গল্পভারতী

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

৬৫ বছর ধরে জনপ্রিয়-
আজও সবার সেরা

লিলি'র
থিন এরোরুট
বিস্কুট

ভাল বিস্কুট চান-
লিলি বিস্কুট খান

লিলি বিস্কুট কোম্পানি প্রাঃ লিঃ । কলিকাতা-৪

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

SD.6/70

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

ক

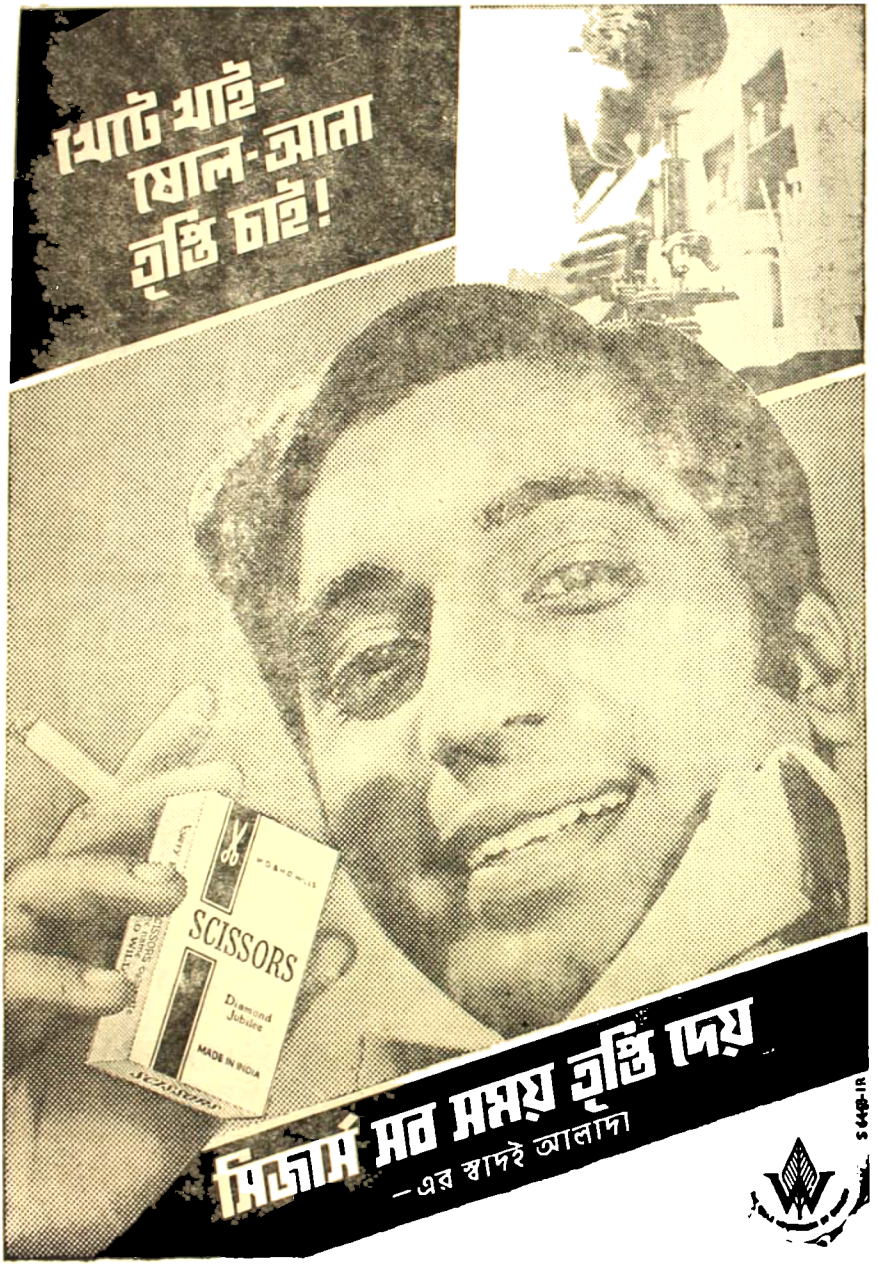
খেটে খাই-
ষোল-আনা
তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
Diamond Jubilee
MADE IN INDIA
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা
S 448-IR

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

আষাঢ় ১৩৭৯,

অষ্টবিংশতি-বর্ষ

JUNE—JULY, 1972

মূল্য : এই সংখ্যা দুই টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র) সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বার্ষিক : (পূজা সংখ্যা সহ)—কুড়ি টাকা

শ্রীগোপাল বিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

এই সংখ্যায়

শ্যামা, শ্যামলা এবং সিমলা	—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ক
কার্টুন		
স্মৃতি তর্পণ		
কাশীনাথের জন্মান্তর	—পরশুরাম (রাজশেখর বসু)	১
জাতিস্মর	—ভাস্কর (জ্যোতির্ময় ঘোষ)	৮
জীবনের সমারোহ	—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১১

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট– **নিম**।

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

এই সংখ্যায়

শরৎচন্দ্রের মামারবাড়ী	—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	১৭
রূপম্ দেহি	— কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
ভাল বাসা	—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯
সীতানাথের বাড়ী ফেরা	—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩
সে আর এক ভারতবর্ষ	—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৯
এপার ওপার কতদূর ?	—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৪৩
আধুনিকা	—আশালতা সিংহ	৪৮

সুলেখা মানেই উৎকর্ষ • উৎকর্ষ সুলেখা

সুলেখা
স্পেশ্যাল
পার্মানেন্ট : শু-ব্ল্যাক
রয়েল শু ★ ব্ল্যাক
ব্রাউন
ওয়াশেব্‌ল : রয়েল শু
রেড ★ গ্রীণ

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ
পার্মানেন্ট : শু-ব্ল্যাক
নেভি শু ★ সুপার ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল : রয়েল শু
এমারেল্ড
গ্রীণ ★ অরেঞ্জেট রেড

সুলেখা
জেনারেল
পার্মানেন্ট : শু-ব্ল্যাক
ওয়াশেব্‌ল : রয়েল শু ★ রেড ★ ব্ল্যাক

সুলেখা
ভারতের সর্বাধিক বিক্রয়ের
গৌরবধন্য কালি

সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
কলিকাতা ● পণ্ডিচেরী

এই সংখ্যায়

বিপ্লব বহ্নি	দীপঙ্কর	৫২
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৫৮
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৬৭
অবেলায়	—নিখিলচন্দ্র সরকার	৭২
আজকের বিজ্ঞান	—শুভঙ্কর	৭৬

স্নাঃ ! কী নরম স্নিগ্ধ ফেনা...
মনে হয় আরো অনেকক্ষণ ধ'রে স্নান
করি ! ঘামাচি-ব্রণর বালাই দূর
ক'রে ত্বক-লাবণ্য মনোরমায়
অম্লান অক্ষুণ্ণ রাখে।

বেঙ্গল কেমিক্যালের
সালফার
সোপ

কসমেটিক ডিভিসন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ★ বোম্বাই ★ কানপুর
দিল্লী ★ মাদ্রাজ ★ পাটনা

কর্মে ব্যস্ত পুরুষদের অতি উপযুক্ত বাটা স্টেপমাস্টার

একেবারে নতুন স্টাইলে, বাটা স্টেপমাস্টার।
জুতোর সম্মুখভাগ প্রসারিত।
আঙুলের আড়ষ্টতা কাটবে এই প্রসারে।
প্রথম দিন থেকেই প'রে পায়ের স্বস্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য।
কালো আর গাঢ় বাদামি, দু রঙেই আছে।
আপনি যখন কাজে ব্যস্ত আপনার পায়ের পরিচর্যায় থাকে বাটা স্টেপমাস্টার।

স্টেপমাস্টার ১৪
সাইজ ৫-১০
৩০.১৫

Bata

এই সংখ্যায়

ফিরে ফিরে চাই	—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	৮০
বন্যা কন্যা (সম্পূর্ণ উপন্যাস)	—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৮৩
লণ্ডনের চিঠি	—অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০৭
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	১১১
মাঠে এল ফুটবল	—অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়	১১৬

কোন মতে বেঁচে থেকে কী লাভ?

বাঁচার মত বাঁচতে হলে শুধু পেট ভরানোই সব নয়। তার সঙ্গে চাই স্নেহ-প্রীতি মায়া-মমতা।

গ্রাসাচ্ছাদনের স্থূল প্রয়োজন মিটিয়ে এক সুন্দর ছন্দবদ্ধ জীবনের কামনা পূর্ণ হওয়া চাই। জীবনও এক শিল্পীর রচনা হয়ে উঠতে পারে আর তার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পিত জীবন। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন পরিকল্পনাকে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে তখন পরিবার ছোট রাখতে তার সাহায্য নিলে ক্ষতি কী? জীবনে সুখ, আনন্দ, প্রীতি ও শুভেচ্ছার পরিবেশ আনতে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করুন।

এই সংখ্যায়—

জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র		
তর্কে অপরাজেয় রামমোহন	—অনাথ উপাধ্যায়	১২০
প্রতিবেশী সাহিত্য—মূল রচনা—প্রেমচন্দ :	অনুবাদ—অনন্তকুমার দাস	১২২
গ্রাম বাংলা		
আর এক তীর্থ রামকেলি	—উৎপল চক্রবর্তী	১২৭
অমন ভেবে মরছেন কেন ?	—শ্রীময়ী	১৩০

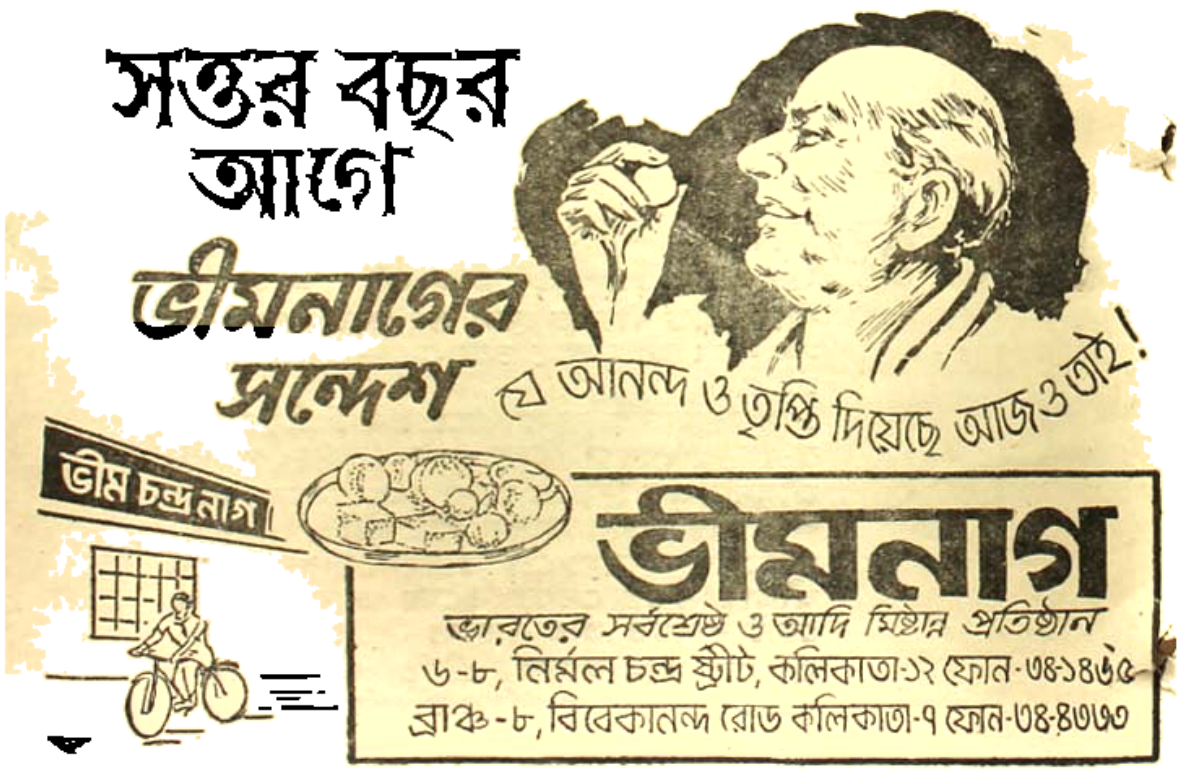

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিটি ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীদুয়ারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই দুর্দ্দিনের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম. অনায়াসেই স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত, ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়—

●

অপরাহ্নবতী	—সুবোধ সিংহ	১৩৪
মেয়ে মজলিশ		
এসেছে বরষা	—বেলা দে	১৩৮
প্রশ্নোত্তরের আসর	—রাঙাদি	১৩৯
ঘরকন্নার কথা	—মীরা ভট্টাচার্য্য	১৪০
ফল সকলের পক্ষে সব সময়েই ভাল	—	১৪৩

বাঙালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহক

পশ্চিম বাংলার তাঁত বস্ত্র

সব ঋতুতে সব উৎসবে ব্যবহার করুন।

বিভিন্ন রুচির আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্রের প্রাপ্তিস্থান

- গভর্ণমেণ্ট সেলস এম্পোরিয়াম
  - ১। ৭।১ লিণ্ডসে স্ট্রীট
  - ২। ১২৮।১, বিধান সরণী
  - ৩। ১৫৯।১।এ রাসবিহারী এভেন্যু
- দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিঃ
  ৬৭ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট কলিকাতা-৪ এবং
  অন্যান্য অনুমোদিত সমবায় বিপনীতে

পশ্চিম বাংলার তাঁতবস্ত্র উৎকর্ষে এবং বয়ন বৈচিত্র্যে অতুলনীয়

প: ব: কুটীর ও ক্ষুদ্রশিল্প অধিকার প্রচারিত

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্পভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্পভারতী নব্যাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্পভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্পভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্পভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্পভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে

গল্পভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্পভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্পভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্পভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

আষাঢ় মাসে গল্পভারতী তার গৌরবোজ্জ্বল ২৮ বৎসরে পদার্পণ করলো।

আজই গল্পভারতীর গ্রাহক হোন

গল্পভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

পূজাসংখ্যাসহ বাৎসরিক চাঁদারহার সডাক মাত্র ২০৲

যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

ভারতের ও বাংলাদেশের সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২১৪ ও ৫৫-১৩৪৫

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

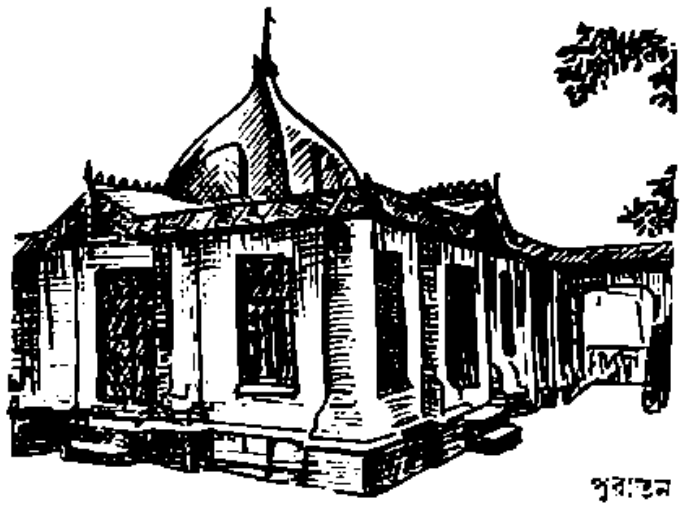

পুরাতন মন্দির

নূতন মন্দির

— সিমলা কালীবাড়ি

শ্যামা, শ্যামলা এবং সিমলা

—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কোথায় কলকাতা, আর কোথায় সিমলা। পূব থেকে পশ্চিমে বেঁকে হাজার মাইলেরও ওপর পথে পাড়ি দিতে হবে। বিহার-উত্তরপ্রদেশ-দিল্লী-পাঞ্জাব টপকে যেতে হবে। চাল-চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে ট্রেনে চাপতে হবে দীর্ঘ দু'দিন দু' রাতের জন্য।

পথের ক্লান্তিটা কম নয়। ইউরোপ মহাদেশ হলে এতক্ষণে লণ্ডন থেকে মস্কো পৌঁছে যাওয়ার কথা! তা হোক, তবু সিমলার ওপর বাঙালীর একটা আঁতের টান আছে।

চেহারায় হিমাচলীদের সঙ্গে বাঙালীর গরমিল আগা-গোড়া। হিমাচলীরা দীর্ঘাকার, টকটকে বর্ণ, চওড়া কপাল, টিকোল নাক, সুগঠিত তনু ও চিবুক—বিশুদ্ধ ককেসয়েড নর্ডিক জাতের সমস্ত চিহ্ন বহন করে আছে। হয়তো কিছু-মিশেল হয়েছে, তবু অষ্ট্রালয়েড আর মঙ্গোলয়েডের

বিশেলে তৈরী বাঙালী জাতের সঙ্গে এদের আকৃতিগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত। নডিকের ছোঁয়া বাঙালীর রক্তে একেবারে ছিটেফোঁটা। আহারে-বিহারে, ভাষায়-আচরণে, হাবে-ভাবে, সাজে-পোশাকে হিমাচলী আর বাঙালীর কারাকটা হল আসমান-জমিন্।

জিনে স্ট্রাকচারে সমতল ভূমির বাসিন্দা বাঙালী। মেজাজে বেশ খানিকটা আলসে। মতটা মাথে তভটা হাতে নয়। ওদিকে উত্তুঙ্গ হিমালয়ের দুর্গম চূড়ায় ডেরা বানিয়েছে হিমাচলীরা। সেখানকার পাইন আর আকাশ-ছোঁয়া দেওদারের বনের হাওয়া টাটকা—তাজা, ঝরঝরে তরতরে। এমন কি যখন শীতের তুষারপাতে আল্পাইন রেঞ্জের-অংগলগুলো পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে সব একাকার হয়ে যায় দুধের ফেনার মতো সাদায়, তখনও বাতাস থাকে তাজা বিস্কুটের মতো মচ্‌মচে। তাই হিমাচলীদের কলজের জোর বাঙালীদের চেয়ে অনেক বেশী। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বোঝা পিঠে নিয়ে খাড়া-প্রপাতের চড়াই ভেঙে উঠে যায় পাহাড়ী টাট্টুর মতো উপরদিকে। ষাটের বয়সের মধ্যেও হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খাটে জীবিকার জন্যে।

তবু হিমাচলের সঙ্গে বাংলার এক জায়গায় অন্তরের মিল আছে। সে হল ধর্মভাবের মিল।

•

প্রাক্ আর্য ভারতের যে সব চিহ্ন পাওয়া গেছে, তার থেকে একটা বড় প্রমাণ মিলেছে, তখনকার ভারতবাসীদের বেশীর ভাগ আগ্রহ ছিল শক্তি উপাসনায়। বিশ্ব উপত্যকার উর্বরা পৃথিবীকে তারা সমস্ত শক্তির উৎস বলে মনে করত। মাটিকে মনে করত—সর্ব জীবের জননী—সর্ব শক্তির আধার। সেই থেকেই ভারতে শক্তি-উপাসনার প্রচলন, তন্ত্রের আদি উৎপত্তি।

সেই শক্তিরই কালভেদে নানান রূপ। তিনিই পার্বতী। তিনিই হিমালয়ের কোলে উমা, হিমালয় দুহিতা উমা—'উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা, পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।'—কবির ধ্যান, যোগীর ইষ্ট মন্ত্র। আবার তিনিই দেবী দুর্গা, দুর্গতি নাশিনী। দেবতাদের সমবেত শক্তি দিয়ে গড়া অমলকমলিনী, তেজোময়ী প্রতিমা চণ্ডী। অসুর নাশে নিযুক্তা।—শেষে তিনিই—

'করাল বদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা-বিভূষিতাং॥
দ্বীপী চর্ম পরিধানাং শুষ্ক মাংসাতি ভৈরবা॥'

দেবী দক্ষিণা কালী। এক হাতে অসুর মুণ্ড; দুই হাতে খেট-খর্পর, অন্য হতে বরাভয়।

হিমাচল প্রদেশে শক্তি উপাসনার ছড়াছড়ি। প্রাক্—আর্য শক্তি-ময় কোন যাদুতে আর্য-নডিকদের ধ্যানময় হয়ে গেল তার ইতিহাস আজও অনুক্ত। কিন্তু চম্বা থেকে রামপুর উপত্যকা পর্যন্ত দুর্গা পুজোর যে উৎসব লেগে যায়, তার একমাত্র তুলনা চলে বাংলার সঙ্গে। বিশেষ করে কুলু-মানালিতে। সমস্ত কুলু উপত্যকা যখন উৎসবের নেশায় যেন পাগল হয়ে যায়। ওদিকে কাংড়ায় লোল-জিহ্বা করালা আলামুখী। কুলু-মানালির হিড়িম্বা দেবীর মন্দিরে মহিষমর্দিনী। নানাদিকে নানাভাবে হিমাচলে শক্তি উপাসনা ছড়িয়ে আছে।

বাঙালী চিরদিন কালী ভক্ত। রামপ্রসাদ তো 'কালের মুখে দিয়ে কালি, কালী বলেই কাল' কাটিয়ে গেছেন। কমলাকান্তের 'মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে' আগা-গোড়াই মজেছিল। রামকৃষ্ণ 'আমার মা যং হি তারা' বলে আত্মহারা সমাধিস্থ। আর শুধু সাধকরা কেন, বাংলার ভাবুক হিন্দু মাত্র মুসলমানরা পর্যন্ত মাতৃমন্ত্রের জপ করেছে। জাতীয়তাবাদী বাঙালী "বন্দেমাতরম্" হুঙ্কার তুলে বন্দনা করেছে দেশমাতাকে যিনি 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী।' তান্ত্রিক বাঙালী-কাপালিক ধ্যান করেছে—ভৈরবীর, ছিন্নমস্তার কিম্বা বজ্রযোগিনী তারার। বৈষ্ণবিক বাঙালী প্রতিমা সাজিয়ে দুর্গাপূজা করেছে ষোড়শোপচারে। বণিক বাঙালী পূজা করেছে মা-অন্নপূর্ণার। আর সাধারণ বাঙালী যারা বালক মনোবৃত্তির ওপরে উঠতে পারেনি—মা মা করে চোখের জল ঝরিয়েছে, গভীর দুঃখে, পরম সুখেও।

ভাবাবেগী বাংলার সঙ্গে শক্তি মূর্তি কালী একাকার হয়ে গিয়ে নাম নিয়েছেন শ্যামা। আর সেই সুদূর হিমাচল

প্রদেশে সেই একই শক্তিমূর্তি শ্যামলা দেবীর অবস্থান থেকে গোটা পর্বত নগরীটারই নাম হয়ে গেছে সিমলা। ভাবতেও অবাক লাগে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়!

• • •

সিমলা কালীবাড়ির ঝকঝকে চত্বরে দাঁড়িয়ে এসব কথা চিন্তা করছিলাম। সকালের উজ্জ্বল রোদের তির্যক রশ্মিগুলো ছত্রাকারে ছড়ান দেবদারুর ফাঁকে ফাঁকে এসে বন্যার মতো পড়েছিল কালীবাড়ির অঙ্গনে, মন্দিরের চূড়োর ওপরে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম চূড়োটার গঠন-শৈলী, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের আটচালা টাইপ। বাঙালীর নিজস্ব নিজ বৈশিষ্ট্য।

মন্দিরে দলে দলে ভক্ত সমাগম হচ্ছিল। সবাই পূজার্থী। আসছিল হিমাচলী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, তৈলঙ্গী, বাঙালীরা তো আছেই। আসছিল বিহারী, উত্তর ও মধ্যপ্রদেশের হিন্দুস্থানী, মারাঠি। অবাক হলাম পাগড়ী-মাথায়, দাড়ি গোঁফ মেজে ঘষে পরিষ্কার পরিপাটী ভাবে জালে বেঁধে আসছিল সর্দারজীরা পর্যন্ত। সঙ্গে তাদের শালোয়ার-কামিজ পরা সর্দারনীরাও।

সবাই আসছে। আগমন জানিয়ে দিচ্ছে ঘণ্টা বাজিয়ে। সামনের কলে পা ধুচ্ছে পূজো চড়াচ্ছে। এলাচ দানা প্রসাদ নিয়ে চলে যাচ্ছে। রাস্তায় যাকে পাচ্ছে প্রসাদ বিতরণ করছে। চারপাশে আকাশে মাথা তোলা গাছ-গুলোর ডালে; মন্দিরের ছাদে বসে থাকা অসংখ্য শাখামৃগ-রাও তা থেকে বাদ পড়ছে না।

মন্দিরের ভিতর থেকে গম্ভীর গলায় শোনা যাচ্ছে—'দেবি প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ। প্রসীদ মাতা জগতোঽ-খিলস্য।' সংস্কৃত উচ্চারণে পুরো বাঙালী টাইল।

ভিতরে ঘণ্টা ধ্বনি হল। বাইরে বেজে উঠল ঢাক-ঢোল নাগারা।

মন্দিরের বাঁদিকে অফিস ঘর। সেখানে বেঞ্চি-চেয়ারে সোফা উপ্‌রে পড়েছে যাত্রীর দল। বাইরে দু পায় ঠায় দাঁড়িয়ে। এ আর এক মন্দির। এখানেও সমবেত হয়েছে কাশ্মীরী থেকে কন্যাকুমারীর তামিল, গুর্জর থেকে আসাম-মণিপুরের অধিবাসী। কে নয়! এঁরা সবাই আশ্রয়প্রার্থী।

আধ-বয়সী পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা দীর্ঘাকার মালিকী ঘুরছেন লাট্টুর মতো। চিমনীর মতো সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চলেছেন আর হাজার জনের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।—আপনি কোথা থেকে এসেছেন? পাটনা থেকে? ও: আসুন।—ঘরে গিয়ে রেজিষ্টার খুলছেন। কবে লিখেছেন? দোসরা? ও: এই যে! এই তুলসীরাম চাবি নিয়ে পাঁচ নম্বরের ঘরটা খুলে দাও।

ধানবাদ থেকে এসেছেন ভট্টাচার্যরা। সঙ্গে শালা-শালি-শালাজরা-এ বোন-ভগ্নীপতি, এতি-গেতি; প্রকাণ্ড দল। মালিকী এগিয়ে এলেন।—ও: ধানবাদের ভট্টাচার্য? ঠিক ঠিক। ওহে ওদের ঐ ডর্মিটারীটা খুলে দাও। ওখানে ঘর চারটে তক্তাপোষ আছে, আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।

—আপনি কোথা থেকে আসছেন?—খবর দিতে পারেন নি। তা হলে তো পারব না। এখন দিচ্ছি। একটুও খালি নেই। সন্ধ্যে বেলা সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করুন। সেক্রেটারী শান্তনু রায়—এখন অফিসে গেছেন। সরকারী অফিসে কাজ করেন। আমার পক্ষে কিছু করা অসম্ভব।

—হ্যাঁ, কি বলছেন? চার্জ? একটা ঘর দিনে পাঁচ টাকা। আর ডর্মিটারী এক টাকা বাট পয়সা মাথা পিছু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাওয়াও মিলবে। আমাদের রান্নাঘর আছে। প্রতি দিন এক টাকা পঁচাত্তর। ভাত, ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল—সব বাঙালী খানা। রাতে রুটী তরকারী, মাছ, সপ্তায় দু'দিন মাংস।

—নতুন বিবেকানন্দ হলের ঘর পিছু তাড়া বারো টাকা। কিন্তু সে সব ভক্তি।

একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—মালিকী বাঙালী?—না: উনি হিমাচলী। কিন্তু বাংলা বলেন বাঙালীর মতো।

কে একজন ভিতর থেকে হাঁক দিল—মালিজী, কলমে পানি নেহি আতা।—একটু দাঁড়ান।—বলেই মালিকী হাতে একটা রেক নিয়ে ছুটলেন।

এক বাঙালী ভদ্রলোক এসে সামনে দাঁড়ালেন। একটা মোটা পুলওভারের ওপর সাংঘাতিক গরম এক ড্রেসিং গাউন, যা গায়ে দিয়ে আরেকটি ঘুরে আসা যায়।

—আমি মুখার্জি। আপনি?

—ভট্টাচার্য। আপনার বোধহয় একটুতেই খুব শীত করে?

—না মশায়, শীত তো নেই। তবু আমি ঠিক করেছি শীত থাক বা না থাক এগুলো পরতে হবে। বলা যায় না এ পাহাড়ে জায়গায় ঠাণ্ডা একবার কখন যে লেগে যাবে, আর আপনি খরচ হয়ে যাবেন তা বুঝতেই পারবেন না। এই তো পরশু একজন একদিনের জ্বরে হ্যামোনিয়া হয়ে মারা গেলেন।

—কি আপনারা কুলু মানালি যাবেন না?—আরও একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন।

সিমলার কালীবাড়ি দেখতে দেখতে লোকারণ্য। তাইতে লাগলাম—কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর থেকে এর তফাৎ কোথায়?

তফাৎ যে নেই তা নয়।

কালীঘাটের মতো গঙ্গার তীরের কালী মন্দির। বাজার, বেশ্যালয়, লাখে লাখে লোক, রাস্তায় সহস্র ভিক্ষুক আর হকার। এদের ভীড় ঠেলে মন্দিরে যদি বা পৌঁছান যায়, গর্ভগৃহে 'মা'র দর্শন প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণেশ্বরে অবশ্য কথঞ্চিৎ এদিক ওদিক। তবে সেখানে এখন উঠতি প্রেমিক-প্রেমিকাদের তীর্থ-ক্ষেত্র আর কি কালীঘাট, কি দক্ষিণেশ্বর, মন্দির ঘিরে আছে অসহ্য নোংরা, অসম্ভব কলুষিত বাতাবরণ।

এখানে এই সিমলার কালীবাড়ির চূড়ো মাথা উঁচু করে আছে একটা উত্তুঙ্গ পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু চূড়োয়। চারদিকে আকাশে মাথা তুলে দেওয়া বিরাট বিরাট বনস্পতির দল,—দেওদার, খনৌর, চীল—সবুজের কাঁড়ি চালা। তাদের নীচে ঝকঝকে পরিষ্কার পাহাড়ী পথ। এখানকার চত্বরে দাঁড়ালে নজরে পড়ে সিমলার তাবৎ ঢেউ-খেলে যাওয়া বনভূমি, ছাওয়া পাহাড়ের পর পাহাড়। বৃক্ষাবলীর ফাঁকে ফাঁকে বিচিত্র শৈলীর নানান ঘরবাড়ি। তাদের মাঝে মাঝে রাস্তা। এখানে ওখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাদ। সব নীচে কানা-উঁচু বাটীর তলার মতো দেখা যায় সমতল জমিটুকু, চক চক করে রোদে। আগে ঐটাই ছিল সাহেবদের রেস কোর্স। হিমালয়ের ধ্যান গম্ভীর ভাব সত্ত্বেও আবহাওয়ায় ঈষৎ চঞ্চল হলেও সব ছাপিয়ে তা দাঁড়িয়ে আছে আকাশ পৃথিবী জুড়ে। হিমালয় চিরকালই হিমালয়।

রাতে এসব দৃশ্য অন্ধকারে একাকার হয়ে যায়, শুধু কালো আকাশে অজস্র নক্ষত্রের মতো মিট মিট করে জ্বলে অগুনতি বিজলীবাতি।

সিমলার শোভা অপূর্ব! বিশেষ করে আমাদের এই নোংরা-জঘন্য; কলুষিত বাতাবরণে ঘেরা পচা ডিমের খোলার ভিতরকার কলকাতার বাসিন্দাদের কাছে।

মিঃ মুখার্জি বললেন—বড় সুন্দর না? আমি এই পঁচিশ বছর পরে কলকাতার বাইরে এসেছি। এসেই ভাল লেগে গেল সিমলাকে। আর সিমলায় এসেই পেলাম আমার বাংলা দেশের ছোট খাট সংস্করণ—এই কালী-বাড়িকে। পেলাম বাঙালী সঙ্গ, বাঙালী খানা।

সর্বভারতীয় সমন্বয় হলেও এখানকার বাঙালীপনাটা সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে। তাই টিপিক্যাল বাঙালী মিঃ মুখার্জি কুলু-মানালি ঘুরে এসেও নাক সিঁটকে বললেন—সিমলার মতো জায়গা হয় না মশায়। কুলু-মানালির চেয়ে ঢের ভাল। সেখানে বাঙালীর আড্ডা নেই, বাঙালী খানা নেই—

হক্ কথা! এই আড্ডাই হল বাঙালীর প্রাণ। পুকুর ঘাটে আড্ডা, রান্নাঘরে আড্ডা, চণ্ডিমণ্ডপ-বৈঠকখানায় আড্ডা, রকে আড্ডা, রাস্তায় আড্ডা, চায়ের রেস্তরাঁয় আড্ডা, ক্লাবে তো আড্ডা আছেই. আছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আড্ডা, সভা-সমিতির আড্ডা, খেলার মাঠে আড্ডা, অফিস-আদালতের আড্ডা, মন্দির-মসজিদে আড্ডা, আড্ডা না হলে বাঙালী বাঁচে না। তার পেট ফুলে ওঠে, দুনিয়া ফাঁকা ফাঁকা বিস্বাদ লাগে।

আর সে আড্ডার রকম ফের কতো! বাড়ীর হেঁসেল থেকে আরম্ভ করে, পাড়ার কেচ্ছা, সমাজের কেচ্ছা, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য-শিল্প, খেলাধূলো—কি সেখানে আলোচনা হয় না!

এই আড্ডার জন্যেই চারজন হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালী বিদেশে একত্রিত হলে কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠার কথা ভাবে। কালীবাড়ি শুধু ধর্মেরই আয়তন নয়—কালচারাল সোসাইটীও বটে।

সিমলায় কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার মূলেও রয়েছে এই আড্ডার মনোবৃত্তি। তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে 'সিমলা বঙ্গীয় সম্মেলনী'।

সভ্যায় বঙ্গীয় সম্মেলনী ও কালীবাড়ির সম্পাদক শান্তনু রায়ের সঙ্গে দেখা হল। চেহারায় টিপিক্যাল বাঙালী, যোগা-পাতলা। কিন্তু উজ্জ্বল ছুটো বড় বড় চোখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবেদন, দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই কালীবাড়ির ইতিহাস কি কিছু পাওয়া যায়?

শ্রী রায় তখুনি একখানি 'সিমলা কালীবাড়ি পরিচয়' কাচের আলমারী থেকে বার করে দিলেন। দেখলাম এই রচনার লেখনী ধরেছেন অস্তের কাননদা—কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। শ্রীমালী বললেন—মূল্য সকাল সন্ধ্যা। বইটা কিনে নিলাম। নিলাম বটে, তখন কে জানত পরভারতীর শ্রীসত্যেন রায় মশাই উপ্র আগ্রহে উন্মুখ হয়ে বসে আছেন সেই সুদূর কলকাতায় সিমলা কালীবাড়ির পরিচয় জানবার জন্ত! যোগাযোগটা নেহাৎই কাকতালীয়। সত্যেনদা কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বললেন—মায়েরকৃপা! প্রভিডেন্স!

কালীবাড়ির আফিস ঘরের মধ্যেই কথা বার্তা হচ্ছিল। আমার চোখ বার বার গিয়ে পড়ছিল ঘরে টাঙান অনেক-গুলি ফটোর দিকে। বিশেষ করে একটা উজ্জ্বল মুখ, প্রশান্ত ইন্দ্রিয়ময়। দেখলে মনে হয় কোন প্রদেশের বিদেশী শাসক। উনি হলেন স্তর বি. এল. মিত্র। আমাকে শান্তনু রায় মনে করিয়ে দিলেন।

তখন মনে পড়ল ইংরাজ রাজত্ব, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতক, কলকাতার পত্তন, মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবি বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল রামমোহন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ফুদিরাম-প্রফুল্ল চাকীর দল, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র এবং মনে পড়ল লর্ড সিংহ ও স্তর বি, এল মিত্র কথা। মনে পড়ল রামমশাই কেদার বাড়ুয্যে-এর কোন গ্রন্থে অনেক অবাঙালীর উক্তি—'সারে হিন্দুস্থানমে ওহি এক ইলিমদার জাত হায়, বাংগালী।'

বললাম—রাজনীতিতে যেমন টক্করাটক্করি বিরুদ্ধাচরণ করেছে বাঙালী ইংরেজের, তেমনি এক সময়ে রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইংরেজের ডানহাত হয়েছে বাঙালী। আজ সে বাঙালী বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া। কিন্তু সেদিন সেই উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর একটা চেহারা ছিল, চরিত্র ছিল। বাঙালী সেদিন ছিল স্রষ্টা—ভবিষ্যৎ ভারতের স্রষ্টা, নতুন জাতের স্রষ্টা, কাব্য-সাহিত্য-দর্শনের স্রষ্টা আবার কালীবাড়িরও স্রষ্টা।

একজন সিমলা প্রবাসী যুবক শুনুনি বললেন—হ্যাঁ, কালীবাড়ি থেকে নকশাল বাড়ি। সব কিছুই বাঙালীর সৃষ্টি।

হাসতে দিয়েও হাসতে পারলাম না, কথাটার যাথার্থ বুঝে।

সার্ভে-অব্-ইণ্ডিয়ার তরীপ সংক্রান্ত কাজে সে সময়ে বাঙালী রাজ কর্মচারীদের অবদান ছিল প্রচুর। রাধানাথ শিকদার থেকে নামী-অনামা, জানা-অজানা বহু রাজ-কর্মচারীর কাজ এর সাক্ষ্য হয়ে আছে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে সিমলা তখন শুধু পাহাড় আর জংগলে ভরা পাহাড়ী আবাসিকদের ভেড়া একদল বাঙালী রাজ-কর্মচারী এসে তাঁবু ফেললেন সিমলা পাহাড়ে। তাঁরা নানা কাজে পর্বত ঘুরে বেড়ান। তাঁদের চোখে পড়ে এক প্রকাণ্ড দেওদারের তলায় ছোট্ট একটি গুহার মধ্যে নির্জনে বাস করেন এক সাধু। সাধুটি তান্ত্রিক। তিনি পূজা করেন এক মহিষমর্দিনী চণ্ডীর বিগ্রহ। বাঙালীবাবুদের সেখানে যাতায়াত সুরু হয়ে যায়।

একদিন সেই সাধু দেহত্যাগ করলেন। তখন নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে বাবুরা নিলেন সেই চণ্ডী-বিগ্রহের পূজোর সমস্ত ভার। কিন্তু শুধুমাত্র চণ্ডীমূর্তিতেই তাঁরা সন্তুষ্ট হইলেন না। সেই গুহার পাশে একটি কাঠের মন্দির তৈরী করিয়ে, সেখানে প্রতিষ্ঠা করলেন কালীমূর্তি। জয়পুরের এক বিখ্যাত ভাস্করকে দিয়ে কষ্টিপাথরে এই মূর্তি তৈরার করান হল।

সিমলা যে আগে থেকেই তন্ত্র উপাসনার জায়গা ছিল, সে বিষয়ে প্রাত্বিকরা নিঃসন্দেহ। শ্যামুহিল বা যক্ষ পাহাড়ে বহুদিন আগে থেকেই ছিল শ্যামলা দেবীর মন্দির।

শ্যামলাদেবী হলেন দুর্গার আর এক রূপ—ললিতা সহস্র নামের মধ্যে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবী শ্যামা, তাই তিনি শ্যামলা। কালীরই নামান্তর। শ্যামলা থেকেই সিমলা। সেখানেও পূজারী ছিলেন এক তান্ত্রিক সাধু।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এই সাধুর আস্তানার পাশের সমস্ত জমিটা কিনলেন এক বৃটীশ ভদ্রলোক। ইচ্ছা এখানে দেশের বাগান ও বৃটীশ ক্যাসেলের অনুকরণে প্রাসাদ তৈরী করে বাস করেন। করলেনও। প্রাসাদের নাম দিলেন রথ্‌নে ক্যাসেল। আর সেই সঙ্গে পাশের সাধুর কুঁড়েটি উচ্ছেদ করে দেবীমূর্তিটিকে নিক্ষেপ করলেন খাদের মধ্যে।

কিম্বদন্তী বলে, বাস করতে এসে প্রথম রাত্রেই সেই সাহেবের স্বপ্নদর্শন হল। একদল রক্তাম্বর অস্ত্রধারী সেনা তাঁকে মারতে আসছে এবং পরের পর ক'রাত একই রকম আতঙ্কের স্বপ্ন দেখলেন তিনি। অনুসন্ধানের ফলে হিন্দু কর্মচারীদের কাছ থেকে জানতে পারেন দেব-মূর্তিকে অশ্রদ্ধাভরে ফেলে দেওয়াতেই তাঁর এই অবস্থা।

তিনি তখুনি খাদ থেকে সেই মূর্তি উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন ও দেবী পূজার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জনৈক বাঙালী ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও একজন তান্ত্রিক সাধু রামানন্দ ব্রহ্মচারী খাদের ভিতর থেকে সেই দেবী মূর্তি উদ্ধার করে নিয়ে আসেন সম্পূর্ণ অটুট অবস্থায়, শাস্ত্রীয় মতে প্রতিষ্ঠা করেন বাঙালীদের প্রতিষ্ঠিত কালী-বাড়িতে।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে সিমলার রবরবা বাড়ল। হল ভারত সরকারের গ্রীষ্মাবাস, ভাইসরয়ের শ্রীমাবাস। কালীবাড়ির বোলবোলাও বাড়তে লাগল। চাঁদা উঠতে লাগল, ভাণ্ড তৈরী হল। ইন্দোরের হোলকারের টাকায় তৈরী হল 'অজিয়' বাড়ি কাঠের বাড়ির আদলায়। দিগ্‌দেশ থেকে যাত্রীরা এসে থাকবার জন্য তৈরী হল অতিথিশালা।

কিন্তু বাঙালীর দুর্ভাগ্য যে, তার কোন প্রতিষ্ঠান কখনও একভাবে সুষ্ঠু অবস্থায় যায় না। কালীবাড়ির অবস্থাও এক সময়ে খারাপ হয়ে এল। সে হল ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রবাসী বাঙালী সমাজের মাথাওয়ালা ব্যক্তি উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি পড়ল কালীবাড়ির দিকে।

তিনি অবিলম্বে হিন্দু জনসভার আয়োজন করলেন ১৫ই সেপ্টেম্বর। সেই সভায় কালীবাড়ির তত্ত্বাবধানের জন্য ও পরিচালনার জন্য ব্যবস্থা করলেন সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলীর ও রীতিমতো পরিচালক সমিতির। অনেক অনুসন্ধান করে হলেন সভাপতি এবং উমেশচন্দ্র হলেন সম্পাদক।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র মিত্র সম্পাদক হন। সে সময়ে স্যর গুরুদাস আর স্যর রাসবিহারী আইনের এই দুই 'বাঘা-ভালুক' এক সঙ্গে আসেন সিমলা পাহাড়ে। শ্রীশচন্দ্র এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। দু'জন আইন ধুরন্ধরকে নিয়ে কালীবাড়ির একটা 'ট্রাষ্টডীড' এর খসড়া তৈরী করিয়ে নেন। পরে আইনমতো রেজিষ্ট্রি করিয়ে নেন। এই আইনে কালীবাড়ির সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। চারুচন্দ্র সরকার হন সেই সম্পত্তির প্রথম ট্রাষ্টি।

১৯০৩ থেকে ১৯৩০ এর ইতিহাস মোটামুটি গতানুগতিক। বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু সবাই মুক্ত হস্তে দান করেছেন কালীবাড়ির ব্যাপারে। ১৯১৩-২৪এ দিল্লীর বড় ব্যবসায়ী শেঠ আলোপীপ্রসাদ দিয়েছিলেন দেবীর শ্বেত পাথরের পদ্মাসন তৈরী করিয়ে খরচ পড়েছিল সাত হাজার টাকা।

১৯৩০ এ ঢুন্ডল রাজ্যের রাণা-সাহেব তৈরী করিয়ে দেন মন্দিরের সামনে শ্বেত পাথরের স্তম্ভ দুটি। জয়পুরের মহারাণী দেন মন্দিরের রূপোর দু'পাটী দরজা। ক্রমশঃ তৈরী হতে থাকে আধুনিক ধরণের অতিথিশালা, শিক্ষা-ভবন, প্রতিমা মিত্র হল, গ্রন্থাগার ইত্যাদি।

১৯৩১ এ কালীবাড়ি হয়ে দাঁড়ায় এক বৃহৎ স্বয়ং সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং সম্পূর্ণভাবেই বাঙালী প্রতিষ্ঠান। এই বছরেই শেষ হয় কালীবাড়ির এই বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণের কাজ। এ কাজে যে অর্থ লেগেছিল তা ওঠাবার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করেন স্যর বি. এল. মিত্র ও লেডী প্রতিমা মিত্র। তাঁদের কথা স্মরণ করেই হলের নাম হয় 'প্রতিমা মিত্র' হল। উদ্বোধন করেন মণ্ডী রাজ্যের বাঙালী রাজা স্যর যোগীন্দর সেন।

কালীবাড়ি ও সিমলা বঙ্গীয় সম্মেলন এর উদ্যোগে সিমলার বাঙালীদের একমাত্র বিদ্যালয় 'ইউনিয়ন একাডেমী'র

জন্য উপযুক্ত স্থানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং মন্দির এলাকার মধ্যে নির্মাণ করা হয় বিদ্যালয় ভবন। খরচ হয় আঠারো হাজার টাকা। এই খরচের বেশীর ভাগ টাকাটা তুলে দেন তখন নৃপেন্দ্রনাথ সরকার স্বীয় উদ্যমে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তখ সরকার যখন সিমলা ছাড়েন তখন কালী-বাড়ির দেনা শোধ হয়েও থেকে যায় একুশ হাজার টাকা। পরে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ শোধ হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, কালীবাড়ির দেনা শোধের জন্য কলকাতায় বিখ্যাত ইন্সেপারিও সুহৃদবৎসল, সমাজসেবী স্বর্গত হরেন ঘোষ মশাই দুবার সিমলায় যান। প্রথমবার তিনি সেরাইকেলার মহারাজার বিখ্যাত ছৌ নৃত্যের দলটিকে সিমলায় সফর করান। পরের বারে সিমলায় নিয়ে যান স্ব-নামধন্য নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু ও সেই সঙ্গে অন্যান্য কয়েকজন শিল্পীকে। এ হল ১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের কথা। সাধনা তখন তরুণী যুবতী।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সিমলায় স্থায়ী বাঙালীর সংখ্যা কমতে সুরু করে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে ভ্রমণকারী আগন্তুক বাঙালীর দল। কালীবাড়ির অতিথি-শালার খ্যাতি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রয়োজন হয় অতিথিশালাকে নতুন করে নির্মাণ করার।

কালীবাড়ির কিছু জমি বহু আগে থেকেই মিলিটারী অথরিটিদের অধিকার করে নিয়েছিল। তখনকার লোক সভার সদস্য ও পরে উপমন্ত্রী অরুণ গুহের সাহায্যে সেই জমি পুনরুদ্ধার করা হয়। সেই জমিতে নতুন অতিথিশালা গড়ে ওঠে ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে। এক সুপ্রশস্ত কক্ষে আহার ব্যবস্থাটিকে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে পুরাতন মন্দিরের ছাদ ও চূড়া ভেঙে ফেলে বাঙলার আটচালা শৈলীর নতুন চূড়া ও ছাদ তৈরী করা হয়।

এই হল সংক্ষেপে সিমলা কালীবাড়ির ইতিহাস।

হিমাচল প্রদেশ তৈরী হবার পর থেকে সে দেশের সরকার ক্রমাগত প্রচার করে যাচ্ছে সিমলার ও হিমাচলের অন্যান্য জায়গার আকর্ষণের কথা। সমতলের লোকদের সামনে তুলে ধরছে লোভনীয় বেড়াবার টোপ। টুরিজ্‌ম্ হল এই সরকারের একটা বড় আয়ের পন্থা। মে জুন এর একশো দশ থেকে একশ বিশ ডিগ্রী গরমে অস্থির হয়ে নীচে পাঞ্জাব হরিয়ানার সমস্ত জায়গা থেকে বিশেষ করে চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, অমৃতসর, আম্বালার থেকে রইস-আদমীরা, সাধারণ লোকেরা দলে দলে গাড়ীতে ট্রেনে এসে হাজির হচ্ছে সিমলায়। দিল্লী ভেঙে লোক ছুটে আসছে একটু শীতল আশ্রয়ের জন্য! ওদিকে আসছে দলে দলে বাঙালী ভ্রমণকারীর দল। এই তৃতীয় গরমের ওপর আবার 'সাবিট অনুকারেন্সের' গরম। সিমলায় এবার তিল ধারণের জায়গা নেই। তিন টাকা থেকে তিনশ' টাকার সমস্ত হোটেল লজিং ভর্তি ভর্তি ইয়ুথ হোস্টেল, ডর্মিটারী, ওয়াই এম্ ও ওয়াই ডব্লু সি এ। ঘর ভাড়া নিতে গেলেও এক রাতে বিশ টাকার কম কোথাও নয়।

—সরকারী টুরিস্টব্যুরো এর সব কথা চেপে যায়। তারা কেবল লোক ডেকেই খালাস। টোপ নাচিয়েই চুপ। তারপর ঠেলা সামলাও যদি ক্যামেরা বেচে। বললেন আমাকে ইন্সেপারিও : দুঃ তুমপ'। সম্প্রতি স্থানের জন্য ঘোরাঘুরি করছেন সিমলায়, মাতৃকর দেবপ্রসাদ সরকারের ম্যাজিক পার্টী আসছে, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু বাংলা বলেন চমৎকার কলকাতায় দীর্ঘদিন বাস করার ফলে। বললেন—মধ্যবিত্ত ও বড় বিত্ত বাঙালীর থাকবার কোন ভাল বন্দোবস্ত এই সিমলায় নেই—একমাত্র কালী-বাড়ি ছাড়া। একটাকা ষাট পয়সায় রাত্রি বাস করতে পারার মতো ফুটপাথ ছাড়াও সিমলায় পাওয়া অসম্ভব। তারপর একবার একটু বিষ্টি হল তো ব্যস্। শীতের চোটে হাত পা ঠাণ্ডা করে ছেড়ে দেবে। থাকবেন কোথায়?

রাত্রে আহার কক্ষে বসেও সেই কথা মনে পড়ল। হুগলী জেলার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য আছেন এই ব্যাপারে তার প্রাণ্ড। সাদর আপ্যায়ন করে সবাইকে বসাচ্ছেন। শ্রীমাখন চন্দ্র বর্মনা হাসি হেসে বাসমতী চালের ভাত ঢেলে দিচ্ছে থালায়। পড়ছে গরম গরম কড়াইএর ডাল, পোস্ত চচ্চড়ি, কুমড়োর ছক্কা, মাছের ঝোল। (কটীতো আছেই, সপ্তাহে দু'দিন মাংস।) এই গোস্ত রুটী, আলু ছোলে-ডড়কার থেকে এসব হল গুরুপাক পদার্থ। এবং তা পাচ্ছি পেট ভরে। শ্রীযুক্ত মাখন বারংবার জিজ্ঞাসা করে আত্মীয়ের মতো

খাওয়াচ্ছে। মূল্য মাত্র একটাকা পঁচাত্তর! যেখানে বাইরে এক প্লেট ভাতের (আধপেটাও হতে পারে), দাম সবচেয়ে কম যদি হয়তো একটাকা। এক প্লেট ডাল হল আট আনা থেকে একটাকা। এক প্লেট মাংস হল আড়াই থেকে তিন টাকা। সিমলার মতো জায়গায় কালীবাড়ির সস্তায় এই সদাব্রত না থাকলে বহু বাঙালীই দেশ দেখার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতো নিঃসন্দেহে।

সুতরাং স্বল্প ব্যয়ে কেউ যদি সিমলায় বেড়াতে যেতে চান তো—ডুব দেবে মন কালী বলে। সেখানে আত্মা ও পুণ্য দুই-ই লাভ হবে একসঙ্গে। হবে রথ দেখা এবং কলা বেচা। তবে আগে থাকতে খবর পৌঁছে দেওয়া চাই সম্পাদকের কাছে।

•

মায়ের মহিমা অপার! ভাবতেও চমক লাগে চোখেকে কী হয়! Simla summit Conference যখন চলছে তখন থেকেই ভাবছিলেম এবারে সিমলা কালীবাড়ির কথা দিতে পারলে ভাল হয়। সিমলা তখন পৃথিবীর সকলের মুখে মুখে। সিমলার যাঁরা পরিচিত আছেন তাঁদের কাছে চিঠি লিখবো লিখবো করছি অথচ হয়ে ওঠে না, কাজের গণ্ডগোলে কোনদিনই। দেরী হয়ে গেল ভেবে এখানকার এক ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার কর্তৃপক্ষের একজনকে অনুরোধ করে বল্লেম Telex-এ খবর করে তাঁদের সিমলার প্রতিনিধিকে দিয়ে সেখানকার কালীবাড়ির ইতিকথা ও মন্দিরের ছবি যদি আমাদের আনিয়ে দিতেন উপকৃত হতেম। তিনি বল্লেন আচ্ছা ব্যবস্থা করছি, কিন্তু তিনি হয়তো ভুলেই গেলেন কাজের চাপে। তাই ঠিক করা হলো এবারে অন্য মন্দিরের খবর থাক পরে যাবে সিমলা ও দিল্লী আসে আসে।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় বসে, আছি হঠাৎ গল্পভারতীর বন্ধু লেখক ভক্টর ভট্টাচার্য এসে উপস্থিত অনেকদিন পর। নানা কথা বার্তার পর তাঁর পাহাড়-দেশ ভ্রমণের গল্প শোনাতে লাগলেন। তিনি সিমলার কালিবাড়ীতে দুদিন ছিলেন ও সেখানকার কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ও ব্যবস্থাদির ভূয়সী প্রশংসা করে বল্লেন যে আসার সময় সেক্রেটারী শ্রীশান্তনু রায় তাঁর হাতে কালীবাড়ির ছবি ও ছাপান বিবরণ দিয়েছিলেন। তখন যিনি দিলেন বা যিনি নিলেন কেউ-ই জানেন না কেন দিলেন বা নিলেন। এই কথা শুনে আমরা তো আকাশ থেকে পড়লেম এবং তখনি ভক্টর ভট্টাচার্যকে বল্লেম সত্বর সব বিবরণ লিখে ছবিগুলিসহ আমাদের পাঠিয়ে দিতে। তাই বলো। ভাবলেম তাইতো মার ইচ্ছায় কী না হয়!

অন্তরীক্ষে

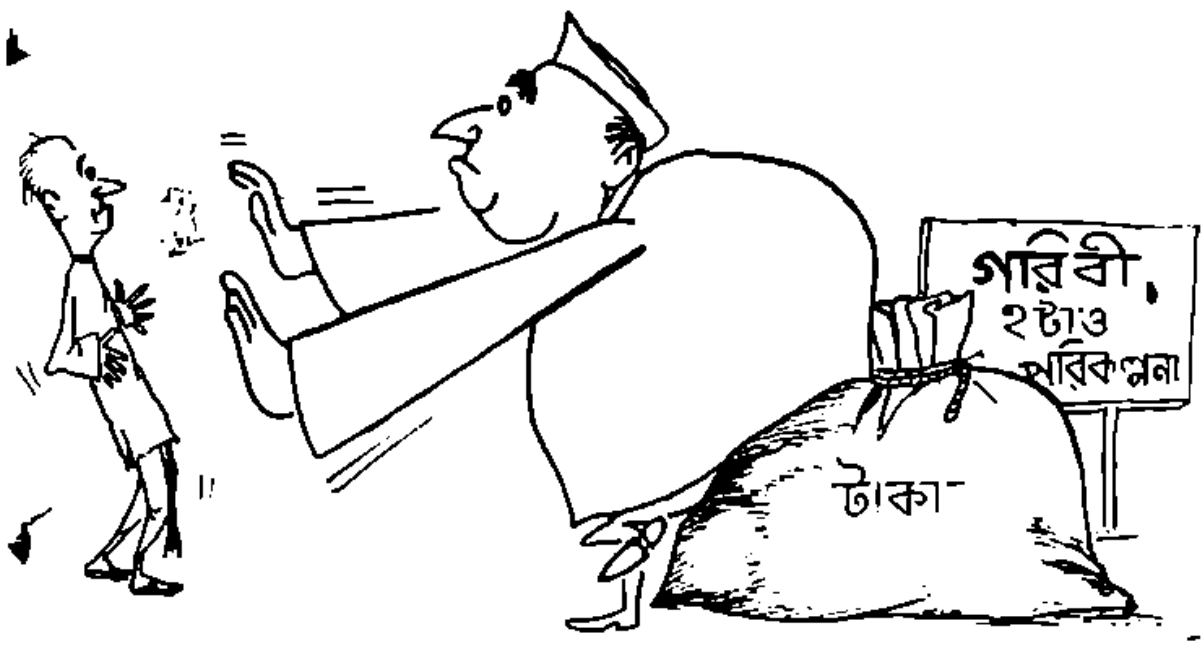

ঘটেই তো যাচ্ছি দাদা !....

এডের কল্যাণে যা অবস্থা...
এবারে নিজে বাঁচলে বাপের নাম

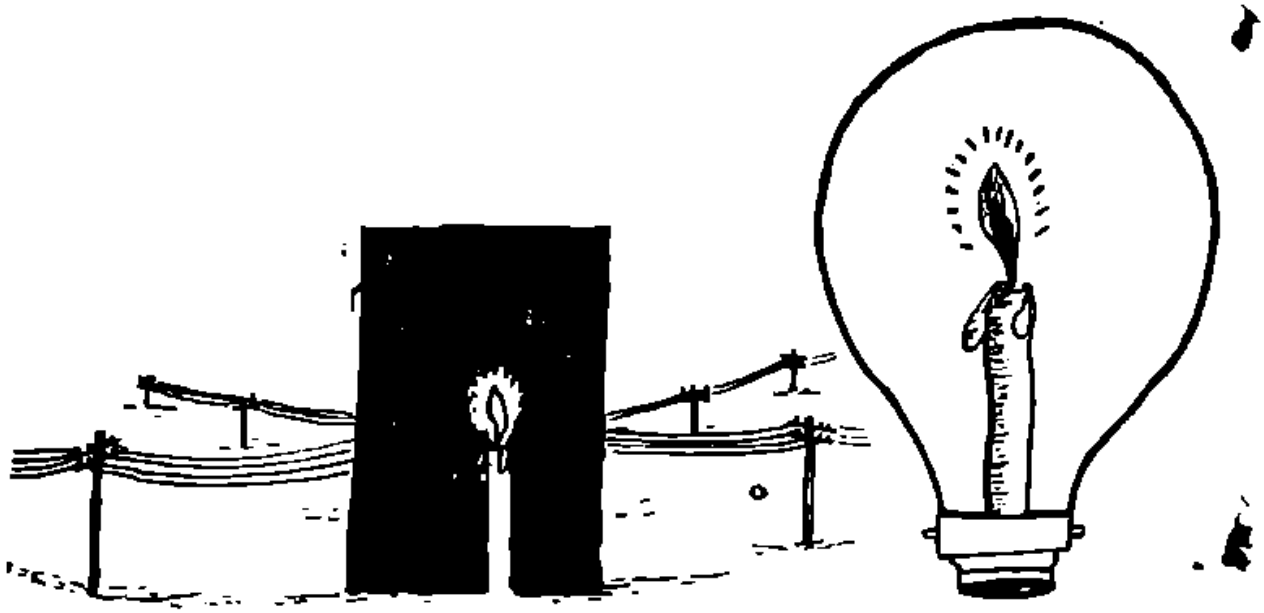

বিদ্যুৎ পর্ষদের নতুন স্লোগান ও বাল্ব !

স্মৃতি তর্পণ

অষ্ট বিংশতিবর্ষে
গল্পভারতীর নিবেদন

আজ বিশেষ করে আমাদের স্মরণ করতে হবে, গল্প আজ শুধু গল্প নয়। শুধু আষাঢ় অপরাহ্নের অলস কাহিনী নয়। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনা, সুখ-দুঃখ, অতীত ভবিষ্যৎ সমস্তই আজ গল্পকেই আশ্রয় করে আত্মপ্রকাশ করছে। আজ গল্পের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পশ্চিমকে চিনছে, পশ্চিম পূর্বকে চিনছে, দেশ বিদেশকে চিনছে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীকে চিনছে। আজকের পৃথিবী সেই নতুন গল্পের পৃথিবী। গল্পভারতী সেই নতুন গল্পের বাহন।

নতুন জগৎ, নতুন মানুষ, নতুন তার গল্প। গল্প পড়ে আছে গঙ্গার ঘাটে ঘাটে, পদ্মার তীরে তীরে, ওরাইএর জঙ্গলে জঙ্গলে, বাংলার গ্রামে গ্রামে, নোনা মাটীর ধুলোয়, রাঙা কাঁকড়ে, ঘন বনে, বিলের ধারে ধারে, বর্ষায়-ডোবা নদী নালায়। গল্প পড়ে আছে নতুন গড়ে ওঠা সহরে, ভেঙ্গে যাওয়া পুরোনো গ্রামে,—কয়লা কুঠিতে, কারখানায় কারখানায়, গৃহস্থের ঘরে ঘরে, নির্বাসিতের অশ্রুজলে, বঞ্চিতের হাহাকারে, সদ্য-জাগ্রত তন্দ্রাজড়িত চোখের লালিমায়। আজ এই ভাঙ্গা-গড়ার তাণ্ডব নর্তনে প্রত্যেক মানুষ এক একটি জীবন্ত গল্প।

সেই গল্পকে খুঁজে বার করতে হবে, ভাষায় দিতে হবে নবজীবন। গল্পভারতীর সেই আশা সেই তার আকাঙ্ক্ষা। এবং সেই জন্যেই সে আজ এই আবেদন সকলের কাছে পৌছিয়ে দিতে চায়: কোথায় কে আছ লেখনী-বীর, এস তোমার লেখনী নিয়ে প্রাণের রঙে ডুবিয়ে লেখ সেই-কাহিনী, যে-কাহিনী আজও মূক হয়ে পড়ে আছে বাংলার ধুলোয় ধুলোয়। দাও তাকে নবরূপ, নবজন্ম। গাঁথ নতুন করে নতুন ফুলের মালা। সে মালা নিজে তোমার জননী পরিয়ে দেবে মহাকালের কণ্ঠে। বাংলা ভাষা জগৎ সভায় ঘোষণা করুক বাঙালীর প্রতিভার জগজ্জয়ী মহিমা।

আপনি কোন্ পত্রিকা পড়েন ও কেন পড়েন? একদিন হয়তো এই প্রশ্নের বিশেষ কোন গুরুত্ব বা সার্থকতা ছিল না। কিন্তু আজ জগতের ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তরের উপর শুধু আপনার আমার নয় সমস্ত জাতির ভাল-মন্দ উত্থান-পতন সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে।

শুধু একা আপনার কথা নয়। আপনার বাড়ীতে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তাদের হাতে কোন্ পত্রিকা আপনি পড়তে দেন? এমন কোন একখানা পত্রিকা পেয়েছেন কি যা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় আপনার বাড়ীর সকলে পড়তে পারে এবং সকলেই সমানভাবে তা থেকে আনন্দ আর শিক্ষা পেতে পারে?

আপনি যে-পত্রিকা পড়েন বা আপনার ছেলেমেয়েদের হাতে যে-পত্রিকা ধরে দেন, ভেবে দেখেছেন কি তাতে আপনার ও তাদের মনের চাহিদা মিটছে কি না? সে কি শুধু অবসর-বিনোদনের

খেলা ? না, তা থেকে আপনি আপনার মনের তৃপ্তি, অবসরের আনন্দ, চিন্তার খোরাক, জীবন-পথের পাথেয়ের সন্ধান পান ? সে পত্রিকা কি আপনাকে এনে দেয়, আপনার জাতির, আপনার সমাজের, আপনার সাহিত্যের আধুনিকতম সংবাদ ? সে পত্রিকা কি আপনার জীবন-যাত্রার পথে এগিয়ে চলার সহায় হয় ? সে পত্রিকা কি আপনার জাতীয়-জীবনের বিভিন্ন ধারার রূপ ফুটিয়ে তোলে এবং তুলে ধরে আপনার সম্মুখে জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মহাসম্ভাবনার ইঙ্গিত ? তাই যদি না হয়, তাহলে সে-পত্রিকা পড়বার সার্থকতা কোথায় ? নিজের মনের অন্তঃপুরে এবং নিজের বাড়ীর অন্তঃপুরে যে-পত্রিকাকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশ করার অধিকার দিয়েছেন, তার সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই দাবী আছে। সে দাবী কি সে পত্রিকা মেটাতে পারছে পূর্ণমাত্রায় ? আজ পত্রিকা কেনবার সময় আপনাকে এই সব কথা নিজের মনে ভেবে দেখতে হবে। আজকে আপনাকে আমাকে নিয়ে একটা নতুন জাতি গড়ে উঠছে। আজকে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটা প্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের যাচাই করে নিতে হবে।

এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশেষ চিন্তা ও আলোচনা করে এক মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, আটাশ বছর পূর্বে বাঙালীর সমস্যাবহুল জীবনের সন্ধিক্ষণে গল্পভারতী আত্মপ্রকাশ করে। জাতির মানসিক প্রয়োজনের সবচেয়ে বিপন্ন লগ্নে গল্পভারতী জাতির নব-জাগরণের এক মহৎ আদর্শ তার প্রত্যেক গ্রন্থের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছে। জাতির উন্নয়নের কাজে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সাহিত্য। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে গল্পভারতী বর্তমান বাংলা-সাহিত্যে এক নতুন সঞ্জীবনী সুর ধ্বনিত করে তুলেছে এবং আপনার অন্তরের চাহিদা মেটাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

গল্পভারতীর পরম সৌভাগ্য যে বাংলার প্রত্যেক শ্রেণীর চিন্তানায়ক এবং প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যরথীই গল্পভারতীকে তাঁদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতির দ্বারা সমৃদ্ধ করে আসছেন এবং তাঁদের সমবেত চেষ্টার ফলেই আজ গল্পভারতী বাংলার মানস-জগতে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে নিতে পেরেছে ও সাহিত্য-জগতে এক গৌরবময় নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। এই সাহিত্য-সাধনার ব্রতে আমরা আপনার একান্ত সহযোগিতা প্রার্থনা করছি।

পত্রিকাটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বজনপ্রিয়, আরও সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক করার জন্য আমরা সর্বদাই যত্নবান এবং এই সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার অভিমত ও পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, এজেন্ট, পৃষ্ঠপোষকগণ ও অনুরাগীদের আনুকূল্যে বাংলা-মাসিক সাহিত্য পত্রিকারূপে গল্পভারতী যে আদর্শ স্থাপন করেছে, যে অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, যে অভূতপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে, আশা করি তাঁদের কাছ থেকে আগামী দিনেও আমরা সেই সহায়তা আরও অধিক পরিমাণে লাভ করবো।

গল্পভারতীর অভূতপূর্ব সাফল্য ও কৃতিত্বের মূলে বর্তমান প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দের ঐকান্তিক সহযোগিতা।

গত সাতাশ বছর ধরে যাঁরা নিয়মিতভাবে গল্পভারতীর আদর্শ, ভাবধারা ও সাহিত্যিক ঐশ্বর্যকে সমৃদ্ধ করেছেন ও করে আসছেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ও আছেন :

অনুরূপা দেবী, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী, অমলা দত্ত, অশোকনাথ শাস্ত্রী, অনিমা দেবী, অরবিন্দ পোদ্দার, অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত,

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, অমিল ভট্টাচার্য, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, আশালতা সিংহ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর কালিদাস নাগ, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষিতিমোহন সেন, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, গৌরীশংকর দে, ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য, জিতেশচন্দ্র গুহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায় (অরবিন্দ আশ্রম), দেবেশচন্দ্র দাশ, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু (শান্তিনিকেতন), নগেন্দ্র-কুমার গুহরায়, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নলিনীকান্ত সরকার (পণ্ডিচেরী), ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বামী, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন), প্রমথনাথ বিশী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, প্রভাত কিরণ বসু, প্রবোধচন্দ্র সেন (শান্তিনিকেতন), প্রবোধচন্দ্র মজুমদার, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, ডক্টর প্রিয়দারঞ্জন রায়, প্রিয়রঞ্জন সেন, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ সাক্যাল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, পশুপতি ভট্টাচার্য, প্রতিমা দেবী, প্রতিভা বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বলাইচন্দ মুখোপাধ্যায় বনফুল), বাণী রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, বিমল মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বেলা দে, ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ বসু (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা), মনোজ বসু, মতিলাল রায় (প্রবর্তক সংঘ), মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র পাল, ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী, মায়া রায়, মায়া বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামনাথ বিশ্বাস, রামপদ মুখোপাধ্যায়, রাণী চন্দ, লীলা মজুমদার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা দেবী, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সবিতা দাশগুপ্তা, সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সীতা দেবী, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুন্দরীমোহন দাস, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পণ্ডিচেরী), সুধীরচন্দ্র কর, সুষমা সেনগুপ্ত, সুবোধ বসু, সুজাতা রায়, সুমথনাথ ঘোষ, সুলেখা দাশগুপ্তা, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হাসিরাশি দেবী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, ডক্টর হিরন্ময় ঘোষাল, ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

এইসব লেখক লেখিকাদের মধ্যে কেউ কেউ আজ লোকান্তরিত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি পরভারতীর পাতায় ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের প্রতিভার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাই আজ আমাদের নববর্ষের শুভমুহূর্তে তাঁদের সকলের কথা স্মরণ করে, কয়েকজনের রচনা পরভারতীর পাতা থেকে এই সংখ্যায় প্রকাশ করে আমরা তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মৃতিতর্পণ করলেম।

'বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।'

কাশীনাথের জন্মান্তর

পরশুরাম

প্রায় দেড়শ বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতার বাঙালী হিন্দুসমাজে নানারকম পরিবর্তন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু তার কোনও লক্ষণ বাঘবপুর গ্রামে দেখা দেয় নি। কাশীনাথ সার্বভৌম সেই গ্রামের সমাজপতি, দিগ্‌গজ পণ্ডিত, যেমন তাঁর শাস্ত্রজ্ঞান তেমনি বিষয়বুদ্ধি। তাঁর সন্তানরা কলকাতা হুগলী বর্ধমান কৃষ্ণনগর মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে, কিন্তু তিনি নিজে তাঁর গ্রামেই থাকেন, জমিদারী দেখেন, তেজারতি আর দেব-সেবা করেন, একটি চতুষ্পাঠীরও ব্যয় নির্বাহ করেন।

একদিন শেষরাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী কাশীমাতা আবির্ভূত হয়ে বলছেন, বৎস কাশীনাথ, তোমার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করেছে, তুমি সুদীর্ঘকাল ইহলোকের সুখদুঃখ ভোগ করেছ আর কেন, এখন দেহরক্ষা কর।

কাশীনাথ বললেন, মা কৈবল্যদায়িনী, এখন তো মরতে পারবো না। আমার ভরাভরন্ত সংসার, চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন। আঠারোটি পুত্র-কন্যা, একশ পাঁচটি পৌত্র-পৌত্রী, কৌতির-দৌহিত্রী। প্রপৌত্র-প্রদৌহিত্র প্রভৃতি বোধহয় ছ'সাত শতাধিক জন্মেছিল, তাদের অনেকে মরেছে কিন্তু এখনও প্রচুর জীবিত আছে। তাছাড়া বিস্তর শিষ্য আমার চতুষ্পাঠীতে পড়ে, আমি তাদের পালন ও অধ্যাপনা করি। এইসব দেহত্যাজনদের ত্যাগ করা অতীব কষ্টকর। তোমার জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্মাণের সংকল্প করেছি, তাও উদ্‌যাপন করতে হবে। আমার ছেলেদের দিয়ে কিছু হবে না, তারা স্বার্থপর, নিজের ধান্দা নিয়েই ব্যস্ত। বয়স বেশী হলেও আমার শরীর এখনও শক্ত আছে। অতএব কৃপা করে আরও দশটি বৎসর আমাকে বাঁচতে দাও।

কাশীমাতা ভ্রূকুটি করে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে কাশীনাথ সার্বভৌমের চতুর্থ পক্ষের পত্নী রাসেশ্বরী বললেন, আজ যে তোমার তিনটি প্রপৌত্র পুত্র আর পাঁচটি প্রদৌহিত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন, তার হুঁশ আছে? তুমি চট করে স্নান-আহ্নিক সেরে এস, তোমাকেই তো হোমযাগ করতে হবে।

গঙ্গায় স্নান করে এসে কাশীনাথ বললেন, সর্বনাশ হয়েছে গিন্নী, কালসর্প আমাকে দংশন করেছে, আমার মৃত্যু আসন্ন। মা করালবদনী, এ কি করলে, হায় হায়, সাঙ্কল্পিত কর্ম সমাপ্ত না হতেই আমাকে পরলোকে পাঠাচ্ছ?

শাস্ত্রে বলে, যার যেমন ভাবনা তার তেমনি সিদ্ধিলাভ হয়। কাশীনাথ যদি খ্রীরামপুরের পাদরীদের কবলে পড়ে খ্রীষ্টান হতেন তবে মৃত্যুর পর শেষ বিচারের প্রতীক্ষায় তাঁকে সুদীর্ঘকাল জড়ীভূত হয়ে থাকতে হত, নরীসপাদি যেমন শীতকালে থাকে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে তিনি অতি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, সেজন্য তাঁর পারলৌকিক পরিণাম অবিলম্বে সংঘটিত হল।

মৃত্যুর পরেই কাশীনাথ উপলব্ধি করলেন, তিনি সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে শূন্যে অবস্থান করছেন, তাঁর প্রাণহীন দেহ অঙ্গনে তুলসীমঞ্চের সম্মুখে পড়ে আছে। তাঁর পত্নী আর আত্মীয়বর্গ চারিদিকে বিলাপ করছেন, প্রতিবেশীরা বলছেন, ওঃ, একটা ইন্দ্রপাত হল! অল্পকাল পরেই তিনি প্রচণ্ড বেগে ব্যোমমার্গে দক্ষিণ দিকে বাহিত হয়ে যমলোকে উপনীত হলেন।

যম বললেন, এস হে কাশীনাথ! তোমার সুকৃতি-দুষ্কৃতির বিচার এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, সংক্ষেপে বলছি শোন। পুণ্যকর্মের তুলনায় তোমার পাপকর্ম অল্প। রামপতি ভট্টাচার্যের জমির কিয়দংশ তুমি

অন্যায়ভাবে দখল করেছিলে, তিনবার আদালতে মিথ্যা হলফ করেছিলে, প্রথম ও মধ্যবয়সে বন্ধুপত্নী ও বন্ধুকন্যার কয়েক জনের প্রতি কুদৃষ্টিপাত করেছিলে, অন্তিমকাল পর্যন্ত বিষয় চিন্তায় মগ্ন ছিলে, ঘৃষিকের ন্যায় অজস্র সন্তান উৎপাদন করেছিলে। এ ছাড়া আর যা করেছ সবই সৎকার্য। নিয়মিত দুর্গোৎসবাদি করেছ, গঙ্গাস্নান তীর্থ-ভ্রমণ ব্রতব্রতাদি এবং ব্রাহ্মণের যাবতীয় কর্তব্য পালন করেছ, কদাপি অখাদ্য ভোজন কর নি। দুষ্কৃতির জন্য তুমি পঞ্চাশ বৎসর নরকবাস করবে, তারপর পুণ্যকর্মের ফলস্বরূপ এক শত বৎসর স্বর্গবাস করবে। যাও, এখন যাও কর্মফল ভোগ কর গিয়ে।

নির্দিষ্ট কাল নরকভোগ আর স্বর্গভোগের অন্তে কাশীনাথ পুনর্বার যমসকাশে আনীত হলেন। যম বললেন, ওহে কাশীনাথ, তোমার প্রাক্তন কর্মের ফলভোগ সমাপ্ত হয়েছে, এখন তোমাকে পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে। বিধাতা তোমার উপর প্রসন্ন, তুমি অভীষ্টকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারবে। বল, কি প্রকার জন্ম চাও, ধনী বণিকের বংশধর হয়ে, না ক্ষত্রিয় ভূমী ধর্মরাজ পুত্ররূপে, না শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে?

কাশীনাথ উত্তর দিলেন, ধর্মরাজ, মৃত্যুকালে আমার অনেক বাসনা ছিল। দয়াকরে এই ব্যবস্থা করুন যাতে আমার বর্তমান বংশধরের গৃহেই প্রত্যাবর্তন করতে পারি। আমার প্রপৌত্রের পুত্র শ্রীমান ভবানীচরণ আমার অতিশয় স্নেহভাজন ছিল, তারই সন্তান করে আমাকে ধরায় পাঠান।

যম বললেন, বলছ কি হে কাশীনাথ! জীবিতকালেই তুমি অধস্তন পাঁচপুরুষ পর্যন্ত দেখেছিলে। তোমার মৃত্যুর পর বেড়াল বৎসর কেটে গেছে, তাতে আরও দু' পুরুষ হয়েছে, এখন যে বংশধর সে তোমার সপিণ্ডও নয়, তার সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্পর্ক? তার পুত্র হয়ে জন্মালে তোমার কি লাভ হবে? আরও তো ভালভাল বংশ আছে।

কাশীনাথ বললেন, প্রভু, দয়াকরে সেই অধস্তন একাদশ সংখ্যক বংশধরের গৃহেই আমাকে পাঠিয়ে দিন। ব্যবধান যতই থাকুক, সে আমার তথা শ্রীমান ভবানীচরণের সন্তান, অতীব স্নেহের পাত্র। তাকে দেখবার জন্য আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে আছি।

—তুমি তাকে চিনবে কি করে? তোমার বর্তমান স্মৃতি তো থাকবে না, জ্ঞানহীন ক্ষুদ্র শিশুরূপে প্রসূত হয়ে তুমি ক্রমে ক্রমে বড় হবে, জ্ঞানার্জনও করবে, কিন্তু বিগতকালের সঙ্গে তোমার নবজীবনের যোগ থাকবে না।

—প্রভু, আমার প্রার্থনাটি অবধান করুন। নারী-গর্ভে ন' মাস দশ দিন বাস করার পর শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে আমি চাই না। জ্ঞানবান জাতিস্মর করেই আমাকে পাঠিয়ে দিন।

—মরবার সময় তোমার বয়স একশ বৎসরের কিছু অধিক হয়েছিল। সেই বয়স নিয়েই জন্মাতে চাও নাকি?

—আজ্ঞে না। ভবসাগর তীর্ণ হবার পর যদি পৃথিবীতে যাই তবে নবজন্ম কঠিন ভোগ করব। আমাকে পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের যুবা করে পাঠিয়ে দিন।

—তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি অদ্ভুত। গর্ভবাস করবে না, যুবা রূপে নবজন্ম লাভ করবে, পূর্বস্মৃতি বিদ্যমান থাকবে, বর্তমান বংশধরের গৃহে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হবে। —এই তো তুমি চাও?

—আজ্ঞে হাঁ।

—আচ্ছা তাই হবে। দেখাই যাক না এর ফল কি হয়! তোমার গোত্র কি?

—ভরদ্বাজ।

যমরাজ মুহূর্তকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ধরাধামে অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে। তুমি যদি স্বাভাবিক নিয়মে শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হতে তবে ক্রমে ক্রমে বর্তমান অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যেতে। কিন্তু অদৃষ্টপূর্ব সমাজে হঠাৎ অবতরণের ফলে সংকটে পড়বে। তোমার অসুবিধা যাতে অত্যধিক না হয় তার জন্য আমি যথাসম্ভব ব্যবস্থা করছি।

যম তাঁর এক অনুচরকে বললেন, আজ দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এই জীবাত্মা তিন বৎসরের যুবা রূপে ধরাধামে

কিয়ে যাবে। একে পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক ভাষা ছোটো-মুটি শিখিয়ে দাও, সেই সঙ্গে কিছু অপভ্রষ্ট ইংরেজী ও হিন্দীও। বর্তমান কালের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তু এবং প্রচুর অর্থও একে দেবে। একটি নিক্তান্তি বটিকাও দেবে। তারপর কলিকাতা নগরীতে নিয়ে গিয়ে শ্রীমধুসূদন রোডে তিন নম্বর বাড়ির ফটকের সামনে একে সুপ্ত অবস্থায় রেখে দেবে। ওহে কাশীনাথ, তোমার বংশধর চক্রধর মুখুজ্যের কাছে তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার পূর্বনামই বজায় থাকবে। যদি দেখ যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তোমার পক্ষে কষ্টকর, কিছুতেই তুমি সইতে পারছনা, তবে নিক্তান্তি বটিকাটি খেয়ো। তাহলে তৎক্ষণাৎ যমলোকে ফিরে আসবে এবং অবিলম্বে পুনর্বার সনাতন রীতিতে জন্মগ্রহণ করবে

চক্রধর মুখুজ্যে ধনীলোক, বাস্তুবিবর্ধন করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, তিন নম্বর শ্রীমধুসূদন রোডে তাঁর প্রকাণ্ড বাড়ি। সকলকে সাড়ে সাতটার আগে তিনি বিছানা ছেড়ে ওঠেন না, কিন্তু আজ ভোর বেলায় তাঁর স্ত্রী সুরূপা ঠেলা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। চক্রধর জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?

—নীচে গোলমাল হচ্ছে শুনতে পাচ্ছ না ? বারান্দায় দাড়িয়ে খোঁজ নাও কি হয়েছে। আমার বাপু ভয় করছে।

চক্রধর বারান্দা থেকে দেখলেন গেটের সামনে অনেক লোক জমা হয়ে কলরব করছে। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে দালবাহাদুর ?

দারোয়ান দালবাহাদুর বলল, কে একজন বাবু ফটকের সামনে রাস্তার ওপর শুয়ে আছে, বেঁচে আছে না মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না।

নেমে এসে চক্রধর দেখলেন, তাঁর বাড়ির ফটকের ঠিক বাইরে একটা চামড়ার ব্যাগ মাথায় দিয়ে আগন্তুক বিবস্ত্র হয়ে শুয়ে আছে। বারকতক জোরে ঠেলা দিতেই লোকটি মিট মিট করে তাকাল, তার পর আস্তে আস্তে উঠে হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, তার ব্রহ্মময়ী করালবদনী, কোথায় আনলে ম

চক্রধর বললেন, কে হে তুমি ? এখন নেশা ছুটেছে ? কি খেয়েছিলে, মদ না গঞ্জ ?

—আমি শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়, আবার এসে পৌঁছেছি। তুমিই চক্রধর ? শ্রীমান ভবানীচরণের বংশধর ? আহা, কত বড়টি হয়েছ ! ঘরে চল বাবাজী, সব কথা বলছি।

কাশীনাথের আজগুবি কথা শুনে চক্রধর স্থির করলেন, লোকটা নেশাখোর নয়, মিথ্যেবাদী জুয়োচোরও নয়, কিন্তু এর মাথা খারাপ। প্রশ্ন করলেন, তোমার ওই ব্যাগে কি আছে ?

—তা তো জানিনা। তুমিই খুলে দেখ। এই যে, আমার পইতেতে চাবি বাঁধা রয়েছে, খুলে নাও।

চক্রধর ব্যাগ খুললেন। গোটাকতক ধুতি পেন্টি পাঞ্জাবি, একটা এন্ডির চাদর, একজোড়া চটি, একটা গামছা, আরশি চিরুনি ইত্যাদি। নীচে একটা পোর্টফোলিও। সেটা খুলে চক্রধর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, প্রায় পাঁচশো টাকার গভর্নমেন্ট কাগজ এবং ভাল ভাল শেয়ার, নগদ দুহাজার টাকার নোট আর দশটাকার আধুলি সিকি ইত্যাদি।

—সব তোমারই নামে দেখছি। কি করে পেলে ?

কিছুই জানি না বাবাজী, সবই ভগবানের লীলা আর যমরাজের ব্যবস্থা।

চক্রধর অনেকক্ষণ ভাবলেন। লোকটা পাগল হলেও গুছিয়ে কথা বলে। একে হাতছাড়া করা চলবে না, বাড়িতেই রাখতে হবে, চিকিৎসাও করাতে হবে। বয়েস তো বেশী নয়, বড় জোর ত্রিশ। তার একমাত্র মেয়ের বিবাহ হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর ভাইঝি চন্দনা তো রয়েছে। এই কাশীনাথের সঙ্গে বিয়ে দিলে সেই বাপ-মা-মরা মেয়েটার চমৎকার একটা গতি হয়ে যায়। পাঁচ লাখ টাকাটা ইনভেস্টমেন্ট কি সোজা কথা ! লোকটা যদি তিন বৎসর আগে আসত তা হলে চক্রধর নিজের মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে দিতেন।

চক্রধর বললেন, শোন হে কাশীনাথ ! তুমি আমার পূর্বপুরুষ হলেও আয়তনে আমার চাইতে ছোট, তোমার

বয়স বোধ হয় ত্রিশ হবে, আর আমার হল গিয়ে ষাট তোমার ইতিহাস আমি জানলুম, কিন্তু আর কাকেও ব'লোনা, লোকে তোমাকে পাগল ভাববে। তুমি আমার জ্ঞাতি, ছেলেবেলায় তোমাদের পাড়াগাঁ থেকে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে পালিয়েছিলে, এখন সন্ন্যাসে অরুচি হওয়ায় আমার আশ্রয়ে এসেছ—এই তোমার পরিচয়। তুমি আমাকে বলবে কাকাবাবু, আমি তোমাকে বলব কাশী বাবাজী। তোমার সম্পত্তির কথা খবরদার কাকেও বলবে না। বুঝলে?

কাশীনাথ বললেন, হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু আমি তোমার বাড়িতে থাকব কি করে? তুমি তো দেখছি ম্লেচ্ছ হয়ে গেছ। পৈতেটেতে গঙ্গ পাচ্ছি, পায়ের জুতিতে মুরগি চরছে। একটি প্রৌঢ়াকে দেখলাম চটি জুতো প'রে চটাং চটাং করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল, ঘোমটা নেই, প্যাট প্যাট করে আমার দিকে চাইল।

—উনি তোমার কাকীমা।

—ও, তা বেশ। কিন্তু স্ত্রীলোক জুতো পরে কেন? ঘোর কলি।

—ঠিক বলেছ বাবাজী, ঘোর কলি। এই কলিযুগের সঙ্গেই তোমাকে বনিয়ে চলতে হবে

—তুমি বোধহয় মুসলমান বাবুর্চীর রান্না খাও? তা আমি মরে গেলেও খেতে পারব না।

—না না, বাবুর্চী আছে বটে, কিন্তু মুসলমান নয়, হরিজন। জাতে চামার

—রাধামাধব! আমি স্বপাক খাব, আজ শুধু ফলার। আমার থাকবার আলাদা ব্যবস্থা করে দাও।

—বেশ তো, আমার বাড়ির নীচের তলায় পূবদিকের অংশে থাকবে, একেবারে আলাদা আর নিরিবিলি।

চক্রধর ডাকলেন, চন্দনা, ও চন্দনা।

একটি মেয়ে ঘরে এল। চক্রধর বললেন, এটি আমার ভাইঝি। প্রণাম কর রে, উনি তোর কাশীদাদা, ঘুর সম্পর্কে আমার ভাইপো। চন্দনা প্রণাম করে চলে গেল।

কাশীনাথ বললেন, তোমাদের কাণ্ড কিছুই বুঝতে পারছিনা। এত বড় বাড়ী মেয়ের মাথায় সিঁদুর নেই কেন? কপাল পুড়েছে নাকি?

—আরে না না, ওর বিয়েই হয় নি। খুব ভাল মেয়ে, বি, এ, পাশ করেছে।

—দুর্গা দুর্গা! বিবি বানাচ্ছ দেখছি!

—আচ্ছা কাশীনাথ, তোমার বিবাহের মতলব আছে তো?

—আছে বইকি। একজন ভাল ঘটক লাগাও।

—আমার ভাইঝি ওই চন্দনাকে বিয়ে করবে?

—তুমি উন্মাদ হলে নাকি হে চক্রধর? এক গোয়ে বিয়ে হবে কি করে? তা ছাড়া ওরকম বেয়াড়া স্ত্রী আমার পোষাবে না। সংবংশের নিষ্ঠাবতী লজ্জাবতী মেয়ে চাই। বিস্তর চাকর দরকার নেই, রান্না আর ঘরকন্নার সব কাজ জানবে, ব্রতনিয়ম পালন করবে, তোমার গিন্নী আর ভাইঝির মতন ধিঙ্গী হলে চলবে না

—মুশকিলে ফেললে কাশীনাথ। তুমি যে রকম পাত্রী চাও তেমন মেয়ে ভদ্রঘরে আজকাল লোপ পেয়েছে। আচ্ছা, যতটা সম্ভব তোমার পছন্দসই পাত্রীর জন্যে আমি চেষ্টা করব এখন তুমি স্নান আর সন্ধ্যা আহ্নিক সেরে আহারাদি কর গিয়ে

চক্রধর মুখুজ্যে ভাবতে লাগলেন। লোকটা পাগল, কিন্তু কথাবার্তা অসংলগ্ন নয়, সেকেলে মতিগতি হলেও বুদ্ধিমান বলা চলে আশ্চর্য ব্যাপার, কাশীনাথ অতটাকা পেল কোথা থেকে? যাই হ'ক, একে আটকে রাখতে হবে, সম্পত্তি যাতে আমার কাছেই গচ্ছিত রাখে তার ব্যবস্থা করতে হবে। চন্দনার সঙ্গে বিয়ে হলে খাসা হ'ত, একেবারে আমার মুঠোর মধ্যে এসে যেতো। ওর পছন্দ মত পাত্রীই বা পাই কোথায়? সেকেলে নিষ্ঠাবতী মেয়ে হবে, পাগল স্বামীকে সামলাবে, আবার আমার বশে চলবে। হঠাৎ চক্রধরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। আচ্ছা পরেশবাবুর সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না? তারই তো খুব নিষ্ঠা আর আচার বিচার, বুদ্ধিও খুব, আমাকেও খাতির করে, সব বিষয়ে আমার মত নেয়। টাকার

লোভে কাশীনাথকে বিয়ে করতে হয়তো রাজী হবে। কিন্তু বয়সের তফাতটা যে বড্ড বেশী।

গয়েশ্বরী সম্পর্কে চক্রধরের ভাগনী, জেঠতুতো বোনের মেয়ে। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হলেও এখনও তিনি কুমারী। বাপ-মা অল্প বয়সে মারা গেলে চক্রধরই অভিভাবক হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে ভাগনীর তত্ত্বাবধান বেশী দিন করতে হয় নি। গয়েশ্বরী অসাধারণ মহিলা, অল্প লেখা-পড়া আর নানা রকম শিল্পকর্ম শিখেই তিনি স্বাবলম্বিনী হলেন। তাঁর নারীবস্ত্রশালা খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ-জন উদ্‌বাস্তু মেয়ে আর দুজন দরজী গয়েশ্বরীর দোকানে কাজ করে, তিনটে সেলাই-এর কল চলে, খদ্দেরের খুব ভিড়। চক্রধর অনেকবার ভাগনীর বিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু গয়েশ্বরী বলেছেন, ওসব হবে না, আমি কত কষ্ট করে ব্যবসাটি খাড়া করেছি, আর এখন একটা উটকো লোক এসে কর্তামি করবে তা আমি সইব না। চক্রধর স্থির করলেন, খুব সাবধানে কথাটা পাড়তে হবে।

দৈবক্রমে চার দিন পরেই কাশীনাথ আর গয়েশ্বরীর একটা সংঘর্ষ হয়ে গেল।

চক্রধরের বাড়ির একতলার পূর্বদিকের অংশে কাশীনাথ স্বতন্ত্রভাবে বাস করতে লাগলেন। তিনি রাঁধেন খান, চক্রধরের একজন পুরনো চাকর তাঁর ফরমাশ খাটে। একদিন সকালবেলা প্রাতঃকৃত্য সেরে কাশীনাথ গড়িয়াহাট মার্কেটে বাজার করতে গেছেন। জামাইষষ্ঠীর জন্যে সেদিন বাজারে খুব ভিড়। কাশীনাথ অত্যন্ত বিরক্ত মনে ভাবছিলেন, এ যে ঘোর কলি, বারো আনা সের বেগুন! সব জিনিসই অগ্নিমূল্য, দেশে রাজত্ব হয়েছে রাক্ষসি? কাশীনাথ দুটি কাঁচকলা কিনবেন বলে ভিড়ের মধ্যে সাবধানে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় অকস্মাৎ ধপাস করে গয়েশ্বরীর সঙ্গে তাঁর কলিশন হল।

কাশীনাথের অপরাধ নেই। তিনি রোগা বেঁটে মানুষ, ভিড়ের ঠেলা সামলাতে না পেরে সামনের দিকে পড়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গয়েশ্বরী উল্টো দিক থেকে আসছিলেন। তিনি স্থূলকায়া সুতরাং তাঁর দেহের পতনোন্মুখ কাশীনাথের ধাক্কা প্রতিহত হল। গয়েশ্বরী পড়ে গেলেন না, অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, আ মর ছোঁড়া, নেশা করেছিস্ নাকি? ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে চলে পড়িস্ এতদূর আস্পর্ধা!

কাশীনাথ বললেন, ক্ষমা করবেন ঠাকরুন, ভিড়ের চাপে এমন হ'ল, আমি ইচ্ছা করে অপরাধ করিনি।

গয়েশ্বরী বললেন, একশ'বার অপরাধ করেছিস্ হতভাগা বেহায়া বজ্জাত!

একদল লোক গয়েশ্বরীর পক্ষ নিয়ে এবং আর একদল কাশীনাথের হয়ে তুমুল ঝগড়া করল। গয়েশ্বরীকে অনেকেই চেনে। একজন টিকিধারী পুরুত ঠাকুর বললেন, ও গয়াদিদি, ব্যাপারটি তো সোজা নয়, তোমাকে প্রায়শ্চিত্তির করতে হবে।

চার-পাঁচজন চিৎকার করে বলতে লাগল, নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি লোকটি কে হে? পাড়াগাঁ থেকে এসেছ বুঝি? ধাক্কা লাগাবার আর মানুষ পেলে না, গয়া-ঠাকরুনের গায়ে চলে পড়তে কোন আক্কেলে? এক্ষুণি বার কর পঞ্চাশটি টাকা, প্রায়শ্চিত্তিরের খরচ, নইলে তোমার নিস্তার নেই।

ওই সময় চক্রধরের একজন চাকর এসে পড়ায় কাশীনাথ বেঁচে গেলেন। পুরুত ঠাকুরটি বললেন, তা বেশ তো, গয়াদিদি আর এই ছোকরা দুজনেই যখন চক্রধরবাবুর লোক তখন তিনিই এর মীমাংসা করবেন।

চক্রধর মুখুজ্যে যোগেন যে তপ্ত অবস্থায় ঘা দিলেই লোহার সঙ্গে লোহা জুড়ে যায়। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রথমে তাঁর ভাগনীকে প্রস্তাবটি জানালেন। গয়েশ্বরী আশ্চর্য হয়ে বললেন, দাদা, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? চক্রধর সবিস্তারে জানালেন, লোকটা বাতিকগ্রস্ত হলেও ভালমানুষ, সহজেই শোধ মানবে, আর তার টাকাও বিস্তর আছে। বয়স কম তাতে হয়েছে কি? আজকাল ওসব কেউ ধরে না। গয়েশ্বরী অতি বুদ্ধিমতী মহিলা, দাদার প্রস্তাবটি সহজেই তার হৃদয়ঙ্গম হল। অবিলম্বে বললেন, তা ও ছোঁড়া যদি

বাজী হয় তো আমার আর আপত্তি কি, লোকে কি বলবে তা আমি গ্রাহ্য করি না।

কাশীনাথ অত সহজে রাগ মানলেন না। বললেন, কি পাগলের মতন বলছ চক্রধরকাকা। গয়েশ্বরীর বয়েস তো আমার প্রায় ডবল। সেকালে কুলীন কন্যার অমন বিয়ে হত বটে, কিন্তু আমি তো সেকালের পাণি-গ্রাহী নই।

চক্রধর বললেন, বেশ করে সব দিক ভেবে দেখ কাশী বাবাজী। মেয়েটি অতি নিষ্ঠাবতী, সব রকম ব্রতব্রত পালন করে। ওরফীর দোকান চালায় বটে, কিন্তু ওর চালচলন তোমারই মতন সেকেলে। দোকানটা তোমারই হাতে আসবে, তোমার আয় বেড়ে যাবে।

—কিন্তু বয়েসের যে আকাশ পাতাল-তফাত।

—খুব ঠিক কথা। তোমার ইতিহাস যা বলেছ তাতে তোমার আসল বয়েস এখন দুশ'পঞ্চাশের বেশী, আর গয়েশ্বরীর সবে উনপঞ্চাশ। তোমার তুলনায় ও তো খুকি। আরও বুঝে দেখ, তোমার শরীরটাই জোয়ান, কিন্তু মনটা তো দু'শো বছর পিছিয়ে আছে। গয়েশ্বরীর সঙ্গে তোমার মিল সহজেই হবে। আরও একটা কথা, আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, মেয়েদের পূর্ণ যৌবন হয় পঞ্চাশের পরে। মর্ডার্ন কলা খেয়েছ তো? পাকলেই সুস্বাদু হয় না। যার খোসাটি কালচিটে হয়ে ঢুঁচকে গেছে, শাঁসটি মজে গিয়ে একটু নরম হয়েছে, সেই পরিপক্ক কলাই উৎকৃষ্ট। মেয়েরাও সেই রকম। এখনকার পঞ্চাশীর কাছে তোমাদের সেকেলে ষোড়শী-টোড়শী লাগেনা।

চক্রধরের যুক্তি শুনে কাশীনাথ ধীরে ধীরে বশে এলেন। একটু চিন্তা করে বললেন, আমি যখন যারা গিয়েছিলাম তখন আমার চতুর্থ পক্ষের স্ত্রী রাসেশ্বরীর বয়স ছিল তোমার ভাগনী গয়েশ্বরীই মতন। এখন মনে হচ্ছে রাসেশ্বরীই গয়েশ্বরী হয়ে ফিরে এসেছে। আচ্ছা তুমি ঘটক লাগাতে পার?

—আমিই তো ঘটক। গয়েশ্বরীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে রাজী আছে। এখন পাকা দেখাটা হয়ে গেলে বিয়ে হতে পারবে। আজ বিকেল বেলা তুমি তার বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে আলাপ ক'রো।

—তোমারও উপস্থিত থাকা চাই চক্রধর কাকা।

—না না, তা দস্তুর নয়, শুধু তোমরা দুজনে আলাপ করবে।

কাশীনাথকে দেখেই গয়েশ্বরী একটু হেসে বললেন, কি হে ছোকরা আমাকে মনে ধরবে তো?

কাশীনাথ নীচে উপরে নীচে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

—তোমার কি পাঁচশো টাকা আছে? শোন কথা, বিয়ে চুকে গেলেই সব টাকা আমার হাতে দেবে। তুমি যে রকম ভোলা খ্যাপা মানুষ, তোমার হাতে টাকা থাকলে গেছি আর কি। লোকে সব ঠকিয়ে নেবে, আমার মামাবাবুকেও বিশ্বাস করি না।

কাশীনাথ বললেন, ভয় নেই গয়েশ্বরী ঠাকরুন, আমাকে ঠকাতে পারে এমন মানুষ দুভারতে নেই। যা মতলব করেছি বলি শোন। মেয়েছেলের দোকানদারী ভাল নয়, বিয়ের পর তোমার দোকানটা বেচে দেব। তার টাকা আর আমার যা আছে নিয়ে তেজারতি করব। তোমাকে এক গা গহনা গড়িয়ে দেব। এই কলকাতা হচ্ছে দানবের শহর, ভয়ংকর জায়গা, আমরা রাঘবপুর গ্রামে গিয়ে বাস করব। বাড়ি বাগান পুকুর গোয়াল সব হবে, একটি দেব মন্দির আর চতুষ্পাঠীও হবে।

গয়েশ্বরী হাত নেড়ে ঝঙ্কার করে বললেন, আ মরি মরি, কি মতলবই ঠাউরেছ ঠাকুর মশাই! পাগল কি আর গাছে ফলে; তুমি একটি আস্ত উন্মাদ পাগল। শোন হে ছোকরা, স্ত্রী হলেও আমি তোমার চাইতে বয়েসে বড়, গুরুজন তুল্যি, আমার হেপাজতে তুমি থাকবে, আমার বশেই তোমাকে চলতে হবে।

কাশীনাথ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন, তারপর 'তারা ব্রহ্মময়ী রক্ষা কর মা' বলেই চলে গেলেন।

সন্ধ্যাহ্নিকের পর কাশীনাথ ইষ্টদেবীকে নিজের অবস্থা নিবেদন করলেন।—এ কি বিপদে ফেললে মা? তোমারই

বা দোষ কি, নিজের কুবুদ্ধিরই ফলভোগ করছি। পৃথিবীতে কলি যে এত প্রবল হয়েছে তা তো ভাবতে পারিনি। ব্রাহ্মণের বাড়ি বাবুর্চী রাঁধছে, মুরগী চরছে, বুড়ী মাগীরা জুতো পরে খটমটিয়ে চলছে, বাড়ী মেয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে। ছোটলোকের আস্পর্ধা বেড়ে গেছে, ব্রাহ্মণকে গ্রাহ্য করে না, সামনেই বিড়ি খায়। এখানে জাত ধর্ম কিছুই রক্ষা পাবে না। ওই গয়েশ্বরী একটা ভয়ংকরী খাণ্ডার মাগী, ওকে বিয়ে করলে আমার নরক ভোগের আর বাকী থাকবে না। চক্রধর একটা পাদও চূলোয়ার, আমার বংশধর হতেই পারে না, হয়তো নিশ্চয় ভুলক্রমে ওর কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন কালী কৈবল্যদায়িনী, উপায় বাতলাও মা।

শেষ রাত্রে কাশীনাথ স্বপ্ন দেখলেন, তাঁর ইষ্টদেবী আবির্ভূত হয়ে [illegible] বলছেন, ওরে মূঢ় কাশীনাথ

তখনই কাশীনাথের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বুঝলেন, এই পাপ সংসারে ফিরে আসা তাঁর মস্ত বোকামি হয়েছে। মন স্থির করে কাশীনাথ তখনই যমদত্ত সেই নিদ্রাক্তি বটিকাটি গিলে ফেললেন এবং অচিরে পরলোকে প্রয়াণ করলেন।

সকালবেলা কাশীনাথকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বললেন, ধ্রুবোসিস। এত কম বয়সে বড় একটা দেখা যায় না। তবে পাগলদের এরকম হয়ে থাকে

চক্রধর ধুধুলো তখনই কাশীনাথের মাইতি থেকে চাবি খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাগানটা পরখ করতে গেলেন, কিন্তু খুঁজে পেলেন না নিশ্চয় গয়েশ্বরী ভোগা দিয়ে সেটা হাতিয়েছে এই ভেবে তিনি তখনই বাড়ি ছুটলেন। দুজনে তুমুল ঝগড়া হল, কিন্তু কাজ পাওয়া গেল না। কাশীনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যমদত্ত সম্পত্তি যম-সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়েছে

গণেশ উল্টানো

গণেশ সিদ্ধিদাতা দেবতা ; সেজন্য হিন্দু ব্যবসায়ীর কার্য পরিচালনার স্থানে (দোকান, গদি, অফিস ইত্যাদি) গণেশের মূর্তি স্থাপিত হয় ব্যবসায়ে লোকসান হইয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সিদ্ধিদাতা গণেশ বিমুখ হইয়াছেন এবং কল্পনা করা হয় যে দেবতা মুখ ঘুরাইয়া অর্থাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিয়াছেন।

ব্যঙ্গে ইঙ্গিত করা যে ব্যবসায়ী তাহার ভাগ্য বিপর্যয় জ্ঞাপনার্থে নিজেই গণেশের মূর্তি উল্টাইয়া রাখে। ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার তুলিয়া দেওয়া দেউলিয়া হওয়া। ফেল হওয়া।

"……ব্যবসায় ঢুকে পড়লাম। তিন মাস পরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। জেঠামশাই দু হাজার টাকা পর্যন্ত লোকসান বরদাস্ত করে বললেন, নাও ঢের হয়েছে, এবার গণেশের মুখটি ফিরিয়ে দাও"।

—বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের—যাদুর কথামালা

জাতিস্মর

ভাস্কর

সেদিন একটু বেশি রাত্রে ফিরিয়াছিলাম। রাত্রে একটু সকাল সকাল শুইয়া পড়িয়াছি। ভদ্র আসিয়াছে। শুনিতে পাইলাম, রেডিওতে বলিতেছে, নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণা, একটি চার বছরের ছেলে, সাট ও হাফ-প্যান্ট পরা, রং ফর্সা, কপাল উঁচু, নাক টিকোলো, মুখ লম্বাটে, ইত্যাদি। শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

একটু সকালেই ঘুম ভাঙিল। মুখ হাত ধুইয়া মুকিয়া ষ্ট্রীট ধরিয়া খানিকটা পায়চারি করিতে করিতে ঘরে ফিরিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ির সম্মুখে আসিতেই অবাক্ হইয়া গেলাম। একটি ছোট ছেলে বিদ্যাসাগর-বাটীর দিকে সোজা চাহিয়া আছে। ছেলেটির আকৃতি ও পরিধেয় পূর্ব রাত্রির রেডিওর ঘোষণার সহিত অবিকল মিলিয়া যাইতেছে। বিস্মিত হইয়া ধীরে ধীরে ছেলেটির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া একটু ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। ছেলেটি কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্থিরদৃষ্টিতে এই বাড়ীর দিকেই চাহিয়া রহিল। একটু পরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকা, তোমার নামটি কি বলতো?

আমার দিকে ফিরিয়া বালকটি বলিল, আমার নামে আপনার দরকার?

কি জ্যাঠা ছেলে! দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা আরও দৃঢ় হইল। এ নিশ্চয়ই সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলে। সুতরাং একটু খোঁজ খবর লইতেই হইবে। বলিলাম, দরকার কিছু নেই। অমনি জিজ্ঞাসা করছিলুম। তুমি কোথায় থাক?

নাইবা শুনলেন, এই কথা বলিয়া সে আবার বিদ্যাসাগর-বাটীর দিকে নিষ্পলক চোখে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আমারও কৌতূহল বাড়িয়া গেল। ছেলেটির পরিচয় জানিতেই হইবে। আবার একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, খোকা, তুমি কি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ?

যদি এসেই থাকি, তাতে আপনার কি?

না, আমার কিছু নয়। তবে এতটুকু ছেলে, পথ হারিয়ে, কোথায় চলে যাবে, বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে না, তাই জিজ্ঞেস করছি।

ধন্যবাদ! কিন্তু আপনার কোন সাহায্য না হলেও আমার চলবে।

ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেলাম। কথাগুলি যে ওই ছোট্ট ছেলেটির মুখ হইতে বাহির হইতেছে, তাহা যেন বিশ্বাসই হইতেছিল না। অথচ চক্ষু কর্ণকে অবিশ্বাস করি কেমন করিয়া? একটু চিন্তা করিলাম। পরে মনে করিলাম, খোকাটি যখন খোকার মত কথা বলিতেছে না, তখন উহার সহিত ভদ্রলোকের মত কথা বলিয়া দেখিলে কেমন হয়। একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক। বলিলাম, কিছু মনে করবেন না, আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে, আপনি কে এবং কোথা থেকে এখানে এলেন?

খোকা-রূপী ভদ্রলোক বলিলেন, আপনি দেখছি নাছোড়বান্দা। সত্যি, আমি বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছি। আর ফিরব না। কাজেই কোথা থেকে এসেছি, সেকথা আপনাকে আমি বলব না। আমি কিছুদিন বাংলায় ও বাংলার বাইরে এখানে সেখানে ঘুরে দেখব, তারপর—

তারপর কি করবেন?

তারপর—তারপর—মুক্তে মিলিয়ে যাব, বলিয়া খোকা হাসিয়া উঠিলেন।

আপনি কে তা তো বললেন না।

নেহাতই শুনবেন?

যদি আপনার নেহাত আপত্তি না থাকে।

তা'হলে বলি, আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আমি হা করিয়া উহার দিকে চাহিয়া থাকিলাম। তিনি বলিলেন, কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?

কি করে বিশ্বাস হবে?

হ্যাঁ, সত্যি আমি বিদ্যাসাগর। মরবার পর জন্মেছিলাম নরওয়েতে। বেশ ছিলাম। শীতের দেশ—ভারি আরামে জীবনটা কাটলো। তারপর যখন ঘরে স্বর্গে গেলাম, তখন ব্রহ্মা ডেকে বললেন, এবারে কোথায় যেতে চাও? আমি বললুম, একবার বাংলাদেশে যেতে ইচ্ছে করে। বেশ, তাই যাও। তাই বাংলাদেশে এলাম। চার বছর হ'ল এসেছি। আর মন টিকছে না।

কথা শুনিয়া মনের মধ্যে সব যেন গোলমাল হইয়া গেল। এতটুকু একটা ছেলে, নিজেই বলিতেছে, চার বছর বয়স; তাহার পক্ষে এত বড় একটা ধাপ্পা দেওয়া কি সম্ভব। একটু পরীক্ষা করিবার চক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি সেবার বই লিখেছিলেন, মনে আছে?

আছে বই কি? বর্ণ পরিচয়, কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, সীতার বনবাস, এইসব ব্যাকরণ কৌমুদী তো আমিই লিখেছিলাম

ব্যাকরণ কৌমুদী তোমার লেখা—মানে আপনার লেখা?

হাসিয়া ছেলেটি বলিল, তবু সন্দেহ? ব্যাকরণ কৌমুদীর একটা শ্লোক শুনবেন, এখনও মনে আছে—

ত্যজো নিজো ভজো ভুনজো ভুজ্ প্রসজো দমজ্
যুজ্ রুজঃ।
বুজো রণজো রুজবিজৌ স্বজ্ সনজৌ এব চ।
ষোড়শৈতান্ অকরান্তান্ জানিয়াদ্বিড্ বিবর্জিতান্॥

তাই তো। শোনা ছিল, যাকে যাকে জাতিস্মরেরা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ইনিও তাহা হইলে একজন জাতিস্মর। এমন একজন মহাদ্ভুত জাতিস্মরের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেল। কি সৌভাগ্য! জিজ্ঞাসা করিলাম, এতদিন পরে বাংলাদেশ কেমন লাগছে? নূতন কিছু দেখছেন?

নূতন আর কি দেখব, যে বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশই আছে। নূতন দেখছি মাত্র দুটো জিনিষ।

কি কি?

মূল্য-প্রগতি, জিনিষপত্রের অসম্ভব দাম। আমরা কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারতাম না। মানুষগুলো বেঁচে আছে কেমন করে। তাই আমার আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

আর একটি কি জিনিস?

আর হচ্ছে নারী-প্রগতি। আমাদের দেশে যে এত মেয়ে আছে। আর তারা যে এত কাজ করতে পারে, আমাদের যুগে কেউ জানতো না—ভাবতেও পারতো না।

দেশের সম্বন্ধে সমাজের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে এই জাতিস্মর খোকাটির সহিত একটু অন্তরঙ্গ হইলাম। খোকাটি বলিলেন, একবার ইচ্ছা করছিল, আমার এই বাড়ীটার মধ্যে একবার ঢুকে দেখে আসি কিন্তু, যাক্ কাজ নেই। পূর্বতন স্মৃতি মনে উঠিতে খোকা বেশ গম্ভীর হইয়া উঠিলেন এবং আমার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন সহসা নিকটস্থ একটি পার্ক হইতে ধূ ধূ করিয়া ধূম উঠিতে দেখিয়া আমরা তাড়াতাড়ি সেই দিকে অগ্রসর হইয়া পার্কের পাশে উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্গী খোকাটিও বিস্ময়-বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কার মুখ দেখিয়া যেন আজ উঠিয়াছিলাম বিস্ময়ের পর বিস্ময়ই বুঝি আজ কপালে ছিল।

দেখিলাম পার্কের মাঝখানে স্তূপাকার কাগজ, উপরিভাগ সোনালী রঙের। সেই স্তূপে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হু হু করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, কাগজ-পোড়া গন্ধে বাতাস ভরিয়া গিয়াছে। এই অগ্নিকুণ্ডের চারিপাশে কতকগুলি লোক নাচিয়া নাচিয়া আনন্দ করিতেছে। লোকগুলি একটু অদ্ভুত ধরণের। পুরুষ, অথচ ঠিক পুরুষের মত নয়, হিন্দু অথচ ঠিক হিন্দুর মত নয়, বাঙ্গালী অথচ ঠিক বাঙ্গালীর মত নয়। ইহারা দাবি বাঁধিয়া নাচিতেছে আর উল্লাস করিতেছে। এক-

পাশে কয়েকজন ভুঁড়িওয়ালা লোক নাদাপেঁচা করিয়া কাপড় পরিয়া এক একটি ভাঙ্গা চেয়ারী কোলে করিয়া তাহা হইতে ভুট্টা ছড়িয়া ছড়িয়া দিতেছে এবং ঐ লোকগুলি সেই ভুট্টাগুলি খুকিয়া-লইয়া প্রজ্বলিত অগ্নি-কুণ্ডে সেকিয়া কামড়াইয়া কামড়াইয়া খাইতেছে আর আনন্দ করিতেছে।

সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত রহস্যময় মনে হইল। পাশে একটি লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন মনে হইল, তিনি ব্যাপারটা গোড়া হইতেই লক্ষ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মশায়, ব্যাপারটা কি বলতে পারেন?

ব্যাপারটা আমার মাথা।

আহা বদ্‌লাই না, ব্যাপারটা কি?

বাংলাদেশে যেখানে যত 'প্রথম ভাগ' আর 'দ্বিতীয় ভাগ' ছিল, সেগুলি ভণ্ড করে বন্দুকারের করা হচ্ছে। আর ওই কিম্ভূতকিমাকার লোকগুলি তাই নিয়ে খেই খেই করে নাচছে।

এই কথাগুলি শুনিবামাত্র পাশের খোকাটির মুখ হঠাৎ কঠিন ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল এবং মুহূর্তের মধ্যে সে দৌড়াইয়া গিয়া ওই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপ দিল। দর্শকদের মধ্যে 'অনেকেই কি হ'ল কি হ'ল' বলিয়া আগাইয়া গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে খোকাটির আত্মা বাংলাদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে।

একনম্বর গাছিন প্রেসে কিম্বা নিকটস্থ থানায় নিবেদন সম্পর্কে কোন সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

তাঁর জীবনই যেন দুঃখের। ছ'বছর বয়সেই হয়েছেন মাতৃহীন মা-কে হারাবার দুঃখ কিছুতেই যায় না মন থেকে। ভারি লাজুক ছেলে। একটুতেই কষ্ট পান মনে। অথচ স্কুলে ভর্তি হবার পর যাদের সাথী হিসাবে পেলেন তারা অত্যন্ত অভদ্র। ফলে তাঁর জীবন হ'য়ে উঠল দুর্বিষহ। মনের ওপর চেপে রইল স্কুল-জীবনের তিক্ত স্মৃতি। হাউস অব লর্ডস-এ কেরাণির কাজ পেলেন। কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে এই কথা শুনে মনে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল যে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেল। পাঠাতে হলো পাগলা গারদে। জীবনের বাকি দিনগুলিতেও মাঝে মাঝেই ফিরে এসেছে এই উন্মাদ অবস্থা। অবশ্য সুস্থ থেকেছেন মাঝে মাঝে। তখন রচনা করেছেন আশ্চর্য গীতিকবিতা। আর ইংল্যাণ্ডের চিঠি লিখিয়েদের মধ্যে বোধ হয় তিনিই একদিন ছিলেন সেরা। একদিন ভাগ্যহীন এই মানুষটি হলেন ইংরেজ কবি কুপার।

জীবনের সমারোহ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সমীর আজকাল কি খায়, কতটুকু খায়, কিভাবে খায় নিজের চোখে দেখে তবে আজ সে বাড়ী ফিরবে।

দেরী করার জন্য বাড়ীর দরজা হয়তো বন্ধ করুক আর বকুনি-ঝকুনি দিক কিছুই সে গ্রাহ্য করবে না

উমাদের বাড়ীতে সে যখন খুসী যতবার খুসী যাক তাতে কারো আপত্তি নেই, একলা একলা যাওয়াটাও কেউ দোষের মনে করেনা—একমাত্র মুকুল আর বিধবা ছোট পিসী গঙ্গা ছাড়া

কিন্তু সে যেন সময়মত যায় এবং সময়মত ফিরে আসে। বাড়ীতে কাজকর্ম আছে, নানা রকম ঝঞ্ঝাট আছে—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বাড়ীর মত হলেও সেখানে যখন খুসী বেড়াতে গিয়ে যতক্ষণ খুসী আড্ডা মেরে এলে চলবে কেন

একালের হিসাবেও বিয়ের বয়স পনিয়ে এসেছে। ঘর-দ্বারির কাজ-কর্ম তাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে।

সুমতি এসব নিয়ম এসব রীতি নির্বিবাদে মেনে চলে।

অনর্থক ঝগড়া করে লাভ কি ?

আজ তার মাথা বিগড়ে গেছে সমীরের মুখ থেকে শোনা প্রেমের স্বাধীনতার ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝবার সাধ্য তার নেই। নিজের মনের মত করে ছেলে নিয়ে সেজে নিয়ে যেটুকু বুঝতে পারবে সেটুকু মেনে নেবার চেষ্টা করতে গেলেই গণ্ডগোলের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

সমীরকে সে কি ভালবাসে ?

সুমতির তা জানা নেই।

ওর জন্য কেন তার এত চিন্তা-ভাবনা মায়া-মমতা জেগেছে তাও সুমতি জানে না।

রান্না নিয়ে ব্যতিব্যস্ত উমার মার সঙ্গে ছাড়া ছাড়া ভাসা ভাসা ভাবে দু'চারটে কথা বলে, কি পরিমাণ তেল মশলা দিয়ে আলু কুমড়ার তরকারীটা রান্না করা হচ্ছে সেটা ভালভাবে নজর করে রাখে।

মাছ ডিম সমীর খাবে না। এই তরকারীও সে খাবে কিনা কে জানে।

রান্না নিয়ে ব্যতিব্যস্ত উমার মা ছাড়া ছাড়া ভাবে কথা বলে। এক হাতে বুন্তি দিয়ে তরকারীটা নাড়ে, অন্য হাতে পাখা নেড়ে উনানের আঁচ বাড়াবার চেষ্টা চালিয়ে যায়—মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সময় বা উপায় তার নেই।

তার সব কথাই হয় ছোট ছোট আলগা জিজ্ঞাসা—সুমতি এবং তার বাড়ীর মানুষদের সম্পর্কে

সুমিষ্ট স্নেহভরা কণ্ঠস্বর—সুমতি যে নিজে থেকে বাড়ী বয়ে এসে তার রোগা তোতলা ছেলেটার প্রতি দরদভাব বজায় রেখেছে, তার সঙ্গে কথা বলার জন্য রান্নাঘরে এসে বসেছে, এজন্য উমার মা'র আনন্দ আর কৃতজ্ঞতার যেন অন্ত নেই

তাকে নিয়ে কী আশা উমার মার মনে উঁকিঝুঁকি দিয়ে যায় আজকাল সুমতি সেটা টের পেয়েছে।

প্রায় পঙ্গু ও অকর্মণ্য ছেলেটার জীবনের সঙ্গে যদি বেঁধে দেওয়া সম্ভব হয় এই মমতাময়ী মেয়েটির জীবন—উমার মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। একটি বৌ নিয়ে ঘর করবে নিজের এই সুখের হিসাবটাই শুধু তার নয়, ছেলেটাও তার মায়া-মমতা আদর-যত্ন পাবে। সে চোখ বুজলে সমীরের দিকে কে তাকাবে ভেবে ঘোরতর উমার মার রাত্রে ঘুম হয় না।

ওই ছেলের জন্য যেমন তেমন মেয়েও যে জুটবে না সেটা তো জানা কথাই, ঘরদোরটানে সুমতি যদি রাজী হয় !

মনে মনে হাসি পাওয়ার বদলে সুমতির প্রাণটা জ্বালা করে

সমীরের জন্ত তার প্রাণের টান আছে শুধু এইটুকু জেনেই উমার মা এমন একটা অসম্ভব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এমন আশাও পোষণ করতে পারে।

তার না হয় আপত্তি হবে না। সমীরের স্বাস্থ্য নেই, বিদ্যা নেই, কয়েকটা কথা স্বাভাবিকভাবে একটানা উচ্চারণ করার ক্ষমতা নেই—রোজগার নেই। কয়েকটা বিড়ি টানা ছাড়া কোন বিলাসিতা না থাকলেও এবং নিজে সাবান দিয়ে কেচে নিয়ে সস্তা জামা-কাপড়ে চালিয়ে দিলেও নিজের খরচ চালিয়ে সে যে কিভাবে প্রতিমাসে সংসার খরচের জন্ত তিন চার কুড়ি গণনের বিশটা টাকা মার হাতে তুলে দেয় সেটা তো রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার।

সে না হয় রহস্যের খাতিরে এসব কিছুই প্রশ্ন করবে না—সারাজীবন দুঃখ কষ্ট সঙ্গে কাটাতে হবে জেনেও তোমাকে রাখবে না—সমীরের গলায় বরমালা দিতে রাজী হবে।

কিন্তু উমার মা কি ভুলে গেছে সে ভাই-বোন—মাসী-পিসীদের মত একটা সংসারের অল্পবয়সী একটি মেয়ে মাত্র? কার হাতে তাকে সমর্পণ করা হবে সে বিষয়ে তার সম্মতি-অসম্মতি আপত্তি-নিরাপত্তির প্রশ্নই ওঠে না?

সমীরের সঙ্গে তার বিয়ের কথা উঠলে সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে?

ভাববে একটা তামাসা করা হচ্ছে?

সমীর স্নান সেরে তার সম্বল ধুতিটি এবং শার্টটি গায়ে চড়িয়ে চুল আঁচড়ে রান্নাঘরে খেতে আসবার আগেই সুমতি তার জন্ত পিঁড়ি পেতে তার নিজস্ব কাচের গ্লাসে জল ভরে টানা মাটির প্লেট ছোট বাটিটা ধুয়ে সব ঠিকঠাক করে রাখে।

সমীর এসেই একটু রাগতভাবে বলে, এসব করতে গেলে কেন মা? তোমায় না কতবার বলেছি আমার জন্ত একটু বাড়তি খাটুনি তুমি খাটতে পারবে না? বেঁধে দিচ্ছ তাই বেশ।

বার বার ঠেকে গিয়ে থেমে থেমে জড়িয়ে জড়িয়ে কত চেষ্টায় কত কষ্টেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করে। ধৈর্য ধরে তার কথা শেষ পর্যন্ত শুনে উমার মা বলে, আমি নই সুমতি করেছে

ওঃ!

সুমতির দিকে চেয়ে সমীর একটু হাসে।

মাপা একহাতা ডাল দিয়ে অল্প খানিকটা ভাত মেখে খেতে আরম্ভ করে' খুব ধীরে ধীরে সুমতিকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি করে জানলে খাওয়ার সময় এই তিনটে ছাড়া বাড়তি বাসন নিই না?

খেয়াল করে সুমতি আশ্চর্য হয়ে যায় যে কথাগুলি বলতে গিয়ে সমীর একবারও ঠেকে যায় না, একটুও তোতলায় না।

বিস্ময় চেপে রেখে হেসে বলে, আহা, আমি যেন নতুন এলাম, তোমার বিষয়ে জানতে কিছু বাকি আছে। প্লেট গেলাস নিজে ধুয়ে রাখো তাও আমি জানি। আরেকটু ডাল নেবে না, আরেকটু আলুভাতে?

না, আমাকে মাপ মত খেতে হয়—ওজন ঠিক রেখে।

একবারও সে তোতলায় না।

উমার মা বলে, আমার কি মনে হয় জানিস বাছা। ও ইচ্ছে করে তোতলিয়ে কথা কয়, ইচ্ছে করে কম খায়।

খানিকটা তরকারী দিয়ে বাকী ভাতটা মাখতে মাখতে সমীর বলে, তোমরা বুঝবে না। এটা আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার ব্যাপার নয়। হঠাৎ শরীরটা ভারি হাল্কা লাগে, কিছুক্ষণ তোতলামি বন্ধ থাকে। তারপর আবার আরম্ভ হয়। সব জেনেও কেন উল্টো-পাল্টা কথা বলছ মা, আমার বাত জানতে তোমার বাকী আছে? মাপ মত না খেলে পেট কাঁপবে জান না?

: জানি রে জানি, সব আমি জানি। বাচ্চা বয়স থেকে কত ডাক্তার দেখালাম, কত চিকিচ্ছে করালাম—কিছুতে কিছু হল না। আমার কপালের লেখা।

সুমতিকে প্রায় চমকে দিয়ে সমীর সশব্দে হেসে ওঠে।

: আর কেন মিছে মাথা ঘামাও, আপশোষ কর? কিছু হয় নি তো হয় নি—চুলোয় যাক। জগতে কত কানা খোঁড়া, বোকা হাবা মানুষ আছে—ছোট মামা তো

দাত বছর বয়স থেকে পঙ্গুঘাতে বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাচ্ছে। সে তুলনায় আমি তো দিব্যি আছি—খাই দাই হাঁটি ঘুরে বেড়াই....

বিস্ময়ের সত্যিই সীমা-পরিসীমা থাকে না সুমতির।

মাঝে মাঝে ভোতলামিটা কম মনে হয়েছে কিন্তু অবাধে তাকে এমন অনর্গল কথা বলে যেতে সে আর কখনো শোনে নি।

সমীরের খাওয়া শেষ হতে হতে উমা এসে যায়।

ব্যস্তভাবে বলে, যা রান্না হয়েছে আমার দিয়ে যাও না। যা পারি নাকে-মুখে গুঁজে আমাকেও একটি বেরোতে হবে।

: এত তাড়া কিসের উমাদি? তোমার অফিস তো সাড়ে দশটায়।

: কয়েকদিন ন'টায় হাজিরা দিতে হবে

সমীর জিজ্ঞাসা করে, ওভার-টাইম পাবে তো?

: কি জানি। হয় তো পাব একভাবে না পাই অন্যভাবে পাব।

সমীর একটু হাসে।

উমার মা বলে, মাছের ঝোলটা যে হয় নি? মাছ ছাড়া তো আবার ভাত রোচে না একটু দেরী কর না, ঝোলটা করে দিই?

উমা রেগে বলে, কোন সকালে মাছ এসেছে, এখনো ঝোল হয় নি? তোমরাই ডোবাবে আমাকে।

: আজ তাড়া আছে আগে তো বলিস নি। ভাল তরকারী দিয়ে একটু ধীরে-সুস্থে খা—ইলিশ মাছের ঝোল করতে কতক্ষণ।

সুমতি যেন খুসীতে ফেটে পড়ে বলে, ইলিশ মাছ। ঝোল-ভাত না খেয়ে নড়ব না মাসীমা—তোমাদের কষ্ট পড়লে পড়বে।

প্রায় আদেশের সুরে সমীরকে বলে, উঠো না, গরম গরম মাছের ঝোল দিয়ে আরেক হাতা ভাত খেয়ে যাও। না খেলে কিন্তু ঝগড়া-ঝাঁটি কাটাকাটি হয়ে যাবে—আর কোনদিন আসব না।

: আমি তো মাছ খাই না

: আজ খেতে হবে।

: অম্বল হলে কে সামলাবে?

: আমি সামলাব

সকলকে অবাক করে দিয়ে সমীর সত্য সত্যই মাছের ঝোল হবার প্রতীক্ষায় হাত গুটিয়ে বসে থাকে এবং ঝোল রান্না হলে বেশ খুসীর সঙ্গেই বাড়তি মাছ ভাত পেটে চালান দেয়।

সুমতি বলে, প্লেট গেলাস আমি ধুয়ে রাখব'খন।

সমীর খাওয়া শেষ করে কথা না বলে বাঁচাতে যায়।

উমা বলে, কী মন্ত্রে ওকে তুই বশ করেছিস রে?

সুমতি বলে, যে মন্ত্রে তোকী গোঁয়ারকে বশ করতে হয়।

পাঁচীর একটি ছেলে হয়েছিল বছরখানেক আগে রোগা কাঠি ছেলে হাড় যেন শুধু চামড়া দিয়ে ঢাকা

জীবন্ত কঙ্কালের মত ছেলেটার মা হবার পর থেকেই পাঁচীর কিন্তু অদ্ভুত আশ্চর্য রকম পরিবর্তন ঘটেছে।

শাশুড়ী-ননদের নিষ্ঠুরতায় আর কার্তিকের অবহেলায় প্রাণের জ্বালায় হন্য হয়ে বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছিল—এখন ওরকম নরম থাকার বদলে তার যেন হয়েছে উল্টো ধাত, গরম ধাত।

একলা কার্তিকের রোজগারে সংসার চালানো সত্যই অসম্ভব। তার নিজেরই এখন খাওয়া জোটে না যে খিদে মিটে বুকে একটু দুধও আসবে—বাচ্চাটা শুষে নিয়ে বাঁচবে।

শিশু কি মায়ের শুকনো বুকের চামড়া চেটে মোটা-সোটা হয়ে বেঁচে থাকতে পারে!

পাঁচী তাই শাশুড়ী-ননদের ধমক দিয়ে তার দেখিয়ে ওদের উপর বাচ্চাটাকে দেখাশোনা করার ভার চাপিয়ে তিন বাড়ীতে কাজ যোগাড় করে নিয়েছে।

বাচ্চাটাকে বুকে আঁকড়ে রেখে ঘরে বসে থেকে লাভ নেই

শুকনো চামড়া হয়ে গেছে বুক। সারাদিন কেঁদে

ফকিয়ে চেষ্টা করলেও এক কোঁটা পুঁজি বেচারার জুটবে না।

তার চেয়ে পয়সা দিয়ে কিনে আনা সস্তা ধানের ভৈরী খাস চামচ চামচ থাক—হাড় চামড়া সার হয়ে দাঁড়ালেও প্রাণটা হয় তো টিকে যাবে।

সকাল সন্ধ্যায় তিন বাড়ীতে কাজ করে

দু' বাড়ীতে সকাল বিকাল বাসন-মাজা, ঘর নিকানো, উনান সাজানো ঝি-গিরির কাজ—এসব সেরে সন্ধ্যা নাগাদ আরেক বাড়ীতে গিয়ে রাত্রিবেলার রান্না করার কাজ।

রাত্রের খাওয়াটা ও বাড়ীতেই সে পায়

কিন্তু সকলকে খাইয়ে তবে তার ছুটি মিলত নিজের পেট ভরাবার—নিষ্কৃতি পাবার

সেটা তো সম্ভব নয়

কয়েকদিন কাজ করেই সে তাই ঝিন্নী-মাকে জানিয়ে দিয়েছিল যে একাজ তার পোষাবে না

তবে ছোটলোকদিও সে করবে না অন্য লোক যোগাড় করতে যে-কদিন তাদের সময় লাগবে সে-কদিন চোখ-কান বুজে এইভাবেই সে খেটে যাবে—নিজের কথা ভাববে না।

মরিয়া হয়ে কঙ্কালসার বাচ্চাটাকে সেদিন পাচী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

আড়চোখে বাচ্চাটার দিকে তাকাতে তাকাতে মোক্তা-ভরা চার-পাঁচটা পান একেবারে মুখে পুরে দিয়ে গিন্নীমা ব্যবস্থা দিয়েছিল যে, কাজ ছেড়ে দেবার দরকার নেই, রান্নাবান্না শেষ করেই সে ঘরে-ফিরে যেতে পারবে।

এখানে খেয়েও সে ঘরে ফিরতে পারে, খাবারটা নিয়েও যেতে পারে।

তবে তাকে অথবা এ বাড়ীর অন্য কোন একজনকে দেখিয়ে যেন নিয়ে যায়।

: আমি কি চোর যে বেশী বেশী নিয়ে যাব ?

: কে চোর কে সাধু এত সহজেই কি জানা যায় বাছা ? সংসারের এই হল নিয়ম। বাড়ীতে গিয়ে খাবে বলে কি কিছু কতটা কিছু, দেখিয়ে নিয়ে যাবে—তাতে তো দোষের কিছু নেই তোমারও মুখ রক্ষা হবে মাঝে টান পড়লে কেউ বলতে পারবে না সাড়ে তিন টাকা সেরের মাছ এক টুকরোর বদলে তুমি পাঁচটুকরো নিয়ে গেছ।

: ঠিক কথা বলেছেন মা।

খুব ভোরে এসে অনিলদের বাড়ীতে শুধু বাসনটা মেজে দিয়ে যায়।

মুকুলের ভোর রাত্রে ওঠে।

কিন্তু পাচী এসে কড়া নাড়লে প্রায় রোজই সদর দরজার খিল খুলে দেয় সুমতি।

পাচী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে, রাতে বুঝি ঘুম হয় না দিদিমনি ?

সুমতিও হাসিমুখে জবাব দেয়, রাতভোর ঘুমিয়েছি, আর কত ঘুমোব বল ?

পাচী হালকা সুরটা বজায় রেখেই বলে, এই বয়সে যত পারবে খেয়ে নেবে ঘুমিয়ে নেবে। মেয়েমানুষের ব্যাপার তো, ঝঞ্ঝাট যখন শুরু হবে, কখন খাবে কখন ঘুমোবে ঠিক রইবেনি তো।

পাচী 'মেয়ে মানুষের কপাল' বা অদৃষ্ট বলে না—বলে 'ব্যাপার'।

সুমতি অবশ্য সেটা খেয়াল করে না। তার মগজে অতবুদ্ধি গজায়নি। সে অন্যভাবে অন্য ভাষায় জবাব দেয়। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি বলেই কি ওসব মানতে হবে ? আমি মানবো না। দেখিতো কার সাধ্যি আছে আমাকে মানায়।

: অন্তে দেবে ভরে তো অন্ন জুটবে দিদিমনি ?

: অন্ন না জুটলে উপোস দেব

: উপোস দিয়ে মানুষ বাঁচে ?

: না বাঁচতে পারি মরে যাব।

তাদের এই ধরণের কথাবার্তা সকলেরই কানে যায়—মা অবশ্য ভোর রাত্রে ওঠে। মুকুল সুমতিকে তিরস্কার ক'রে বলে, ঝিয়ের সঙ্গে তোর অত কথা বলার দরকার কি রে মতি ?

সুমতি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তোমাদের সঙ্গে কথা বলে সুখ হয় না তাই। হলই বা বামনমাগী ঝি—কী সুন্দর খাঁটি খাঁটি কথা বলে

: তোর মাথা বিগড়ে গেছে মতি

: চিকিৎসা করে সারিয়ে দাও

: চিকিচ্ছে তোর করতেই হবে আজ্ঞা করে চাবকে দিতে হবে তোকে।

: আনো না চাবুক ; চেষ্টা করে দিদিগিরি ফলাবার ? মজা টের পেয়ে যাবে

: তুই তো বড় ঠাটা হয়ে উঠেছিস

: আমি হইনি—তোমরা করেছ

সকলে চিন্তিত হয়ে ওঠে

মাথাকি সত্যই বিগড়ে গেল মেয়েটার ? নইলে এমন ঘর-বেজাজ চাল-চলন তার কি করে হয় ? বনেদী তেজী মেয়ে সত্যই কিন্তু এরকম বিশ্রীভাবে সে তো কোনদিন রাগও প্রকাশ করেনি, তেজও দেখায় নি।

রাগ হলে বরং গুম্ খেয়ে একেবারে চুপ হয়ে যেত—দু'এক বেলা খাওয়া বন্ধ রাখত।

মেয়ে যে সে বিষয় রকম জেদী সেটা টের পাওয়া যেত কোন বিষয়ে কারো কোন কথা কানে তুলতে অস্বীকার করে মুখ বুজে থাকার অদ্ভুত ক্ষমতায়।

যেন কালা-বোবা মেয়ে, কারো কথা শুনবেও না, জবাবও দেবে না—মিষ্টি কথা হোক, দরকারী কথা হোক আর ধমকধামক গালাগালিই হোক।

আজকাল সকলের উপর ফটাং ফটাং কথা বলে—গা-জ্বালানো ভঙ্গীতে বলে। সে যেন হঠাৎ পণ করেছে যে গুরুজন বা অভিভাবকদের উপদেশ বা তিরস্কার সহ্যও করবে না, গ্রাহ্যও করবে না, চোখরাঙানির নামকরা কুঁদুলে মেছুনির মত তাদের সব কথাতেই খোঁস করে উঠবে।

অনিল মিষ্টিসুরেই জিজ্ঞাসা করে, তোর হল কিরে সুমী ?

সুমতি মুখ বাঁকিয়ে বলে, হবে আবার কি ?

: সবার সাথে ঝগড়া শুরু করেছিস্।

: শোন কথা—মিছে কথা বলছ গায়ে পড়ে কার সাথে ঝগড়া করেছি ? আমার পেছনে না লাগলেই হয়।

: তুই যা খুশী করবি, আবোল তাবোল বকবি—কেউ কিছু বলবে না তোকে ?

: যার বলবার অধিকার আছে সে বলবে। সবাই মিলে উঠতে বসতে বলতে শুরু করলে মাথা বিগড়ে যাবে না ?

অনিল আরও বেশী শান্তভাবে আরও বেশী মিষ্টি সুরে বলে, সে তো বুঝতেই পারছি আমি যা জিগ্যেস করছি সে কথার জবাব দে এতদিন মুখ বুজে থাকতিস, কি এমন ব্যাপার ঘটল যে হঠাৎ ফুঁসে উঠলি ? এটাই আমি বুঝতে চাইছি

সুমতি বলে, বড় হইনি ? আমার সাধ আহ্লাদ নেই ?

এইভাবে সুমতি আসল প্রশ্ন এড়িয়ে যায়। কি বলবে তাই যে তার জানা নেই।

সমীরের সম্পর্কে নিজের মন যে ঠিক করে ফেলেছে কিন্তু নিজের মন ঠিক করে ফেলেছে বলেই অন্য সমস্ত প্রশ্ন আর সমস্যার তো মিমাংসা হয়ে যায় নি।

কয়েকদিন পরে উমার কাছে অনিল সুমতির খাপছাড়া ভাবে বিগড়ে যাবার কারণ কি তার হদিস পায়।

উমা যদিও বিব্রত ভাবে বলে, কথাগুলি আমিই বলছি প্রস্তাবটা কিন্তু আমার নয়। যা নিজেই আসছিল, আমি ভেবে চিন্তে মাকে ঠেকিয়ে বলতে এলাম।

অনিল বলে, ব্যাপারটা কি ?

উমা বলে, সুমির সঙ্গে সমীরের বিয়ে দেবার জন্য মা পাগল হয়ে উঠেছে।

অনিল বলে, ও. এই জন্য সুমির পাগলামি শুরু হয়েছে।

অনিলকে বিশেষ বিচলিত হতে না দেখে উমা সত্যই আশ্চর্য হয়ে যায়।

উমা বলে, আমি ভেবেছিলাম কথাটা শুনে তুমি হেসে ফেলবে। সমীরের বিয়ে হবে, তাও আবার সুমতির সঙ্গে। মা নিজেই আসত, আমি ভাবলাম যে অপমান হয়ে গঙ্গায় গিয়ে কাঁপ দেবে কিনা কে জানে। তার চেয়ে আমিই তোমার সঙ্গে কথা বার্তা বলে যাই।

অনিল দ্বিধা করে না।

পরিষ্কার স্পষ্টভাষায় বলে, সুমতি যদি রাজি থাকে আমার কোন আপত্তি নেই।

: সমীরের কি বিয়ে করা উচিত?

: সেটা সমীর বুঝবে।

: সমীর বুঝবে কি রকম? ওর কি মাথা ঠিক আছে? আমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার আরম্ভ করেছে তুমি ধারণা করতে পারবে না। ওই তো টিং টিং করছে শরীর, তার ওপর চাকরি-বাকরি করে না, রেস্তরাঁর কোন ঝামেলা নেই। বিয়ে করলে নিজেও ঘুমিয়ে পড়বে, আমাদেরও ঝঞ্ঝাট বাড়বে। এমনিই সামলাতে পারছি না, হিম সিম খেয়ে যাচ্ছি—মাসের শেষে কি যে অবস্থা হয়। তোমার বোনের দায়টাও ঘাড়ে চাপাতে চাইছ?

: তোমার ঘাড়ে দায় চাপবে কেন? দায় হবে সমীরের। সমীর রোজগার করে—সারাদিন বসে বসে বিড়ি পাকায়।

উমা যেন আকাশ থেকে পড়ে।

: বিড়ি পাকায়?

: দোকানটা অবশ্য পাড়ায়—বোধ হয় ইচ্ছে করেই ঘুষের দোকান বেছে নিয়েছে—জানাজানি হলে তোমরা লজ্জা পাবে।

উমা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বলে, আমরাও তাই ভাবছিলাম—নিজের খরচটা কি করে চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বিড়ি পাকিয়ে কতই আর রোজগার হয়? বিয়ে করে চালাতে পারবে?

অনিল বলে, ওদের দু'জনকেই সেটা খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোন রকম অবস্থায় আমার চলবে না। বিয়ের দায় ঘেড়ে থাকলে বিয়ে আমরা দিয়ে দেব, কিন্তু চালাতে হবে নিজেদের। না পারলে বস্তিতে গিয়ে খোলার ঘরে থাকতে হবে।

উমা একটু কঠোর সুরেই বলে, যে ভাবে হোক বোনটাকে পার করে নিশ্চিন্ত হতে চাইছ বুঝি?

অনিল রাগ করে না।

বলে, আমার দিকের হিসাব করছি না। ইচ্ছা অনিচ্ছাটা বোনের চোখের সামনে দেখে আসছি তো সব ব্যাপার। সুমিকে কাঁদিয়ে ওর অনিচ্ছায় চাকরে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব, দু'দিন বাদে ছাঁটাই হয়ে বেকার হবে। বিড়ি বানাক আর যাই করুক সমীর তো রোজগার করছে।

একটু থেমে যোগ দেয়, তাছাড়া, সমীরের তেজ আছে, মনের জোর আছে। নইলে আমি রাজী হতাম না।

খবর শুনে পাচী বড়ই খুশী হয়।

অনিলকে বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দিয়ে দাও। মেয়ে যাকে মায়া করে তার সঙ্গে লটকে দেওয়াই ভাল।

পাচীর শুধু বাসন মাজার কাজ।

সুমতি মশলা বাটছিল।

হাত থেকে নোড়া কেড়ে নিয়ে তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে মুকুন্দের উদ্দেশ করে বলে, ক'দিন বাদে বিয়ে, মেয়েটাকে দিয়ে মশলা বাটিয়ে নিচ্ছ? কেমন মানুষ গো তোমরা?

শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ী

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

গত ১২ই শ্রাবণ ১৩৪৭, মাত্র কিছুকাল পূর্বে, স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছোটমামা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পাটনায় তাঁর একমাত্র পুত্র শুভদাসের গৃহে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়ঃক্রম চুরাশী বৎসর হয়েছিল।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ স্বর্গীয় কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস ও কনিষ্ঠ বিপ্রদাস। ঠাকুরদাস বহুকাল পূর্বে গত হয়েছেন; বিপ্রদাস সুপরিণত বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আমি যে আজ বিপ্রদাসের বিষয়ে কিছু লিখতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ মাত্র এ নয় যে, তিনি শরৎচন্দ্রের মাতুল ছিলেন; শরৎচন্দ্রের জীবনের গুরুতর সঙ্কটকালে শরৎচন্দ্রকে তিনি যে পরিমাণে রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন, তার অভাব ঘটলে শরৎচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবন নিষ্ফলতার ঊষর ক্ষেত্রে প্রবেশ করতেও পারত, প্রধানতঃ এই কথাটাই আমি বাঙলা দেশের পাঠকসম্প্রদায়কে জানাতে ইচ্ছা করি।

যে সঙ্কটকালের কথা আমি উল্লেখ করছি, তার বিস্তৃতি শরৎচন্দ্রের এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার দুই বৎসর পূর্ব হতে আরম্ভ ক'রে দুই বৎসর পর পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটি চার বৎসর কাল। এই চার বৎসরে লেখাপড়ার ফলে যে-পরিমাণ বিদ্যা শরৎচন্দ্র অর্জন করেছিলেন তার স্বকীয় মূল্য নিশ্চয়ই তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়; কিন্তু পরবর্তীকালে সফলতার যে ভাসমান পরিধির মধ্যে প্রবেশ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন, তার প্রবেশ দ্বার উদ্‌ঘাটিত করবার পক্ষে সেই যন্ত্র বিদ্যাটুকু ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বস্তু। ইংরাজি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত অর্জিত বিদ্যার প্রভাবে জীবন-স্রোতস্বিনীতে ডিঙ্গি-নৌকায় সওয়ারি হওয়া যায়, স্টীমার জাহাজের আরোহী হওয়া চলেনা। সুতরাং সেই বৎসামান্য বিদ্যার পুঁজিটুকু নিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্য শরৎচন্দ্রকে যদি স্থানীয় কোনো বিহারী জমিদারের জমিদারি সেরেস্তায় বিশ-পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরিতে প্রবেশ করতে হ'ত, তা হ'লে বিস্মিত হবার কিছু থাকত না। সেরূপ অবস্থায় শরৎচন্দ্রের সমস্ত সাহিত্য প্রতিভা, বালুকাগর্ভে জলধারার ন্যায়, কায়ক্লিষ্ট অক্ষরে হিজি বিজি ভাষায় লিখিত সেহা রোজনামচা, খসড়াখরচ, রোকড়ের মধ্যে অবলুপ্ত হ'য়ে যেতেও পারত। তা হ'লে কোথায় থাকত পথের দাবী, আর কোথায়ই বা থাকত চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত। সেই সম্ভাবনীয় দুর্ভাগ্য থেকে শরৎচন্দ্রকে এবং বাঙলা সাহিত্যকে রক্ষা করেছিলেন শরৎচন্দ্রের ছোটমামা বিপ্রদাস।

যে সঙ্কট কালের কথা বলছি, সে-সময়ে শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায় উপার্জনহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য ছিলেন নিরুপায়; এবং শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ের অধিকাংশ অভিভাবক-স্বজন ছিলেন ভাগলপুর হইতে নানা দূরবর্তী স্থানে কার্যোপলক্ষে নিযুক্ত। সর্বোপরি ছিল সকল প্রকার বাধাবন্ধন ছিন্ন ক'রে নৈষ্কর্ম্যের পথে-ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়াবার শরৎচন্দ্রের দুর্বার প্রকৃতি। শুধু বাক্তিত্বসম্পন্ন বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিভাবকোচিত কর্তব্যবোধের গুণে শরৎচন্দ্রকে সে-সময়ে লেখাপড়ার দুর্মোচ্য কীলকে আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল।

ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়ার ঠিক পূর্বে কি অবস্থায় এই কীলক উৎপাটিত হ'য়ে যায়, সেকথা এখানে অবান্তর। তবে তৎপ্রসঙ্গে মাত্র এইটুকু বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন এণ্ট্রান্স পরীক্ষার প্রবেশ মূল্য মাত্র পনেরটি টাকা জোগাড় না হ'তে পারার দরুন শরৎচন্দ্র ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিতে পারেন নি,—এই মর্মে একটি

যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তা আদৌ সত্য নয়। এমন কি, সেই কাহিনীর সৃষ্টি যত বড় লোকের দ্বারাই হ'য়ে থাকুক না কেন, তথাপি সত্য নয়। যে ব্যক্তি দুই বৎসর ধ'রে কলেজের ফি এবং পাঠ্যপুস্তকের মূল্য জুগিয়ে শরৎচন্দ্রকে ফার্স্ট আর্টস্ পড়িয়েছিলেন; যে কোনো ব্যক্তিই তিনি হোন্ না কেন, মাত্র পনেরটি মুদ্রা ব্যয় ক'রে শেষ রক্ষা করলেন না,—একথা একান্তই অযৌক্তিক। শরৎচন্দ্রের স্বার্থে না হলেও, নিজের স্বার্থেও পনেরটি টাকা ব্যয় ক'রে শরৎচন্দ্রকে পড়ানোর ব্যয়ভার হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করা, অন্ততঃ অর্থের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে অধিকতর লাভজনক ছিল। তখনকার দিনে ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারলে বিহারে বাঙালির পক্ষে চলনসই একটা কোনো কাজ জোগাড় করা বিশেষ কঠিন ছিল না।

কথায় বলে নরাণাং মাতুলক্রমঃ। অসতর্ক দৃষ্টিতে বিপ্রদাস ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে নরাণাং মাতুলক্রমঃ সূত্রটি খুঁজে পাওয়া কঠিন। হঠাৎ মনে হয় শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি বিপ্রদাসের প্রকৃতির ঠিক বিপরীতই ছিল। বিপ্রদাস ছিলেন ধর্মপরায়ণ, আচারনিষ্ঠ এবং গুরু ও দেবতায় ভক্তিমান; ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক এবং পূজাপাঠ না ক'রে তিনি কখনো জলগ্রহণ করতেন না: সুখাদ্য বলতে তিনি বুঝতেন একমাত্র সেই খাদ্য দেবতার ভোগে যা নিবেদন করা চলে,—অখাদ্য, যা চলে না; ধর্ম অর্থে বুঝতেন সনাতন হিন্দুধর্ম; ভ্রমণ অর্থে তীর্থভ্রমণ, এবং বোধ করি শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী পরিপূর্ণ পুণ্য অর্জন করবার অভিপ্রায়েই তীর্থের স্থান যত দুর্গম এবং বিঘ্নসঙ্কুল হোক না কেন, সশরীরে তীর্থদর্শন করতেন; যে পান চিবিয়ে খেতে হয় একমাত্র সেই পান ভিন্ন আর কোনো প্রকার পানের সহিত তাঁর সংস্রব ছিল না;—এমন কি, ধূমপানের সহিতও ছিল না।

এই ধরনের বিষয় মিলিয়ে মিলিয়ে দেখলে অধিকাংশ লোকের মনে হবে বিপ্রদাস এবং শরৎচন্দ্রের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। কিন্তু ইহা যাঁর মনে ক'রে এই সকল ঘটিরূপ বস্তুর খোসকাড় পেরিয়ে উভয়ের অন্তর্দেশে প্রবেশ করতে পারলে খুঁজে পাওয়া যাবে মাতুলক্রমের সূত্র,—দেখা যাবে উভয়েরই চিত্তমাঝে বর্তমান একই প্রাণধর্মের আবেগ, একই অগ্নি-জলের বাষ্প। রেলগাড়ি ছুটে চলে কঠিন ভূখণ্ডের উপর লৌহের রেল বাঁধানো পথে; জাহাজ ভেসে চলে বীচিবিক্ষুব্ধ মহাসাগরের বেপমোর্মা জলবিস্তারের উপর দিয়ে। একজন অর্বাচীন লোকের চক্ষে এই দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথক ধর্মী বস্তু ব'লে মনে হবে। কিন্তু মেকানিকাল এঞ্জিনীয়ার মাত্রেই জানে প্রাণধর্মের দিক দিয়ে রেলগাড়ি এবং জাহাজ একই গোত্রের বস্তু,—উভয়ের জন্মদিতই চলেছে একই টীম এঞ্জিনের তাড়নায়। বিপ্রদাস এবং শরৎচন্দ্র উভয়েরই গতিবেগ ছিল উদ্দাম্। প্রভেদ ছিল, বিপ্রদাস চলতেন কেবলমাত্র সমাজের লৌহময় রেলবাঁধানো পথে, আর শরৎচন্দ্রকে ভাসতে দেখা যেত সমাজের বাধ-পরিখার উর্ধ্বে বিস্তৃত তরঙ্গভঙ্গেরও উপর। ফলে, বিপ্রদাসের অনুরাগ নিবদ্ধ ছিল সমাজের চতুঃসীমার মধ্যে, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি পরিব্যাপ্ত হ'ত সেই চতুঃসীমা অতিক্রম ক'রেও। বিপ্রদাসের দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী শরৎচন্দ্রের সর্বতোমুখী।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিপ্রদাসের প্রবল অনুরাগ ছিল। কলেজ প্রবেশ করবার পূর্বেই তিনি দুর্বহনীয় সংস্কৃত ব্যাকরণকে বেশ খানিকটা বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মচর্চার প্রতি ক্রমবর্ধমান আসক্তির ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কালিদাস-ভবভূতির কাব্য-লোকের লীলাভূমি থেকে নির্গত হ'য়ে ক্রমশঃ স্তব-স্তোত্র মন্ত্রের পুণ্যময় গুহার মধ্যে অধিক পরিমাণে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছিল বটে, কিন্তু ব্যাকরণ ও ঈশ্বরের ন্যায় সর্বগত বস্তু,—পূজারতিলকেও সে যেমন অধিষ্ঠিত, মোহমুদ্গরেও তেমনি বিদ্যমান। তাই কোনো দিনই বিপ্রদাসের সংস্কৃত ব্যাকরণের সহিত সম্পর্ক শিথিল হবার কারণ ঘটে নি।

আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে বহুকাল হ'তে জগদ্ধাত্রী পূজা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের জোরে এই পূজায় আমাদের ছোড়দাদা বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একটি বিশেষ গুরুতর অংশ অধিকার করতেন। সেই কথাই এবার বলছি।

জগদ্ধাত্রী পূজা একদিনের পূজা, কিন্তু সেই একদিনের তিন দফা পূজায় যে পরিমাণ অর্থ এবং উদ্যম ব্যয়িত হ'ত, তা'তে তিন দিনের দুর্গাপূজা করাও এক রকমে চলতে পারত। কিন্তু আমাদের কর্তারা দুর্গাপূজার চেয়ে জগদ্ধাত্রী পূজাই যেন বেশী পছন্দ করতেন। দশমীর দিন গঙ্গাবক্ষে প্রতিমা বিসর্জন দিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা যখন বাড়ি ফিরতাম, কর্তারা তখন ঘরে ঘরে দোরদেশে দাঁড়িয়ে থাকতেন,—পদধূলি নিয়ে আমরা প্রণাম করলে আমাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে করতে গাঢ় কণ্ঠে তাঁরা বলতেন, 'এই আমাদের দুর্গাপূজা, আজ আমাদের আসল বিজয়া।' সে কথা শুনে আমাদের সেদিনা বিধুর মনে অনমুভূতপূর্ব শিহরণ জাগত। পূজার একমাস পূর্বে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিনে কাঠামো পূজা হ'ত। সেই দিন থেকেই পূজার সুর লেগে যেতো। দিন দুই-তিনের মধ্যে নিয়মিতভাবে সংবাদ যেত ভাটপাড়ায় আমাদের কুলগুরু স্বর্গীয় যজ্ঞপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছে। তার দশ-বার দিন পরে লক্ষ্মণপুর থেকে সুবিখ্যাত মূর্তিশিল্পী শশিভূষণ পাল এসে কাঠামোয় খড় জড়াতে আরম্ভ করতেন। অন্দরমহলে এবং বহির্বাটিতে একটা বিপুল উদ্দীপনা জেগে উঠত। আমরা ছেলের দল প্রতিমা গড়ার সম্মুখভূমিতে অষ্টপ্রহরী আড্ডা জমাতাম এবং পাল মহাশয়ের ছোট খাটো ফাইফরমাস খাটতাম। তারপর দেখতে দেখতে চক্ষের সম্মুখে প্রথম দিনের সেই খড়-বাঁধা কঙ্কাল অপরূপ লাবণ্যে রূপায়িত হ'য়ে উঠত। প্রতিমার সুষমামণ্ডিত মুখের দিকে চেয়ে আমাদের চক্ষে জল ভ'রে আসত।

পূজার দিন দুই পূর্বে ভাটপাড়া থেকে যজ্ঞপতি ঠাকুর মহাশয় সদলবলে ভাগলপুরে উপস্থিত হতেন। প্রতিমার সাজ, সোনা রূপোর ডাল, নূতন গুড় এবং ভাগলপুরে দুষ্প্রাপ্য অপরাপর সামগ্রী নিয়ে কলিকাতা থেকে আসতেন সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতা, আমাদের পিতৃব্য, স্বর্গীয় অক্ষয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়।

পূজার দিন চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমার সম্মুখভাগে ধূপ দীপ বিবিধ নৈবেদ্য, বড় বড় পুষ্পপাত্রে বিচিত্র বর্ণের পুষ্পরাশি এবং অপরাপর উপকরণের সোতার অপূর্ব শ্রীবারণ করত। ধূপধুনার গন্ধে ও ধূমে পূজা কক্ষ অলৌকিক মহিমায় আচ্ছন্ন হ'য়ে উঠত। দেবীর সম্মুখে আসন গ্রহণ করতেন প্রধান পুরোহিত, তাঁর বাম পার্শ্বে উপবেশন করতেন জন দুই তন্ত্রধারক; এবং তাঁদের পিছনে আসন পড়ত বিপ্রদাসবাবুর। আসন গ্রহণ করার পর বিপ্রদাস বাঙলায় কথা কওয়া বন্ধ করতেন। কোনো প্রয়োজন হ'লে সংস্কৃত ভাষায় 'হুং হো' ব'লে আমাদের ডাকতেন। এবং সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দিতেন। তাঁর এই বাঙলা ভাষা পরিত্যাগ ক'রে দেব-ভাষার আশ্রয় গ্রহণ দেখে আমাদের মনে প্রচুর সমীহ এবং প্রশংসার উদ্রেক হ'ত। সংস্কৃত ভাষায় আমরা উত্তর দিতে পারতাম না। কিন্তু বাঙলায় কথা কইলে পাছে গাঢ়নিবদ্ধ আবহাওয়ার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় সেই ভয়ে সাধ্য মতে বাঙলাও বলতাম না।

বিপ্রদাসের প্রধান কাজ পূজা অনুষ্ঠান যাতে সুপরিচালিত হয়, তদ্বিষয়ে চতুর্দিকে লক্ষ্য রাখা। লক্ষ্য রাখতেন তিনি চতুর্দিকেই কিন্তু কান রাখতেন পুরোহিত এবং তন্ত্রধারকদের দিকে। দৈবাৎ যদি মন্ত্রপাঠ বা কোনো বিধি-বিধান সম্পর্কে কুল ভ্রান্তি কিছু হোত, তা হ'লে আর রক্ষা থাকত না, আহত সর্পের ন্যায় বিপ্রদাস ফোঁস ক'রে উঠতেন, পুরোহিতদের সহিত তর্ক লেগে যেত। পণ্ডিত চূড়ামণি যজ্ঞপতি ঠাকুর মহাশয় বিপ্রদাসকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অদূরে আচার্যের বিশেষ আসনে উপবেশন ক'রে সকৌতুক আনন্দে তিনি পুরোহিতদের সহিত বিপ্রদাসের বিবাদ-বিতর্ক শুনতেন, এবং মীমাংসার জন্য কোনো পক্ষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'লে অধিকাংশ স্থলেই বিপ্রদাসের সপক্ষে রায় দিতেন। বিপ্রদাসের ভয়ে পুরোহিতেরা কাঁটা হ'য়ে কাজ চালাতেন। বিপ্রদাসের ব্যাকরণপ্রিয়তা সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ কাহিনী ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

বৈশাখ মাস, বেলা তখন এগারোটার কাছাকাছি। ভাগলপুরের প্রচণ্ড গরমে মালিক সরকার রোডে এক জরুরি পিয়ন একখানা খামের চিঠি নিয়ে হাজিরান হ'য়ে ঘুরছে। কে যে চিঠির মালিক, তা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বাঙালী ভদ্রলোক দেখলেই পিয়ন জিজ্ঞাসা করে, 'কহিয়ে তো বাবুজী মজ্জর চন্দর্ কৌন্ হৈ ?'

সকৌতূহলে ভদ্রলোক প্রশ্ন করে, "বাঙালী ?" "চট্টোপাধ্যায় বর হৈ তব বাঙালী তো জরুর হোবে"।"

পিয়নের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে প'ড়ে দেখে ভদ্রলোক বলে, "তাই ত! এ যে স্পষ্ট মজ্জরচন্দ্র! এমন নাম ত কস্মিন্ কালে শুনি নি।" তারপর পিয়নের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বলে, "মজ্জর মানে জানতা হ্যায়? মশা, মশা! যো কাটনেসে জাড়া বোখার হোতা হ্যায়। জঙ্গলমে খাও পতা মিলেগা।"

অত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পরিহাস পিয়নের ভাল লাগেনা, অন্যান্য লোককে সে জিজ্ঞাসা করে। সকলেরই মুখে কিন্তু একই ধরণের কথা,—কি জানি বাপু। এমন নাম ত' কখনো বাপের জন্মে শুনিনি!

হতাশ হয়ে পিয়ন 'নট ফাউণ্ড' (Not found) লিখে চিঠিখানা ফেরৎ দেবে স্থির ক'রে ফিরে চলেছিল, এমন সময় বিপরীত দিক থেকে নূতন দুটি বাঙালী ভদ্রলোককে আসতে দেখে সে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখবার মতলব করলে. "দেখিয়ে তো বাবু, ই মজ্জর্ চন্দর্ কৌন হৈ ?"

"মজ্জরচন্দর্? মজ্জর তো কীড়া হোতা হৈ। কাহা? দেখে ?" চিঠিখানা নিয়ে সবে মাত্র দুজনে বিস্মিত হ'তে আরম্ভ করেছে, এমন সময় দৈবক্রমে সেখানে শরৎচন্দ্র এসে উপস্থিত। ভদ্রলোক দুটিকে একটা চিঠি নিয়ে মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করতে দেখে কৌতূহলী হ'য়ে শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন,

"কি হয়েছে মশায় কার চিঠি ?"

"কে জানে কোন্ মজ্জর চন্দ্রের চিঠি। দেখনা তুমি ?" চিঠিখানা হাতে নিয়ে খামের উপর পরিচিত হস্তের মুক্তার মতো লেখা দেখামাত্র কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে শরৎচন্দ্রের মুখ দীপ্ত হ'য়ে উঠল। বললেন, "এ চিঠি আমার ছোটমামা লিখেছেন।"

"কে ? বিপ্রদাস !"

"হাঁ।"

"মজ্জরচন্দ্র কে হে ?"

"মজ্জরচন্দ্র নয় মজ্জরচন্দ্র।"

খামের উপর একবার দৃষ্টিপাত ক'রে ভদ্রলোক বললেন, "মজ্জরচন্দ্র নাকি ?—সর্বনাশ! তাই যা কে ?"

"আমি।"

"তুমি ? তার মানে ?"

স্মিতমুখে শরৎচন্দ্র বললেন. "ছোটমামা ব্যাকরণে একটু বেশী পাকা কিনা, তাই শ্রীমৎ আর শরৎচন্দ্র এই দুটি শব্দের সন্ধি করে শ্রীমজ্জরচন্দ্র করেছেন।"

মুহূর্তকাল কাটল সপুলক বিস্ময়ের স্তব্ধতায়। তারপর অট্টহাস্যের উদাত্ত রবে বাঙালীটোলার উত্ত প্ত রাজপথ চকিত হ'য়ে উঠল।

"পুরুষরা বলে আমি সমাজ ধ্বংস করে দিলেম : আমার মেয়েরা বলে ঠিক তার উল্টো। কত মেয়ের সঙ্গেই ত আমার পরিচয় আছে। তারা আমাকে আপনার লোকের চেয়েও আপনার ভাবে। তারা অসঙ্কোচে বলে যে আমার লেখা থেকে তারা অধঃপথে ত যায়-ই না, বরঞ্চ, সৎপথ পৃথিবীতে যদি কিছু থাকে ত তারই খোঁজ পায়।"

—শরৎচন্দ্র

রূপম্ দেহি

কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তেজচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন তেলিনীপাড়ার বাবুদের ষ্টেটের ম্যানেজার। যাঁরা জমিদারের নায়েব ছিলেন, তাঁদের কাজের দক্ষতা বা দাপট দুর্যুক্তের নামান্তর হয়ে পড়ায়, ক্রমে তাঁরা ম্যানেজার-সাহেব নামটি গ্রহণ করেন। এর চেয়ে ভদ্র ও সম্মানের ডাক নাকি আর নেই। এখন জমাদার, দর্দার সকলেই সাহেব সহযোগে ও নামটি নিয়েছে ও তাতে তৃপ্তি পেয়েছে।

আমাদের তেজবাবুর ইংরাজিতেও সখল কম ছিল না।

সুতরাং তিনি একেবারে নকল সাহেব ছিলেন না। যখন তখন however বলে বক্তব্য আরম্ভ ও শেষ করতেন। পরশ্রীকাতরেরা কিন্তু বিদ্বেষ বশতঃ বা স্বভাব দোষে বলাবলি করত—"ভাগ্যি হে ভাগ্যি, ম্যাট্রিক্ পাস করে যিছে মাথাটাই খারাপ করলুম, মিলল' কেবল কলের কেরানীগিরি। জানে তো 'বেগুনেই' তেল টানে কেন্ট—তেলিনীপাড়ার তেলটুকু চৌধুরীর জন্যেই ছিল", ইত্যাদি।

চৌধুরীমশাই ছিলেন কিন্তু ভদ্র-সজ্জন। কথায়, কাজে রূঢ়তা ছিল না, কর্তব্যে অবহেলা ছিল না, পূজা পাঠও নিয়মিত ছিল। গুরু-গুরুজনেরা কখনোও পিও বা জলাভাব অনুভব করেন নি। বিশিষ্ট ভদ্র হিন্দু ছিলেন। তবে—বাজনের ঘরে যার কাজ, তাকে বেদাগ পাওয়াটাও স্বাভাবিক বলা চলে না। ছেলের গুণধরবাবুর শালখানাও তার দু'কৌটার দাবী রাখে। অবশ্য কৌটার পরিমাণ সকলের সমান নয়। সেইখানেই ভাগ্যের তারতম্য।

প্রচলিত আছে—কোনো এক সময়ে কোন এক ভোজের সাধারণ পংক্তিতে, ভক্ত বৈষ্ণব বেচারাম দাদু বসে পড়েছিলেন। পরিবেশকের হুস্ ছিল না। পাঁঠার ঝোল দিতে দিতে সে চমকে অপরাধীর মত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বেচারাম তাকে অভয় দিয়ে বলেন—"শোনো, যে আপনি চলে আসছে, তার আসার আগ্রহকে কখনো নেই। সে টান তোমারও নয় আমারও নয়। তার জন্যেই তো সারা জীবন আশা করে' বসে আছি বাবা। এত ধ্যান জপ আর কিসের জন্যে? ওকে অবাধে আসতে দাও।" চৌধুরীমশাইও যা আপনে চলে আসে তাকে রোকেন না তাতেই তাঁর সৌভাগ্যোদয়। এই Short hand systemকে জমিদারবাবুরাও পছন্দ করেন—সম্মানও দেন। তাই তেজবাবুর খাতিরও যথেষ্ট।

তাঁর দুই ছেলে,—বড়টি প্রতাপ, ছোট—মলয়, উভয়েই শিক্ষিত। তারা On Principle 3rd yearটি ছুঁয়ে কলেজের বা মনেজের সম্পর্ক ছেড়ে দেয়। কারণ তাদের পড়া তো চাকরির জন্যে নয়—বাপ যে পাপের পথ মেরে রেখেছেন তাঁর নাম রাখতে ও বাকে B.A'র (?) বেসার পর্যায়ই বহন।

প্রতাপ তার বাপের ধারা সম্মান বজায় রাখতে ইংরেজি না মিশিয়ে কথা কয় না। বলে—যিছে সময় নষ্ট না করে' নিজের প্রকৃতির প্রতিধ্বনি শোনাই উচিত—Free will কে Scope দেওয়াই বুদ্ধির কাজ। লোকে নানা লাইনে যাতে অভিজ্ঞ হতে পারে, তাতে কেবল Jack হয়ে মরে। দেশের এখন দরকার অভিজ্ঞের নয় বিশেষজ্ঞের। কি বলিস মলয়?"

বিমর্ষমুখে মলয় বলে—"আমি আর কি বলব' দাদা! আমি শিল্প-রসজ্ঞিক, তাই arts course নিয়েছিলুম। আমি সুন্দরের পূজারী। ঋষিরা ধ্যানস্থ হয়ে তার মহিমাই বুঝেছিলেন ও আমাদের চণ্ডীর মত 'শক্তি-শাস্ত্রে'—তাই প্রথম নমস্কারই প্রার্থনা করে গেছেন—"রূপম্ দেহি"।—আর বাবা কিনা সেই ঋষিবাক্য উপেক্ষা করে' এমন এক কি এরে বাড়িতে ঢুকিয়েছেন যার সবার শ্রী বলে' কেনো

সম্পদই নেই—শাস্ত্রবাক্যের সাক্ষাৎ প্রতিবাদ—Fine arts এর পরিপন্থী। সে যে আমার সাধনপথে কতটা ক্ষতি করছে সেটা উপলব্ধি করবার সহানুভূতি কারো নেই। Fine arts চর্চ্চায় সে যে দুঃস্বপ্নের মত কাজ করে, সেটা কেউ ভাবেন না বোঝেনও না। আমি বলেওছিলুম, to help me—তাকে বিদায় করতে। বাবা বুঝলেন না—হাসলেন। বললেন "দেখচ" তো আজকাল লোক পাওয়া কিরূপ কঠিন, একটা না পেলে ওকে ছাড়াই কি করে? দুদিন পরে মা বললেন—"একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধপধপে কালাপেড়ে-পরা ঝি এসেছিল।" প্রথমেই বললে—"আগে থেকে বলাই ভালো—আমার অম্বলের অসুখ আছে মা—দুটো দুটো করে' পান না পেলে কাজ করতে পারব না কিন্তু—" তার সঙ্গে একটু টানও ছিল। ও বালাই যত কম থাকে। আমি পাঁচ বাড়ি বলে রেখেছি, লোক পাবেই। তবে কাঞ্চনের মত মানুষ মিলবে না—তাও বলছি শুনলে হাসে—"বাসন মাজা" কাজের মানুষের কদর! এদিকে ছেলের জীবন যে নিরর্থক হয় তাতে ক্ষতি নাই!"

প্রতাপ বললে "নামটি কিন্তু বেশ ছিল 'কাঞ্চন'।" বলে তিনি হাসলেন। মলয় বললে—"আমরা ওই প্রতিমাময় বাস্তু-শিল্পটি বোধকরি ইংরাজের আমলে শিখেছি ও তার উন্নতিও করেছি ও করছি। ওটি বৈশ্যধর্ম্মী—টাকি মিলে—মেকেলের জোরেই ওর জয়। আমাদের দেশে ভেলে, সাবানে, আর মেয়েদের নামে, এমন কি পুস্তকাদির নামেও ওর প্রভূত প্রভাব। তা যা থাকুক না কেনো—বোঝে কিন্তু গুণাকর! সাহিত্য সম্রাটকেও অনেকে ঠকিয়েছেন, দাদা।"

"সেটাও তো কম গুণ নয় ভাই।" "হাঁ—ঐ গুণটি আমাদের আছে। এখন তার উৎকর্ষ জন্য নামে শিক্ষিত সভ্যদের গর্ব্বের বস্তু হয়ে কমপিটিসনে কাজ করছে। করুক; আমি কিন্তু এবার অনেক খেটে তিনমাস কালিম-পংয়ে বসে, বিলেতের International Exhibitionএ একখানি পোট্রেট্ পাঠিয়েছি। আশা তো করি—নইলে ওই শেষ। ব্যাঘাতের মধ্যে মিছে আর নয়—"

তুমি ভেব না মলয়, ওর উপায় সহজেই হয়ে যাবে। কয়লার খনিতে মেয়েদের নাকি ভারি ডিমাণ্ড্। এতদিন ওদ্ধরে খেটে মরেছে, আমাদেরও তো কর্ত্তব্য আছে—ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি দেখ না। কুষ্মাণ্ডাপি কাঞ্চনম্ কথাটাও সার্থক হবে। বুদ্ধির ব্যবহার যদি না করলুম, লেখাপড়া করলুম কেনো! সপ্তাহখানেক সময় চাই, বড় ব্যস্ত আছি ভাই। একখানা নাটক লিখছি, তার রিহার্সেলও চলছে। এই শ্রীপঞ্চমীতে তোমায় তাইপো—পুষ্পভঞ্জের হাতেঘড়ি কিনা। সেই রাত্রেই অভিনয়—সময় আর নেই। অমন শুভদিন সহজে পাওয়াও যায় না।"

মলয় বললে—"কই তা তো জানতুম না দাদা। বিষয়টা কি, I mean—নাটকের প্রতিপাদ্য—"

"দেশের কথা কিছুই ভাব না দেখছি! স্বাধীনতা ছাড়া দেশের আর কোন অভাব আছে? তার গোড়ার কথা একটু সরল ও সহজ করে' ছেলেদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতে চাই। এখন থেকে বুঝুক। মুখমিষ্ট কথার আনন্দ নাড়ু বানিয়ে দিতে পারলে তারা লুফে নেবে।" খুব grand Idea, তাতে ঘড়ির পরই best time, clean slate এ দাগ চিরস্থায়ী হয়ে বসবে, একথা তো আপনার পূর্ব্বে কারো মাথায় আসতে দেখিনি! তরুণ না হতেই সব তরুণ হয়ে থাকবে। উদ্দেশ্য বহুৎ পরে রূপ পেলেই—মহিয়ান। কিন্তু রূপ ফোটার পথ ওই কাঞ্চন বেটী আমার মেরে রেখেছে যে—"

"ভাবিসনি—বিদিত্তি, ওকে বিদেয় করছি দেখ্ না। হাঁ সাহিত্যে তোর ইন্টে, বরাবর, আমার কেবল ধারে পড়ে—অর্থাৎ দেশের জন্যে। আজ সন্ধ্যের পর Hall ঘরে একবার আসিস, রিহার্সেলটা একবার জমে যাক।"

'যাব' বলে মলয় বিদায় নিলে।

মলয়ের আসতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছে। রিহার্সেলের তখন শেষ অবস্থা। 'Hall'টি বেশ বড়। ছোট বড়, নাবালক সাবালক—প্রায় ৩০ জন উপস্থিত। কাকে কাকে সিগারেটের পাত্র ও তার সদ্ব্যবহার। ষ্টাজের উপর মাথাগুঁজে প্রতাপ প্রম্ট করছেন।

দেখে মলয় অবাক। "সাত রাসভারী লোক, হঠ

বলাও চলে এসব তো তিনি কোনোদিন ভালবাসতেন না! নিশ্চয়ই মাথায় কিছু একটা ঢুকে থাকবে। বেয়াদবে কখনই তাঁর এ সব চাপত না।

দেখা হলে যারা রাস্তা ছেড়ে একপাশ দিয়ে সন্তর্পিত ভাবে সরে যেত আজ তারা এক কদমে আসরে বসে বেশ বেপরোয়া সিগারেট টানছে? একি? মনের দু'পা এগিয়েই কাট হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—ন যযৌ অবস্থা। "বাবার এ Hall সন্তানদের আহ্বান আপ্যায়নের জন্যে। সেখানে কিনা মতি সরদার ১৫ বছরের ছেলে কুতো উর্ধ্বমুখে সিগারেটের ধোঁ ছাড়ছে। একি!" মনের ইচ্ছাটা—পিছু হটে সরে পড়ে। বাপ কিন্তু আড়চোখে তাকে দেখে নিয়েছিলেন। বললেন "তোমার আসতে বড় দেরি হয়ে গেছে মনয়। আজকের রিহার্সেল খুব সাকসেসফুল? এরা এত সত্বর এত সুন্দর আবৃত্ত করে' নেবে তা আশা করিনি। জিনিষটা খুব clear করে' বুঝিয়ে দিয়েছি কিনা। বাঙালির ছেলে পারেনা কি। মিনিট পাঁচেক শুনলেই শেখ হয়ে যাবে—তাতেই তুমি Idea করে' নিতে পারবে।"

নিরুপায় মনয় বসে' পড়ল'। কাকনকে বিদায়ের যে দায়াই তার ভরসা!

অভিনয় চললো। রিহার্সেল শেষও হ'ল। প্রতাপ মনয়ের কাছে উঠে এসে জানতে চাইলে—"কেমন লাগলো?"

মনয় বললে—"মাটকের ডায়লগ্ খুব সুন্দর শুনলুম। এ সব নিয়ে চর্চা করলেন কবে। এবে একটা কঠিন আই—আমাকে আশ্চর্য্য করে' দিয়েছেন।"

প্রতাপ খুশি মুখে বললে—"শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদের কাছে কিছুই কঠিন নয় ভাই। মনয় হলেই তারা সব পারে। চলো রাত হয়েছে। কাকনকে বিদায় করতে আমার তিন দিনের বেশী লাগবে না। চলো—"

প্রতাপ বৈঠকখানায় বসে আরাম করে' তামাক টানতে টানতে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। বন্ধু যোগেশবাবুকে আসতে দেখে—"এসো এসো যোগেশ, বড় সময়েই এসেছ ভাই—বান্ধব একেই বলে, বিপদে ন তিষ্ঠতি। বড় বিপদে পড়েছি ভাই ৫৩ টাকা দিয়ে নতুন মোটরখানা কিনলুম কি করে গাড়াবার জন্যে! কোথায় তোমাদের মিছে—দেশের অবস্থা দেখে বেড়াব, যতটা পারি গ্রামের উন্নতির উপায় চিন্তা করব, কিন্তু এক কোঁটা পেট্রল পাবার পথ নেই—"

যোগেশবাবু হাসতে হাসতে বললেন—"তেল কোথা পাবে—এটা মহাযুদ্ধের মরসুম তেল ছাড়া কোনো যুদ্ধ কাজই হয় না। তার ফল কতো। শুনতে পাই ধরের বীজ ওই তেলের মধ্যেই। এটলান্টিককেও খানাতোবার মত করে দিয়েছে। যেখানটার মত যখন ইচ্ছে পার করে নেয়। শেষ না—যুদ্ধ শুরু আর দেরি নেই, অভিজ্ঞরা বলছেন—"সে হয়েই গেছে।'—তাহ' কেন?"

প্রতাপ বললেন—"বুদ্ধির ঢেঁকি তো তেল বড় নয়, বুঝিই তাকে বার করেছে। একটু ভেবে দেখো ভাই। কলকেতা থেকে অনেকেই মোটর হাঁকিয়ে আধপয়সার সুরমি শাক বাজরাদাঁড় দিয়ে কিনে আনছে। বাড়িতে কচি সজনে খাড়া খেতে চাইলে, গালনের হিসেব থাকে না। ভাসমডহারবার থেকে মোটরে চড়ে' আসে। তাতো দেখছো?"

যোগেশ বললেন—"সে যাক তোমার আমার রাজের নয়। তুমিও একটা সুপন্থা কিছু করে পড় না—যেমার কমিশনার যা হয়—কেউ করবে না! শুনছি হাতে ঘড়ির ঘিয়েটর বসিয়েছে—ওই এক ঘায়ারেই এগিয়ে পড় না। ইলেকসন তো সামনে; বলো আজি আমি 'Propose' করি।

তারপর উত্তরে অনেক কথা, পান তামাক চা।—"পেট্রলটা অমনি অমনি ভাঁকি দিয়ে না পেলে ভদ্রলোকের কিছুতেই চলে না ভাই। কিন্তু ভাইস চেয়ারম্যান না হলে যে—"

যোগেশবাবু বললেন—"আজকাল ছেলে ছোকরারা হাতে থাকলে দেহেই সব হয়ে যায় তারাই এ যুগের জনার্দন। যখিনলকে তুষ্ট থাকবে—বুঝেছ? দেখছ না গ্রামের শ্রী ফিরিয়ে দিয়েছে—সাতখানা বিড়ির দোকান বুড়িয়েরে চলছে। পাচজন মাপিতে কুলুচ্ছে না—কোনো

লোকদের ঘাড়ে নিত্য একবার করে ঝিপ্ ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে হয়। তারাই সকল দিক পুষ্ট রেখেছে—গ্রামের Motive Force—তাদের যখন তুষ্ট রেখছ, কিন্তু ভাবতে হবে না।"

প্রতাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—"আমার ডিফিকল্টিজ, তুমি জান না যোগেশ—মলয় Fine artsএর সেবক, সৌন্দর্য্যের পূজারী—চারু আর কারু নিয়ে থাকে সে কিন্তু ওদের দেখতে পারে না। ওদের চলাচলন, কথাবার্ত্তা, হাসি তাহাও সইতে পারে না। এক ক্লাসে বসে ছুতোরের ছেলে শিক্ষিত ভদ্র যুবকদের মাথায়, বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে ছিহি করে হাসবে, মর্য্যাদাজ্ঞান নেই, তাকে তুলে না দিয়ে, আলাদা দিতে হবে নাকি, ইত্যাদি সে অনেক কথা। আমাদের কি কাকনকে 'বশায় করবার ভার নিয়েছি বলেই সে চুপ করে আছে। এখন এই বিপদ থেকে যদি উদ্ধারের একটা উপায় করে দাও ভাই, তবেই সব করতে পারি আমাদের কাকন বলে, কিকে তুমি দেখেই থাকবে। মলয় ওকে এ বাড়িতে রাখতে চায় না, বলে তার কোনখানটায় ঐ সেই Artistএর সামনে ও Model সমূহ অভিকর। বন্ধের প্রভাব, অজান্তেই অনিষ্ট করে, সেটা সকলে বুঝবে না—expertরাই বোঝেন" ইত্যাদি। তাই সকলের আন্তরিক মতেই কাকনকে বিদায় করা হচ্ছে। এতদিন সে একাই এতবড় সংসার মাথায় করেছিল। অমন অক্লান্ত স্বভাবের কাজের লোক আর মিলবেও না।"

যোগেশ বাবু অবাক হয়ে থেকে বললেন—"কথাটা বুঝলুম না। ভালও লাগল না। মলয়কে সকলেই ভালবাসে—আমারও সে বিশেষ প্রিয়। কিন্তু সুন্দরের পূজারীর, এ কথাটা যে অত্যধিক অসুন্দর, rather অপরাধ।"

প্রতাপ। সায়েন্সের সিক্রেট বুঝি না ভাই। এখন তুমি একটী ঝি কি চাকর, না যোগাড় করে দিলে, সংসার অচল, সময়ে ভাত জুটবে না। পেট্রলের ব্যবস্থা মাঝরাস্তায় মারা যাবে।

"সেবেরটা আমি মলয়কে বুঝিয়ে রাজি করতে পারব, কিন্তু লোক মেলা কঠিন। তোমাদের ভাগ্যে লোক মিলতেও পারে। তাই তো বলছি—কমিশনার হলে অনেক সুবিধা এগিয়ে আসবে। হাঁ- ইলেকসনটা করে?" বলতে বলতে উঠলেন, এবং ভাবতে ভাবতে চললেন।

"ছুটি তাদের তুলনা খুঁজে পাই না—প্রতাপ চাপকান চড়িয়ে চাকরি করবে না; কিন্তু 'বাকরির' বহর মাথায় ওরা, তাকেই সে বুদ্ধির বাহাদুরী ভাবে। কমিশনার হয়ে Vice ধনতেই হবে, পেট্রলটা যিনি পয়সায় টানতেই হবে। তাই ফিয়েটের আকড়া বসিয়েছে। মলয় সত্যিই ভাল ছেলে, বংশমর্য্যাদা রক্ষার সজাগ। একটু ছিট, আছে বই কি—সেটাও অভিনব। কাকনকে বিদায়ের কারণটার বাঁধন খুঁজে পাই না, আমার কাছে নিরাকারই ঠ্যাকে।" ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে চললেন।

চৌরাস্তায়—মিহির, নরেশ, মলয় 'Statesman' খানা টানাটানি করে পড়ছে মলয় চিন্তামগ্নির মুখে বলছে—"দেখো—ছেড়ে না দেন ভাই—অনেক করে' ধরাধানেকের জন্যে চেয়ে এনেছি। ছেলেটিকে কিন্তু চিনতে পারছি না—অথচ পাশাপাশি বসে! তোমরা ঠাওরাতে পারলে কি? নিশ্চয়ই অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে—বরাবর স্কলকেতা থেকে পড়াশুনা করে থাকবে।" মিহির বললে "তা হলেও গোদোলপাড়ার ছেলেকে আমরা চিনব না—এমন হতেই পারে না।

তার আবার সে 'মোহনবাগানে'র সেণ্টার ফরোয়ার্ড ছিল।" "ওঃ সেই কালু!—হু' ফিট্ লম্বা, সুন্দর চেহারা। ওকেই তো কোন সাহেব বিলেত নিয়ে যান—ঐতেই আছে দেখ না! ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে আবার Fine arts—(Portrait Painting) এও First হয়েছে। তার 'এটনি ও ক্লিপেট্রা'—ইউরোপে আজ সর্ব্বত্র Table talk—আমেরিকা—original খানা কেনবার জন্যে বহু টাকা offer করেছে।—চলো, আজই বিকেলে তার খবর আনতে হবে।"

যোগেশবাবু বাড়ী যেতে যেতে যুবকদের জটলা দেখে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন ও তাদের কথা শুনছিলেন। সহসা বলে উঠলেন—"কি নাম বললে—"গোদোলপাড়ার কালীচরণ?" সকলে তাঁর দিকে সাগ্রহে ফিরে—"হাঁ, তাকে চেনেন নাকি?" "না—আমারও অত কাগজে দেখা। ঐ নামের

একটি ছেলে কিন্তু P. N. O. Steamers. গত্তায়-পুরে যাত্রা করেছে বিলেত To receive degree and honour—Personally—সব কথা আমার ঠিক্ ঠিক্ মনে নেই। তোমরা খোঁজটা নিও। যে রকম প্রশংসা দেখলুম—সে ছেলেকে সবাই চিনবে।"

নরেশ বললে—"নিশ্চয়ই যাব এবং আজি যাব। আমিও যে Portrait Lineএ interested—কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি বলয়ের নাম নেই দেখে। তার মত রূপ ফোটাতে কেউ পারে না। Experiরা বলেন—ও সম্বন্ধে সে অমনস্ক। সেও যে তার পেন্টিং পাঠিয়েছে—"

বলয় এগিয়ে এসে শুনছিল, বললে—"আমি ওর Secret জেনে তার ব্যবহার করতে শেখেছি কই। কালীচরণ আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে। খুঁটিয়ে দেখে ছবির রূপ বুঝতে হয় না, সে এক নজরেই পরিচয় দেয়। কালীচরণ দুটি বিভিন্ন দেশের দুটি প্রসিদ্ধ চরিত্রের Figure নিয়েছে—রোমের একটিনি আর মিশরের ক্লিওপেট্রা। ওরা দুটি ভিন্ন দেশকে represent করে। দুটিই নারীমূর্ত্তি, কিন্তু তাদের দেখলেই স্বতন্ত্রভাবে রোম আর মিশর দেখা হয়ে যায়, নচেৎ তা পট হল বইত নয়। আমার একটি মাত্র কিশোরে সে সুযোগ ছিল না, আমি চাতুর্য্যে তার কাছে হেরেছি। যাক সে অনেক কথা। বিষয় নির্বাচনেই তার বুদ্ধির পরিচয়—I congratulate him—তোমরা খোঁজ নিয়ে এসো, আমার আজ সময় হবে না ভাই, পরে যাবো।"

ছেলেরা গৌরদপাড়ায় গিয়ে, হতাশ হয়ে ফিরে এলো। কালীচরণের বাড়ি ঘর, পরিচয়াদি কেউ দিতে পারলে না। বয়স্কা স্ত্রীলোক—মাটির দেল দেয়া—ঘোড়ো চালা ঘর দেখিয়ে বললে—এই বাড়িতে কাঞ্চনমাসি থাকে। পাঁচুর বাড়ী দাসীবৃত্তি করে। তার ছেলের নামও কালীচরণ। কলকেতায় থেকে ছেলে পড়ায় আর নিজেও পড়াশুনা করে—শুনেছি। আহা—তার জন্যেই কাঞ্চনের দিনরাত খাটুনি, কোন দিন পথেই ঘুরে পড়ে' যাবে?

"চলো চলো মিছে সময় নষ্ট করা। দু'খানা ঘোড়ো চালা, আমাদের ম্যানেজার—বাড়ির কি কাঞ্চনের হতে পারে, তার ছেলের নাম কালীচরণও হতে পারে। আমাদের বেশে ও নামের তো অভাব নেই, কিন্তু আমরা আজ যার সন্ধানে এসেছি, সে কলকেতার কোনো সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে হবে। তাহলে না যোগেশ কাকার কাছে—সে বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গিয়ে, প্রতিভা বলে দু'কাজই পেয়েছে। সে কখনো কাঞ্চনের ঘোড়ো চালার কালীচরণ নয়।"—তারা হাসি তামাসা করতে করতে ফিরলো "তাকে বুঝুরে কামড়ায় কি যে—চলো।" বলয়ের বাপ—ম্যানেজার চৌধুরীমশাই ও মা জাহ্নবী দেবী; খুবই বিমর্ষ মুখে ধীরে ধীরে এক আধটি কথা কইছিলেন। সংসারে তাঁদের কিছুরই অভাব নেই, অথচ সুখও নেই। দু তিন দিন হ'ল কাঞ্চনকে বিদায় করা হয়েছে। বাড়ির যে একজনের মত' ছিল' আর তাকে অনুমতি নিয়ে সে বাড়িতে ঢুকতে হয়েছে! সে নীচের এক ধারে বসে চোখ মুছচে, কেউ তার মুখের দিকে চাইতে পারছেন না। কর্ত্তা অপরাধীর মত—কথা খুঁজে না পেয়ে, হেঁট মুখেই বললেন—"তোমাকে দু'তালো হয়নি কাঞ্চন। কয়েক মাস কাটিয়ে এসো। কাছারির সেরেস্তা থেকে কি মাসের পাঁচ তারিখে তোমার মাইনে নিয়ে যাবে। বলয়ের একটা কি বিশেষ কাজ আছে, ওই সময়ের মধ্যে সেটা করে নিতে চায়। ছেলেদের আবদার যাতেই হয়। তুমি দুঃখিত হয়ো না। তার কাজ লাগবে ঠিক বলতে পারছি না। তাই তোমার বাক্সটার ব্যবস্থা কি করবো জানাবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি। ওর মধ্যে তোমার কি আছে—কিছুই জানি না। তুমি বরং দেখে নিয়ে যাও।"

কাঞ্চন কাঁদতে লাগলো। বললে—"ছোটবাবুর কথা আমি জানতে চাই না। কিন্তু আমার কথা আপনাকে জানাতে চাই দিনরাত সেটা ভেবেছি—বলতে সাহস পাইনি। বছর বছর আমি নিত্য ছুটোছুটি করে ৪।৭ বাড়ী দাসীবৃত্তি করেছি, ২৩।২৪ বছর। ৪।৬ ঘণ্টার বেশী, খেতে শুতে সময় নিই নি, ছেলেটির একটা উপায়ের জন্যে। আশীর্বাদ করুন—"

চৌধুরীমশাই আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—"তোমার যে ছেলে আছে সে কথা তো কোনোদিন শুনিনি! কত বড়টি (জাহ্নবী দেবীর দিকে চেয়ে)। কি গো—তুমি দেখেছ।"

"না, এই তো শুনছি। কাঞ্চন তো কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আসে নি, দেখায়ও নি!"

চৌধুরীমশাই বললেন—"একা এতো খেটে মরেছে, আমি ওর ছেলেকে তো—তার মত' কোনো একটা কাজে লাগিয়ে রাখতে পারতুম—তাতে ওর কিছু আসান হোতো।" কাঞ্চন বললে—"বাবা, আপনাদের সেবাই করেছি, কখনো মনিব বলে' মনে করতে দেন নি, বাপ-মার কাছে আছি বলেই জেনেছি। কিন্তু একটা অপরাধ আমাকে সর্ব্বক্ষণ কষ্ট দিয়েছে, নিজের পরিচয় (আমাদের আর পরিচয় কি! নিজের কোনো কথা কোনো দিন বলবার সময় কি সাহস পাই নি বাবা। ছেলেও বলতে দিত না।

আপনি ঐ বাক্সের কথা তুললেন। আজ সেই কথাই বাপ-মাকে জানাতে চাই। কিন্তু সেটা আমার মরণ বাঁচনের মত' গোপন কথা। আর কেহ না শোনে বা প্রকাশ করে—দয়া করে' এই ভিক্ষাটি আমার রাখতে হবে। ভয় হয়, ছেলে জানলে, আমাদের দু'জনেরি ভবিষ্যৎ আর সুখের না থাকতে পারে। আমার আর ভবিষ্যৎ কি—তার সুখেই আমার সুখ। তা হ'তে বঞ্চিত হলে আমার যে সবই বৃথা, জীবনও—"

চৌধুরীমশাই তাড়াতাড়ি বললেন—"আর তোমাকে বলতে হবে না; আমাদেরো শুনে দরকার নেই। এখন বাক্সটা নিয়ে যাও।"

কাঞ্চন তাঁর স্নেহশূন্য কণ্ঠস্বর শুনে—স্তম্ভিত মুখে তাঁদের দিকে চেয়ে কেঁদে ফেললে, বললে—"বাবা, এ সংসারে মেয়েদের কোথাও কি প্রাণের দুঃখ জানাবার বা বিপদে সান্ত্বনা পাবার স্থান নেই! বাপ-মার কাছেও থাকবে না? ক্ষমা করবেন—যাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিনরাত কাজ করে' বাঁচতে আর বাঁচাতে হবে, ভগবান তাকে দয়া করে' আত্মরক্ষার উপায়ও দিয়েছেন—স্নেহ 'স্নেহ' দেন নি। মেয়েদের যা সবার বড় অস্ত্র। সতীত্ব এত বড় দান—এক তাতেই সম্ভব ছিল বাবা!"

চৌধুরীমশাই অপ্রতিভের মত অতিষ্ঠ ভাবে বললেন—"বলো বলো—কি বলছিলে বলো শুনছি। ও কথাটা তোমার মুখ থেকে শুনতে আমার বাধো বাধো ঠেকছিল কাঞ্চন। বলছিলে কি না—'ছেলে শুনলে, তোমাদের ভবিষ্যৎ আর সুখের থাকবে না'।"

"মাপ করুন বাবা, আমি নিজে শিক্ষিতা নই, গুছিয়ে সব কথা বলতে পারি না। আমাদের একটা সহজ কথার অর্থও পুরুষদের বোঝানো কঠিন হয়। মেয়েরা মা হয়ে, তার জীবন সার্থক হয়—ওই মা ডাকটি শুনলে। ওর মধ্যেই তার ভগবান, তার স্বর্গ—পূজা জপতপ সব ওর মধ্যেই। নিজের ভাগ্য ভালো নয়, তাই বলতে এত ইতস্তত আসে বাবা। ছেলে এখন জানবার হয়েছে। সব কথা শুনলে পাছে আমি আমার স্বর্গ হারাই—আমার অবস্থা আমার কাজ কর্ম দেখে 'মা' বলতে বাধে—তার জন্যে এখনো যে আমার অনেক কাজ বাকি, অনেক সাধ"—

চৌধুরীমশাই বললেন—"সে কি কথা, বলছ'—জানবার ছেলে—"

"দয়া করে' সবটুকু না শুনলে—আমার কথাটা যে বুঝতে পারবেন না বাবা। সে কথা কিন্তু আমার বাপ মার কাছেই থাকবে, আর কেউ জানবে না—"

চৌধুরীমশাই চিন্তিত ভাবে পত্নীর দিকে চেয়ে বললেন—"কি বল'গো—পারবে? বিশ্বাস ভঙ্গ, মহাপাপ—"

জাহ্নবী দেবী বললেন—"কিন্তু না শুনেও আমি আর থাকতে পারছি না, তুমি বলো কাঞ্চন। শোনা-শুনির সন্দেহ রেখো না।"

চৌধুরী পাকা লোক, হাসি মুখে অনুমতি দিলেন, বললেন—"ওটা তোমার কাঁচা কথা কাঞ্চন। আমরা কাকেও না বললেও তোমার বাক্স তোমার ছেলেকে বলবেই।—সেটা ভেবে দেখো—"

"সে একদিন হবেই বাবা, সে কথাও ভেবেছি। তবে আর ঘাটাই আমার ভাগ্যলিপি। অদৃষ্টকে আর কে রুখবে।

তারপর—যিনি সকলের—আমারো তিনিই আছেন, তবে তাঁর 'দয়াময়' নাম আছে। আমি আর ভাবতে পারি নি বাবা। যতটুকু পারি বলে রাখি—"আমাদের বাড়ী দুমুরদহে—আমরা কায়স্থ।

পাশের বাড়িতে আর একঘর কায়েস্থরা থাকতেন। তাঁদের বড়বউ বিরাজ ছিল আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ঘনিষ্ঠ-ভাবে আমাদের নিত্য মেলামেশা ছিল। আমার যখন কপাল পুড়লো—স্বামী-পুত্র হারালুম - সেই আমাকে দেখতো শুনতো। তার সাহায্যেই ক'বছর কাটে, তিন বলে জানতে দেয়নি। আমি চরকা কেটে যতটুকু পারতুম করতুম। কিন্তু ভাগ্য ভাঙলে যা হয়—তাবেও আমার তাই ঘটলো—স্বামী একদিন কলেরা হয়ে মারা গেল। বিরাজ তখন পূর্ণ-গর্ভা। ভাগ্যবতীকেও সেই রোগই ধরে। সেই অবস্থায় তার একটি ছেলে হয়। তার পর সময়ে সেই ছেড়ে যাবার শিশুটিকে আমার কোলে দিয়ে আর ঐ বাক্সটি দিয়ে বলে' যায়—এই অনাথ যদি বাঁচে—এইতেই ওর সব রইল। যদি পার, তোমাদের কষ্ট খাকবে না। ও তোমার ছেলে, তোমারি রইল ভাই। প্রাণপণ চেষ্টা পাবে ওকে নিতে বিষধারি চৌকি দিতে ছেলে আর ওই বাক্সটি দুই সমান জেনো। এখানে একদিনও থেক না, তাতে জাতিদের হাত থেকে ছেলেকেও বাঁচাতে পারবে না, বাক্সকেও নয়।

তারা বিদেশে থাকে, শুনলেই এসে পড়বে। নগদ টাকা বেশী নেই, দরকার মত খরচ কোরো চললুম। সে চলে গেল, আমি অকূলে পড়লুম। তার কাজ সেরে, ঘরে চাবি দিয়ে—বিষ্ণুপুরে মামার বাড়ি যাচ্ছি বলে, ছেলে নিয়ে কলকেতায় চলে যাই। তারপর অনেক কিছু। শেষ—

"বেলুড় মঠের শরৎ মহারাজের সাহায্যে ছেলের ব্যবস্থা করি। সেই দেবতাকে না পেলে—ছেলেকে বাঁচাতে ও নিজেও বাঁচতে পারতুম না। অনেক ভেবে শেষে দাসীবৃত্তি স্বীকার করি। মহারাজের উপদেশ মত কয় বৎসর কাটে, তিনিই কালীচরণকে স্কুলে দেওয়ান। তার বুদ্ধি ও স্বভাব দেখে—তিনি পড়বার ব্যবস্থা করে দেন। ম্যাট্রিক পাস করে' সে ১৪ টাকা জলপানী পায়। জলপানী সে যখন পেয়েছে B. Sc. পর্যন্ত। তিন-চার বাড়ি দাসীবৃত্তি করে' আমিও তিরিশ টাকা পেতুম—নিজে ৯৲ টাকায় চালাতুম, আর তার কাপড়, জামা, জুতো, বই, জলখাবারে খরচ করতুম—সে কষ্ট না পায়। শেষ মহারাজ তাকে এক সাহেবের সঙ্গে বিলেত পাঠিয়ে দেবার পর রেহাই পাই। আমি আবার অন্ধকার দেখলুম। এখন বাক্স রাখি কোথায় —কখনো খুলি নি—তাতে কি আছে জানি না।

"মহারাজের একজন বয়স্থা শিষ্যাকে পাই, তিনি কিছু কিছু শুনেও ছিলেন, বললেন—"ঐ বাক্সই তোমার শত্রু, কলকেতা নিরাপদ স্থান নয়। আজকাল কি-চাকর পাওয়া যায় না, যেখানে থাকবে, পাচবাড়ি কাজ করতে পারবে। তুমি চন্দননগরের দিকে যেতে চাও তো আমি একজন সাধুসজ্জনকে বলে দিতে পারি, তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।"—তাই করলুম। কোনোটিই আমার মত স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সবই করেছি বাবা—কে করিয়েছে, কোথা থেকে বল এসেছে জানি না। সেই সাধুপুরুষের দয়ায় ৪।৫ বাড়ি কাজও পেলুম। মাস গেলে কালীচরণের অনেক টাকা দরকার—বিদেশে থাকে। কে দেবে? আরো দু'বাড়ি যাতালুম। শরীর আর বয় না। কিন্তু চাইও—ছেলে বিদেশে—বন্ধু—কার মুখ চাইবে। এক ঘণ্টা চরকা কাটায় দিলুম, নিজের জন্য চারঘণ্টা রাখলুম। শোবার আগে ভগবানের কাছে কেঁদে বলি—প রছি না যে, বল্ দাও দয়াময়—"

"সেই সময়ে তিনিই আপনাকে দিলেন. বাক্স রাখবার উপায় হ'ল, দুর্ভাবনা থেকে বাঁচলুম। ভেবেছিলুম নিতান্ত কারে না পড়লে বিরাজের ওই বাক্সে হাত দেব না—দিইও নি। ও সব কালীর। শরীর যায়—বাবা তাকে দেবেন।"

"সেলো দু'মাস আগেকার কথা। এ বাড়ীর কাজ সেরে রাত ৯টার পর নিজের কুঁড়ের ফিরছি, বাড়ির কাছাকাছি হয়েছি, শুনলুম—কে যেন বললে—"মা, আমি কালী।"—ভয়ে চমকে যাই—কেঁপে উঠি। কোট পেন্টুন পরা কিনা! তার পরই প্রণাম করলে।—"ভয় পেয়েছ নাকি, ঘরে চলো মা, সব বলছি গোল ক'র না—কেউ না

জানতে পারে।" তারপর অনেক কথা—"আমি ইভিনিয়ার হয়েছি মা।" তারপর হাসে আর বলে—"একখানা ছবি এঁকেও খুব নাম পেয়েছি বোধ করি টাকাও অনেক পাব। সেটা টাকার দেশ মা, আমরাই এখানে খেতে পাই না।" রাত্তিরটে কোথা দিয়ে কেটে গেল জানি না, তার কথা আর ফুরয় না। সব কথার পরে—"তুমি আর অতো খেট না মা, শরীর যে গেছে।" আর কিছু বলে না—ভাবে।

"নিজে কলকেতায় গিয়ে রইল, বললে—"কখন কি আদেশ আসবে—জানতে পারব না।" মাসখানেকের মধ্যেই তার জরুরী তার পড়ায় আবার তাকে বিলেত যেতে হয়েছে। এবার এলেই—" বলে থেমে গেল। ঢোক গিলে বললে—"দু'বাড়িতে বসন মাজি, কিন্তু এই ছিল আমার বাপের বাড়ি। এখানে বাপ-মা পেয়েছি, শান্তি পেয়েছি, ভায়েদের পেয়ে বল পেয়েছি। আজ সে বল আমার কোথায় গেল?" বলে' চেষ্টা করে' কান্না চাপতে সশব্দে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস বেন ফেটে বেরুল—"আর যে আমি বল পাচ্ছি না গো—আর যে আমি কালীকে—" বলতে বলতে কাঞ্চন ভেঙে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গেই মলয় ছুটে এসে ঘরে ঢুকলো। সকলে চমকে—নির্বাক।—"ছেলেরা কতো অপরাধ করে, মা 'ক্ষমা করে' থাকেন—তুমি আমাকে মাপ করো মা। অন্ধ ছিলুম, আজ আমি মায়ের রূপ দেখতে পেয়েছি। 'রূপম্ দেহি'র অর্থ আমি বুঝিনি—তুমি বুঝিয়ে দিলে মা। চর্মের প্রভাকেই রূপ বলে' বুঝতুম—অন্তরের ঐশ্বর্য্য দেখবার চক্ষু ছিল না, তোমার কাছে পেলুম। ছেলেকে ক্ষমা করো—ক্ষমা দাও—তুমি এই বাড়িতেই থাকবে, এ তোমার বাড়ি। আমাকে ত্যাগ কর' না—কালীচরণ আমার ছোট ভাই।

—"আমার শান্তি ছিল না। আমি পাশের ঘরেই ছিলুম্, সকল কথাই শুনেছি। ভগবান ভিন্ন সে কথা আর কেউ শুনবে না মা, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। ছেলের এই আবদারটি মাকে রাখতেই হবে, নইলে আমার জীবন চির অসুখের হয়ে থাকবে—আমি অপরাধী।"

কাঞ্চন অসম্বিত। স্তব্ধ নিস্তব্ধ সকলের অন্তরেই মলয়ের কথায় তখন ব্যথার ঝড় উঠেছে···সে ঝড়ের আওয়াজে আর কিছু শোনা যায় না···।

গঙ্গামণ্ডলের তালুক বিকিয়ে যাওয়া।

একটা অস্তিত্বহীন কল্পিতনামা তালুক ঋণের দায়ে বিক্রয় হইয়া যাওয়া। কিন্তুমাত্র ক্ষতি না হওয়া।

"আমার শরীর যখন এত খারাপ, রান্না করতে পারছিনা, তখন একটা রাঁধুনি আর দিন কতকের জন্য রাখতে পারনা? কত আর খরচ পড়বে? তাতে কি আর তোমার গঙ্গামণ্ডলের তালুক বিকিয়ে যাবে?

ভাল বাসা

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধের হিড়িকে বোম্বাই সহরে বাঙালী অনেক বাড়িয়াছে। আগে যত ছিল তাহার প্রায় চতুর্গুণ। তিন বছর আগেও বোম্বাইয়ের পথেঘাটে গুজরাতি-মারাঠী-পার্সী-পোর্তুগীজ মিশ্রিত জনারণ্যে হঠাৎ একটি সিঁদুর-পরা বাঙালী মেয়ে বা ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা পুরুষ দেখিলে মন পুলকিত হইয়া উঠিত, ডাকিয়া কথা বলিবার ইচ্ছা হইত। এখন আর সেদিন নাই। এখন পথে পথে হাফ্‌প্যাণ্ট-পরা দ্রুতসঞ্চারী বাঙালী যুবকের সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি হইয়া যায়। যাঁহারা স্থায়ী বাসিন্দা, তাঁহারা পূর্ববৎ সহরের উত্তরাঞ্চলে খানিকটা স্থানে বাঙালীপাড়া তৈয়ার করিয়া বাস করিতেছেন; নূতন আমদানী যাহারা, তাহারা সহরের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কে কোথায় কি ভাবে থাকে তাহার ঠিকানা করা কঠিন। তাহারা যুদ্ধের জোয়ারে ভাসিয়া আসিয়াছে, যখন যুদ্ধ শেষ হইবে তখন আবার ভাটার টানে বাংলাদেশের বিপুল গর্ভে ফিরিয়া যাইবে। গত সাত বৎসর যাবৎ আমিও এ-প্রদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়া পড়িয়াছি। তবে আমি বোম্বাই সহরের সীমানায় থাকি না; বেশী দূর নয়, মাত্র আঠারো মাইল। বাড়িটা ভাল এবং পাড়াটা নিরিবিলি: ইলেকট্রিক ট্রেণের কল্যাণে অল্প সময়ের মধ্যে সহরে পৌঁছানো যায়। কোনও হাঙ্গামা নাই; সহরে থাকার সুখ ও পাড়াগাঁয়ে থাকার শান্তি দুই-ই এক সঙ্গে ভোগ করি। বন্ধুরা হিংসা করেন—কিন্তু সে থাক। এটা আমার কাহিনী নয়, খেঁচুর উপাখ্যান। মাস কয়েক আগে একটা কাজে সহরে গিয়াছিলাম। গিরগাঁও অঞ্চলের জনাকীর্ণ ফুটপাত দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখি—খেঁচু! বিকেলবেলার পড়ন্ত রৌদ্রে খাকি হাফ্‌-প্যাণ্ট ও হাফ্‌সার্ট-পরা রুক্ষকায় ছোকরাকে দেখিয়া চিনিতে বিলম্ব হইল না—আমাদের খেঁচুই বটে। তাহার চেহারাখানা এমন কিছু অসাধারণ নয় কিন্তু অমন সজারুর মত খোঁচা খোঁচা চুল এবং ডিমকোণা কান আর কাহারও হইতে পারে না। খেঁচুকে ছেলেবেলা হইতেই চিনি। আমাদের গাঁয়ের ছেলে—বিষ্টু মাইতির ভাইপো। এখন বয়স ষোলছয় উনিশ-কুড়ি দাঁড়াইয়াছে। যখন তাহাকে শেষ দেখি তখন সে গাঁয়ের মিডল্‌ স্কুলে পড়িত এবং ভাং গুলি খেলিত। চেহারা কিছুই বদলায় নাই, কেবল একটু ঢ্যাঙা হইয়াছে। এই ছেলেটা বাংলা দেশের অত পাড়াগাঁয়ের একটি পঙ্কিল পানাপুকুরের অতি ক্ষুদ্র পুঁটিমাছেরই মত ছিল এক টানে একেবারে বোম্বাইয়ের গুরুনা ভাঙায় আসিয়া পড়িয়াছে। বলিলাম—'আরে খেঁচু! তুই!'

খেঁচু একটা ইরাণী হোটেল হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইতেছিল, আমাকে ডাক শুনিয়া ক্ষণকাল বুদ্ধিভ্রষ্টের মত তাকাইয়া রহিল; তারপর লাফাইয়া আসিয়া এক খামচা পায়ের ধুলা লইল—'বড়কর্তা'।

তাহার আনন্দবিহ্বলতার বর্ণনা করা কঠিন। হুরানো সুদূরছায়া অচেনা পথের মাঝখানে হঠাৎ প্রভুকে দেখিতে পাইলে যেমন অসম্ভব আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠে, খেঁচুও তেমনি আমাকে পাইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল—কি বলিবে কি করিবে কিছুই যেন ভাবিয়া পায় না। সে সামান্য একটু তোৎলা, কিন্তু এখন তাহার কথা পদে পদে আটকাইয়া যাইতে লাগিল 'হাঃ আশ্চর্য্য! আপনি কী করে আমাকে দেখে ফেললেন? আমিও আপনার ঠিকানা লিখে এনেছিলুম, কিন্তু কাগজের চিলতেটা কোথায় হাঃ হারিয়ে গেল। আর কী করে খোঁজ নেব? কেউ একটা কথা বুঝতে পারে না, কিড়ির মিড়ির করে কী বলে আমিও বুঝতে পারি না—এসে অবধি একটা

বাঙালীর মুখ দেখিনি। তাঁ ভালো দেখা হয়ে গেল— নৈলে তো—' নিজের কাজ ফেলিয়া ফুটপাথে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত অনেকটা কথাবার্তা বলিলাম। ছেলেটা ভালমানুষ, তাহার উপর বলিতে গেলে এই প্রথম পাড়া-গাঁয়ের বাহিরে পা বাড়াইয়াছে। নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে করিতে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। দিন সাতেক হইল সে বোম্বাই আসিয়াছে, আসিয়াই কোন এক দূর সম্পর্কিত কারখানায় যোগ দিয়াছে। একটা মাথা গুঁজিবার আস্তানা খুঁজিতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছিল, শেষে এক মারাঠী সহকর্মীর কৃপায় একটা চৌলে একটা খোলি পাইয়াছে সেইখানেই থাকে এবং চৌলের নীচের তলায় একটি নিরামিষ হোটেলে খায়। এখানে আসিয়া অবধি মাছের মুখ দেখি নাই, কেবল ডাল কটি আর তেল-কুচোর তরকারি খাইয়া তাহার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। বর্ণনা শেষ করিয়া খেঁচু সচকিতনেত্রে বলিল— বটুকদা, এদেশের রান্না মুখে দিতে পারি না। খাবারের দিকে যখন তাকাই প্রাণটা হু হু ক'রে ওঠে। অন্য কিছু নয়, দুটি ভাত আর মাছের ঝোল যদি পেতুম—' বলিলাম—'সে না হয় ক্রমে স'য়ে যাবে। কিন্তু তুই যে এখানে একটা মাথা গোঁজবার জায়গা পেয়েছিস এই ভাগ্যি। আজকাল তাই কেউ পায় না।' খেঁচু বলিল—'মাথা গোঁজবার জায়গা যদি স্বচক্ষে দেখেন বটুকদা, তাহলে আপনারও ভাগ্য পাবে। আসবেন —দেখবেন? বেশী দূর নয়, ঐ মোড়টা ঘুরেই—' খেঁচুর সঙ্গে তাহার বাসা দেখিতে গেলাম। প্রকাণ্ড একখানা চারতলা বাড়ি, তাহার আপাদমস্তক পায়রার খোপের মত ছোট ছোট কুঠরী বা খোলি। প্রত্যেক কুঠরীতে একটি করিয়া মধ্যবিত্ত পরিবার; সেই একটা ঘরের মধ্যে শয়ন, রান্না সব কিছুই সম্পাদিত হয়। ইহাই বোম্বাইয়ের চৌল। এক একটা বড় চৌলে শতাধিক ভদ্র দরিদ্র পরিবার কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া বৎসরের পর বৎসর বাস করে। এইটুকু পরিসরের অধিক বাসস্থান পাওয়া যায় না, বোধ করি প্রয়োজনও মনে করে না। খেঁচুর খোলি চৌলের চার-তলায়। তিনপ্রস্থ অন্ধকার সিঁড়ি ভাঙিয়া লম্বা সঙ্কীর্ণ বারান্দা ওপ্রান্ত পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহারই দুই পাশে সারি সারি ঘরের দরজা। বারান্দায় অসংখ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছে, চীৎকার করিতেছে, কুস্তি করিতেছে। প্রত্যেকটি ঘরের কাছে একটি দুইটি স্ত্রীলোক মেঝেয় বসিয়া গম বা ডাল বাছিতেছে, নিজেদের মধ্যে হাসিতেছে গল্প করিতেছে। অপরিচিত আগন্তুক কেহ আসিলে ক্ষণেক নিঃসৃহ চক্ষে চাহিয়া দেখিয়া আবার ডাল বাছায় মন দিতেছে। বারান্দার এক প্রান্তে খেঁচুর ঘর। দেখিলাম, ঘরটি আদৌ ঘর ছিল না, বাল্‌কনি ছিল। ঘরের চারিদিক বাঁশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান গৃহস্বামী স্থানটি তক্তা দিয়া ঘিরিয়া সম্মুখে একটি দরজা বসাইয়া রীতিমত ঘর বানাইয়া ভাড়া দিতেছেন। ভিতরটি দেশলাইয়ের বাক্সের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। খেঁচুর একটি তোরঙ্গ ও গুটানো বিছানাতেই তাহার অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে। খেঁচু বলিল, 'দেখছেন তো! দরজা বন্ধ করলে ঘর বন্ধ হয়ে যায়, আর খুলে রাখলে মনে হয় হাঃ হাটের মধ্যেখানে বসে আছি। সাতদিন হয়েছি, একটি লোকের সঙ্গে মুখ-চেনাচিনি হয় নি। কেউ ডেকে কথা কয় না; আর কী বা কথা কইবে? বুঝতে পারলে তো! ইংরিজিও কেউ বোঝে না, সব দাক্ষিণাত্যের গোমড়া। বলুন তো, এমন করে মানুষ বাঁচতে পারে? কেন যে মরতে চাকরি করতে এসেছিলুম! এক এক সময় ছোড় হয়, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যাই। কিন্তু পালাবার কি জো আছে—লড়াইয়ের চাকরি—ধরলেই জেলে পুরে দেবে—' ছেলেটার কথা শুনিয়া বড় মায়া হইল; বলিলাম, 'চল্ খেঁচু তুই আমার বাড়ীতে থাকবি। আমার একটা কামরা ঘর আছে—হাত-পা ছড়িয়ে থাকতে পারবি। আর কিছু না হোক, তোর বৌদির রান্না ভালভাত তো দুবেলা পেটে পড়বে।' আহ্লাদে খেঁচু নাচিয়া উঠিলেও শেষ পর্যন্ত বিবেচনা করিয়া দেখা গেল ব্যবস্থাটা খুব কার্যকরী নয়। খেঁচুকে সকাল আটটার মধ্যে কারখানায় হাজিরা দিতে হয়। এক ঘণ্টা ট্রেনে আসিয়া তারপর আরো আধ ঘণ্টা পায়ে হাঁটিয়া ঠিক আটটার সময় প্রত্যহ কারখানায় হাজির হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর মনে হইল না। খেঁচু দুঃখিত ভাবে বলিল—'আমার কপালে নেই তো কী করবে! কিন্তু

বটুকদা, এখানে আর পারছি না। আপনি অন্য কোথায় একটা ভাল বাসা দেখে দিন—যেখানে দুসকাল বিকেল দুটো বাংলা কথা শুনতে পাই—আর যদি মাঝে মাঝে দুটি মাছের ঝোল ভাত পাওয়া যায়—'। আমি বলিলাম—'চেষ্টা করব। কিন্তু আজকাল ভাল বাসা পাওয়া তো সহজ কথা নয়। যদি বা একটা ভদ্রলোকের মত ঘর পাওয়া যায় তার ভাড়া হয় তো পনেরো টাকা কিন্তু পাগড়ী দিতে হবে দেড় হাজার।' ঘেঁচু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—'পাগড়ী?' হ্যাঁ, হ্যাঁ পাগড়ী যাকে বলে লোকের ওপর বিশেষ জোড়া। সেলামী আর কি! গভর্মেণ্ট আইন করে দিয়েছে বাড়ীওয়ালা ভাড়া বাড়াতে পারবে না, তাই রসিদ না দিয়ে মোটা টাকা গোড়াতেই আদায় করে নেয়। এ তো আর ছেলেভুলো বাঙালী বুদ্ধি নয়—শুদ্ধবুদ্ধি বুদ্ধি ঘেঁচু বলিল—'ও বাবা, অত টাকা কোথায় পাব। মাইনে তো পাই কুড়ি—বলিলাম 'না না, সে তোকে ভাবতে হবে না। বাসা যদি যোগাড় করতে পারি, বিনা পাগড়ীতেই পাবি। চেষ্টা করব বলারে, মানে বাঙালী পাড়ার তোর ভাগ্যে থাকে তো এক-আধটা ঘর পেলেও পেতে পারি। কিন্তু তুই ভরসা রাখিস নে, মনে ভেবে রাখ এখানেই তোকে থাকতে হবে। আর একটা কথা বলি, যখন এদেশে এসেছিস তখন এদেশের ভাষাও শিখতে আরম্ভ কর। নৈলে এ ভাবে কদিন চালাবি? কাতর ভাবে ঘেঁচু বলিল—"সে তো ঠিক কথা বটুকদা, কিন্তু ও কিচির মিচির ভাষা কি শিখতে পারব? তাহা শুনলে মনে হয় ছাদ কড়াই খাতে ফেলে চিবচ্ছে—'। বলিলাম - 'নতুন নতুন অমনি মনে হয় —ক্রমে সয়ে যাবে। কথায় বলে যদ্দিন বেঁচে থাকাচারঃ।' নিরপরাধ আসামী যেভাবে ফাঁসির আজ্ঞা গ্রহণ করে তেমনি ভাবে ঘেঁচু বলিল—'বেশ আপনি যখন বলছেন—'। সেদিন ঘেঁচুকে তাহার কোঠরে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলাম। স্থির করিলাম অবকাশ পাইলেই দাদারে গিয়া তাহার জন্য ভাল বাসার খোঁজ করিব। সেখানে অনেক ভদ্রলোক আছেন, তাঁহাদেরই কাহারও পরিবার একটি আলাদা ঘর ও দুইটি মাছের ঝোল ভাত জোগাড় করা বোধ করি একেবারে অসম্ভব হইবে না। তারপর আঠারো কাঠে পড়িয়া ঘেঁচুর কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মনে পড়িল প্রায় দুহপ্তা পরে। বেচারা নির্বান্ধব পুরীতে তেলেভুচার তরকারি খাইয়া কত কষ্টই না পাইতেছে এবং অসহায় ভাবে আমার পথ চাহিয়া আছে অনুতপ্ত মনে সেদিনই সন্ধ্যাবেলা দাদারে গেলাম। ঘেঁচুর কপাল ভাল: দুই-এক জনের সঙ্গে কথা কহিয়াই খবর পাইলাম, একটি ভদ্রলোকের বাসায় একটি ঘর শীঘ্রই খালি হইবার সম্ভাবনা আছে—যে বৈজ্ঞানিক অভিধিটি ঘর দখল করিয়া আছেন তিনি নাকি শীঘ্রই বদলি হইয়া চলিয়া যাইবেন। তৎক্ষণাৎ গিয়া ভদ্রলোককে ধরিলাম। সনির্বন্ধ অনুরোধ বিফল হইল না। বৈজ্ঞানিক অতিথিটির চলিয়া যাইতে এখন দশ-দুই দেরি আছে, কিন্তু তিনি বিদায় হইলেই ঘেঁচু তাঁহার স্থান অধিকার করিবে, এ ব্যবস্থা পাকা হইয়া গেল। ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া উঠিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম ঘেঁচুকে সুখবরটা দিয়া যাই, সে আশায় বুক বাঁধিয়া এই কটা দিন কাটাইয়া দিবে। ঘেঁচুর ডেরায় পৌঁছিতে রাত্রি হইয়া গেল। তাহার কোটরে প্রবেশ করিয়া দেখি সে মেজের বিছানা পাতিয়া বসিয়া পরম মনোযোগের সহিত একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া আনন্দে উঠিয়া দাঁড়াইল, 'বটুকদা, আপনি বলে গিছলেন, এই অদ্দিন মারাঠি প্রথম ভাগ আরম্ভ করেছি। বাপ্, এর নাম কি ভাষা, স্রেফ্ পাথর আর ইটপাটকেল। ঃ হুঙ্কারণ করতে গিয়ে চোখ ঠিকরে বেড়িয়ে আসে। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা; যখন ধরেছি। হয় এস্পার নয় ওস্পার।' হাসিয়া বলিলাম—'বেশ বেশ! কিন্তু শিখছিস কার কাছে? শুধু বই থেকে তো শেখা যায় না।" ঘেঁচু বলিল—"সে জোগাড় হয়েছে। ওপরতলার ঘরে থাকে—বয়টয়া ও বলে একজন মারাঠি। বেশ ভদ্রলোক, আমার চেয়ে দু-চার বছরের বড় হবে; একটু আধটু হিঃ ইংরিজি বলতে পারে—সেই দেখাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের Translation পড়েছে কিনা বাঙালীর ওপর ভারি ভক্তি। রবীন্দ্রনাথ, আর কিছু না হোক, বাঙালীর জন্য ঐটুকু করিয়া গিয়াছেন, বিদেশে তাঁহার স্বজাতি বলিয়া পরিচয় দিলে খাতির পাওয়া যায়।—যা হোক, ঘেঁচুকে বাসার খবর দিয়া তাহার সংবাদ—কোল ভাত সম্ভোগের

আমার সম্ভবমত আশ্বাস জানাইলাম। সে আহ্লাদে এতই তোৎলা হইয়া গেল যে তাহার একটা কথাও বোঝা গেল না। অতঃপর সে—রাস্তে বাড়ি ফিরিলাম। দু'দিন পরে দাদারের ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, বাসা খালি হইয়াছে, এখন খেঁচু ইচ্ছা করিলেই তাহা দখল করিতে পারে। আবার খেঁচুর কাছে গেলাম। তাহাকে তাহার নূতন বাসায় অধিষ্ঠিত করিয়া তবে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিব।

সন্ধ্যার পর বাড়ি জমিয়াছিল। খেঁচুর ঘরের কাছে পৌঁছিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। ঘরের মধ্যে বেশ একটি ছোটখাট মজলিশ বসিয়া গিয়াছে। মেঝের পাতা বিছানার উপর চা এবং এক থাল চিঁড়া চিনাবাদাম ভাজা (এদেশের ভাষায় 'ভাজিতা') লইয়াই ঘিরিয়া বসিয়াছে খেঁচু এবং একটি মহারাষ্ট্রী মিথুন। পুরুষটি বেঁটে নিরেট ধরনের চেহারা, বুদ্ধিমানের মত মুখ। মহিলাটি কুঙ্কুমচিহ্নিত ললাট, আঁটসাট করিয়া হাত পাড়া পরা একটি স্নিগ্ধ কমনকান্তি যুবতী। চা পান, 'ভাজিতা'ভক্ষণ ও হাস্যকৌতুকের ফাঁকে ফাঁকে তাহার শিক্ষা চলিতেছে। আর, একটি হাফ-প্যান্ট ও হাতকাটা গেঞ্জি পরিহিত দুইবছরের বালক আপন মনে ঘরময় লাফাইয়া বেড়াইতেছে। আমাকে দেখিতে পাইয়া খেঁচু একটু সলজ্জভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর বন্ধুদের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল।

এই যে আন্নন বটুকদা। ইনি হলেন গিয়ে বেডটরাও পাটিল, যার কথা আপনাকে বলেছিলুম। আর ইনি হচ্ছেন ওঁর স্ত্রী হংসাবাই। আর ঐযে দেখছেন ছোট মানুষটি হচ্ছেন এঁদের ছেলে।'

নবপরিচিতদের সহিত নমস্কার বিনিময় করিয়া বিছানার এক পাশে বসিলাম। যুবকটি একটু গম্ভীর স্বভাবের, যুবতীটি অপ্রতিভ মৃদুহাসিনী। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে ঘোমটা বা পর্দা কোনকালেই নাই; অনাত্মীয় পুরুষের সহিত মেলামেশার কোনও বাধা নাই। দেখিলাম খেঁচু এই নবীন মারাঠী দম্পতীর বেশ অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। খেঁচু শিশুটির পতিবিধি স্নেহদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—'কী দুষ্টু যে ঐ ছেলেটা—যাকে বলে আস্ত ডাকাত, একেবারে আসল বস্তু। ওর নাম কি জানেন বিট্‌ঠল। মানে আমাদের দেশে বিট্‌লে বলে তাই।' খেঁচু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ একথা সেকথার পর বলিলাম—'খেঁচু, তোমার নতুন বাসা খালি হয়েছে—কালকেই গিয়ে দখল নিতে পার।'

খেঁচু হঠাৎ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া তোৎলাইতে আরম্ভ করিল। তাহার তোৎলামি কতকটা শান্ত হইলে বুঝিলাম সে বলিতেছে—'আমি এইখানেই থাকি বটুকদা, এখানে মন বসে গেছে।'

এদের সঙ্গে শুভ্‌ভাবে হয়ে অবধি···জানেন। আজকাল আমি এঁদের সঙ্গেই খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এরা রুটি ভাত দুই-ই খান; আছ মাংস অবিশ্যি হয় না। কিন্তু ও আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। হংসাবৌদি যে কী সুন্দর রাঁধেন তা আর কী বলব। বড্ড ভাল লোক এঁরা। আমি আর কোথাও যাব না বটুকদা, মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দিলুম, শিশু বর্ণাটি ইতিমধ্যে খেঁচুর ট্রাঙ্কের উপর উঠিয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়াছিল, খেঁচু তাহাকে ধমক দিয়া ডাকিল—'এই বিট্‌লে এদিকে আয়—ইকড়ে ইকড়ে, বুঝিলাম, খেঁচুর ভাল বাসার আর প্রয়োজন নাই, সে এই বস্তুই আরও ঘনিষ্ঠ আকারে লাভ করিয়াছে।

সীতানাথের বাড়ী ফেরা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সীতানাথ আজ দুমাস পরে বাড়ী যাচ্ছে। ট্রেন ছাড়তেই সে আনন্দে একটা গান ধরলে গুন গুন করে। কিন্তু তখনই মনে হোল উঃ, খোকার কাছে পৌঁছুবে সেকি আজ? বাবা: আজ সারা রাত ট্রেনে কাটবে। এ দুমাস সে যে কি করেছিল সেই জানে। যখন সে চলে আসে, বাড়ীর কাছে ইস্টিশন, আড়াই বছরের খোকা পিটু তার জামা আঁকড়ে ধরে বল্লে—বাবা, আমি তোমার সাথে যাবো।—তুই যাবি, তবে তোর মা যে কাঁদবে?

—কাল আসবো ন'টার গাড়ীতে।

খোকার কাছে যত গাড়ীই যাক, সব ন'টার গাড়ী। আর ভবিষ্যত কাল মানেই কাল।

—বাবা, তুই ন'টার গাড়িতে যাবি?

—হ্যাঁ।

—আমি যাবো কাল।

—মার কাছে থাকবে কে?

—কাল আসবো।

ওর মাও ওকে বুঝিয়ে বলেছিল—খোকা, তুই যাবি তবে আমি কার কাছে থাকবো?

—কাল আসবো।

—মা আমি থাকতে পারবোনা।

—তোমার জন্য মুকি। মুড়কি) কিনে নিয়ে আসবো।

যেদিন আসি, সেদিন সকাল থেকে খোকা ব্যস্ত হয়ে মাকে বলতে লাগল—মা, আমার জামা ছাও। ছাতি ছাও।

—কেনরে?

—বাবার সঙ্গে যাবো।

—কোথায় যাবি?

—কলকাতা।

—আবার আসবি কবে?

—কাল আসবো।

কিছুতেই ছাড়লেনা, জামা গায়েদিয়ে খোকা ইস্টিশানে এল। গাড়ী এলে বাবার কোল থাকতে জামা টেনে ধরে রাখলো এঞ্জিনটা সশব্দে প্ল্যাটফর্মে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বাবার জামা যখন এঁটে ধরলে—খানিকটা এঞ্জিনের ভয়ে, খানিকটা বাবা পাছে পালায় ওকে ফেলে সেই ভয়ে। তখন সে দিশাহারা হয়ে বলছে—ও বাবা আমি যাবো, আমি ন'টার গাড়িতে যাবো—আমি তোমার সঙ্গে যাবো বাবা। গাড়ী থামি সিগ্নে ভয় বেড়ালে সীতানাথ, খোকার একবুলি তার আকুল কান্নার মাঝে আমি তোমার সঙ্গে যাব বাবা আমি ন'টার গাড়িতে যাব গাড়ির লোক এবং স্টেশনের লোক হাসতে লাগল ব্যাপার দেখে সীতানাথ নির্মম ভাবে খোকার হাত জোর করে ছাড়িয়ে দিলে এবং খোকাকে তার জ্যাঠতুতো ভাইয়ের মেয়ের কোলে দিয়ে ছুটে এসে ট্রেনে উঠলো।

ধীরে ধীরে ট্রেন স্টেশন ছাড়লো। খোকা আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে আর্তনাদ করছে বীণার কোলে—ও বাবা আমাকে নিয়ে যা আমি ন'টার গাড়ীতে যাবো—আমায় নিয়ে যা—গাড়ীতে উঠে পেছন দিকে সীতানাথ চেয়ে দেখলে খোকাকে। ক্রমে তার মূর্তি মিলিয়ে গেল।

স্টেশন দূরে চলে গেল।

সীতানাথের চোখ জলে ভরে এসেছে। পাছে গাড়ীর লোক টের পায়, সে জানালার বাইরে চেয়ে রইল।

একজন কে বলে—আপনার ছেলে বুঝি।

—হ্যাঁ।

অপরিচিত লোকের সঙ্গে এ নিয়ে বেশী আলোচনা করার ইচ্ছে নেই সীতানাথের। তাছাড়া তখন কান্নার তার গলার স্বর আড়ষ্ট। তাড়াতাড়ি জানলার বাইরে চেয়ে

যেন মনযোগের সঙ্গে আকাশের মেঘ লক্ষ্য করতে লাগলো। নইলে তার চোখের জল সবাই টের পেয়ে যাবে। সকলে ভাববে, ছেলেকে ফেলে রেখে আসতে হোলো বলে অতবড় মানুষটা কাঁদছে। এরা কি কিছু বুঝবে তার মনের ব্যথা? এরা কি বুঝবে খোকাকে ছেড়ে থাকতে হবে বলে সারা রাত ভাল ঘুম হয়নি—কাল সারাদিন খোকাকে সে কাছছাড়া করেনি, খোকাও তার কাছছাড়া হয়নি। কেবল বলেছে—বাবা, কাল তোর সঙ্গে আমি ন'টার গাড়ীতে যাব। নিয়ে যাবিতো?

—কেন তুই তোর মার কাছে থাকবি।

—না, তাহলে আমি কাঁদবো।

—তোকে না দেখলে তোর মা কাঁদবে।

—কাল আসবো?

—রাত্রে কার কাছে শুবি?

—তোর কাছে।

—যাবি কি?

—যুক্তি।

—দু তিনটে স্টেশন পেরুলে সীতানাথের কান্না থামলাতে। ওকে না দেখে খোকা এ দুমাস কেমন করে থাকবে। ওইবা কেমনকরে থাকবে খোকাকে না দেখে?

চাকুরীতেও ছুটি পাবেনা বা তেমন অবস্থাও নয় যে অতদূর থেকে খোকাকে সে দেখতে আসবে। এ দুমাসের প্রত্যেকটা দিন, প্রত্যেকটা মুহূর্ত সে খোকার কথা ভেবেছে। এক এক সময় বড্ড অসহ্য হোত, হাতের কলম ফেলে দিয়ে সে চোখের জল চাপতে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো সে সময়। একদিন তার বুক দিয়ে যন্ত্রণার চোটে উঃ শব্দ বেরিয়ে গিয়েছিল। পাশে নলিনী ছিল বসে, সে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হোল?

ও বল্লে—পেটে বড় যন্ত্রণা হচ্ছে ভাই।

—পেটে? কি খেয়েছিলেন?

—ইলিশমাছ।

—তাই। নরেশবাবুর কাছ থেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ একডোজ খেয়ে আসুননা? বড্ড কষ্ট হচ্ছে?

—এখন একটু কম।

—মহামুস্কিল। কিন্তু ভাববারও যো নেই লোকের মাঝখানে বসে। খোকার কথা ওদের কাছে বলে লাভ নেই। ওরা কিছুই বুঝবেনা, তার মনের যে নিদারুণ কষ্ট—শুধু দাঁত বের করে হাসবে। খোকা অত ভালবাসে কেন তাকে? খেলা করবে, নিজের বয়সী ছেলেমেয়ে—কত এসেছে তাও বলবে, বাবা, খেলা করবি আয়—

—তোরা খেল।

—না বাবা—আয়, খেলা কর্‌বি।

ওর কাপড় ধরে টেনে নিয়ে খেলায় নামিয়ে তবে ছাড়বে। খাবার সময় তার হাতে ভিন্ন খাবেনা। কোথাও যেতে দেবেনা। জামা গায়ে দিলেই অমনি হেসে বলবে—বাবা, বেড়াতে যাবি? আমায় নিয়ে যাবি তো? চলো—

—আমায় বকবিনাতো?

একবার খোকাকে নিয়ে বেড়াতে গিয়ে কি কারণে ওকে একচড় মেরেছিল। খোকা সেই কথা মনে করে রেখে দিয়েছে। বাবার সঙ্গে বেরুবার আগেই বলবে—আমায় বকবিনেতো?

—না বকবো না, চল।

—আমায় মুক্তি কিনে দিস।

—দেবো। —একপয়সার মুক্তি।

—আমায় কি কিনে দিবি?

—একপয়সার মুক্তি কিনে দেবো, কাল কিনে দেবো।

—তাই দিস। কতদূর গাড়ি এল? মোটে বারছাড়োয়া? গাড়ি যেন আজ আর আর চলচেনা, ঘুমুবার চেষ্টা করে দেখলে সীতানাথ, ঘুমুলেই অমনি খোকা এসে হাসি মুখে সামনে দাঁড়ায়। ওর মুখ যেন স্পষ্ট মনে হয় না। যেন ভুলে গিয়েছে খোকারমুখ। কতক্ষণে গাড়িটা গিয়ে পৌঁছবে? আজ পনেরো কুড়িদিন দেশের চিঠি পাইনি। কেন এমন হল! দু'তিনখানা পত্র দিয়েছি, তারও কোন উত্তর পাইনি, এমন তো কখনো হয়না ও এ'ক দিন সাহেবগঞ্জে! কি ছটফট করেই কেটেছে? রোজ ভেবেছে, দিন গুনেছে, আর কদিন আছে? আর সাতদিন, আর ছয়দিন, আর পাঁচ-দিন, দিন যেতে চায়না। এক একটা দিন এত লম্বা হয় কেন?—আগে তো দিনগুলি আর আসতো আর যেতো

তত বোঝা যেতোনা যে দিনগুলি এত লম্বা হয়। তারপর গতকাল রাতে যখন সে বিছানায় শুতে গেল—তখন সে শুধু প্রতীক্ষা করছে কতক্ষণে সকাল হবে। ভালো ঘুম হয়নি। জানলা দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখছে ঘুম ভেঙ্গে উঠে। একবার উঠলে তখন ঘড়িতে টং টং করে বাজলো দুটো: একবার উঠলো, তার কিছু পরে বাজলো তিনটে।···একঘুমে রাত ভোর হয় অন্যদিনে—আজ এমন হয় কেন? আবার ঘুমলো তখন চেয়ে দেখলো জানলা দিয়ে বাইরে চমৎকার জ্যোৎস্না। প্রথমটা তো বুঝতে পারে বলে বোঝা যায়নি, ভোরের আলো বলে মনে হল···ওর বহু প্রতীক্ষিত প্রত্যুষটি···যে দিন ও বলতে পারবে, আজ আমার খোকার কাছে যাওয়ার দিন কিন্তু না, ওটা শেষ রাতের জ্যোৎস্না।

সকালের এখনো বিলম্ব আছে। টং টং করে বাজলো চারটে একটু পরেই। এইবার সে ঘুমুবে—একেবারে উঠে দেখবে সকাল হয়ে গিয়েছে·····দুযুগের আকুল প্রতীক্ষার সেই সকালটি, যে সকাল কোনদিন আসবে বলে বিশ্বাসই হয়নি ওর। যে সকাল ট্রিস্ তামেনার সপ্তসমুদ্রের পারে। তা এল ওর চোখের সামনে রূপধরে সত্যিকার পাখী ডাকা সেই অপরূপ সকালটি

তারপর কত কষ্টে সকাল হল। আজ সে রওনা হবে খোকার কাছে। পৃথিবীতে এমন অপূর্ব সকাল নামে।

ট্রেন কত দূর এল? গাড়ির মধ্যে খুব গরম। ঘুম আসে কই? সীতানাথ শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো নৈহাটি থেকে খোকার জন্য নিতে হবে সেরেফল, বিস্কুট, খেজুর। কোন একটা খেলনা, একটা জামা, স্ত্রীর জন্য একখানা কাপড়। খোকা কেমন বলতো কোন জায়গা থেকে কিনলে—বাবা, কোথায় গেইলে?

—অমুক জায়গায়।

—আমার জন্য কি আনলি? মুকি? ভালো কথা। ও মুড়কি খুব ভালবাসে. মুড়কি কোথা থেকে নেবে ওর জন্যে? রাণাঘাটের মুড়কি ভাল সেখান থেকেই নেবে।··

আরকি খাবার নেওয়া যাবে খোকার জন্য কিছু রসগোল্লা।

আবার সীতানাথ ঘুমিয়ে পড়লো।···

নৈহাটি পৌঁছে গেল গাড়ি। রাণাঘাটের ট্রেনের এখনও অনেক দেরি। হাত-মুখ ধুয়ে সে চা খেয়ে নিলে। তারপর খোকার জন্য বাজার করলে। ট্রেন এল বেলা ন'টায়। তখনি সে উঠে বসলো·····

ট্রেন গুলো আজকাল এমন আস্তে আস্তে যায়।

স্বাধীনতা লাভের পরে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছে। আগেকার ট্রেন অনেক জোরে চলতো। এক একটা স্টেশনে যদি বা দয়া করে এসে থামে—ছাড়তে আর চায়না। তাড়াতাড়ি ঘণ্টা দিয়ে দেনা কেন বাপু? এত কি তোমাদের কাজ?

"চাই কেক্, ভালো কেক্ এতে আছে মাখন, ডিম, কিস্‌মিস্ বাদাম পেস্তা। বাজারে যার দাম ৪আনা আমাদের কোম্পানী প্রচারের জন্য তাই দিচ্ছে এক আনা। বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্যে নিয়ে যান, আগে খান পরে দাম। ডাইলকল! ভালো কেক্ প্রতুল কোম্পানীর ইংলিস কেক!

—এই কেক্? এদিকে এসো কত করে ভালো হবেতো?

—নিয়ে যান না মশায়। এই গাড়িতে আজ এক বছর ধরে আমি কেক্ বিক্রী করছি। সবাই আমায় জানে।প্রতুল কোম্পানীর কেক্ বল্লে সবাই চেনে। ভালো না লাগে লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিন, দাম কেরৎ দেবো—

—আচ্ছা দাও চারখানা। চার আনা? ছোদ্দ পয়সা দিই—খোকা এ জিনিষ কখনও খায়নি। পাড়াগাঁয়ে শিশু—সে চিনেচে শুধু মুড়কি। বড় খুসি হবে। এ কোন স্টেশন? এখনো মদনপুর আসেনি? নাঃ এদের নিয়ে আর পারা গেল না। এঞ্জিনের কয়লার আঁচ কি নিবে গেল নাকি?

রাণা—ঘা—ট?···

তাড়াতাড়ি নেমে পড়লো সে। ওদিকের লাইনের গাড়ির কত দেরি? আচ্ছা আগে মুড়কি টুড়কি কেনা যাক

না? পাকাকলা বিক্রী হচ্ছে খোকা কলা খেতে খুব ভালবাসে। একবার খোকা বলেছিল—বাবা আমাকে এক পয়সা দিও। —কেনরে খোকন?

—আমি তোকে কাল কলা কিনে দেবো।

হায়রে, খোকা তুই জানিসনে, এক পয়সায় আজকাল কোন্ জিনিষটা পাওয়া যায়? তুই সেকেলে সরল শিশু, কিছুই বুঝিসনে। সাড়ে তেরো আনা গেল মুড়কি আর কলা কিনতে। তাও মাত্র চারটি পাকাকলা খোকনের জন্যে—পাঁচ পয়সা করে এক একটি কলা। মুস্কিল হোল টিকিট করতে এসে ওর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো বন্যার জলে হরিনারায়ণপুরের নিচে কোলনা নদীর পুল ভেঙে গিয়েচে। লাইনের ওপর জল। ট্রেন চলাচল আজ তিনদিন বন্ধ আছে। কবে খুলবে তা কেউ বলতে পারলে না। বেশ বন্যাতে নাকি ভেসে গিয়েছে। সর্ব্বনাশ? সীতানাথের কান্না এল হঠাৎ। এখন সে কি করে? তিনদিন সে থাকবে কোথায়? তাকে তাহোলে আবার সাহেবগঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

কত জিনিষ যে খোকার জন্য কিনেছিল। মুড়কি, কল ভেবেছিল সে সব কি হবে? একজন লোকের সঙ্গে হঠাৎ ওর দেখা হয়ে গেল। তার মুখে ও শুনলে চূর্ণী নদীর ঘাট থেকে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায় ওদিকে যাওয়ার জন্যে। সে নিজে যাবে কোলা-কুলবেড়ে গ্রামে। সীতানাথের গ্রাম কোলা-কুলবেড়ে থেকে পাঁচ ছ ক্রোশ উত্তরে। একখানা নৌকা ভাড়া করলে চূর্ণী নদীর ঘাট থেকে। বেলা ন'টার সময় নৌকা ছাড়লে। মাঝির মুখে শুনলে তাদের গাঁয়ের দিকে বন্যা নেই। হরিনারায়ণপুরের নীচে পুল ভেঙেচে কোলানদী ও ভাঙড় নদীর বানে। মাঝিকে বল্লে—কতক্ষণে কুল থেকেতে তেড়াতে পারবে?

—তাকি বলা যায় বাবু। জলের কাণ্ড। সাঁজ হতি পারে।

চূর্ণী নদীর জলে চল নেমেছে। রাণাঘাট টাউন ছাড়িয়ে দুধারে পাড়াগাঁ—ভাদ্রের নদী কূলেকূলে ভর্ত্তি, বাবলা গাছে হলদে ফুল বুনো কচুর ফুল ফুটেচে জলের ধারে। আউশ ধান কাটচে চাষীরা নদীর দুধারে চলতে খেতে। সীতানাথ চূর্ণী দিয়ে নৌকা করে জীবনে প্রথম এল এদিকে। মাঝে মাঝে গ্রামের ঘাটে মেয়েরা কড়া ভরে জল নিয়ে ভিজে কাপড়ে ডাঙায় উঠেচে, বাঁশবনের পথে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

ওরকম লাগছিল। কালকাসুন্দির ফুলে নদীর ধার ছেয়ে গিয়েচে এক এক জায়গায়। কাশের ফুল বর্ষার হাওয়ায় দুলচে। থাকা কাশ ফুলে বন ঘনানী নদীতীরে যেন শুভ্র বর্ষের হাসি হাসচে। নীল আকাশ। গাং-চিল ঝাঁ মেরে মাছ ধরচে। ছেলেরা কোচাড়ি পাততে জলে নেমে। ও জিজ্ঞেস করলে—কি মাছ ছাঁগো?

—চিংড়ি। নৌকা কোথাকার?

—রাণাঘাটের

—কনে যাবে?

এবার সীতানাথকে কথা বলতে না দিয়ে মাঝি ধমক দিয়ে বল্লে—তোমারে সে খোঁজে দরকার কি? যেখানেই যাই।

লোকটা বড্ড অপ্রতিভের সুরে—ওমা, তা জিজ্ঞেস করলিও দোষ। ক্রমে বেলা পড়ে গেল। বাঁশবনে সোনার সড়কির মত নূতন বাঁশের কোঁড় নীল আকাশে ঠেলে উঠচে চারদিকে। বন দুধ্লের হলুদবরণ ফুলের পাপড়িতে প্রজাপতির নৃত্য। বন শিমের নীল ফুল ঝোপের মাথায়। অনুকূল স্রোতে তরতর বেগে নৌকা চলে যাচ্ছে। মাঝির জন্য এক গাঁ থেকে ওরা মুড়ি কিনে দিলে, নিজেরাও দুটো খেয়ে নিলে। হ্যাঁ মাঝি কুলবেড়ে আর কত দূর?

—এখনও আছে। পানচিতের বাঁওড়ে গিয়ে পড়বো। তারপর কুলবেড়ে।—সন্দে হবে?—সন্দের পর একদণ্ড রাত্তির হবে। একটা গাঁয়ের পাশে কি আম্র মাকাল লতার ফল থেকে টুক টুক করে ঝুলচে। হঠাৎ ওর মনটা কেমন করে ওঠলো। সেবার ওদের গ্রামে পুরুণো জুমুর গাছ মাকালফল থেকে অমনিধারা লাল টুক টুক করছিল। তখন পিটু আরও ছোট। ও বল্লে—ওই তাখ খোকা। ইবু। (দেব)—

খোকা বল্লে—ইবু দিবি বাবা?

—দাঁড়া পাড়ি।—পাড়ো আমি কাল ইবু দিয়ে ভাত খাবো।

ANNOUNCEMENT

With effect from 1 October 1972 we shall comply with your order received here from that date in accordance with the enclosed revised TERMS. All orders reserved before 1 October 1972 will be dealt with the current one which has been effective from 1 January 1972.

11 September 1972

J N Kapoor
Manager
HMSO

—খেও। আমায় পকবিনেতো ?—না—কাল টবু দিবি।

—এখনই দিচ্ছি, আবার কাল কেন ? দাঁড়া। একটা কঞ্চি পাচ্ছিনে বড় উঁচু। মনটায় মধ্যে কেমন করে ওঠলো মাঝিকে বলে সোটা কতক পাকা মাকাল ফল নিলে ছোড—বাবাও নৌকা।

—ওকি হবে বাবু ?

—কিছুনা। ছেলে পিলেরা খেলা করবে।

—চলুন আসে অনেক আছে। এখন বেলা পড়ে গিয়েচে, বনকোপের মধ্যে নামেনা। মনে পড়লো কোন দোষ করে ফেলে খোকা ওর কাছে এসে ভয়ে বলতো (যেমন সেবার ওর হাত ঘড়িটা নিয়ে নাড়তে গিয়ে হঠাৎ হাত থেকে ফেলে দিয়ে এবং মায়ের বকুনি খেয়ে ;—বাবা আমি দুষ্টু করিনি—আমি ভাল।

—খুব ভালো। তুমি দুষ্টু করনিতো ? কে দুষ্টু করে তবে ?

—মা যবি দুষ্টু করে, চন্দন দুষ্টু করে, বাবা আমি ভাল ?

—খুব ভালো। ঘড়িটা কে ভেঙেছে ?

মা—ও বটে। একবার খোকার টাইফয়েড হয়েছিল। জ্বরের ঘোরে সে কেবল বলতো—বাবা আমুর সেবে গেলে ভালো তেল মেখে নদী থেকে নেয়ে আসবে—

সীতানাথের বুক কেঁপে উঠতো নদীতে নাইবার কথা বলছে কেন ? এটা কি খারাপ লক্ষণ ? জ্বরের ঘোরে কেবল ডাকতো—

—বাবাই ? ও বাবাই এইযে খোকা—

—বাবাই আমার কাছে বোস কোথাও যাসনে।

আবার খানিক পরে বালিশ থেকে মুখ উঠিয়ে বলতো

—বাবাই মরেচতো ?—আছি।—তুই মরেচ নাকি ?

—বলে আছি।

থাক আমি ঘুমুই—

—ঘুমোও—

কিরকটা দুর্গন্ধ বেরলো হঠাৎ। মাঝি ও তার সহযাত্রী নাকে কাপড় দিলে। ও বল্লে—কিসের গন্ধটাহে ? মাঝি কিছু না বলে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। ডাঙ্গার দিকে শিমুলতলায় জলকচুড়ির ঝাড়ে একটা মড়া আটকে রয়েচে। পাশানা উঁচু করে আছে আকাশের দিকে। হাঁটু মুড়ে যেন দুপুরের আহারের পর বিশ্রাম করচে। একটা চওড়া পাসের ডগা ওর দাদাটে হাতাবরা হাঁ করা মুখের মধ্যে। মড়াটার ওপরকার ডাঙ্গায় শিমুল গাছটাতে একপাল শকুনি বসে। ওর মনটা হাঁৎকরে উঠলো। এসব বড় অলক্ষণ। কেন ওটা দেখলে সে ? এইতরা নদী বেলাতে ওটা দেখবার কি দরকার ছিল ?

যামে শব শিবা কুক্কু
লক্ষিণে গো, মৃগবিজ

আচ্ছা মড়াটা যখন প্রথম দেখলো তখন মড়াটা ওর কোন দিকে ছিল ? বাঁদিকে। বাঁদিকে—না ডানদিকে, না বাঁদিকেই। এইবার চন্দনতলার ঠাকুর বাড়ির ঘাট।

—সেকি ! তাহলে তো আর বেশী দূর নেই।

মনে মনে সে চন্দনতলার কালীঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনা করলে খোকা যেন ভালো থাকে, গিয়ে যেন ওকে ভাল দেখতে পায় সে। আর বেশী দূর নেই। ওর বুকের কাছে কি যেন দুলে উঠলো আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডলের মরিচরেখা বিরাট প্রশ্ন নিয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এসে গেল ওদের গ্রামের ঘাটে। এবার খোকার সঙ্গে দেখা হবে। কতদিন খোকাকে যে দেখেনি। ওর মুখ যেন আর স্পষ্ট মনে পড়েনা। খোকার মুখ যেন সে ভুলে গিয়েচে। খোকার মুখের কথা এতদিন যেন আরব্য রজনীর উপকথা ছিল। আজ তাকি এতকাল পরে বাস্তবে রূপ নেবে ? সত্যিকার খোকা ওর সামনে এসে দাঁড়াবে ? স্বপ্নের খোকা নয়, কত বিনিদ্র রজনীর স্বপ্নের সঙ্গে তার তফাৎ থাকবে তো ? এই পরম মুহূর্তটির জন্যে যেন বিশ্ব স্তব্ধ। সমস্ত বিরাট নভোমণ্ডলের ঘূর্ণায়মান। নেবুলোরাজ, মৃগশিরা, সপ্তর্ষি, শুক্রতারা, কালপুরুষ সব নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণশীল, শুধু তার এই পরম মুহূর্তটা সম্ভব ও সার্থক করে তুলবার জন্যে। নইলে ওসব অসার, মিথ্যে অর্থহীন। প্রেম নেইযে সেটা আবার কি ? একটা বিষ ? সেই ঘুমন্ত হয়ে মহাব্যোমে মিলিয়ে যাকনা, কে দেখচে ? কিসের সার্থকতা ওর অস্তিত্বের ? সর্বংসহা ধরিত্রী মাতার কোলে যাপিত এই দুদুর মুহূর্তগুলির প্রেমের বাণী দিগন্তরে,

নীহারিকা থেকে নীহারিকান্তরে এক মাক্ষত্রিক দীপ থেকে দীপান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে তাই বিশ্ব বেঁচে আছে। বিশ্ব দীর্ঘজীবি হয়ে আছে। নতুবা বিশ্ব নাড়িবাল তুলে যাবি খেতো। ওদের পাড়ার ঘাটে নৌকা লাগলো। কচুবনে ঝিঁঝি ডাকছে। অন্ধকার বাঁশবনের মধ্যে দিয়ে পথ। শেয়াল ডাকলো কেন? শেয়াল ডাকা কি ভালো? জোনাকী জ্বলছে তেলেকুচের ঝোপে। নিমাই জেলের সঙ্গে দেখা সে জাল কাঁধে নিয়ে নদীর দিকে যাচ্ছে। বল্লে—কেডা যাও? ও বল্লে—আমি সীতানাথ। নিমাই ভাল আছ?

—কে খুড়োমশায় আসেন? ভাল আছেন? নিমাই যেন দ্রুত পায়ে চলে গেল? বাড়ীর সবাই ভালো আছেতো? নিমাই অত তাড়াতাড়ি গেল কেন? যেন সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। হয়তো ওর মাছ ধরবার সময় বয়ে যাচ্ছে, এই জন্যই যে ছুটেছে নদীর দিকে। ওইতো উঁচুপাড়ের নীচে রাস্তা সামনে শম্ভুচক্কত্তির বাড়ি। শম্ভুরা চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে —কো সীতানাথ? বাড়ী এলে? নৌকায়?

—হাঁ দাদা।

—আচ্ছা। যাও

আর কিছু বলে না কেন শম্ভুদা? বাড়িতে খোকা কেমন আছে একথা জিজ্ঞেস করতে সাহস হোল না ওর। আচ্ছা, শম্ভু দাদার মুখে যেন একটা—কি একটা ঢাকবার চেষ্টা করছে বলে মনে হোল না?

বামে শব শিবাকুল্ল
দক্ষিণে সোদ্দল, বিহ্ন

মড়াটা তখন কোন দিকে ছিল, যখন এ প্রথম মড়াটাকে দেখলো? ঐতো বাড়ি। অন্ধকার মত কেন? আলো জ্বলছেনা কেন দাওয়ায়? ওর পা যেন ভারি হয়ে গিয়েছে। পা আর চলছেনা। গলা আড়ষ্ট আর মুখ যায় হোচ্ছেনা। বাড়িতে সুধা আর খোকা আর একটা কি ছাড়া আর কেউ থাকে না তার নাম ধরে ডাকবে? কিএর না সুধার? না খোকনের?……না। পা এত ভারি কেন? ডাকতে গিয়ে গলা দিয়ে সুর যায় হয়না কেন? সারাপথ সাহেবগঞ্জ থেকে আজ দুদিন একরাত্রির আকুল প্রতীক্ষার পরে নিজের ঘরের দোরে এসে প্রাণের ধারা শুকিয়ে গেল কেন? কি হয়েছে বাড়িতে? নিমাই জেলে কথা বললেনা কেন? শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে এতকাল পরে দেখা, সেও ভালো করে কথা কইলেনা কেন? বাঁশবন তেঁতুল গাছের নীচে অন্ধকার বাড়িটা ওর আড়ষ্ট মুখের মড়া ছাগলের চোখের মত অর্থহীন চোখের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বললেনা। তেঁতুলের ডালে লক্ষ্মী পেঁচার কর্কশ আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে ঝট্‌পট্ করে উড়ে যাওয়ার শব্দ। চমকে শিউড়ে উঠলো সীতানাথ।

এমন সময় পথের ওপর আলো এসে পড়লো। কারা আসচে ওদিক থেকে। গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। সুধার গলা যেন? পরক্ষণে বিনদের মা কি লণ্ঠন নিয়ে পথের সামনে এসে পড়লো। পেছনে সুধা ও তার কোলে খোকা। লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল স্পষ্ট। বিনদের মা চেঁচিয়ে বলে উঠলো ওমা, এইযে দাদাবাবু অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে। আমরা গিইলাম রায়বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নির পেসাদ পেতে বাড়ি চাবি দিয়ে।

—আর কোন কথা ওর কানে গেলনা।

খোকা হঠাৎ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে দেখছিল। পরক্ষণেই সে মার কোল থেকে নেমে দৌড়ে হাত বাড়িয়ে ওর দিকে ছুটে আসতে বল্লে—বাবা—ও বাবা তুই কোথায় গেইলি? আমার জন্যে মুকি এনেচ?…ও বাবা—

তারপরে ওর গলা দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলো, তখন সীতানাথ নীচু হয়ে ওকে কোলে তুলতে গেল। আদরের সুরে বল্লে—বাবাই—বাবাই—আমার বাবাই—মুকি এনেচ বাবাই?

সে আর এক ভারতবর্ষ

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

মর্মান্তিক বেদনার বিষয়, এমন একটা শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে আমরা লেখাপড়া শিখেছি, ইতিহাসকে যা বিভীষিকা বলে দেখতে শিখিয়েছে। মনে আছে, স্কুলে ইতিহাসের ক্লাসে ইতিহাসের বই-এর আড়ালে উপন্যাস পড়তাম।

মাষ্টার মশাইদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে দেখলাম, ইতিহাসের চেয়ে রোমান্টিক উপন্যাস আর কিছু হতে পারে না। মানব-সভ্যতার প্রথম দিন থেকে জীবন্ত জীবন্ত চরিত্রদের নিয়ে মহাকাল রচনা করে চলেছে ক্রমশ-প্রকাশ্য এক বিরাট উপন্যাস। বিশ্ব-ইতিহাস তার নাম। আজকের য়ুরোপ আর আমেরিকা ইতিহাস-রচনাকে একটা নতুন কথা-শিল্প রূপে গড়ে তুলেছে। ইতিহাসের পথে চলেছে মানব-মনের রোমান্টিক এ্যাডভেঞ্চার। সেখানকার সাহিত্যে প্রাণের স্পর্শে সন-তারিখের ইতিহাসের কঙ্কালকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে। আমাদের দেশের ছাত্রদের দুর্ভাগ্য যে তারা আজও ইতিহাস বলতে সন তারিখের ক্যাটালগকেই জানে।

ভারতবাসী হিসাবে আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি, আমাদের রক্তকণিকায় রয়েছে জগতের বিচিত্রতম এক সভ্যতার প্রাণ-বীজ। জন্মসূত্রে সম্পূর্ণ অনার্জিতভাবে আমরা যে কতবড় সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী হয়েছি, পরম দুঃখের বিষয়, সে সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি আজ যেন ম্রিয়মাণ হয়ে আসছে। আজকের আমরা আমাদের চেতনার মধ্যে হারিয়ে ফেলতে চলেছি আমাদের ইতিহাসের অন্তরের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগসূত্র। আজকের আমরা ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছি, এই কথাটাই জানি, ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের মধ্যেও জন্মগ্রহণ করেছি, এই স্বাভাবিক সত্যকে আমরা ভুলে যেতে বসেছি। এর চেয়ে দুর্ভাগ্য ভারতবাসীর পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।

ইতিহাস মৃত ঘটনার মিউজিয়াম নয়। ইতিহাস হলো গঙ্গার মত নিত্য-চলমান প্রাণের ধারা, তার অবিরাম গতির মধ্যে নিঃশব্দে ধারণ করে চলেছে তার এবং অনাদি জীবন-তরঙ্গকে। আজ বারাণসীতে যে গঙ্গার জলে আমি অবগাহন করছি, সেই জলধারার মিশ্রিত আছে আমার শত শত বর্ষ আগে যারা এই গঙ্গার জলে অবগাহন করেছিলেন, তাঁদের স্পর্শ-চেতনা। গঙ্গার জল-ধারাকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আমি স্পর্শ করি ভারত সভ্যতার ধারাকে, যাকে বহন করে চলেছে এই প্রবহমান জলধারা। শিব-জটা থেকে সে সংযুক্ত করে রেখেছে আমাকে। ভারতের ইতিহাস হলো এই নিত্যবহমান প্রাণধারা। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বোঝা মানে এই প্রাণধারায় অবগাহন করা। আজ আমাদের অবগাহন করতে হবে এই প্রাণধারায়।

(২)

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান বিশেষত্ব হলো, মানব-মনের প্রথম বিকাশ থেকে মানবসত্তার অতিব্যক্তির সমগ্র বিভিন্ন স্তর তার বিরাট অবিচ্ছেদ্য জীবনধারার মধ্যে বিধৃত। মানব সভ্যতার সে সমবয়সী এবং কোথাও তার গতির ছেদ পড়েনি। যে চোখ দেখেছে জগতের প্রথম যার অভ্যুদয়, সে চোখ অতন্দ্রভাবে আজও দেখছে জগতের রক্ত-সন্ধ্যা।

তার দীর্ঘ জীবনের মধ্যে কতবার এসেছে জরা, এসেছে বার্দ্ধক্য, আবার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তিতে সে জেগে উঠেছে নব-যৌবনে। ঋতু-চক্রের অনিবার্য্যতায় তার দীর্ঘ জীবনে কতবার এসেছে গিয়েছে গ্রীষ্ম বর্ষা শীত বসন্তের অবিরাম চক্র। তার এই তপঃক্ষেত্র দেখেছে মানব-মনের বিভিন্ন বিচিত্র পরীক্ষা। মানব-মনের হেন পরীক্ষা ঘটেনি যাকে সে যাচাই করে দেখেনি, যাকে সে জীবনে সত্য করে তোলেনি। তার হিমালয়ের শৃঙ্গের মতন, তার জীবন প্রান্তর থেকে মেঘলোকের দিকে উঠেছে মানবীয় সম্ভাবনার শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ। শৃঙ্গের রেখার হয়তো কোন রেখা সম্ভাবনার সর্ব্বোচ্চ চূড়া থেকে নেমে এসেছে জীবনের সবতল ক্ষেত্রে, আবার আর এক ক্ষেত্র থেকে উঠেছে আর এক শৃঙ্গরেখা মেঘলোকের দিকে। এইভাবে এক শৃঙ্গ থেকে আর এক শৃঙ্গ, এক সম্ভাবনার সর্ব্বোচ্চ স্তর থেকে আর এক সম্ভাবনার সর্বোচ্চ স্তরে বিস্তৃত হয়ে আছে ভারত-ইতিহাস। মানব-মনের আর মানব-জীবনের এমন বিচিত্র বিভিন্ন প্রকাশ আর কোনো জাতির ইতিহাসে দেখা যায় না। যা কিছু প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা কিছু গতির সঙ্গে সম্পর্কিত ভারতবর্ষ তাকেই নিজস্ব করে গ্রহণ করেছে, মানব-মনের কোনো সম্ভাবনাকেই সে প্রত্যাখ্যান করেনি। তাই তার কাছে বশিষ্ঠও ঋষি, চার্ব্বাকও ঋষি। তাই তার কাছে ধর্ম্মও শাস্ত্র, কামও শাস্ত্র। তাই সে গলা উঁচু করে বলতে পারে, পৃথক বিশ্বে···সমগ্র বিশ্বকে, জাতি-বর্ণ-বর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মানুষকে কেন্দ্র করেই তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ভাব আর ভাবনা। তাই বিশ্ব-ইতিহাসে তার স্বতন্ত্র স্থান···সে হলো বিশ্ব-মানবের যজ্ঞশালা, বিশ্ব মনের অভিব্যক্তি ক্ষেত্র। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে তারতবর্ষে যারা এসেছিলেন য়েরোপীয় তাঁরা শুধু তারতবর্ষের কথাই বলেননি, তাঁরা বলেছেন, তারতবর্ষের সঙ্গে বিশ্বের অন্তর-সম্পর্কের কথা ··এই পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক তারতবর্ষের আড়ালে তাঁরা আবিষ্কার করে গিয়েছেন শাশ্বত এক তারতবর্ষকে, যে তারতবর্ষের অন্তর-ধর্ম্মের মধ্যে আছে বিশ্বমানবেরই কল্যাণ-মন্ত্র। তাই তার ঠাকুর রামকৃষ্ণ সকল বিভেদের মধ্যে শুধু তারতবাসীকে নয়, সকল মানুষকে দেখিয়ে গেলেন তার অন্তর্নিহিত মহাঐক্যের পথ, তাই তার বিবেকানন্দ পূর্ব্ব আর পশ্চিমের বিরোধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মন্দিরহীন মসজিদহীন প্রচার করে গেলেন নব-মানবতার মন্ত্রবীজ, তাই তার কবি তারতবর্ষের বহুমুখী সাধনার অন্তর থেকে জাগিয়ে তুললেন নিখিল-মানবের মিলন-সংগীতির অপরূপ রাগিনী, তাই তার মানুষেতা ক্ষুদ্র-গত সাময়িক আঘাত-প্রতিঘাতের ঊর্দ্ধে বিশ্বের মানুষকে আত্মঘাতী হিংসার হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্যে জীবন দিয়ে প্রচার করে গেলেন সমগ্র মানবতার অনিবার্য্য পরিণামের মহাধর্ম্ম, মন্ত্রাদেহে মানবের দিব্য অভিব্যক্তির ভবিষ্যৎ বাণী।

এই তারত-ইতিহাসের বিশ্বব্যাপী চৈতন্যের মধ্যে আজ জাগিয়ে তুলতে হবে স্বাধীন তারতের কিশোর-কিশোরীদের, যারা হবে আগামীকালের তারতবর্ষের ধারক ও বাহক, যাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে সফল হয়ে উঠবে, সৃষ্টা হয়ে উঠবে, তারতবর্ষের ইতিহাসের অন্তর্নিহিত মহা উদ্দেশ্য··· সাত্যকারের ত্যাগ, মহৎ মেসেজ্। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের ইতিহাসের প্রত্যেক ঘটনা সেই বিশ্বাসকেই প্রমাণিত করে, বিশ্বের যজ্ঞশালায় পৌরহিত্য করবার সুমহান দায়িত্ব ওতপ্রোত হয়ে আছে তারতবর্ষের ইতিহাসে।

(৩)

আজকের বাংলা সাহিত্য আসিয়ে তুলুক আমাদের সেই সুমহান ঐতিহাসিক চেতনায়। বলাবাহুল্য রাজনৈতিকদের একার নয়, একার হলো সাহিত্যিকদের। এ কালের পেছনে মন্ত্রিত্ব নেই, একালের পেছনে হয়তো কয়তালও নেই, তবুও একার সুসম্পন্ন না হলে কোনো আইনসভা, কোনো শাসন পরিষদ, কোনো সংবিধান বা কোনো আইনই এই বিচিত্র বিপন্ন মহাদেশকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে না।

আজ আমরা যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি তার ইতিহাস যখন লেখা হবে তার প্রথম পাতায় থাকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতা আর কর্ম্মীদের

কথাই, যখন পুরস্কার বিতরণের পালা আসে, সব ফুলের মালা যায় মৃত বা জীবিত রাজনৈতিক কর্মীদের গলায়, কেউ তখন ভেবে দেখে না এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার পেছনে কতখানি আছে সাহিত্যিকের দান। সাহিত্যিকের দান কেউ স্বীকার করে না তা বলতে চাইনা কিন্তু যে ঘন কালিতে রাজনৈতিকের প্রশংসাপত্র লেখা হয়, সাহিত্যিকের প্রশংসা-পত্র লেখার বেলায় ব্যবহৃত হয় তার বদলে ফিকে জলো কালি। স্বদেশী যুগে সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের দানকে বিচার করতে গিয়ে আমরা খুঁজে যার করি রাজনৈতিক রবীন্দ্রনাথের দানকে এবং খুঁজে পেলে মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করি। কতজন রাষ্ট্র অত্যাচারিত রাজনৈতিক কর্মীর পরিবারকে অর্থ-সাহায্য করে, দেশ সেবার প্রণোদনায় কে কতবার কারাবাস করেছে বা কে কি নির্যাতন ভোগ করেছে তার একটা হিসাব-নিকাশের খবর পাওয়া যায় কিন্তু কোন সাহিত্যিক যুগের পাতর জেলে বসে দুটি লাইন অগ্নি-অক্ষর লিখেছিল, যে অগ্নি-স্পর্শে বিমুখ ছুটেছে মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, নিদ্রিত ভীরু যে আগুনের স্পর্শে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী বীর, যে আগুনের আঁচে ভেঙেছে শতাব্দীর ঘুমঘোর, পুরস্কার বিতরণ সভায় কোথাও কেউ কি রেখেছে তার হিসাব?

একটা কাহিনী মনে পড়ছে। ঠিক এমনি কাহিনী আজ এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যেও রচিত হচ্ছে। কিন্তু নিকটে যা ঘটে, অতি-নৈকট্যের বশে মানুষ তাকে পুরোপুরি দেখতে চায়না। তাই দূরের উদাহরণই ভাল।

আমাদের বাংলাদেশে বাংলা ভাষার দিকব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে যেরকম একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল, ঠিক সেই রকম দেশব্যাপী নিশ্চেতনার মধ্যে নরওয়ে দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক প্রতিভা, বিয়র্ণসন্। বঙ্কিমচন্দ্রের মতনই বিয়র্ণসন্ উপন্যাসে আলো-চনায়, প্রবন্ধে, কবিতায় গানে ঐতিহাসিক প্রেরণায় নরওয়ের ঘুমন্ত মনকে নব-জীবনে জাগিয়ে তোলেন। বঙ্কিমের মতনই নরওয়ের জাতীয় সঙ্গীতের তিনি জনক। তাঁর সাহিত্যের প্রেরণায় তরুণ নরওয়েবাসীদের অন্তরে নতুন রাজনৈতিক চেতনা জেগে ওঠে। দেখতে দেখতে দেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন মতবাদ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে বিয়র্ণসন তখন বৃদ্ধ। একদল তরুণ, রাজনৈতিক কারণে তাঁর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর বাড়ী আক্রমণ করে। বৃদ্ধ তখন শয্যায় শুয়ে ছিলেন বাইরের সেই তুমুল গোলমাল শুনে তিনি বিছানায় উঠে বসলেন বৃদ্ধা পরিচারিকা ছুটে এসে জানালো, কর্তা, আপনি বেরুবেন না, ওরা আপনার ওপর রেগে গিয়ে বাড়ী-ঘর-দোর জ্বালিয়ে দিতে এসেছে। এমন সময় একটা ঢিল জানালার কাচ ভেঙে ঘরে এসে পড়লো। বৃদ্ধ উঠে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। নীচে ক্ষিপ্ত জনতা তাঁকে দেখে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ক্ষিপ্ত জনতা গান গাইছিল বৃদ্ধ কান পেতে শোনেন, তারা কি গাইছে! শুনতে শুনতে বৃদ্ধ আনন্দে নেচে উঠলেন। বৃদ্ধা পরিচারিকা সে আনন্দের কোনো কারণই বুঝতে পারে না বিয়র্ণসন উত্তেজিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন, তোরা, তোরা ওরা আমাকে মারতে এসেছে, মারুক কোন দুঃখ নেই কিন্তু ...তুমি শুনতে পাচ্ছনা, ওরা আমারই গান গাইছে? আমারই লেখা Mi Norge. Mi Norge শুধু দিয়েছে শক্তি, দিয়েছে প্রেরণা

নরওয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে থেকে এই কাহিনীটি আমার মর্মস্থলে বিদ্ধ হয়ে আছে। সাহিত্য-স্রষ্টার ভাগ্যের প্রতীক হলো এই কাহিনী। দেশ যখন ঘুমিয়ে থাকে, শতাব্দীর হিমেল হাওয়ায় জমাট বাঁধা সে ঘুম, সে ঘুম ভাঙাতে দরকার হয় সাহিত্যিকের, কবির.....কবির ভাষা ছাড়া, কবির সুর ছাড়া সে জমাট ঘুম ভাঙতে পারেনা আর কেউ। বন্দে মাতরম্—এই সামান্য দুটি শব্দের সংযোগ যে সাহিত্যিক করেছিলেন, সেই সংযোগের মধ্যে দিয়ে তিনি যে শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, শতশত রাজনৈতিক বক্তার গগনভেদী-চীৎকার সে শক্তির অনুরণও সন্ধান পায়নি। সেদিন বৃটিশের কারাগারে কারাগারে শৃংখলাবদ্ধ বাংলার তরুণ বিপ্লবীরা নজরুলের শৃংখলমোচন গানে যে শক্তি পেয়েছিল, সে-শক্তি সেদিন কারাগারের ভেতরে তাদের অন্তরে আর কেউ কি পারতো পৌঁছে দিতে? বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের পেছনে শত শত বর্ষ আগেকার লেখা একখানি সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ... গীতা যে শক্তি জুগিয়েছিল, অনুরূপ মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিময়ী শক্তি আর কোনো কিছু থেকে পাওয়া সম্ভব?

কিন্তু প্রতিদিনের জগৎ মানুষ প্রয়োজনের তালিকা থেকে সাহিত্যকে বাদ দিয়ে রাখে। একমাত্র মহাকাল জানে, সাহিত্যের মূল্য। মহাকালের যখন প্রয়োজন হয়, তখন সে ডাক দেয় সাহিত্যিককে। তখন সাহিত্যিকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ওঠে মহাকালেরই বাণী। শতাব্দীর আবর্জনাকে পোড়াতে প্রয়োজন হয় সাহিত্যিকের প্রাণ-অগ্নি।

স্বাধীনতা আজ পেয়েছি বটে কিন্তু আমাদের ঘিরে পড়ে আছে ইংরাজ-আমলের শতাব্দীর আবর্জনা। এই আবর্জনার দুর্গন্ধ বাইরের বাতাসকে কলুষিত ক'রে আমাদের নিশ্বাসকে পর্যন্ত কলুষিত করতে চলেছে। মাথার ওপর শরতের স্বচ্ছ নীল আকাশ কিন্তু পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে আমরা প্রত্যেকে নিউরে উঠছি প্রত্যেকের নিশ্বাসের দুর্গন্ধে। আবর্জনা এমন মারাত্মক যে স্বাধীনতা হেন বস্তুকে পচিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে পারে। এ আবর্জনাকে সরাবার একমাত্র পথ হচ্ছে, তাকে পুড়িয়ে নিঃশেষে ধ্বংস করে ফেলা। সেই পাবক অগ্নি আছে একমাত্র সাহিত্যের মধ্যে। তাই জাতির পুনর্গঠনে সাহিত্যের এই মূল্যকে, সাহিত্যিকের এই দায়িত্বকে সর্বাগ্রে স্বীকার করতে হবে। নিজেদের পুঞ্জীকৃত অন্ধকারের বিরুদ্ধে আজকার এই নতুন সংগ্রামে আবার ডাক দিতে হবে সাহিত্যিকদের। সাহিত্যিকদেরও আজ উপলব্ধি করতে হবে তার ডাক এসেছে মহাকালের কাছ থেকে, মানুষের ডাকের আশায় তাকে বসে থাকলে চলবে না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে মহৎ কাজের সূচনা করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা, বাংলা-সাহিত্যের ঐতিহ্য স্রষ্টারা, আজকের সাহিত্যিকদের সযত্নে তুলে নিতে হবে সেই অসমাপ্ত সংগ্রামের ভার। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য ভারতের নবজাগরণে যে মহান দায়িত্ব পালন করেছে; আমরা আজকের সাহিত্যিকেরা হলাম সেই মহা দায়িত্বের উত্তরাধিকারী। যে কেউ কলমের মুখদিয়ে বাংলা অক্ষর লেখেন, তিনি যেন স্মরণে রাখেন এই ভাষার মন্দিরের পবিত্রতা, এই ভাষায় মানুষ মৃত্যুকে জয় করবার প্রেরণা পেয়েছে, এই ভাষায় মানুষ মৃত্যুকে জয় করবার প্রেরণা পেয়েছে, এই ভাষার মাঝে বোধন হয়েছে এই ভাষার শতাব্দীর অন্ধকারকে মুছে ফেলে উঠেছে হিরণ্ময়জ্যোতি সূর্য। এই ভাষায় ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়ানো বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ।

(৪)

কেউ আমাদের ডাকুক আর নাই ডাকুক, জাতির নব-গঠন-প্রয়াসী কোন পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টা থাকুক বা নাই থাকুক, বাংলা সাহিত্যের গত একশো বছরের প্রাণের ধারা যেন আমাদের জীবনে এসে না ব্যাহত হয়।

প্রাণের শঙ্খ বাজিয়ে যে দেবতাকে আমাদের পূর্বাচার্যরা জাগিয়ে তুলেছিলেন, আজ করতে হবে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। বাংলা সাহিত্যে আছে ভারতের জাগরণ-মন্ত্র। বাংলা সাহিত্যে হবে ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বাংলা ভারতের রাষ্ট্রভাষা না হোক, বাংলা ভাষায় জেগে উঠুক ভারত-রাষ্ট্রের প্রাণ। শতাব্দীর বিকৃতির হাত থেকে উদ্ধার করে যে ভারত সাধনাকে রূপ দিয়ে গিয়েছেন রামমোহন থেকে শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত ভারত-মনীষীরা আজ রাজনৈতিক অতি-ইচ্ছার সঙ্কট থেকে নতুন করে আবার রক্ষা করতে হবে তাকে, পৌঁছে দিতে হবে তার মর্মবাণী জাতির সর্বসাধারণের কাছে। আজ বাঙালী সাহিত্যিককে নতুন করে আবার বেরুতে হবে ভারতের আত্মার অনুসন্ধানে। ভারত-সাধনার সুবিশাল প্রান্তর থেকে যুগের পর যে সব মানব-সাধনার পুষ্প উঠেছে মেঘলোকের দিকে তার উদ্ভাস চূড়ার গিরে দাঁড়াতে হবে আবার, প্রতি-দিনের জীবনে জাগিয়ে তুলতে হবে চিরদিনের ভারতবর্ষের-হৃস্পন্দনকে; পুঁথির সত্যকে অনুবাদ করতে হবে জীবনের সত্যে। অনাবিষ্কৃত পড়ে রয়েছে ভারত-সাধনার যে সব গৌরীশঙ্করের চূড়া নতুন করে সেখানে গিয়ে করতে হবে পদার্পণ। দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন পড়ে রয়েছে যে সব যোগসূত্র, খুঁজে খুঁজে তাকে আবার গড়ে তুলতে হবে একসূত্রে সংহত করে। ব্রতধারী পরিব্রাজকের মতন আবার বেরুতে হবে ভারত-সাধনার তীর্থে তীর্থে।

এপার ওপার কতদূর ?

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মাঝখানে গেছে ছোট নদী যমুনা এতটুকু সরু, তবু পারাপার হতে খেয়া-নৌকার দরকার হয় বইকি। জল কালো ঘন-কালো বর্ষার কূলে কূলে ভরে ওঠে, অনেক দিন কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে দুপাশের সোনা মাঠের বুকে তাতে জমির উর্বরতাই বাড়ে এবং ফসল উৎপন্ন হয় ভালো রকমই। এর মধ্যে ওপারে এপারে গড়ে উঠলো কয়েকটা কলকারখানা। সৃষ্টি হল কয়েকটা কলোনী এবং যেখানে মানুষের প্রায় সাড়া পাওয়া যেত না সে সব জায়গা সরে উঠলো ভরে।

মাঠের সৌন্দর্যই শুধু নষ্ট হল না। ফসলও মারা গেল, তবে কারখানায় অনেক লোক কাজ পেলে একথা ঠিক। এই কলকারখানা এবং কলোনী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির চেহারা বদলে গেল। একে উন্নতিও বলা চলে কেউ অধোগতিও বলবেন। গ্রামের চাষীরা আশেপাশে হয়ে চেয়ে থাকে কালে চালে হল কি? দেশ যায়, ধর্ম যায়, ঘরের পবিত্রতাও যে নষ্ট হয়। মাঠের কাজ ছেড়ে দেয় চাষী ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় কারখানার কাজে। হবে নাই বা কেন? চাষী আজকেরদিনে চাষা হয়ে থাকতে চায় না, বরং মজুর বলে পরিচয় দেওয়াটা ওরা গৌরবজনক বলে মনে করে।

হাজার হোক চাকরী তো বটে।

মনের অন্তরালে এই আশাটাই ছিল হয় তো, বাবুরা যখন সকালে নাকে মুখে ভাত গুঁজে যান কাজ করতে সন্ধ্যায় ফেরেন, মাস গেলে মাইনে মেলে; তাঁরাও হপ্তা মজুরীতে তেমনই কাজ করবে—এ যেন বাবুয়ানার চরম। চাষার জীবনে এ একটা লোভনীয় আকর্ষণ বইকি। আজ যেন সে সুযোগ এসেছে—এরা তা ছাড়তে পারে না বলেই মাঠের কাজে ইস্তফা দিয়েছে।

রামগতির সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায় পুত্র শঙ্করের—রামগতি চায় না শঙ্কর কারখানার কাজে যোগ দেয়। কয়েক বিঘা জমি আছে তার। এ জমিতে সোনা ফলে। প্রতি বৎসর এত ধান হয় যাতে বৎসরের ধান গোলাভরে রেখে বাকিটা বিক্রয় করে বৎসরের নূন কাপড়ও কেনা চলে।

রামগতি বলে—"আমি ফেলে ছড়া চাষীরীতে কাজ করে দুই দিন চালাতে পারবিনে শঙ্কর যা দিনকাল পড়েছে এর পর একমুঠো চাল পাবিনে। গেলই বা এক বছরের দুর্ভিক্ষ, কে বলতে পারে আবার তেমনি কি তার চেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ এদেশে আসবে কিনা। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কত লোক যে ঘর ছেড়ে গেল কত মরলো কত হারালো তাদের জাত ইজ্জত, সেদিন আমি ঘর ছেড়ে যাইনি, যেমন করেই হোক জাত ইজ্জত বাঁচিয়েছিলুম। মাটি-মা দুহাতে ভরে সোনা ঢেলে দিয়েছিলেন আমার কোলে, সেই মাটি-মার অমর্যাদা করিসনে শঙ্কর, অনেক দুঃখ পাবি।"

বৃদ্ধ পিতার কথায় শঙ্কর হাসে

পিতা সেই ঘরে বসে আছে লাঙ্গল গরু, মাঠ আর ফসল, আজকালকার দিনে কয়জন লোক চাষা নাম নিয়ে, চাষের কাজ করে বাঁচতে চায়? উদয়াস্ত জমির কাজ—মাথার উপর আগুনের মত রোদ্দুরে, ঝর ঝর করে পড়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা, মাঠে হাঁটু সমান জল; চাষা নেহাৎ চাষা বলেই ওই মাঠে কাজ করতে পারে, ভদ্রলোক হলে ঘরে শুয়ে হয়ে যেতো—অন্য পরে কাকথা। ঝগড়াও বাধে এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত রামগতি ক্ষেপে ওঠে, স্পষ্টই বলে—"বাবি যা কাঁচা পয়সা রোজগার করতে, বাবু সাজতে; তাই বলে তোর বউ ছেলে আমি যে যেতে পরতে দিয়ে ঘরে রাখব সেটি হচ্ছে না। যেখানে যাবি বউ নিয়ে যাবি—হক কথা বলে দিচ্ছি।" বউ নিয়ে যাওয়ার কথায় একটু কাহিল হয়ে পড়ে শঙ্কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্ত্রী পুত্র নিতে যেতেও

হয়। তার বন্ধু গোবিন্দ খুব ভরসা দেয়, তার দুখানা ঘরের একখানা ঘরে শহরের স্ত্রী পুত্র কন্যা যথেষ্ট থাকতে পারবে। একলা ঘরে থাকে রামগতি—বারান্দায় বসে তামাক সাধে আর অবিশ্রান্ত তামাক খায়; চোখে দেখে পথ দিয়ে কত লোকই না চলেছে।

ছোট্ট অপরিসর যমুনার ওপারে মসিম চলে ঘন ঘন করে—চিমনী দিয়ে ধোঁওরা ওঠে, নোংরা জল ড্রেনের পথে গড়িয়ে এসে পড়ে যমুনার কালো জলে. তবু এমি জমাই যায় না, বিষাক্ত হয়ে ওঠে যমুনার কালো জল, বিকৃতও হয়ে ওঠে। বর্ষাকাল ছাড়া যমুনার বুক ভরে থাকে কচুরী পানায়, তবু পল্লীর মেয়েরা কলসীর ঢেউ দিয়ে পানা সরিয়ে যে জলটুকু নিতো সে জল ছিল পরিষ্কার এবং কাকচক্ষুর মত কালো, এখন সে জলের রং পালটে গেছে,—জলে দুর্গন্ধ ছাড়ে, উপায় নাই বলেই সে জল তারা নিয়ে যায়, কোন রকমে ফটকিরি দিয়ে থিতিয়ে নেয়, পরে কর্পূর দিয়ে দুর্গন্ধ নষ্ট করে কিন্তু রোগের জীবাণু তো তাতে মরেনা। এতকাল ছিল কেবল ম্যালেরিয়া জ্বর, গ্রামবাসী তার সঙ্গে বিশেষ পরিচিত, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যে কোন জ্বর হলেই তারা বলবে "ম্যালোয়ারি"। ম্যালেরিয়া জ্বরে তারা এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে নিজেদের দুর্বলও বিশেষ মনে করে না।

এখন আসতে সুরু করেছে কত নূতন নূতন রোগ—টাইফয়েড, ডিপথিরিয়া এমন কি অ্যানিমিয়া, ডিসপেপসিয়া আরও কত নাম কে জানে।

ওপারে গড়ে উঠেছে কলোনী। ছিল ধানের জমি, বুক চমক জলে—সে মাঠ তাকলে কথা কইতো, আঁচল ভরে সোনা ফেলে দিতো—সেই মাঠ আজ কলোনীতে সমৃদ্ধ, সারি সারি উঠেছে ঘর, বেশীর ভাগই খাঁপের বেড়, টালির চালা, খড়ের ঘর করতে দেওয়া হয় না, দৈবক্রমে আগুন লাগলে বাঁচানো হবে মুস্কিল। কত দেশের কত লোকইনা এসেছে। লোকে বলে পশ্চিম বাংলা সমৃদ্ধ হয়েছে, ধনে নয় জনে। আশ্চর্য্য, এই ফসলও আর তেমন জন্মায় না। পণ্ডিতেরা বলবেন—পৃথিবী এখন অতি বৃদ্ধা, বয়সের গাছ পাথর নাই। আদিম যুগ হতে মধ্যেরতী যুগ পর্য্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে উর্ব্বরতা শক্তি ছিল; অতিরিক্ত উৎপাদন করে পৃথিবী নিঃস্বা হয়ে গেছে, মাটির উর্ব্বরতা শক্তি নাই বলেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি গেছে নষ্ট হয়ে, ফসল উৎপাদনও গেছে খুব কমে।

সাধারণ লোকে বলে—পৃথিবী পাপে ভরে গেছে তাই ফসল উৎপন্ন হয় না। তারা জানতে চায় না বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি তর্ক, বিজ্ঞানকে তারা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেয়। রামগতি একহাতে হুঁকা ধরে টানে, অন্য হাতে কেশশূন্য মাথায় হাত বুলায়।

যমুনার পূর্ব্ব দিকে কারখানার কাজ করতে যাচ্ছে। রামগতি একেবারে আকাশ হতে পড়ে। কালে কালে হল কি—মানুষ কি করে ভুলছে তার কৃতজীবনটাকে? ঘরের বউ কি, তারাও যেতে চায় বাইরের কাজ করতে,—সে কাজও কারখানার এবং নানা রকমের নানাজন লোকের সঙ্গে মিলেমিশে। বনমালী সামন্ত হুঁকার ছাড়ে—"ইজ্জত আর রইলো না মণ্ডল, কালে কালে এসব হল কি?"

রামগতি হাসতে চায়, হাসি আসে না, সে শুধু অপর্য্যাপ্ত কাশে। খানিক বাদে কাশি থামে, হাঁপাতে হাঁপাতে রামগতি বলে—তা আর হবে না। কলির শেষ যে। নাস্তে আছে না কলির শেষে সব একাকার হয়ে যাবে জাত ধর্ম কিছু থাকবে না, মেয়ে পুরুষ সব ঘর ছেড়ে বার হয়ে পড়বে। ধ্বংস এসেছে যে—একে কি ঠেকাতে পারো সামন্ত? নইলে শুনেছো কখনও আমাদের এই দেশে না খেয়ে লোক মরে,—স্বামী স্ত্রীর ইজ্জত বিক্রি করে খায়। সে এত ঘন ঘন হাঁপাতে থাকে যে আর কথা বলতে পারে না। ধ্বংস আসছে—দেশের ধ্বংস, সামাজিক জীবনের ধ্বংস, জাতির ধ্বংস। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে বৃদ্ধ রামগতি মণ্ডল, বনমালী সামন্ত, নরহরি দাস। আর এদের কারও ভেঙেছে কারও ভাঙতে সুরু করেছে।

নরহরি, যে দুটি চারটি দাঁত আছে অবশিষ্ট—তাই কিড়মিড় করে বলে,—"এই যে লোকগুলো এসেছে, এদের জন্যেই আজ আমাদের এই অবস্থা হয়েছে। এইটুকু দেশ এত লোক ধরবে কি করে, এত লোক খাবেই বা কি?"

রামগতি মিস্ত্রির কপালে চার ভাঁজ পড়ল, দন্তহীন মুখে প্রশান্ত হাসি হাসে. তৎক্ষণে সে হাঁফটাকে সামলে নিয়েছে।

বললে—"চটো কেন বাবের পো, দোষ কারও নয়, দোষ আমাদের কপালের। ওই যে গান আছে জানোতো—

'দোষ কারও নয় গো মা,
আমি স্বধাত সলিলে ডুবে মর শ্যামা।'

আমরা নিজেরাই খাল কেটেছি, সেইখালে ডুবে মরছি, এর জন্য কাউকে দোষ দেওয়া চলে না। ও বেচারাদেরই বা অপরাধ কি বল? দলের পাপে দেশ দেশ, রাজার রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু খড়ের প্রাণ যায়, এ ঠিক সেই রকমই হয়েছে যে। মরছে এই সব হতভাগারা তারা এতকষ্ট সয়েও তবু জাত ধর্ম বিসর্জন দিতে পারলে না, নিজেদের চৌদ্দপুরুষের ভিটে, জমি জায়গা, বাগান পুকুর সব ফেলে পরের দেশে পরের দয়ায় কীবনধারণ করতে এসেছে দোষ তাদের নয়, দোষ আমাদের অদৃষ্টের কপালের লেখা, সব আমাদের কপালের

কথাটা এই সব দুঃখেরা যে দেখে এ তা নয় এই সব বাস্তুত্যাগীদের চার দুঃখের তারা চোখে দেখছে, এদের করুণ কাহিনী তারাও কানে শুনছে, মানুষের মন গলে গেছে। তবু মাঝে মাঝে বড় জ্বালায় বুক যখন পুড়ে থাক হয়ে যায় তখন মুখ ফেলে এরাই পাঁচ কথা বলতে ছাড়ে না। তবু এরা নিজেদের ঘর আঁকড়ে থাকতে চায়, ঘরের পবিত্রতা বজায় রাখতে চায়। পুরুষ কর্মস্রোতে ভেসে যায় যাক, মেয়েরা অন্ততঃপক্ষে ঘরে থাকুক, ঘরের আদর্শ অটুট থাক। আজ ঘর ভাঙার কল্পনাতেই সব অস্থির হয়ে উঠেছে। পিতাকে দেখতে অথবা নিজের ঐশ্বর্য দেখাতে আসে শঙ্কর,—সঙ্গে এলো সুমার্জিতা স্ত্রী, কন্যা এবং পুত্র। কারখানার মজুর হপ্তায় দেড়দিন ছুটি মেলে—ওতার ভিউটি দিলে সে দেড় দিনে সাত হয় কম নয়। কাঁচা পয়সা আছে এতে। চিবিয়ে চিবিয়ে শঙ্কর বলে—"মাঠের কাজ নিয়ে চাষা ঘরে থাকা আজকের দিনে আর চলে না। মাথা খুঁড়ে মর একটি পয়সা জুটবেনা। শুধু পেটে খাওয়া—সে তো শেয়াল কুকুরেও খায়।" কলোনী সব রকমের উন্নত হয়েছে। কল ও কারখানা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় ওপারটা বন্ধ ছোটখাটো একটি সহর হয়ে উঠেছে বলা চলে। ওখান থেকে মাইল তিনেক দূরে মহকুমা সহরে আছে সিনেমা—কলোনীর পুরুষেরা হপ্তাভোর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ছুটির দিনে স্ফূর্তি করে, সিনেমা দেখে—তাতে তাদের শ্রান্তি যায়। নতুন করে নাকি কাজে উদ্যম আসে। হারিয়ে গেছে শুধু উপযুক্ত ছেলেই নয়—হারিয়ে গেছে অতের লক্ষ্মী বধূ, হারিয়ে গেছে ভবিষ্যৎ বংশধর ছেলেমেয়েরা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে রামগতি।

শঙ্কর বাবু হয়ে গেছে। মাথায় তার ছোট ঝড় চুল—ঢেউ খেলে গেছে, গায়ে তার সৌখি পাঞ্জাবী, পরনের সূক্ষ্ম ধুতির কোঁচা শৌখীন, বাবুদের কায়দায় অতি সন্তর্পণে কোঁচা ধরে হাঁটে—পায়ে তার চকচকে জুতা—বাবুয়ানার চরম।

মনের অন্তরালে অতি প্রচ্ছন্নভাবে ইচ্ছার যে বীজ নিহিত ছিল, আজ অনুকূল ক্ষেত্রের মাঝে সেই বীজ হয়েছে মহীরুহ। বীজকে ধ্বংস করা সম্ভব হতো। কিন্তু সমস্ত শিকড় পঞ্জিয়ে যে মহীরুহ মাথা উঁচু করেছে তাকে ধ্বংস করা চলবে না।

বধূ শহরের চংয়ে চলে। এই কেত দুই বৎসরেই পল্লীর সে বধূর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামের লোক যে বধূর মুখ দেখতে পায়নি কোন দিন, সে এখন কেবল মাত্র খোঁপার উপর কাপড় রাখে। সে আধুনিক ধরণে পরেছে শাড়ি, পায়ে দিয়েছে স্যাণ্ডেল। বধূর মুখে কথা ফুরায় না—অথচ তার মুখের একটি শব্দ কেউ কোন দিন শুনতে পায়নি। পনের ষোল বৎসরের পৌত্র শিবনাথ—যে দাদুর সামনে কোন দিন অসংলগ্ন উক্তি করতে সাহস পায়নি সে আজ সামনে বসে বিড়ি খায়, গান গায়—

"বঁধু তোমায় চাউনিতে মোর
হারিয়ে গেছে প্রাণ।"

চৌদ্দ বৎসরের পৌরী—গ্রামে নাম ছিল পাচী, কলোনীতে গিয়ে নাম হয়েছে নীলাবতীবালা—সে রুক্ষ পথে লম্বা বেণী দুলিয়ে চলে, নাচের ভঙ্গীতে দাদুর সামনে হাতের বিবিধ মুদ্রা সহযোগে অঙ্গভঙ্গী করে নৃত্য করে—

তোমার তরে সাজিয়ে বরণ ডালা
দাঁড়িয়ে আছি পথের ধারে
হে প্রিয়তম মম—

রামগতি যেন নিশ্বাস ফেলতেও ভুলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে এদের দিকে।

অনভিজ্ঞ সেকালের লোক জানে না পৃথিবীর কত দ্রুত আমূল পরিবর্তন হচ্ছে—আরও কত হবে। রামগতি মনে মনে আকুতি জানায়—"আর কেন ভগবান, আমায় নাও, এ অধঃপতন আমি আর সইতে পারিনে, দেখিতে পারিনে।"

তবু মুখ ফুটে সে ছেলেকে বলেছে—কি করছিস শঙ্কর, সকলকে একেবারে অধঃপাতে দিলি! শিবনাথ, পাঁচু, বউমা, এরা কি ছিল কি হয়েছে কতদূর এগিয়েছে। এখনও সময় আছে শঙ্কর, ছেড়ে দে এ মজুরীর কাজ, —যন্ত্র আর তন্ত্রবা তার ছেড়ে বেশ করছেই হচ্ছে, উপরন্তু সব যে যায়। নিজের পরিবার তাকিসনে শঙ্কর, মজুরের কাজ ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ে ফিরে আয়, যেমন কাজ করছিলি তাই কর। মাইরী হলো কাঁচা পয়সা, আর ভদ্রলোক পেটভরে খেতে পাবি—"

শঙ্কর ঠোঁট উল্টে হাসে, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে—"হুঁ, আবার ফিরে এসে মাঠে চাষবাস করি। চিরটা কাল এক সমানই কাটালে বাবা, জগৎ যে কিরকম ধারায় চলছে তাতো জানো না। পিঠে যাচ্ছো কোঁড় গোনোনা কত ধানে কত চাল হয় সেটা যদি জানতে তাহলে মানুষ হতে পারতে।

কিন্তু অমানুষ যে কি করে হল তাই বুঝতে পারেনা রামগতি তাই মানুষ পুত্রের পানে ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে।

চোখের সামনে দিয়ে কাজ করতে যায় মঙ্গলের স্ত্রী, হরিশের বিধবা মেয়ে প্রভৃতি। মঙ্গলের স্ত্রী বেপরোয়াভাবে সকলের প্রথমে ঘরের আগল ভেঙে বার হয়েছে, তারপর ঝাঁক বেঁধে বের হয়ে এলো ঘরের মেয়ে-বউয়েরা।

বৃদ্ধেরা তাকিয়ে দেখে বর্তমান দিনের জবোয়াতি। কেউ কিছু বলতে গেলে মেয়েরা রুখে দাঁড়ায়।

বিধবা মেয়ে টেঁপু স্পষ্টই বলে—"খেতে দিতে পারবে, তার সঙ্গে সঙ্গে পরতে? হাঁ, একেবারে পাকা লেখাপড়া করে দিতে হবে, কাঁকা কথায় হচ্ছেনা—পাকা রকম চাই।"

ছেলেরা মেয়েদের আগে পিছনে যায়, তাল কানাই তুড়ি দিয়ে গান করতে করতে চলে—

গয়লা পাড়ার মদনা বোঁড়া
মজিয়ে গেল প্রাণ (মদনী)

মেয়েরা হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে কানাইয়ের ভাবভঙ্গি দেখে।

ঘর সবারই ভেঙেছে—শূন্য ঘর পড়ে কাঁদে। ঘরের উঠানে, বারান্দার দরজার উপর আজ আর কেহ আলপনা দেয়না, উঠানে গোবর জল ছড়িয়ে দিয়ে বাসী উঠানের পাঠ কেউ সারে না। সন্ধ্যায় আর শাঁখ বাজেনা, ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজা আর হয় না। ঘরের লক্ষ্মী সব ঘর ছেড়ে বাইরে বার হয়ে পড়েছে পেটের চিন্তায়।

একদিন একখানা মোটা কাপড়েই লজ্জা নিবারণ হতো, আজ আর তা হয় না, আজ চাই সুপার ফাইন, ধুতি, শাড়ী। মেয়েদের আজ চাই সেমিজ, ব্লাউজ পেটিকোট। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার কম দামী পাউডারও মেখে।

রামগতি দীন নেত্রে তাকায়।

কে জানে কি করছে তার নাতি-নাতনী, কি করছে তার পুত্র-পুত্রবধূ।

নদীর ওপারে কলোনী কারখানা—একটা নয় পর পর অনেক কারখানা গড়ে উঠেছে। ওপারটা নাকি ছোটখাট সহর হয়ে উঠেছে।

লাঠিটা হাতে নিয়ে রামগতি মাঝে মাঝে যমুনার ঘাটে বসে, তাকিয়ে থাকে দূর পারের দিকে!

মনশ্চক্ষে দেখে সেই অতীতের ছবিটিকে, বিঘার পর বিঘা ধানের জমি। আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধানের শীষে বাতাসের দোলা লেগেছে, সেই ধানক্ষেতে কত নাম জানা—নাম নাজানা পাখীর আনাগোনা, কোলাহল মুখরিত নদীর দুকূল।

আজ সে সব পাখী আর আসে না, তাদের কোলাহলে পরিপূর্ণ হয় না নদীর দুকূল

দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—চোখেও বুঝি জল আসে।

শঙ্কর এসে দাঁড়ালো।

দৃষ্টিহীন আঁখি মেলে রামপতি জিজ্ঞাসা করে—"কে, কে এসেছো ?"

"আমি শঙ্কর বাবা"—

পিতার পায়ের কাছে বসে শঙ্কর।

রামপতি আশ্চর্য্য হয়ে যায়,—"শঙ্কর ?"

শঙ্কর ধীর কণ্ঠে উত্তর দেয়—"হাঁ, তোমার কথাই সত্যি হল বাবা, আমি ফিরে এসেছি। কল-কারখানা আর ভালো লাগল না তাই মাটি-মার বুকে ফিরে এলুম বাবা—"

রামপতি পুত্রের গায়ে হাত বুলায়—"হাঁরে, তোর কণ্ঠার হাড় উঠেছে, গায়ে একটু মাংস নেই, এত রোগা হয়ে গেলি যে ?"

শঙ্কর হাসে উত্তর দেয় না।

রামপতি আবার জিজ্ঞাসা করে—"কিন্তু ওরা,—বউমারা —ওরা কোথায় রইলো, ওদের আনলিনে ?"

শঙ্কর আস্তে আস্তে উত্তর দিলে—"ওরা সব হারিয়ে গেছে বাবা, ওদের খুঁজে পেলুম না।"

"খুঁজে পেলিনে,—তুই বলছিস কি শঙ্কর ?"

বৃদ্ধের মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না।

শঙ্কর একটা নিঃশ্বাস ফেলে—"হাঁ বাবা, ওরা সব হারিয়ে গেল। আমিও তো হারিয়ে গিয়েছিলুম বাবা, হয়তো চিরটাকাল অসহ্যভাবে সব হারানোর দলের সঙ্গে মিশেই কাটিয়ে দিতুম। বুকের জ্বালা জুড়ানোর জন্যে কত যে মদ খেয়েছি বাবা, তাতে জ্বালা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। তারপর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে—একা বিছানায় পড়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল—নদীর এপারে আছে যে গ্রাম, সেই গ্রামে আছে আমার ঘর,—সেখানে আজও আমার বাবা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি বাঁচলুম বাবা, কলোনীর দিকে আর না গিয়ে আমি ফিরে এসেছি আমার পৈত্রিক ভিটেয়।"

অন্ধ রামপতি পুত্রের শীর্ণ দেহে হাত বুলোতে থাকে।

সেইতো আসতে হল, কিন্তু কটা বছর আগে এলে সে স্বাস্থ্য হারাতো না, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও হারাতে হতো না। বর্ত্তমানের ঢেউয়ে তারা ভেসে গেছে দূরে—বহুদূরে, আজ তাদের নাগাল পাবে না শঙ্কর।

এপার ওপার কতদূর ?

সারা অন্তর আজ তার হাহাকারে আছড়ে পড়ে।

মেয়েটা উঠেছে কারখানার ম্যানেজার মেহতাল চাঁদের বাড়ী, সেখানে কিভাবে জীবনযাপন [illegible] শঙ্করের কাছে তা অজানা নাই। সেদিকে যাওয়ার ধিকার শঙ্করের নাই; একদিন বাক্স রেখে সে ফিরে এসেছে, আর যায়নি। স্ত্রী আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে মিশে যায় কারখানার কাজ করতে, রোজাই কেরোয় করে সে শঙ্করকে। পুত্র এখন উপযুক্ত হয়েছে, কারখানায় কাজ করে, দিন রাতের মধ্যে সে বাড়ি আসে না। পিতা-মাতা বা সংসারের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই স্পষ্টই সে জানিয়েছে।

কেউ চাইলে না শঙ্করের পানে—যে যার নিজের পথ করে নিয়েছে

শঙ্কর ফিরেছে তার নিজের ঘরে

দৃষ্টিহীন চোখ মেলে কোন দিকে তাকিয়ে থাকে রামপতি। নিরাশায় তার অন্ধ চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে।

শঙ্করের উপর রাগ করেই বধূ এবং ছেলেমেয়ে নিয়ে যেতে বলেছিল সে একদিন,—সেই কথাই ভাবে সে। শঙ্করকে ভয় দেখিয়ে জব্দ করতে চেয়েছিল সে,—শঙ্করকে তার ভাগ্যই জব্দ করেছে।

অন্ধকার ঘর খাঁ খাঁ করে।

কেবল একটি সংসারই নয়।

বর্ত্তমানের প্রবলতম ঘূর্ণিকায় বিক্ষুব্ধ নরনারী কোথায় কে ভেসে গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তরেও তারা বেঁচে ছিল—এই ধাক্কায় তারা ভেসে গেল. কে কোথায় গেল কে জানে।

ঘরে আলো না জ্বলুক, বাইরে আলো জ্বলছে, সেই আলোয় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তিনটি কাল—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ। শঙ্কর তাকিয়ে থাকে পথের পানে,—যে পথ দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়ে এগিয়ে চলেছে নদীর ওপারে কারখানার দিকে।

আধুনিকা

আশালতা সিংহ

মাধবী নামটা খুব আধুনিক নয় কিন্তু প্রজাপতির এমনই নির্বন্ধ যে মাধবীর এক অতি আধুনিক পরিবারে একটি আধুনিকতম পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। হওয়াটাও কিছু বিচিত্র নয়, কারণ কেবল নামই নয় ছেলে হিসেবে মাধবীর শিক্ষা-দীক্ষায় আধুনিকতার কোন ত্রুটি ছিল না। সে সংস্কৃতে এবং ইংরেজীতে দু'দুবার এম এ পাস করেছে। কীর্তন যেমন জানে তেমনই আবার পিয়ানোয় সে পশ্চিমের বড় বড় সুরকারদের সুর হুবহু নির্ভুলভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে। লোকে বলতো, এটা পাশ্চাত্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ হয়েছে মাধবীর শিক্ষায়। মাধবী শুনে মুখ টিপে হাসত। তার মনের গভীরে যে কোন্ কথাটি বাসা করে আছে তা ঠাহর করবার ক্ষমতা কারও ছিল না। ছেলেদের সঙ্গে সে মিশতো কিন্তু খুব একটা দূরত্বের সীমা রেখে, এই নিয়ে কোন কোন সহপাঠিনী তাকে ঠাট্টা করে বলতো, মাধবী এখনও সেই সেকালিনী মেয়েদের মত পর্দানশীলা রয়ে গেছে। আধুনিক জগতের প্রখর আলোক যথেষ্ট পরিমাণে সে গায়ে লাগায়নি লেখাপড়া শিখলে কি হবে। এ কথারও জবাবে মাধবী মুখ টিপে হাসতো। তার মুখ থেকে দু'একটা প্রতিবাদ কেবল শোনা যেত—যখন নারী-সঙ্ঘের সভায় তারা মাধবীকে যথোচিত নিন্দা করে বলতো, মাধবী, তুমি তাই এত লেখাপড়া শিখেও মেয়েদের অধিকার ও স্বাধীনতার চেষ্টার কোনই সাড়া দাও না। পুরুষদের কবে গাল দিয়ে এবং অত্যন্ত ঝাঁঝালো আচরণের দ্বারা তাদের সম্যকরূপে শিক্ষা দেওয়া দরকার। এ চেষ্টায় কই তোমার এতটুকু সহানুভূতি দেখিনে? তখন আর থাকতে না পেরে মাধবী বলতো, কি করে দায় সেব বল ভাই, তোমরা যে বিধাতার সরল রেখাটার উপর জোর করে কালীর আঁকিবুকি কাটবার চেষ্টা করছ। জগতের ইতিহাসের খাতাখানা খুলে পাতা উলটিয়ে যাও, দেখবে মেয়েদের স্বাধীনতার পথে প্রথম নিশানা তুলে দাঁড়িয়েছে শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতিভা।

যারাই পুরুষ শ্রেষ্ঠ—সে যুগে বুদ্ধদেব থেকে এ যুগে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সকলেই দেখবে স্ত্রীজাতিকে বাঁধন খুলে মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন অন্য দিকে আবার দেখো শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতিভার মূলে তাকে অভিসিঞ্চিত করছে নারীর পুণ্য। বুদ্ধদেবের তপস্যায় সেবিকা সুজাতার পরমান্ন, খ্রীষ্টের সেবিকা মাথার আত্মনিবেদনের ছবি কি ইতিহাসের পাতায় পাতায় নেই?

মাধবীর উত্তরে তার প্রগতিশীলা বান্ধবীর দল ভ্রূকুঞ্চিত করে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে প্রত্যুত্তর দেয়া যতই যা বলো ভাই, তুমি বড় সেকেলে।

এমন বছরে পা দিয়েই মাধবীর বিয়ে হয়ে গেল। নানাস্থানে কথাবার্তা হচ্ছিল। এঁরা একবার মেয়ে দেখেই অতিশয় পছন্দ করে ফেললেন, আধুনিক পরিবারের প্রথামত বিমানবিহারী, মেয়ে নিজে দেখতে এলো। মন জানাজানির জন্যেও দু'একমাস মেলামেশার আয়োজনের কোন ত্রুটি রইলো না, কিন্তু মাধবীর কলেজের বান্ধবীরা হতাশ হয়ে একবাক্যে বললে, ব্যাপারটা একেবারে গদ্যময়। এর মধ্যে না রইল একটু ফাঁক না হ'লো কোন রোমান্স। এর জবাবেও মাধবী মুখ টিপে একটু হাসলে, কোন উত্তর দিলে না।

মাধবীর স্বামী বিমানবিহারী ক'লকাতার এক নামজাদা অফিসে চাকরি করেন। বিয়ের পরে তিনি স্ত্রীর কাছে প্রস্তাব তুললেন, যদি তুমি বলো তাহলে আলাদা একটা বাড়ী করে আমরা থাকি। মাধবী একটু বিস্মিত হয়ে বললে, কেন এ বাড়ীটা কি দোষ করেছে? তোমার আটাশ

গুরু যদি নিশ্চিন্তে এই সাড়ীটুকু কেড়ে থাকে তবে আজই তা দুঃসহ হয়ে উঠলো কেন? বিমান গম্ভীর হয়ে বললে, মনেপ্রাণে আধুনিক হব এই আমার আদর্শ। এতদিন বিয়ে করিনি একাই ছিলাম। বহু পরিজনের মধ্যে কোন গতিকে দিন কেটে যাচ্ছিল, দারিদ্র ছিল না। বিশেষ করে কারও প্রতি। আজ তোমাকে বিয়ে করে ঘরে এনেছি, তুমি চাকরি করতে পারতে, স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারতে, এদিকে সম্পূর্ণ সক্ষম ছিলে তুমি। তবু যে, সে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে আমার ঘরে এসেছ এর মধ্যে আমার কি একটা দায়িত্ব নেই যে, তোমাকে স্বাধীনভাবে ঘর বাঁধবার সুযোগ এবং সুবিধা আমি করে দেব?

মাধবী বললে, অন্যের ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি আমরা স্বাধীন থাকতে পারি সেইটে চের বড় সত্য। উপস্থিত তো আমার কোথাও বাধছেনা। যদি কখনও বেকে, নিজের শক্তিতে যদি সমাধান করতে না পারি তখন নিশ্চয়ই তোমাকে বলব।

বিমান একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, আমার জন্যে বা আমার আত্মীয় স্বজনের সুখ সুবিধার জন্যে তুমি নিজের ব্যক্তিত্বের হানি করবে, সেটা আমার পক্ষে ক্লেশকর।

মাধবী বললে, যদি তুমি সত্যিই আধুনিক হতে চাইতে তাহলে একথা বলতে না। কারণ আধুনিক কথাটা খুব শক্ত আর সত্যিকার তা হওয়া আরও শক্ত। সমস্ত সম্বন্ধ থেকে দূরে একা থেকে আপন স্বাধীনতা বজায় রাখতে হলে তো বনে গিয়ে বাস করতে হয়। সমস্ত যোগকে স্বীকার করে নিয়েও আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাও সকল বিরুদ্ধ এবং সুরগ্রাম থেকেও একটি ঐক্যের সুর বার করাই আধুনিক হবার সাধনা। কিন্তু সত্যই কি তুমি আধুনিক হতে চাও? আমার কিন্তু একথা মনে হলে ভারি কষ্ট হয়। বিমান অবাক হয়ে বললে, কষ্ট হয়! তার মানে? তুমি কি চাও তোমার স্বামী একটি আদিম বর্বর মানুষ হবে?

মাধবী তার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ মৃদু হেসে বললে, মেয়ে মানুষের চাওয়া বড় গোলমেলে। তারা সত্যি কি চায় আর না চায় তা স্বয়ং ভগবানেও জানেন না। আমি তা বলিনি তাছাড়া আমার চাওয়া অনুসারেই যে, তোমাকে নিজের

উপর আমার একান্ত শ্রদ্ধা রয়েছে। এবারের "কৃষ্ণ" মাসিক পত্রিকায় প্রথমেই তাঁর যে কবিতাটা বেরিয়েছে, সেটা পড়ে প্রফুল্লবাবুর মত দুরন্ধর সমালোচককেও স্বীকার করতে হল যে,মেয়েদের মধ্যেও দু'একজন ভাল লেখে। "পূর্ণিমা" কাগজের সম্পাদক এদিকে আমায় অনুরোধের উপর অনুরোধ করছেন, মাধবী দেবীর দু'একটা লেখা যেন তাঁদের কাগজে জোগাড় করে দিই। তুমি একটু বলোনা ভাই তাঁকে। সেই লোভেও অনেকটা এসেছি।

বিমান একটু ম্লানমুখে বন্ধুকে বললে, আমিই নাহয় অফিসে ছিলুম, মাধবী তো বাড়িতেই রয়েছে, তাকে ডেকে পাঠালেই পারতে মাধবী লিখতে চায় না, আমি লুকিয়ে তার কবিতার খাতাটা তোমাকে দিয়েছিলাম। কাগজে এর লেখা বার হয়ে গেছে, এখনও সে নিজেই জানে না। নীরদ গম্ভীর মুখে বললে, এমন একটা প্রতিভা অকালে নষ্ট হওয়া উচিত নয়। তোমার এ বিষয়ে বন্ধুর মত উৎসাহ দেওয়া উচিত। দিও বুঝলে ?

দেখি কত দূর কি করতে পারি। বিমান সদরের এলাকা ছেড়ে বাড়ীর অন্তঃপুরের দিকে গেল। একতলার ঢাকা বারান্দায় একটা ছোলা উনুনে তখন মাধবী গোকুল পিঠে তৈরী করছিল। বিমানকে দেখে খুব আনন্দিত হয়ে বললে, বাঃ আমি মনে মনে ঠিক ভাবছিলুম পিঠেগুলা হয়ে গেল, এবার ভিজের কচুরিগুলি ভাজব। কিন্তু তুমি এখন অফিসে, গরম গরম খেতে পাবে না। ঠিক সময়ে এসে পড়েছতো !

বিমান পাশের বেতের মোড়াটায় বসে বললে, তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে নীরদ যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করে রয়েছে, অনায়াসে তোমাকে ডেকে পাঠাতে পারতো। আমি নেই তাতে কি হয়েছে ? এইসব সেকেলে-পনা করবার এই আধুনিক যুগেও প্রয়োজন রয়েছে নাকি ? আমার তা মনে হয় না।

মাধবী হাতের কাজ শেষ করতে করতে বললে, আমার কিছু কাজ ছিল, ডেকে পাঠালেও যেতে পারতুম না। এখনও কচুরি ভাজা শেষ না হলে অন্য কোথাও যাওয়া মুস্কিল। ভিজিসগুলো চারদিকে ছড়ান রয়েছে। তা'হলে তাকে এখানেই ডেকে পাঠাই। এই বলে উঠে দাঁড়াল। বাইরে তখন বৃষ্টি সুরু হয়েছে, সেই সজল অন্ধকারের দিকে চেয়ে মাধবী একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, আমি মনে করে ছিলুম এই আসনটা পেতে তোমাকে খাওয়াব। আর সেখানে কেউ থাকবেনা।

চলে যেতে যেতে বিমান সতৃষ্ণ নয়নে সামনের পাতা একখানি মৃদুণ্ড আসনের দিকে চেয়ে বললে তা হয় না, আমার বন্ধুরা এমনিতেই আমাকে ঠাট্টা করে বলে, মুখে তুমি যতই আধুনিকতার বক্তৃতা দাও, কাজের বেলা দিন দিন ক্রমশঃ অতি পুরাতন যুগে ফিরে চলেছ। তার উপর নীরদ বেচারা দুপুর থেকে বসে রয়েছে অপেক্ষা করে।

রাত্রিবেলায় মাধবী অনুযোগ করে বললে তুমি আধুনিক হতে চাও বলে আমাকে এই সব কবিযশপ্রার্থীর ছিন্না ছিন্না কবিতা দেখতে হবে ?

বিমান এবারে তার যথোচিত কোন উত্তর দিতে পারলে না ! চুপ করে রইল।

মাধবী তার কাছে—খুব কাছে সরে গিয়ে কানে কানে বলার মত করে মৃদু স্বরে বললে, সমস্ত গভীর সুরের ভিতর সার কথাটা হচ্ছে একা থাকার সাধনা। তুমি আর আমি দুজনে যখন একা একা থাকব তখনই কি তা ধ্বনিত হয়ে উঠবেনা ? আজকালকার দিনে মোটেই আমার আধুনিক হবার অভিযানে যোগ দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না, বরঞ্চ যে গান গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে যদি তুমি শোন তো গাই।

সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো এস্রাজটা পেড়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর বাজাতে বাজাতে মাধবী গাইলে—

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন নদীর পারে,
গহন কোন বনের ধারে,
গভীর কোন অন্ধকারে,
হতেছ তুমি পার.....

গান তখনও শেষ হয়নি,বিমান সহসা ঘাপছাড়ার মত বলে উঠলো, কাল আমার অফিস থেকে ফিরতে সন্ধ্যে হবে, একটা জরুরি কাজ আছে, জ্যোতির্ময় আসবে বিকালে

তার সঙ্গে ছটার শোতে তুমি রোমিও জুলিয়েট অনেক দিন পরে হচ্ছে, দেখতে যেও। জ্যোতির্ময়কে আমি কথা দিয়েছি না বলো না যেন।

মাধবী এল্যাজটা পাশে নামিয়ে রেখে বললে, এই গানের বদলে এই জবাব মুখে এলো?

বিমান অসহায় সুরে বললে কি করবো, জ্যোতিকে যে একরকম আমি·····ওরা বলছিল, মাধবীদেবী তুমি না থাকলে অনায়াসে আমাদের সঙ্গে মেশেন না·····মাধবী মাঝ পথে বাধা দিয়ে বললে, কি মিশবো? ওঁরা কি আমার সঙ্গে মিশতে চান? যদি আমার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে ওঁরা লাভবান হতে চাইতেন সে আলাদা কথা। কিন্তু থাক ও কথা, তুমি যদি সত্যি আধুনিক হতে চাও তাহলে আজ থেকে আমার কাছেই তোমাকে পাঠ নিতে হবে। কোন দিন তোমাকে কোন উপরোধ করিনি কিন্তু আজ এটা একটু জোরের সঙ্গেই বলেছি। কারণ আমারও নিজস্ব একটা সাধনা আছে, সত্যিকারের আধুনিক হওয়া। সেটা করতে গেলে কি হতে হবে জানো? সমস্ত রকম সংস্কার মুক্ত হয়ে গভীর ভাবে জীবন রসের প্রত্যেকটা মুহূর্ত পান করতে হবে। যেমন আজকের এই রাত্রি মন থেকে বন্ধুভয় আর লোকভয় ভুলে রেখে একে নিবিড় রূপ মনের মধ্যে দিয়ে আসতে দাও বাধা দেবে কেন?

এই বলে মাধবী আবার তার এল্যাজটা তুলে নিয়ে গাইতে সুরু করল—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধুহে আমার"

বিমান অত্যন্ত নীরব নিশ্চিন্ততায় আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে গানের আরম্ভ কেদারাটায় শুয়ে শুনতে লাগলো।

জীবিত ও মৃত

অনেকদিন আগের কথা।

বাংলাদেশের বেতার অফিস। একদল লোক এসেছে প্রোগ্রাম কর্তার কাছে। বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় সম্বন্ধে একটা প্রোগ্রাম করার প্রস্তাব নিয়ে।

প্রস্তাব শুনেই বেতারের শিশু প্রোগ্রাম পরিচালক বলে উঠলেন, দেখুন, এ তো সম্ভব নয়।

—কেন?

—বেতারের নিয়ম হলো, জীবিত লোক সম্বন্ধে কোন প্রোগ্রাম করা চলবে না।

ভদ্রলোকরা হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন।

কিন্তু বেতারের সেই প্রোগ্রাম কর্তা ঠিক কথাই বলেছিলেন, কারণ সুকুমার রায় সত্যই জীবিত, মৃত হলো সেই প্রোগ্রাম কর্তা।

১৮৫৭ সালের ২৯ মার্চ এই বাংলাদেশেই ব্যারাকপুরে বেঙ্গল নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির ৩৪শ রেজিমেন্টের ৫ম বাহিনীর ১৪৪৬ নম্বর সিপাই মঙ্গল পাণ্ডে প্রথম বন্দুক ছোঁড়ার পরই শুরু হয়ে গিয়েছিল চিরস্মরণীয় সিপাই বিদ্রোহ। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষে। বিদ্রোহের ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, বাহাদুর শাহের আলী খাঁ, নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, বক্তিয়ার খাঁ, সাহাবাদের কুনওয়ার সিং, মেদিনীপুরের কৃষ্ণচন্দ্র ভেওয়ারী, বাঁকুড়ার নীলমণি সিং, আজমের মনীরাম দত্ত, লক্ষ্ণৌ-এর বহুমন আবদুল্লা এবং আরও অনেক নাম। ইংরেজ শক্তির কবলিত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই এই ব্যাপক বিদ্রোহের লক্ষ্য না হলেও স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহই ভারতের সমস্ত বিক্ষোভের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সিপাই বিদ্রোহ যদিও ওর স্থায়ী হল মাত্র, কিন্তু আগুন একেবারে নিভিয়ে ফেলা গেল না। পাঞ্জাবে জ্বলে উঠল রাম সিং, মহারাষ্ট্রে বাসুদেব বলবন্ত পাণ্ডকে, গৌলতরাও বাবেলী আর গোবিন্দরাও পাণ্ডারে এবং মণিপুরে সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিং।

বাংলাদেশে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতির লেখনী আগুন ছড়াতে শুরু করলেও এ ইতিহাস সর্বজনবিদিত যে, ইংরেজের সর্বপ্রকার কবলমুক্ত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন প্রথম দেখেছিল মহারাষ্ট্র এবং যে মানুষটি সর্বপ্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ভারত স্বাধীন করবার পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করবার উদ্দেশ্যে বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কাজে নেমেছিলেন তাঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক। মহারাষ্ট্রকেশরী তিলক। গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে তার সূচনা। তারপর স্থাপিত হয় 'মিত্র মেলা', পরে রূপান্তরিত হয়ে নামকরণ হয়, 'অভিনব ভারত সোসাইটি'।

চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, প্রকাশ্য জনসভায় ও কর্মিদের গুপ্ত বৈঠকে এই সবরই ঘোষণা করা হত। গান গাওয়া হত :

সাভারকরের কর্মকাণ্ড

হায়, পরাধীন জীবন যাপনে তোমার লজ্জা নাই !
যদি না থাকে, তাহলে আত্মহত্যা কর।
জঙ্গলের যত দুর্বৃত্ত শয়তান গরু ছাগলকে হত্যা করে,
উল্লাসে নৃত্য করে, বলে, ওদের কষ্ট থেকে মুক্তি দিলাম।
তুমিও মরবার আগে ইংরেজ হত্যা কর।

শুধু গান কেন, মহারাষ্ট্রের পত্র-পত্রিকাতেও জন-মানসের বিক্ষোভ ফেটে পড়ত। ১৮২৬ সালের ১১ এপ্রিল 'সুধাকর' পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে শিবাজী উৎসবের মূল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে যাথর্থীন ভাষায় মন্তব্য করা হয়েছিল, এই মুহূর্তে আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন একটি দ্বিতীয় শিবাজীর। কিন্তু তাঁর আদর্শ হবে কিঞ্চিৎ অন্যরূপ। আমাদের জাতীয় বিশ্বাসের ওপর যে হামলা চলছে, আমাদের নালিশ তার বিরুদ্ধে নয়। আমাদের বিক্ষোভ রাজ কিংবা রিয়ার সেই সব অত্যাচারী অফিসারের বিরুদ্ধে যাদের অত্যাচার হেডেই চলেছে দিনের পর দিন।

এই সব সাহসিক অভিব্যক্তির মূলে ছিলেন সেই মানুষটি যাঁর নাম বালগঙ্গাধর তিলক। লোকমান্য তিলক। মহারাষ্ট্রকেশরী তিলক।

দীপঙ্কর

তাঁর অসমসাহসিক সর্বকার্যে প্রধান সহযোগী ও বন্ধু ছিলেন শিবরাম যাদব পরাঞ্জপে।

বাংলাদেশে বিপ্লববাদের প্রবর্তার নাম যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিপ্লববাদের আদিগুরু অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু মহারাষ্ট্রেই সূত্র হয়েছিল প্রথম বিস্ফোরণ। বরোদা থেকে বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে অরবিন্দ তিলকের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিপ্লবের প্রেরণা লাভ করেন।

মহারাষ্ট্রের অবিস্মরণীয় অবদান সেই তিনটি ভ্রাতা, দামোদর হরি চাপেকর, বালকৃষ্ণ হরি চাপেকর আর বাসুদেও হরি চাপেকর। নিহত হল সাতারার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ র‍্যাণ্ড এবং লেফটেন্যান্ট আয়ার্স্ট। তারপর নিহত হল পুলিশের গুপ্তচর গণপৎরাও দ্রাবিড় এবং রামচন্দ্র দ্রাবিড়।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে অকম্পিত কণ্ঠে দামোদর গান গেয়েছিলেন, 'নারায়ণ জয়, গোপালহরি জয়।'

গুপ্তচরদ্বয়ের হত্যাপরাধে বাসুদেব ও তার বন্ধু মাধব বিনায়ক রাণাডের প্রতি লঘু দণ্ড হলে যখন ফাঁসীর আদেশ দিলেন, পরিহাসচ্ছলে বাসুদেব সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন জজকে, দুজনের হত্যার জন্য যখন দুবার ফাঁসীতে ঝোলানো হবে, তখন জিজ্ঞেস করতে পারি কি, গণপৎরাও আর রামচন্দ্র কার জন্য আগে ফাঁসী হবে?

ফাঁসীর হুকুম শুনে বালকৃষ্ণ বলে উঠেছিলেন, ধন্যবাদ!

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম বোম্বাই শহরে হলেও মারাঠি যুবকদের একটা বড় অংশ অনুরোধ উপরোধ আবেদন নিবেদনের দ্বারা কখনও বলদর্পী ইংরেজের অত্যাচার লাঘব করা যাবে, তা বিশ্বাস করত না। তাদের আস্থা ছিল বন্দুকের জোরে, বোমা-রিভলভারে, পর পর হত্যাকাণ্ডের দ্বারা শাসকগোষ্ঠীর মনে ত্রাস সৃষ্টিতে। ভারতে ওদের জীবন দুর্বিসহ করে তোলাই ছিল এদের ব্রত। তারা বিশ্বাস করত, এই পথেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা।

মারাঠি সৌখ যুবকদের তালিকার আর একটি নাম, বিনায়করাও দামোদর সাভারকর। ১৯০৫ সালে বাইশ বৎসর বয়সে বি-এ পাশ করে পরের বৎসর আইন পড়বার জন্য লণ্ডন যাত্রা করেন। পূর্বেই তিনি অভিনব ভারত সোসাইটিতে যোগদান করেছিলেন। লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে সোসাইটির এক গোপন বৈঠকে সাভারকর বলেন, আইন পড়তে যাবার কথা প্রকাশ করেছি বটে, কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য ভারতের বিপ্লবের বাণী সাগর-পারের লোকগুলোতে পৌঁছে দেয়া আর লণ্ডনে থেকেই বিপ্লবের কাজ করা।

র‍্যাণ্ড, আয়ার্স্ট এবং গণপৎরাও ও রামচন্দ্র নিহত হবার পরই পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠল। সন্দেহবশে অনেককে গ্রেপ্তার করতে লাগল, শুরু হল নির্যাতন চালাতে লাগল। বুঝতে দেরী হল না যে পুলিশ কাথিয়াবাড়ের অধিবাসী শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সম্বন্ধে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। ১৮৯৭ সালে কৃষ্ণবর্মা গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য একদিন চুপিসারে লণ্ডন পাড়ি দিলেন।

কিন্তু পরাধীনতার বেদনাবোধ যার অন্তরে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা সৃষ্টি করেছে, স্বদেশমাতার পুনরুদ্ধারের জন্য জীবন বিসর্জন দিতেও যে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না, পৃথিবীর প্রলোভনের কোন কিছুই কি তাকে ভুলে থাকতে পারে?

১৯০৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি' স্থাপন করলেন। পরাধীনতার জ্বালা যে কি দুর্বিসহ, এই সঙ্কটকালে জাতীয় ঐক্য যে কতখানি প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে লণ্ডনের ও ইয়োরোপের ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার এবং তাদের স্বাধীনতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তোলাই ছিল এই সোসাইটির উদ্দেশ্য। কৃষ্ণবর্মা লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য একটি আবাসও গড়ে তোলেন ১৯০৫ সালের ১ জুলাই।

১৯০৬ সালে লণ্ডনে এসে সাভারকর এই হাউসেই অবস্থান করেন এবং পুরোদমে সোসাইটির কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। ১৯০৭ সালে কৃষ্ণবর্মা 'পলিটিক্যাল মিশনারীজ ইন ইণ্ডিয়া' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন এবং যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিটি এই নতুন সংগঠনের সর্বভার গ্রহণ করেন, তাঁর নাম হরদয়াল।

ক্রমে ইণ্ডিয়া হাউসের ভার এসে যায় সাভারকরের হাতে। অভিনব ভারত সোসাইটির লণ্ডন শাখা পরিণত হয়।

জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত লণ্ডনের ভারতীয় ছাত্রেরা ইণ্ডিয়া হাউসের একদিক গোপন সভায় ভারত স্বাধীন করবার জন্য সর্বস্ব নিয়োগের কঠোর শপথ গ্রহণ করেন। ইণ্ডিয়া হাউসের বৈঠকে ভারত থেকে এসে ভাষণ দেন লালা লাজপৎ রায়, বিপিন চন্দ্র পাল ও আরও অনেকে। এই সব সভায় যোগদান করত যারা, তাদের মধ্যে একটি নাম মদনলাল ধিংড়া।

অভিনব ভারত সোসাইটির কয়েকজন বোমা তৈরী শুরু করলেন। উদ্দেশ্য, গোপনে গুলো ভারতে পাঠিয়ে বিপ্লবীদের হাতে পৌঁছে দেয়া, যাতে তারা গুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারেন। সাভারকর ভারতে ইংরেজের অত্যাচার এবং ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে বহু পুস্তিকা রচনা করেন এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সেগুলো ইংরেজদের দৃষ্টি এড়িয়ে বিতরণ করা হয়।

এবার পুলিশের টনক নড়ল। অভিনব ভারত সোসাইটির লণ্ডন শাখা থেকে সাভারকরই যে এই সব বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা সোসাইটির বোম্বাই অফিসে পাঠাচ্ছেন এবং অফিসের প্রধান কর্মি সাভারকরের দাদা গণেশপন্থ দামোদর সাভারকরই যে সেই পুস্তিকাগুলি বিতরণের ব্যবস্থা করছেন, পুলিশ তা বুঝতে পারল।

১৯০৯ সালের ২ মার্চ তারা গণেশপন্থের বাড়ী তল্লাসী করে অনেকগুলি পুস্তিকা পেল, গ্রেপ্তার করল তাঁকে।

ঐ মার্চ মাসেই ইণ্ডিয়া হাউসের অন্যতম পাঞ্চ চতুর্ভুজ আমিনকে সাভারকর ভারতে পাঠালেন। সবাই জানল, অনেকদিন দেশে যায়নি সে, তাই ছুটি নিয়েছে কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সাভারকরের ব্যবস্থাপনায় চতুর্ভুজের বাক্সের নীচে তৈরী করা হল একটি গুপ্ত খোপ, সেই খোপের মধ্যে তিনি কুড়িটি ব্রাউনিং পিস্তল ভরে দিলেন। তখনকার দিনে কাস্টমস বিভাগের এত কড়াকড়ি ছিল না। চতুর্ভুজ জাহাজে নিরাপদে এসে বোম্বাইতে নামল এবং সাভারকরের নির্দেশমত অভিনব ভারত সোসাইটির মাসিক শাখার কর্মি ও বিপ্লবী পাণ্ডারকরের কাছে সেই পিস্তলগুলি পৌঁছে দিল। নির্দেশ পাঠালেন সাভারকর, পিস্তলগুলি যেন কাজে লাগানো হয়।

ওদিকে লণ্ডনে মদনলাল ধিংড়া অধীর হয়ে উঠেছেন, একটা কিছু করতেই হবে। ওঁর আশেপাশের বন্ধুরা কিছুই আঁচ করতে না পারলেও খবর পৌঁছে গেল ওঁর বাবার কাছে। তাঁরই নির্দেশে মদনলালের দাদা চিঠি লিখলেন লণ্ডনে ভারত সচিবের এ ডি সি কার্জন উইলীকে, তিনি যেন ছোট ভাইকে সংশোধনের চেষ্টা করেন। উইলী ওঁকে ডেকে ধমকে দিলেন। মদনলাল স্থির করলেন, এই উইলীকেই খতম করতে হবে।

১৯০৯ সালের ১ জুলাই লণ্ডনের ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউটের জাহাঙ্গীর হলে ন্যাশনেল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ঘরোয়া সভায় মদনলাল ধিংড়া পিস্তলের গুলীতে উইলীকে হত্যা করে।

মতের ঘাসে আহমদাবাদে প্রকাশ্য রাজপথে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টোর গাড়ীর ওপর বোমা ফেলা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বোমা বিস্ফোরিত হল না। কিন্তু গ্রেপ্তার করা হল সাভারকরের সতেরো বৎসর বয়স্ক ছোট ভাই নারায়ণ সাভারকরকে।

সাভারকর প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে বোম্বাইতেও কাজ সুরু হয়ে গেল।

২১ ডিসেম্বর নাসিকের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে বিজয়ানন্দ থিয়েটার হল-এ যখন বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, অভিনব ভারত সোসাইটির আওরঙ্গাবাদ শাখার কর্মি অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

সুরু হয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলার সঙ্গে সাভারকরের দাদা গণেশপন্থকেও জুড়ে দেওয়া হয়। অনন্তলক্ষ্মণ কানাড়ে, কৃষ্ণগোপাল কার্ভে ও বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডের প্রতি ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয় এবং অন্যান্যের সঙ্গে গণেশপন্থের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড।

পুলিশ এবার নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, এ সবেরই মূলে আছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের বেঁটেখাটো ফীপদের সেই লোকটি, যার নাম বিনায়কবাও দামোদর সাভারকর।

তাঁর ওপর হুকুম জারী করা হল, ভারতে প্রবেশ করতে পারবে না।

ব্যারিষ্টারী পাশ করলেন তিনি, কিন্তু হুকুম জারী করা হল, বার-এ যোগদান করতে পারবে না।

উইলীর মত একজন উচ্চপদস্থ অফিসারের হত্যার ফলে সারা ইংলণ্ডে হৈ হৈ পড়ে গেল। ঘটনাও ইয়ার্ডের ঘুঘুরু গোয়েন্দাদের বুঝতে দেরী হল না যে, মদনলাল ধিংড়া গুলী চালালেও এই ষড়যন্ত্রের নায়ক হচ্ছে সেই ভারতীয় ব্যারিষ্টারটি, যার নাম বিনায়কদাও দামোদর সাভারকর। তারা যেমন প্রকাশ্যেই সাধারণভাবে ইণ্ডিয়া হাউসের বাসিন্দাদের, বিশেষ করে সাভারকরের গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে লাগল, সাভারকরও তেমনি প্রকাশ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের সমর্থন করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মদনলালের কাজের নিন্দা করে কোন সভায় বক্তৃতা হলেই সাভারকর তার প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। ইণ্ডিয়া হাউসের ছাত্রদের ওপর গোয়েন্দাদের নজর পড়ায় সাভারকর হাউস বন্ধ করে দিলেন, সারা লণ্ডন শহরে ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ল। লণ্ডনের ভারতীয়দের মধ্যে তারা বিপ্লবের বীজ ছড়াতে লাগল।

১৯০৯ সাল, ৯ জুলাই। লণ্ডনের রাজভক্ত ভারতীয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সভা। সভাপতির আসন গ্রহণ করেছেন মাননীয় আগা খাঁ। বক্তার পর বক্তা উইলী হত্যার নিন্দা করতে লাগলেন, কঠোর ভাষায় ধিক্কার দিতে লাগলেন মদনলাল ধিংড়াকে। কাপুরুষ, বহুলাঞ্ছ, সমাজের কলঙ্ক—এমনি সব মন্তব্য করতে লাগলেন। শ্রোতৃবর্গ নীরবে সেই ধিক্কার ধ্বনি সমর্থন করতে লাগলেন।

অবশেষে এল প্রস্তাব, 'এই সভা স্পষ্টহীন ভাষায় কার্জন উইলীকে নৃশংসভাবে হত্যার নিন্দা করিতেছে এবং গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইতেছে যে, হত্যাকারীকে যোগ্য শাস্তি দেয়া হউক।'

সভাপতি আগা খাঁ উঠে দাঁড়ালেন, ঘোষণা করলেন, সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হল।

অকস্মাৎ শ্রোতাদের মধ্য থেকে উচ্চৈঃস্বরে একটি কণ্ঠ ভেসে এল, না, না, সর্বসম্মতিক্রমে নয়।

কে? কে আপত্তি জানাচ্ছেন? আগা খাঁ বললেন, সামনে এগিয়ে আসুন।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল বেঁটেখাটো একজন ভারতীয়, আমি আপত্তি জানাচ্ছি।

কে আপনি?

আমার নাম বিনায়কদাও দামোদর সাভারকর। আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করি না। সাভারকর দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন, লিখে নিন, অন্ততঃ একজন প্রস্তাবের বিরোধীতা করছে, তার নাম ভি ডি সাভারকর, বোম্বাই-এর অধিবাসী ভারতীয়।

মার মার করে উঠল সবাই। চীৎকার, হল্লা, সাভারকরকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ চলল। ধেয়ে এল একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, প্রচণ্ড ঘুসি মেরে বসল সাভারকরের মুখে। চশমা ভেঙে গেল, দুপ করে পড়ে গেল।

সহকর্মি কজন সঙ্গে ছিলেন, তাদের একজনের পকেটে ছিল রিভলভার। টেনে বার করছিলেন আততায়ীকে শেষ করে ফেলবার জন্য। সাভারকর ইসারায় বারণ করলেন।

আরেকজন আততায়ীর মাথায় লাঠি মেরে বসলেন। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভূতলশায়ী হল।

পুলিশ গ্রেপ্তার করল সাভারকরকে।

কিন্তু ছেড়ে দিল কিছু পরেই।

বড় ভাই বাবারাও সঙ্গে পরিচিত, মিটোর ওপর বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে সন্দেহবশে ছোট ভাই গ্রেপ্তার, নিজের ভারত প্রবেশ নিষিদ্ধ, ব্যারিষ্টারী পাশ করেও ব্যারিষ্টারী করবার অনুমতি পাওয়া গেল না—মানসিক দুশ্চিন্তার ফলে সাভারকর অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

চলে এলেন ফ্রান্সে ১৯০৯ সালের শেষ দিকে।

ফ্রান্সে ছিলেন সেই বিখ্যাত ফরাসী মহিলা মাদাম কামা, ইংরেজের ক্রমবর্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত ভারতের বেদনা ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যিনি নানারকম পুস্তিকার মাধ্যমে প্রচার করছিলেন এবং সেই বহু প্রচেষ্টায় ইয়োরোপের ভারতীয়দের সুসংহত করবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাধ্যায়কার ও বিশ্রামের আশায় সাভারকর তাঁর ওখানে উঠলেন। মাসিক ষড়যন্ত্র মামলার দৈনন্দিন বিবরণ ঢাকযোগে পেতে লাগলেন।

এই প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলাতেই শাস্তার সঙ্গে সাভারকরকেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসে সাভারকরের অনুপস্থিতিতেই সুরু হল দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা। তাঁর ছোট ভাই নারায়ণকেও অভিযুক্ত করা হল তাঁর সঙ্গে। সাভারকরের প্রেরিত ব্রাউনিং পিস্তল দিয়ে জ্যাকসনকে হত্যা করা হয়েছে, সুতরাং সাভারকর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করেছেন, এই অভিযোগে তাঁর প্রতি দ্বিতীয় বার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

দু-দুবার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড! সাভারকর আর দ্বিরুক্তি করলেন না। সোজা চলে এলেন লণ্ডনে। স্টেশনেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল।

পরদিন পাঠানো হল ব্রিকষ্টন জেলে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাভারকরকে ভারতে পাঠানো হবে।

সে সময় ইংলণ্ড থেকে ভারতে যেতে হলে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফ্রান্সের মার্সেলিস বন্দরে এসে জাহাজে চড়তে হত। কিন্তু দুর্ধর্ষ ভারতীয় বিপ্লবীকে নিয়ে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ পথে যেতে সাহস করলেন না। তাঁরা স্থির করলেন সোজা সাগর পথেই সাভারকরকে পাঠানো হবে।

১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ্চ ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ইয়ার্ডের একদল সুদক্ষ পাহারাসহ সাভারকরকে বিরাট উপসাগরে জাহাজে তোলা হল।

জাহাজ রওনা হল।

গভীর রাত্রি। কুয়াশাচ্ছন্ন সমুদ্র। সেই পুরু আবরণ ভেদ করে কালো জল কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

জাহাজ প্রকোষ্ঠে বন্দী সাভারকর।

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিনায়কদাও সাবোদর সাভারকর।

লোকে শ্রদ্ধাভরে নামকরণ করছে, বীর সাভারকর।

সাভারকর গভীর চিন্তামগ্ন।

এই শীতেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

চার বৎসর পর দেশে ফিরছি। অভ্যর্থনা জানাতে সাদা পণ্টনরা আসবেন না, জেলে আছেন, ভাই নারায়ণ আসবে না, জেলে আছে। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আসবে সশস্ত্র পুলিশ আর কালো রং-এর বন্দী গাড়ী। আবারও জেলে যেতে হবে। লৌহ কপাট মুখব্যাদান করে রয়েছে। মাথার ওপর ঝুলছে দু-দুটো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড। অর্থাৎ আঠাশ বৎসর।

জাহাজ নোঙর করল।

কোথায়?

গবাক্ষের শিকের ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি প্রসারিত করেই ছিলেন সাভারকর, মার্সেলিস বন্দর। ফ্রান্সের সেই মার্সেলিস বন্দর। যে বন্দরে এসে তাঁকে নিয়ে জাহাজে উঠতে সাহস করেনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট। জাহাজ, দেখা যাচ্ছে, সেই বন্দরেই বাঁক কাটাতে এসেছে। আবার যাত্রা করবে প্রত্যুষে।

হঠাৎ সাভারকরের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

দরজায় নক করলেন।

বাইরে থেকে প্রহরী জিজ্ঞেস করল, ইয়েস?

শৌচাগারে যাওয়া দরকার।

দরজা খুলে বাইরে এনে বন্দীকে শৌচাগারে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রহরী বলল, তাড়াতাড়ি করো। তারপর দরজা ভালো বন্ধ করে দিল।

চতুর্দ্দিকে চাইলেন সাভারকর। কোনো ফাঁক নেই। শুধু মাথার ওপরে সিলিং-এ একটি ছিদ্র, খুব ছোট নয়। ভেতর দিয়ে দেখা যায় কালো আকাশের টুকরো। ঐ রন্ধ্র পথেই ঝির ঝির করে সমুদ্রের হাওয়া আসছে। একমাত্র ভেন্টিলেশন। ওর পাশে একটা হুকও দেখা যাচ্ছে।

ব্যস, আর দেরী নয়। ড্রেসিং গাউনটা খুলে ছুঁড়ে মারলেন হুক লক্ষ্য করে। গাউনটা আটকে গেল হুকে। হেঁটে খাটো হালকা শরীর সাভারকর গাউন বেয়ে উঠলেন ওপরে, ছোট্ট শরীর ছুটো দিয়ে গলিয়ে বেরিয়ে এলেন শৌচাগারের ছাদে। সেখান থেকে অনেক নীচে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হঠাৎ বিপদের শব্দ? বাইরের প্রহরী সচকিত হয়ে উঠল।

খালো, খালো, দরজা খোল, দরজা খোল।

কোনো সাড়া নেই।

খোল শিগগির। নইলে দরজা ভেঙে ফেলব।

কোনো শব্দ নেই।

জাহাজের জাকল প্রহরী। দরজা ভেঙে ফেলল। ক্লেসিং গাউন ঝুলছে। প্রিজনার পলাতক।

বাইরে এল ছুটে। ভোর হয়ে আসছে। তবু টর্চ ফেলে দেখা গেল সাভারকর প্রাণপণে পারের দিকে চলেছেন।

এলার্ম বাজিয়ে দিল। ছুটে বেরিয়ে এল প্রহরীর দল। ছুটে গিয়ে নামল তীরে।

ব্যারিষ্টার সাভারকরের জানা ছিল যে, ফ্রান্সের মাটিতে পা ঠেকাতে পারলেই আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বৃটিশ পুলিশ আর তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না। তীরে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন তিনি কোন ফরাসী পুলিশের সন্ধানে। ওর হাতে পড়লে আর এরা কিছু করতে পারবে না।

ছুটছেন তিনি তীর বেগে। বৃটিশ পুলিশও ছুটছে আন্তর্জাতিক আইন না মেনেই।

ভোর হয়ে গেছে। মার্সেলিস বন্দর জেগে উঠেছে। চলছে যানবাহন, লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছে। তাদের মধ্য দিয়েই ছুটছেন সাভারকর, ছুটছে জাহাজের বৃটিশ পুলিশ।

দেখা গেল একজন ফরাসী পুলিশের জমাদারকে।

ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, বললেন, আমি একজন ভারতীয় বিপ্লবী, তোমাদের দেশ থেকে বৃটিশ পুলিশ আমায় এমনি-ভাবে ধরে নিয়ে যেতে পারে না।

শুনল না জমাদার। মানল না আইন। বৃটিশ পুলিশের হাতে তুলে দিল।

বৃটিশ পুলিশ সাভারকরকে বন্দী করে আবার জাহাজে নিয়ে এল।

জাহাজ যাত্রা করল ভারত অভিমুখে।

বোম্বাই পৌঁছেই সাভারকরকে সোজা জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

ফরাসী গভর্নমেন্ট পরে সাভারকরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছে দাবী জানিয়েছিল, বৃটিশ গভর্নমেন্ট সে দাবী প্রত্যাখ্যান করল।

বীর সাভারকরের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ওপর যবনিকা নেমে এল।

পাঠানো হল তাঁকে আন্দামানে সেলুলার জেলে।

দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর কাটালেন আন্দামানে।

তারপর তাঁকে ভারতে এনে অন্তরীণ করে রাখা হল বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি নামক ক্ষুদ্র শহরে নানা বিধি নিষেধের নাগপাশে জড়িয়ে।

মুক্তিলাভ করলেন ১৯৩৭ সালের ১০ই মে সুদীর্ঘ আঠার বৎসর পরে।

জেলে প্রবেশ করেছিল-ছাব্বিশ বছরের তরুণ যুবক, বেরিয়ে এলেন চোয়ান্ন বছরের ভগ্নস্বাস্থ্য প্রবীণ।

দেশের স্বাধীনতার জন্য একটানা এত দীর্ঘ কাল জেলে ও অন্তরীণে আর কেউ কাটিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

জনগণের সম্রাদ্ধ নামকরণ সার্থক, বীর সাভারকর।

[আগামী সংখ্যায়—কুমিল্লার সেই মেয়ে দুটি]

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(সাতাশ)

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬১ সালের ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যার পর আমাদের বাড়ীতে দলবলে সুনীলবাবু এসে হাজির হলেন।

২২ এপ্রিল তাঁদের বাবুপাড়া পাঠাগারের বার্ষিক সম্মেলন হবে আর্য নাট্য সমাজ হল-এ, প্রধান অতিথি হিসেবে আসবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিকা আশাপূর্ণা দেবী, সুনীলবাবুদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমায় সেই সভায় সভাপতি হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে এও জানাতে কসুর করলেন না যে, কার্ড ও কাগজপত্র তাঁরা ইতিমধ্যেই ছাপিয়ে ফেলেছেন, কিছু বিতরণও হয়ে গেছে, সুতরাং—

সুতরাং, আমি হেসে বললাম, আমার অনুরোধ আদেশে নয়, শুধু খবরটা দিতে এসেছেন বলুন।

হেসে উঠলেন সুনীলবাবু, একরকম তাই বলতে পারেন তবে এটাও ভুলবে চলবে [illegible] গত বছরই আমরা আপনাকে এ বছরের জন্য অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিলাম। নিশ্চয়ই আপনি ভোলেননি [illegible]।

একটু চিন্তিত [illegible] বক্তৃতা দেবার অভ্যাস আছে বটে, কিন্তু এ সভায় ত আর সাধারণ বক্তৃতা চলবে না, নিছক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে। এর আগে সাহিত্য সম্বন্ধে ঘরোয়া আলোচনায় কখনো কখনো যোগ দিয়েছি বটে, কিন্তু জনসভায় সাহিত্য নিয়ে কিছু বলিনি। আর জলপাইগুড়ী সহরে এটাই হবে আমার প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা। তাই মনে হল লিখে নেয়াই নিরাপদ। অতএব বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিপাটি করে দশ মিনিটের একটা ভাষণ লিখে ফেললাম। ভাবলাম, আসল ভাষণ দেবেন ত প্রধান অতিথি আশাপূর্ণা, শ্রোতাদের আগ্রহ তাঁর জন্যই, আমি সার দুচার কথা বলেই কাজ সেরে দোব।

লেখাটি শুনে বুবুল কিন্তু ক্ষেপে উঠল, বলল, বাবা, তুমি লেখা বক্তৃতা পড়বে? আমার জীবনে কখনও ত তোমায় লেখা ভাষণ পড়তে দেখিনি। আজ লিখলে কেন?

বললাম, তা সত্যিই বলেছিস, জীবনে এই প্রথম। কিন্তু বুঝতে পারছিস না, আশাপূর্ণা দেবীর উপস্থিতিতে এক্সটেম্পোর কিছু বলা—

কেন পারবে না শুনি! বাঘা দিল মেরে, তুমিনি তোমার এক্সটেম্পোর? কাউকে একবার কাগজ, আরেকবার শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা দিতে দেখলে আমার কেমন যেন হাসি পায়। ওকে বক্তৃতা দেয়া বলে না, বক্তৃতা পড়া বলে। তুমিও তাই করবে নাকি? না, না, তা হবে না, ছিঁড়ে ফেল ঐ কাগজখানা।

জিজ্ঞেস করলাম, যদি ঠেকে যাই?

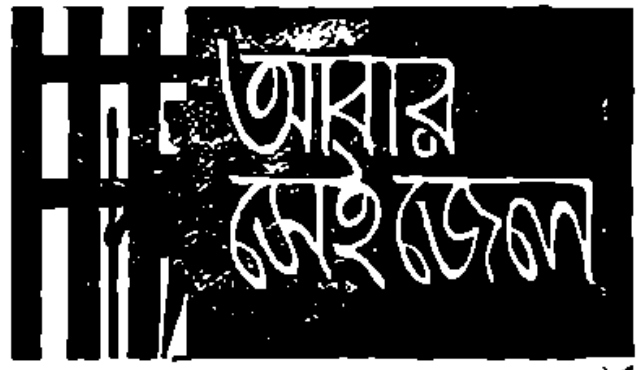

জ্যোতিরিন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ঠেকে যাবে! বল কি! বুবুল হেসে বলল, বরং দেখছি একবার সুরু করলে তোমাকে ঠেকানোই মুস্কিল হয়ে পড়ে উদ্‌যোক্তাদের। —না, না, ওসব লেখা-টেখা পড়তে হবে না। বলবে যা বলার।

অগত্যা ছিঁড়ে ফেলতে হল লিখিত ভাষণ।

ভেবেছিলাম, আশাপূর্ণাই বেশ কিছুক্ষণ বলে শ্রোতাদের প্রত্যাশা পূরণ করে দেবার পর সভাপতি হিসেবে আমি করেক মিনিটেই সেরে দোব। কার্যক্ষেত্রে হল ঠিক তার বিপরীত। আশাপূর্ণাই সংক্ষেপে সেরে বসে পড়লেন। সুতরাং হাল ধরার শুরুভার আমার কাঁধেই এসে পড়ল। দশ মিনিটের জন্য রেডি হয়ে এসে চার-দশ মিনিট যখন

পাশ করে দিয়েছি, তখন আমার খেয়াল হল যে, এর পর আবার আছে ম্যাট্যাডিনর। সুতরাং আরেক ঘণ্টা মিনিটের মধ্যেই আমার কথা শেষ করলাম।

সভার শেষে শ্রোতাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি আমার অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন। চারু সান্যাল বললেন, নিছক সাহিত্য সম্বন্ধে প্রায় এক ঘণ্টা জমিয়ে বক্তৃতা দেয়া বেশ কঠিন। আর একজন বললেন, এমনি সাহিত্যিক জেল সুপারিনটেনডেন্ট কল্পনাই করা যায় না। কয়েকজন বললেন, আপনার বইখানা পড়েছি, ভাল লিখতে পারেন বুঝতে পেরেছি, কিন্তু বলতে পারেন যে আরও ভাল, আজ তা প্রথম জানতে পারলাম!

কয়েক দিন পরই ডিসট্রিক্ট লাইব্রেরীর লীডিশ রাগচি এসে ধরলেন। ঐ দিন তিনি বাইরে গিয়েছিলেন টুরে, শহরে ফিরে এসে সবার মুখেই সেদিনকার কথা শুনেছেন। উনি ত আগেই বলে রেখেছিলেন যে, শুধু চুপচাপ আমার লেখা পড়া নয়, আমার কথাও শুনবেন। অতএব স্থির হল ৬ যে সন্ধ্যা সাতটায় ডিসট্রিক্ট লাইব্রেরীর হল-এ আমার বক্তৃতা দিতে হবে। বিষয়, Crime and probation system. অর্থাৎ অপরাধ এবং অবেক্ষণ পদ্ধতি।

সেদিনকার সভায় সভাপতিত্ব করলেন সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ রঞ্জিৎ গুপ্ত। আমন্ত্রিত শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ডেপুটি কমিশনার কে, জি, বসুসহ অনেক ম্যাজিস্ট্রেট ও সরকারী অফিসার, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ, স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষিকারা, মফস্বলের বিভিন্ন পাবলিক পাঠাগারের কর্মকর্তা ও সভ্যগণ এবং শহরের আমন্ত্রিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভার শেষে প্রবেশন পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নের জবাব দিতে হল আমায়। অবশেষে সবার একই প্রশ্ন, এমনি সমাজকল্যাণমূলক আইন যে আছে, কই, আমরা সে সংবাদ পাইনি কেন? সরকারী প্রচার বিভাগের কেন এই উদাসীনতা? বললাম, এর জবাব দেবেন প্রবেশন ডিপার্টমেন্ট। আমি এখন সুপারিটেনডেন্ট অব জেল, প্রবেশন অফিসার নই।

পুলকিত হয়ে বিস্তৃত বিবরণ আই জি-কে লিখে পাঠালাম। ভাবলাম, নিশ্চয়ই তিনি খুশী হয়ে চিঠি দেবেন। বলবেন, প্রবেশন সিস্টেম সম্বন্ধে আপনার প্রকাশ্য বক্তৃতার ফলে সরকারী প্রচারের কাজ হয়েছে। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেল না। মনে পড়ল, আমি আসবার পরই উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন যে, মফস্বলে পাবলিক লাইব্রেরির সাফল্য নির্ভর করে পাবলিকের মধ্যে ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার ওপর। লিখেছিলেন পার্সোনাল ইন্ফ্লুয়েন্সের কথা। এখন আমার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার খবরটা যখন সত্যিই গিয়ে পৌঁছেছে, তখন বোধহয় আর ভাল লাগেনি। ভাবলেন, গাঙ্গুলী যে সত্যিই জমিয়ে ফেলল! হুঁ!!

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালিত হয় সমগ্র দেশে ও বিদেশেও বহু স্থানে। জলপাইগুড়ী শহরের অধিবাসীরা একটি শতবার্ষিকী উৎসব পালন কমিটি গঠন করেন, চেয়ারম্যান স্বয়ং ডেপুটি কমিশনার। ইণ্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স এসোসিয়েশন হল-এ কমিটির সভা হয়। বিশিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে আমিও আমন্ত্রিত হয়ে সভায় যোগদান করেছিলাম। স্থির হল, তিনদিন ব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন দিবসে সভাপতিত্ব করবেন ডেপুটি কমিশনার কে, জি, বোস। প্রধান অতিথি ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় দিবসের কথা উঠতেই চারু সান্যাল প্রস্তাব করে বসলেন, সভাপতি হবেন দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় আর দুজন অতিথি হবেন, গজেন্দ্র কুমার মিত্র এবং প্রমথনাথ বিশি। প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পাশ হয়ে গেল, আমি আর আপত্তি জানাবার সুযোগই পেলাম না।

জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের এই একটি সভায় সভাপতিত্ব করবার পর থেকেই শহরের পাড়ায় পাড়ায় উৎসব অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবার আমন্ত্রণ আসতে লাগল। আমন্ত্রণ আসতে লাগল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে। এমন কি, সেই সুদূর পূর্বে ডুয়ার্সের চা বাগান অঞ্চলের ভারতীয় কর্মচারী সমিতিও আমন্ত্রণ জানালেন। ওঁদের কালচিনি ক্লাব হল-এ সভার অনুষ্ঠান হল, দেখি, সেখানেও সেই

ষোড়া অতিথি, গজেন্দ্র কুমার মিত্র ও প্রমথ নাথ বিশি। আবার আমাকেই ওখানে পেয়ে রসিকপ্রবর বিশি মশায় বলে উঠলেন, আরেঃ আপনিও দেখছি এখানে। আসুন না একটা কাজ করি তাহলে, যাত্রা দলের মত আমরা তিনজন একটা শতবার্ষিকী দল গঠন করে ফেলি। এই জেলায় যেখানে যত শতবার্ষিকী পালাগান হবে, আমরাই সবগুলোর বরাতটা নিয়ে নিই। কি বলেন গাঙ্গুলী মশাই? ঠিক বলিনি?

এই তিনটি সভা করবার পরই যেন ভেলকি লেগে গেল। যেখানে যত সভা ও যত রকমের সভা হতে লাগল, সবগুলোতেই আমার ভূমিকা হল হয় সভাপতি নয় ত প্রধান অতিথি, নয়ত উদ্বোধক বা প্রধান বক্তা, এসব না হলেও অন্ততঃ কিছু বলবার জন্য অনুরোধ আসতে লাগল। ওঁরা যেন ভুলে গেলেন যে আমি একটা চাকরি করি, সে চাকরিটি পাবলিক সার্ভিস এবং তা অত্যাবশ্যকীয়, যাকে বলা হয়, এসেনসিয়াল সার্ভিস যে চাকরি করলে ডি সি-র অবগতি ও অনুমোদন ব্যতীত আমার পক্ষে যেত কোয়ার্টার্স ছেড়ে যাওয়া নিষিদ্ধ। ওঁরা শুধু একটি মাত্র সভাই উপলব্ধি করে বসে আছেন বলে মনে হল যে, যেখানে-সেখানে যখন-তখন যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, এই লোকটিকে কোনও রকমে একবার দাঁড় করিয়ে দিতে পারলেই, কম করে হলেও অন্ততঃ পনেরো বিশ মিনিট ইনি বেশ চালিয়ে যেতে পারেন, পা কাঁপবে না, কণ্ঠস্বরে ক্লেদ্যা দেখা দেবে না, মাঝে মাঝে এক সিপ জল খেয়ে শুকনো গলা ভিজিয়ে নেবার দরকার হবে না, বক্তৃতার পয়েন্ট হারিয়ে ফেলে বার বার 'এবং এবং' করে খাবি খেতে হবে না, বুক টান টান করে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ বক বক করতে পারবেন।

কত রকমের সভায় যে বক্তৃতা করতে হয়েছে, আজ সব মনেও করতে পারছি না।

জলপাইগুড়ী শহরে ছোট ছেলেদের একটি সুপরিচিত সংস্থা ছিল, হয়ত এখনও আছে, 'ডানপিটেদের আসর।' তাদের বার্ষিক সম্মেলনে বলতে হল। তেমনি আবার বসলাম ডিসট্রিক্ট লাইব্রেরী হল-এ একেবারে পঞ্চাশোর্ধ্ব প্রবীণদের সংস্থা 'বড়দের আসর'-এ। বিষয়, শিশুশিক্ষায় মাতাপিতার উদাসিনতা।

বিশুজন্মিক্যাল সোসাইটির সভায় বক্তৃতা দিলাম জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে। আবার হরিসভায় যা বললাম, তার মর্ম হচ্ছে, হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

অনেক সময় এমনও হতে লাগল যে, সভায় শ্রোতৃবর্গ এসে গেছেন, অথচ নির্বাচিত সভাপতিকে আনবার জন্য যে গাড়ী পাঠানো হয়েছে, তার দেখা নেই, উদ্যোক্তারা বার বার ঘড়ি দেখছেন ও নানা অজুহাতে সময় কাটাচ্ছেন, বার বার মাইক টেষ্ট হচ্ছে, ওয়ান, টু, থ্রি.....মাইন টেন,—টেন, নাইন, এইট, সেভেন, সিক্স, ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান, শ্রোতারা অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন, অন্তরাল হতে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, সভার শেষে যে রিফ্রিশমেণ্টের ব্যবস্থা আছে, তার শিল্পীরা উনুন উনুন করছে, অন্য কাননে এনগেজমেণ্টের হুমকি ছাড়ছে, ঠিক এমনি সঙ্কটে অকস্মাৎ ঘুসকিলে আসান দেখতে পেলাম উদ্যোক্তাদের সেক্রেটারী এবং তৎক্ষণাৎ মাইকে ঘোষণা করলেন, অনেক দেরী হয়ে গেছে, সেজন্য আমরা দুঃখিত। নির্বাচিত সভাপতির আশায় আর দেরী করা সম্ভব নয়। তাই আমি আজকের এই মেঘনাদ বধ কাব্য শতবার্ষিকী সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্য সুসাহিত্যিক সুপারিনটেনডেণ্ট অব জেল হিজেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি।

তৎক্ষণাৎ আরেক জন মাইকে গলা বাড়ালেন, আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

হল্ প্রতিধ্বনিত করে হাততালি পড়ে গেল। ফলে শ্রোতা হয়ে এসে একেবারে বিনা অনুমোদনে ও বিনা প্রস্তুতিতে আমায় সভাপতি হতে হল এবং বাধ্য হয়ে মেঘনাদ বধ কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলতে হল।

কি এমন জানা আছে ঐ কাব্য সম্বন্ধে? জানবার প্রয়োজন নেই। আগে কখন অধ্যাপক বন্ধুদের বিদ্যাবিত ভাবে আমি ওঁদের সারাংশটুকু গ্রহণ করে তাতে রঙ চড়িয়ে বলে গেলাম পনেরো মিনিট।

আচার্য বিনোবা ভাবে পদব্রজে আসাম যাবার পথে জলপাইগুড়ীতে যখন এলেন, তখন আবার এমনি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হল। উনি আসবার কয়েকদিন আগে কলকাতা থেকে এলেন সর্বোদয় আন্দোলনের নেতারা আর এলেন প্রবীণ কবি নরেন্দ্র দেব, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, অধ্যাপক ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত, কবি দীনেশ দাস ও সাহিত্যিক নারায়ণ চৌধুরী। এঁদের মধ্যে একমাত্র নারায়ণবাবু আমার বিশেষ পরিচিত। একদা, ১৯৪৮ সালে 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকায় আমরা একসঙ্গে চাকরি করতাম। তারপর অবশ্য আর দেখা হয়নি। ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

কোন সভা-টভা হবে, তা আমাকে জানা ছিল না। ভাবলাম, নারায়ণবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি। দেখা করতে গিয়েই দেখি, সেখানে একটি ছোটখাটো সভা আহ্বান করা হয়েছে এঁদের নিয়ে। আলোচ্য বিষয়, কবি ও সাহিত্যিকদের আচার্যের ভূদান আন্দোলন সমর্থন করা উচিত কিনা।

নারায়ণবাবু অনেক অনুরোধ জানিয়ে ধরলেন। অনেক গল্প হল।

তারপর সভা সুরু হবে।

অকস্মাৎ নারায়ণবাবু ঘোষণা করে বললেন, আমি আমার প্রাক্তন সহকর্মী সুসাহিত্যিক ও এখানকার জেলের সুপারিনটেনডেন্ট বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বাস, অনুরোধ না রেখে উপায় কোথায়? কি জানি নারায়ণবাবু বোধহয় খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে, এই শহরে সর্বরকম সভার সভাপতিত্ব করবার জন্য সহজেই এক ব্যক্তিকে পাওয়া যায়।

একদিন সুনীলবাবুসহ আরতি গুহ এসে বললেন বাবুপাড়া পাঠাগারের "বাঁশরী" নাটকে আমায় পার্ট করতে হবে এবং নাটক পরিচালনা করতে হবে।

পরিচালনায় অবশ্য আপত্তি জানালাম না। কিন্তু একেবারে অভিনয়?

আরতি ওঠ ফুলে উঠলেন, কেন?

বললাম, আপনাদের শহরে সভাসমিতি করে চাকরিটা ইতিমধ্যেই বোধহয় খানিকটা নড়বড়ে করে ফেলেছি, এর পর যদি নাটকে অভিনয় সুরু করে দিই, তাহলে আর পাবলিক সার্ভিসটাকে রক্ষা করা যাবে না—ওটা ভেঙে পড়বে।

এটাও ত পাবলিক সার্ভিস, উনি বাধা দিয়ে বললেন, পাবলিককে অভিনয়ের মাধ্যমে বিমল আনন্দদান। এ কি কম সার্ভিস? সভাসমিতিতে আপনার এ্যাসেটের ভূমিকা পাবলিক উপলব্ধি করেছে, এবার তারা দেখতে চায় আপনাদের পুরন্দরের ভূমিকায়।

অনেক করে বোঝানো গেল ওঁদের যে, আমি শুধু নাটক পরিচালনা করব, অভিনয় করব না।

সিদ্ধান্ত নিলে ও সময়ে আর্য নাট্য সমাজ হলে লোকে লোকারণ্য। শুধু বাবুপাড়া পাঠাগারের অভিনয় বলেই নয়, আমন্ত্রণ কার্ডে ও দর্শকদের মধ্যে বিতরিত প্রোগ্রামে আরও একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি সংযোজন করা হয়েছে, নাট্য পরিচালনায় বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়।

ঠিক সময়ে অভিনয় সুরু করার পাঠাগারের সুনাম আছে। কিন্তু আজ বুঝি আর সে সুনাম রক্ষা করা গেল না। বাঁশরীর ভূমিকায় নামবে রঞ্জিতা ঘোষ, সে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে এসেছে। তার বাড়ীতে অসুখ তাই দেরী। কিন্তু যতই তাড়াতাড়ি করুক না কেন, পাঁচ মিনিটে ত মেক-আপ শেষ হবে না। সমর চট্টোপাধ্যায় ও চিন্ময় রায় নামবে সোমশঙ্কর ও পুরন্দরের ভূমিকায়, গ্রীন রুমের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমি তাদের অভিনয়ের দু একটা জায়গা ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম অকস্মাৎ হন্তদন্ত হয়ে আরতি গুহ এসে হাজির।

শুনুন মিঃ গাঙ্গুলী, মহা বিপদে পড়েছি।

আপনার আবার কিসের বিপদ মিসেস গুহ, হেসে বললাম, আপনি নিজেই ত জগদ্ধাত্রী, চিরকুমার সভাতে একদল কুমারীকে তাড়াতে তাড়াতে এনে সভায় ঢুকিয়ে

দিয়েছিলেন, সুতরাং যে মিলেই তাঁবিনী, তার আবার বিপদ কিসের ?

না, না, হাসবার কথা নয়, শুনুন। বরাবর আমরা ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় অভিনয় সুরু করেছি। এইমাত্র রক্তিতা এল, এলেই অবশ্য মেক আপে বসে গেছে। কিন্তু তিন চার মিনিটে ত মেক আপ শেষ হবে না, অন্ততঃ পনেরো মিনিট লাগবে। মানে, সওয়া সাতটা হয়ে যাবে, আমাদের এতদিনকার সুনামটা যাবে।

তা কি করব বলুন, আমি বললাম, আমি ত আর দ্বিতীয় পি সি সরকার নই যে, সেই ম্যাজিক ওয়াণ্ডটা ঘুরিয়ে 'হলা-হুলা-লুম' বলে চীৎকার করে উঠব, অমনি হল-এ যত ঘড়ি আছে, সবগুলো সাতটায় এসে আটকে যাবে, আর সেই রক্তিতা—

না, না, হাউ নট টু মিঃ সরকার, আইডি শুধ সিরিয়াসলি বললেন, আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। ঠিক সাতটাতেই আমরা ক্লীন তুলে দিচ্ছি। আপনি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে, বলুন, রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা করবেন—

আরেঃ, বলছেন কি মিসেস গুহ, আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, চাইলেই একটা বক্তৃতা দেয়া যায়, তাও আবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ?

না না, ওসব কোনো কথাই শুনব না, আবার শুধ আরও সিরিয়াস হয়ে গেলেন। মিনিট পনেরোর বেশী বলতে হবে না, এরই মধ্যে রক্তিতা রেডি হয়ে যাবে—আসুন, আসুন, আর মাত্র দুমিনিট বাকি—বরং এক কাজ করবেন, রক্তিতা রেডি হলেই আমি উইংস-এর পাশ থেকে আপনাকে ইসারা করব, আপনি বক্তৃতা শেষ করবেন—আসুন, আসুন—একেবারে জোর করেই নিয়ে এলেন আমায় ষ্টেজে, বললেন, আমি ওদিকের উইং থেকে ইসারা করব। বলেই প্রস্থান করলেন।

শুধু তাৎক্ষণিক বক্তৃতা নয়, বক্তৃতা মেক টু অর্ডার কিন্তু ভাববার আর এক মুহূর্ত অবকাশ নেই। রেডি হয়ে এমনভাবে দাঁড়ালাম, যাতে সেই বিশেষ উইংস-এর কাঁকটা দেখা যায়।

ঠিক সাতটায় ক্লীন উঠে গেল। হাজারো চক্ষু মঞ্চের ওপর পড়েই বিস্ফারিত হয়ে গেল কিনা জানি না, কারণ দেখা গেল, মঞ্চের ওপর দ্বিতীয়রূপী শচীন রায় এবং বাসন্তীরূপিনী রক্তিতা ঘোষ নয়, উজ্জ্বল আলোকে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুপারিটেনডেণ্ট অব জেল দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় !

সুরু করলাম, কারণ সুরু না করে উপায় নেই, 'সমবেত রবীন্দ্রানুরাগী সুধীবৃন্দ, অসীম আকাশ কিংবা অতলস্পর্শ মহাসাগরের সঙ্গেই রবীন্দ্র প্রতিভা তুলনীয়। আকাশের রহস্য যেমন আজও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়নি; সাগর গহ্বরে কি আছে, আজও যেমন তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেছে, তেমনি, শুধ অনন্যসাধারণ নয়, অলৌকিক রবীন্দ্র প্রতিভার কতটুকুর সন্ধানই-বা পেয়েছি আমরা। একটি আকাশেই যেমন দেখতে পাই আলোর খেলা, আবার অন্ধকারের বিভীষিকা, পূর্ণিমার চাঁদ, আবার অমানিশার ভ্রূকুটি, একটি সমুদ্রেই যেমন আছে পর্বত প্রমাণ বিক্ষুব্ধ বীচিমালার আক্ষেপ, তেমনি তারই নিস্তরঙ্গ নীলিমায় দেখতে পাই প্রভাতকিরণের স্বর্ণাস্তরণ, তেমনি রবীন্দ্র প্রতিভা যেন সাগরের সঙ্গে আকাশের মিলন, তেমনি সীমাহীন, অন্তহীন।'—তারপরই রবীন্দ্রনাথ যে একাধারে কবি, গীতিকার, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, আলঙ্কারিক তাহার তা বর্ণনা করে সর্বশেষে বললাম, 'তিনি শিল্পী, তিনি নট, তিনি নাট্যকার।' ততক্ষণে পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে, এমনি যে হবে, তা আগেই জানতাম, কারণ দুনিয়ায় কোনো নায়িকারই কমসে-কম আধ ঘণ্টার কম সময়ে মেক আপ হয়না, তাই আরও বলবার সুবিধার জন্য শেষ দিকে 'নাট্যকার' বলে উইং-এর দিকে চকিতে চেয়ে দেখি নটনটিরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আবতি গুহের টিকিরও পাত্তা নেই। তাই আবার সুরু করলাম, কিংবা বলা যায়, সুরু করতে হল, রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটকের সংখ্যা চল্লিশের কাছাকাছি।

তাঁর নাট্যরচনাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন গীতি নাটক, নাট্যকাব্য নৃত্যনাটক, রঙ্গ-নাটক, সামাজিক নাটক ইত্যাদি। নাট্যকাব্যই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্য রচনা বলা যায়। রাজা ও রাণী বা বিসর্জন এই শ্রেণীর নাটক। শ্রদ্ধেয় বন্ধু, আপনাদের এই মঞ্চেই এই বাবুপাড়া পাঠাগারের শিল্পীরাই গত বৎসর ইংরেজীতে বিসর্জন দি স্যাক্রিফাইস, নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। বিসর্জন নাটকের মূল কথা কি? আচার বড়, না হৃদয় বড়। রঘুপতির আচার-ধর্মের সঙ্গে গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়-ধর্মের যে সংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের অমর লেখনীতে তা মূর্ত হয়ে উঠেছে, তা কি আমাদের একটি চিরন্তন সত্যের ইঙ্গিত দেয় না? তাঁর রচিত রঙ্গ-নাটক চিরকুমার সভা, বাবুপাড়া পাঠাগার যে নাটকখানিরও অভিনয় এই মঞ্চে পরিবেশন করেছিলেন, তার বক্তব্য কি নিছক হেয়ালী? তেমনি সামাজিক নাটক বাঁশরী, আজ একটু পরেই যা অভিনীত হবে।'

—না, এখনও আরতি গুহের দেখা নেই। নাটক শুনতে যারা এসেছে, নাটক সুরু না হয়ে নাটক সম্বন্ধে তত্ত্বকথা তাদের কতক্ষণ ভাল লাগবে? অথচ আমাকে চালিয়ে যেতে হবে, কারণ নান্দিকার বোধহয় এখনও সাক্ষসজ্জাতেই ভালোছেন। ওঁদের সুবাদে ত আটটা বেজেই গেল, কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় আমায় দিয়ে অনুষ্ঠান সুরু করিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু পনেরো মিনিটের জায়গায় যে আধ ঘণ্টা হয়ে গেল। কিন্তু উপায় নেই, তাই আবার সুরু করতে হল, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিটি নাটকেই একটি চিরন্তন সত্যের আভাস দিয়েছেন। সেই সত্যের সন্ধান পেতে হলে নাটকের বহিরঙ্গ দেখেই চমৎকৃত হয়ে থাকলে চলবে না, নামতে হবে নাটকের অন্তরঙ্গ গভীরে।'—অনন্যোপায় হয়ে ভাবছিলাম, এবার বাঁশরীর গোটাকতক কোটেশন উল্লেখ করে সংলাপের কেস্ত্যালু কি, আর ইনট্রিনসিক ভ্যালু কি, তাই ব্যাখ্যা সুরু করতে হবে, এমন সময়, ঐ ডিকটার উইং-এ নয়, আমার কাণের পাশের উইং-এর আড়াল থেকে আরতি গুহের ফিসফিসানি শোনা গেল, মিঃ গাঙ্গুলী, রঞ্জিতা রেডি হয়ে গেছে।

বাপস, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল যেন।

ঘবনিকা পড়তেই আরতি গুহকে বললাম, সত্যি, আপনি মার্ডার করতে পারেন—

মার্ডার! আপনাকে? হেসে বললেন তিনি, সাহিত্যিকরা চিরজীবি, তাদের বিনাশ নেই। আর যদি অপর কাউকে মার্ডার করি, তাহলে ত আত্মিক গ্রহণ করতে হবে আপনারই হোটেলে। তখন আর আপনি সাহিত্যিক নন, জেলের একচ্ছত্র অধিপতি!

সবাই হেসে উঠল

অভিনয়ের শেষে আরতি একান্তে আমায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কি জেলের সুপারিনটেনডেন্ট, না প্রফেশনাল বক্তা?

জবাব দিতে পারলাম কারণ, সে প্রশ্নটা যে আমারই মনে জেগেছে

পরদিনই সন্ধ্যায় আরতি গুহ বাড়িতে এলেন আমায় অভিনন্দন জানাতে অনেকক্ষণ গল্প হল, অনেক হাসাহাসি হল। এক হাসির ফেরেন, যারা বাড়ী ভাড়া দেবে, তারা বাড়ীর বাইরে 'টু লেট' বোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। আপনি এক কাজ করুন না মিঃ গাঙ্গুলী, বড় রাস্তার ওপর গলির মুখে একখানা বড় সাইন বোর্ড খাড়া করে দিন তাতে লিখে রেখেন, এই গলির শেষ বাড়ীতে মুফতে সভাপতি ও বক্তা ভাড়া পাওয়া যায়, চার্জ মাত্র পঞ্চাশ টাকা। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। কন্তাকে দিয়ে এই লহত রোজগারের পথটা ছেড়ে দেবেন কেন?

আমি কিন্তু প্রত্যেকটি সভার বিবরণ আমাদের আই জী বাহাদুরকে লিখে পাঠালাম, সঙ্গে একটি লাইন, আপনার উপদেশমত পার্সোনাল ইকুয়েশনের ব্যবধানটা হাতের সঙ্গে কাজে লাগাচ্ছি।

কিন্তু হায়, কোন জবাব পাওয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

শতবার্ষিকীর পরিপ্রেক্ষিতে

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবদানের মূল্যায়ন

একশো বছর ধরে বাংলার ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ দর্শকদের কাছ থেকে অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে। এই একশো বছরের মধ্যে অবক্ষয়ের যুগ এসেছে, দর্শকের অভাব ঘটেছে, প্রথম পঞ্চাশ বছরে দেখেছি, কোন নাটকই বেশী দিন চলে নি, অনেক থিয়েটার-মালিকের লাভের চেয়ে লোকসান হয়েছে বেশী, অনেকে সর্বস্বান্ত হয়েছেন —এ সবই সত্য। তবু তারই মধ্যে একথাও সত্য যে যাঁরা বুদ্ধির সঙ্গে, সদুদ্দেশ্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, থিয়েটার-ব্যবসা পরিচালনা করেছেন তাঁরা লাভও করেছেন যথেষ্ট। মনোমোহন পাঁড়ে নামে এক পশ্চিমা ভদ্রলোক কলকাতায় এসে প্রথমে ফেরি করতেন। সেই পাঁড়ে মশায় থিয়েটার ব্যবসা করে যখন মারা যান তখন নগদে আর বিষয় সম্পত্তিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রেখে যান। ১৯১৪ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত দেখেছি তাঁর থিয়েটারে জমিদারী থেকে

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আনানো একটা বাচ্চা হাতী বাঁধা থাকতো। এযুগেও শ্রীললিত মিত্রও থিয়েটার চালিয়ে কম টাকা করেন নি।

অতএব আজ যদি এই প্রশ্ন তোলা যায় যে এই একশো বছরে বাঙালী দর্শক জাতি ও দেশ বহু রঙ্গমঞ্চের কাছ থেকে কী পেয়েছে, লোকশিক্ষা ও সমাজ-চেতনার বাহনরূপে কতখানি সে সার্থক, তাহলে তা বোধ করি অযৌক্তিক হবে না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপালাভের পর গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে বলেছিলেন, আর থিয়েটার করতে ভাল লাগছে না। ভাবছি ছেড়ে দেব। তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, না, না, অমন কাজ করিসনি, যা করছিস করে যা, ওটাও কম কাজ নয়, ওতে লোকশিক্ষে হয়।

এখন, এই লোকশিক্ষার বাহনরূপে বহু রঙ্গমঞ্চ কতখানি জাতির মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছে তা পরীক্ষা করে দেখবার সময় এসেছে। আজকের দর্শককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কী তিনি পাচ্ছেন থিয়েটার থেকে যা ব্যক্তিগতভাবে, পারিবারিক পারিপার্শ্বিকতায় বা সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে প্রভাবান্বিত করছে, তাঁর জীবনকে নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে, তাহলে তাঁকে উত্তর দিতে বোধ করি বেগ পেতে হবে। অবশ্য এক কথায় তিনি বলতে পারেন, আনন্দ আহরণের জন্যে থিয়েটার সিনেমা দেখতে যাই, জীবনধারণের চাপে শ্বাসরুদ্ধ প্রাণকে একটু মুক্তি দিতে চাই তরল আমোদের মধ্যে। এবং এই বলার মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের একটি পৃথক দায়িত্ব রয়েছে, তা হল সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজে লাগা, দেশের মুক্তি সংগ্রামে, রাষ্ট্র বিপ্লবে, দেশের মানুষকে জীবনের মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করতে, কোন বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থাকে পালটাতে বা সমাজের কোন মন্দ জিনিষকে লোকের কাছে তুলে ধরে তাকে অপসারিত করতে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা সারা বিশ্বে স্বীকৃত।

বর্তমানে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ নানা সমস্যায় জর্জরিত, তার হাজারো প্রশ্ন, হাজারো এষণা, তার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে আকাশজোড়া হতাশা, তার নানা সমাজে ব্যবস্থা আমূল পালটানো দরকার। এই সব দিক দিয়ে নাটক আর তার অভিনয় অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ মানুষকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে, পথ দেখাতে পারে।

কিন্তু আজকের ব্যবসায়িক রঙ্গমঞ্চ সেকাজে কতটা মনোযোগী, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। শুধু সাধারণ রঙ্গমঞ্চই বা কেন, সাধারণ মঞ্চের বাইরে যে সব পেশাদার ও আধা পেশাদার নাট্যসংস্থা আছে (তাদের সংখ্যা কম নয়) তারাই বা এ বিষয়ে কতটা আগ্রহী ?

কিন্তু অতীতের দিকে চোখ ফেরালে, প্রথম পঞ্চাশ বছরের রঙ্গমঞ্চের গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করলে আমরা দেখতে পাই নাটকাভিনয়ের মধ্যে সমাজব্যবস্থা ও রাজনৈতিকতার উন্মাদনাময় প্রতিফলন বিশেষ করে স্বদেশী যুগে বাংলার রঙ্গমঞ্চ অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে। সেই কথাই আজ বলব।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের এই বাংলা দেশেও একদা রঙ্গমঞ্চ স্বদেশমন্ত্র প্রচারের দিক দিয়ে এক মহনীয় আদর্শ রেখেছে। দেশ তখন পরাধীন, জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেম প্রচার করা তখন বিদেশী শাসকদের কাছে ঘোর অপরাধ বলে বিবেচিত। জাতীয় চেতনা জাগাবার কাজে যাঁরা আত্মনিবেদন করেছেন তাঁদের উপর বিদেশী শাসকের কত না অত্যাচার আর কালা কানুনের প্রয়োগ।

সেই আতঙ্কজনক অবস্থার মধ্যেও কিন্তু বাংলার মঞ্চ-মালিকরা, নাট্যকাররা এবং অভিনেতা অভিনেত্রীরা ভয়ে পিছিয়ে যান নি। একের পর এক তাঁরা দেশপ্রেমমূলক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন, রাজরোষে সে নাটক বন্ধ হয়েছে, আবার অভিনয় করেছেন নতুন স্বদেশী নাটক। আবার আইনের বজ্র তাঁদের উপর পড়েছে, এমন কি রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের গ্রেপ্তার পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মঞ্চ-মালিকরা ভীত হয়ে থিয়েটারের দরজা বন্ধ করেন নি, নাটকের মধ্যে সরকারের তুঘলকনীতির সমালোচনা করতে পশ্চাদপদ হননি।

এই সম্পর্কে তখনকার দিনের প্রখ্যাত নাট্যকার ও থিয়েটার ম্যানেজার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর একটি বই-এ যে চিত্র গ্রথিত করেছেন তা থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"১৯০৫ সালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইল। ইহা বাঙ্গালার প্রাণে এমন একটা আঘাত দিল, যে আঘাতে ধনী নির্ধন পণ্ডিত মূর্খ আইনজীবী ও হলধারী কৃষক একই সঙ্গে যেন একটা দারুণ বেদনা অনুভব করিল। সহরে সে কী উন্মাদনা। গঙ্গাতীরে রাখীবন্ধন কবীন্দ্র রবীন্দ্র গাহিলেন—'ভাই ভাই এক ঠাঁই'। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক পাড়ায় পাড়ায় কান্তকবি রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেনা ভাই' গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়েই বাংলার নায়ক সুরেন্দ্রনাথ বাংলার অমূর্ত রাজা বলিয়া অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল সেই মহামন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'। এই সময়েই নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র সিরাজদ্দৌলাকে অবলম্বন করিয়া বাঙালীকে তাহার কীর্তির কথা তাহার ভাগ্য বিপর্যয়ের করুণ কাহিনী, তাহার অতীত গৌরব ও অগৌরবের উজ্জ্বল ও মলিন চিত্র দর্শক সমক্ষে প্রকটিত করিলেন গিরিশচন্দ্রের ভৈরব ভেরীর নির্ঘোষে বাংলার নাট্যশালা ধ্বনিত হইল। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। সিরাজদ্দৌলাও সেই আন্দোলনের বেশ একটা অংশ হইয়া পড়িয়াছিল। যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সেই দিনের কথা দর্শক বোধহয় বিস্মৃত হন নাই—তিলক মহারাজ রয়েল বক্সে প্রবেশ করিবামাত্রই সমগ্র দর্শকের কণ্ঠোচ্চারিত 'বন্দে-মাতরম্' শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া। গিরিশচন্দ্র মঞ্চের উপর হইতেই নতজানু হইয়া তিলককে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। সিরাজদ্দৌলার প্রথম অভিনয় রজনীতে দর্শকদের মধ্য হইতে একজন মুসলমান কবি গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া

দুই ছত্র কবিতার লাইন আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ এই :—হে গিরিশচন্দ্র, তুমি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ কর।"

সেই বছরই সফল হয় দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক রাণা-প্রতাপ সিংহ। এক সঙ্গে দুটি রঙ্গালয়ে সেই নাটক অভিনীত হয়। স্টারে এবং বিনোদায়। সেই নাটক দেখে দর্শকদের সে কী প্রবল উন্মাদনা। থিয়েটার শেষ হবার পর প্রতি রাত্রে হাতীবাগান থেকে দর্শকরা বীডন ষ্ট্রীটের দিকে আর বীডন ষ্ট্রীট থেকে দর্শকের স্রোত আসতো হাতীবাগানের দিকে। আর সেই সম্মিলিত জনতার কণ্ঠে সেই গান উচ্চারিত হ'ত।—

"চল সমরে দিব ঢালি
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।"

আজকের নাটকে কোথায় সেই প্রাণবত্তা, কোথায় সেই উন্মাদনা? কোন মহৎ চিন্তা, ভাব বা আদর্শের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে কি আজকের সাধারণ রঙ্গালয়ের কোন নাটকে? মানুষকে ভাবাতে পারে, উদ্দীপ্ত করতে পারে, তাকে তার বিগত দিনের ঐতিহ্য বা বেদনা অথবা কোন মহান কীর্তি বা প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করাতে পারে এমন নাটক কই? এর একটি ব্যতিক্রম দেখা গেছে বিশ্বরূপা মঞ্চে কিছুদিন আগে "বেগম মেরী বিশ্বাস" নামে যে নাটকটি অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে। ঔপন্যাসিক বিমল মিত্রের এই বইটির মধ্যে নবাব সিরাজদ্দৌলার একটি করুণ ঐতিহাসিক নতুন ভাবময় রূপায়ণ আছে আর আছে সেই সময়কার এক গ্রাম্য বাঙালী তরুণীর সাহসিকতা, দেশের প্রতি ভালবাসা এবং প্রণয় বেদনার অনাঘ্রাত আলেখ্য। এই ঐতিহাসিক কাহিনীর সুগ্রথিত নাট্যরূপের মধ্যে অনেক নতুন তথ্য, অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্য, ভাবসমৃদ্ধ গানের মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি ভালবাসা আর ভাবঘন ভক্তির অপরূপ প্রকাশ উপস্থাপিত হয়েছে! সেই দিক থেকে আজকের রঙ্গালয়ের এই ভাবহীনতার দিনে, সমাজের এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের যুগে "বেগম মেরী বিশ্বাস" বাংলা মঞ্চে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তাতে সন্দেহ নেই!

সমাজব্যবস্থার প্রতি তীব্র কশাঘাত করে, এমন কি শাসক সম্প্রদায়ের কার্যকলাপকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করে নাটকের মধ্যে তাদের রূপদান করতে পঞ্চাশ বছর আগেকার থিয়েটার কর্তৃপক্ষরা ভয় পেতেন না।

১৮৭৬ সালে গ্রেট ন্যাশনালে সামাজিক ভাটায়ার গজদানন্দ প্রহসন পুলিশ কর্তৃক নিষিদ্ধ হবার পর ঐ সালের ১লা মার্চ সুরেন্দ্র বিনোদিনী নামক নাটকের সঙ্গে পুলিসকে সমালোচনা করে লেখা 'পুলিশ অফ পিগ অ্যাণ্ড পীপ' প্রহসন অভিনীত হয়। এই অভিনয়ও নিষিদ্ধ হয়।

৪ঠা মার্চ "সতী কি কলঙ্কিনী" ও 'উভয় সংকট' নাটক দুটির অভিনয় হবে। প্রেক্ষাগার পূর্ণ। প্রথম নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে এমন সময় হঠাৎ পুলিশের ডেপুটি কমিশনার সদল বলে থিয়েটারে প্রবেশ করে গ্রেট ন্যাশনালের ডিরেকটর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং যতিলাল সুর, বেলবাবু প্রমুখ আটজন শিল্পীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ১লা মার্চ সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকে অশ্লীলতা ছিল এই অপরাধে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

৬ই মার্চ ম্যাজিষ্ট্রেট হিউ ক্লিকেনসনের এজলাসে ১০ জন আসামীর বিচার শুরু হল। কলকাতায় এ ব্যাপার নিয়ে তুমুল হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হল। দলে দলে লোক আদালতে গিয়ে উপস্থিত হল। অভিনেতাদের গ্রেপ্তার ও বিচার—এ যে অভাবনীয় ব্যাপার।

৮ই মার্চ রায় বেরুলো। অমৃত সকলে খালাস। উপেন্দ্র বাবু ও অমৃতবাবুর এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড।

পরদিনই হাইকোর্টে আপীল করা হল এবং বিচারপতি কীয়ার ও মার্কবীরের এজলাসে ১৯ই মার্চ শুনানী হল। ২০শে মার্চ বিচারপতিদ্বয় আসামীদের বেকসুর খালাস দিলেন, কারণ সুরেন্দ্র বিনোদিনী অশ্লীল বলে প্রমাণিত হল না।

বীরের সম্মান পেলেন বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দুই সাহসিক সংগঠক। কিন্তু সরকার নিশ্চেষ্ট রইল না। ১৮৭৬ সালের মার্চ মাসে তারা বাংলা থিয়েটারের কণ্ঠরোধকারী একটি বিল পেশ করল—সেটি কুখ্যাত 'ড্রামাটিক পারফরমান্স কনট্রোল বিল।' সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গেল।

কিন্তু কোন ফল হল না। এই বছরের শেষের দিকে বিলটি আইনে পরিণত হ'ল।

বাংলার সাধারণ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বিদেশী সরকারের পতন এই ভাবে উদ্ঘোষিত হ'ল।

উপরিউক্ত তথ্য থেকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হচ্ছে যে তখনকার দিনের থিয়েটার-কর্তৃপক্ষরা শাসকদের নানা নির্যাতনের মধ্যেও নিজেদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন নি।

গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবারপতন, দীনবন্ধুর নীল দর্পণ, ক্ষীরোদ প্রসাদের পুণ্যপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক নাট্যকারের অনেক নাটকই ইংরেজ শাসকরা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাতে দমেননি নাট্যকার, দমেননি যন্ত্র মালিকও।

এই আদর্শ, এই প্রেরণা, এই সাহসিকতা কি বর্তমানের রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষদের মধ্যে দেখা যায়?

একশো বছরের দ্বিতীয়ার্ধে আমরা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মন্মথ রায়ের কাছ থেকে কয়েকটি উদ্দীপনাময় নাটক পেয়েছিলাম। কিন্তু তারপর এলো এমন এক যুগ (যা আজো চলেছে) যখন মৌলিক নাটকের অবলুপ্তি ঘটল বললেই চলে, সহজ পথে বড় বড় রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষরা জনপ্রিয় উপন্যাসের নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে ব্যবসার দিক থেকে সাফল্যের আস্বাদ পেয়ে সেই কাজেই ব্যাপৃত রইলেন এবং আজো আছেন। এই সব নাট্যরূপের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। তাদের দেখে ক্রমবর্ধমান দর্শকবৃন্দ যথেষ্ট আনন্দ পাচ্ছেন। কিন্তু এদেশ জাতির মর্মকথা, তার জীবনযন্ত্রণা ও প্রাণঘাতী সমস্যার কথা ও সে সম্পর্কে কোন নতুন পথের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে এমন নাটকের সন্ধান কি দর্শকবৃন্দ পাচ্ছেন?

সাজাহান, ঔরঙ্গজেব ও আমি

১৯২৩ সাল থেকে '৫৭ সাল অবধি আমি বহু অভিনয় করেছি, তার মধ্যে বোধ হয় সাজাহানের ভূমিকায় সবচেয়ে বেশী।

দ্বিজেন্দ্রলালের এক অদ্ভুত সৃষ্টি এই 'সাজাহান' চরিত্র। চরিত্রটির মধ্যে দেখা যায়, যেমনি তাঁর পত্নীপ্রেম তেমনি তাঁর অপত্যস্নেহ। এই দুটোতে মিলিয়ে তাঁকে মহান উদার করে তুলেছিল।

আমি প্রথমবার 'সাজাহান' করি ১৯১৪ সালে প্রিয়শঙ্কর মজুমদারের বাড়ীতে। তাঁর বাড়ী ছিল হরিশ মুখার্জী রোডের উপর। বাড়ীর পাশ দিয়ে যে রাস্তা ছিল তার নাম ছিল কাঁদারীপাড়া, বর্তমানে দেবেন্দ্র ঘোষ রোড। তখনকার দিনে লোকের বাড়ীর মাঝখানে থাকতো বিরাট উঠোন। আজকের দিনে সেটা একেবারে অচল। এই উঠোন করার অর্থ হলো বাড়ীর ভেতর বয়ে হাওয়া ও আলোর কোনদিন অভাব হবে না। প্রিয়শঙ্করবাবুর বাড়ীতেও ছিল বিরাট উঠোন। কোথাও জায়গা ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে গিয়েই ধরলাম তাঁর উঠোনে অভিনয় করবো বলে। তাঁর আত্মীয় ত্রিপুরাশঙ্করের ছিলাম আমি বন্ধু। অবশ্য সে অভিনয় করতো না। আমাদের ক্লাব বলে যেটাকে গড়া হয়েছিল তাতে যা সম্ভব ছিল, তা নিয়ে এই সাজাহান অভিনয় করা যেতো না। কারণ এতে পাত্রপাত্রী অনেক বেশী। তাই অন্য ক্লাব থেকেও কিছু ছেলে আনা হয়েছিল। ১৯১৩ সাল থেকেই আমাদের এই অভিনয়ের মহড়া শুরু হয়। টাকার অভাবে অভিনয় হয়ে ওঠেনি। আমাদের শিক্ষক ছিলেন প্রবোধ মুখার্জী। তাঁর শেখানো কসরতগুলো অনেক করে অভ্যেস করার চেষ্টা করতাম। তাও আবার বাড়ীতে নয়, শেষরাত্রে প্রাতর্ভ্রমণের নামে মাঠে বেরিয়ে।

প্রাণপণে চেঁচাতাম, আর হাত মুখ নাড়তাম। তবুও ঠিক মনঃপুত হত না। মাঝে মাঝে মনে হত, কোন বৃদ্ধকে নকল করলে হয়। কিন্তু মনের মত তেমন বৃদ্ধ পাই কোথায়? তাছাড়া যে দু-একজন বৃদ্ধকে পেতাম তাঁরা ছিলেন হিন্দু। কিন্তু সাজাহান ছিলেন মুসলমান আর তারও ওপর ছিলেন ভারত সম্রাট। অন্ততঃ কোন বঙ্গলোক বৃদ্ধ মুসলমান না পাওয়া গেলে অন্য কাউকে নকল করাকে আমার মন সায় দেয়না। তাই নিজের বুদ্ধিতে যতটুকু খেলে ততটুকু করেই আমাকে তৃপ্ত হতে হয়।

১৯১৪ সালে যখন প্রথম সাজাহান সেজে মঞ্চে এলাম তখন গরমকাল। পেশোয়াজ পরিচ্ছদ পরে ঘেমে যাচ্ছি অথচ সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই, কি করে চেঁচিয়ে দর্শকদের মন জয় করবো, এই দিকেই বেশি লক্ষ্য।

আমার সঙ্গে সেদিন ঔরঙ্গজেব সেজেছিলেন অমূল্যধন ঘোষ। কিন্তু তার কি রকম অভিনয় হল, সেদিকে মন দেবার মত অবস্থা আমার ছিল না। তাই আজ তাঁর অভিনয়ের সমালোচনাও করতে পারব না। তবে এইটুকু বলব দর্শকরা খুশী হয়ে হাততালি দিয়েছিলেন। ৪৫ বছর আগেকার কাহিনী মুছে যায়নি, জলজল করছে আমার স্মৃতির মণিকোঠায়। সেদিন বাড়ীতে বলে গিয়েছিলাম বন্ধুর বিয়ে, আমাকে কলকাতার বাইরে যেতে হবে, ফিরতে তার পরের দিন বেলা হবে। বেলা তো হবেই। কারণ অভিনয়ের শেষে সকলকে বিদায় করে তো আসার ছুটি।

* * *

১৯২৪ সালের শেষের দিকে দানীবাবু আর্ট থিয়েটারে যোগ দেবার পর কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন 'সাজাহান' খুলবেন। নরেশবাবু দিনার্জায় থাকার সময়ে সাজাহান অভিনয় করেছিলেন এবং তাতে কিছু নামও করেছিলেন। তাই কর্তৃপক্ষ ওঁকেই সাজাহানের পার্ট দিলেন। দানীবাবু সাজলেন ঔরঙ্গজেব আর বিখ্যাত অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ী সাজলেন দিলদার। আমার কোন ভূমিকা নেই, তাই আমার হলো ছুটি। কিন্তু ছুটি চাইলেই ত আর ছুটি পাওয়া যায়না। তখনকার আর্ট থিয়েটারের পরিচালক প্রবোধ গুহ মহাশয় আমাকে বললেন 'সাজাহানের পার্টটা তো করা আছে একটু মুখস্থ রেখ'। আমি বলি, 'কেন?' তিনি বললেন 'যদি কোন দিন নরেশবাবু না আসেন তুমি নামবে।' কাগজে বিজ্ঞাপন পড়লো সাজাহান 'নরেশচন্দ্র মিত্র'। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম যে সপ্তাহে একটা দুটো দিন ছুটি পাওয়া যাবে। মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। অভিনয়ের দিন কাগজ দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। নরেশবাবুর বদলে নাম বেরিয়েছে আমার। খবর নিয়ে জানলাম তাঁর আগের দিন নরেশবাবুর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আকস্মিকভাবেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিয়েছেন তাঁকে বিশ্রাম নিতে। শারীরিক কোন উত্তেজনা বা বেশী কথা বলা তাঁর পক্ষে এখন নিষেধ। অগত্যা আমাকেই নামতে হল। সাজ-পোষাকের দিকে আমার চিরকাল খুঁতখুঁতানি। খাওয়া-দাওয়ার পরই তাই গেলুম আবদুল বারির দোকানে। সেখান থেকে গেলাম থিয়েটারে। পার্ট একরকম মুখস্থই ছিল। কিন্তু গোল বাধল নতুনত্ব করবো কি নিয়ে। ইতিপূর্বে সাজাহানের চরিত্রকে পরিচালনা করেছিলেন অমর দত্ত। এবং তাতে তাঁর মুক্তাদরের রোগও দেখা দিয়েছিল। কিছুদিনের জন্য তাঁর পক্ষাঘাতও হতে দেখা গিয়েছিল। এইটাকেই আমি কাজে লাগালাম। সাজাহানের একটা দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করলাম—কিন্তু মনের মধ্যে ভয় হয়—যদি অভিনয় না জমাতে পারি তাহলে?

অভিনয় শুরু হল। দানীবাবু অপূর্ব অভিনয় করলেন, তবে এইখানে বলে রাখা ভাল—দানীবাবুর অভিনয়প্রতিভা তখন শেষের দিকে। তিনি তখন দুঃখের পর্যায়ে। সামান্য কথায়ও ভোর এসেছে। কিন্তু তিনি অভিনয় করতেন অপূর্ব। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের দুটো দিক, যেমন তাঁর ধর্মপ্রবণতা তেমনি তাঁর কূটরাজনৈতিক বুদ্ধি। এ দুটো দিকই তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুললেন।

অপরদিকে আমি সাজাহান। তিরিশ বছর বয়সের যুবক। শেষ দৃশ্যে বিশেষ করে যখন ঔরঙ্গজেব পিতার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছে, তখন আমি পড়তাম মুস্কিলে। তিনি পায়ে হাত দিতে আসতেন আমি সংকুচিত হয়ে যেতাম। অপরদিকে জাহানারা সেজেছিলেন কুসুমকুমারী। উনি

ছিলেন অবর দত্তের সময় বিখ্যাত অভিনেত্রী। তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে তবুও সংকোচ কাটিয়ে অভিনয় করলাম। যথেষ্ট হাততালিও পেলাম। বুঝলাম দর্শকরা আমায় নিয়েছেন। আর এই দর্শক নেওয়াতেই আমিও হয়ে গেলাম স্থায়ী 'সাজাহান'।

রাধিকানন্দবাবু ছিলেন আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা। শিবসাতে বড় সরকারী চাকরী করতেন। কিন্তু অভিনয়ের নেশায় সে চাকরী ছাড়লেন। ১৯২১ সালে নরেশবাবুর সঙ্গেই তিনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন। পরে আর্ট থিয়েটারে চলে আসেন। এখানে নরেশবাবুর অনুপস্থিতিতে তিনি কর্ণার্জুনে শকুনির পার্ট করেছিলেন যা হোক দানীবাবুর পর উনিই আমার সঙ্গে ঔরঙ্গজেব সাজেন ভালই অভিনয় করতেন তবে তাঁর অভিনয়ের মধ্যে রাজনীতিটাই ফুটে উঠতো বেশী। যার ফলে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রটা একটু ক্রুর ও খল হয়ে যেত। সেটা ফুটে উঠতো দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে অর্থাৎ রাজসভার দৃশ্যে, তিনি যখন বলতেন, 'চল মহম্মদ আমরা মক্কায় যাই চল'। এতে ঔরঙ্গজেবের ধর্মপ্রবণতা ফুটতো না, যেন একটু ক্রুর হয়ে যেতো।

এর পরে ধরা যাক নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কথা। তিনি সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করে যেমন নাম করেছিলেন, তেমনি নাম করেছিলেন ঔরঙ্গজেব অভিনয় করে। বহুবার দানীবাবু ঔরঙ্গজেব সেজেছেন আর শিশিরবাবু সাজাহান। কিন্তু মুস্কিল হল আমার সঙ্গে সম্মিলিত অভিনয়ে, উনি বলতেন, ঔরঙ্গজেবের অভিনয় ততখানি ভাল তিনি করতে পারেন না। যতখানি তাঁর করা উচিত। আমাকে তিনি ঔরঙ্গজেব করতে বলতেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব করতে আমি অভ্যস্ত নই। ছেলেবেলা থেকেই আমি সাজাহান করছি। তার ওপর আর্ট থিয়েটারে সাজাহানের অভিনয় করে নামও করেছি। দর্শকের কাছে হাততালিও পেয়েছি। তাই আমার পক্ষে ঔরঙ্গজেব করা সম্ভব ছিলনা, অগত্যা শিশিরবাবুকেই নামতে হতো ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায়। প্রতিভাবান শিল্পী, শুধু তাই নয়, নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারতেন ঐ ভূমিকায়। তবে অসম্ভব খেয়ালী লোক ছিলেন তিনি। যেদিন তাঁর ভাল লাগতো, সেদিন সুন্দর অভিনয় করতেন আর যেদিন তাঁর ভাল লাগতো না, সেদিন কোনরকমে চালিয়ে দিতেন। ঔরঙ্গজেবের স্বগত উক্তিগুলি পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে তিনি অপূর্ব অভিনয় করতেন। কথা প্রসঙ্গেই বলে রাখি – শিশিরবাবুর শেষ জীবনে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। সাজাহান আর ঔরঙ্গজেব একসঙ্গে দুটি চরিত্রই অভিনয় করেছিলেন। ইদানীং কালে তো নয়ই, অতীতেও কেউ এ ধরণের দুটি অভিনয় একসঙ্গে করেছেন বলে আমার জানা নেই।

নির্মলবাবু আমাদের সঙ্গে আর্ট থিয়েটারে অভিনয় করতে শুরু করেছিলেন ভিলেনের পার্ট নিয়ে। দানীবাবুর পর তিনি সাজতেন ঔরঙ্গজেব। এই প্রসঙ্গেই বলি, নির্মলবাবু এই ভূমিকাটি তখন থেকে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে গেছেন। নির্মলবাবুর কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সুদর্শন অভিনেতা। তবে চরিত্র নিয়ে অনুসন্ধান খুব একটা তিনি করেননি। তাই যেদিন যে ধরনের ইচ্ছে হত, সেদিন সেই ধরনের অভিনয় করতেন এক একদিন মনে হত ঔরঙ্গজেবের চরিত্র ক্রুর। আবার এক একদিন মনে হত তিনি ধর্মপ্রাণ। তিনি রাজনীতিবিদ। যেটুকু নিষ্ঠুরতা তাঁর চরিত্রের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সেটুকু ধর্মের জন্যে তাঁকে করতে হচ্ছে। এরই ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সম্মিলিত অভিনয়ে ঔরঙ্গজেব সাজতো দুর্গাদাস; দুর্গা আমাদেরই সঙ্গে কর্ণার্জুনে অভিনয় করে তার যাত্রা শুরু করে। কর্ণার্জুনে সে করতো বিজয়ের পার্ট। সামান্য ছোট পার্টেই সে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরও আকর্ষণ করেছিল একটি নির্বাক ভূমিকায়। 'রাজারাণীতে' একটি জনতার দৃশ্যে সে নেমেছিল। ক্ষুধার্ত জনতা তাদের ক্ষুধা যে কতখানি তীব্র তা বোঝাবার জন্যেই সে একটা গাছের ডাল হাতে নিয়ে আসে। শুধু হাতে নয়, মুখে এসে সেটাকে চিবোতে আরম্ভ করে। তার অভিনয়ে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল সে কতদূর ক্ষুধার্ত। এই সামান্য ভূমিকায় সে সমালোচক এবং দর্শকের দৃষ্টি তো আকর্ষণ করেছিলই উপরন্তু সে পেয়েছিল সমালোচকদের প্রশংসা। দুর্গা ছিল শিল্পী, নরেশবাবু তাকে আর্ট থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলেন, আমার সংগে তার সেই সূত্রেই প্রথম

পরিচয়। অপূর্ব ছিল তার কণ্ঠস্বর। আর তেমনি ছিল তার চেহারা।

আমাদের আর্ট থিয়েটারে যখন প্রথম সাজাহান অভিনয় হয়, তখন তার করবার কথা ছিল মহম্মদ। কিন্তু সেদিন সে আসেনি। দুর্গা যখন ঔরঙ্গজেব করেছিল, তখন সে বিখ্যাত অভিনেতা। দুর্গা ঔরঙ্গজেবের মধ্যে দেখাতো তার অন্তর্দ্বিধাটা বেশী করে। লায়ার মৃত্যুর পরোয়ানা সই করার দৃশ্যটি অর্থাৎ চতুর্থ অঙ্কের ৪র্থ দৃশ্য, যেখানে ঔরঙ্গজেব নিজের বিবেকের সংগে দ্বন্দ্ব করছে, লায়ার মৃত্যু পরোয়ানা সই করবে কি না, অপূর্বভাবে সে ফুটিয়ে তুলতো। এছাড়া পঞ্চম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে সে সুন্দর অভিনয় করতো। দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যেও যখন সে বলতো 'চল মহম্মদ, আমরা মজার ঘরে চল' কিংবা বলতে যখন "উত্তম তবে এই মুহূর্তে আমি সিংহাসন ত্যাগ করলাম"—তার কণ্ঠস্বর মন ভরে করতো। দুর্গা অভিনয়ের গৌরবশিখরে উঠে ১৯১৩ সালে অকালে মারা যায়।

এর পরে নির্মলবাবুই ঔরঙ্গজেব অভিনয় করতেন। নির্মলবাবু ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলালের ভাগিনেয়।

সাধারণ রঙ্গালয়ে সমস্যা দেখা দিল নির্মলবাবু মারা যাবার পর। এখন ঔরঙ্গজেব করে কে? শিশিরবাবু করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজের মঞ্চ ছাড়া অন্য জায়গায় গিয়ে অভিনয় করতে তেমন উৎসুক নন। তাছাড়া তাঁর তখন বয়সও হয়েছে। সুদর্শন অভিনেতা বলতে তখন মঞ্চে ছিল ছবি বিশ্বাস। ছবি শখের যাত্রাদলে প্রথম অভিনয় করত। আমেচার অভিনেতাও অনেক নিত। কিন্তু মঞ্চে বিশেষ অভিনয় করতো না। পরে সে যোগ দেয় সিনেমায়। এই সিনেমায় বিখ্যাত হবার পর ছবি আসে সাধারণ মঞ্চে। প্রথমে নাট্যনিকেতনে 'বীরকাশিম' নাটকে অভিনয় করে। পরের বারীতে খেলাৎ-এর অভিনয় করে সে বিখ্যাত হয়। মিনার্ভায় কয়েক রাত্রি সে সাজাহান অভিনয় করেছিল। সম্মিলিত অভিনয়ে সে দিলদারের অভিনয় করতো। কিন্তু ঔরঙ্গজেব কখনো করেনি। এইবার তার পড়লো তার। ছবি সিনেমা থেকে এসেছিল বলেই তার অঙ্গভঙ্গি চলাফেরা অভ্যুত ভাল হতো। কিন্তু কণ্ঠস্বর দুর্বল থাকায় আবৃত্তি ভাল হতো না। তবে ঔরঙ্গজেবের চরিত্রচিত্রণ সে নিখুঁতভাবে আঁকতে পেরেছিল বলে আমার মনে হয়।

আর একটি ছেলে এই সময় ঔরঙ্গজেব করতে আরম্ভ করে। তার নাম নীতিশ মুখার্জী। নীতিশের কণ্ঠস্বর ছিল—চেহারাও ছিল। আশা করেছিলাম নীতিশ ঔরঙ্গজেবের অভিনয়েতে আরও নাম করবে। আমি মঞ্চ থেকে অবসর নেবার পর নীতিশ কয়েক রাত্রি সাজাহানও অভিনয় করেছিল। ভেবেছিলাম আমি মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেও সাজাহান অভিনয়ের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় মোটর অ্যাকসিডেন্টে ১৯৬২ সালে ছবি আর মাত্র কয়েক বছর আগে নীতিশও মারা গেল।

আমি যখন শেষবারের মত স্টার থিয়েটারে যোগ দিই, সেখানে কয়েকরাত্রি সাজাহান অভিনয় করেছিলাম। সেখানে আমার সংগে ঔরঙ্গজেব করেন মহেন্দ্রবাবু।

তারপর থেকে এই অভিনয় তিনি আজ অবধি করে আসছেন। তিনি শিক্ষিত এবং নাটকের চরিত্রের যথাযথ মর্যাদা বোঝেন। তাই এই শক্ত চরিত্রটি তাঁর অভিনয় করতে মোটেই অসুবিধে হয় না। আমি মঞ্চ থেকে অবসর নিলে, নরেশবাবু, নীতিশ বা ঠাকুরদাস মিত্র যখনই সাজাহানের অভিনয় করেছেন, তখনই তিনি ঔরঙ্গজেব করেছেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী

নাট্যপ্রবাহ

তীর্থঙ্কর নাট্য গোষ্ঠী উত্তর কলিকাতার শ্যামপুকুর অঞ্চলের একটি প্রগতীধর্মী, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্যমশীল নাট্যসংস্থা। এ পর্যন্ত এঁরা যে কটি নাটক পরিবেশন করেছেন তাদের মধ্যে নাট্যচিন্তা ও নবতর প্রযোগ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেছে। এঁদের সাম্প্রতিকতম নাট্যোপহার অস্থি দিয়ে অস্ত্র গত ২৩শে জুন রবেজ ওর লাইব্রেরী মঞ্চে যাত্রাভিনয়ের

রীতিতে অভিনীত হল। নাটকের রচয়িতা ও পরিচালক বটা ভট্টাচার্য। নাটকটির মধ্যে অভিনবত্ব আছে, পরিচালনায় পাওয়া গেছে দক্ষতার ছাপ। সঙ্গীতবহুল এই নাটকটির দলগত অভিনয় হৃদ্য। নাটকটির বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে রূপক বাস্তবতা ও প্রতীকের সমন্বয় সাধন করে নাট্য মুহূর্তগুলিকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যেই নিষ্ঠা ও প্রত্যয়ের পরিস্ফুটন লক্ষিত। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন, বিজয় মুখোপাধ্যায়, তারকদাস রায়, বটা ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়, গোবিন্দ মিত্র, সুবেন্দু মুখোপাধ্যায়, ভোলা বসু, নারায়ণ পাল ও দুর্লভ মুখোপাধ্যায়। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন, বীণা ভট্টাচার্য, সমিতা ঘোষাল ও রুনু ঘোষ। সঙ্গীত পরিচালনায় ও শব্দ সংযোজনায় তারকদাস রায়ের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। আলোক সজ্জাতে যথেষ্ট রক্ষিত কল্পনা শক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন

• কয়েকদিন আগে ইনডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটের কর্মীরা রঙনা মঞ্চে বিমল মিত্রের **সাহেব বিবি গোলাম** অভিনয় করলেন। নাট্যরূপ—বৈদ্যনাথ ঘোষের। অভিনয় মোটামুটি ভাল। প্রযোজনাও হৃদ্য। পরিচালনায় শুভাংশু ভট্টাচার্য দক্ষতার ছাপ রেখেছেন। অভিনয়াংশে ছিলেন উমা দে, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায়, হরিশ মৈত্র, বিমল সিংহ, বিনয় গোস্বামী, গৌরীশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

• **গণদেবতা** তারাশংকরের একটি অসাধারণ উপন্যাস। সেই উপন্যাসের সার্থক নাট্যরূপ সহজ নয়। রতনকুমার ঘোষ এই কাহিনীর যে নাট্যরূপ দিয়েছেন তা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করলেন **লোকরঙ্গের** শিল্পীরা সম্প্রতি মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। বহু চরিত্রের মধ্যে যাঁদের অভিনয় বিশেষভাবে দর্শকদের আনন্দ দান করেছে, তাঁরা হলেন, হারাধন চক্রবর্তী, অনিল দত্ত, রণজিৎ রায়, প্রশান্ত চৌধুরী, মমতা চট্টোপাধ্যায়।

• **অমিভ** রচিত **অন্ধকারের নীচে সূর্য** নাটকটি সম্প্রতি মঞ্চস্থ করলেন **প্রতিদ্বন্দ্বী** (নবার্ক) নাট্য সংস্থার সভ্যরা বিশ্বরূপা মঞ্চে। প্রদীপ ঘোষের সুদক্ষ পরিচালনা ও প্রতিষ্ঠানের সমস্ত-শিল্পীদের সুঅভিনয় দর্শকদের প্রকৃত আনন্দ দিয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন দিবাকর চক্রবর্তী, দেবী বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর ঘোষ, নির্মল গাঙ্গুলী, স্বপন মুখোপাধ্যায়, শীতেশ ভট্টাচার্য, সাধন রায়চৌধুরী, কাজ সেনগুপ্ত, মমতা চক্রবর্তী ও আরতী ঘোষ।

• যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা গঠিত **লুম্বিনীলাজ** ক্লাবের সভ্যরা সম্প্রতি হিন্দি হাইস্কুল মঞ্চে তরুণ নাট্যকার নচিকেতার **পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে** নামক নাটক ও রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য **শ্যামা** পরিবেশন করলেন। নাটকে সুঅভিনয় করেন সুশান্ত চৌধুরী, সুদর্শনা বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃত্যনাট্যে অরুন্ধতী সেনগুপ্ত, অভিরূপ গুহঠাকুরতা এবং শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

• গত ৩রা জুন স্টার থিয়েটার মঞ্চে **তালনাল গ্রিনমঞ্চে** রাজ্যের কর্মীরা দীপক চৌধুরীর **ফরিয়াদ** নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করলেন। সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা উল্লেখযোগ্য। অভিনয়ে কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল মুখোপাধ্যায়, রাধাদা চট্টোপাধ্যায়, সমর বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীত চট্টোপাধ্যায়, বেলা রায়, কাজল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীরা কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন

• ১৯শে জুন রঙনা মঞ্চে **উত্তরায়ণের** সভ্যরা মঞ্চস্থ করলেন **স্বীকৃতি**। বিভিন্ন চরিত্রে সুঅভিনয় করেন সমর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী ঘোষ, সুশীল চৌধুরী, শ্যামাপদ রায় ও আরতি ঘোষ প্রমুখ। পরিচালনায় শতীন বর্মণ কৃতিত্বের দাবী রাখেন।

• **বাঁকুড়ার** সাংস্কৃতিক সংস্থা **জ্ঞানমঞ্চ** সম্প্রতি স্থানীয় চিত্র-শিল্পির প্রাঙ্গণে রতন কুমার ঘোষের **অমৃতস্যপুত্রাঃ** নাটকটির অভিনয় করে দর্শকবৃন্দের সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। দলগত অভিনয় আপাদমস্তক সুন্দর। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখেন পার্থ কুণ্ডু, সমর দত্ত, কাবেরী বিশ্বাস, আশীষ সরকার, জিতেন গোস্বামী, দীপক ঘোষ, শাশ্বত আইচ, ইন্দুলাল রায়, শম্পা আইচ। নাটকটি পরিচালনা করেন বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

• **বালীতীর্থের** শিল্পীরা সম্প্রতি বিনার্তা মঞ্চে শচীন ভট্টাচার্যের **সম্রাটের মৃত্যু** নাটকটি পরিবেশন করে দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। সজল পালের পরিচালনা এবং নমিতা মণ্ডল, নিমাই পাল, কাজল সাহা, রঙনা বিশ্বাস প্রমুখ শিল্পীদের অভিনয় বিশেষ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখে।

অবেলায়

নিখিল চন্দ্র সরকার

সূর্য ডুবছে। আকাশে ম্লান আবছা ছায়া। মাঠে প্রান্তরে স্থির অমছে। থেকে থেকে উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছিল। ধূসর বিষণ্ণতা আলোও যেন যাই যাই করছে এবার। পাখির দল কুলায় ফিরছে। সমস্ত চরাচরে কী এক বিষণ্ণতা ধীরে ধীরে ব্যাপ্ত হচ্ছে। ক্ষীরোদবাবু বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন। দৃষ্টি ঘুরে নিবদ্ধ স্থির। গায়ে চাদর জড়ানো, শীত শীত করছে, তবুও ওঠার নাম করলেন না তিনি। ওদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেন যেন তার এক রকমের কষ্ট হচ্ছিল। তাঁরও বয়েস হয়েছে। দিনের আলো ফুরিয়ে আসার মতন তাঁরও সব শেষ হয়ে এলো এবার। প্রকৃতির এই বিষণ্ণ মূর্তির সঙ্গে তাঁরও এক মিল রয়েছে যেন। আজ কদিন ধরে বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর বারান্দায় কাটছে। ঘরে যেতে বেশী ইচ্ছে করে না। আরো ফাঁকা লাগে। মনে হয়, বিরাট এক শূন্যতা তাঁকে গ্রাস করার জন্যে ছুটে আসছে। এত নিঃসঙ্গ নিজেকে আর কখনো মনে হয় নি। কদিন আগেও বাড়িতে কত লোকজন, চেঁচামেচি। গোটা বাড়িটাই যেন খুশীতে ঝলমল করছিল। এবারের পুজোতে তিনি সবাইকে আসতে লিখেছিলেন।

মণিময় এবাড়ির সবার বড়, ক্ষীরোদবাবুর দাদার ছেলে। বাসনা অবশ্যি ওদের ছেলেমেয়ে জামাইদেরও আসতে লিখেছিলেন তিনি। প্রবীর তাঁর নিজের ছেলে, সেও এখানে থাকে না, পাটনায় কাজ করে। প্রবীরও এসেছিল।

এভাবে একা একা থাকতে তাঁরও ভাল লাগে না। ওরা সবাই আসার পর কদিন বেশ কাটল। তাঁর শরীরের কোন কষ্ট বা উপসর্গ ছিল না তখন। এমন ছবি যেন তিনি বহুকাল দেখেন নি। একবারও মনে হয় নি যে এই সুখের ছবিটা একদময় তাঁর চোখের সামনে থেকে স্বাভাবিক ভাবেই সরে যাবে, থাকবে না, কোন সময়ই হয়তো আর তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা চলে যাওয়ার পর কষ্টটা আগের চেয়ে আরো বেড়েছে। এই নির্জনতা, শূন্যতাবোধ তাঁকে যেন ক্রমশই কোথায় নিয়ে যাবে এখন। টুকরো টুকরো ঘটনাগুলোর কথা মনে পড়লে তাঁর বুকের ভেতরটা যে কী করতে থাকে না! এই সেদিনও ছেলেমেয়েগুলো চোখের সামনে দৌড়াদৌড়ি করেছে, দিনরাত শুধু হুড়াহুড়ি। বাড়িটা যেন আবার পুরনো দিন ফিরে পেয়েছিল। ক্ষীরোদবাবুর মনে হয়েছে, এটা যেন এক উৎসব বাড়ি। এখন উৎসব শেষ, যে যার জায়গায় ফিরে গেছে আবার, কিন্তু তার চিহ্নগুলো এখনও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এই সত্যটাই আজ তিনি বেশী করে উপলব্ধি করলেন। বারবার যেন অন্যমনস্ক হয়ে যান।

রীণা, বাসনার ছোট মেয়ে, যাওয়ার সময় খুব কেঁদেছিল। ও-ওই তাঁকে কটা দিন সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে, খালি গল্প শোনার বায়না ধরেছে। ওদের কথা মনে হলে তাঁর বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যায়, আর বুঝি সইতে পারবেন না। সংসারে কাউকে ধরে রাখা যায় না এই বোধটাই তাঁকে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। ওরা এসে সব কেমন ওলট পালট করে দিয়ে গেল। এ কদিন ধরে একটা কথাই তাঁর বারবার মনে হয়েছে, তিনি আর ওদের কখনো দেখতে পাবেন না। এবারের আনন্দটুকুই তাঁর শেষ পাওয়া। বাকী যে কটা দিন বাঁচবেন, এই স্মৃতিই হবে তাঁর বড় আশ্রয়। একটা জিনিস তিনি বুঝতে পারছেন, তাঁর দিন ফুরিয়ে এলো। এবার সব মায়া মমতা ছিন্ন করে চলে যাবেন এখান থেকে। 'বিদায়, তোমাদের সবার কাছ থেকেই বিদায়' মনে মনে এই কথা কটি উচ্চারণ করতে গিয়েও বুকের ভেতরে বাতাস আটকে গেছে, কষ্ট

পেরেছেন। এখন শুধু এরই জন্যে অপেক্ষা করছেন যেন। কোথায় যাবেন? তা তিনি জানেন না, শুধু এটুকুই বুঝতে পারেন, চিরকালের জন্যে তাঁর এই চলে যাওয়া, কেউ আর কোন দিনও তাঁকে ফিরে পাবে না। যাদের নিয়ে এই আরম্ভ হইচই করলেন এতকাল, সব কিছুর শেষ এবার। ভাবলে ভীষণ খারাপ লাগে। তাঁর দাদাও আজ কতকাল হয়ে গেল তাঁদের ছেড়ে চলে গেছেন। মণিময়কে তো তিনিই মানুষ করেছেন। ইদানীং সেই দাদার কথা খুব মনে পড়ে। তন্দ্রার মধ্যেও তিনি মা বাবার মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পান। কী এক অস্বস্তিতে জেগে ওঠেন। অনেকক্ষণ আর ঘুম হয় না। ছটফট করেন খালি।

বাসনা যাওয়ার সময় ডুকরে কেঁদেছিল, ভাঙা ভাঙা গলায় বলেছিল, "এখানে একাবে একা একা আপনি থাকতে পারবেন না বাবা, হয় প্রবীরের কাছে চলে যান, না আমার এখানে এসে থাকুন।"

ক্ষীরোদবাবু ওর মুখের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, "আর সময় নেই রে যাওয়ার; তাছাড়া এই ছিটে ছেড়ে আমি যেতে পারি না, আমার বাবা মা দাদা এখানেই মরেছেন, আমিও ওঁদের পাশেই থাকতে চাই!" ক্ষীরোদবাবুকে কেমন ক্লান্ত, উদাসীন একটু বিষণ্ণও দেখাচ্ছিল তখন।

বাসনা চোখের জল মুছতে মুছতে অস্ফুটে বলেছিল, "আরেকবার এসে আপনাকে আর দেখতে পাব না।"

ক্ষীরোদবাবুর চোখ জলে ঝাপসা হয়ে উঠেছিল, একটু হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, "আমাকেও সবাইকে ছেড়ে ছুড়ে থাকতে ভীষণ কষ্টের, এটা কেউ বুঝতে চায় না।"

বাসনা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, "শরীরের যত্ন নেবেন, চিঠি দিয়ে জানাবেন সব, না হলে ভীষণ চিন্তা হবে।"

"আর যত্ন!" ক্ষীরোদবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে ছিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "ভগবান, তোদের সুখে রাখুন, আশীর্বাদ করছি সুখী হ তোরা।"

জয়ন্তীরাও যাওয়ার সময় তাঁদের জন্যে গভীর এক কষ্ট নিয়ে গেছে।

ক্ষীরোদবাবু ওদের ছেড়ে এবার মুক্তই হয়েছেন। ওরা ভালই আছে। ওদের ছেলেমেয়েগুলোও ভাল হয়েছে। জয়ন্তীর ছেলে শুভ তো পড়াশুনোয় বেশ ভাল, মণিময়ের মেয়ে মিতি অনেক প্রাইজটাইজ পেয়েছে, গানে বেশ নামটাম করেছে। এসব শুনলেও গর্ব হয়; শুধু জামাইরাই নয়, মণিময়রাও জীবনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। ওরা সুখে আছে জানলেও বুকটা শান্তিতে, তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। সবার জন্যেই তাঁর আজ আন্তরিক আশীর্বাদ। তিনি এদের মধ্যেই থাকবেন। বংশ পরম্পরায় দীর্ঘদিনের যে রক্ত ধারা তাঁর মধ্যে প্রবাহিত, তিনিও উত্তরপুরুষের মধ্যে সেই ধারাই ছড়িয়ে দিয়ে গেলেন। তিনি মনে করেন, এই রক্তকে নিজের নিজের সাধনা দিয়ে দোষমুক্ত, পবিত্র করতে হয়; খুব কঠিন সে দায়িত্ব যাকে যাকে আমাদেরই ভুলে, প্রলোভনে দূষিত হয় সে রক্ত, সেখানে ভাবীকালের কত রকম সর্বনাশ, অনর্থ অপেক্ষা করে! তিনি এটা বিশ্বাস করেন, ভাল বীজ না হলে, ভাল ফসল হয় না। খুব সূক্ষ্মভাবে, অন্তরালে নিয়ত এর কাজ চলেছে। তিনি দেখেছেন, সংসারে অধিকাংশ মানুষই বাইরেটা দেখে বিচার করে, কোন কিছু তলিয়ে দেখতে চায় না। তিনিও যে পারেন, তা নয়। এরা ভালভাবে আছে এটুকু জেনেই তিনি আনন্দিত; কিন্তু যখনই মনে হয়, এসব ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে যাবেন, আর কখনো ফিরবেন না, এবং সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন মনটা গভীর এক দুঃখে ভরে যায়। এতদিন যে সব আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনার পেছনে অন্ধের মতন ছুটোছুটি করেছেন, কখনো ক্লান্ত, কখনো বা সফল পুরুষ এবং এই বুনোনের ভেতর দিয়ে দিয়ে আজ এমন একটা জায়গায় চলে এসেছেন যে দেখে মনে হচ্ছে, কি প্রয়োজন ছিল এসবের। অনেকটা যেন নেশার মতন। এবার সেই নেশা কেটে গেছে তাঁর। আর সেই সঙ্গে সময়ও ফুরিয়ে এলো। তবু এখনও কিছু কাজ তাঁর বাকী থেকে গেল।

চলে যাওয়ার আগে মণিময় আর প্রবীরকে একবার ডেকেছিলেন ক্ষীরোদবাবু, বলেছিলেন, "তোদের একটি কথা বলতে চাই, হয়তো এর পর আর সময় পাব না।"

ওরা চুপ করে থাকল।

ক্ষীরোদবাবু আরো খানিকটা সময় নিয়ে বললেন, "আমি থাকতে থাকতে এ বাড়ির একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই।"

মণিময় আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাঁকে একবার দেখল, আরও একটু সময় নিয়ে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

ক্ষীরোদবাবু অন্যদিকে তাকিয়েছিলেন, কি ভেবে ওর ওপর দৃষ্টি স্থির রেখে আস্তে আস্তে বললেন, "না বোঝার কিছু নেই; এই বাড়ি নিয়ে একটা কিছু এবার ভাবতেই হবে তোদের।"

মণিময় মাথা নীচু করে রেখে বলল, "আমার পক্ষে তো এখানে এসে এখন থাকা সম্ভব নয়।"

ক্ষীরোদবাবু চুপ করে ছিলেন কিছুক্ষণ, তাঁর চোখ মুখে উদাস ম্লান এক ছায়া পড়েছে, ধীরে ধীরে বললেন, "বুঝতে পারছি, তোদের কারো পক্ষেই আর এখানে থাকা সম্ভব নয়।" একটু পরে কের বলেছিলেন, "তাই যদি হয়, তবে আর বাড়িটা ফেলে রাখার কি দরকার, বেচে দিলেই হয়।"

মণিময় প্রবীরের মুখের ওপর চোখ রেখে মৃদু হেসে বলেছিল, "তুই তো এখানে এসে প্র্যাকটিস করতে পারিস, বাড়িতে কারো থাকা দরকার এখন।"

"দরকার তো, তুমি এসে থাক না!" প্রবীর যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

ক্ষীরোদবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, "বলছি তো, বাড়িটা বেচে দিই; কাজের ক্ষতি করে তোদের কাউকেই এসে বাড়ি পাহারা দিতে বলছি না।"

মণিময় আস্তে হেসে বলল, "এখনও তো মাঝে মাঝে এসে আমরা একটু বেড়াতে-টেরাতে পারি, বেচে দিলে আর আসাটাসা হবে না।"

ক্ষীরোদবাবু ওর চোখে চোখে চেয়ে বলেছিলেন, "আমরা এতগুলো ভাইবোন এই বাড়িতেই মানুষ হয়েছিলাম, তোদের ছেলেবেলাও এখানেই কেটেছে, সারা বাড়ি গম গম করত তখন, আর এখন? সবাই যে যার মতন ছিটকে পড়েছে। এভাবে ফেলে রাখলে শেষকালে ভূতের বাড়ি হবে, দেখিস।"

এরপর মণিময়রা আর কোন কথা বলে নি।

ওদের কারো কোন মায়া নেই। অথচ ক্ষীরোদবাবু বাড়িটার জন্যে মমতাবোধ করছিলেন। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর। তিনি একদৃষ্টে চেয়ে আছেন বাগানের দিকে। এখন কত ফাঁকা হয়ে এসেছে, আগে কিন্তু এমন ছিল না। আজ এই অবেলায় অনেকের কথাই মনে পড়ছে। এটাই তাদের পিতৃভিটা। তিন চার পুরুষ আগে এই বংশেরই কেউ এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন। আজ এতকাল পরে আবার সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। এঁরা আছেন বলেই এখনও ওদের পরস্পরের মধ্যে দেখাশোনা হয়, পরে তাও হবে না। সবাই আলাদা, বিচ্ছিন্ন। এমনি করেই কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক থাকবে না। ক্ষীরোদবাবু দীর্ঘ করে শ্বাস ফেলেন। ভেতরটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠছে। তিনি ওদের বলেছেন বটে, বাড়ি বেচে দেবেন। এটা মনের কথা নয়। মনের কথা হতে পারে না। এতকালের এই বাড়ি তিনি ইচ্ছে করলেই বেচতে পারেন না। এখানে তাদের কত স্মৃতি, হাসি কান্না! বরং অভিমান, ক্ষোভ ছিল ওঁর মধ্যে। ওরা সবাই একসঙ্গে এসে থাকুক, এটাই তিনি চেয়েছেন। তিনি যেন চোখের সামনে দেখছেন, বাড়িটার এখানে ওখানে মঙ্গল হয়েছে, পরিত্যক্ত! ইট কাঠ সব চুরি হয়ে গেছে, সাপটাপ এসে আশ্রয় নিয়েছে। দেখতে দেখতে একসময় এই বাসযোগ্য ভিটাটাই হিংস্র শ্বাপদে ভরে যাবে। ভাবলেও দুঃখে বেদনায় বুকের ভেতরটা টন টন করতে থাকে। নিজেরা কেউ এসে না থাকলে এই দশাই হবে।

ক্ষীরোদবাবুর বিষণ্ণ চোখ দুটোতে এখন কী এক ঘোর নেমেছে যেন। মাঝে মাঝে দীঘির হাওয়া ছুটে আসছে। হঠাৎ কেন যেন বাসনার কথা মনে পড়ল, ও আর তাকে দেখতে পাবে না, এই ভয়েই মেয়েটার কী কান্না সেদিন! তিনিও জানেন, ওদের সবার সঙ্গেই তাঁর এই শেষ দেখা। সবার ক্ষেত্রেই তো এই নির্মম নিয়তি অপেক্ষা

করে রয়েছে। তবু, কেন এত ব্যথা, ছটফটানি, আকুলতা!

এমন সময় স্নেহলতা এসে পাশে দাঁড়ালেন; তিনিও যেন কেমন ভেঙে পড়েছেন। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বললেন, "ঠাণ্ডায় ঘরে থাকলে তো শরীর আরো খারাপ হবে, ওঠে চলো।"

ক্ষীরোদবাবু স্নেহলতার দিকে চেয়ে থাকলেন একটু সময়। ওর জন্যে কেমন মায়া হলো তাঁর! সংসারের কত টানা পোড়েন, কত ঝাপ্টা গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। সব সময়ই স্নেহলতা তাঁর পাশে, হাসি মুখে তাঁকে সান্ত্বনা, সাহস দিয়েছেন। এবার কি ওঁদের মধ্যে চিরকালের ছাড়াছাড়ি! বুকটা যেন চ্যাং করে ওঠে। ক্ষীরোদবাবু ম্লান ভাবে হাসলেন শান্তস্বরে, বললেন, "আর খারাপ হওয়ার কি আছে; তবু এখানে বসলে একটু ভাল লাগে।"

স্নেহলতা চুপ করে থাকলেন তিনিও বুকের মধ্যে গভীর এক যন্ত্রণা নিয়ে বেড়াচ্ছেন। থেকে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। একটু পরে বললেন, "বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে, তাকানো যায় না!" বলতে বলতে গলাটা কেমন নরম হয়ে এলো তাঁর। চোখ জলে ভরে উঠেছে। আঁচলে চোখ মুছলেন

"এসব ভাবলে তোমার কষ্টই বাড়বে।"

"আমি কি ভাবতে চাই নাকি, চারদিকে চাইলেই মনে পড়ে যায় সব!"

ক্ষীরোদবাবু চোখ ফেরালেন অন্যদিকে, একটু পরে ধীর গলায় বললেন, দেখলাম এসব ভেবে আর লাভ নেই এখন; ওদের, এখানে এসে থাকার তাদের ইচ্ছে নেই। আমরা যে কটা দিন আছি, এই!"

"আমার আর এখানে একদণ্ডও ভাল লাগছেনা, ওদের কাছ থেকে কদিনের জন্যে ঘুরে এলেও হয়।" স্নেহলতার গলা ভাঙা ভাঙা শোনাল।

ক্ষীরোদবাবু কিন্তু বললেন না। তিনিও ওর দুঃখ বোঝেন ওরা সবাই আসার স্নেহলতা যেন আবার সুখের দিনগুলো ফিরে পেয়েছিল। ওকে তখন একটু অন্যরকম মনে হয়েছে তাঁর। তিনি বললেন, "যাও না, ঘুরে এসো, ভাল লাগবে।"

"সে যে কত যাওয়া হবে আমার জানা আছে।" মৃদু আস্তে আস্তে স্নেহলতা বললেন।

ক্ষীরোদবাবু ওঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলকে চেয়ে থাকলেন। তিনি ভাল করেই জানেন, ওঁকে এখানে একা একা রেখে ওর যাওয়া হবে না। এই একঘেয়েমী একাকীত্ব কারই বা ভাল লাগে। ম্লান গলায় বললেন, "সত্যি, আমি তোমাদের সবাইকে বড় দুর্ভোগে ফেলেছি।"

"হয়েছে, এসব অনেক শুনেছি, আর ভাল লাগে না।" স্নেহলতা ওর মুখের দিকে তাকালেন।

অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষীরোদবাবু সেদিকে চেয়ে আছেন বিমূঢ় দৃষ্টিতে।

স্নেহলতা আস্তে আস্তে বললেন, "আমি যাচ্ছি, আর ঠাণ্ডা না খেয়ে ভেতরে এসো।"

ক্ষীরোদবাবু কিন্তু বলতে পারলেন না। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল এই অন্ধকার আরও ঘন হবে, তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরারই ষড়যন্ত্র এখানে। দিনের আলো শেষবারের মতন যেন ফুরিয়ে গেল। হায়রে, রামধনুজীবন!

• • • •

ঈশ্বরের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি। মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা। ধ্যান-ধ্যান করতে ভালবাসেন। চির-জীবন রইলেন কুমারী। জীবনের মাঝামাঝি সময়ে একটা শক্ত অসুখে ধরল। প্রায় পঙ্গু অবস্থায় কাটাতে হলো জীবনের বাকি ক'টি বছর। সেই অবস্থায়ও তিনি রচনা করে গেলেন চমৎকার সব কবিতা। তাঁর রচিত কিছু কবিতা ছাপা হয়েছিল তাঁর জীবিতকালেই। বাকী কবিতা প্রকাশিত হ'ল মৃত্যুর পর। পড়ে কবিতার পাঠকরা মুগ্ধ হলেন। ইনি হ'লেন ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত মহিলা কবি ক্রিশ্চিনা জিব্রিলা রসেটি।

মানবিক পরিবেশ ও বিজ্ঞান

রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে স্টকহোম মানবিক পরিবেশ সম্পর্কে গত ৪ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত বারদিন ব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজিত হয়েছিল। পৃথিবীর ১১৫ টি দেশের প্রায় ১২০০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পারমাণবিক বিস্ফোরণ, শিল্পোন্নয়নের ফলে কলকারখানার নানা দূষিত ও বিষাক্ত পদার্থের বায়ুমণ্ডল ও জল-মাটীতে অহরহ অনুপ্রবেশ, জনসংখ্যাবৃদ্ধি জনিত নানা সমস্যার ফলে মানুষের পরিবেশ ক্রমশ দূষিত

শুভঙ্কর

হয়ে উঠছে। আধুনিক কালের বিজ্ঞানীরা তাই মানুষের জীবনচর্যার রীতিনীতির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের কথা চিন্তা করে উদ্বেগ বোধ করছেন। অতীতে বিজ্ঞানীরা ঠিক এতটা উদ্বেগ বোধ করেন নি। কারণ তাঁরা এতটা অভিনিবেশ দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করেন নি। এই সম্পর্কের তত্ত্ব বা ইকোলজি আধুনিক বিজ্ঞানীদের অনেকের কাছে চিন্তা ও গবেষণার একটা বৃহৎ বিষয় হয়ে উঠছে। নানা কারণে আজ মানুষের পরিবেশ নিদারুণ ভাবে দূষিত হয়েছে ও হচ্ছে। দূষিত পরিবেশের ফলে থেকে মানুষকে রক্ষা করার কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারকে সচেতন করবার উদ্দেশ্যে এই সম্মেলন আহূত হয়েছিল।

আমরা জানি, বায়ু ও জল মানুষের জীবন ধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বায়ুর উপাদান আয়তনে শতকরা ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, ২১ ভাগ অক্সিজেন ০·৩ ভাগ কার্বন ডাই-অকসাইড, ০·০৩—০·০৪ ভাগ বিরল গ্যাস এবং বাকিটা জলীয় বাষ্প। কোন কারণে যদি বায়ুতে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় (শতকরা ০·১ ভাগ), তাতে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এ ছাড়া, কোন কোন দূষিত পদার্থ, যেমন কার্বন মনোকসাইড গ্যাস অতি অল্প মাত্রাতে (শতকরা ০·১২৫ ভাগ) থাকলেও বায়ু বিষাক্ত হয়। তাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। শীতকালে রাত্রে ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে কয়লার আগুন জ্বালিয়ে রেখে ঘুমুলে অনেক সময় মানুষ মারা যায়। কারণ বন্ধ বায়ুতে কয়লা জ্বলতে থাকলে শুধু কার্বন ডাই-অকসাইড নয়, কার্বন মনোকসাইডেরও উৎপত্তি হতে পারে। বড় বড় শিল্প কারখানার চুল্লীতে অহরহ প্রচুর পরিমাণে কয়লা জ্বলতে থাকে। ফলে বায়ুতে বিপুল পরিমাণে কার্বন ডাই-অকসাইড গ্যাস মিশ্রিত হয়। বড় বড় শহরে যেখানে বহু মোটর গাড়ি ও বাস চলাচল করে তাতে যে পেট্রোল পোড়ে তা থেকে কার্বন ডাই-অকসাইড ও জৈব রাসায়নিক গ্যাসীয় পদার্থের (কার্বন, হাইড্রোজেন, অকসিজেন ঘটিত) সৃষ্টি হয়ে বায়ুকে দূষিত করে। মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সব গ্যাস বিশেষ ক্ষতিকর।

কয়লাতে অল্প-বিস্তর গালকার বা গন্ধক থাকে। কয়লা পোড়াবার সময় গালকার ডাই-অকসাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়ে বায়ুতে মিশে যায়। এটি মানুষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কলকারখানার চিমনি থেকে কার্বন ডাই-অকসাইড, গালকার ডাই-অকসাইড, জলীয় বাষ্প এবং কয়লার পুড়ন্ত

ধূলিকণা নিঃসৃত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যানের উদ্গমে কয়লা জ্বালানোর কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনো-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস ও কয়লার ধূলিকণা ঐভাবে বায়ুকে দূষিত করে। এর প্রতিকারের জন্যে প্রত্যেক শিল্পপ্রধান দেশে নানাবিধ আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় বড় শিল্পপ্রধান শহরে এই জাতীয় ক্ষতিকর পদার্থের অস্তিত্ব বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে।

বর্তমান যুগে আর একটি ভয়াবহ ক্ষতিকর পদার্থ বায়ুতে দেখা যাচ্ছে। সেটা হলো পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে প্রক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এগুলি মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। বৃষ্টির জলে ধৌত হয়ে এরা মাটিতে প্রবেশ করে এবং মাটি থেকে মানুষের খাদ্য শাকসবজিতে প্রবেশ করে। বায়ু থেকে এরা এদের শরীর থেকে মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ করে।

বায়ুর মতো আমাদের জীবন ধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় উপাদান জলও নানাভাবে দূষিত হচ্ছে।

কলকারখানার অপজাত পদার্থবাহী বর্জ্যের জল এবং শহরের মলমূত্র ও আবর্জনাবাহী পয়ঃপ্রণালীর জল ইত্যাদি জলাশয় ও নদীতে গিয়ে পড়ে। তাতে এ জলরাশি দূষিত হয় এবং ঐ জলে মাছ ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হয়। এই সব মাছ থেকে নানা রোগের বীজ মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

পরমাণু বোমা ও পরমাণু শক্তি সৃষ্টির জন্যে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তাদের পয়ঃপ্রণালী থেকেও সমুদ্রের জল অহরহ নানাবিধ তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংমিশ্রণে দূষিত হয়। ঐ জলের মাছ ইত্যাদিও এই কারণে মানুষের খাদ্য হিসাবে বিশেষ ক্ষতিকর হবার সম্ভাবনা।

বহু কীটঘ্ন ও রোগবীজাণুনাশক রাসায়নিক পদার্থ এবং নানা কৃষির কাজে বহুল পরিমাণে বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের অপব্যবহার বা অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার জমি ও ফসলের পক্ষে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি পশুপাখী ও মানুষের পক্ষেও কম ক্ষতিকর নয়।

এইসঙ্গে আর একটি বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটি হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত। ৩০ বছর পরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে সাড়ে ৩০০ কোটিতে দাঁড়াবে। তখন এই বিপুল সংখ্যক মানুষের খাদ্য আয়ু ও পুষ্টির অন্ন যোগাবে কে? পৃথিবীতে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কখন থেকেই চলেছে। এই পার্থিব সঞ্চয়গুলি সীমাহীন নয়। একদিন যখন এই সঞ্চয় নিঃশেষ হবে, তখন কোন্ পদার্থের দহন-দাহন থেকে শক্তি আহরণ করে মানুষ তার জীবনের পরিচর্যা করবে? এই সব প্রশ্ন আজ বিজ্ঞানীদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছে।

এই সমস্ত সমস্যা ও প্রশ্নের মোকাবিলা করার জন্যে স্টকহোমে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা তাই সম্মিলিত হয়েছিলেন। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে মানবিক পরিবেশ সম্পর্কে একটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আছে একটি ভূমিকা আর আছে পরিবেশ সম্পর্কে ২৬টি মূলনীতি। এদের মধ্যে প্রধান ২১ সংখ্যক নীতি নির্দেশে এই সচেতনতা উচ্চারিত হয়েছে—যে কোন রাষ্ট্র নিজের দেশের সীমানার ও তার নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকার বাইরে অন্য কোন রাষ্ট্রের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর যে কোন কাজ থেকে যেন বিরত থাকে—এবিষয়ে নিশ্চয়তা দানের দায়িত্বও তাদের।

এই ঘোষণার দ্বিতীয় নীতিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্যে এই পৃথিবীর সকল প্রাণী-সমাজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং যে তাপ ও বিকিরিয়া পরিবেশের গুরুতর ও অপূরণীয় ক্ষতি করে থাকে তা বন্ধ করার নির্দেশ এতে দেওয়া হয়েছে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে এই ঘোষণায় বলা হয়েছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চ হারের ফলে পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলের উন্নতি ব্যাহত হয় এবং পরিবেশের ক্ষতি হয়ে থাকে অথবা যে সকল স্থানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি নিম্ন হওয়ায় মানবিক পরিবেশের উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হয়, উভয়স্থলেই মৌলিক মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ন না করে সংশ্লিষ্ট সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকর করা উচিত।

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা অব্যাহত রাখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে পরিবেশ

সম্পর্কে নীতি গ্রহণের জন্যেও ঐ ঘোষণায় আহ্বান করা হয়েছে। এতে সকল জাতীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে প্রতিটি রাজ্যের পরিবেশ সংক্রান্ত সকল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা করার জন্যে বলা হয়েছে। এতে আরও বলা হয়েছে, পরিবেশ সম্পর্কে সমাজের শিক্ষিত জনের দৃষ্টি প্রসারিত করা, কালিমামুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পরিবেশের উন্নতি বিধানের জন্যে তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্ক সকলকেই পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা ও শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

জানবার কথা : টেলিপ্রিন্টার

আজকাল সংবাদপত্রের মাধ্যমে 'টেলিপ্রিন্টার' কথাটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি। 'টেলিপ্রিন্টার' জিনিসটি কি সে সম্বন্ধে অনেকের কিন্তু সুস্পষ্ট ধারণা নেই। টেলিপ্রিন্টার বলতে বোঝায় টেলিগ্রাফের সাহায্যে সাংকেতিক ভাষায় যোগাযোগ ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। এই ব্যবস্থার প্রেরক যন্ত্রটিতে সাধারণ টাইপ-রাইটারের মত 'কী-বোর্ড' থাকে। পরিচালক টাইপ-রাইটারে ছাপার মত সংবাদটিকে চাবি টিপে ছাপতে থাকেন। সংবাদের অক্ষরগুলি বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে যন্ত্রস্থ কাগজের ওপর কতকগুলি ছোট ছোট ছিদ্রের সমষ্টিতে পরিবর্তিত হয়। বিভিন্ন অক্ষরের জন্যে ছিদ্রগুলি বিভিন্ন রকমে সাজানো থাকে। এবার কাগজটি প্রকৃত প্রেরক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলতে শুরু করে। প্রেরক যন্ত্রটি এই ছিদ্রগুলির বিন্যাস অনুযায়ী বিভিন্ন শক্তির বৈদ্যুতিক স্পন্দন তারের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে পাঠায়। ফলে একটি স্বয়ংক্রিয় টাইপ-রাইটার এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন দ্বারা পরিচালিত হয় এবং বিশেষ যান্ত্রিক কৌশলে মূলগত সংবাদ একটি কাগজের ফিতার ওপর একেবারে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসে।

জানবার কথা : গ্যাস বার্নার

শহরে ও শহরাঞ্চলে অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবারে রন্ধন কার্যের জন্য কয়লা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কয়লা ব্যবহারের একটা বড় অসুবিধা হচ্ছে, কয়লা পোড়ালে তা থেকে ধোঁয়া বেরয় এবং তার ফলে রান্নার ঘর অপরিষ্কার হয়। এসব অসুবিধার জন্যে আজকাল সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ পরিবারে গ্যাস-বার্নার বা গ্যাস-চুল্লী ব্যবহার করা হচ্ছে।

এই গ্যাস-চুল্লীতে থাকে লোহার তৈরী বার্নার বা চুল্লী। চুল্লীর গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে—যার মধ্য দিয়ে গ্যাস নির্গত হয়। এ ছাড়া থাকে গ্যাস নিয়ন্ত্রণের চাবি—এই নিয়ন্ত্রক চাবিগুলি খুলে বা বন্ধ করে গ্যাস সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে কোন গ্যাস বার্নারে জ্বালানো হয়, তা সরবরাহ করা হয় একটি গ্যাস সিলিণ্ডার বা গ্যাসভর্তি আধার থেকে। তারদের সাহায্যে গ্যাস-চুল্লিতে গ্যাস সরবরাহ করা হয়।

কিছু দিন আগে দক্ষিণ কলকাতায় একটি পরিবারে গ্যাস-বার্নার জনিত দুর্ঘটনার ফলে ১৪—১৫ জন প্রাণ হারায়। তারপর থেকে গ্যাস-চুল্লী ব্যবহার করা সম্পর্কে লোকের মনে একটা ভীতি দেখা দিয়েছে। কতকগুলি নিয়ম মেনে চললে এবং গ্যাস আধার ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করলে এই ধরণের দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয় না।

বার্নার জ্বালাবার সময় এই নিয়মগুলি মেনে চলা উচিত :

(১) বার্নার নিয়ন্ত্রক চাবিগুলি ঠিক মতো বন্ধ আছে কিনা দেখে নিন ;
(২) সিলিণ্ডার ভালব খুলুন ;
(৩) বার্নারের মাথায় জলন্ত দেশলাই ধরুন ;
(৪) বার্নার নিয়ন্ত্রক চাবিগুলি খুলুন। যদি কোনো কারণে বার্নার না জ্বলে ওঠে, তা হলে বার্নার নিয়ন্ত্রক চাবি ও গ্যাস সিলিণ্ডার ভালব বন্ধ করুন।

আর যদি গ্যাসের গন্ধ পান, তা হলে

(১) বার্নারের চাবিগুলি বন্ধ অবস্থায় আছে কিনা দেখে নিন ;
(২) সব আগুন আর শিখা নিভিয়ে দিন ;
(৩) সিলিণ্ডার ভালব বন্ধ করুন।

(৪) যদি ক্রমাগত গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যায়, তা হলে সিলিণ্ডার পরিবেশককে খবর দেবেন। আর যেখানে গ্যাস সিলিণ্ডার রাখা আছে, সেখানে খোলা আগুন আনবেন না।

যখন কোনো গ্যাস সিলিণ্ডার বদলানো হবে, তখন নিচের নিয়মগুলি পালন করা বিধেয় :

(১) সব ক'টি বার্ণার-চাবি বন্ধ করুন ;

(২) সব আগুন ও শিখা নিভিয়ে দিন।

খালি হয়ে যাওয়া সিলিণ্ডার খুলতে

(১) সিলিণ্ডারের ভালব বন্ধ করুন ;

(২) স্প্যানার চাবি ডানদিকে ঘুরিয়ে ছুঁচটা খুলুন।

ভর্তি সিলিণ্ডার সংযুক্ত করতে

(১) ভর্তি সিলিণ্ডারের ভালব বন্ধ আছে কিনা দেখে নিন,

(২) সিকিউরিটি চাবি ডানদিকে ঘুরিয়ে জমে দিন।

একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, সিলিণ্ডার ভালব হাত দিয়ে খুলবেন ; কখনও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করবেন না।

• • • •

মানসিক অশান্তি কি অকাল বার্ধক্যের কারণ ?

পশ্চিম জার্মানীর ও পশ্চিমের আরো সব দেশের বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা অকাল বার্ধক্যের কারণ অনুসন্ধানে বহুদিন থেকে তৎপর হয়েছেন। প্রথম অনুসন্ধানের ফলাফল বিশেষ আশাব্যঞ্জক না হওয়ায় অকাল-বার্ধক্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করার জন্যে জার্মান রিসার্চ সোসাইটি, বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। বহুদিন ধরে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়ে গেছে। ইতিপূর্বে অবশ্য বহু বিজ্ঞানী বলেছেন যে মানসিক অশান্তি শুধু যে অকাল বার্ধক্য ডেকে আনে তা নয়, রক্ত চলাচল ব্যবস্থা ও হৃদ্‌যন্ত্রেরও ক্ষতি করে। কাজেই এ কতবড় গুরুতর ব্যাপার। এ সম্বন্ধে আরোও ভাল করে জানা গেলে অকাল বার্ধক্যকে ঠেকানো চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষে সহজ হবে। এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে বহুভাবে গবেষণা চালান হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে।

ফিরে ফিরে চাই

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

একদিন সন্ধ্যার সময়ে সিলেটের নদীর ধারে বসে আছি। জ্যোৎস্না থাকায় চারদিকটা বেশ মনোরম লাগছিল, তবুও কেমন যেন বিষাদ-মাখানো। বাড়ি থেকে অনেক দূরে একা-একা বসে আছি বলে হয়তো, প্রয়োজনহীন তাকে। অদূরে বসে কয়েকজন লোক। একজন গান করছে—"বন্ধু, প্রেমের পিয়াসীরে ।" সত্যই তো দুনিয়ার লোক তো এই প্রেম পিয়াসী' যাই তার অর্থ হোক্। কাছে গিয়ে বসলাম। গান হচ্ছে—

"বন্ধু প্রেমের পিয়াসীরে
বন্ধু তোর মনে পীরিতি করি,
ঘরে না মুই রইতে পারি।
বন্ধুরে দিবানিশি ঘুরিয়া মরি তুই বন্ধুর লাগিয়া।
যাইতে দিনে চাহিয়া থাকি পথ নিরখিয়া—
বন্ধুরে সহিতে না পারি দুখ সদায় জ্বলে হিয়া,
স্বপনে দেখি বন্ধু না পাই লাগিয়া।
বন্ধুরে সৈয়দ সাদেকুর কয় উদাসিনী হইয়া
কি দোষ পরাণের বন্ধু না-চাও ফিরিয়া।...."

গান শুনতে শুনতে ভুলে গেলাম আমি পূর্ববঙ্গের নদীর ঘাটে বসে গান শুনছি। অপরিচিতদের উদ্দেশ্যে বলে ফেললাম—'গানটি আমি লিখে নিতে পারি কি?" তারা চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে, বোধহয় অ-বাঙাল কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে একজন বললেন—"মনে হচ্ছে, আপনি এ-অঞ্চলের লোক নন।" আমি সংক্ষেপে পরিচয় দিলাম। লোকটি বললে—"ভক্তের গানের কথা সুর সবদিকেই এক।" আমার দাড়ি দেখে তাদের মনে সন্দেহ জাগে—প্রথম বুঝতে পারেন নি আমার জাত ধর্ম কি। কথায়-কথায় বেশ পরিচয় হয়ে গেল তার সঙ্গে বললে তার বাড়ি সিলেট থেকে মাইল ষোল দক্ষিণ পুবে 'ঢাকা দক্ষিণে'। আমি 'ঢাকা দক্ষিণ' শুনেই শুধোই—"চৈতন্য মহাপ্রভুর আদি বাসভূমি না?" সে বললে—"হাঁ, শ্রীহট্টাইল গ্রামে জগন্নাথ মিশ্রের বসতবাটি। এখানে মহাপ্রভুর মন্দির আছে। প্রবাদ—চৈতন্যদেব শ্রীহট্টে আসেন তার ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে; তখন তিনি তাঁকে দুটি মূর্তি দিয়ে যান একটি নিজের ও অপরটি কৃষ্ণের। দুটি মূর্তিই ঠাকুরবাড়িতে আছে। এখান থেকে ভালো রাস্তা আছে যাবেন?" আমি বললাম—"হাতে সময় কম বোধ হয় পারবো না।" সে বললে—"পাহাড়জলাদের ধরণা দেখেছেন?" বললাম—"শ্রীহট্টায় গিয়েছিলাম, পাহাড়জলা সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে পারি, পরে সন্ধানও করেও তাঁর সম্বন্ধে ও শ্রীহট্ট বিজয় সম্বন্ধে ইতিহাসটা জেনে নিয়েছি।" সে বললে,

"তাহলে আপনাকে আরেকটি জিনিস দেখার নূতন লাগবে—আর কোথাও পাবেন না দেখতে এই জেলা ছাড়া। সেটা হচ্ছে 'সিলেটি নাগরী'র বই।" আমি হেসে বললাম—"আমাদের শান্তিনিকেতন লাইব্রেরিতে সিলেটি বাংলায় কয়েকখানা বই আছে, আমি তা কলকাতার বটতলা থেকে কিনি। আমাকে বইগুলো কিনতে দেখে দোকানী খুব অবাক হয়ে যায়।" এ-কথা শুনে সে বললে—

"আমারও তো অবাক্ লাগছে! হিন্দুরা কেন, শিক্ষিত মুসলমানরাও এই নাগরীর খবর রাখেনা! বেশ, কাল সকালে আপনাকে এখানকার একটা ছাপাখানায় নিয়ে যাবো।"

পরদিন সকালে দেখা করতে এলে আমি তাকে বললাম—"প্রেস খুলতে নিশ্চয় দেরী আছে, চলুন নূতন কলেজটা দেখে আসি। গতবার দেখেছিলাম তো বাজারের কাছে। দুর্গাবাড়ি দেখতে গিয়ে শুনি সেখানে কলেজ হবে।"

মুরারিচাঁদ কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯২ সালে অর্থাৎ যে-বৎসর আমার জন্ম হয়। রাজা গিরীশচন্দ্র রায় তাঁর মাতামহ মুরারীচাঁদের নামে কলেজটি স্থাপন করেন। গতবার অধ্যাপক অপূর্বকৃষ্ণ দত্তের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

নূতন কলেজ-বাড়ি দেখলাম। কলেজের অদূরে এক টিলার উপর খৃষ্টান পাদরী টমাস্ সাহেবের সুন্দর অট্টালিকা। ১৯১১ সালে রবীন্দ্রনাথ সিলেট সফরে এসে এই পাদরীর বাড়িতে উঠেছিলেন। থাক্ সে-কথা।

নূতন কলেজ দেখে ফিরে আমরা সিলেটি নাগরী হরপের বই দেখবার জন্য গেলাম 'ইসলামিয়া প্রেসে'। প্রেসের মালিক আমাকে 'সিলেটি নাগরী' সম্বন্ধে কৌতূহলী দেখে একটু বিস্মিত হলেন। তখন পরিচয় দিয়ে বললাম—"আমি এই সিলেটি নাগরীতে ছাপা বহু বই দেখেছি—ভেবে পাইনে বাঁশের মতো এই লিপিটি বাংলাদেশের একপ্রান্তে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হ'লো কেনো ও কেমন করে!" সেখানে বসা ছিলেন একজন উচ্চশিক্ষিত মৌলভী। তিনি বললেন—"এই লিপি সমুদয় জেলায় প্রচলিত নেই; সিলেট সদর, করিমগঞ্জ ও মৌলবীবাজার মহকুমায়, আর কাছাড় জেলায় ও ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় একসময়ে সিলেটি নাগরী পুঁথির প্রচার ছিল।" মৌলবী সাহেব আরও বললেন—"আশ্চর্য হবেন শুনে পুরুষদের থেকে মেয়েরা এই নগর লিপি ব্যবহার করতেন এককালে। অশিক্ষিত মুসলমান যারা বাংলা, উর্দু, আরবী কিছুই জানেনা, তারা এই লিপিতে দলিল দস্তাবেজে সহি করতো। আমি সে রকম দলিল দেখেছি।" আমি বললাম—"ছোট নাগপুরে কায়থী নাগরী দেখেছিলাম সিরিবিতে যাবার এক মুহুরী কায়থীতে আঙি লিখতেন, আর মুসলমান মুন্সী উর্দুতে লিখতেন। কায়থী লিপি উঠে গিয়েছে এখন।" মৌলবী বললেন—"এই লিপি কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে লেখা যায়। বাংলার মতো মিশ্র বানান প্রায় নেই এতে, যুক্তবর্ণ মাত্র তিনটি ক্ষ,..... । আর আমাদের বাংলার কথা ভাবুনতো। লোকে বলতো আড়াই দিনে সিলেটি নাগরী লেখা যায়। কিন্তু দেশ ব্যাপী হয়নি।" সেদিনকার কথাবার্তা ভালোই হ'লো। ভাবলাম ভাগ্যে সিলেটি নাগরী বই সম্বন্ধে কিছু জানা ছিল।

সিলেট থেকে যাবো করিমগঞ্জে। বাসার লোকেরা আমাকে শুধোলেন—"আপনি সাঁতার জানেন?" আমি 'না' বলায় তারা খুবই বিস্মিত হলেন—পূর্ববঙ্গের নদীপথে ঘুরছি সাঁতার না-জেনে! মনে ভাবলাম, যে নদী দেখছি নৌকাডুবি হ'লে সাঁতরে পার হবে কে?

এবারও একা আমি এক নৌকোয়—সঙ্গী এক মাঝি। বিকাল বেলায় দেখি কারা যেন নদীতে বিরাট জাল ফেলে মাছ ধরছে। মাঝি কয়েকটা টাট্‌কা ধরা মাছ কিনলো তাদের কাছ থেকে। সন্ধ্যার মুখে হাত পা ধুয়ে মাঝি 'নামাজ' সেরে নিলো। তারপর ছোট একটি পাথরের শীল এবং একটি নোড়া বের হ'লো নৌকার খোল থেকে—একটা ছোট উনুন জেলে ভাত চাপালো। তারপর লঙ্কা বাটলো শীলে, ভাত হ'য়ে গেলে ছোট কড়াইয়ে ছোটশিশি থেকে তেল ঢেলে সেই ধরা মাছ রাঁধলো—কী লাল টক্-টকে রঙ হলো। সন্ধ্যার পর খেয়ে নিয়ে আবার হাল ধরলো মাঝি। আমি সংস্কারবদ্ধ জীব, জাত ধর্মের বৈশিষ্ট্য ভুলে—বলতে পারলাম না 'বন্ধু, তোমার সঙ্গেও বসে খাই'। তা পেয়েছিলাম বহু বৎসর পরে বর্মায় —ইরাবতী নদীর উপরে জাহাজে। মান্দালয় থেকে আসছি—স্টীমারের সারেঙ বাঙালী দেখে আলাপ করতে এলো; বললে তার বাড়ি চাকায়—রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিল চাকায়। শান্তিনিকেতনের কথা জানে। আমি তাকে আমার জন্য ভাত রাঁধতে বলি—একসঙ্গে খেতে বসলাম

পাশাপাশি। সারেঙ বললে—"এই কাসাঁরটা খান, আমার মায়ের হাতের তৈরী।" খাওয়া হলো একসঙ্গে। খাওয়া শেষে আমি দাম দিতে গেলাম; নেবেনা কিছুতেই। বললে—"এখানে তো বাঙালী যাত্রী কমই দেখি, আজ আপনাকে পেয়েছি, পয়সার কথা উঠতে পারেনা।" সেই চাকা, সেই মানুষ! সে মুসলমান, আমি হিন্দু!

সুরমা নদীর উপর দিয়ে চলেছি একা—জ্যোৎস্না-আলো ছড়িয়ে পড়েছে, চারিদিকে অস্পষ্ট পাড় দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ খুব দুর্গন্ধে চমকে উঠে দেখি নৌকার পাশ দিয়ে কী একটা ভেসে যাচ্ছে। মাঝি বললো—"বাবু একটা মাইয়া মানুষ কোথায় দুইব্যা মরছে' তারই লাশ ভাইস্যা চলছে!" ভাবলাম, কে-এ হতভাগিনী কোথায় তার ঘর!

ভোর হতেই একটা ঘাটে থামলো নৌকো। পারাপারের ঘাট এটা, তাই অনেক লোক। মাঝি বললে—"ঐ ভাখেন কতো লোক চলছে; ওদের সঙ্গে গেলেই নদী পাবেন।" নৌকা ছেড়ে চলতে শুরু করলাম হাঁটাপথে। কুশিয়ারি নদীতে গিয়ে পড়লাম নৌকা পেলাম, নৌকা চলছে নদীপথের বাঁক। করিমগঞ্জের ঘাটে নামলাম সামনেই শচীন্দ্র চন্দ্র সিংহের বাড়ি। শচীন্দ্র চন্দ্রের ছেলেমেয়েরা সবাই শান্তিনিকেতনে পড়ে—সেলমনে শনধর ও সমরেশ ছাত্র। সমরেশ সুমধুর গানের জন্য সবার প্রিয়। সমরেশ ও বুনি (ছাত্র) রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে দোলনায় দুলতে-দুলতে গান গেয়েছিল—"দক্ষিন-হাওয়া জাগো জাগো, জাগাও আমার সুপ্ত প্রাণ।"

শচীন্দ্রবাবুর সঙ্গে আগে পরিচয় হয়েছিল, যখন ছেলেদের হাতে বোলপুরে এসেছিলেন। আমাকে অতিথিরূপে পেয়ে খুশি হলেন খুব। যেখানে আমরা ছিলাম, তার অপর পার পূর্বপাকিস্তান—আর এপারে খুব আর ওপারে কেরা ধ্বনি কলরব করেনা। শচীন্দ্রবাবু ছিলেন Many a Hampden এর একজন; তেজস্বী পুরুষ, সত্যান্বিষ্ঠ, নির্ভীক। Eastern Chronicle নামে এক সাপ্তাহিকের সম্পাদক ছিলেন তিনি। এই পত্রিকা ছিল বৃটিশ চা-বাগিচাওয়ালাদের চক্ষুশূল। চা-বাগিচাওয়ালারা পুলিশের, ম্যাজিস্ট্রেটদের সাহায্যে কতো ভাবেই না শচীন্দ্রবাবুকে নিপীড়ন করছিল!

আমি যখন এই অঞ্চলে ঘুরছি, তার কিছুকাল পূর্বে সিলেটের একগ্রামে পুলিশের সঙ্গে ঠাকুর হরানন্দের দলের সংঘর্ষ হ'য়ে যায়; হবিগঞ্জ অন্তর্গত বাঘৈ গ্রামে গুরুদাস চৌধুরী ১৯০৮ সালে 'ঠাকুর হরানন্দ' নাম নিয়ে বিশ্বশান্তির গুরু বলে আশ্রম প্রচার করেন।

১৯১২ সালের ৬ই ও ৮ই জুলাই জগৎসী আশ্রমে পুলিশ ও মিলিটারি সিপাহীর অত্যাচার-কাহিনী সেদিন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তখন বাংলাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী মতবাদ আর বাক্যব্যয়ে সীমিত ছিল না,—বোমা দিয়ে ইংরেজ অফিসার ও তাদের দালালদের হত্যাকাণ্ড চলছে এখানে-সেখানে। জগৎসী আশ্রমে পুলিশ অনেক বালককে পাকড়াও করতে আসে। আশ্রমের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে সাহেবকে আসতে দেখে একজন ত্রিশূলধারী ঘোড়া ও ঘোড়সোয়াড়ীকে আঘাত করে। একটি গণ্ডগোল ঘটে—হরানন্দের প্রধান শিষ্য মহেন্দ্রনাথ দে (M.A.B.S.) গুলির আঘাতে মারা যান। দুদিন পরে ৮ই বহু গুর্খা সিপাহী ও সিলেটের ইংরেজ ডেপুটি কমিশনার আশ্রমের লোকদের গ্রেপ্তার করে ও আশ্রম তছ-নছ করে অকথিত অত্যাচার করে। এসব কথা কিছু-কিছু জানতাম—তবে শচীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে বিস্তারিত শুনলাম।

শচীন্দ্রবাবু এই গুরুবাদীদের দলভুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর পত্রিকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে পুলিশ ও সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন, ফলে পত্রিকাচালনা বন্ধ করতে হয়। শচীন্দ্রবাবুর বাসাতেই যাদবগোবিন্দ রায় নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়—তিনি হরানন্দের শিষ্য। শচীন্দ্রবাবু বলেছিলেন—লোকটি অত্যন্ত মজন, হরানন্দের আদর্শে তাঁর জীবন পরিবর্তিত হয়। শচীন্দ্রবাবু আমাকে বললেন—"আমি গণ্য অধিকার রক্ষার জন্য এদের হয়ে লিখেছিলাম—ধর্মমত বা তাঁদের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে আমার কোনো যোগ ছিল না।"

করিমগঞ্জ থেকে রেলে সিংচর চললাম—সেখানে ঠাকুর হরানন্দের আশ্রম।

বনহুগ্না

[নূতন টেকনিকে লেখা একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস]

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[**পূর্বকথা :** সরসিজ মজুমদারের মেয়ে বনছায়া। বাপ বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও বনছায়া চাকরি করে, গল্প উপন্যাস লেখে। বড় সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন দেখে। কখনও তাকে জার্নালিস্ট হই বেহেতু আজকাল সাহিত্যের চেয়ে জার্নালিজমেই বেশি গ্ল্যামার। সম্পাদক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক অনেকের সঙ্গেই মহরম-মহরম করে। সুবীর আধুনিক কবিকে ভালোবাসে যে কিনা বড়লোকের মেয়ে গরিবকে ভালোবাসতে পারে, ভালোবাসতে পারলেও বিয়ে করতে পারে, এমন প্রবাদে বিশ্বাস করে না। বনছায়া যেমন কবিকে ভালোবাসে তেমনি এক ঔপন্যাসিককেও ভালোবাসে। তার নাম সন্দীপ সেন। কিন্তু সুবীর যদি সমুদ্রের মত উত্তাল, সন্দীপ পাহাড়ের মতই ধীরস্থির। সন্দীপও দুঃস্থ কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ। দারিদ্র্য যেন তার আদর্শকে ম্লান করতে না পারে সে সম্বন্ধে সবসময় সজাগ। সরসিজ মেয়ের জন্যে হিমাংশু বোস নামে এক কৃতী ইঞ্জিনিয়র ঠিক করছে, কিন্তু বনছায়া তাকে বিয়ে করতে রাজি নয়। তাকে রক্ষা করতে কে এগিয়ে আসবে ? সন্দীপ না সুবীর ? না, বনছায়া শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকে বরণ করবে ? হিমাংশুর বন্ধু আর মুরুব্বি দেবজ্যোতি ভৌমিক, সে অফিসে বনছায়ার বস্, তার দৃষ্টিও না কোন বনছায়ার দিকে। বনছায়া প্রেমের জন্যে কেরিয়র মাটি করবে, না কেরিয়রের জন্যে প্রেম ?

অতঃপর সরসিজের বাড়িতে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রিত হল হিমাংশু। বনছায়াকে পাত্রী হিসাবে মনোনীত করল। তার ফার্মে অনেক চাকরি আছে—বনছায়া চাইল সুবীরকে সুপারিশ করতে। সে সুপারিশ গ্রহণ করল হিমাংশু, সুবীরকে চাকরি দিল। সুবীর ভাবতেই পারেনি এমন অঘটন ঘটতে পারে। আর সুবীরের চাকরি হবার পর তার সঙ্গে বিয়ের নোটিশ দিল বনছায়া। এ ব্যাপারে হিমাংশু অন্ধকারে। হিমাংশুর সঙ্গে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে দিতে পারলেই নোটিশের মেয়াদ অন্তে সুবীরের সঙ্গে বিয়েটা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। সেই মতলবে হিমাংশুর কাছ থেকে মিথ্যা

অজুহাতে বিয়ের তারিখটা পিছিয়ে নিল বনছায়া। সরসিজবাবু জানলেন হিমাংশুর নিজের সুবিধের-জন্যেই তারিখটা লম্বা করছে। এখন বনছায়ার ভয় তার আগেই সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ের দলিলটা পাকা করতে পারবে কিনা।

সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার বিয়ে নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হল। কিন্তু প্রথম মিলনক্ষণেই মনে হল যেমনটি চেয়েছিল তার চেয়ে কিছু কম পড়ল। আরো কম পড়ল যখন সরসিজবাবু এ ব্যাপারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। বনছায়া বুঝল পিতৃগৃহ ত্যাগ না করলে বাবা শান্ত হবেন না। একটা সুটকেস আর বিছানা নিয়ে বনছায়া বাপের বাড়ি ছেড়ে সুবীরের ঘরে গিয়ে উঠল। যাবার আগে ছোটবৌদি শাশ্বতীর সিঁদুর কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে ঘন করে রেখা টানল—জগজ্জনকে জানাবার জন্য যে সে অয়ী, সে সুখী।

সুবীরের কবি-বন্ধুরা ঠিক করল এ বিয়ে উপলক্ষে সম্পাদক পীযূষ দত্তের বাড়ির ছাদে একটা পার্টি হবে। স্বামীর ঘরে নির্জনে বসে বনছায়া যখন সাজছে তখন দরজায় হিমাংশুর টোকা পড়ল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল বনছায়া, দরজা খোলে কি না খোলে কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু স্থির করবার আগেই দরজা খুলে দিল।

হিমাংশু ঘরে ঢুকে দেখল এক-ঘরের ফ্রেমে বন্দিত মেয়েটা সুখে সৌভাগ্যে একেশ্বরীর মত বিরাজ করছে। ভাবছে তার এই অহঙ্কারটা চূর্ণ করা যায় কী করে? সে গেল বনছায়ার বস্ দেবজ্যোতি ভৌমিকের কাছে-নালিশ করতে। দেবজ্যোতি বললে, সুবীরকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিন। আর হিমাংশু বললে, বনছায়ার কাপটারও শাসন হওয়া উচিত। দেবজ্যোতি সায় দিল। বললে, দেখি, ভাবি, কি করা যায়।

আসলে দেবজ্যোতি বনছায়ার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিল। বনছায়া যে প্রেমের মুখে অয়ী হয়েছে, ক্লান্তি ও বঞ্চনাকে বলে হিমাংশুতে আকৃষ্ট হয়নি, এ যেন তারই পুরস্কার। কিন্তু সুবীরের মুখে মাইনে-বাড়ার খবর পেয়ে হিমাংশু ক্রুদ্ধ হল। সুবীর ভেবে পেল না এ প্রতিক্রিয়ার অর্থ কী।

হিমাংশু নানা প্রশ্নে জেনে নিল একটা ছোট ঘরে সুবীর আর বনছায়া কেমন সুখে দিন কাটাচ্ছে। সঙ্গে সান্নিধ্যে তাদের সন্ধ্যাগুলি কী রমণীয়। স্বামীর মাইনে কম স্ত্রীর মাইনে বেশি এ তাদের কাছে কোন সমস্যা নয়। হিমাংশু চাইল তাদের মধ্যে বিরোধের ছুরি চালাতে। শত্রুতাতেই এখন তার শান্তি। আর শত্রুতার মহত্ত্ব শুশ্রূষার কারুকার্যে—অশ্বত্থামা হত ইতি গজে।

হিমাংশু সুবীরের জন্যে অফিসে ওভারটাইমের ব্যবস্থা করলে। টাকা রোজগার বেশি হবে বুঝে সুবীর তাতে আনন্দিত হল। আর এদিকে বনছায়ার সন্ধ্যাগুলি নিঃসঙ্গ হয়ে উঠল। হিমাংশুই তার রঙিন মদির সুন্দর সন্ধ্যাগুলি নিল হরণ করে। আবার দেবজ্যোতি

বনছায়ার স্বপ্নে একটা বাড়ি ভেঙে দিল বলে হিমাংশুও সুবীরের স্বপ্নে আরেকটা ভেঙে দিল। সেটা তুলনায় খারাপ হলেও সুবীর দাবী করল সেইটাই তার কোয়ার্টার, সেখানেই বনছায়াকে যেতে হবে। সুবীর যেমন তার বস্-এর হুকুম মানে, বনছায়ারও তেমনি সুবীরের কথা মানা উচিত।

বনছায়া সুবীরের কথা মেনে সুবীরের মনোনীত বাড়িতেই সংসার পাতল। সুবীরের অফিস থেকে অতিরাত্রকে পাঠানো হল কাজ করার জন্য। কিন্তু নিঃসঙ্গতার নির্বাসন থেকে রেহাই পেল না বনছায়া। ভাবল কোথাও গিয়ে দুদণ্ড জুড়াই। সন্দীপের কথা মনে পড়ল। সন্দীপের কাছে গিয়ে বসল বনছায়া। সে উপন্যাস রচনায় রত। মনে হল বনছায়ার উপস্থিতি থেকেও সাহিত্যই বুঝি তার প্রিয়তম—তাতে না থাক টাকা না থাক নাম-যশ। বনছায়ার যে বিয়ে হয়ে গেছে এতেও যেন তার ভালোবাসার ক্ষতি নেই। বাড়ি ফিরে এসে দেখল সুবীর লিখছে। কিন্তু কবিতা নয়, অফিসের রিপোর্টের বাংলা অনুবাদ। তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যাতেই বনছায়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় একা একা। ওভারটাইম করে সুবীর কতক্ষণে ফিরবে তার প্রতীক্ষা করে না।

বনছায়াকে বাইরে বেরনো থেকে নিরস্ত করবার অভিসন্ধিতে সুবীর তার সঙ্গ নিতে চাইল, নিতে চাইল হিমাংশুর বাড়ি। বনছায়া গেল না। একদিন হিমাংশুই সুবীরের ফ্ল্যাটে এসে হাজির। বনছায়া ঘরে নেই, সুবীর গেল চা দিতে। হিমাংশু নিল না, বলল বনছায়া নিজে যেদিন চা করে দেবে সেদিন খাবে। বনছায়া ফিরে এলে সুবীর তাকে শাসন করতে চাইল আর বনছায়ার মধ্যে ভর চুকল একা বাড়িতে হিমাংশুই না একদিন আক্রমণে উদ্যত হয়ে আবির্ভূত হয়। তাই কদিন পরে সুবীর যখন বনছায়াকে ঘুমের মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইল তখন দুঃস্বপ্নের ঘোর থেকে ভুল করে বনছায়া চেঁচিয়ে উঠল এ কী অন্যায়। ছি ছি ছাড়ুন ছাড়ুন—

অফিসের পার্টিতে বস-এর পাল্লায় পড়ে সুবীর মদ খেল। সেই থেকে সে নেশা তাকে পেয়ে বসল। বনছায়াকেও সে খেতাল মদ খেতে। একটা দুঃসহ সন্দেহ থেকে মুক্ত হবার জন্যেই বনছায়া স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। কিন্তু সুবীর আর নিজের শর্ত পালন করল না। বিরোধ ধূমায়িত হল।

তারপর বিরোধের মধ্যে বনছায়া আবিষ্কার করল সে মা হতে চলেছে। তার পেটে সুবীরের সন্তান।

বনছায়া অনুভব করল এ সন্তান আনন্দের অভিজ্ঞান নয়, শুধু মাতলামির পরিণতি। পরাভবের অপমানের প্রতীক। বনছায়া ডাক্তার অরবিন্দের কাছে গেল, পেটের সন্তানকে নষ্ট করবে। অরবিন্দ যখন জানল এ সন্তান বৈধ, তখন প্রস্তাবে রাজি হল না। তখন কুমারী সেজে সন্তানকে অবৈধ বলে বুঝিয়ে বনছায়া গেল আরেক ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার কমলেশ তার কি বাবদ এমন এক ফিনিস দাবি করল যাতে সে রাজি হতে পারল না।

সেবারের পার্টিতে হিমাংশু বেশি করে মদ খাইয়ে সুবীরকে মাতাল করে দিল। বাড়িতে পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ি ও তাতে একটি নারীর ব্যবস্থা করলে। নারীর নাম লাবণি, তাকে বলে দিল যেন সুবীরকে একেবারে তার স্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেয়। যাতে বনছায়া বুঝতে পারে সুবীর কতদূর নেমে গিয়েছে। যখন সুবীর বাড়ি ফেরে, দেখতে পায় সন্দীপ সেন এসেছে আর বনছায়া তাকে তার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনাচ্ছে। নিজে ধরা পড়ে যাবার দরুন চটে গিয়ে সুবীর সন্দীপের উপর প্রতিশোধ নেয়, তাকে গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দেয় বাড়ি থেকে।

সুবীর বনছায়ার কাছে দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধ মিটিয়ে নিল। সন্দীপের কাছে ক্ষমা চাইতে রাজি হল, বললে, তাকে একদিন বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস। বনছায়াকে অনুরোধ করল হিমাংশুকে ধরে তাকে বম্বেতে উচ্চতর পদে বদলি করিয়ে দিতে। বনছায়া রাজি হল না। অথচ সন্দীপকে নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে তার আলিঙ্গনে ধরা দিল।

সন্দীপের অন্তর্লোকে দ্বন্দ্ব সুরু হল—শিল্পীর পক্ষে এমন কোনো আকর্ষণে লিপ্ত হওয়া উচিত নয় যাতে তার সৃষ্টির শান্তি নষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার্যত সে উদাসীন থাকতে পারল না। বনছায়ার বাড়ি গেল তার উপন্যাসের বাকি অংশ শুনে আসতে। ঈর্ষায় দগ্ধ হয়ে সুবীর সে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল আর সেই টুকরোগুলি কুড়িয়ে নিয়ে চলে গেল সন্দীপ।

ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঘরের বাটোয়ারা হয়ে গেল—এক ঘরে সুবীর, অন্য ঘরে বনছায়া। সুবীর তার ঘরে একটা ক্লাব বসাল যাতে বনছায়ার সাহিত্য-সাধনা বিপর্যস্ত হয়ে যায়। লেখার জন্যে নিরিবিলি জায়গা খুঁজতে বনছায়া সন্দীপেরই দ্বারস্থ হল। দেখল সন্দীপ সযত্নে তার পাণ্ডুলিপির ছেঁড়া টুকরোগুলি একটা খাতার পৃষ্ঠার সেঁটে সেঁটে উপন্যাসের পুনরুদ্ধার ঘটিয়েছে। বনছায়া ঠিক করল সন্দীপের বাড়িতে বসে বইটার একটা নকল তৈরি করবে।

সন্দীপের বাড়িতে বসে উপন্যাসের নকল করল বনছায়া। প্রবাহের সম্পাদক পীযূষ দত্তের সঙ্গে হোটেলে দেখা করবে বলে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করে পাঠাল। তুমি মদ খাবে? জিজ্ঞেস করল পীযূষ। বনছায়া বললে, আমি খেতে শিখেছি।

বনছায়া পীযূষের সঙ্গে হোটেলে মদ খেল, এক ট্যাক্সিতে বেড়াল। তার উপন্যাস 'অবন্ধনা' 'প্রবাহ' পত্রিকার জন্যে মনোনীত হল। তারপর মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরলে সুবীর গর্জে উঠল: তুমি মদ খেয়েছ? বনছায়া বললে, তুমিই তো শিখিয়েছো মদ খেতে।

বনছায়ার উপন্যাসের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হতেই পাঠকমহলে সাড়া পড়ল। কিন্তু সুবীর খুশি হতে পারল না। জানতে চাইল কোথায় বসে সে নতুন করে লিখেছে এবং কী উপায়ে বাগিয়েছে পীযূষ দত্তকে। বনছায়া বললে, অফিসে বসেই লিখেছি, আর যেহেতু পীযূষ দত্তের রুচি কিছু মোটা, তদবিরটা সে মোটা করেই করেছে। রাগে 'প্রবাহে'র কপি ছিঁড়ে ফেলল সুবীর আর তার অক্ষম ঈর্ষাকে ব্যঙ্গ করল বনছায়া। লেখাটা পড়ে হিমাংশু

খুব উত্তেজিত হল। সুবীরকে ডাকিয়ে বলল, এ অশ্লীল লেখা বন্ধ করে দিন। শেষকালে আপনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আমার কার্যের না বদনাম হয়।

অফিসে বনছায়া অসুস্থ হয়ে পড়লে দেবজ্যোতি তাকে নিউজন নার্সিং হোমে পাঠিয়ে দিলে, দেবজ্যোতি বনছায়ার বাপের বাড়িতে খবর দিলে, খবর দিলে হিমাংশুকে। হিমাংশু সুবীরকে খবর দিল। সুবীর উদাসীন রইল। তার বিরুদ্ধতার কারণ শ্রীযুত দত্তের কাছে গিয়েছিল 'অবজ্ঞনা'র প্রকাশ বন্ধ করে দিতে আর শ্রীযুত তাতে রাজি হয়নি যেহেতু বনছায়ার মতে স্বামী ও সংসারের চেয়েও তার আর্ট বড়। এই নিয়ে সুবীরের সঙ্গে বনছায়ার আবার ঝগড়া হয় আর সুবীর তাকে তার আর্টের গুরু সন্দীপ সেনের কাছে চলে যেতে বলে। নার্সিং হোমে গিয়ে হিমাংশু শোনে বনছায়ার অপারেশন হয়েছে কিন্তু গর্ভের সন্তান বেঁচে নেই।

নার্সিং হোমে অপারেশনের আগে ডাক্তারকে বনছায়া অনুরোধ করল যেন তাকে আর সন্তানধারণ করতে না হয়। ডাক্তার সেই রকম ছুরি চালাল। নার্সিং হোমে যতদিন ছিল বনছায়ার কোন খোঁজ নেয়নি সুবীর। সন্দীপই সব দেখাশোনা করেছে। তারপর যখন ছুটি পেল বনছায়া সন্দীপের সঙ্গে সন্দীপের বাড়িতে গিয়েই উঠল।

বনছায়া সন্দীপ সেনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে এ খবর পেয়ে হিমাংশু দারুণ ক্রুদ্ধ হল। প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুবীরকে উত্তেজিত করতে লাগল। বললে আপাতত ডিভোর্সের মামলা করতে। ওদিকে লাবণি সুবীরের প্রতি প্রেমলুব্ধ হল, চাইল গৃহিণী হতে। সেই স্বার্থেও তো বনছায়ার সঙ্গে বিবাহের বিচ্ছেদ দরকার। সুবীর গেল উকিলের পরামর্শ নিতে।

সুবীর বিচ্ছেদেরই মামলা করবে ঠিক হল। হিমাংশু অভিরামকে ডাকল সেই মামলায় বনছায়ার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের সাক্ষী হতে। অভিরাম রাজি হল না। মামলার কথা সন্দীপ বনছায়াকে জানাল। এ মামলায় সুবীর ডিক্রি পেলেই তো সন্দীপের সঙ্গে বনছায়ার মিলন সুগম হবে। কিন্তু বনছায়া বললে, মামলা সে কনটেস্ট করবে।

সুবীরের মামলায় অভিরাম সাক্ষ্য দিতে রাজি হল না বলে অভিরামের চাকরি গেল। অভিরাম বনছায়ার কাছে কেঁদে পড়ল, বনছায়া যদি বোস সাহেবকে তার জন্যে একটু সুপারিশ করে ত তার চাকরিটা সে আবার পায়। বনছায়া হিমাংশুকে ফোন করল। বনছায়ার অনুরোধে হিমাংশু অভিরামকে ফের চাকরি দিতে রাজি হল। হিমাংশু ভেবেছিল ধন্যবাদ জানিয়ে বনছায়া বুঝি আবার খোঁজ করবে, কিংবা জানাবে তার বর্তমান সদ্গতির কথা। বনছায়া স্তব্ধ হয়ে রইল—একা ঘরে বসল মদ খেতে। আর তাই দেখে সন্দীপ তার কাছে বসল না, চলে গেল উপরে।

লাবণিকে হিমাংশু প্ররোচিত করল সুবীরকে দিয়ে ডিভোর্সের মামলা করতে। এদিকে

ঠিক করল বনছায়ার বই 'অবগুন্ঠন' সে ফিল্ম করবে। ডিরেক্টর সমীর সাহাকে পাঠাল চুক্তি করতে। ঠিক হল বনছায়ার সঙ্গে পরামর্শ করে সিনারিয়ো লিখতে হবে। পরামর্শ করবে কে? পরামর্শ করবে প্রডিউসার হিমাংশু বোস।

লাবণি সুবীরকে ডিভোর্সের মামলা করাতে রাজি করাল। এ খবর পেয়ে হিমাংশু লাবণির উপর খুব খুশি। ঠিক হল 'অবগুন্ঠন' ফিল্মে লাবণিকে দ্বিতীয় নায়িকার পার্ট দেওয়া হবে। আরও সুসংবাদ, বনছায়া সিনেমার সিনারিয়ো লেখায় কোনো হস্তক্ষেপ করবে না—তারও চেয়ে বেশি, কোনো আলোচনায়ই যোগ দেবে না। হিমাংশু বোধহয় বনছায়ার অহঙ্কার এখনো যায়নি।

কিন্তু আসল যে বিবাহ বিচ্ছেদ তাতে কোনো পক্ষই আদালতে যাচ্ছে না। এ গেলে ওর সুবিধে, ও গেলে এর সুবিধে—মনোভাবেই দু পক্ষ নিষ্ক্রিয় থাকছে। তখন সন্দীপ পথ বাতলাল, মামলার হাঙ্গামায় না গিয়ে ডিভোর্স বাই মিউচুয়াল কনসেন্টে করা যাক আদালতে সংযুক্ত পরিবাদ করেই বিবাহ বিচ্ছেদ।

এদিকে খবর এল 'অবগুন্ঠন' ফিল্ম আর হবে না। অথচ তার দ্বিতীয় নায়িকা রূপে নির্বাচিতা লাবণি বনছায়ার ফ্ল্যাটে এসে হাজির হল। তার কাছে নতুন খবর।

লাবণি খবর দিল বনছায়ার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেলেই নতুন ডিরেকশানে 'অবগুন্ঠনের' ফিল্ম হবে, চাই-কি সে যোল প্রডিউসার হিমাংশু বোসের ঘরণী হতে পারবে। আরও খবর দিল তার শরীরের যে অবস্থা সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ে অবশ্যম্ভাবী। আরও খবর দিল বিবাহ-বিচ্ছেদ না হলে সুবীর সন্দীপের বিরুদ্ধে র‍্যাডালটারির চার্জে ফৌজদারি করবে। তখন বনছায়া বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজি হয়ে সন্দীপের সঙ্গে মিলনে আশ্বস্ত হতে গেল। সন্দীপকে নিশ্চিন্ত করবার জন্য জানাল তার সন্তান-সম্ভাবনার ভয় নেই কেননা সে অপারেশান করে নিয়েছে। সন্দীপ বনছায়াকে প্রত্যাখ্যান করল—ভুল নেই ফল নেই—একটা হাহাকার মরুভূমি নিয়ে আমি কী করব?

সন্দীপ চাইল বনছায়া আর তার বাড়িতে না থাকে। বনছায়া দাবি করল সে এ বাড়ির ভাড়াটে, কারু মুখের কথায় তার উচ্ছেদ হতে পারে না। অপেক্ষা করতে লাগল সন্দীপের বিরুদ্ধে র‍্যাডালটারির কেসটা সত্যি হয় কিনা। বৃথা প্রতীক্ষা। হঠাৎ রাস্তায় একদিন লাবণির সঙ্গে দেখা—তার সিঁথিতে সিঁদুর। সেই খবর দিল সুবীরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে।

কালীঘাটে পাণ্ডা ধরে বিয়ে হয়েছে—খবরটা লাবণি হিমাংশুকে জানাল। তাহলে বনছায়া কি এবার সুবীরের বিরুদ্ধে বাইগ্যামির চার্জে মামলা করবে? হিমাংশু বললে, এ আশা দুরাশা। লাবণি আশ্বাস দিল—মামলা সে নিজেই আনবে, সিঁদুর তারই সাক্ষ্য। এদিকে বনছায়া সন্দীপের বাড়ি ছেড়ে অন্য ফ্ল্যাটে উঠে গেল। অভিরামকে তার কাজের লোক হিসেবে পেয়ে গেল আর তা হিমাংশুর সম্মতিতে।

লাবণি আরো চেষ্টা করল সুবীরকে বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজি করাতে। নিজে মামলা করবে তার দেখাল। তবু সুবীর বিচলিত হল না। শেষে পত্যন্তর না দেখে সুবীরের বিরুদ্ধে লাবণি ফৌজদারি করলে বৈধ বিবাহের ছলনা করে তার সঙ্গে সহবাস করেছে। ম্যাজিস্ট্রেট ওয়ারেন্ট ইস্যু করল।

পুলিশ ওয়ারেন্ট নিয়ে সরাসরি সুবীরের অফিসেই হাজির হ'য়ে তাকে এ্যারেস্ট করলো। হিমাংশুকে জানাবারও সময় দেল না, সুবীর। পুলিশ ইন্সপেক্টরকে কালো ভ্যানটা অফিসের গেটে লাগাতে বললে, কিন্তু না তারা কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে নিয়ে ভ্যানে তুললো সুবীরকে। সারারাত রাত কাটলো সুবীরের। পরের দিন, অফিসের কেরাণী বাণীময়, উকিল দিয়ে জামিন দেওয়ালো। বনছায়া লাবণির ব্যবহারে জ্বলে উঠলো। বললে, সুবীরের যদি দরকার হয় আমাকে যেন সাক্ষী মানে। তার সঙ্গে আমার যত শত্রুতাই থাক, সত্যের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই।

সুবীর যদি লাবণিকে বিয়ে করে তাহলেই মামলা মিটাতে পারে—লাবণির হয়ে হিমাংশু জানাল সুবীরকে। কিন্তু তার আগে তো বনছায়ার বিয়েটা ঠিক করা দরকার—অথচ সেই ব্যাপারে বনছায়াকে রাজি করানো সুবীরের পক্ষে সম্ভব নয়। পীযূষকে পাঠিয়ে জানা গেল বনছায়া আসামীর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে। তখন হিমাংশু নিজে গেল বনছায়ার বাড়িতে, সুবীরকে বাঁচানোর জন্যে বনছায়াকে বিচ্ছেদে রাজি করাতে। বনছায়া দেখা করল না। হিমাংশু বুঝল লাবণির মামলা সফল হবার নয়। তখন সে সুবীরকে বললে, পনেরো হাজার টাকা খেসারৎ দিন, লাবণি মামলা ছেড়ে দেবে। সুবীরের মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ল।

টাকা জোগাড় করতে পারছে না সুবীর, তখন হিমাংশুই পরামর্শ দিলে আপাতত অফিসের ক্যাশ থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলুক—পরে আস্তে আস্তে পূরণ করে দেবে। সুবীর টোপ গিলল, ক্যাশ ভেঙে দশ হাজার টাকা লাবণিকে দিয়ে দিল। লাবণির মামলা নিষ্পত্তি হল বটে কিন্তু হিমাংশুর নির্দেশে পুলিশ এসে সুবীরকে গ্রেপ্তার করল। এবারের মামলা আরো কঠিন—ক্রিমিন্যাল ব্রিচ অব ট্রাস্ট।

সুবীরের উকিল বললে, এবার তার আর পরিত্রাণ নেই, যে করে পারুক মামলা মিটিয়ে নিক। তার চেয়ে একটা পিস্তল নিয়ে হিমাংশুকে গুলি করে মেরে ফাঁসি যাওয়া সহজ। সুবীর উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরতে ঘুরতে পীযূষ ডাক্তারের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। পীযূষ খবর দিল লাবণির মামলা টাকা দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া ভুল হয়েছে যেহেতু এমন একজন সাক্ষী ছিল যে প্রমাণ করে দিত লাবণির মামলা মিথ্যে। সে সাক্ষী কে? সে সাক্ষী বনছায়া। সুবীরের সঙ্গে তার শত্রুতা থাক, সত্যের সঙ্গে তার শত্রুতা নেই। তখন সুবীর সাহসে বুক বেঁধে বনছায়ার বাড়ি গেল। অভিরামকে বললে, বড় অশান্তিতে আছি।

বনছায়া সুবীরকে ফিরিয়ে দিতে পারল না। বুঝল ষড়যন্ত্র করে হিমাংশু সুবীরকে মিথ্যে

কৌজদারিতে ঠেলেছে। এখন পনেরো হাজার টাকা—দশ হাজার কাশে আর পাঁচ হাজার ঘুষে—পুরিয়ে দিতে পারলে সুবীর রেহাই পেতে পারে। বনছায়া তো জানে সুবীরের প্রতি হিমাংশুর এই আক্রোশ কেন, এ যে শুধু বনছায়ার উপরই প্রতিশোধ নেবার জন্যে, তাই সে সুবীরের সাহায্যে এগিয়ে গেল। প্রথমেই গেল তার বাবা সরসিজ মজুমদারের কাছে। বললে, একটা জায়গায় বড্ড ঠেকে গিয়েছি, কিছু টাকা চাই বাবা।

সরসিজ মজুমদার টাকা দিলেন না, বললেন, দান বিচার করে করা উচিত। বনছায়া ভাবল সন্দীপের কাছে গিয়ে চাই। সন্দীপের তো সাহিত্যের বাজারে এখন ভাল রোজগার, উদার হাতে কিছু দিতে পারে অনায়াসে।—অমনি না হোক, ধার। সন্দীপের বাড়ী গিয়ে সন্দীপকে পেল না, শুনল তার নাকি বিয়ে। বাড়ি ফিরে সুবীরকে আশ্বস্ত করল, বনছায়া তার অফিস থেকেই টাকাটা জোগাড় করে আনবে।

বনছায়া অফিসে টাকা পেল না। তখন ঠিক করলে সরাসরি হিমাংশুরই সে দ্বারস্থ হবে। সুবীর তাকে বাধা দিতে চাইল। বনছায়া বললে, তুমি ভয় পেয়োনা, আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।]

উনপঞ্চাশ

অভিরামকে ডেকে পাঠাল হিমাংশু।

'কী, ব্যাপার কী?'

অভিরাম ভড়কে গেল। তার কোথায় কী অপরাধ চল ভেবে পেলনা।

'সুবীরবাবু আবার তোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকেছে?'

এবার নিজের থেকেই অপরাধীর ভাব করল অভিরাম। মাড় চুলকে বললে, 'তাই তো দেখছি।'

'তাকে ঢুকতে দিলে?'

'আমি কী করব হুজুর? আমি তো ওকে নিচে বসিয়ে রেখেছিলাম, উপরে উঠতে দিইনি—'

'তবে?' যেন কৈফিয়ত নিচ্ছে, কৈফিয়ত নেবার তার এক্তিয়ার আছে, এমনি আক্রোশে ধমকে উঠলো হিমাংশু।

'মা নিজে এসে ওকে উপরে নিয়ে গেলেন।'

'নিয়ে গেলেন!' হিমাংশু টেবিলে একটা ঘুসি মেরে বসল: 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও বলে তেড়ে এলেন না?'

অনুতপ্তের মত মুখ করে অভিরাম বললে, 'কই আর এলেন!'

বিচারবুদ্ধি বুঝি লোপ পেয়েছে হিমাংশুর। নইলে অভিরামের উপর সে মুখিয়ে উঠল কেন? বললে, 'তুমি ছিলে কী করতে?'

এর উত্তর কী ঠিক দেওয়া যায় অভিরাম ভেবে পেলনা। কান চুলকে বললে, 'মা তার বাবুকে ধরে নিয়ে যাবেন আমি তার কী করব?'

অভিরামের যুক্তিটা হিমাংশুকে একটা ধাক্কা দিল। সামলে নিয়ে বললে, 'আমি তোমার কথা বলছিনা। ভদ্রমহিলার কথা বলছি। উনি কী বলে একটা জঘন্য চোরকে বাড়িতে ডাকতে দিলেন? শুধু চোর নয়, জোচ্চোর, কোমরে দড়ি-বাঁধা আসামী, তার উপর আবার মাতাল, সিনেমার একটা পথে-দাঁড়ানো দস্তা মেয়েকে বিয়ে করেছে—'

'মা বললেন শত হলেও একটা চেনা মানুষ তো বটে—বিপদে পড়ে এসেছে, মুখের উপর তাড়াই কী করে?'

'তাড়াই কী করে! কুচ্ছিত অপমান করে যে একদিন বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল দময়ন্তীকালে তাকেও তাড়ানো যাবেনা?'

'মা বললেন, বিপদ কেটে গেলেই চলে যাবে। তাড়াবার কী দরকার!'

'বিপদ কাটাচ্ছি আমি! ওর বেশিদিন নেই,

এবার শ্রীঘরে। কোর্টে যে ভদ্রমানিব—প্রতিভদ্রের ভয়ে দিন পড়েছে তা তোমার বাবু—তোমার মার বাবু জানে ?'

'জানিনা।'

'জানলেও ভুলে গেছে নিশ্চয়। আচ্ছা,' হিমাংশু কণ্ঠস্বর ঘোরালো করল : 'তোমার মা আর সুবীরবাবু কি একঘরে থাকেন ?'

ইঙ্গিত শুনে প্রতিবাদ করল অভিরাম : 'না, তা কী করে হয় ? উপরে আলাদা ঘর আছে, বাবু আলাদা ঘরে থাকেন।'

'কিন্তু,' কার সঙ্গে কী কথা কইছে হিমাংশু যেন কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসেছে—যেন সমস্ত অপরাধ অভিরামের এমনি তর্জিতে আবার রুখে উঠলো : 'কিন্তু মাঝরাতে দু ঘর এক ঘর হয়ে যায় কিনা তার তুমি কী জানো ? তুমি কি সারা রাত জেগে পাহারা দাও ?'

কী পাগলের মত প্রশ্ন ! অভিরাম ম্লান হয়ে গেল। নত চোখে খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিমর্ষ গলায় বললে, 'আমি ভাবছি চাকরিটা এবার ছেড়ে দিই।'

'ছেড়ে দেবে ?' এতেও হিমাংশুর বজ্রস্বর

'মানে, বাবু তো এবার এসে গেছেন, ওদের অন্য লোকও জুটেছে—আমাকে আর কী দরকার ?'

'বাবু এসে গেছেন মানে ?' হিমাংশু এবার চিন্তিত মুখে বললে, 'কী মতলবে এসেছেন, কেন তার জমাতে চাইছেন তা কে জানে ?' ভদ্রমহিলার বাক্স ভেঙে না পেয়ে সরে পড়ে ! যেমন নির্লজ্জ চোর, গয়নার জন্যে গায়ে না হাত দেয়। বাধা দিলে চাই কি গলা টিপে খুনও করতে পারে। তুমি একটু সজাগ থেকো, আমিও পুলিশে খবর দিচ্ছি যাতে ওর জামিন ক্যানসেলড হয় ! তুমি চাকরি ছাড়লে চলবে কেন ? তোমার মা-বদি একা পড়েন তখন তাঁকে দেখবে কে ?'

অভিরাম হাঁ করে তাকিয়ে রইল। কী বলবে সাত-পাঁচ কিছু ভেবে পেলনা।

'তা ছাড়া এমনিতেও সুবীরবাবু বেশি দিন থাকতে পারবেনা বাইরে। তাকে শিগগিরিই জেলে যেতে হবে। অফিসের ক্যাশ-ভাঙা চার্জ, জেল লম্বা না হয়ে যাবে না। তখন তোমার মা আসবে যে একা সেই একা।' হঠাৎ বিষয়ান্তরে লাফ দিল হিমাংশু : 'আচ্ছা, সন্দীপবাবু আসেন না ?'

শূন্যের মত মুখ করল অভিরাম। বললে, 'কই বেশি না তো।'

'আচ্ছা সন্দীপবাবু তোমার মাকে ছাড়লেন কেন ?'

'কে কাকে ছাড়ল তা কে জানে।'

আশ্চর্য, এ দিকটা তো হিমাংশু ভেবে দেখেনি। সন্দীপকে অবলম্বন করেই তো বনছায়া সুবীরের ঘর ছেড়েছিল। তবে সেই সন্দীপের আশ্রয় থেকেই সে বিচ্যুত হল কেন ? বনছায়া নিজে ইচ্ছে করে আর সন্দীপকে চাড়েনি, সন্দীপই নিশ্চয় তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কেন ? সে খবরটাই নেওয়া হয়নি। সেদিন যে পীযূষের সঙ্গে বিয়েটিল বনছায়াকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্যে, প্রশ্নটা একবারও মাথা তোলেনি। ছেলেটার মাথাই সমস্ত প্রশ্ন নিমজ্জিত ছিল। তারপর যখন বনছায়ার ঘরের দরজা থেকে গাড়ি-সহ নিজেই বিতাড়িত হল তখন অন্য লোকের অন্য ঘটনার কোথায় কতটুকু আর ঔৎসুক্য থাকে ? তখন ভয়াবহ এক অপমানের যন্ত্রণায় আপাদমস্তক দগ্ধ হচ্ছে হিমাংশুর। তখন তার একমাত্র চিন্তা কী করে সমুচিত প্রতিশোধ নেবে। কোথা থেকে সংগ্রহ করবে প্রহারের অস্ত্র !

কিন্তু সন্দীপ কেন বনছায়াকে তাড়াল তার কারণটা জানা দরকার। আশুই জানা দরকার। হিমাংশুর আতীব্র ইচ্ছা বনছায়া সম্বন্ধে সব কিছু সে জানে, অ-থেকে-হ একটি তত্ত্বও কোথাও বাকি না থাকে—কিন্তু কী করে জানে, কে তাকে জানায় ! যত জানবে ততই তার প্রতিশোধ নেবার পথ মিলবে, ততই মিলবে তার আরামের সুযোগ। বনছায়াকে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত, কলঙ্কিত দেখতে পাওয়াটাই তো তার একমাত্র আরাম। কিন্তু কোথায়, মেয়েটার অহংকার তো এতটুকুও টলল না !

ওর চাকরিটা যদি খাওয়া যেত ! ওর প্রাণের পুরুষ ছেলে, ওর নিজের চাকরি নেই, বাপের বাড়ির ধরচা বন্ধ —তখন বুঝত মজাটা ! দূর থেকে দেখতাম আর প্রাণ ভরে

উপভোগ করতাম। দেখতাম কোথায় যায়, কোথায় দাঁড়ায়, কোন রাস্তায় হাঁটে।

'বাড়িতে আর কোনো লোক আসে?' হিমাংশু আবার বিছিয়ে উঠল।

'ছি, কী যে বলেন!' প্রায় জিভ কাটল অভিরাম।

'নিশ্চয়ই আসে। অফিসের বড় কর্তা মিস্টার ভৌমিক আসে না?'

'কী যে বলেন!' অভিরাম মুখ ফেরাল।

অবশ্য দেবজ্যোতি এতটা দুর্বল হতে পারে এ অন্তরে-অন্তরে হিমাংশু বিশ্বাস করেনা। এ জাতীয় দৌর্বল্যের পক্ষে দেবজ্যোতি অনেক বেশি সন্ত্রাস্ত, উচ্চারূঢ়। নিজের অফিসের পুঁচকে মেয়ে-কেরানির উপর সে চোখ ফেলবে না, হাত বাড়াবে না। তবু মুখে ঢঙাম ঘটাতে আপত্তি কী। বনছায়াকে কলঙ্কিত করে চিরিং করাতেই তো হিমাংশুর এখন একমাত্র সুখ।

কিন্তু শুধু কলঙ্ককথায় বনছায়ার কী এসে যাবে? তার দ্বারা সত্যিকার কোনো ক্ষতি ঘটানো যাবে না। আর সে যদি সত্যি দেবজ্যোতির বক্ষপুটে না হোক, কক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে থাকে, তা হলে তার চাকরিতে তো একটি আঁচড়ও ফেলা যাবে না। শুধু সুবীরকে জেলে পাঠিয়েই কি হিমাংশুর প্রতিহিংসা নির্বাপিত হবে? বনছায়ার নিজের কোনো ক্ষতি করা যাবে না?

দেবজ্যোতি কী করে বুঝবে কী দুর্জয় কামনায় হিমাংশু বনছায়াকে অহোরাত্র বেষ্টন করে আছে। হিমাংশু নিজে ঘুমোলেও তার কামনা ঘুমোয় না, এক মুহূর্তের জন্যেও না। তার অস্তিত্বের গভীরে তা হিংস্রনখ বন্যার মত সর্বক্ষণ বিঁধে থাকে। যে বাসনার নির্বাসন হয় না, যার উচ্ছেদ নেই, উৎপাটন নেই, তারই নাম ভালোবাসা। হ্যাঁ, হিমাংশুর অভিধানে এই আদিম কামনাই ভালোবাসার আরেক নাম।

এ এক অদ্ভুত প্রেম। এ সুখ দেখতে চায় না, ক্ষত-বিক্ষত দেখতে চায়। এ বলেনা মঙ্গল হোক, এ বলে সর্বনাশ হোক। প্রাণে না মরে শুধু টুকরো-টুকরো হয়ে যাক। অতদূর না হয়ে যদি হিমাংশু শোনে বনছায়া পড়ে গিয়ে পা ভেঙেছে, তা হলেও হিমাংশু নিশ্চয় মনে মনে জোড় পায়ে লাফাতে থাকে। অতদূর কেন—সামান্য ব্লেডে বনছায়ার আঙুল কেটে গেছে শুনতে পেলেও বুঝি হিমাংশু খুশি হয়। ভাবতে পারে সে কটি রক্তের ফোঁটাই তারই গোপন আনন্দবিন্দু। মোট কথা, কোথাও যদি বনছায়ার একটা হার হয়, অপমান হয়, দুঃখ হয়, লজ্জা হয়, কোথাও যদি একটা প্রবল প্রত্যাঘাত জোটে তা হলেই হিমাংশু শান্তি পেতে পারে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কিছুতেই বনছায়াকে পরাস্ত করা গেল না। এত কলঙ্কেও কিনা সে উজ্জ্বল হয়ে আছে। এত দৌড়ঝাঁপ গেল, এত টানা-হেঁচড়া, তবু কোথাও এতটুকু চিড় লাগলনা। চাকরিতে স্থির থাকল, শুধু তাই নয়, ধাপে-ধাপে মাইনেও দিব্যি বাড়িয়ে নিল। স্বামী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার পরেও এতটুকু কাতর হল না, দিব্যি পরপুরুষের ঘরে এসে বিস্তীর্ণ আশ্রয় পেল। কী কারণে কে জানে সেখানেও টিকতে পারল না, তবু কই, হোঁচট খেল কই? পথে বসা দূরের কথা, পথে ভাসলও না এক বেলা। বরং অবস্থার উন্নতি ঘটাল, উপরে-নিচে ঘর নিয়ে বসল দৃঢ় হয়ে। একটা রান্নার লোক একটা ঠিকে-ঝি, আর অভিভাবক স্বয়ং অভিরাম। কী কপাল, অভিরাম মাইনে পায় হিমাংশুর অফিস থেকে। কাগজে-কলমে অভিরাম এখনো সুবীর গুহর আর্দালি। সুবীর গুহর যতদিন না জেল হয়, অন্তত ততদিন। কী ভাগ্যি উপরেই না আছে মেয়েটা! স্বামী নেই তো তার আর্দালি আছে! আর সেই আর্দালির কাছ থেকে সুন্দর একটি 'মা' ডাক আদায় করে নিয়েছে। চলতি সংসারের মামুলি মা-ডাক নয়, একটু যেন সারল্যে ভরা অন্তরঙ্গ মা-ডাক। অভিরাম সব সময়ই তার মার পক্ষে, মার সমর্থনে। যদি কেউ তার পক্ষের বিরুদ্ধে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে অভিরাম সদর্পে তার প্রতিবাদী হবে। এমনকি হিমাংশুকেও সে হয়তো রেহাই দেবে না। আর এমনি এমিনেন্ট অভিরামকেই সে পারছে না ছাড়িয়ে আনতে।

মেয়েটার আরো কত প্রতিপত্তি। সাহিত্যিক হয়েছে। দু-দুখানা উপন্যাস লিখেছে। বই দুটো ঐ তো রয়েছে তাক টেবিলের উপর—'অবন্ধনা' আর 'দ্বিতীয় পুরুষ'। একটাও

পড়েনি হিমাংশু—শুধু কিনে এনেছে। বই পড়ুক না পোড়াক তাতে কার কী যায় আসে! তার টেবিলের উপর সাজানো বা ছড়ানো থাকলেই বা কার কী আপত্তি! 'অবকাশ'-টা আবার কিনে হচ্ছে! আর বলো কেন, হিমাংশু তো নিজেই গিয়েছিল কিনে করতে। তার যে উদ্দেশ্যই থাক, কিনেটা তো সমীর সাহা নিজেই মহরৎ করল, হিমাংশুকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে। কে জানে হয়তো পরের বইটাও কিনে হবে। অসহ্য। স্ত্রীলোকটার এত উন্নতি আর দেখা যায় না।

এত যখন তার তুচ্ছ অবস্থা তখন ঐ ক্যাপভাঙা আসামী, মাতাল মজুরটাকে সে আশ্রয় দিতে চায় কেন?' 'একটা চেনা মানুষ তো বটে, বিপদে পড়ে এসেছে—' তার জন্যে মায়া একেবারে উথলে উঠেছে। মেয়েটার কি লাজ-লজ্জা বলে কিছু নেই, নেই এতটুকু সম্ভ্রমবোধ? যে তাকে অগ্রাহ্য করে একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে লটঘট করলে, শুধু তাই নয়, মাথায় সিঁদুর চাপিয়ে প্রকাশ্যে স্ত্রী বলে চালালে—ব্যাপারটা আদালত পর্যন্ত উঠল—তবু সেই প্রতারকের বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহ নেই? তার ঘৃণা হয় না? একটা অসতীরও তো সম্মান আছে, ব্যক্তিত্ব আছে। এ মেয়েটাতে কি সেটুকু চরিত্রও আশা করা যাবে না? 'বিপদে পড়ে এসেছে' বলে প্রতারককে দাদরে আশ্রয় দিতে হবে এ এ-যুগের কোন মহাভারতে লেখে?

বনছায়া সমীপের বাড়িতে থাকলে সুবীর নিশ্চয় সেখানে আশ্রয় পেত না। একক বাসা নেবার ফলেই সুবীর এই সুবিধে নেবার সুযোগ পেয়েছে। কায়াকাটি করে গলিয়েছে মেয়েটাকে। কিন্তু আসল কথা, সমীপের আশ্রয় থেকে মেয়েটা বিতাড়িত হল কেন—সমীপের কী বক্তব্য? চাইকি, সমীপকে দিয়ে মেয়েটার বিরুদ্ধে একটা মামলা বাধানো যায় না—রসরসে ফৌজদারি মামলা? নিশ্চয়ই যায়। বনছায়ার সম্পর্কে নিশ্চয়ই সমীপের বহুতর ক্ষোভ আছে, সেগুলোতে বিদ্বেষের আগুন ধরিয়ে একটা ধূমায়িত মামলা বাধিয়ে দেওয়া কঠিন হবে না।

তার জন্যে সমীপের সঙ্গে নিভৃত পরামর্শ দরকার। সেই উদ্দেশ্যে সর্বাগ্রে দরকার শীষুষ দত্তকে। শীষুষের 'প্রবাহ'ই আজকাল সমীপের প্রধান বাহন।

ফোনে একটু নিশ্বাস ফেলল হিমাংশু। বললে, 'একলা তোমার মায়ের জন্যে এত বড় একটা ফ্ল্যাট!'

'তেমন বড় আর কী।' অভিরাম তাকাল ভয়ে-ভয়ে: 'তবে হ্যাঁ, মায়ের একলার ফ্ল্যাট। উপরে মা একলাই থাকেন। নিচে আমি। সুবীরবাবু তো কদিনের অতিথি, কখনো থাকেন, কখনো থাকেন না—'

এ সব কথা বাতিল করে দিয়ে হিমাংশু হঠাৎ উচ্চকিত স্বরে উঠল: 'তুমি শীষুষবাবুকে খবর দাও তো আমার সঙ্গে আজ সন্ধের মধ্যে একবার দেখা করে।'

খানিকক্ষণ থেমে রইল অভিরাম। পরে ঢিপ কাটিয়ে সাহস করে বললে, 'হজুর, আমি বলি কী আপনি একা যান, শীষুষবাবুকে সঙ্গে নেবেন না।'

'আমি কোথায় যাব?' হিমাংশু প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

হিমাংশু তো জানে সে কোথায় গিয়েছিল শীষুষ দত্তের সঙ্গে। অভিরামের ধারণা, বড়সাহেব একা এলে, চুপি চুপি এলে ঐ প্রতারকাটার একটা সমন প্রত্যাহার অভিনীত হত না। সমস্ত ব্যাপারটার ঐতিহ্য সাক্ষীইতো একমাত্র অভিরাম। তার চোখের সামনেই তো বড় সাহেবের ঐ লাঞ্ছনাটা ঘটল। সেটা অভিরামের ভালো লাগেনি। অভিরাম যেন বোঝে বড়সাহেব মায়ের কাছে কী চান, কেন সেদিন এসেছিলেন। এতদিনে, এতক্ষণে, তার যেন হঠাৎ জ্ঞান হয়েছে, তার মায়ের পাশে সুবীর বা সমীপবাবুর চেয়ে বড়সাহেবকেই এখন ভালো মানায়। সুবীর এল, সমীপ এল, বড়সাহেবের আসতে দোষ কী। ওরা কেউ জয় করতে পারেনি, কিন্তু অভিরামের ধারণা, ইচ্ছে করলে বড়সাহেবই স্থায়ী হয়ে বসতে পারেন সিংহাসনে। তিনি তো আজও বিয়ে করেননি। আজও ছড়ছাড়া।

স্বরে দরদ মিশিয়ে বলেছিল কথাটা কিন্তু প্রত্যুত্তরে এমন ধমক খাবে অভিরাম কল্পনাও করেনি। 'আমি কোথায় যাব!' গেলে, যেতে চাইলে, অভিরামই বরং সাহায্য করতে পারত, দিতে পারত দরজা খুলে, তার সেই আত্ম-কুলের মূল্য কিনা এই তিরস্কার।

অভিরাম থামতে গেল। কিন্তু যে করে হোক, বিসদৃশ

অবস্থাটা এখন সামলে নিতে হবে। তাই উপস্থিতবুদ্ধিতে অভিরাম সুন্দর একটা মিথ্যাকথা বানিয়ে বললে, 'মা বলছিলেন কিনা—'

'কী বলছিলেন ?'

'বলছিলেন আপনার-সঙ্গে মিরিবিলি বসে পরামর্শ করতে পারলে সব সহজ হয়ে যেত।'

'তার জন্যে আমাকে তোমার মায়ের বাড়ি যেতে হবে ? কেন তিনি এখানে আসতে পারেন না ?'

ওরে বাবা—তিনি আসবেন ? মনে-মনে শিউরে উঠল অভিরাম। হিমাংশুর নাম শুনলেই মা একেবারে আগুন। সেদিন গাড়িতে দেখা মাত্রই সোরগোড়া থেকে কেমন তাড়িয়ে দিলেন আচমকা। সোরগোড়া পর্যন্ত নেমে আসেননি, সিঁড়ির উপর থেকেই হাঁকার ছাড়লেন—অভিরাম, দরজা বন্ধ করে দাও।

তিনি আসবেন হিমা তব বাড়িতে মিরিবিলিতে!

কিন্তু কথা একবার মুখে বলে আর পিছিয়ে যাওয়া চলে না। অভিরাম তাই বলে ফেলল : 'আমি মাকে বলে দেখব ?'

'কী বলবে ? বলবে আমি ডেকেছি ?'

'না, ছি, তা বলব কেন ? বলব মানে পরামর্শ দেব। পরামর্শ দেব, একবার বড়সাহেবের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করুন। বড়সাহেব এতে কোনো আপত্তি করবেন না। সব সহজ হয়ে যাবে। বড়সাহেবের মত এমন উঁচু-প্রাণ মানুষ দুনিয়ায় খুব বেশি নেই।'

'ঘরজামাই !' আবার একটা প্রচণ্ড ধমক হানল হিমাংশু : 'তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে হবে না। 'মিনিমেল' আছ 'মিনিমেল'-এর মত থাকো। এ ফৌজদারি মামলার ব্যাপার—সাবধান !'

রীতিমত ভয় দেখাল হিমাংশু।

কত সে আসবে এখানে ! চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের জোগাড়ে হাত বাড়াল হিমাংশু। আসতে হলে কত আগেই সে পারত, সেই উষালগ্নে। কিংবা মধ্য অম্বরের কুটিল পথের তীক্ষ্ণ বাঁকে ছোঁচট খেয়ে। দৈবের অঘটন, শেষেও যদি আসে, সে কি অকারণ হবে ?

সব আসাই আশা দিয়ে ভরা। প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত করে রাখা।

'হুজুর—'

'তুমি এখন যাও। আমার কথাটা মনে রেখো। কারো কোনো শলা-পরামর্শে থেকো না।'

'পীযূষবাবুর কাছে যেতে হবে ?'

'না।' হিমাংশু আবার ধমকের সুরে বললে, 'সময়মত আমিই তাকে ফোন করতে পারব।'

ফোন করে পীযূষকে ড্রিংকস-এ নিমন্ত্রণ করল হিমাংশু। দেখিকা বনছায়া দেবীর বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করল। আপনার অন্য লেখক সন্দীপ সেনেরই বা কী খবর ? আচ্ছা, মশাই, সন্দীপ সেনের সঙ্গে বনছায়ার কেন ছাড়াছাড়ি হল ? কেন তাড়াল মেয়েটাকে ? গ্রাস করেছিল তো উগরে দিল কেন ? অন্তর্দৃষ্টি খোল মেরেন তো। আমার দরকার আছে।

সব খোঁজ খবর নিয়ে কদিন পরে এসেছে পীযূষ। সে মদ পাবে মাংস পাবে, পাবে কিছু কেচ্ছা-কাহিনী এতেই সে পরিতৃপ্ত। তার উপর হিমাংশুর মত প্রতিপত্তিশালীর বন্ধুত্ব—এর দাম অনেক।

মদে সান্নিধ্যে একটু খন হয়ে উঠতেই হিমাংশু জিজ্ঞেস করলে, 'ব্যাপার কী বুঝলেন ?'

'মেয়েটার রোগ আছে।'

'রোগ আছে !' চমকে উঠল হিমাংশু : 'কার ! বনছায়ার ?'

'আবার কার !' শান্তমুখে গ্লাসে চুমুক দিল পীযূষ।

'কী রোগ ?'

'ক্যানসার, নয়তো টি-বি, নয় কোনো গোপন ব্যাধি। সন্দীপ ঠিক জানে না, সন্দেহ করেছে মাত্র। জানে আসলে নার্সিং হোমের ডাক্তার, কমলেশ চ্যাটার্জি।

হিমাংশু স্তম্ভিত হয়ে গেল : 'সন্দেহ করেছে মাত্র ! আর মাত্র সন্দেহের বশে মেয়েটাকে তাড়িয়ে দিল ?'

'তাই তো সন্দীপ সেনকে বেশ একটু আপসেট দেখলাম।' কাটলেটের প্লেটটাকে আপসেট করবার জন্যে পীযূষ হাত বাড়াল : 'বেশ অনুতপ্ত। কেবল বলছে, ডাক্তার

দেখিয়ে কাইন্যাল রিপোর্ট না নিয়ে কেন ওকে ছেড়ে দিলায়!'

'ভীষণ আশ্চর্য তো!' হিমাংশু হাসবে-না-কাঁদবে ভেবে পেলনা: 'রোগ হয়ে থাকে, চিকিৎসা করে সারিয়ে নাও। চিকিৎসা দূরের কথা, এখানে তো রোগের নির্ণয়ই হল না। রোগ-টোগ সমস্ত বাজে কথা, কারণ অন্যত্র কোথাও আছে, কিংবা আসলে ঐ কাপুরুষটাই রুগ্ন।' মন খুলে এতক্ষণে হাসতে পারল হিমাংশু।

'কাপুরুষ নয়তো কী। নইলে ফেড়ে নিয়ে ধরে রাখতে পারে না? ছেড়ে দেয়?' পীযূষ দায় দিল।

'ছেড়ে দিয়েই তো অসুবিধে বাড়াল।' ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করল হিমাংশু: 'ছেড়ে দেবার পরও পিবি আলাদা ফ্ল্যাটটা নিল মেয়েটা আর সেই সুযোগে সুবীর গিয়ে সেখানে মাখা গুঁজল। মেয়েটা সন্দীপ সেনের বাড়িতে থাকলে সেখানে ঢুকতে নিশ্চয়ই সে সাহস পেত না, আগের ডেরায়ই লক্ষ্মী-ছাড়ার মত থাকত, নয়তো বাউণ্ডুলের মত পথে-পথে ঘুরে বেড়াত—তাহলে তার বিরুদ্ধে আমাদের ক্রমিন-নামঞ্জুরের পিটিশনটা খারিজ হয়ে যেত না।'

পীযূষ চমকে উঠল। 'সুবীরের বেইল-ক্যানসেল করার জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, পুলিশকে দিয়ে মুভ করিয়েছিলাম। একটা ক্যাশ-ভাঙা চোর জামিনে থাকবে কী, যে কোনো দিন র‍্যাবস্কণ্ড করবে, তাই তাকে কাস্টডিতে নেওয়া দরকার। কোর্ট ইন্সপেক্টর অনেক আর্গু করল কিন্তু হাকিম ইনগ্রেসড হল না। কী করে হবে? কোর্টে আসামীর পাশে দাঁড়িয়েছে তার সতীসাধ্বী, এক বিলিতি কোম্পানীর চাকুরাণী—ডিফেন্সের উকিলের সে কী আস্ফালন—স্ত্রীই তার স্বামীকে রক্ষা করবে—পালাতে দেবে না—'

'বনছায়া কোর্টে গিয়েছিল?'

'যাবেনা? পাতিব্রত্যের সে কী ঢেউ! কটেস্টে দু-এক ফোঁটা চোখের জলও বুঝি বার করেছিল। হাকিমেরও ভীমরতি হয়েছে, আমাদের পিটিশন সরাসরি রিজেক্ট করে দিল। আচ্ছা মশাই,' হিমাংশু টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল: 'আপনার সুবীর ওর এতটুকু আত্মসম্মান নেই? যে স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে সজ্ঞানে পরপুরুষের সঙ্গে বসবাস করলে, সেই স্ত্রীর কাছেই সে আশ্রয় ভিক্ষা করল?'

'যা, সুবীরের তো এখন ডুবন্ত অবস্থা, তলে এখন সে যে তক্তা পাবে তাই ধরবে—কাঠের বাছবিচার করবেনা।' মনেই মনোনিবেশ করল পীযূষ।

'তাই বলে এই অপমান!' হিমাংশু যেন মনেও শান্তি পাচ্ছেনা, জ্বালাধরা গলায় বলল, 'আর বনছায়াকেও বলি, যে লোকটা একটা বাজারের মেয়েকে বিয়ে করে তোর চরম অসম্মান করলে, তাকে বাঁচাবার জন্যে তুই এখন বুক দিয়ে পড়েছিস?'

'কেন পড়বেনা? ও ওর জন্য পড়বে, ও এর জন্য পড়বে।' পীযূষ বুঝি উচ্ছ্বসিত হল: 'দুজনে এখন সমান-সমান। দু কান কাটা। ও বলে আমার স্বাধ, ও বলে আমার স্বাধ।'

'অসম্ভব।' হিমাংশু গর্জন করে উঠল: 'তাই বলে মানুষের শেষ বস্তু আত্মসম্মান থাকবেনা?'

এবার বুঝি শক্তিটা বেশি হয়েছে পীযূষের। ধীরস্থির মুখ করে বললে, 'মানুষ যে কী অগাধ ব্যাপার তা মানুষ নিজেই কোনোদিন খই খুঁজে পাবেনা। আর সম্মান? শুনেছি প্রেম এমন এক বস্তু যেখানে মান-অপমান নেই, লজ্জা-ঘৃণা নেই, পাপ-পুণ্যেরও নেই—'

হিমাংশু কথা বাড়াল না, চুপ করে গেল। একটা বেইল-ক্যানসেলের পিটিশন বাতিল হয়ে গেলে কী এসে যায়, ঘোর মামলা চালু আছে। একেবারে আসামীর নিজের মুখের স্বীকারোক্তি—দেখি কোন প্রেম তাকে বাঁচায়! জেল থেকে ছাড়িয়ে আনে!

কিন্তু তার আগে ডাক্তার চ্যাটার্জির বন্ধু হওয়া দরকার। বন্ধু হওয়া মানে বন্ধুতা কিনে নেওয়া। বনছায়ার রোগটা কী তা হুবহু জানতে হবে।

পরদিনই লোভনীয় রসদ সাজিয়ে এক সন্ধ্যায় কমলেশকে কল দেওয়া হল। কমলেশ দেখে-শুনে বললে, 'এ ব্যাধা তেমন কিছু সিরিয়স নয়, সামান্য লিভারের গোলমাল। আপনি কি ড্রিঙ্ক করেন? তাহলে ওটা একটু কমান, ঠিক হয়ে যাবে।' বলে একটা দামী প্রেসক্রিপশান লিখলে।

তারপর বোটা কি পকেটে গুঁজে যখন কমলেশ একটু অন্যমনস্ক হল তখন হিমাংশু তাকে তার বসবার ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনাকে একটু ড্রিঙ্ক অফার করতে পারি ?'

'স্বচ্ছন্দে।' আরাম করে বসে কমলেশ।

দেখা গেল সে নিজের বেলায় মাত্রা কমাতে রাজি নয়।

দ্বিতীয় ফল-এই কমলেশ এক মাসের বন্ধু হয়ে গেল।

'আপনি আমার অফিসের কর্মচারী সুবীর গুহর স্ত্রীকে নিউ-ডন নার্সিং হোমে ট্রিট করেছিলেন ?' হিমাংশু কী যেন একটা অফিসিয়াল এনকোয়ারি করছে এমনি ভাব দেখাল।

'কে কার স্ত্রী অত কে মনে রাখে ?' হাসল কমলেশ : 'নাম বলুন। নাম বললেই ঠিক খুঁজে করতে পারব কিনা কে জানে ?

'নাম ?' স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করতে চাইল হিমাংশু : 'দাঁড়ান, মনে করছি। দিয়ে নাম—ব. বন—ঠা. বনছায়া। মনে পড়ছে ?'

'খুব পড়ছে। এক ডাকে মনে পড়বার মত।' কমলেশ চঞ্চল হল : 'সে কোথায় ?'

'তা কে জানে।' হিমাংশু গম্ভীর হল : 'প্রশ্ন তা নয়। প্রশ্ন হচ্ছে,' স্বর কাপল করল হিমাংশু : 'ওকে যে আপনি ট্রিট করেছিলেন—ওর কী হয়েছিল ?'

'কী আবার হবে ! মা হতে গিয়েছিল। হাউ স্যাড ! হতে পারল না।' কমলেশ বিমর্ষ মুখে বললে, 'মৃত সন্তান প্রসব করল।

'তারপর ?' গোপন কিছু শোনবার আশায় কান পাতল হিমাংশু।

'তারপর আর কী !'

'ব্যস, শুধু ঐটুকু ? এর মধ্যে রোগ কোথায় ?'

'না, আরেকটু আছে। বলতে পারেন সেইটাই রোগ—ইনস্যানিটি।'

'ইনস্যানিটি ?' হিমাংশু চমকে উঠল।

'ইনস্যানিটি না হলে কোনো নিঃসন্তান যুবতী মেয়ে বলে, আমাকে স্টেরিলাইজড করে দিন। সে কী কান্না। চিরতরে দাম্পত্যের থেকে মুক্তি দিয়ে দিন। ল্যাবরেটরিটলি ক্রি করে দিন আমাকে।'

'করে দিলেন ?'

'কোনো এমারজেন্সি নেই, আমি অমন এক সুস্থ ও সুন্দরী যুবতীর সর্বনাশ করে দেব ? অসম্ভব ! আমি তো পাগল হইনি।' কমলেশ করুণ করে হাসল : 'তবে আমি একটু মজা করলাম। যাতে টেনসানে না থাকে, বলে দিলাম, অপারেশান করে তাকে ক্রি করে দিয়েছি—'

'কী সর্বনাশ !' বুঝি নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল হিমাংশু : 'শেষে অঘটন কিছু ঘটে !'

'স্বামী বেঁচে থাকতে অঘটন কোথায় !' নিপুণ চোখে হাসল কমলেশ : 'আর তেমন কিছু ঘটে, আমি আছি।'

ডাক্তার চলে গেলে হিমাংশু কক্ষান্তরে লাবণিকে গিয়ে বললে, 'ডাক্তার খুব ভালো। ওষুধ না খাইয়েই তোমার ব্যথা সারিয়ে দিলে।'

লাবণি বাড়ি ফেরবার জন্যে উঠে বসেছে। আবার কালো করে বৃষ্টি এসে গেল বলে অপেক্ষা করছে উচাটন হয়ে।

ক্লান্ত চোখে ম্লান হেসে লাবণি বললে, 'আর কত অভিনয় করব ?'

'সমস্ত জীবনই তো অভিনয়। আমরা সবাই শুধু অভিনয় করে যাচ্ছি। আমি অভিনয় করছি, তুমি অভিনয় করছ, ডাক্তারও অভিনয় করছে।' কিন্তু হিমাংশু সরে এসে জানলা দিয়ে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললে, 'কিন্তু দৈবাৎ কোনদিন যদি সত্য এসে দেখা দেয় সমস্ত মুখোস খুলে ফেলে যেন আন্তরিক হয়ে তাকে স্বীকার করতে পারো।' যেন বুঝতে পারো কে তোমার সমস্ত ব্যাধির উপশম।

দুদিন পরে হিমাংশুর অফিসে ডিরেক্ট লাইনের ফোন বেজে উঠল।

পঞ্চাশ

'কে ?' টেলিফোনের রিসিভার তুলেই জিজ্ঞেস করল হিমাংশু।

'আমি।'

'আমি কে ?' হিমাংশু বিরক্ত হল : নাম কী ?'

'সে কী, গলার স্বর শুনে চিনতে পারছেন না?'

চেনা কি এতই সহজ? হিমাংশু নৈর্ব্যক্তিক হবার চেষ্টা করল: 'নাম বলতে দোষ আছে?'

'নামের আগের অক্ষর ব—মনে পড়ছে?'

অভাবিত সংবাদে হিমাংশু অভিভূত হল। তবু প্রাণপণে চেষ্টা করল নির্লিপ্ত থাকতে। গম্ভীর অথচ নম্র কণ্ঠে বললে, 'বুঝতে পেরেছি। বলুন, কী দরকার।'

বনছায়া আরো বুঝি একটু কাঁদ আশা করেছিল, আরো একটু আগ্রহ। ভাবেনি এতটা উদাসীন থাকবে।

হবে তো মুবীরের ফেল, তাতে বনছায়ার কী ক্ষতিবৃদ্ধি! বনছায়া যেমন মুক্ত তেমনি একাকী। কিছুতেই সে ম্লান হচ্ছে না, দরিদ্র হচ্ছে না। দেহে-মনে লাম কমছে না এতটুকু। এই ভেবে খিন্ন করতে গিয়েও স্থির রইল হিমাংশু।

'কী, বলুন, চুপ করে রইলেন কেন?' হিমাংশু ধরিয়ে দিল।

'আচ্ছা, বাড়িতে আপনাকে টেলিফোনে কখন পাওয়া যাবে?'

'টেলিফোনে!' একটু বুঝি নিরাশ হলো হিমাংশু।

'মানে, অফিসে কাজের সময় আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না।' বনছায়া দারুণ নিরর্গল হল: 'আপনাকে বাড়িতে পেতে চাই মানে আজ আপনি কখন নিরিবিলি?'

কথাটার মধ্যে কী যেন একটা যাদু আছে হিমাংশুকে বিচার-বিবেচনা করতে দিলনা। হিমাংশু কথার পিঠে বললে, 'অফিস-টাইমের পর সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে-সাতটা।'

'আটটা করুন।'

'বেশ, আটটা।' হিমাংশু সম্মতি না দিয়ে পারলনা।

'তা হলে কাইণ্ডলি আটটা পর্যন্ত বাড়িতে থাকবেন। থাকবেন কিন্তু। আমার কথা আছে।' বনছায়া লাইন ছেড়ে দিল।

কথা আছে! এমন কথা যা বলতে নিরিবিলি লাগে! তাও কিনা মুখোমুখি নয়, টেলিফোনে। কিছুটা আঁচ করতে পারলেও পুরোটা হিমাংশু আয়ত্ত করতে পারছেনা। মামলার জন্যে হলে হিমাংশুর কিছু করবার নেই—তা এখন আদালতের হাতে। তা ছাড়া অন্য আর কী বিষয় আছে যার জন্যে নিভৃতে কথা বলার প্রয়োজন! কে জানে কী, হিমাংশুর মনে সারাক্ষণ একটা ঔৎসুক্য জেগে রইল। না, চঞ্চল হবার কিছু নেই। তবু কথা—নিরিবিলি হলেও কথা ছাড়া আর কিছু নয়—তা হোক, কাকা অনেকেরো কথা শুনলেও বা দোষ কী।

কিন্তু কথার সুরটা একটু পালটেছে না? যেন একটু লোহার্গলের টান লেগেছে। বাঘের কথা—নিজেকেই নিজে ধমকালো হিমাংশু। কিন্তু যাই বলো যে মেয়ে শত্রু, যাকে আপাদমস্তক হিংসা করি, যার লক্ষ্য ও লাঞ্ছনা দেখলে তৃপ্ত হই, তার মুখের চুল-করা মিষ্টি কথাও মধুর লাগে।

নির্দিষ্ট সময়ে টেলিফোনের কাছে ঠিক বসে আছে হিমাংশু।

কই, বাজছে না তো। ভুলে গেল নাকি? না কি কোনোকারণ পাচ্ছে না নিজের ফ্ল্যাটে নিশ্চয়ই ফোন নেই আর কারো বাড়ি থেকে করতে হবে, নয়তো কোন দোকান থেকে। তেমন কিছু খুশির মত মিলছে না বোধ হয় হিমাংশুকে যখন নিরিবিলি থাকতে বলেছে তখন তারও কি নিরিবিলি হওয়া দরকার? প্রশ্নোত্তরের কথাবার্তা কেউ না শোনে তাই কি ওর ইঙ্গিত? তেমন একটা পরিবেশ খুঁজে পেতেই দেরি হচ্ছে না তো?

কথাবার্তা তো ভারী নিশ্চয়ই কোনো অনুরোধ। অভিরামকে চাকরি রাখার মত। বড়জোর মামলার ব্যাপার। বেশ, তাই বলুক। তা হলে অন্য কথায় সোজা প্রত্যাখ্যান করা যাবে। কোনো প্রকারেই ওকে প্রত্যাখ্যান করা যাবে না তাগ্যের এ নিয়ম আর ঘটলনা। আমার স্বামীকে জেল থেকে বাঁচান, এই বলে ও কাঁদো-কাঁদো গলায় অনুরোধ করবে আর হিমাংশু কঠিন কণ্ঠে 'না' করে দেবে, বলবে, এ আমার সাধ্যাতীত।

তার সেই প্রত্যাখ্যানের উত্তরে কেরাক্ষিতি হিমাংশুও কোনোদিন প্রত্যাখ্যান করতে পারবেনা, প্রকৃতির জগতে চলবে এ অনিয়ম? নিয়তি তাকে সুযোগ এনে দেবে না?

কে জানে।

ক্রিং ক্রিং—বেজে উঠল টেলিফোন।

'কে?' রিসিভার তুলে ধরতেই হিমাংশু নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেল।

'চিনতে পারছেন না।' ওপার থেকে বনছায়া তরল একটু হাসি মিশিয়ে বললে, 'দুপুরে ফোন করেছিলাম অফিসে। আমার কল-এর জন্যেই তো বসে আছেন, তাই না?'

'কত কলই তো আসছে, সব মনে থাকে কি? আপনার কী দরকার তাই বলুন।'

'আপনি বাড়িতে এখন একা তো?'

'হ্যাঁ, তাতে কী?' ইচ্ছে করেই গলা চড়াল হিমাংশু: 'আপনি কে?'

বনছায়ার স্বর মাধুরে তেমনি মসৃণ: 'কতবার বলব। আমি আপনার সেই ব।'

আপনার ব! হিমাংশুর বুকের মধ্যে বাজা করে উঠল। ব্যথার মধ্যেও বুঝি সুখের উপাদান আছে। প্রবাসে আমি সকলের কাছে বনছায়া, কারো কাছে বন বা বুনো বা বনি, কিন্তু আপনার কাছে আমি শুধু ব—আরো গোপনে, একান্তে, আচ্ছাদনের আড়ালে।

'হ্যাঁ, বুঝেছি। বলুন কী চান?'

'আচ্ছা, আপনি আমাকে আপনি করে বলছেন কেন? বনছায়ার এক বিন্দু কুণ্ঠা নেই, সহজ আন্তরিকতার সুরে, বললে, 'আগে তো তুমি করে বলতেন।'

হিমাংশু আবার একটা ধাক্কা খেল। একটু থেমে একটু বা বিষাদ মিশিয়ে বললে, 'সে কবেকার কথা কিছু মনে নেই।'

'আহা, তা বুঝি ভোলা যায়!' বনছায়া আদুরে গলায় বললে, 'আমাকে আপনি করে বলবেন তো ফোন ছেড়ে দেব। তুমি করে বলুন, আমার কথা, শেষ কথাটা আপনাকে বলছি।'

ছেড়ে দিন—এ কথা প্রাণে ধরে বলতে পারল না হিমাংশু। স্বরে অজান্তেই কেমন একটা স্নিগ্ধতা এসে গেল। বললে, তোমার দাদারা আমার বন্ধু সেই সুবাদে তোমাকে তুমি বলতে পারি।'

'ঠিক, ঠিক বলেছেন।' বনছায়া উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: তুমি—'ঐ আমার সত্যিকার পরিচয়।'

'বেশ তবে বলো, কী চাই?'

কতক্ষণ বনছায়ার কোনো উত্তর নেই। কী ভাবে বলবে সে যেন বুঝে উঠতে পারছে না।

'কী চুপ করে আছ কেন? বলো।' হিমাংশুই তাড়া দিল।

'আপনি বাড়িতে এখন একেবারে একা তো?' ভয়ে-ভয়ে নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল বনছায়া।

'হ্যাঁ, একা।'

'আশে-পাশে কেউ নেই তো?'

'না। কেন?'

'আমি একবার আপনার কাছে যেতে চাই।'

হিমাংশুর বুকের মধ্যে ছোট্ট একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাই নয়, আপনার বাড়িতে যেতে চাই নয়—আপনার কাছে যেতে চাই। এটা কি বলার ভুল, না, এটার মধ্যে অন্য কোনো তাৎপর্য আছে? হিমাংশু স্থির কণ্ঠে যাচাই করতে গেল: 'আমার কাছে আসতে চাও? বাড়িতে?'

'বাড়িতেই তো ভালো।'

কী রকম একটা দুরন্ত ইঙ্গিত যেন কথাটার মধ্যে উঁকি মারছে! না, না, ওসব কিছু নয়, ওসব কল্পনারও অতীত, এমনি সরল অর্থে বলতে গিয়েই কথাটা বাঁকা হয়ে পড়েছে। কিন্তু, সরল অর্থে মেয়েটা যদি প্রার্থী তবে তার স্বর কাঁদো-কাঁদো নয় কেন? নয় কেন মিনতি মাখানো? এ যেন মূলয় দেশের ষড়যন্ত্রীর গলায় কথা বলা। কী উন্মাদ সাহস মেয়েটার!

না, না, ওসব কিছু নয়, হিমাংশু নিজের মধ্যেই পাপ আছে বলে কুচক্রীর মত মানে করছে। আসলে উদ্দেশ্য খুব সাধারণ, স্বামীর জন্যে অনুনয়। প্রত্যেক স্ত্রীর পক্ষে যা স্বাভাবিক।

হিমাংশু শুধু আবার গেল খাঁচাই করতে। কাঠখোট্টার মত বললে, 'কাজটা কেন?'

'সেটা এখান থেকে খুলে বলতে হবে?' বনছায়া আধেক-খোলা আধেক-না-বলা রাখল।

'বাধা কী?'

'আমি সামনে গিয়েই না হয় বুঝিয়ে দেব, বাধা নেই।' দিব্যি খিল খিল করে হেসে উঠল বনছায়া।

এই কি প্রার্থীর আবেদন? বিনম্র স্তবস্তুতি? ধনীর ভিখারি কি এমনি করে প্রার্থনা করে? এ যে অভাবনীয়!

'তবু একটু আভাস যদি দাও আমি প্রস্তুত হতে পারি।' হিমাংশু বিচক্ষণ হবার চেষ্টা করল।

'আভাস দিতে হবে? আচ্ছা, বলছি,' বনছায়া গম্ভীর হবার চেষ্টা করেও লঘুতাকে বাদ দিতে পারল না, বললে, 'আপনাকে আমি একটা জিনিস ফিরিয়ে দেব।'

'ফিরিয়ে দেবে?' হিমাংশু কাঁপরে পড়ল: 'কী জিনিস

'ভুল বলেছি।' সহাস্যে দিব্যি সংশোধন করল বনছায়া বললে, 'আপনাকে আমি একটা জিনিস উপহার দেব।'

'কী জিনিস?'

'এরও আবার আভাস দিতে হবে?' হাসির লহর তুলল বনছায়া: এর আভাস হয় না। এখন বলুন কবে যাব? আজ?'

হিমাংশু আবার কাঁপরে পড়ল বললে, 'আজ? এখন তো রাত।'

'রাতই তো ভালো।'

হিমাংশু যেন চিন্তায় পড়ল। কী হল সেই বনছায়ার?

হিমাংশুকে এক মুহূর্তে দ্বিধা করতে দেখে বনছায়াই উদ্যোগ করল: 'এখন রাত আর কত! সাড়ে আটটাও হয়নি।'

হিমাংশু চিন্তিত স্বরেই বললে, 'আমি ভাবছি এখন থেকে যত সময় যাবে রাত ততই গভীর হবে।'

'তা হোক না। যদি বলেন তো আরো একটু দেরি করে যেতে পারি। গভীর রাত—' বনছায়া গলার স্বরকেও গভীর করল: 'গভীর রাতেও আমার আপত্তি নেই। যেমন বলবেন।'

এ কি সত্যিই বনছায়া? না কি কোনো অশরীরী প্রেতস্বর? একবার দেখতে হয় পরীক্ষা করে। না দেখে ছেড়ে দেবার মানে হয় না প্রত্যাখ্যানের আগে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তৃপ্তি নেই।

চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলোলো হিমাংশু। সব যেমন শ্রীহীন, অনুজ্জ্বল। প্রবৃতি বা প্রতীক্ষার একটিও আলো জ্বালানো নেই।

'শোনো, কাল এস।' হিমাংশু কথার সুরে আর্দ্রতা এনে ফেলল।

কই, পারল না তো প্রত্যাখ্যান করতে। এই তো চমৎকার সুযোগ এসেছিল বনছায়ার উপর নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নেবার। তার সোজাসুজি অনুরোধকে সরাসরি অগ্রাহ্য করবার। না, দেখা হলে না, দেখি, এক্সকিউজ মি, বলে অনায়াসে টেলিফোন ছেড়ে দিতে পারত কে না বোঝে অনুরোধ শেষ পর্যন্ত ঐ মামলাতেই স্পর্শ করবে—তাই এমনি তো সুন্দর সুযোগ ছিল 'না' করে দেবার তা নয়, উলটে তাকে বললে কিনা কাল আসতে না হয়ে পারল না। মায়া হল।

মায়া-টায়া কিছু না নিজেকে বোঝাতে চাইল হিমাংশু। এ শুধু আগ্রহের বনছায়াকে দেখতে চাওয়া। সে কতদূর বেড়েছে, না কি মেয়ে গেছে মরেছে। সে নিজের ইচ্ছেয় আসছে, এতে হিমাংশুর কোনো প্রয়োজনা নেই। তাই হিমাংশুর কোনো ভয় নেই কোনো বিমুখতাও নেই। দেখি না সত্যি আসে কি না। আসে তো কী করে, কতদূর যায়। প্রত্যাখ্যানের পরিচ্ছেদ তো শেষ দিকে।

'কাল বাদ দিন।' পরশু করুন। নয়তো—'

'কাল কী হল?'

'কাল বেস্পতিবার। যাত্রা ভালো নয়।'

এবার হিমাংশুই হাসল। বললে, 'বেশ, তবে পরশুই এস। কিন্তু কখন আসবে?'

'রাত নটায়। সাড়ে নটায়।'

'আমি বলি কি, আটটার মধ্যেই চলে এস। এখানে আমার সঙ্গে ডিনার খাবে। তারপর—'

'খেতে-টেতে গেলে লোক-জানাজানি হবে। সেটা চাইনে।'

'তবে ?'

'খাওয়াদাওয়া সেরে আমি একটু বেশি রাতে যাব আবার চট করে চলে আসব।'

'যদি যেতে না দিই ? ধরে রাখি ?'

হাসির বৃষ্টি করাল বনছায়া। বললে, 'কিন্তু এক সময় তো ছেড়ে দিতেই হবে।'

'এক সময় মানে কখন ?'

'অন্তত ভোর রাতে।' হাসির মাঝেই বললে বনছায়া, 'দিনের আলোয় তো ধরা পড়ে যাব।'

'বেশ, তাই এস। কিন্তু কী করে আসবে ? গাড়ি পাঠিয়ে দেব ?'

'না, না, গাড়ি পাঠাবেন না। লোক-জানাজানি হবে। আমি ট্যাক্সি করে যেতে পারব। ফেরবার সময় না হয় গাড়ি দেবেন।'

'সে ভাবতে হবে না।'

'তবে সেই কথা রইল। পরশু শুক্রবার—রাত নটা সাড়ে নটা—'

ওপারে বনছায়া লাইন ছেড়ে দিলেও হিমাংশু রিসিভারটা আরো কতক্ষণ ধরে রইল—যদি কোনো না-বলা কথা শোনা যায়।

কী দুর্দান্ত মেয়ে! নিজে সেধে ধরা দিতে চাইছে। ইঙ্গিত তো ষোল আনা সেই দিকে। এমনিতে ভাবতে গেলে অকল্পনীয়, সেই অনম্য নির্দয় মেয়ে এমনিভাবে উপযাচিকা হবে, কিন্তু এখানে, আর যাই হোক, উদ্দেশ্য তো শুধু; উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবীরকে বাঁচানো, নগদ দাম দিয়ে সুবীরের মুক্তি কিনে নেওয়া। নিঃসংশয় মনে হাসল হিমাংশু। মামলার ফলাফল যা হবার তা হবে, তা কোর্টের এক্তিয়ারে, কিন্তু তাই বলে স্বয়ং-আগতা বনছায়াকে সে ছেড়ে দেবে না! তার কত দিনের জাগ্রত পিপাসা আজ চরিতার্থ করবে। তারপর বনছায়া দেখবে সুবীর যেমন জেলে, বনছায়াও তেমনি বন্দী। এ কী করে হয়—হাহাকার করবে বনছায়া! হিমাংশু বলবে, নিয়তির পরিহাস। সুবীরের জেল হোক হাকিমের খামখেয়াল। আর তোমার এ সন্দীদশার জন্যে দায়ী ডাক্তার চ্যাটার্জির ব্যবস্থা।

তখন ? সেটা হিমাংশু এত দিনের যন্ত্রণার পর্যাপ্ত প্রতিশোধ হবে না ? প্রত্যাখ্যানের বদলে প্রত্যাখ্যান ?

দিন-ক্ষণ-মুহূর্ত গুনতে লাগল হিমাংশু।

শুক্রবার। রাত নটা।

দারুণ সেজেছে বনছায়া। বিয়ের রাতের বউয়ের মত।

'কী রকম দেখাচ্ছে ?' বনছায়া সুবীরের কাছে এসে দাঁড়াল : 'তোমার সেই কান্নাটার মত হয়নি ?'

'আমার কান্নার মত !' ক্যালক্যাল করে তাকিয়ে রইল সুবীর।

'সেই একদিন, আমাকে বাঁচাও বলে কেঁদেছিলে আমার কাছে,পাপ-পরিবেশ থেকে দূরে কোথাও সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেছিলে, মনে নেই ?' বনছায়া বললে, 'সেই তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টায় চলেছি। দেখি পারি কিনা, দেখি ভাগ্য কী বলে।'

'আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'আমার একটুও ভয় করছে না।' পরিচ্ছন্ন সারলো হাসল বনছায়া : 'কিসের ভয় ? শারীরিক ? তোমাকে বলেছি তো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। একটি দাগও ও ফেলতে পারবেনা। শোনো,' বনছায়া আরো কঠিন বাস্তবে নেমে এল, বললে, 'অভিরামকে আজ রাতে ছুটি দিয়েছি, তুমি একটা ট্যাক্সি ডেকে আনো।'

সুবীর ট্যাক্সি ডাকতে গেল।

আয়নায় নিজের মোহিনী সাজ দেখে নিজেই তারিফ করল বনছায়া। তার অপমান হবে ভাবতে সুবীর এখন ভিয়মাণ হচ্ছে কিন্তু কদিন আগে লাবণির সঙ্গে যখন জড়িপটি খাচ্ছিল তখন তো স্ত্রীর সম্মানের কথা তার মনে ছিল না। এখন বুঝতে পেরেছে অসম্মানিত স্ত্রীই তাকে ফের মানে ফিরিয়ে আনতে পারে, বাঁচাতে পারে জেলের কলঙ্ক থেকে। তাই তো সে স্ত্রীর অভিসারের উদ্দেশে ট্যাক্সি আনতে যেতে পারল।

ঠিকঠাক ট্যাক্সি নিয়ে এল সুবীর।

বললে, 'চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

শুকনো হাসল বনছায়া। বললে, 'তোমার কতদিনের

সাধ ছিল আমাকে তোমার বন্ধু-এর কাছে, বাড়িতে, পার্টিতে পৌঁছিয়ে দাও। তোমার সেই সাধ এতদিনে পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু আমার সঙ্গে তুমি কোথায় যাবে ?'

'চলো তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

'অনেক এগিয়ে দিয়েছ।' দিব্যি পরিহাস করল বনছায়া: 'এখন তোমার অন্য ডিউটি। তুমি বাড়ি থাকো দেখ আর ঘড়ি।'

'তাতো দেখবই।'

'যদি বারোটা-একটার মধ্যে ফিরি জানবে মামলা জিতে গিয়েছি আর যদি না ফিরি—'

সুবীর তড়াক উঠে ব্যাকুল চোখে তাকাল।

'যদি না ফিরি, তবে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তুমি থানায় চলে যেও। গিয়ে ডাইরি করো, ভাঁওতা দিয়ে তোমার স্ত্রীকে হিমাংশু বোস তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 'রাঙ্কুলি কনফাইন' করেছে, আসতে দিচ্ছে না—সিগারির তার 'রেস্কু'-র ব্যবস্থা করুন। পুলিশ না যাবার আগে আমি আর ও বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিনা। আমাদের ব্লাকমেইল করতে পারে, সেই উলটে আমরাও পারি কিনা।'

ট্যাক্সিতে একাই উঠল বনছায়া বললে, 'তোমার লেন।'

তারপর ঘুষ বাড়িয়ে সুবীরকে বললে, 'ঘড়ির দিকে চোখ রেখো। ঘুমিয়ে পড়ো না

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশুও বসে আছে।

আসবার আগে আরেকবার ফোন করবে হয়তো। তাই মাঝে মাঝে ফোনের দিকেও তাকাচ্ছে। ফোন যেমন নিস্তব্ধ ঘড়িও তেমনি নিশ্চল।

ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়! নইলে এমন করে কেউ আসে ? সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে রাজি হয় ?

রাগে আরো মদ ঢালল হিমাংশু। নতুন আরেকটা সিগারেট ধরাল।

আসুক না, একবার আসুক। বনছায়া জানেনা কত বড় পিপাসার সামনে সে দাঁড়াবে জলাশয় হয়ে। অগস্ত্যের মত এক গণ্ডুষে সমস্ত সমুদ্র শোষণ করে নেবে হিমাংশু। সে জানে না এ পিপাসার নাম কী, এ হিংস্রতা, এ অন্ধতার কী রকম চেহারা ? কী এর আয়তন, কোথায় এর পরিণাম ?

সত্যি কোন সাহসে সে আসবে ? কিসের ভরসায় ? দাঁড়াবে কোন ভিত্তির উপর ভর করে ? তার যে একূল ওকূল দুকূল যাবে। ধানও যাবে দুকড়িও যাবে। হিমাংশু মামলাও ছেড়ে দেবে না, তাকেও ছেড়ে দেবে না। প্রবাদই বলে, কাচা কাপড় আর বাচা মেয়ে ছাড়তে নাই।

অনেক প্রতীক্ষা করেছে, আরও এক রাত না হয় প্রতীক্ষা করল। বনছায়া যাক পাক সে প্রতীক্ষা কত সুখের!

তেতালার দরজা আস্তে খুলে গেল আর ভিতরে ঢুকল ও কে—হাঁ, ওই তো বনছায়া

'এ আপনি কী করেছেন ?' সহাস্যে প্রশ্ন করল বনছায়া।

'কী করেছি ?' হিমাংশু বুঝি হকচকিয়ে গেল।

'এত আলো জেলে রেখেছেন কেন ?'

'তুমি আসবে, আলো জ্বালব না।'

'আমি বুঝি আলো ? আমি তো ছায়া—বনছায়া। আলো নিবিয়ে দিন।'

'দাঁড়াও তোমাকে আগে দেখি।' হিমাংশু এগিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করল: 'তুমি যে সত্যি এসেছ আলোর সেটা বিশ্বাস করে তুলি। এখুনি অন্ধকার করে দিলে মনে হবে হয়তো অন্য লোকের বাসিন্দে।'

'অন্য লোকের মানে প্রেতলোকের ? আমি তাহলে ভূত ?' বনছায়া শব্দ করে হেসে উঠল: 'ধরে দেখুন না, আমি শরীর না আমি হাওয়া ?'

'যথা সময়ে সে পরীক্ষা করা যাবে।' আপাতত হিমাংশু আঙুল দিয়েও ছুঁল না। বললে, 'তোমার সাহসটাকে দেখি। লক্ষ্মী হয়ে বোসো।'

হাতে-লাগে ছুঁয়ে-বসে অপরূপ সেজে এসেছে বনছায়া। যেন একটা সাহসের তলোয়ার। আগের চেয়ে একটু রোগা হয়েছে বোধহয়, কণ্ঠার হাড় দুটো একটু উঁচু দেখাচ্ছে। নারীদেহে কণ্ঠার হাড় যে এত সুন্দর হতে পারে, দুই বুকের শিখরে দুই প্রহরী, আগে কারো মধ্যে যেন

এমনটি লক্ষ্য করেনি হিমাংশু। হাতের ওপারে যে দুটি কূপ রয়েছে সে বুঝি চুমনে ভরে দেবার জন্যে। দাঁড়াও, চোখ দুটি আরো একটু দেখি স্থির হয়ে। নির্লজ্জতায় কেমন জল-জল করছে চোখ দুটি!

'আমি লক্ষ্মী নই, আমি অলক্ষ্মী।' টেবিলের উপর চোখ রাখল বনছায়া: 'আপনি ড্রিঙ্ক করছিলেন? আমাকে একটু দিন না।'

'তুমি ড্রিঙ্ক করতে শিখেছ?'

'বাঃ, আপনিই তো শেখালেন।'

'আমি শেখালাম!' হতবুদ্ধির মত তাকাল হিমাংশু।

'মানে আপনি একজনকে শেখালেন, সে আবার আমাকে শেখাল।' মুক্ত মনে হাসল বনছায়া: 'সেটা তবে আপনারই শেখানো হল না?'

'সব দোষের মূলেই তো আমি—আমার 'ডিভায়ার'।' আলাদা গ্লাসে মদ ঢালল হিমাংশু।

বনছায়া পরিমাণটা একবার নিরীক্ষণ করল। প্রশ্ন করলে, 'বেশি দেননি তো?'

'না, বেশি দিলে অসুস্থ হয়ে পড়বে। তাতে লাভ নেই। অল্পেই লাভ।'

দিব্যি এক ঢোঁক গিলল বনছায়া। হাত বাড়িয়ে বললে, 'একটা সিগারেট দিন না। স্মোক করি।'

'তুমি স্মোক করতেও শিখেছ নাকি?'

'আমি সব শিখেছি। জানেন আমি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছি। দিন না একটা সিগারেট।'

হিমাংশুর মনের কোন এক অজানা কোণে ছোট্ট একটা আঘাত লাগল। বললে, 'না, সিগারেট নয়, সিগারেটে তোমাকে ভালো দেখাবে না।'

বনছায়া হাত গুটিয়ে নিল। বললে, 'আপনি যা বলবেন তাই হবে। যা ভালো হবে, ভালো দেখাবে, তাই করুন।' হাতের গ্লাসে চুমুক দিল বনছায়া: 'আজকের রাত তো আপনার রাত।'

'আর আগামী রাতগুলো?'

উত্তর দিতে গিয়ে গলায় বাধল বনছায়ার। হঠাৎ টেবিলের উপর বুক-স্টাণ্ডে নজর পড়তেই দেখল তার 'অবন্ধনা'। বনছায়া একেবারে কাঁপিয়ে পড়ল: 'এ যে 'অবন্ধনা'। পড়েছেন?'

'পড়িনি। শুধু দেখছি। চোখ ভরে দেখছি।'

'ও মা, এ যে দেখি 'দ্বিতীয় পুরুষ'টাও আছে।' ও বইটাও টানল বনছায়া।

'ওটা ভালো হয়নি।'

'পড়েছেন?'

'আমি না পড়েই বুঝেছি।'

'কে জানে কী ভালো-মন্দ। জীবনের স্রোতে ভেসে চলেছি, যা পাচ্ছি নিচ্ছি কুড়িয়ে, ভালো-মন্দ বিচারের ফুরসৎ পাওয়া যাচ্ছে না। যা ভালো তাই মন্দ, যা মন্দ তাই ভালো হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার অবন্ধনা তো সিনেমা হচ্ছে।'

'সে আমার কোণ্ডক্ট—সে তো আপনার অবন্ধনা। আমার বই তো আপনার ডাইরেক্টর সমীর সা-র কাঁচিতে অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। ছবিতে হিরোয়িন সাজছে কে?'

'শুনছি লাবণি ভটচাজ। একেবারে নিউ ফেস।'

'দূর! ও অভিনয় করবে কী। পার্টটা আমাকে দিতে বলুন। দেখবেন কী দারুণ অভিনয় করি! স্বয়ং লেখিকা হয়োয়িন সাজবে, পাবলিসিটির পক্ষে এ একটা দুর্দান্ত স্টান্ট হবে।'

'সমীরবাবুকে বলব। তার আগে তোমার অভিনয়-ক্ষমতাটা আমার কাছে প্রমাণিত করো।' হিমাংশু চঞ্চল হয়ে উঠল।

এতটুকু ঘাবড়াল না বনছায়া। তপ্ত মদির কণ্ঠে বললে, 'সেই আশা করেই তো এসেছি। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। চলুন বেড-রুমে চলুন।'

'দাঁড়াও। তার আগে তুমি আমাকে কী একটা জিনিস ফিরিয়ে দেবে বলেছিলে, কই দাও সে জিনিস!'

'সে তো এই শাড়িটা।' ফুলমলিয়ে উঠে দাঁড়াল বনছায়া: 'আমার বিয়েতে এই বেনারসীটা আপনি দেননি?'

বিহ্বলের মত তাকিয়ে রইল হিমাংশু: 'শাড়িটা গা থেকে খুলে ফেলবে?'

'গা থেকে খুলে না ফেললে শাড়িটা ফেরত দেব কি করে?'

'দাঁড়াও, আরো আছে। বলেছিলে ফেরত দেবার পর আরো একটা জিনিস উপহার দেবে—সেটা কী?'

শিল্পর মত হাসল বনছায়া। বললে, 'গা থেকে শাড়ি খুলে দেবার পর স্ত্রীলোকের যা থাকে তাই।'

'তারপর কী নিয়ে বাড়ি ফিরবে?'

'তার আমি কী জানি! আপনি শাড়িও নিলেন নয়তাও নিলেন, এখন ফেরাবার দায় আপনার।' ক্লান্তের মত চেয়ারে বসে পড়ল বনছায়া: 'আপনি কী অদ্ভুত! এত ঘুম পাচ্ছে আমার।'

'যাই বলো ফেরাবার দায়, আমার নয়।' হিমাংশু অন্যমনস্কের মত বললে, 'তুমি নিজের ইচ্ছায় এসেছ, নিজের ইচ্ছায় ফিরে যাবে। আমার জিনিস আমাকে দিয়ে শুধু শাদা-ব্লাউজে চলে যাবে।'

'অমনি বুঝি কেউ যায়?'

'উপায় কী! আমার এখানে শাড়ির বন্দোবস্ত নেই।'

'না থাক। আপনার পা-জামা-পাঞ্জাবি আছে তো? তাই পরে বাড়ি ফিরব।'

'তোমার স্বামী দেখলে কী বলবে?'

'কিছু বলবে না। সে জানে আমি এখানে এসেছি।'

'জানে?'

'জানে বৈকি। সেই তো ট্যাক্সি এনে দিল। বলে দিল ফিরতে যেন খুব বেশি দেরি না করি।' পিচ্ছিল কটাক্ষ করল বনছায়া: 'এখন তো আপনিই শুধু দেরি করিয়ে দিচ্ছেন। আমার কী ভীষণ ঘুম পেয়েছে।'

হিমাংশু নড়ল না। বললে, 'এখান থেকে এত বড় পাপের বোঝা বয়ে নিয়ে গিয়েও তুমি তোমার স্বামীর কাছ থেকে মার্জনা পাবে?'

'কে আর কাকে মার্জনা করে? এখন আর পাপ-পুণ্য-ক্ষমা-ঘৃণা মার্জন-বর্জনের প্রশ্ন নেই। এখন সমস্ত কিছুর উপরে আছে একমাত্র নীল আকাশ—'

বনছায়া চোখ বুজল। ভাবল এবার বুঝি অন্ধকার উত্তাল হয়ে উঠবে আর সেই অন্ধকারে সে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু, না, ঘড়ির টিক টিক ছাড়া আর কিছু না। চোখ খুলল বনছায়া। দেখল তেমনি অনড় হয়ে বসে হিমাংশু তাকে দেখছে তন্ময় হয়ে।

চোখে চোখ পড়তেই হিমাংশু বললে, খানিকটা যা অনুকম্পার সুরে, 'তুমি সেই তোমার স্বামীকেই বাঁচাতে চাও? তার জন্যে এত আয়োজন, এত স্ট্রাটেজাইস?'

বনছায়া চোখ নামিয়ে ধীরে-ধীরে বললে, 'আমি সেই দুর্বীরকেই বাঁচাতে চাই।'

'কিন্তু তোমাকে বাঁচাবে কে?'

'আমাকে?'

'তুমি হয়তো ভাবছ তুমি ক্রিমিন্যাল ইনটেন্ট, তুমি নিরাপদ, কিন্তু ডক্টর চাটার্জির অভিমত অন্যরকম।'

'ডাক্তার চাটার্জি?'

'হ্যাঁ, কমলেশ চাটার্জি। ফিট-ডন নার্সিং হোমে তিনি তোমার ডেপিডাবি করেছিলেন।'

'তাকে আপনি কোথায় পেলেন?'

'যেখানেই হোক পেয়েছি। তোমার ধারণা তিনি অপারেশান করে তোমাকে স্টেরিলাইজড করে দিয়েছেন, কিন্তু সেটা সত্যি নয়। তিনি বুল করেছেন সেটা একটা চাওতা। তুমি এখনো মা হবার উপযুক্ত।'

'সত্যি?' বনছায়া অতর্কিত আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'সুতরাং এমনিতরো এ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে যেয়ো না। ভীষণ রিস্কি এ্যাফেয়ার।'

তা হলে বুঝি হিমাংশুও বঞ্চিত হয়—সেই ভেবে ম্লান হল বনছায়া। তবু হবার চেষ্টার মানের তলানিটুকু সে খেয়ে নিল। বললে, 'তাতে কী। অন্য প্রিক্রিপশন তো আছে।'

আবার একবার বনছায়াকে দেখল হিমাংশু। দেখল লালসা আর বিতৃষ্ণা কত পাশাপাশি বাস করে, দুয়ের মধ্যে শুধু বুঝি এক তন্তুর ব্যবধান। এক নিশ্বাসের অবকাশে আইরি আপত্তি হয় মণির প্রতিবেশী কঠোর বৈরাগ্যের

সঙ্গে স্থান বদল করতে পারে। একই মুদ্রার এদিকে যদি হিংস্রতা ওদিকে ঔদাসীন্য।

'চলো।' হিমাংশু উঠে দাঁড়াল।

বনছায়াও উঠল। ভাবল হিমাংশু এবার তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাবে।

কিন্তু, এ কী, হিমাংশু নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হল।

'ওদিকে কী?' বনছায়াই চেঁচিয়ে উঠল।

'তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।'

'না, না, আমি এখন বাড়ি ফিরব না, আমি ঘুমোব। আমার বেজায় ঘুম পেয়েছে। আমি চললাম ও ঘরে।' শোবার ঘরের দিকে অঙ্গুলি ইঙ্গিত করল বনছায়া।

'না।' হিমাংশু প্রতিবাদ করল। বললে, 'রাত অনেক হয়েছে। তোমার এখন ফেরা উচিত। তোমাকে বাঘের মুখে পাঠিয়ে দিয়ে সুবীরবাবু নাজানি কত ভাবছেন। চলো। গাড়ি বার করতে বলি।'

'কিন্তু যার জন্যে এত, সেই মামলা—সুবীরের মামলার কী হবে?' বনছায়া আর্তনাদ করে উঠল।

'মামলা আমি ছেড়ে দেব।'

'ছেড়ে দেবেন?' অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে বলতে উঠল বনছায়া।

'মামলা চালাব না। আসামী ডিসচার্জড হয়ে যাবে।

'সত্যি?'

'আসল মামলায়ই যখন জিততে পারলাম না, তখন এ বাজে মামলা দিয়ে কী হবে?'

চোখ ফিরিয়ে নিল বনছায়া। বললে, 'শুনেছি এ মামলা কম্পাউণ্ডেবল নয়, মিটিয়ে নেওয়া যায় না।'

'তাই দেখলে তো, মিটিয়ে নিলাম না।' অন্য অর্থে বলে কথাটি হিমাংশু সরল অর্থে হাসল। বললে, 'কম্পাউণ্ডেবল নয় কিন্তু আমরা যদি এভিডেন্স না দিই, কিংবা এভিডেন্স যদি শর্ট হয়, কোর্ট না ছেড়ে দিয়ে কী করবে?'

'কিন্তু ধরা পড়তেই সুবীর যে স্বীকারোক্তি করেছিল সেটার কোনো বিপদ নেই তো?'

'কিছুমাত্র না। সেটা তো পুলিশের কাছে স্টেটমেণ্ট সে স্টেটমেণ্ট এভিডেন্স হয় না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।' হিমাংশু এক ঝাপটায় সব কুয়াশা ঘুরে করে দিল: 'যখন বলেছি তখন ঠিকই সুবীর ছাড়া পাবে।'

'কিন্তু তার চাকরি?'

'যখন কনভিকশান হল না তখন তার চাকরিতে কে দাগ কাটে? তার চাকরি অটুট থাকবে।' হিমাংশু আরো এগোল: 'আসলে ও তো খুব ভালো অফিসর, ওর উন্নতি হবে। ওকে এখানে রাখব না, এখানে রাখলেই নানান কথা হবে। ওকে বম্বে অফিসে ট্রান্সফার করে দেব।'

'বম্বে!' বনছায়া প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল।

আনন্দমূর্তি দেখে হিমাংশু আর প্রশ্ন করল না বম্বেতে বনছায়ার কী সুরাহা হবে। কে জানে কী, সুবীরকে সম্প্রতি এই ঘূর্ণাবর্ত থেকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারলেই বুঝি তার শান্তি।

'চলো। বেরিয়ে পড়ি।'

গাড়ি বার করিয়ে নিজেই হিমাংশু হুইলে বসল। পাশে বনছায়া।

নির্জন বাড়ি ছেড়ে নির্জন গাড়িতে এসে উঠেছে। কিন্তু যা প্রবল আসক্তি তাই আবার এক সুতোর ব্যবধানে নিবিড় বৈরাগ্য।

হঠাৎ বনছায়ার মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। বললে, 'ক্যাশের সেই দশ হাজার টাকার কী হবে? আমাদের ফেরত দিতে হবে না?'

'না।' হিমাংশু শান্ত স্বরে বললে, 'ও লাবণির টাকা, ও লাবণিরই থাকবে।'

'ও লাবণির টাকা হয় কী করে? ও তো আপনার টাকা।'

'বলতে পারো, আমাদের টাকা।'

'তার মানে আপনি লাবণিকে ঐ টাকাটা চ্যারিটি করলেন?'

'তা যা বলো। চ্যারিটি! চ্যারিটি বিগিন্‌স্ অ্যাট হোম্। লাবণিই তো এখন আমার হোম্।'

'হোম্!' প্রায় আঁতকে উঠল বনছায়া: 'তার মানে?'

'হোম্ যানে সংসার। লাবণিকে আমি বিয়ে করব।'

'লাবণিকে বিয়ে করবেন?' বনছায়ার বিস্ময় যেন আর্তনাদের চেহারা নিল।

এও'কি একটা প্রত্যাখ্যানের মত দেখাচ্ছে না?

গভীর নিশ্বাস নিয়ে হিমাংশু বললে, 'লাবণির পুরো নাম লাবণি ভট্টাচার্য। দুঃখে-দারিদ্র্যে মানুষ হয়েছে, তাই বেশ খাঁটি মেয়ে। যেমন সরল তেমনি অনুগত। সমস্ত সংস্কারের ঊর্ধ্বে। তবু যা একটু অভিনয়ে অপটু। যেমন, তাই না? তবু আমার জন্যে যা করেছে তা বলবার নয়। আমি যদি ওকে যান না দিই তবে ও দাঁড়াবে কোথায়? আমি নিজে জিততে পারিনি কিন্তু ওকে আমি জিতিয়ে নেব।'

গাড়িটার আর কোথাও যাবার সম্ভাবনা নেই—নিতান্তই বনছায়ার ফ্ল্যাটের দরজায় এসে দাঁড়াল। একদিন হিমাংশু এই দরজার থেকেই গাড়ি করে বনছায়াকে নিয়ে যেতে এসেছিল, আজ অনায়াসে সেই গাড়ি করেই বনছায়াকে সেই লোরগোড়ায় নিয়ে গেল পৌঁছিয়ে।

নামবার আগে বনছায়া বললে, 'যা বললেন সব ঠিক হবে তো?'

'সমস্ত ঠিক হবে। অক্ষরে-অক্ষরে।'

আলো-জ্বালা জাগা ঘরে সুবীর সিগারেটের পর সিগারেট টানছে আর থেকে-থেকে ঘড়ি-দেখছে, কতক্ষণে খানার রওনা হবে। লেখায়-পড়ায় মন দিতে পারছে না, শুয়ে-বসে আরাম পাচ্ছে না, সর্বক্ষণ কাঁটার উপর দিয়ে হাঁটছে—ঘড়ির কাঁটা নয় যেন জলন্ত অঙ্গার।

গাড়িটা কখন থামল টের পায়নি সুবীর। হঠাৎ তার সমস্ত চেতনা হুংকার দিয়ে উঠল যখন দেখল সদর খুলিয়ে বনছায়া উঠছে সিঁড়ি দিয়ে সরবে, লাফিয়ে-লাফিয়ে।

'তুমি কোথায়?' চৌকাঠের ওপার থেকেই হাঁক দিল বনছায়া।

'কী হল?' আনন্দে সুবীর প্রতিধ্বনি করে উঠল। দাঁড়াল উৎসুক হয়ে।

'সমস্ত জিতে এনেছি।' সুবীরের বুকে কাঁপিয়ে পড়ল বনছায়া। কোথাও প্রাচীর নেই, কাঁটা তার নেই।

'সমস্ত?' বুক ভরে গ্রহণ করল সুবীর। কোথাও গ্রন্থি নেই, বন্ধন নেই।

'সমস্তর চেয়েও বেশি। আশাতীত।'

'বলো। বলো।'

বলতে লাগল বনছায়া: 'প্রথমত, ফৌজদারি মামলা ছেড়ে দেবে, চালাবে না, তুমি খালাস হয়ে যাবে। কাজে-কাজেই তোমার চাকরিও বহাল থাকবে। দ্বিতীয়ত ক্যাশের টাকা ফেরত দিতে হবে না। ওদের টাকা ওদেরই থাকবে। তৃতীয়ত, তোমার উন্নতি হবে, তুমি যাচ্ছ ট্রান্সফার্ড হবে।'

'সত্যি? এ ভীষণ অদ্ভুত। স্বপ্নের মত অদ্ভুত। কী করে এ সম্ভব হল?' কতদিন পরে অন্তরঙ্গ আনন্দের মুখোমুখি হয়েছে সুবীর: 'বলো কী করে জয়ী হলে?'

'আমাদের প্রেম জয়ী হল হিমাংশু বোস দেখল কিছুতেই, কোনো অবস্থাতেই তাকে নড়ানো গেল না, তাড়ানো গেল না, ঘুরে-ঘুরে বারে-বারে নিজের জায়গায় সে ফিরে এল। শত ছলনা করেও স্থির করতে পারল না, পাকের মধ্যে ফেলেও দেখল তা পচে গেল না, দিব্যি ফুল ফোটাল। তখন নিজেই হেরে গেল, ছেড়ে দিল, ভালো মানুষের মত বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল, তোমাকে থানায় পাঠানোর মত অবধা সময় অপেক্ষা করাল না। তারপর আরো আছে, সেইটেই আশাতীত।' হঠাৎ বনছায়ার দু চোখে জল এসে গেল: 'নার্সিং হোম-এর ডাক্তারের ভাড়িই এনে দিল। আমার উপর সেই অপারেশনটা হয়নি, আমি যা জানতাম তা ভুল, আমি নিরাপদ নই।' বলে হাসতে লাগল প্রাণ খুলে।

অফিসে দেবজ্যোতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে বনছায়া।

'কি, কিছু ঠিক করলে?' দেবজ্যোতি প্রশ্ন করল।

মমতার প্রতিমূর্তি, বনছায়া নিচু চোখে বললে, 'আপনার কথামত বাইরে যাব বলেই ঠিক করেছি।'

'হ্যাঁ, যদি বাঁচতে চাও তো ঐ পাপ সংসর্গ থেকে পালাও।'

'তাই যাব।'

'আশা ঠিক করেছ ?'

'করেছি।'

'কোথায় ?'

'বম্বে। সেখানেই আমার আত্মীয় আছে।'

'বেশ, তাই। বম্বেই ভালো। থ্রিলিং।

উত্তরে বনছায়া চকিতে একটু হাসল।

যথাসময়ে সুবীর আর বনছায়া দুজনেই বম্বে চলে গেল। বদলি হয়ে। দুজনের দু চাকরি, দু অফিস, কিন্তু এক ফ্ল্যাট, এক সংসার। সম্প্রতি এক ট্রেন, এক কুপে। এক জয়, এক আনন্দ। এক যাত্রা।

বনছায়া বললে, 'শেষটা কী সুন্দর !'

সুবীর হেসে বললে, 'আমার মনে হয় শেষের চেয়ে আরম্ভটা আরো সুন্দর।'

শেষ

একটি মর্মান্তিক কাহিনী !

'কমাস হয়েছে ?' ফোনে কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো।

'দুমাস' বললো মেয়েটি।

কণ্ঠস্বর আবার বেজে উঠলো ফোনে, 'ডলার নগদ নিয়ে আসবেন কোন চেক নয়, বৃহস্পতিবার রাত আটটার সময় 'এম্ব' হোটেলের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করবেন। বুঝলেন ? আর শুনুন, গোলাপী রঙের পোষাক প'রে বেশ সেজে আসবেন। আমাকে যাতে চিনতে পারেন তার জন্য আমি কাল কোটের একদিকে প'রে আসবো সুন্দর লাল গোলাপ।'

ঘটনাটা ঘটেছিল গত বছরের জুলাই মাসের ১৮ই তারিখ ওয়াশিংটন সহরে। চারিদিকে একটা সেঁতসেঁতে আবহাওয়া। মনে হয় এতটুকু বাতাস নেই। যেন কেমন থমথমে ভাব ! কী করে এমন বিপদে পড়লো মেয়েটি ? কে জানে ! অবিবাহিতা মেয়েদের কি সন্তান হতে আছে ? ছিঃ ছিঃ ! যাক্—

ডিটেকটিভ গল্পে যেমন হয় তেমনি এক রহস্যময় পরিবেশে মেয়েটি একা হাজির হলো 'এম্ব' হোটেলের সামনে। শেষ পর্যন্ত সে উদ্ধার পেলো কুমারী কলঙ্ক থেকে। কিন্তু তার পরিবর্তে দিতে হলো তাকে প্রচুর অর্থ।

আর মনের অবস্থা যা হলো তা আর কি বলবো ! আপনারা ভেবে দেখুন।

এরকম ওদেশে ঘটছে—প্রায়ই ঘটছে।—সত্যি মর্মান্তিক !

লণ্ডনের রাজনৈতিক ভোজে গল্পভারতীর প্রতিনিধি

কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের (লণ্ডনে) পঞ্চবিংশতি ভোজানুষ্ঠান হয়।

সম্প্রতি বি. বি. সি.র পক্ষে লর্ড চ্যালফণ্ট ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ইণ্টারভিউ ক'রে ছবি তৈরি ক'রে বি. বি. সি. ও ভারতের মধ্যে এক পুনর্মিলনের আনন্দ সৃষ্টি করেন। তিনি এক বক্তৃতায় এক কথায় ভারতীয়দের জিজ্ঞাসা করলেন—ব্রিটিশের দুটো ঘর থাকে, একটা এখানে অপরটা ফ্রান্সে। কিন্তু বহুকাল আমার ভারতের সঙ্গে বহুতরে যোগাযোগ। তাই আমার একটা এখানে, অপরটা ভারতবর্ষে।

হাততালির ঘটায় আর কে কোন কথা শোনে!

ভোজানুষ্ঠানে ইন্দ্রাণীর ভারতীয় নৃত্য কলাকৌশল দেখে মুগ্ধ হল সকলে। তারপর শুরু হল ব্যক্তিগত আলোচনা। লর্ড চ্যালফণ্টকে বললাম—আপনার দুটো ঘরের কথা বড় ভাল লাগল।

মুখে হাত দিয়ে তিনি বললেন—কথাটা এখান থেকে উঠেছে।

লেডিও তা অনুমোদন করলেন।

আমিও ব্রিটিশ চরিত্রের সমর্থনে বললাম ব্রিটিশরা যে-কথা বলতে চায় না তা চেপে রাখতে জানে। কিন্তু যা বলে ফেলে তা তখান থেকে আসে এবং লোক বিশেষের অমন কথা অখণ্ডনীয়।

লর্ড ও লেডি স্বীকার করলেন আমার উক্তি। আমি বললাম, ইন্দিরার সঙ্গে কথোপকথনে আপনি এক নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি করেছেন।

লর্ড খুব উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন—আপনি দেখেছেন সেই প্রোগ্রাম ও সেই ছবি? ওঃ! সি ইজ এ ওয়ারিয়ার উওম্যান।

আমি বললাম—অফ কোর্স দেখেছি, আমার স্ত্রীও দেখেছেন।

লর্ড ও লেডির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—তাই না কি, মিসেস বানার্জী? ইজন'ট সি গ্রেটরিয়াল?

—ইয়েস, এক্সেলেণ্ট!

তারপর আরও নানা আলাপ আলোচনার পর হৃদ্য পরিবেশে অনুষ্ঠান শেষ হল।

অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

উপায় নির্ধারণ

কয়লাখনিকর্মীরা হরতাল করার ফলে অনেক এলাকায় ইলেকট্রিক বন্ধ থাকে দিনের কয়েক ঘণ্টা, কোথাও বা সারাদিন। এই শীতে ঘরে তাপমাত্র কমল। ফলে অনেকে ইলেকট্রিক হিটারের পরিবর্তে অন্য ব্যবস্থা করে। ওয়াশিংটনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এক ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেয়—আসুন সমস্যা জয় করি! একটা ইলেকট্রিক চেন করাত নিয়ে লাকড়ি কেটে নেও।

বিজ্ঞাপনটি এতই হাস্যজনক যে ডেলি টেলিগ্রাফের আধা-সম্পাদকীয় কলমে না তুলে পারল না।

বিভার কাট

প্রথম যুদ্ধের যুবা-সৈনিকরা দেশে ফিরল কালাপাহাড়ের মন মেজাজ নিয়ে। লম্বা চুল ও দাড়ি বিশিষ্ট

লোকগুলো হল তাদের চক্ষুশূল। বলা বাহুল্য তখনো বহুলোক চলেছে ভিক্টোরিয়ান যুগের জের টেনে। অন্ততঃ প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরা তো বটেই। কিন্তু লড়াই-ফেরৎ ছোকরাগুলো পথের আনাচে কানাচে দাড়ি দেখলেই টেনে ধরবে চিৎকার করে। তাদের অত্যোল্লাসটা ছিল 'বিভারের' সম্বাদকল্পনে, তাই সেই সম্প্রদায়ের নাম হয় 'বিভার কাট।'

তাদের ভয়ে বহুলোক লম্বা চুল আর দাড়ি ছেঁটে ফেলে। সেই সঙ্গে সেল একটা যুগের ধারা। বর্তমান যুগে সেই 'গুহাবাসীর' ধরণটা ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে তাদের ধরণও। তাদের নাম ফিন হেড, তাদের মাথায় ছোটছোট চুল—অন্ধকার কোণে বাপটি মেরে বসে থাকে লম্বাচুলের মাথার সন্ধানে তাদের অপর শিকার হল পাকিস্তানীরা।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা

পাঁচ ছটাকের কাজে ডম মিন্টকের ডম বৈঠকের চোটে পঞ্চদশ ঘাটধারা দাড়ি পালায় চাপানো হল। এক ডজন বৈঠকেও ১৪ মিলিয়নের ওপর উঠল না, কর্ণেল গাদাফীর গাদা বন্দুকের গুণে ডমের গোঁয়ারতুমির দমও কমল না। কত অভদ্র কথার তুবড়ি কাটালো, কত ভাঁটই দেখালো। লর্ড ক্যারিংটনের মাণ্ডার যাওয়া একেবারে বন্ধ করালো, নিজে ব্রিটেনে আসবেন না, অন্ত দেশে গিয়ে ডম সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে হবে তা হল। ওদিকে ব্রিটেনের মাল-পত্র কটাপট চালান হতে থাকলো, হাজার খানিক মন্টিস বরখাস্ত হল। এবার ছ'হাজার বরখাস্ত হবার নোটিশ পেয়েছে। এখন নিজের গরজে ডম মিন্টক লণ্ডনে ছুটে এসেছে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবার উদ্দেশ্যে। এবার লর্ড ক্যারিংটন নয় তিনি প্রধান মন্ত্রী, অতএব প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন।

এদিক থেকে তাঃ লুস প্রভৃতিও হাজির হলেন। ম'ঘণ তেল পুড়লে রাধা নাচার কথা। কিন্তু এ ব্যাপার দেখা গেল ন'মাসের বৈঠক, তার শেষ হল নাচটাচে। শেষ লাইনটা দেখার জন্ত টেলিভিশনের খবরটার অপেক্ষায় ছিলাম। কথাই সেই তিমিরেই রইল। এখন দেশে ফিরে লাজার হাজার অন্ধকার সংসার দেখবেন, দাবার ছকের মন্ত্রীত্ব করবেন ডম মিন্টক।

বাপ, বেটির ডুবল তরী

মাত্র একটি ভোটাধিক্যে ডম্ মিন্টক্ মাণ্টার প্রথমে। তারই জোরে কাটাকাটি করে সব শুদ্ধ ডুবতে বসেছে। ঠিক সেই সময় তাঁর মেয়ে একসিটার ইউনিভার্সিটির ছাত্র সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী—তাকে নিয়ে মোট ৪০ জন প্রার্থী। তার পিছনে আছে 'ইন্টারন্যাশানাল সোশালিষ্ট কনভেনশান।' এক হাজার কেলভ ছাত্র ভোট দেয়, তার ভাগ্যে মাত্র আটটি ভোট জোটে। একেবারে গো-হারান। বাপ-বেটির ডুবনের পিছনেই বিশ্বজনীন সমর্থন ছিল।

সৈনিক বুড়ো হয় না

এ কথাটা সত্য নয় যে বুড়ো সৈনিকের মৃত্যু নেই। পাশ্চাত্য জগতের অপর দেশের তুলনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শালরা কাজ আঁকড়ে ধরে থাকে অনেক বেশী দিন। মার্শাল ক্রিলভ, বাশ্কিরার মিশাইল ফোর্সের অধিনায়ক, গত সপ্তাহে ৬৯ বছর বয়সে মারা যান। যাঁরা এখনো আছেন তাঁদের মধ্যে ও উল্লেখযোগ্য সংরক্ষণ মার্শাল গ্রেচকো ৬৯, ইন্সপেক্টরেট বিভাগের অধিনায়ক মার্শাল-মোসকালেঙ্কো ৭০, ইনটেলিজেন্স প্রধান কর্ণেল জেনা: ইভস্থভিন ৬৩, যুদ্ধ কালিন খাতে কমাণ্ডার মার্শাল বলিয়েভ ৭৪-এ আরও সম্মানীয় তালিকাভুক্ত।

পাশ্চাত্যের অপরাপর দেশে ৬০-এর পর কোন সৈনিক কর্মে লিপ্ত থাকে না। সে তুলনায় আমাদের দেশে অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাবার কোন ব্যবস্থা নেই।

প্রিন্স ফিলিপ ও ইংরেজ সন্ন্যাসী

ডেলি টেলিগ্রাফের আধা-সম্পাদকীয় কলমে দেখলাম ১১ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স ফিলিপ ব্যাঙ্কের বন্তাবিবাস বৌদ্ধ মন্দিরটি পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে গিয়ে তিনি পরিচিত হবেন এক উনচল্লিশ বছরের ইংরেজ সন্ন্যাসীর সঙ্গে। তাঁর শান্ত কণ্ঠে আর আর লণ্ডনীয় উচ্চারণের চিহ্নমাত্র নেই।

লরেন্স মিলস্ লণ্ডনস্থ কিউ গার্ডেনে উদ্যান বিশেষজ্ঞের কাজ করতেন। পরে 'রয়্যাল আর্মি কোরের' কার্যোপলক্ষে তাঁকে যেতে হয় দেশান্তরে। ইংরেজদের মধ্যে ইনিও একজন যিনি আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার জন্য প্রাচ্যের পথ অবলম্বন বিধেয় মনে করেন।

তাঁর জীবনে এমন আশ্চর্যজনক পরিবর্তন হয়েছে যে, গত বছর মিঃ লরেন্স মিলস্ ছাম্পস্টেডে, নিজের বাড়ীতে যখন আসেন তখন সেটা বিশেষ মনে করেন। তিনি একখানা বই লিখেছেন—"বুদ্ধিজিম এক্সপ্লেনড্।" প্রিন্স্ ফিলিপ যখন মঠে আসবেন সেই বইটার এক কপি তাঁকে উপহার দেওয়া হবে

রাজভক্তির ভয়

দেশ কাল ও পাত্র বিশেষে বিভিন্ন রকম অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হয়। নৌকা-বিহারও তার অন্যতম বিধি। থাই রাজা ভূমিপালের অনেক প্রাচীন পানসি আছে। কিন্তু ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের থাইল্যাণ্ড ভ্রমণের সময় সেটা বার হয় নি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পিছনে একটা অপরিহার্য কারণ ছিল।

নৌকা ও রাজকীয় নৌ-বিহারটা এক প্রাচীন প্রথা। গত শতাব্দিতে এমনই এক নৌ-বিহারের সময় শ্যাম রাজ্যের রাণীর নৌকাটা উল্টে যায়। চতুর্দশ নাবিক এবং আরো অনেকে সেই পানসিতে ছিল। তাদের কেউ রাণীর সাহায্যে এগিয়ে এল না। রাণী তলিয়ে গেলেন জলের নীচে।

তাদের প্রথানুযায়ী ইতরজনের পক্ষে রাজবংশোদ্ভব কারো দেহ স্পর্শ মহাপাপ, রাজা-রাণী তো দূরের কথা। তার একটা আধুনিক দৃষ্টান্তও আছে। লিওন জনসন যখন জাইস প্রেসিডেন্ট তখন তিনি ব্যাঙ্ককে যান এবং ওখানকার বিধি নিষেধ অগ্রাহ্য করে বন্ধুভাবে যুবক থাই রাজার স্কন্ধে নিজের হাতটা চাপিয়ে দেন। বক্তব্যটি নিরিশেষে উপস্থিত সকল থাইবাসীর মন এক গুরুতর ধাক্কা খায়—সবাই হতাবিষ্টের মতো চেয়ে থাকে।

এক কালে রাজা মাত্রই ছিলেন ধর্মাবতার। অতএব ঈশ্বর। কোন না কোন ভাবে এখনও তা আছে। পাশ্চাত্য জগতে ভাবটা গেলেও আছে নামটা, অথবা অমনই একটা কিছু। যেমন যুক্ত রাজ্যের রাণীর স্থান ধর্ম মন্দিরের শ্রেষ্ঠ ধর্মযাজকেরও ওপরে পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোতে অন্য বিষয় নাম ও ভাব দুটোই আছে। আমাদের দেশে রাজ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারকদেরও ইতরজনে এখনো ধর্মাবতার বলে থাকে। যেখানে রাজা আছে তাঁকে সেখানে যে তেমন সম্মান দেবে তাতে আর বিচিত্র কি!

জাপানের প্রজাসাধারণের রাজভক্তির কত দৃষ্টান্ত অনেকেরই জানা। এমন কি হয় জানি না, তবে কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজার গাড়ী রাস্তায় চলেছে শুনতে পেলে সবাই জানালা বন্ধ করত। রাস্তার উপরস্থ স্থানে প্রজাসাধারণের অবস্থিতি বিধি বিরুদ্ধ ও পাপজনক।

অধনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে এমন একটা জাপানী গল্প শুনেছি। এক কারখানায় সভার ঘণ্টা হয়। সে কাজ করবে না বলে উঠে যায় চিমনিটার মাথায়। কেউ আর তাকে অনুরোধ অনুনয় বিনয় করে নামাতে পারে না।

তখন একজন ছুটে এসে তাকে জানায়—রাজা আসছেন এই পথে!

বলা বাহুল্য লোকটি খুব চট্ করে নেমে এল।

ধাপে ওঠা

উইলংসায়ারবাসী এক স্টক ব্রোকারের সতেরো বছরের মেয়ে তিরিশ বছরের মায়কুইস্কে (অর্থ লণ্ডনডারি) বিয়ে করে সমাজের ধাপে উঠে হল মায়কিয়নেস্। কিছুদিন পর এল বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। গত মার্চে সেটি লণ্ডনডারির আঠারো মাসের সন্তানের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট বিবেচনে আদালত বিধান দেয়—আপাতদৃষ্টিতে যে ছেলেটি মায়কুইস উপাধির উত্তরাধিকারী সে মায়কুইসের ঔরসজাত নয়।

মামলায় কোরেস্পণ্ডেণ্টের নাম করা হয় আঠাশ বছরের অভিনেতা কেভের।

বিচারপতি অলরোডের মতে ছেলেটি অভি কেভের ঔরস জাত হতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে সঠিক মতামত

দেওয়া যায় না। যতটা খবর পাওয়া গেল বিবাহ বিচ্ছেদের পক্ষে তা যথেষ্ট।

জর্জি কেমের আসল নাম ক্লাইভ পোয়েল, একসময়ে লাক্সাসায়ারে তাঁতের কাজ করত। একুশ বছর বয়সে "ইয়া ইয়া" রেকর্ড করিয়ে এত নাম করল যে, পপ গাইয়ে হিসেবে বিট্‌ল্‌দের ওপরে উঠে গেল। ১৯৬৬ তে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং-এ এক লক্ষ পাউণ্ডের কনট্রাক্ট পায়।

সম্প্রতি মেরিলিবোন রেজিস্ট্রি অফিসে সে তার আসল নামে মোটিশ দেয় নিকোলেট্‌ লণ্ডনডারিকে বিয়ে করবার। মেয়েটি লণ্ডনডারির বয়স এখন তিরিশ। জর্জি কেমকে বিয়ে করে তার খ্যাতিটা কতখানি বাড়ে সময়ে তা বোঝা যাবে।

যৌন জীবনের সুর আবিষ্কার

একদিকটায় ইউনিভার্সিটির প্রফেসারার ডাঃ ডার্বন উইন যৌন-জীবন সার্থক করে তোলার এক আবিষ্কারের দাবী করে বলেন—স্বামীদের যদি সূক্ষ্ম সুরজ্ঞান থাকে তবে ঘর সংসারের নানা কাজের সময় স্ত্রী যেমনভাবে গুন গুন করে, তা শুনে বোঝা যায় সেটা যৌনাবেদন কিনা। স্ত্রীও সমভাবে তেমন গুণের অধিকারিনী হতে পারে এবং স্বামী স্নান করবার সময় যে ভাবে বকবক করে সেটা শুনে আন্দাজ করতে পারে যে সে যৌন তৃপ্তির জন্য প্রস্তুত কিনা।

বলা বাহুল্য, এমন দৃষ্টান্ত দেবার কারণ এই যে, এরা আমাদের মতো সকালে স্নান করে না সেটা থাকে রাত্রের জন্য

ডাঃ উইন দেখেছেন ঋতুমতী হবার সময় স্ত্রীলোকের গলার স্বর বদল হতে থাকে। সেটা বুঝতে পারলে স্বামী নিরাপদ দিন বাছাই করে নিতে পারে, যখন সন্তান সম্ভাবনা থাকে না। আবার নিঃসন্তান দম্পতিরাও এমন দিন বেছে নিতে পারে যখন স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার হতে পারে।

তাঁর একত্রিশ বছরের স্ত্রী অ্যান, একজন সুগায়িকা। তার ওপর তিনি নিজের পরীক্ষা প্রয়োগ করেন। এবং অ্যানও সাহায্য করেন স্বামীর সকল পরীক্ষায়।

গায়িকা হিসাবে অ্যানের কান বড় সূক্ষ্ম এবং কোন একটা শব্দ শোনা মাত্র তার 'নোট' বিশ্লেষণ করতে পারেন। ডাঃ উইন অ্যানের শব্দ-স্বর ওঠানামার যান্ত্রিক মাপবন্ধের সাহায্যে যাচাই করে দেখেন যে, মাসিক ঋতুর প্রথমার্ধে সেটা নেমে যায়, এবং "ওভিউলেটেড" (ovulated) হবার সময় বেড়ে যায় ঋতুকালে যে hormone pattern পরিবর্তন হয় তাতে গলার স্বর এবং কানেরও অনুভূতির হেরফের হয়। পুরুষেরও তা হয়, কিন্তু সেটার কিছু রকম ফের আছে। পুরুষের যৌন চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে "টেস্টো টোরোন হরমন" (testotorone hormone), তারও মাসিক পরিবর্তন হয়। অতএব সুরজ্ঞা স্ত্রীর পক্ষে বোঝবার সম্ভাবনা থাকে যে তার স্বামীর যৌন উত্তেজনা এসেছে কিনা।

কি চাই স্যার ?

কান খাড়া রাখলে অনেক মজার কথাই না শোনা যায়। স্ট্যাসকোর্ডের এক দোকানদার-খরিদ্দারের কথোপকথন :

—পোনের গজ হোসপাইপ চাই।

—দুঃখিত, ডেসিমেল সিসটেম চলার পর, আমরা আর গজের মাপে কিছু করি না। এখন সব মেট্রিক।

—বেশ, তবে পোনের মিটার।

—ঠিক, আচ্ছা খি কোয়ার্টার ইঞ্চি না এক ইঞ্চি পাইপ ?

এখানে এলে বলবো

এক বৃদ্ধা মাঝরাতে থানায় ফোন করে জানায়—কে যেন তার বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীতে ঢুকে চুরি করবার চেষ্টা করছে। চট করে চলে এস।

—আপনার ঠিকানাটা দিন তো মা'ম। এখুনি পুলিশ পাঠাচ্ছি।

—তুমি আগে এখানে এস বাছা, তারপর ঠিকানাটা দেব।

———

রঞ্জিৎ সিংজী

গত সংখ্যায় প্রিন্স রঞ্জিৎ সিংজীর ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে প্রসঙ্গত কিছু লিখেছিলাম। তা পড়ে কয়েকজন ক্রীড়ামোদী গল্পলাবণ্যের অনুরাগী পাঠক এই "ক্রিকেটের বিস্ময়" খেলোয়াড় সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানতে চেয়েছেন। তাই এই সংখ্যায় সেই অবিস্মরণীয় ব্যাটসম্যান-এর অসামান্য ক্রীড়াকৃতির আরও কিছু পরিচয় জানাচ্ছি।

ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞরা বলেন, রঞ্জির মতো ব্যাটসম্যান আর দেখা যাবে না। ক্রিকেটের ধারা বদলেছে। এখন খেলতে হয় কেতাব মাফিক। কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না। ঝুঁকি নিয়ে আউট হলেই তুমি দল থেকে বা টেস্ট টীম থেকে বাদ। ক্রিকেটের ম্যাজিক বা অপরূপত্ব আর নেই। এখন মাটি কামড়ে খেলা আর রান করা। আজকালকার দিনে নির্বাচকরা এমন ব্যাটসম্যানকে দলভুক্ত করতে চায় না, যার মারগুলি নিয়ম মাফিক বা ক্রিকেটের বই অনুযায়ী নয়।

কিন্তু রঞ্জি কোন ক্রিকেট-বইএর ধার ধারতেন না। তাঁর মারগুলি ছিল নিজস্ব কল্পনা ও প্রতিভা প্রসূত। মস্তবড় ক্রিকেট বিশারদ ওয়েন স্মিথ তাঁর খেলা সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছিলেন। He never made a Christian stroke in his life.

রঞ্জির ব্যাটিং ছিল মৌলিক ও দুঃসাহসী। ঝুঁকি নিতেন তিনি। কিন্তু এমনি ছিল তাঁর সুরধার ব্যাটিং যে বল কদাচ ফস্‌কাতেন না। ব্যাটে বলে হবেই, যদি অবশ্য বল নাগালের বাইরে দিয়ে না যায়।

যখন তাকে বলা হত, এভাবে খেলেন যদি বল ফসকান ?

উত্তরে তিনি বলেন, বল ফসকানো মানেই তো আউট হওয়া। বল ফসকানোকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন। হাতে অত বড় একটা ব্যাট থাকতে বল ফসকাবো, সে আবার কেমন কথা।

একবার সেঞ্চুরি করবার পর তিনি প্যাভিলিয়নে ফিরলেন। অনেকে তাঁকে শত রানের জন্যে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু তিনি খুশী নন। বললেন, ভাল খেলতে পারি নি আজ। এই বলে তিনি তাঁর দুধের মত সাদা প্যাডে তিনটি লাল চিহ্ন দেখিয়ে বললেন, তিনবার বল ফসকেছি।

একজন বোলার তাঁকে বল দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে বলেছিল, আমার সবচেয়ে ভাল বল করেছিল বোধ করি সেইটি যেটি রঞ্জি মারতে পারেন নি

অংক কষে রানের পরিসংখ্যান দিয়ে রঞ্জির ব্যাটিং-এর মাহাত্ম্য বোঝানো যাবে না। তাঁর খেলায় সৌকুমার্য

জ্যোতির্ময়

আর অবিশ্বাস্য ধরনের প্রভুত্ব ছিল তাঁর নিজস্ব। অবশ্যম্ভাবী কঠিন শৃংখলাবদ্ধ ইংলণ্ডের ক্রিকেটে তিনি এনেছিলেন রূপকথার কাব্য সুষমা, প্রাণখোলা মুক্ত ছন্দ।

ব্যাট হাতে করে যখন ক্রিজে দাঁড়াতেন বল মারবার জন্যে, তখন তাঁর মধ্যে এতটুকুও বিচলিত ভাব নেই, যেন মাঠে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন, এমনি একটি নিরাসক্ত ঔদাসীন্য। কোন বিশেষ তদ্গতা নেই, কোন তৎপরতাও যেন নেই।

তারপর বল যখন তাঁর দিকে এলো তখন চিতা-বাঘের মতো ক্ষিপ্রতায় আর অবলীলায় তিনি ব্যাট চালালেন। কোথাকার বল কোথায় চলে গেল। তান দিক ঘেঁসে যে বল এলো সে বল চলে গেল বাঁ দিকে বাউণ্ডারীর লেগে। বোলার, ফিল্ডার, দর্শক—সকলে অবাক। এ কী মার। না যাদুর খেলা। দেখা গেল, ব্যাট চালাবার পর রনজি তেমনি অবিচল ঔদাসীন্যে দাঁড়িয়ে আছেন।

তাঁর আগে ব্যাটসম্যানরা রান করত বেশীর ভাগই আগ বাড়িয়ে মেরে। তিনিই প্রথম দেখালেন, পিছিয়ে এসে বল শুধু না ঠেকিয়ে তাকে মেরে মাঠের সীমানা পার করা যায়—যাকে আজ বলা হয় ব্যাক ফুট ড্রাইভ, তা উদ্ভাবন করেছিলেন তিনিই, আর আবিষ্কার করেছিলেন—লেগ গ্লান্স নামক মার

বোলান্‌কোয়েটের ছ'লি বল আর রনজির লেগ গ্লান্স—বহুদিন পর্যন্ত ছিল প্রবাদের মতো।

এই খেলায় ফল রণজির সাধনা ছিল যেমন একনিষ্ঠ তেমনি কঠোর পরিশ্রমের ক্রিকেট মরশুম আরম্ভ হবার দু'তিন মাস আগে থেকেই তিনি বড় বড় পেশাদার লোকেদের নিযুক্ত করতেন। তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁকে বল দিত আর তিনি অনুশীলন করতেন। একজন বন্ধু একবার বলেছিলেন, এতক্ষণ ধরে পরিশ্রম করা, এতে কী শরীরের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকবে না? উত্তরে তিনি বলেন, না, তা থাকবে কেন? আমি বুঝতে পারি, এক ঘণ্টা আমি বেশ খেলতে পারি কিন্তু তারপর যেন অবসন্ন বোধ করি। অনুশীলন করে এই অবসন্নতা দূর করতে হবে।

ফাঁকী দিয়ে তিনি বড় হন নি। অনুভব পরিশ্রম করেছেন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা।

একবার একটি খেলায় দু'দিক থেকেই দুই দুর্ধর্ষ দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার তাঁর দিকে ক্রমাগত যেন গোলা ছুঁড়ছিল। সেই খেলার বর্ণনা প্রসঙ্গে ক্রিকেট সমালোচক হিউ সেলিন্‌কোর্ট লিখেছিলেন—দুই বোলারের দুর্দশা দেখে কষ্ট হচ্ছিল। যত জোরে তারা বল করে, তত অবলীলায় রণজি সেই বলগুলি পাঠিয়ে দেন বাউণ্ডারীর সীমানায়। তিনজন স্লিপে, তিনজন কাইন লেগে। কিন্তু তবুও তাঁর মার আটকানো যাচ্ছে না। আবার বল যদি একটু উঁচু হল তো চোখের পলক পড়বার আগেই সে বল চলে গেল কভার বা এক্সট্রা কভারের পাশ দিয়ে বাউণ্ডারীতে। হতাশ হোয়ে বোলাররা এবং ফিল্ডাররা আর এদিক ওদিক সরলো না, সরেও তো কোন ফল নেই। রণজি ঠিকই ফাঁক খুঁজে পাঠাবেন এবং সেই ফাঁকের মধ্য দিয়া বল চলে যাবে বাউণ্ডারীর সীমানা পেরিয়ে।

এমনি ব্যাটসম্যান ছিলেন প্রিন্স রঞ্জিৎ সিংজী wizard at the wicket.

ইংলণ্ডের সমকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান সি. বি. ফ্রাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—He moved as if he had no bones. One would not be surprised to see blue flames shimmering round his bat as he made his strokes.

নীচে রণজির ব্যাটিংএর পুরো রেকর্ড দেওয়া হল।

মরশুম	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	গড়
১৮৯৩	১১		৪০১	৫৮	২৫·৮২
১৮৯৪	১৬	৪	৩৮১	৯৪	৩২·২৪
১৮৯৫	৩১	৩	১১১৫	১৫০	৪১·৩০
১৮৯৬	৫৫	১	২১৮০	১৭১	৫১·১১
১৮৯৭	৪৮	৫	১৯৪০	২৬০	৪৫·১১
১৮৯৭-৯৮ (অষ্ট্রেলিয়ায়)	২২	৩	১১৪৭	১৮৯	৬০·৮৯
১৮৯৯	৫৮	৮	৩১৪৯	১৯৭	৬৩·১৮

১৮৯৬, ১৯০০ এবং ১৯০৪ সালে তিনি মরশুমের ব্যাটিংএ গড়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন, ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে দ্বিতীয়, ১৮৯৯ ও ১৯০১ সালে তৃতীয়, ১৮৯৫ সালে চতুর্থ এবং ১৮৯৭ সালে পঞ্চম স্থান ছিল তাঁর।

তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি ইংলণ্ডের ভূমিতে টেস্ট

খেলায় মনোনীত হয়েছিলেন। কিন্তু এ মনোনয়ন সহজে হয় নি।

১৮৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ড সফরে এসেছে। হ্যারি ট্রট সেই দলের অধিনায়ক। দলে আছে আর্চেস্ট জোনস নামে এক বোলার যার তুল্য ফাস্ট বোলার জগতে তখন ছিল না। সে বছর রণজি দুর্দান্ত খেলছেন। সকলেই ভেবেছিল, টেস্ট দলে তিনি স্থান পাবেনই। কিন্তু বাগড়া তুললেন এম. সি. সির কর্তা লর্ড হ্যারিস। বললেন, রনজি তো ব্রিটিশ বংশোদ্ভব নন, তিনি "ময়ূরপুচ্ছ পাখা" সুতরাং তাঁকে টেস্ট দলভুক্ত করা যেতে পারে না। প্রথম টেস্টে তিনি ঠাঁই পেলেন না। ইংলণ্ডের ক্রীড়ামোদী ক্রিকেট মহল খুবই হতাশ হল।

সে সময় প্রথা ছিল, যে কাউনটিতে টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে সেই কাউনটি ক্লাব দল মনোনীত করবে। দ্বিতীয় টেস্ট ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে। ল্যাংকাশায়ার কাউনটি। তারা সরাসরি হ্যারিসের দলভুক্ত করলেন লর্ড ব্যারিস্টার পূর্ববর্তী নির্দেশ অগ্রাহ্য করে। শুনে রনজি বললেন, খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু জানতে হবে অস্ট্রেলিয়ানদের এতে কোন আপত্তি আছে কি না। অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ট্রট জানালেন, রনজি খেললে তাঁরা খুবই আনন্দিত বোধ করবেন।

হ্যারি ট্রট আর ল্যাংকাশায় কাউনটি এঁদের কাছে ক্রিকেট জগৎ চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবে কারণ তাঁরা আপত্তি করলে আমরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের সেরা খেলার পরিচয় পেতাম না।

প্রথম টেস্ট খেলায় সেঞ্চুরি। রনজি লর্ড হ্যারিসকে মুখের মত জবাব দিয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ৪১২ করল। ইংলণ্ড করল মাত্র ২৩১। তার মধ্যে রনজির রানসংখ্যা ৬১। ইংলণ্ডকে ফলো অন করতে হল। দ্বিতীয় দিনের শেষে ইংলণ্ড ব্রেস, স্টডার্ট, অ্যাবেল ও জ্যাকসনের উইকেট হারালো। তখনো ১২ রান খাটতি।

পরদিন সকালে রনজি খেলতে নামলেন। তাঁর সেই খেলাকেই বলা হয়েছে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। তাঁর সহব্যাটসম্যানরা কেউই ১১ এর বেশি রান করতে পারেন নি। তিনি তাঁদের দলের রানকে ৩০৪ এ নিয়ে গেলেন এবং নিজে ১৫৪ রান করে অপরাজিত রইলেন। ১১০ মিনিট তিনি খেলেছিলেন, তার মধ্যে ২০টি চার মেরেছিলেন। আউট হবার কোন সুযোগ দেননি।

বাঘের মতো বোলার জোনস হাত ঘোরে বল দেন রনজি তত অবলীলায় সময় সময় তাচ্ছিল্য ভরে সেই বল মেরে বাউণ্ডারিতে পাঠান।

He repeatedly brought of this wonderful leg strokes and his cuttings of these fast rising balls were little short of miraculous—বলেছেন তাঁর দলেরই উইকেট কীপার সিলে যিনি শেষ সময়ে তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ খেলেছিলেন।

রনজির বিপক্ষ দলের জর্জ অ্যালেন বলেছিলেন, His play was a revelation to us. Ranji is the batting wonder of the age.

আর একজন অসট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ক্লেম হিল বলেছিলেন, He is more than a batsman—he is nothing less than a juggler.

সেই মরশুমের রনজি আর একটি কীর্তি স্থাপন করেছিলেন যা আজো বিশ্বরেকর্ড হয়ে আছে। কাউনটি চ্যাম্পিয়ন দুর্ধর্ষ ইয়র্কশায়ারের বিরুদ্ধে তিনি একই দিনে দু' ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। একদিনেই তিনি দুবার ব্যাট করেন। প্রথম ইনিংসে করলেন ১০০, তারপর ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন নট আউট ১২৫। তাঁর জন্যেই তাঁর কাউনটি সাসেকস সে-ম্যাচ ড্র করতে সক্ষম হয়েছিল।

একদিনে তিনটি সেঞ্চুরি—অবিশ্বাস্য খেলা। কিন্তু এই খেলা খেলেছেন রনজি।

কেমব্রিজে পার্কার পীস মাঠে তিনি তাঁর দলের জন্যে অতি অল্প সময়ে একটি সেঞ্চুরি করে পাশের মাঠে গিয়ে খেলা দেখছিলেন। একটি দলে একজন খেলোয়াড় কম পড়ল। তিনি খেলতে রাজী হলেন

খেলতে নেমে অতিক্রান্ত একটি সেঞ্চুরি করে ফিরে এলেন নিজের মাঠে এবং সেখানে সেই দিনই তাঁর দলের দ্বিতীয় ইনিংস-এর খেলায় আর সেঞ্চুরি হাঁকড়ালেন।

১৮৯৬ সালের মরশুমে প্রথম শ্রেণীর খেলায় তিনি সর্বসমেত ১০টি শতরান করেছিলেন। মোট রান করেছিলেন ২৭৮০। ডবলু. গ্রেসের পঁচিশ বছরের রেকর্ড তিনি ভঙ্গ করেছিলেন সেই মরশুমে। ব্যাটিং গড়েও প্রথম স্থান ছিল তাঁর—গড় ৫৭·২১। উইজডেন সে বছর তাঁকে "বছরের পাঁচজন ক্রিকেটারের মধ্যে একজন" —এই দুর্লভ স্বীকৃতি দান করেছিলেন।

সেই বছর রঞ্জির সম্মানার্থে এক ভোজ সভার আয়োজন হয়। তাঁর সম্বন্ধে লাইট অফ এশিয়া নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের বিশ্ববিখ্যাত লেখক সার এডউইন আরনল্ড ডেলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছিলেন, Ranji has burst upon the cricketing world like a star from the East. He has adopted cricket and turned it into an Oriental poem of action.

ফুটবল খেলায় এক হাজার গোল

ফুটবল খেলায় একজন খেলোয়াড় সব খেলা মিলিয়ে জীবনে এক হাজারের উপর গোল করেছে এ নজীর কে স্থাপন করেছেন? করেছেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় জগৎ বিজ্রুত পেলে। টরন্টোর সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি খেলায় পেলে তাঁর দল সানটোস ক্লাবের তরফে তিনটি গোল করে, ক্লাব ম্যাচ ও আন্তর্জাতিক খেলা মিলিয়ে প্রথম শ্রেণীর ফুটবলে এক হাজার গোল করবার বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। কিছুদিন আগে সংবাদপত্রে দেখা হয় পেলে, ফুরিয়ে গেছেন। ব্রাজিলের (তাঁর দেশের) ইউ সেবিও নামে এক খেলোয়াড় তাঁর চেয়ে ভাল খেলেছেন। কিন্তু কোথায় আজ সেই ইউসেবিও, পেলে আজও ফুটবল মাঠের একচ্ছত্র সম্রাট! তাঁর দেশের চেয়ে অন্য দেশে সফরে গিয়ে এই কিছুদিন আগেও প্রতি খেলায় তিনি চমকের পর চমক সৃষ্টি করেছেন, অবশ্য তিনি আর বেশিদিন খেলবেন না, শীঘ্রই অবসর নেবেন—ঘোষণা করেছেন।

কলকাতা ফুটবলের এক জ্যোতিষ্ক

তাঁকে আমরা ইতিমধ্যেই ভুলে যেতে বসেছি। কিন্তু গোষ্ঠ পালের পর সৈলেন মান্নার মত অত বড় কুশলী আর দেখা যায়নি। এবং অত সাফল্য অত কীর্তিও কেউ অর্জন করেনি।

সৈলেন মান্নার খেলা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন অমন পরিচ্ছন্ন এবং আত্ম প্রত্যয় যুক্ত খেলা তাঁরা বোধ করি আর দেখেননি। কী লম্বা শট, বিপক্ষ দলের গতিবিধিকে বোঝবার, তাদের আক্রমন ঠিক সময়ে ব্যর্থ করে দেবার কী অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ক্ষমতা। কুড়ি বছর ধরে তিনি এক টানা খেলেছেন। জন্ম, হাওড়ায়, ১৯২৪ সালের ২৪শে অক্টোবর। স্কুলেই ফুট বল খেলা শুরু। ১৯৪১ এ কলেজে ঢুকে রীতিমতো খেলোয়াড়। সেই বছর তিনি কলকাতার তরফে নিখিল ভারত আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলেছিলেন এবং তাঁর দল সেই প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করেছিল।

দু'বছর হাওড়া ইউনিয়নে খেলার পর তিনি মোহন বাগান ক্লাবে যোগ দেন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মাঠে নামেন। ১৯৫০ সালে তিনি দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হন। তাঁর অধিনায়কত্বে মোহন বাগান পাঁচ বার ডুরাণ্ড এবং দু'বার আই. এফ. এ শীল্ড জয় করেছিল। তাছাড়া অন্যান্য বহু প্রতিযোগিতায় জয় লাভ তো ছিলই। মোহন বাগানের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায়ের তিনিই ছিলেন প্রধান রচয়িতা

১৯৪৮ সালে তিনি ভারতের তরফে লণ্ডন অলিম্পিক্স-এ খেলেন। পর বৎসর সিংহল সফরে অধিনায়কত্ব করেন। অতঃপর ১৯৫১ সালে দিল্লীতে এশিয়ান গেমস-এ ১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকসে, এবং ১৯৫৩ সালে মানিলায় এশিয়ান গেমস-এ তিনিই ছিলেন অধিনায়ক।

১৯৫১ সালে ভারতের অধিনায়ক রূপে প্রথম এশিয়ান গেমস-এ জয়লাভই তাঁর ফুটবল জীবনের সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তি।

মান্না বলেন, কলকাতার ফুটবলের মান অনেক নেমে গেছে। টেকনিক অনেক বেড়েছে, খেলা কতকটা যন্ত্রের মতো চালিত হচ্ছে। কিন্তু তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্রীড়াকৃতি বা খেলার জলুস অনেক কমে গেছে।

শৈলেন মান্না বর্তমানে রিওলজিক্যাল সার্ভে অফিসে সহকারী এডমিনিসট্রেটিভ অফিসর। তিনি বিবাহিত। একটি মাত্র কন্যা নিয়ে মান্না দম্পতির সুখের সংসার। কিছুদিন আগে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে তাঁর ক্রীড়াকৃতিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এ বছর (১৯৭২-৭৩ মরশুমে) ইংলণ্ড-ভারত সফরে আসছে। সেই প্রসঙ্গে এক নজরে ইংলণ্ড-ভারতের টেস্ট ফলাফল (১৯৭২ পর্যন্ত) নীচে দেওয়া হল।

মরশুম	সফরকারী দলের অধিনায়ক	ইংল্যাণ্ডের জয়	ভারতের জয়		মোট
১৯৩১	নাইডু	১			১
১৯৩৬-৩৭	জার্ডিন	২		১	৩
১৯৩৬	ভিজি	২		১	৩
১৯৪৬	পতাউদি (বড়)	১		২	৩
১৯৪৬-৪৭	হাওয়ার্ড	১	১	৩	৫
১৯৫২	হাজারে	৩		১	৪
১৯৫৯	গাইকোয়াড়	৪			৪
১৯৬১-৬২	ডেকসটার		২	৩	৫
১৯৬৩-৬৪	মাইক স্মিথ		০	৪	৪
১৯৬৭	পতাউদি (ছোট)	০	০		৩
১৯৭১	ওয়াদেকর	০	১	২	৩
ইংল্যাণ্ড		১৫	১	৬	২২
ভারত		৩	৩	১২	১৮
	মোট :	১৮	৪	১৮	৪০

মাঠে এল ফুটবল

অধ্যাপক সুনীল মুখোপাধ্যায়

আসন্ন বর্ষার পদধ্বনি বর্ণনা করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ? "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে"—

নিঃসন্দেহে বলা যায় আজকের কোলকাতার ময়দানের সঙ্গে পরিচয় থাকলে কবি ঐ লাইনটিই লিখতেন আসন্ন ফুটবলের পদধ্বনি বর্ণনার জন্যে।

আশ্চর্য্য, কবিগুরু বিশ্বের তাবৎ বিষয় সম্পর্কে লিখেছেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ব্যাপক ব্যবহার তার প্রমাণ। এমন কোনো অনুষ্ঠান নেই যার উদ্বোধন আর সমাপ্তি রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে করা না যায়। ব্যতিক্রম শুধু কোলকাতার ময়দানের ফুটবল—যদিও কখনও কখনও প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচের আগে লাউড-স্পীকারে—"ঐ মালতী লতা দোলে", কিংবা "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে" শোনা যায়—আর ঠিক সেই সময় লক্ষ্য করলে দেখাও যায়, অত্যুৎসাহী কয়েকজন দর্শক মাঠের আশে-পাশের গাছের উঁচু ডালে বসে সত্যিই দুলছে—অথচ রবীন্দ্রনাথ কোলকাতারই ছেলে—খাস উত্তর কোলকাতা, সেখানে ফুটবলের জন্ম বললেই হয়। জোড়াসাঁকো থেকে চৎপুর রোড ধরে ময়দান ক'মিনিটেরই বা পথ ? কিন্তু ফুটবল কবির কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় রয়েই গেল ! ১৯১১'র ঐতিহাসিক ফুটবল সম্বন্ধেও কবিকণ্ঠ নীরব।

যাই হোক, আসল কথায় আসা যাক।

ইংরিজী প্রবাদবাক্যে বলে আসন্ন ঘটনা আগেই তার ছায়াপাত করে। কথাটা খুবই সত্যি।

চাঁদার খাতা হাতে পাড়ার লোনার চাঁদেদের উদয় হলে বুঝতে পারা যায় পুজো এলো ! সহরের বাছাই করা দু-একটি রাস্তার সংস্কার হচ্ছে দেখলেই বুঝতে হবে কোনো VIP'র আগমন আসন্ন। তেমনি প্রচণ্ড গরমের স্টেটে IFA অফিসের সামনে উত্তেজিত, উৎকণ্ঠা-পীড়িত কৌতূহলী এক জনতার সমাবেশ দেখলেই বুঝতে হবে ফুটবল এলো !

এই জনতায় পাবেন ১১ থেকে ৪১ ত বটেই। ৫১ থেকে ৬১-ও পেয়ে যেতে পারেন। এঁরাই কোলকাতা ফুটবলের সাঁচ্চা পিঠ-চাপড়ানোর দল—Patrons ! মার্চ এপ্রিলের দারুণ রোদ আর গ্রীষ্মের সঙ্গে পাল্লা লড়ে এঁরা দাঁড়িয়ে থাকেন IFA অফিসের সামনে ! উদ্দেশ্য, লক্ষ্য করা, কোন তারকা এ-বছর কোন গগনে উদয় হন।

ফুটবল খেলোয়াড়রা দল বদল করে থাকেন যেমন রাজনীতির খেলোয়াড়রা ইদানীং হামেশাই করছেন। এই বদলাবদলির নেপথ্যে অনেক গোপন ইতিহাস, অনেক ছলকলাকবি, অনেক দেনা-পাওনার অঙ্ক, অনেক লাভ-লোকসানের হিসেব-নিকেশ। ফলটুট এম-এল-এ বাবুদের নেপথ্য কাহিনীর মতই রস এবং রহস্যঘন। তফাৎ এই যে, রাজনীতির কর্তারা নীতিগর্ভ ফতোয়া ঝাড়েন, ফুটবল খেলোয়াড়দের ও-সব বালাই নেই। এ-ব্যাপারে ময়দানের খেলোয়াড়রা ময়দানের বক্তাদের চেয়ে অনেক সরল ও স্বচ্ছ।

এই দল ছাড়াছাড়ির গল্প অনেক সময় ডিটেকটিভ গল্পকেও হার মানায়। যাঁরা ভেতরের খবর জানেন তাঁরা মাঠে বসে গল্প সুরু করেন। কোন নায়ককে কোন নায়িকা দিয়ে লটকানো হয়েছে—কাকে কোন দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, কড়া প্রহরার কী ব্যবস্থা ছিল, শত্রুপক্ষ কী মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছিল ওকে উদ্ধার করার, বাগী-মাৎ প্রায় করেও ফেলেছিল—শেষ অবধি পাঁচিলের এ-পারের পা-টা ও-পারে দিয়ে ঠেকতে পারলো না—সেটা কোন্ ভাবের কোন্ কর্মকর্তার বাহাদুরি, ইত্যাদি। বক্তাকে ঘিরে তখন উদগ্রীব শ্রোতার দল ক্রমেই বাড়ছে—

দল বদলাবদলির পালাটা এপ্রিলের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। তারপর দিন কয়েক চুপচাপ। ঝড়ের আগে থমথমে ভাব।

তারপর যে মাসের গোড়ার দিকে কোনো একদিন আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে"—এলো ফুটবল! ঘুমন্ত ময়দান জেগে ওঠে। নিদ্রিত দৈত্য মাথা নেড়ে উঠে বসে নিজার দেয় হুংকার। সেই আহ্বানে হাজারে হাজারে লোক ছুটে আসে দূর-দূরান্তর থেকে।

যে থেকে সেপ্টেম্বর। পাঁচটা মাস ময়দানে উত্তাল। কোলকাতা ফুটবল-মাতাল!

কী উত্তেজনায় ভরা এই পাঁচটি মাস। ময়দানের আশে পাশে সে কী দৃশ্য! যেদিন ফুটবলের বড়দা'দের খেলা থাকে—সকলেই জানে যে এই বড়দা তিনজন—পালা করে এঁরাই বড়-মেজো-সেজো হন—সেদিন যদি আপনি কার্জন (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ) পার্কের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে একবার চলন্ত-ছুটন্ত দুর্দান্ত জনতার দিকে তাকান, আপনার মনে হবে, কী এক অদৃশ্য শক্তির টানে সারা শহর ছুটেছে একই লক্ষ্য পথে। দেখতে দেখতে আপনিও নিজের অজান্তে ঐ স্রোতের সামিল হয়ে যাবেন, বুঝতে পারবেন না যে আপনিও ছুটছেন। কিছুক্ষণ পরে দেখবেন আপনি দাঁড়িয়েছেন সাপের মত আঁকাবাকা দীর্ঘ একটা 'লু'র পিছনে। দেখতে দেখতে আপনার পেছনেও লোক দাঁড়িয়ে গেল। আপনার সামনে মাথা, পিছনে মাথা, ডাইনে-বাঁয়ে অগণিত মানুষের ঢেউ। যে লাইনে আপনি দাঁড়িয়েছেন সেটি সতত সচলমান, কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর। আপনিও চলমান।

আপনি চলেছেন—চলেছেন—চলেছেন।

এবার চেয়ে দেখুন আপনি কোথায়—দুয়ারে কাঠ দিয়ে ঘেরা বড় একফালি জমির ভেতর আপনি ঠ্যালায় ঠ্যালায় পা-পা করে এসে পড়েছেন। স্মরণ করুন বাইবেলের বাণী—"স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের পথ অপরিসর"। এখানেও তাই।

হঠাৎ দেখলেন অশ্বপৃষ্ঠে শান্তিরক্ষী—পরনে খাকী, মাথায় বু-উচ্চ কোঁচ দেওয়া পাগড়ি, পায়ে ভারী বুট—আপনার দিকে ছুটে আসছে! আশান্বিত হতে দেবে না।

ঘোড়া দেখে কিন্তু ঘাবড়াবেন না। "নাদমাত্রা বল-হীনেন লভ্য"। ফুটবল-মাঠও তাই। অতএব, "চরৈবেতি"। এগিয়ে চলুন। সকলের সাথে এক হয়ে এগিয়ে চলুন। "টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে।" আপনিও চলুন।

এবার আপনি এসে পড়েছেন একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের সামনে। ওধারে কে আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। কেউই পায় না। আপনি শুধু দেখছেন যে আপনার আগে দাঁড়ানো সবাই একে একে এই গবাক্ষের সামনে এসে পকেটে হাত দিচ্ছেন—টাকা বের করছেন আর ঐ ছিদ্রপথে হাত প্রবেশ করিয়ে দিয়ে সেখান থেকে এক টুকরো রঙীন কাগজ নিয়ে দ্রুতপদে ভেতরে যাচ্ছেন। আপনিও তাই করলেন।

—আঃ! প্রাণটা বাঁচলো! খোলা মাঠ! আপনার খেয়াল নেই যে আপনার বর্তমান পোশাক—পরিধেয় পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত-প্রায়। তা হোক আপনি এখন মাঠের ভেতরে। এখনও অগণিত মানব-সন্তান বাইরে দুর্মান। আপনি তাদের দলে নয়।

এখন একটু বসার জায়গা পেলেই হয়।

ঘন নয়, মান নয়, নয় বড় কিছু আশা—শুধু কাঠের বেঞ্চে একটুখানি বসা! কিন্তু হায়, কোথায়?

যে দিকেই তাকান, স্থান নাই, স্থান নাই···শুধু মাথার পরে মাথা জমেছে···দেখে, মাথা ঘুরে আসে! মাথা, শুধু মাথা—দেখে দেখে চিত্তে তব বাজে বড় ব্যথা! ভাবছেন, এখন যদি কোথা?

হঠাৎ দেখলেন দু'ইঞ্চি আন্দাজ ফাঁক। যথেষ্ট! মা-কষ্টীর চেয়ে আধ-কষ্টীই ভালো। ভীড় কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন—কোনরকমে দেহকে সঙ্কুচিত করে বসতে যাচ্ছেন—এমন সময়—

"দাদু, জায়গা আছে"—

বলা হয়ে গেল! "আপার হলনে তুলি কী কল লভিনু হায়"—

চীন নাহছে মাঠে। বাহাদুর আ-প্যয়া—

চীৎকারী-স্বাগতম!

Standing Ovation! সব দর্শক দাঁড়িয়ে পড়েছে—

Stand up on the bench—স্কুলে উঠে গেছে, মাঠে চালু আছে। ছাতা বন্ধ করুন···ছাতা বন্ধ করুন! বেরী হয়েছে কি পড়লো ইঁট?

উৎসুক সন্ধানী দৃষ্টি—"ও কী এলো, ও কী এলো না?"

(না! রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেবার কোনো উপায় নেই—ফুটবল মাঠেও না)

—কে নামলো খেলতে আর কে নামলো না? সঙ্গে সঙ্গে হুক—

—এই মরেছে! আবার কেলোকে নামিয়েছে।

—স্কুলেতে আজও চান্স দিলে না?

—না—সিলেক্‌শন কমিটী। মারো না—কে!

—ঘুষখোর।

এর উল্টো মতও পাবেন। কেলোর স্যাপোর্টারও আছে।

খানিকটা তর্কাতর্কি—রেফারেন্স টু দ্য করটেস্ট—অর্থাৎ আগের আগের খেলায় কেলো-ভুলোর কীর্ত্তি। হ্যাটিস্-টিকস্।

দুদলই মাঠে নেমেছে।

একটু সতর্ক দৃষ্টি রেখে থাকেন ত নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, একের পর এক পিঠে বড় বড় নম্বর সাঁটা খেলোয়াড়রা মাঠে ঢোকার সময় দৌড়তে দৌড়তে হঠাৎ নীচু হয়ে মাঠের মাটী চট্ করে কপালে একবার ঠেকিয়ে নিলে। মাঠ-প্রণাম! পরীক্ষার আগে কালিঘাট, ঠনঠনে, দক্ষিণেশ্বরে পরীক্ষার্থীদের দেবী-প্রণাম! জয় মা।

গোলরক্ষক গোলপোষ্টের ওপর দিয়ে একবার ডান দিকের কাঠ, একবার বাঁ-দিকের কাঠ, তারপর লাফ দিয়ে মাথার ওপরের কাঠ স্পর্শ করে হাত ঠেকালে মাথায়। মনে মনে ফিসফিস—জয় মা! গোল সুরক্ষিত হয়ে গেল!

রেফারী বাঁশী বাজিয়েছে।

এগারো—এগারো বাইশজন জায়গা নিলে মাঠে। বাকীরা চলে গেল টাচ্-লাইনের ধারে। গিয়ে সার সার বসে যাবে। মাঠের কোনো খেলোয়াড়কে বসিয়ে দিলে এদের মধ্যে পালা করে এক একজন খেলতে নামবে। নতুন ব্যবস্থা কাকে কখন বসিয়ে দেওয়া হয় কিছুই ঠিক নেই। এতে খেলোয়াড়ের মনোবল ভেঙে পড়ে কিনা ভেবে দেখতে পারেন। খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে প্রীতির সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়ে টীম-স্পিরিট উবে যায় কি না সেটাও ভাববার কথা! তবে ও-সব কথা এখন থাক। খেলা সুরু হচ্ছে—

আকাশের দিকে মুদ্রা উৎক্ষেপণ হোলো—টস্।

সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার। টসে হারজিৎ থেকে একদল বুঝে নিয়েছে খেলার ফলাফল! টসে জিতলে জিত, হারলে সর্বনাশ!

মাঠের ভেতর অনেক রকম সংস্কারের সন্ধান পাবেন। যে জায়গায় আপনি বদলে আপনার টীম জিতে থাকে—এটা আপনি পরপর কটা খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই স্থির জেনে নিয়েছেন—সে জায়গা আপনি কিছুতেই ছাড়তে রাজী নন

কিছুতেই গোল হচ্ছে না—অথচ সময় আর বেশী নেই। দেখবেন কিছু লোক জায়গা বদলাচ্ছে। শুনবেন বলাবলি হচ্ছে, "না, জায়গা না বদলালে আজ আর কোনো চান্স নেই।" কী আশ্চর্য্য। জায়গা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গেই গো—ল! কাকতালীয়? ও-সব ছাড়ুন মশাই! ও জায়গাটাই ছিল অপয়া! যেই পয়মন্ত জায়গায় এলুম সঙ্গে সঙ্গে গোল! আঃ আসুন, একটা চারমিনার—

জোর খেলা চলছে। জোর মানে, দর্শকের চীৎকার আর উৎসাহ, তার জোরেই বেশীর ভাগ খেলা! খেলার জোর কদাচিৎ দেখা যায়। তা না থাক, আপনার টীম জিতলেই হোলো।

আজকাল প্রায় সবাই হয় এ-দলের না হয় ও দলের। নির্দলীয় রাজনীতি যেমন নেই বল্লেই হয়, নির্দলীয় দর্শকও তেমনি নেই। যদি দুর্ভিক্ষের কয়েকজন খেলার আনন্দেই খেলাতে বিশ্বাস করে মাঠে যান তবে তিনি অপাঙক্তেয়—উভয় পার্টির স্যাপোর্টারের কাছে পালা করে সন্দেহ ভাজন

নির্দলীয় আপনি—যে ভাল খেলবে, তাকেই আপনি বাহবা দেবেন ত? কিন্তু, খুব সাবধান। বাহবা দিতে চান, মনে মনে দিন। আপনার চারপাশ লক্ষ্য করুন। বুঝুন হাওয়া কোনদিকে। জনমতের বিপক্ষে যাবেন না। অখ্যাত একটি খেলোয়াড়ের দর্শনীয় একটি 'সটে' বড়দা-মেজদা টীমের প্রখ্যাত কোনো গোলকীপার যদি ধরাশায়ী হন, তবুও আপনি তারিফ করে হাততালি দেবেন না। দিলেই, আপনি আর্যান পার্টি! (বাঙলা ভাষায় খাদ ময়দানের শব্দ সংযোজন) আর কোনো কথা নয়—"মার্ দিয়া—কে!" পারেন ত অন্য সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলুন "অফ্‌সাইড্"! "দা—রেফারী" ইত্যাদি।

খেলা হচ্ছে। বল ছুটছে মাঠে, মুখ ছুটছে গ্যালারীতে। মাঝে মাঝে বর্তমানে প্রায়ই সে মুখ এমন জায়গায় ছুটে চলে যে সেখানে কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

যাঁরা গ্যালারীতে বসে খেলা দেখছেন তাঁরা সবাই ফুটবল-শাস্ত্র-পারদর্শী। কোন্ বল কোথা থেকে কীভাবে মেরে কোথায় ফেলতে হয় তা এঁদের নখদর্পণে। মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে এঁরা নির্দেশ দেন যাঁরা খেলছে তাঁদের। ফুটবলের নিয়মকানুন এঁদের কণ্ঠস্থ। রেফারীটা আর একটা দা—যদি অবশ্য ওঁদের প্রিয়টীমের বিরুদ্ধে কিছু দিয়ে বসেন। নচেৎ সব ঠিক থাকে। ভুল ওঁদের টীমের পক্ষে গেলে "বহুৎ আচ্ছা!" আপনি যদি নির্দলীয় হন তবেই এ-সব মজা উপভোগ করতে পারবেন। দলীয় হলে শুধু গোলই দেখবেন।

নিরপেক্ষ দর্শক হলে দেখবেন, কেলো যতক্ষণ গোল দিতে পারে নি ততক্ষণ সে 'থার্ডক্লাস', 'বোগাস', 'হোপলেস'। শুনবেন কেলোর উর্ধতন কয়েক পুরুষকে অনায়াসে মাঠে নামিয়ে আনা হয়েছে। সিলেকশন কমিটির আদ্য শ্রাদ্ধ আগেই হয়ে গেছে। মোহনদার দাবী উঠেছে, "বসিয়ে দাও, বসিয়ে দাও", "তুলোকে চাই, তুলোকে চাই" ইত্যাদি। এমন সময় হঠাৎ নিজের অজান্তেই কেলো আকস্মিকভাবে একটা গোল দিয়ে ফেলেছে! সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ উঠলো 'বিউটি!' 'লাভলি' 'তুলনা হয় না', 'জবাব নেই' ইত্যাদি, ইত্যাদি। একজন বলে উঠলো ',আহা-হা, শুধু কী একখানা দেখালে।' কেলো আজকের হীরো! খেলার শেষে কেলোকে পায়ে হেঁটে তাঁবুতে ফিরতে হবে না—ভক্তদের কাঁধ প্রস্তুত গুরুকে বহন করতে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ "গোল করলো কে?" উত্তর "কেলো মিত্তির আবার কে?" "টীমকে আজ জেতালো কে?" "কেলো মিত্তির আবার কে?"

পরের খেলায় যদি টিম হেরে যায় তাহলে এই আজকের হীরো 'ভিলেন' হয়ে গেছে দেখলে অবাক হবেন না। অবাক হবেন না যদি তার ওপর ইঁটের বৃষ্টি হয় কিংবা ক্লাবের তাঁবুতে আগুন ধরানোর চেষ্টা হয়। ডি-এল-রায়ের সেকেন্ডার কোলকাতার ফুটবল দেখলে অনায়াসেই বলতে পারতো, "সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই গড়ের মাঠ!"

এখানে বড়-দা মার্কা টীম জিতলে যে উল্লাসধ্বনি হয় তাতে শহীদ মিনার কেঁপে ওঠে—ছাতা-বর্ষাতি-জুতোর সঙ্গে বেলুনও ওড়ে, পটকা ফাটে, শাঁখ-ঘণ্টাও বাজে। হেরে গেলে রেফারী মেরাও হয়, তাঁবু আক্রান্ত হয়, ইঁট পাথর ওড়ে, ধোঁয়া ওঠে, আগুন জ্বলে। পুলিশ আসে, লাঠি চলে, ধোঁয়া ছোটে, কাঁদানে গ্যাসে লোক তাড়ানো হয়। পায়ের খেলা দেখতে এসে মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বাড়ী ফেরে কিছু লোক—কিছু সে রাত্তিরটা হাসপাতালে কাটায়।

কী? ভাবছেন এরপর—"না না না, কাল থেকে আর খেলা দেখতে যাবো না?" আমি বলছি—নিশ্চয়ই যাবেন। মাঠে ফুটবল, ঘরে আপনি—তা কী হয়?

তর্কে অপরাজেয় রামমোহন

সারা জীবনটাই এক অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম। শিশুকাল থেকে, নিজের মতে দৃঢ়বিশ্বাসী। নিজের আদর্শে অবিচল কিন্তু সমাজ আর সংস্কারের সঙ্গে তা নিয়ে যে সংঘাত লাগছে। লাগুক সংঘাত। রামমোহন অটল। আঘাতে সংঘাতে অনমনীয়।

মতবিরোধের জন্য বাপ বাড়ী থেকে তাড়িতে দিলেন। মা তাঁকে আদ্যা করলেন।

অন্য যে কোন মানুষ এই রকম অবস্থায় পড়লে ভেঙে গুঁড়িয়ে যেতো। কিন্তু কী এক আশ্চর্য শক্তি ছিল রাজা রামমোহনের মধ্যে। যে শক্তির জোরে তিনি বাধার পর্বতকে হেলায় সরিয়ে দিয়েছেন।

যেন প্রচণ্ড প্রলয়ের সামনে একাকী বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি। পারো, আমার মতবাদকে আমার যুক্তিকে খণ্ডন কর তা যদি না পারো মেনে নাও আমায়।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে মেনেই নিতে হয়েছিল।

রাজা রামমোহন দেশবাসীর হৃদয়ে রাজা। ভারতবাসীর সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য।

অনাথ উপাধ্যায়

ছেলেবেলা থেকেই বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে কূটতর্ক। তাঁর জীবননাট্যে এই তর্ক যুদ্ধ অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে।

তাঁর জীবন সংগ্রামে দোসর ছিলেনই বা ক'জন? একাই তো লড়েছেন বলতে গেলে চিরকাল। বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের সঙ্গে, বড় বড় জ্ঞানীদের সঙ্গে। রুখে দাঁড়িয়েছেন অসারীয় সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। জীবন বিপন্ন হয়েছে বারবার।

তাঁর জীবননাট্যের প্রতি অঙ্কই চমক, প্রতি অঙ্কেই শ্বাসরোধকারীর ঘটনা প্রবাহ।

তাঁর বিচার বুদ্ধি বিশ্লেষণের সামনে কেউ দাঁড়াতে পারতেন না। তর্কযুদ্ধে তিনি বিশ্বজয় করেছেন।

বারো বছর বয়েসে কাশী গেলেন সংস্কৃত শিখতে।

উপনিষদ পড়ে তাঁর মনে নতুন এক জ্ঞান জাগল ব্রহ্মজ্ঞান।

তিনি দেখলেন হিন্দুর বৈদিক ধর্ম মূর্তীমের মূর্খ এবং স্বার্থলোভী লোকের হাতে পড়ে সংকীর্ণ হয়েছে। নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়েছে।

তিনি এই ব্যবস্থা স্বীকার করলেন না। পণ্ডিতদের সঙ্গে মাঝে মাঝেই তর্ক আরম্ভ করে দিলেন।

তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার যুক্তিজালের সামনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা দাঁড়াতে না পেরে মনে মনে বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। ফলে কাশীতে থাকা রামমোহনের পক্ষে দুরূহ হল।

বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়ে গেলেন তিব্বতে। তিব্বতীরা বৌদ্ধ, সুতরাং সেখানে গেলে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ধর্মের যাবতীয় তত্ত্বকথা জানতে পারা যাবে। এই ভেবেই তিনি তিব্বতে গেলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন, ধর্মের নামে অন্ধ কুসংস্কার। তিনি তীব্র ভাষায় সেইসব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলতে লাগলেন।

ফল হল উল্টো। তিব্বতীরা অপমানিত পরাজিত হয়ে তাঁকে মেরে ফেলবার উদ্যোগ করল। অতিকষ্টে এক মহীয়সী মহিলার সাহায্যে তিনি সে যাত্রা প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরলেন।

কিন্তু ভারত কাকে বলে তাতো তিনি জানতেন না। বারবার আঘাত এসেছে। হিতৈষীরা অনেক নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি টলেন নি একটুও। কবির সেই বিখ্যাত গানের বহু আগেই তিনি গেয়ে গেছেন—

আমি ভয় করব না, ভয় করব না
দু বেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।

তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশে দেশে প্রচারিত হল। তাঁর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মতবাদকে খণ্ডন করতে নানা দেশ থেকে এলেন একাধিক পণ্ডিত। তর্কের আসর বসল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল পণ্ডিতরা ধরাশায়ী।

এক তান্ত্রিক পণ্ডিত তাঁকে একবার চ্যালেঞ্জ করেন কিন্তু রামমোহন তখন তন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতেন না। পণ্ডিতকে বললেন, কাল বসব দুজনে। তারপর তিনি চলে গেলে তৎক্ষণাৎ রামমোহন রাজা রাধাকান্তের লাইব্রেরী থেকে একটি প্রামাণ্য তন্ত্রগ্রন্থ এনে একদিন ও এক রাত্রের মধ্যেই তাকে পড়ে বুকে তুলে খেলেন।

পরদিন তর্কের ঝড় বইল। রামমোহনের যুক্তি এবং বিশ্লেষণের প্রচণ্ড বেগ বইল তার সামনে দাঁড়াতে পারলেন না সেই তান্ত্রিক পণ্ডিত।

রামমোহন যখন তাঁর গ্রামের বাস তুলে দিয়ে কলিকাতায় এসে আত্মীয় সভা নামে একটি সংস্কার সাধনে ব্রহ্ম উপাসনার আয়োজন করলেন তখন একদল গোড়া হিন্দু রাজা রাধাকান্তকে সভাপতি করে হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে রামমোহনকে এক তর্ক সভায় আহ্বান করলেন। যথাসময়ে তর্ক সভা বসল। বড় বড় পণ্ডিত একদিকে আর তিনি একদিকে।

বহুক্ষণ তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে রামমোহনেরই জয় হল। পণ্ডিত সমাজ অদ্বৈতবাদী রামমোহনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।

ব্রহ্ম সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

এতদিন রামমোহন কেবল দেশীয় পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করেছেন। এবার লাগল ইংরেজদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ।

ইংরেজ মনে করলে নেটিভ রামমোহন, তার আর কী জ্ঞান। দু'একজন পাদ্রী তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করলে, কটূক্তি করলে।

আর যায় কোথায়? রামমোহনের বাকাবাণ শুরু হল। মিষ্টি মিষ্টি কথায় তিনি ইংরেজ পাদ্রীদের ব্যক্তিগত নোংরা জীবনচর্যার কথা প্রকাশ করে দিলেন।

অনেক পাদ্রী অবশ্যই ভাল ছিলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ পাদ্রীই ছিল ভাড়াটে। হিন্দুদের বিশেষ করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে হিন্দুধর্মকে গাল দিয়ে এবং খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে তাদের খ্রীষ্টান করত।

সেই সময় দলে দলে হিন্দু খ্রীষ্টান হচ্ছিল।

রামমোহন বাধা দিলেন।

বাধা দিলেন গায়ের জোরে নয়, যুক্তিতর্ক প্রচার করে।

আগে ইংরেজী-লেখা যুবকরাও খ্রীষ্টান হচ্ছিল এখন তারা নতুন ধর্ম—ব্রাহ্মধর্মকে গ্রহণ করতে লাগল।

ইংরেজ পাদ্রীরা জলে পুড়ে মরতে লাগল। তাদের চাকরি তো যায়! মানে এতগুলো হিন্দুকে খ্রীষ্টান করতে হবে—তবেই তুমি মাসে এই টাকা পাবে—পাদ্রীদের সঙ্গে তাদের ওপরওলা মিশনগুলোর এই রকম ছিল চুক্তি।

তাই ছোট ছোট পাদ্রীগুলো রামমোহনের উপর ক্ষেপে গেল। কিন্তু ক্ষেপে গেলে কী হবে। রামমোহনের তুলনায় তাদের আর কতটুকু জ্ঞান!

সেই সময় শ্রীরামপুরে 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামে একটা বাংলা সংবাদ পত্র ছিল। পাদ্রীরা সেই পত্রিকায় রামমোহনের বিরুদ্ধে নানা কথা লিখতে লাগল।

তাতে কি হার মানবেন রামমোহন?

তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বার করলেন—'ব্রাহ্মণ পত্রিকা'। এবং সেই পত্রিকার 'শিবপ্রসাদ শর্মা' ছদ্মনামে তীক্ষ্ণ যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এমন সব প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন যা পড়ে পাদ্রীরা পরাজয়ের গ্লানিতে আর হিংসায় রামমোহনের সঙ্গে আরো নানা ভাবে শত্রুতা করতে লাগল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হল।

অশ্বারোহণ রইলেন রামমোহন জীবনের শেষ পর্যন্ত।

ভারতবর্ষকে জানতে হলে তার বিভিন্ন প্রদেশের মানুষকে জানতে হয় সর্বপ্রথম আর জানতে হয় তাদের সাহিত্য। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায় তাদের মনের ও চিন্তাধারার সম্যক পরিচয়। আমাদের দেশ বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত, আর সেই বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্য। কাজেই বিভিন্ন সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি ভাল করে জানতে হলে সেইসব প্রদেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভার আহরণ করে তাদের তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ একান্ত প্রয়োজন।

গল্পভারতীর প্রথম জীবনে আমরা বহুদিন ধরে প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিলাম।

দেশ স্বাধীন হবার পর, দেশের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজন অনেক বেশী বেড়ে গেছে। কাজেই "প্রতিবেশী সাহিত্য" নাম দিয়ে এই নূতন বছর থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রখ্যাত লেখকদের রচনা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে গল্পভারতীর পাতায় প্রকাশের ব্যবস্থা করা হল। হিন্দী আজ আমাদের রাষ্ট্র ভাষা, কাজেই হিন্দী দিয়ে শুরু করছি।

—সম্পাদক

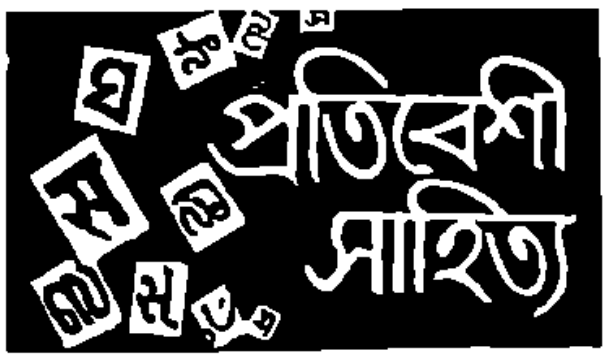

লেখক : প্রেমচন্দ

অনুবাদক : অনন্ত কুমার দাস

(মূল হিন্দী থেকে)

নাদীরশাহী সেনা চালিয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর চক্রান্তলীলা। দিল্লীর পথে পথে বয়ে চলেছে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। চারিদিকে হাহাকার। দোকান-পাট বন্ধ। নগরবাসী দুয়ারের অর্গল বন্ধ করে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করে। জীবন কারও নিরাপদ নয়। কোথাও ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে আগুন, চলেছে লুট, অভিযোগ শোনবার কেউ নেই। ধনী মহিলাদের টেনে বার করা হচ্ছে মহল থেকে বে-ইজ্জতি চলেছে তাদের পরে। ইরানী সিপাইয়ের রক্ত-পিপাসা কিছুতেই শান্ত হবার নয়। মানব হৃদয়ে ক্রূরতা, কাঠিন্য, পৈশাচিকতা বীভৎসরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

নাদীরশাহ প্রবেশ করেন বাদশাহী মহলে। দিল্লী সে সময় ছিল ভোগ বিলাসের কেন্দ্র। আড়ম্বর ও প্রসাধনের দ্রব্য সম্ভার স্তূপীকৃত হ'য়ে থাকতো ধনীগৃহে। নারী মত্ত কৃত্রিম প্রসাধনে, পুরুষ সুখ-ভোগের চিন্তায়। রাজনীতির চিন্তা নেই। রাজ্যের সমস্ত প্রান্ত থেকে টেনে ছিঁচড়ে সংগৃহীত হত ধন দৌলত, জলের মত বয়ে যেত রাজধানীতে। নগরী বিলাস-নিদ্রায় মগ্ন। শাহী মহলের মনোরম দ্রব্যসম্ভার নাদীর শাহের চোখে জাগায় লালসা। দরিদ্র ঘরে জন্ম তার। জীবন কেটেছে রণভূমিতে। ভোগ বিলাসের ইচ্ছা তার অজ্ঞাত। কোথায় রূপ-কৌশলের কষ্ট আর কোথায় সুখের সাম্রাজ্য। দৃষ্টি যেদিকে যায়—নিশ্চলক হ'য়ে থাকতে চায়।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। নাদীরশাহ, সর্দারের সাথে

ঘুরে বেড়াচ্ছেন চলে মহলে, সংগ্রহ করে চলেছেন নিজের পছন্দসই জিনিস। ক্রমে উপস্থিত হ'ল দেওয়ানী—খাস মহলে। সর্দ্দারদের চলে যেতে আদেশ দিলেন। উপবেশন করলেন কারুকার্যখচিত মসনদে। হাতিয়ার খুলে রেখে পুরী রক্ষককে ডেকে আদেশ করলেন,—"আমি শাহী বেগমদের নাচ দেখতে চাই। তুমি এখনই তাদের সুন্দর সজ্জায় সাজিয়ে আমার সামনে হাজির কর। খবরদার, একটুও দেরী না হয়। আর কোন ওজর আপত্তি আমি শুনতে চাইনা।

(২)

নাদীরশাহী আদেশ শ্রবণে স্তম্ভিত, ভীত হয় পুরী রক্ষক। যে বেগমদের 'পরে সূর্য্যের দৃষ্টি কখনও পড়েনি, প্রকাশ্য মজলিসে তারা কেমন করে আসবে! আর নাচ—সে অসম্ভব! শাহী বেগমদের এতখানি অপমান কখনও হয়নি। হা নরপিশাচ! দিল্লী নগরীকে রক্ত রাঙা করেও চিত্ত শান্ত হয়নি তোমার! কিন্তু অমুক্ত থেকে যায় কথাগুলো; নাদীরশাহের কথার আপত্তি জানানো আর আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া যে একই কথা মাথা নত করে কুর্নিশ জানিয়ে বেরিয়ে আসে সে। হারেমে এসে বেগমদের শোনায় নাদীরশাহী আদেশ। আরও সতর্ক করে দেয় এই বলে, একটুও যেন দেরী না হয়। কোন আপত্তি বা অস্বীকৃতি শুনবে না নতুন বাদশাহ্। শাহী বংশের 'পরে এমন ঘোর বিপত্তি কোনদিন দেখা দেয়নি,—কিন্তু এখন বিজয়ী বাদশাহের আজ্ঞা অবনত মস্তকে পালন করা ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় উপায় নেই।

নাদীরশাহী আজ্ঞা শ্রবণে বেগমরা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সমস্ত হারেমে নেমে আসে বিষাদের ঘোর কৃষ্ণ ছায়া। কল কোলাহল শান্ত হয়ে যায় নিমেষে। শত শত হৃদয়ে এই অত্যাচারীর জন্যে পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে অভিশাপ। আকাশের দিকে তাকায় কেউ সহায়তা যাচনার দৃষ্টিতে, কেউ স্মরণ করে খোদা রসুলকে। কিন্তু ছোরা, তরবারীর দিকে দৃষ্টি কারও যায়না—তেমন কোন নারী সেখানে নেই। অথচ এদেরই মত কত কত বেগমের শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে রাজপুত রক্ত। কিন্তু ইন্দ্রিয় লিপ্সা বুঝি শহরের পুরাণ আগুনকে নির্ব্বাপিত করে দিয়েছে! সুখভোগের লালসা বুঝি এমনি করেই আত্মসম্মানের সর্ব্বনাশ করে! পরামর্শ করে মর্য্যাদা রক্ষার, উপায় আবিষ্কারের সময় নেই। হতাশ হ'য়ে তারা বাদশাহের সম্মুখে যাওয়া স্থির করে। চোখে জল, বুকে হাহাকার, তবু অলঙ্কৃত করে তারা দেহবল্লরীকে, অঙ্গ আর নয়নে টেনে দেয় সুরমা। বাঁধা স্তন বুকের পরে সিঞ্চন করে সুগন্ধি বারি। কবরী বিন্যাস করে কেউ, কেউ গেঁথে নেয় সিঁথির 'পরে মুক্তার মালা। এমন কোন বীরাঙ্গনা নেই তাদের মধ্যে যে ঈশ্বরের 'পরে কিংবা নিজের সাহসের 'পরে নির্ভর করে আদেশ অমান্য করতে পারে। এক ঘণ্টায় বেগমী তাদের শেষ হ'য়ে যায়। দুমদুম্ ধ্বনি তুলে নাদীর শাহের সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তারা। বিচিত্র বস্ত্রভূষণ ঝলমল করে ওঠে, মুখকান্তি তাদের লজ্জা দেয় বেল, গোলাপের কুঁড়িকে। বাতাসে ছড়িয়ে যায় সুগন্ধ।

(৩)

আড়চোখে নাদীরশাহ দেখে নেন হুরীর দলটিকে, মসনদে হেলান দিয়ে অর্দ্ধশায়িত হ'য়ে বসেন। ছোরা ও তরবার রেখে দিলেন সম্মুখে। পলকে চোখ তার অর্দ্ধ নিমীলিত হ'য়ে আসে। আলস্যভরে পাশ ফিরলেন তিনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শোনা যায় তার গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ। মনে হয় গাঢ় নিদ্রায় তিনি অচেতন। আধঘণ্টার মধ্যে কোন সাড়া পাওয়া যায়না তাঁর। বেগমরা প্রাচীর বিলম্বিত চিত্রের মত নিথর। তাদের মধ্যে যারা চপলা—ঘোমটার আড় থেকে দেখে তারা নাদীরশাহকে—কানাকানি করে, কী ভয়ঙ্কর রূপ। কী রণোন্মত্ত চোখ! কি বিরাট দেহ! কেউ বলে, মানুষ নয়, দেবতা! সহসা নাদীরশাহের চোখ খুলে যায়। পরীর দল পূর্ব্ববৎ নিশ্চল, নিষ্পন্দ সসঙ্কোচে মাথা নীচু করে তারা। জলপিও তাদের নৃত্য করে সভয়ে—এখনি বোধ হয় নাচের আদেশ হবে। খোদা শয়তানের

সাজা দিন। জীবন গেলেও নাচতে তারা পারবে না। এর বেশী যে-ইজ্জতি সইতে পারবে না তারা।

সহসা ধ্বনিত হয় নাদীর শাহের বজ্রগম্ভীর স্বর—"ভদ্রীগণ, আমি তোমাদের পরীক্ষা করবার জন্ত এখানে ডেকেছিলাম। গভীর দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তোমাদের সম্বন্ধে যে সন্দেহ আমার ছিল তা' অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। প্রত্যেক জাতির মেয়েদের শীলতা জ্ঞানের অভাব, সে জাতির মৃত্যুই সূচিত করে। আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তোমাদের মধ্যে লজ্জাশীলতার কিছু অবশিষ্টাংশ আছে কিনা। সেইজন্তেই ডেকেছিলাম তোমাদের এই প্রকাশ্য দরবার কক্ষে। তোমাদের অপমান করতে আমি চাইনি। বিলাসের দাস আমি নই, তা যদি হ'তাম তাহ'লে আজ ভেড়ার পালে নিয়ে পারস্তের মাঠে মাঠে আমাকে ঘুরে বেড়াতে হ'তো। লিপ্সার পূজারী আমি নই, তা যদি হতাম তবে আজ পারস্তে বসে সম্রাট আর সেতারের ঝঙ্কার শুনতাম—যা আমার কানে হিন্দুস্তানী সঙ্গীতের চেয়ে অধিকমাত্রায় মধুবর্ষণ করতো। শুধু পরীক্ষা নিতেই আমি চেয়েছিলাম। লজ্জাশীলতার কণামাত্রও আর তোমাদের মধ্যে নেই। আমি দুঃখিত। পারোনি তোমরা আমার আজ্ঞা পদতলে দলিত করতে? তোমরা যখন এখানে এসে গেলে আরও একটি সুযোগ আমি তোমাদের দিলাম। ঘুমের ভাণ করলাম। তোমাদের মধ্যে কোন তন্বী কি পারোনি তখন আমার বুকে এই ছুরি আমূল বিঁধিয়ে দিতে। তোমাদের মধ্যে কাউকে যদি এই ছুরীর 'পরে হাত রাখতে দেখতাম তাহলে অত্যন্ত খুশী হতাম আমি। সেই কোমল বাহুলতার সামনে আমি মাথা নত করে দিতাম। কিন্তু [illegible] তৈমুর বংশের এমন একটি মেয়েও আজ এখানে নেই যে অপমানকারীর 'পরে হাত তুলতে পারে। এ সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী। এ সাম্রাজ্যের চিহ্ন অতি শীঘ্র দুনিয়া থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা যদি পারো—বাঁচাও এ সাম্রাজ্যকে; যদি না পারো তবে লিপ্সার সাগরে অচিরেই ধ্বংস হ'বে।'

• • •

একদিন সেই অতি প্রাচীনকালে—যখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষীণ রশ্মি জগতে ফুটে নাই, বিশ্ব যখন অন্ধতামসে আচ্ছন্ন, সেই আদিকালে—ভারতের আর্যাবর্ত্তে যে বেদগান গীত হইয়াছিল তাহার মধুর আকর্ষণে ভারতবর্ষ একপ্রাণ হইয়া গিয়াছিল—শ্রৌতযুগের সেই সাহিত্যিক একতা, সেই সংঘবদ্ধভাব, সেই চিরনবীন প্রেম, সেই বড় শ্রুতনীয় মিলন, আর কি হইতে পারে না? ভারতে আবার সেই সাহিত্যিক একতা, মনীষার সম্মেলন, একপ্রকার অসম্ভব—একথা বলিলে চলিবে না। সেই হারানো ধন আবার ফিরিয়া পাইতে হইবে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, সেই লুপ্ত রত্নের পুনরুদ্ধার করিতে হইবে বালের বশে চলিয়া আমাদের কালস্রোতে হইতে হইবে।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

গ্রাম বাংলা

আমাদের দেশ হচ্ছে আমাদের গ্রাম। শুধু আমাদের দেশ কেন—পৃথিবীর সমস্ত দেশের পক্ষেই এ কথা নিতান্ত সত্য। এক একটা দেশ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গ্রামের সমাবেশ।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে জানতে হলে যেতে হবে তার অগণিত গ্রামে, কারণ সেই গ্রামেই হচ্ছে আমাদের প্রাণকেন্দ্র। দেশের যা কিছু সম্পদ, যা কিছু শিল্প সংস্কৃতি ঐতিহ্য—মানুষের যা কিছু শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান গরিমা—সে সকলের ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম। গ্রামের মাটিতেই পড়ে আছে আমাদের প্রাণনাড়ী। মাটিতে নয়—মা এবং এই মার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক

গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছি আমরা গ্রামকে করেছি অবহেলা। গ্রামের ভিটে মাটি ছেড়ে শহরে এসে বাস করতে যেমন আমরা অভ্যস্ত হলেম—একদিকে গ্রাম যেমন অবহেলিত, উপেক্ষিত কাজেই শ্রীহীন হলো, অন্যদিকে আমরাও মরতে শুরু করলেম যেমন মার সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেলে সন্তান যায় মরে।

আজকের আমাদের যত দুঃখ কষ্ট দৈন্য দুর্দশা তার মূলে বর্তমান গ্রামকে অবহেলা করে গ্রাম ছেড়ে চলে আসা। এই গ্রামই একদিন ছিল জনশিক্ষার কেন্দ্র। এই গ্রামকে কেন্দ্র করে সেদিন মানুষ জ্ঞান-গরিমায় শিক্ষা-দীক্ষায় কর্মে ও ধর্মে গরীয়ান ও মহীয়ান হয়েছিল। গ্রামের যাত্রা কথকতা কীর্তন একদিন মানুষকে শুধু প্রচুর আনন্দ দানই করেনি, দিয়েছে অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান। জনশিক্ষার প্রাণস্পন্দন হয়েছে গ্রামেই।—তাই আজ সর্বত্রই রব উঠেছে "গ্রামে ফিরে যাও—গ্রামকে বাঁচাও"—তবেই বাঁচবে আমাদের দেশ। গ্রাণ চঞ্চল জীবন-যাত্রা, সত্যিকার সুখ-শান্তি মনের সরলতা প্রসারতা সমস্তই গ্রামের শান্ত-শীতল মধুর পরিবেশে জন্ম নেয় ও বেড়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু রচনার মাধ্যমে গ্রামের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে এবং গ্রামীন শিক্ষা দীক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির পক্ষমুখে প্রশংসা করেছেন এবং এদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তিনি বহুবার বহুভাবে বলেছেন জনশিক্ষার মূলকেন্দ্র—এবং সেদিনের সামাজিক ও ধর্মমূলক সকল অনুষ্ঠানের অবস্থান হল গ্রাম।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বহু সময় এই গ্রামোন্নয়নের কাজে অতিবাহিত করেছেন মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের গ্রাম যদি বাঁচে তবে কি তার মানুষ থাকবে বেঁচে, তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য তাঁর চেষ্টার শেষ ছিল না।

গ্রামকে অবহেলার ফলেই আমাদের হয়েছে সকল প্রকার দুঃখ ও দুর্গতি কাজেই আমাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কাজ হবে গ্রামের সকল প্রকার সংস্কার সাধন ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান। এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজ আর নেই যদি আমরা আমাদের দেশের কল্যাণ কামনা করি।

তাই পল্লীভারতীর পাতায় বহুদিন ধরে আমরা বিভিন্ন গ্রামের কাহিনী পরিবেশন করে আসছি। মুখে শোনা বা বইতে পড়া কাহিনী নয়—প্রত্যক্ষদর্শীর কাহিনী।

আর এক তীর্থ—রামকেলি

উৎপল চক্রবর্তী

এই সেই গ্রাম রামকেলি!

পাঁচশো বছর প্রাচীন, বিলুপ্ত রাজধানী গৌড়ের সন্নিহিত একদা-সমৃদ্ধ এক জনপদ, বৈষ্ণবজনের পরম পবিত্র এক তীর্থ—গুপ্ত-বৃন্দাবন।

আর এই সেই পথ, যে পথ ধরে একদিন গৌড়ে এসেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। সঙ্গে শত সহস্র ভক্ত। উত্তাল শ্রীখোলের তরঙ্গ আর মধুর হরিনামের সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছিল গৌড়ের বাতাস।

আর ঐ দূরে সেই কেলিকদম্ব বৃক্ষ যার তলায় বিশ্রাম করতে বসেছিলেন মহাপ্রভু আর যেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন গৌড়েরই দুজন রাজ কর্মচারী শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী!

আমি মালদহ শহর থেকে বাসে এসে নেমেছি গৌড়ের পিয়াসবাড়ীর মোড়ে। পিয়াসবাড়ী! এই নামের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন এক স্মৃতির গল্প। কাহিনী বলে, ঐ সেই পিয়াসবাড়ীর দীঘি যার পাড়ে ছিল গৌড়ের কারাবাস! তৃষ্ণার্তকে বন্দীদের জলপান করতে দেওয়া হতো না। শুধু তারা তাকিয়ে দেখত ঐ দীঘির কলকলানির হাতছানি। আর শেষপর্যন্ত ঐ ছলনার আহ্বান শুনতে শুনতে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে মারা যেত তারা। তাই এই জায়গার নাম পিয়াসবাড়ী! আর এই পিয়াসবাড়ী থেকে যে রাস্তা ডানদিক দিয়ে চলে গেছে গৌড়ের দিকে, সেই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই রামকেলি গ্রাম!

সেই রামকেলি! জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' এ যার সম্বন্ধে লেখা আছে,

'গৌড় নিকটে কুরুকেলি নামে গ্রাম।
তাহে ব্রাহ্মণ গোষ্ঠি ভুবনে অনুপাম।'

আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে লিখেছেন,

'ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি গ্রাম।
গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপাম।'

না। আজ আর 'অতি অনুপাম' নয়। রামকেলির মুখোমুখি দাঁড়ালে তার অতীত ঐশ্বর্যের এক ভগ্নস্তূপের সামনে দাঁড়ানোর বেদনায় অনুভূতিতে মন ছেয়ে যায়, ব্যথিত হয় কল্পনা। সুপ্রসিদ্ধ এই গ্রামের বর্তমান তীর্থশ্রীর অবয়ব যেন আধুনিক মানুষের এক নির্মম অবহেলার সাক্ষীর মতো অস্তিত্ব ঘোষণা করছে. ভক্তজনের এই তীর্থভূমি যেন বৎসরের বিশেষ একটি দিনের প্রতীক্ষায় মুমূর্ষুর মতো কাল গুনছে।

হ্যাঁ, বিশেষ একটি দিন। জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির সেই মহেন্দ্রক্ষণ, যখন চৈতন্যদেব পদার্পণ করেছিলেন এই গ্রামে!

সুবিখ্যাত হুসেন শাহ তখন গৌড়েশ্বর। প্রজানুরঞ্জক বিচক্ষণ পরমতসহিষ্ণু সম্রাট বসেছিলেন সিংহাসনে। চারিদিকে সভাসদবৃন্দ। এমন সময় তাঁর কানে এল এক তুমুল কোলাহল! এ কিসের কোলাহল! চকল হয়ে উঠলেন সম্রাট।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' লিখছে।

'কোটোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে
এক সন্ন্যাসী আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে।'

সেই সন্ন্যাসীর নাম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, আর এই কোলাহল তাঁর শিষ্যবৃন্দের কীর্তনের ফল কোটাল যাকে বললেন 'ভূতের সংকীর্তন'।

সম্রাট হুসেন শাহ তখন অন্যতম প্রধান আমাত্য কেশবখানকে নির্দেশ দিলেন সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহের। যথাযথ সংবাদ সংগ্রহের পর মহান সম্রাট জানালেন।

'যেখানে তাহার ইচ্ছা থাকুন সেখানে।
আপনার শাস্ত্রমতে করুন বিধানে।

সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তাঁর মন।

ঠিক এই ঘটনাই অন্যভাবে বিবৃত হয়েছে কবি কর্ণপুর এর 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকে। চৈতন্যদেবের গৌড় ভ্রমণের সহযাত্রী রায় রামানন্দ কর্তৃক প্রেরিত একজন দূত উৎকল রাজ প্রতাপরুদ্রকে বলেছেন,

'আমি শুনেছি ভগবান যখন গৌড়েশ্বরের রাজধানী থেকে গঙ্গাপারে যান, সেই সময় তাঁর পেছনের ও দু'পাশের চলন্ত লোকদের দেখে গঙ্গাতীরের চন্দ্রশালিকার অধিষ্ঠিত গৌড়েশ্বর। বিস্মিত হয়ে কেশব বসু নামে তাঁর অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে একী! এত লোক কেন?' তখন অমাত্য বললেন, 'সুলতান! শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামে একজন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম থেকে মথুরায় যাচ্ছেন তাকেই তাঁকে দেখতে এত লোক যাচ্ছে।' তাই শুনে গৌড়েশ্বর বললেন, 'ইনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর! নয়তো এত লোক আসবে কেন!'

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রামাণিক বিবরণ আছে সম্ভবত কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে। লিখছেন কৃষ্ণদাস,

'কেশব ছত্রীরে রাজা বার্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উঠাইয়া দিল॥

রূপ সনাতন

রূপ গোস্বামীর নামাঙ্কিত রূপসাগরের জলে স্নান করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এবার সনাতন সাগরে অবগাহন করবেন। পবিত্র হয়ে উঠবে রামকেলি গ্রামের আর একটি দীঘি। সমবেত হয়েছেন ভক্তবৃন্দ! এমন সময় এলেন স্বয়ং হুসেন শাহ। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মান জানালেন গৌড়েশ্বরকে। কিন্তু বিচলিত সুলতান অনুরোধ করলেন সনাতনকে—তিনি ও রূপ গোস্বামী যেন রাজকার্য ছেড়ে চলে না যান।

কিন্তু জানেন রূপ, এ শুধু অনুরোধ নয় রাজ আদেশ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁরই সঙ্গে পা বাড়ান নীলাচলের দিকে। যাবার সময় সনাতনকে বলে যান শ্রীগৌরাঙ্গ, সময় হলেই তাঁকে ডেকে নেবেন তিনি। রামকেলি ছেড়ে কীর্তনানন্দে বিহ্বল সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ ও রূপগোস্বামী সহ চলে যান, আর বিমূঢ় সুলতান কয়েদখানায় বন্দী করেন সনাতন গোস্বামীকে! রূপ গেছে যাক, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিশালী এই কর্মচারীকে তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না!

কিন্তু হায়! যিনি অনন্তের আহ্বান শুনেছেন, শাশ

ছিলেন সুলতানের নিকটেও। রামকেলির কেলিকদম্ব বৃক্ষতলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী তাঁর আর কি ক্ষতি করবে। এই ভেবে সমাদর করতে বলেছিলেন সেই কীর্তন-মুখর সন্ন্যাসীকে! কিন্তু তাঁরই অলক্ষ্যে ঐ কেলিকদম্ব বৃক্ষের নীচে তখন ঘটে গেছে এক মহৎ ঘটনা, যে ঘটনার বিষয় শুনে তিনি চমকিত হয়ে উঠলেন।

শুনতে পেলেন হুসেন শাহ, তাঁরই দুই রাজকর্মচারী সাকর মল্লিক ও দবীর খাস (রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী) সাক্ষাৎ করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে। আর সেই সাক্ষাৎকারের ফলে ঘটে গেছে এক অলৌকিক ঘটনা। সেই হরিনাম প্রেমে পাগল সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে এসে তাঁরা দুইভাই সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেছেন। রাজকার্যে আর তাঁদের মন নেই। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা! সেই দুর্লভ মুহূর্ত এলে দুজনেই রাজকার্যের অসংখ্য নাগপাশ কেটে বেরিয়ে যাবেন অমৃতের সন্ধানে।

রূপ গোস্বামীর নামাঙ্কিত রূপসাগরের জলে স্নান করেছেন শ্রীগৌরাঙ্গ। এবার সনাতন সাগরে অবগাহন করবেন। পবিত্র হয়ে উঠবে রামকেলি গ্রামের আর একটি দীঘি। সমবেত হয়েছেন ভক্তবৃন্দ! এমন সময় এলেন স্বয়ং হুসেন শাহ। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্মান জানালেন গৌড়েশ্বরকে। কিন্তু বিচলিত সুলতান অনুরোধ করলেন সনাতনকে—তিনি ও রূপ গোস্বামী যেন রাজকার্য ছেড়ে চলে না যান।

কিন্তু জানেন রূপ, এ শুধু অনুরোধ নয় রাজ আদেশ। তাই শ্রীগৌরাঙ্গের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁরই সঙ্গে পা বাড়ান নীলাচলের দিকে। যাবার সময় সনাতনকে বলে যান শ্রীগৌরাঙ্গ, সময় হলেই তাঁকে ডেকে নেবেন তিনি। রামকেলি ছেড়ে কীর্তনানন্দে বিহ্বল সন্ন্যাসী ভক্তবৃন্দ ও রূপগোস্বামী সহ চলে যান, আর বিমূঢ় সুলতান কয়েদখানায় বন্দী করেন সনাতন গোস্বামীকে! রূপ গেছে যাক, কিন্তু প্রখর বুদ্ধিশালী এই কর্মচারীকে তিনি কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না!

কিন্তু হায়! যিনি অনন্তের আহ্বান শুনেছেন, শাশ

পেয়েছেন অমৃতের, মর্ত্যের কোন বন্ধন কি আর আটকে রাখতে পারে তাঁকে।

কারাগার প্রহরী হাবসেখকে উৎকোচ বশীভূত করে সনাতন একদিন ঝাঁপ দিলেন গঙ্গার জলে! ভাসলেন অমৃতপুরীর দিকে। শ্রীচৈতন্যের সদ স্পর্শ লাভের ব্যাকুল বাসনায় জানলেন না কোন মায়ার বন্ধনের অস্তিত্ব!

হাজার উটের রামকেলি গ্রামের বাতাসে বুকভাঙা ক্রন্দনের সুর ছড়িয়ে পড়ল সনাতনের গৃহে! তারপর একে একে সবই নীরব হয়ে গেল! কালের হাতে ঘুচে গেল সব জাগতিক মায়ার বন্ধন বন্ধনের ঘটনা।

শুধু অতীতের সাক্ষীর মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইল সেই গ্রাম রামকেলি আর পুণ্যাত্মা দুই ভাইএর স্মৃতিভরা দুই দীঘি রূপ সাগর আর সনাতন সাগর—শ্রীগৌরাঙ্গের পবিত্র অঙ্গস্পর্শে পূত যার জল।

এই সেই রামকেলি গ্রাম! আজ কোনও আর সেই-রূপ প্রাসাদের চিহ্ন নেই। শুধু অদূরে গৌড়ের জঙ্গলের আড়ালে বিশাল এক প্রাচীর এক সুলতানের গর্বোদ্ধত সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে! আর আছে সেই কারাগার! যেখানে একদা সনাতনকে বন্দী করে রেখেছিলেন সুলতান হুসেন শাহ!

কিন্তু সেই রূপ বা সনাতনের বাড়ীর কোন চিহ্ন। এখনো অশ্রুকারে উজ্জ্বল রূপ সাগর আর সনাতন সাগরের পাড়ে আছে তাঁদের ভিটের চিহ্ন!

আর আছে সেই কেলিকদম্ব বৃক্ষ, যার নীচে একদিন এক মহা সম্ভাবনাময় সাক্ষাৎকার ঘটেছিল শ্রীচৈতন্যদেব ও দুই ভক্ত রূপ ও সনাতনের। সে গাছের গোড়া বাঁধিয়ে এখন একটি মন্দির করে দেওয়া হয়েছে। এর ভেতর সংরক্ষিত আছে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রস্তরকোরিত পদচিহ্ন। ভক্তজন তাতে পূজা দেন। তার সম্মুখে আর একটি বাঁধানো আসন। শ্রীচৈতন্যদেবের সমকর্মী শ্রীনিত্যানন্দের আসন। আর কেলিকদম্ব ছাড়িয়ে কিছুটা এগোলেই মদনমোহনের মন্দির। এখানে পূজিত হচ্ছেন রূপ সনাতনের বিগ্রহ রাধা মাধব!

চমৎকার স্নিগ্ধ এক ঠাকুরবাড়ী! নিত্য ভোগ হয়। সন্ধ্যায় পুষ্পারতি। অতিথিশালা আছে। সম্মুখে দুটি পুষ্করিণী আছে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড।

প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন থেকে ১০দিন ব্যাপী মেলা বসে এখানে। রামকেলির মেলা। দেশ বিদেশের বৈষ্ণব ভক্তজন ভিড় করেন এখানে এ সময়। হরিনাম আর কীর্তনের সুরে মুখর হয়ে ওঠে পাঁচশো বছর আগের রামকেলি। এই দিন শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন এ গ্রামে। তাঁরই স্মরণে এই মেলা।

সারি সারি কুটির শিল্পের পসরা সাজিয়ে বসেন বিক্রেতারা। গৌড়ের বড় সোনামসজিদ পর্যন্ত রাস্তার দুধারে অসংখ্য পণ্যের মেলা! থাকে সার্কাস, ম্যাজিক! সরকারী ব্যবস্থাপনায় পানীয়জল সরবরাহ করা হয়।

দূরদূরান্তের বৈষ্ণবজন প্রতীক্ষা করে থাকেন এই কটি দিনের জন্য।

এখন আষাঢ় মাস! পুরোদমে চলছে রামকেলির মেলা! মালদহ শহর থেকে ন মাইল দূরের এই অবহেলিত গ্রাম অতীত বৈভব আর ঐশ্বর্যের ক্ষণিক প্রকাশে বিহ্বল হয়ে ওঠে।

মনে হয়, প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ গ্রাম নতুন বাংলার মানুষের কাছে দেশের অতীত গরিমার এক পুণ্যছবি তুলে ধরে যেন ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলে।

অমন ভেবে মরছেন কেন

শ্রীমন্ত্রী

—নমস্কার। কেমন আছেন?

—ভালো। আপনি?

—ভালো আছি।

ভালো আছি। ভালো আছি। রাস্তায় পা রাখলে চারদিক থেকে মানুষের মুখে ফুটে ওঠে ভালো আছি! কেউ বিনীত হাসিতে, কেউ সরব ঘোষণায়, কেউ নীরব ইঙ্গিতে, কেউ অমায়িক সৌজন্যে, কেউ দাম্ভিক গাম্ভীর্যে, কেউ বা নিতান্ত বিরক্ত মুখে দ্রুত কর্তব্যপালনের ভঙ্গীতে পরস্পরকে জানিয়ে দিচ্ছেন, ভালো আছি। আমরা সবাই ভালো আছি!

আমরা সবাই তবে ভালো আছি?

কারো কোন উদ্বেগ নেই, দুশ্চিন্তা নেই, সমস্যা নেই, সহজ সরল স্বচ্ছল আনন্দময় জীবন যাপন করছি সবাই?

বিশ্বাস করে নিন ওই ভালো আছেন যাঁরা তাঁদের যে কোন একজনকে। শুনতে পাবেন, একটা নেকথার পরই সেই মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাসের হাত হিম করা শব্দ আর হতাশায় ভেঙে পড়া এমস্থিক স্বগতোক্তি—

—আর পারা যায় না! আজ এটা নেই কাল সেটা নেই ছেলের ইস্কুলের মাইনে, মেয়ের বিয়ের চিন্তা, বাড়ীভাড়া দুধ কয়লা কেরোসিন ধুতি শাড়ী প্যান্ট ফ্রক—ওফ্! এভাবে বেঁচে থাকা যায় মশাই?

না যায় না। তবু সবাই বেঁচে আছেন! অন্তত বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এবং পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে সেই প্রাণান্তকর প্রয়াস যতদূর সম্ভব ঢেকে রেখে দিব্যি একগাল হেসে বলছেন, ভালো আছি!

একটু স্থির চোখে তাঁকে দেখুন একবার। যদি প্রসাধনচর্চিত থাকে সেই মুখ, দেখবেন চূর্ণকামের চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে ঘন অন্ধকার—সে আঁধার আলোর অধিক! যদি না থাকে প্রসাধনের ছদ্মবেশ দেখবেন তবে সে মুখের আপাত প্রসন্নতার উপর মাকড়সার জাল বুনছে কয়েকটি জটিল রেখা—সে রেখা দুশ্চিন্তার উদ্বেগে আশংকায় অস্বস্তিতে নিবিড় হয়ে উঠছে ক্রমশ।

হ্যাঁ দুশ্চিন্তা। এবং উদ্বেগ। এবং আশংকা আর এ সবের জন্যই এক অনিবার্য অস্বস্তি।

কিসের দুশ্চিন্তা, কিসের উদ্বেগ, কেন আশংকা?

কয়েকদিন থেকেই দেখছিলাম আমার ভাগ্নে টুকুস পরীক্ষা দেবার পর থেকে বড় বেশী ভগবদ্ভক্ত হয়ে পড়েছে! সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রার্থনা করে, বিড় বিড় করে কি যেন বলে।

একদিন প্রবল কৌতূহলে শ্রবণশক্তি সংহত করে ওর প্রার্থনা শুনতে গিয়ে চমকে উঠলাম। আকুল আবেদন করছে টুকুস,

—হে ভগবান, তুমি দয়া করে কলকাতাকে ভারতের রাজধানী করে দাও

প্রার্থনা শেষে বেরিয়ে আসতেই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,

—তুই ভগবানের কাছে অমন প্রার্থনা করছিস কেন রে?

একটু সলজ্জ ভঙ্গীতে টুকুস উত্তর দিলে,

—আমি পরীক্ষার খাতায় ভুল করে তাই লিখে এসেছি যে!

আমি খুব জোরে হেসে উঠতে গিয়ে থমকে গেলাম। ওর মুখে সলজ্জতা চাপিয়ে গাঢ় ছায়া ফেলেছে দুশ্চিন্তা! তার ভারে সে সত্যিই কাতর। কৈশোরের লাবণ্য কেমন মলিন হয়ে গেছে, ভাসা চোখের ওজ্জ্বল্য ক্রমশ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে! আমার মায়া হলো। বললাম,

—অতো ভাবছিস কেন? ভুল তো হতেই পারে!

—তুমি জানো না মামা,

টুকুল উদ্বেগে অস্থির গলায় বললো,

—কেন করলে যে কি হবে আমি ভাবতেই পারছি না আমার বলে রাত্তিরে ঘুমই হচ্ছে না ভাবনায়—কিন্তু ভাল্লাগছে না—

মনে পড়ছে, গত বছর পূর্ববাংলায় পাকিস্তানী সৈন্যদের বীভৎস অত্যাচারের শিকার হয়ে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হয়ে ভারতে চলে আসছেন তখন কয়েকদিন কি নিদারুণ উৎকণ্ঠায় দিন কেটেছে আমাদের! বিশেষত যাঁদের আত্মীয়পরিজন ছিলেন ও-বাংলায় তাঁরা প্রতিদিন রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করেছেন একটি শুভসংবাদের আশায়—ছিন্নমূল মানুষেরা ভিড় করছেন!

আমার ছোটমাসী ছিলেন গাইঘাটা শহরে। যেদিন খবর এল পাকসৈন্য ঐ শহরে ঢুকেছে সেদিন সারা চোখে ঘুম এল না। মামাবাড়ীর কারো চোখেই ঘুম এল না সেই রাতে! শুধু সেই রাতেই নয়, পরদিন থেকে প্রতি মুহূর্তেই এক দুঃসহ দুশ্চিন্তার উদ্বেগে কণ্টকিত হয়ে উঠেছে! প্রায় একমাস ধরে চলেছে নানা সূত্রে সাবধানে খবর সংগ্রহের চেষ্টা, অবশেষে একদিন প্রায় অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্পূর্ণ রিক্ত হাতে যখন তারা পা রেখেছেন বাড়ীর উঠোনে তখন আচমকা উদ্বেগ নিশ্চিহ্ন করার উত্তেজনায় স্তম্ভিত বাক্যহারা হয়ে গিয়েছেন সবাই! সে রাতেও ঘুম আসে নি কারো চোখেই।

কলেজে ঢুকতেই অধ্যক্ষ ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলাম, তাঁর চোখ মুখ কেমন বিবর্ণ, দুশ্চিন্তার ভারে মাথাটা যেন নুয়ে পড়েছে সামনের টেবিলের উপর। আমার পায়ের শব্দে স্পষ্টতই চমকে উঠলেন।

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম,—আমাকে ডেকেছেন!

যেন ডুবন্ত মানুষ হাতের মুঠোয় খড়কুটো পেয়েছে এমন ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন।

—আপনি এসেছেন! খবর শুনেছেন?

অস্পষ্টভাবে কিছু শুনেছিলাম। পুরোটা জানবার জন্যে বললাম,

—কি বলুন তো?

—আজ ছাত্রেরা নাকি বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আমাকে ঘেরাও করবে! কি করি বলুন তো?

কি বলব আমি! ঘেরাও করা বা ঘেরাও হওয়া কোনটার সঙ্গেই আমি যুক্ত নই। তবু সহকর্মীর এমন বিপদে পিছু হঠতে বিবেকে বাধে। বললাম,

—এত ভাবছেন কেন? ও সব ঠিক হয়ে যাবে!

—ভাববনা, বলেন কি মশাই! ভাবনায় বলে কদিন থেকে আমার নাওয়া খাওয়া বন্ধ। আপনি বলছেন ভাবব না! ভাল্লাগে না মশাই!

ভোম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—কি রে তোর ব্যবসা কেমন চলছে?

চোখের চশমার আড়ালে তার দৃষ্টি হতাশা করে পড়ছে যেন দেখতে পেলাম বললে,

—বড় দুশ্চিন্তায় আছি এতগুলো অর্ডার পেয়েছি, অথচ মাল ঠিক মতো সাপ্লাই করতে পারব কি না বুঝতে পারছি না! পারলে কোম্পানীর গুড-উইল একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। এখন খরার সীজনে পাম্পগুলো ঠিক মতো দিতে পারলে খুব কাজ হতো! কিন্তু....

—আবার ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি।

পার্থ হাসতে চেষ্টা করল, কিন্তু স্পষ্ট দেখলাম ও প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছে!

—এই নিয়ে কতবার যে হলো। অথচ আমি একজন পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার! এবার যদি না হয় তাহলে—

সত্যি কিছু ভালো লাগে না—

রাত এগারোটায় বাড়ী ফেরে চেয়ারে গা এলিয়ে দিল সুদীপ্ত। সারা শরীর জুড়ে ক্লান্তি আর বৈরাগ্য!

—হলো না আজকেও। স্কুল কমিটি এবারের মিটিংএও কোন সিদ্ধান্ত নিলো না আমার পোষ্টটা পার্মানেন্ট করবে কি না! এত অনিশ্চয়তা নিয়ে আর চাকরী করা যায় না! অথচ ভালো একটাও পাচ্ছি না! কি যে হবে ভাল্লাগে না আর....আর ভাবতে পারা যায় না।

—আর ভাবতে পারি না।

ভাবনার সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই-এ হেরে গিয়ে আত্মহত্যায় নিশ্চিন্তিতে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন অসংখ্য মানুষ,

দুশ্চিন্তার জটিল জালে পথ হারিয়ে সুস্থ চিন্তা ক্ষমতা লুপ্ত হয়ে পাগল হয়ে গিয়েছেন কত অসহায় মানুষ।

উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার দুর্বিসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শারীরিক ও মানসিক রোগে পীড়িত হয়ে পড়েছেন কতজন।

বিংশ শতাব্দীর এই শেষ প্রহরে, একদিকে যখন সভ্যতার রথের রশিতে হাত লাগাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মানুষ তখন আর একদিকে পৃথিবীব্যাপী এক অশান্তির পাপস্পর্শে সকলের চিত্ত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে

—পৃথিবীর ভীষণ অসুখ এখন

কবি জীবনানন্দ একবার যে সত্য উচ্চারণ করেছিলেন, আমাদের চারপাশে যত মানুষ আছেন তা সে যে দেশের অধিবাসীই হোন না কেন, তাঁদের দেখলে সে-সত্য আর একবার প্রমাণিত হয়!

সকলেই অসুস্থ। মানসিক উদ্বেগ উত্তেজনা দুশ্চিন্তা উৎকণ্ঠায় ভয়ানক ভাবে আক্রান্ত। নানাবিধ আশংকার কীট ভয়ংকর ভাবে কুরে কুরে খেয়ে ফেলছে সকলের শক্তি।

তাহলে কি কোন পরিত্রাণই নেই! এইভাবে ক্রমশ দুশ্চিন্তার ভাবেতে গড়িয়ে পড়ে মানুষ আত্মহননের পথ বেছে নেবে, মিথ্যে কথার আড়ালে নিজেরই মন ভুলিয়ে অপরকে ভোলাবার হাস্যকর প্রয়াস করে চলবে।

—আমি ভালো আছি!

এবং একটু পরেই সমস্বরে বলে উঠবে ভালো লাগে না—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার পংক্তি আবৃত্তি করবে বারবার—কিছুই আমার ভালোগে না!

দেখা হতেই বন্ধু কাশীনাথ বললে,

—কিরে তুই নাকি মাইনে পাসনি তুমাস?

স্বীকার করলাম ঘাড় নেড়ে। সত্যিই!

—তবে চলছে কি করে?

—চলছে না

—তাহলে!

—চলবে একসময়। ঐ নিয়ে অত ভাবছি না।

—সে কি রে! তোর কি মাথা খারাপ হলো নাকি?

—অত্যন্ত সুস্থ আছে মাথা, এটা তারই লক্ষণ। তাহলে রহস্যটা খুলেই বলি তোকে—

মিষ্টার কেরিয়ারের সেই গল্পটি বললাম তাকে। তিনি ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। থাকতেন নিউইয়র্কে। তিনি প্রচুর টাকা খরচ করে পরিশুদ্ধ গ্যাস তৈরীর একটি উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন—আশা ছিল এই ভাবে তৈরী গ্যাস মেশিনের কোন ক্ষতি করবে না। ব্যাপারটা পরীক্ষিত সত্য ছিল—তবু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, যেমনটি তিনি দেখেছিলেন তা বাস্তব ক্ষেত্রে হচ্ছে না। প্রচুর অর্থ এবং সুনাম এভাবে নষ্ট হওয়াতে তিনি ভেঙে পড়লেন চোখে ঘুম নামে না, দুশ্চিন্তায় শরীর খারাপ হতে শুরু করল

অবশেষে একদিন ভাবলেন, শুধু দুশ্চিন্তা এই সমস্যা সমাধানের উপায় নয় একেবারে নিরুদ্বেগ হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আবার একবার চেষ্টা করবেন, এবং নিরুদ্বেগ হবার জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। প্রথমত, তিনি সমস্ত ব্যাপারটি একবার ভেবে নিয়ে দেখলেন এই ঘটনার ফলে কতদূর ক্ষতি হতে পারে তাঁর। এই চিন্তা করতে গিয়ে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারালেন না। জেল খাটা ফাঁসী হবে না তবে সুনাম ও টাকা নষ্ট হবে কিছু।

দ্বিতীয়ত, চূড়ান্ত ক্ষতির কথা ভেবে নিয়ে তাকে বরণ করার জন্য তিনি মনে মনে প্রস্তুত হলেন। এ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উপায় আপাতত নেই। এই ক্ষতি মেনে নিতেই হবে, অর্থ ও সুনাম নষ্ট হয়ত হবে তবে আবার চেষ্টা করে তা ফিরিয়ে আনা যেতে পারে যেহেতু কাজটা পুরোটাই পরীক্ষামূলক ছিল।

তৃতীয়ত, যখন ক্ষতি হবেই ধরে নেওয়া গেছে এবং মানসিকভাবে তা গ্রহণ করার প্রস্তুতও হওয়া গেছে এবার নিরুদ্বেজিত মন নিয়ে ভুল যা হয়েছে তা কি ভাবে সংশোধন করা যায় তার কথা ভাবতে হবে।

বস্তুতপক্ষে এই তিনটি পথ অবলম্বন করে যখন

দুশ্চিন্তামুক্ত হওয়া গেল তখন নতুন উদ্যমে কাজ শুরু হলো এবং কিছুদিন পর তিনি ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করলেন। দুশ্চিন্তাই এতদিন তাঁর কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করছিল। এখন সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ তিনি।

আমিও তাই নিশ্চিন্ত। দুশ্চিন্তা এলেই প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞাসা করি,—এর থেকে সবচেয়ে ক্ষতিকর কি হতে পারে?

দ্বিতীয়ত—সেই ক্ষতি স্বীকার করার জন্য মনকে তৈরী করি।

তৃতীয়ত—তারপর ক্রটি মুক্ত হবার জন্য বীরেন্দ্রের এগোই।

আমি জানি, দুশ্চিন্তা মুক্ত হবার জন্য এটাই সহজতম পথ।

বন্ধু অবিশ্বাসের সুরে বলল,

—এভাবে দুশ্চিন্তা মুক্ত হওয়া যায়?

—চেষ্টা করে দ্যাখ একবার মনে হয় সফল হবি।

হাঁ। সফল হবেন দুশ্চিন্তার দিন যখন শেষ হয়ে আসছে সারা শরীর তখন নীলকণ্ঠের শক্তি অর্জন করল।

'যা হবার তাই হবে'—রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গানের কলিটি স্মরণ করুন গেয়ে উঠুন সেই গান।

—তা বলে ভাবনা করা চলবে না

দেখবেন দুশ্চিন্তা কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে! সংগত শ্লোক বলে যতক্ষণ ভয় অনাগত থাকে ততক্ষণই ভয়, এলে কিছুই নয়। এও তাই। যা নিয়ে দুশ্চিন্তা তার মুখোমুখি হবার আগেই ভেঙে পড়লে সে আপনাকে গ্রাস করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, চাতকপাখি কিনে যেমন গাছের ডাল থেকে পাখিরা উড়ে যায়, চিন্তিত করলে তেমনি পাপপাখী সব উড়ে যায় কিন্তু সে তো সর্বস্ব সমর্পণের সেই কঠিন সাধনা দুশ্চিন্তা মুক্ত হবার সর্বোত্তম পন্থা।

সে সাধনার যতটুকু দিক্‌চিহ্নিত না হচ্ছে, সে পথে না যাচ্ছি তখন ঐ তিনটিই দুশ্চিন্তামুক্তির সহজ-গম্য পথ

সে পথে চলতে আর বলতে বিজয় হাসিমুখে ডেকে কষ্টকরে উচ্চারণ করতে হবে না

—ভালো আছি,

সবাই হৃদয়ের অন্তরতম থেকেই পরস্পরকে জানাবেন

—আমরা ভালো আছি।

আজো পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত, ক্ষুব্ধ-অশান্ত। আনবিক যুদ্ধের আতঙ্ক আজো সম্পূর্ণ দূর হয়নি পৃথিবী থেকে। ইতিহাসের উষাকাল থেকেই ভারতবাসী শান্তির উপাসক। এই দেশ থেকেই একদিন উচ্চারিত হয়েছিল তথাগত বুদ্ধের মৈত্রী ও করুণার বাণী। এদেশেরই রাজা অশোক চেয়েছিলেন যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তারপর শ্রীচৈতন্য-শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাধনা সেই শান্তির আদর্শ ক'রে তুলেছে আরো জ্যোতির্ময়। ভারতের সেই প্রাচীন ঐতিহ্য অনুধাবন করেছিলেন যখন শোপ কয়েক বৎসর পূর্বে এসেছিলেন ভারতে। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়েই তিনি যেমন অভিভূত হলেন, আনন্দ পেলেন, নতুন প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত হলেন কোন দেশে গিয়ে এমনটি তিনি হতে পারেন নি। যাবার বেলায় তিনি বলেছিলেন আমি ভারতবর্ষকে কোন দিনই ভুলতে পারব না। মনে হচ্ছে বজ্রসন্ধ্যার আকাশে ভারত সেই প্রথম তারা যে আবার নতুন করে বিকীরণ করতে শুরু করেছে শান্তির স্নিগ্ধরশ্মি।

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কয়েকটা ঘর পেরিয়ে পরীক্ষিৎ একটা শোবার ঘরে এসে ঢুকল। সেখানে খাটের ওপরে সুমিত্রা পাশ ফিরে আদুরের মত চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। খাটের কাছেই একটা রাইটিং টেবিল আর তার ওপরে ওর একটা হাত পড়ে রয়েছে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম—বড় একটি টি-পট, নক্সা-তোলা বিলেতি দামী সেট,—তিনখানি কাপ-সসার, তিনটি ঝকঝকে চামচ। আরেকটি বড় ডিসে কিছু প্যাস্ট্রি, খান কয়েক কেকের স্লাইস। তাছাড়া তিনখানি কোয়ার্টার সাইজ ডিসে তিনটি ম্যাগনাম অমলেট। কাছেই দুতিনটি বই আর পাশে একটি মাত্র খালি গ্লাস।

দোতালায় এত ঘর থাকতে সুমিত্রাকে কি নীচে এসে থাকতে হচ্ছে? এটা কি সুমিত্রারই ঘর? শোবার ঘর? দেখে তাই মনে হয় বটে।

বাড়ীর সকলেই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। সিলিংয়ে বন্ বন্ করে ফ্যান চলা সত্ত্বেও একটি উনিশ-বছরের মহিলা ওর মাথার পাখার বাতাস করছে—অডিকোলনের গন্ধ বাসী রোগীর রুগ্নতার স্মৃতি ছড়িয়ে তাজা বাতাসকে কাহিল করে দিয়েছে।

পরীক্ষিৎ আলগোছে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে রইল। সবচেয়ে আগে নজরে পড়ল একটি খালি গ্লাস।

কি ছিল ওতে?

একটি পায়ের দিকে তার দৃষ্টি গেল।

খাট ছাড়িয়ে একটা পায়ের খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে,—সে-পায়ে শাড়ীটা একটু ওপরে ওঠানো। পায়ের আঙুলগুলোও মুড়ে রয়েছে—কেমন যেন রক্ত-শূন্য—আঙুলের ডগাগুলো ফোরেসেন্ট লাইটে নীল দেখাচ্ছে যেন।

ওগুলো কি মরা আঙুল?

বুকের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দিকে লক্ষ্য করল পরীক্ষিৎ। কিন্তু নিশ্বাস পড়ছে কিনা সেটা ভাল করে দেখবার আগেই পরীক্ষিতের দৃষ্টিকে আছাড় দিয়ে আঘাত করল ওর শাড়ীতে আঁটকা আঁটো সাঁটো ফিকে হলদে রঙের ব্লাউসের একটি অচেতনা, ধস্ত ও নির্বিঘ্ন নির্লজ্জতা। পরীক্ষিতের সমস্ত মন ঘনীভূত হয়ে ছুটে গিয়ে ওর শরীরের অন্তরালবর্তী গোপনীয়তাকে এতগুলো লোকের চোখের সামনে থেকে শাড়ীর আঁচল টেনে ঢেকে দিতে চাইল।

কৌতূহলের লোলুপতা ও মজার ব্যাপার দেখবার আগ্রহে যারা এ-ঘরে এসেছে তারা প্রত্যেকেই সুমিত্রার কাজে হাত লাগিয়ে বসে আছে। ঘর খালি করে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়াও এখন নিতান্ত রূঢ় ও অবাস্তব করে তুলেছে ওরা।

ডাক্তার কিন্তু কারো সাহায্য চাইলেন না।

নিজেই অন্য একটা ঘর থেকে অষুধ এনে সুমিত্রাকে খাওয়ালেন, টামলার থেকে জল নিয়ে একটা গ্লাস ভরলেন, খালি গ্লাসটা মাথের কাছে তুলে ধরলেন একবার এবং উঠে গিয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন, হাত-পায়ের ডগাগুলো একবার টিপে পরীক্ষা করলেন, আলনা থেকে একটা ব্যাগ এনে ওর পায়ের উপর ফেলে দিলেন।

টেথিস্কোপ কানে লাগিয়ে বুক পরীক্ষা করে নাড়ী দেখলেন ওর হাতে। তারপর ওর পাশে আড় হয়ে বসে একটা ইনজেকসন দিয়ে পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে বললেন,—

"এ-রকম হিষ্টিরিক্যাল ফিটস্ মাঝে মাঝে হয় অবিশ্যি কিন্তু আজ একটু বেশী। ইমোশানেল ডিস্টারবেনস্ হলেই এ-রকম হতে দেখেছি দু-একবার। বড্ড ইমোশানেল তো।—বোধহয়—যাকগে।—না। ভয়ের কিছু নেই, দু-চার মিনিটেই সেরে উঠবে।"

পাশের বাথরুম থেকে সিরিঞ্জটা সাফ করে ব্যাগে রেখে এবার বাড়ীর লোকদের দিকে তাকালেন। হঠাৎ ইলেকট্রিক আলোকে ওর সাদা ক্রেঞ্চ-কাট দাড়ি ঈষৎ একটা ভঙ্গী করে উঠল,—

"কেন হল এ-রকম জানো কিছু তোমরা?"

বড় ভাইপো উমেশের চোখ দুটো পিট পিট করে উঠল,—

"আমরা মানে আমি?"

"না। না। তোমাকে আমি বিশেষ করেই বলছি না। তোমাদের মধ্যে যে কেউ?"

উমেশের স্ত্রীর পাখা নাড়ানোর দ্রুততা হঠাৎ ঢিলা হয়ে গেল। খাটের কাছ থেকে একটু সরে এসে কি যেন বলতে চাইল সে। আর স্ত্রীর অভ্যন্ত ভঙ্গী দেখে উমেশের শঙ্কিত দাঁতের পাটি কামড়ে চেপে ধরল তার অবাধ্য নীচের ঠোঁটখানি—যেন চেপে বন্ধ করে দিতে চাইল তার ঠোঁট-কাটা স্ত্রীর প্রগলভ বুদ্ধিকে। কিন্তু স্বামীর দিকে এক ঝলক তাকিয়ে উষা তার সতর্ক সঙ্কেতকে অগ্রাহ্য করে বলে উঠল,—

"উনি কিন্তু বড্ড বাড়াবাড়ি করেন সব বিষয়েই।"

তালুকদারের চোখ দুটো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল,—

"কৈ। তা তো জানতাম না।"

"খেয়াল করেননি—কিন্তু করেন, বেশ বাড়াবাড়িই করেন।—লক্ষ্য করবেন এবার থেকে।"

"এবার থেকে করবো। মনে থাকবে তোমার কথা। —কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে?"

"দেখেছি তো এ-কয় মাস। অনেক বিষয়েই দেখেছি!"

"যথা—!"

"যথা? এই তো মাসখানেক আগের কথাই ধরুন না! কোন্ দুটি বাচ্চা বাচ্চা অজানা-অচেনা ছেলেমেয়েদের জন্যে ষাট টাকা দামের উল কিনে কোট আর ফ্রক বুনছেন—সেই থেকে চলছে—রাতদিন! রাতদিন তো এইনিয়েই আছেন দেখতে পাই। অথচ যাকে বুনে দেওয়া দরকার,—যার জন্যে এত—সেদিকে তো দৃষ্টি আছে বলে মনে হয় না!"

"তাই নাকি?"

"আপনার গায়ে একটা ভালো সোয়েটার নেই—সবগুলোই পুরোনো—অথচ কী চমৎকার হাত ওর—"

উমেশ এবার খেঁকিয়ে উঠল,—

"যত সব বাজে কাজ।"

"কেন? বাজে কেন? এটা বাড়াবাড়ি নয়?—যা করবেন, তা না হলেই চলবে না।—আর এই কয়েই তো.....এতটা কি ভালো? রোগ আর সারবে কিসে? বেড়েই তো যাবে দিনকে দিন! পেয়ে পেয়ে ওর এমন হয়েছে—না-পেলে বেশ অসন্তুষ্ট হন। কি একটা বই কিনে আনতে বলেছিলেন তিনদিন হল ভূপেনকে। ছেলেমানুষের বুদ্ধি তো!—ওর কাজটা ভুললে চলে? ও প্রত্যেকদিনই ভুলে যায়। যাচ্ছে তো কলেজ করতে কলেজ ষ্ট্রীট পাড়াতে প্রত্যেকদিন—বইটা আনতে কি হয়?—ভুল।"

ডাক্তার বললেন,—

"ছেলেমানুষের এত ভুল হবে কেন?—কি বই?—বইটা এনেছে?

"এইমাত্র ফের কলেজ ষ্ট্রীটে গিয়ে নিয়ে এলো।—রাগ করা অবিশ্যি উচিত হয় নি ওর—তবু রাগ তিনি নিশ্চয় করেছিলেন।"

"কি করে বুঝলে!" ডাক্তার তালুকদার এই বেশী কথা-কইয়ে সবজান্তা ফাজিল মেয়েটার দুষ্টতাকেই যেন প্রশ্ন করলেন।

"মুখে তো কিছু বলেন না!" হঠাৎ উষার নজরে পড়ল দু-নল-ওয়ালা দূরবীনের মত দুটি চোখ দিয়ে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক তাকে এবং তার কথাবার্তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করছে। যা বলতে যাচ্ছি তা দিলে ফেলে মহিলাটি অন্য কথা বলল,—

"একটু মুখ তার ভার ;—এই আর কি!"

"এমন কি বই, যার জন্যে সুজাতা তিনদিন ধরে তাগাদা দিচ্ছে? উল বলে বদ্ধ কথা ছিল। তার একটা অর্থ হয়!"

ডাক্তার হাসবার মত ভঙ্গী করলেন মুখে। ঘরের দূষিত আবহাওয়াকে লঘু ও সহজ করবার জন্যে একটা রসিকতা করবার চেষ্টা করলেন,—

'উলের কোন বেই পছন্দ হয় না—বললাম,—বিলেতে ক্যাটেক্রসের দোকানে লেখা সুজাতা—এখানে পাবে না!"

রসিকতাটা জুৎসই হল কিনা দেখবার জন্যে ডাক্তার পরীক্ষিতের মুখের প্রতিক্রিয়ার দিকে তাকালেন। পরীক্ষিৎ মুখ নীচু করে সিগ্রেটে ফুঁ কছিল তখন।

ফুপেশের পা-টা কিস্ কিস্ করছিল একটা বেড়ালা আক্রোশে। ওর নিজেরই ওপরে? যে শেষ পর্যন্ত সুজাতার অসুখের মুখ্য কারণ হয়ে দাঁড়াল। না—সুজাতাদির ওপর! যিনি ইচ্ছে করে তাকে জব্দ করবার জন্যে চং করে সেজে-গুঁজে, মুখে পাউডার ঘসে ঠোঁটে রং লাগিয়ে, বাহারের শাড়ী পরে, আলগোছে মূর্চ্ছা গেছেন নরম বিছানার ওপর? না, ঐ নবাগত চেনা অভ্যাগতটির ওপর? যিনি নিজকে একজন এত বড় কেউকেটা মনে করেন যে অন্য কাউকে আমলই দিতে চান না।

ডাক্তার এবার আগের কথায় ফিরে গেলেন,—

"কি বই? কার লেখা?"

ফুপেশ বলল,—

"একটা নভেল। নতুন বেরিয়েছে। ঐ তো টেবিলেই আছে—ওর হাতের কাছেই তো বইটা!"

উষা টিপ্পনী না কেটে থাকতে পারল না,—

"বিশেষ কোন নামজাদা লেখকের বই নয় ওটা—।"

উমেশ এবার ধমক দিয়ে উঠল স্ত্রীকে,—

"থাক! থাক! তোমাকে আর সমালোচনা করতে হবে না!"

ডাক্তার তালুকদার বইখানি তুলে বইয়ের নামটা দেখলেন। বাংলা নভেল একখানি—বেহাৎ কাজের কোন বই নয় সত্যি। তারপর হঠাৎ ললাটের নীচের দিকে লেখকের নাম দেখে একেবারে স্তব্ধ বনে গেলেন। পরিচিত একটি ভদ্রলোক—বইয়ের নীচে নাম সই করে দিয়েছে যে ছাপার অক্ষরে, তিনিই কি এই অপরিচিত লেখক? কিন্তু পরিচিত লোকটির কথাবার্তায় বা ভাবে-ভঙ্গীতে সাহিত্য-সাহিত্য আজগুবী বাজে কল্পনার গন্ধ পান নি তো এ-পর্যন্ত? তিনি পেছনের দিকে তাকালেন একবার। দেওয়ালের এক কোণে দাঁড়িয়ে যে নির্বিবাদে ও অবিচলিত ভাবে আয়াস করে সিগ্রেটে ফুঁকছে, মুখে যার বিন্দু মাত্র ভাব-বৈলক্ষণ্য ঘটে নি, সে কি তার লেখা বইখানা চিনত না যদি ওরই লেখা বই হত। বাহারি জমকালো ললাটের ছবি নিশ্চয়ই তিনি ভুলে যান নি এরই মধ্যে। তবে—? কয়েক পাতা উল্টিয়ে দেখলেন। হঠাৎ একটি পাতায় গিয়ে ওর চোখের দৃষ্টিটা যেন আঠার মত সেটে গেল।

ওর গোঁফটা শিকায় ধরার আগে বেড়ালের গোঁফের মত অনেকবার খাড়া হয়ে ভাঁজ হতে লাগল। সাদা ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি চিক চিক করে হেসে উঠল অকস্মাৎ এবং বুড়ো চোখ দুটোও বাচ্চা ছেলের মত দুষ্টু দুষ্টু হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে নরম হাতে বইখানি টেবিলে রেখে পরীক্ষিতের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধখানি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন,—

"চলুন। বাইরে গিয়ে বসি। এক্ষুণি ভালো হয়ে উঠবে। ভালো হতে হলে ওর যা দরকার তা ও পেয়ে গেছে।"

* * *

সেই মুহূর্তে হেসে উঠেছিল ঘরের দেওয়ালগুলো,—

যেখানে নিওনলাইট সাদা ধবধবে পাখার ঝাপট দিয়ে নীল ঢেউ তুলেছিল নিস্তব্ধ কৌতূহলে এবং নীরব প্রশ্নের ভ্রূ-ভঙ্গীতে। ঘরের মানুষগুলোর হাবাতে ও মুঁকে পড়া দেখার সহজভাব হঠাৎ যেন কঠিন হয়ে শুদ্ধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল। একটি অবাঞ্ছিত পরিবেশে তরুণ ও কিশোর যুগ্ম-প্রণয়ীর গোপন ঘনিষ্ঠতায় আগ্রহ যেন হঠাৎ ধরা পড়ে গেল।

ডাক্তারের একটি কথা ঠেলে নিয়ে এসেছিল এ-পর্যন্ত,—তখন ভেবে আসেনি কী কথা বলবার জন্যে ওর মন ছটফট করছে,—ওর মুখ থেকে কি কথা শুনবার জন্যে ওর অধীরতাতে অকালে যৌবনের উদ্বেগ এসে উপস্থিত হল। ডাক্তার তালুকদারের শেষ কথা কয়টি পরীক্ষিতের অনির্দিষ্ট একটি মনোভাবকে পূর্ণাঙ্গ, প্রকট ও স্পষ্ট করে দিয়ে গেল। অপুষ্ট শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ওর স্পষ্টতর পূর্ণাঙ্গ একটি অবয়বের জন্যে দিশাহারা মুহূর্ত ভবিষ্যৎ সময়ের জন্যে হয়তো অপেক্ষা করছিল। দীর্ঘকাল বসে থাকবার অনেক আগেই ডাক্তারের একটি শুভ-প্রত্যয়-বোধ একটানে সরিয়ে দিয়ে গেল একটি যবনিকা। যবনিকার অন্তরালবর্তী একটি ক্লান্ত দুঃখ এখন আর সুষমাময় জীবনকে প্রত্যাশা করেনা।

সুমিত্রা কি পেয়ে গেছে ওর যা দরকার? নিষ্ঠুরের মত ছেড়ে আসা সন্তানদের কাছে তার কি আর চাইবার কিছু আছে? যে সময়ে তাদের মায়ের প্রয়োজন ছিল সে সময় তারা অতিক্রম করে এসেছে। এখন অপ্রয়োজনে সে কেবল অনাহূতই নয়, এখন সুমিত্রা তাদের জীবনে বাহুল্যও। সুমিত্রা আজ কি পায়নি, সে কথার চেয়েও, সে কি পেতে পারেনা,—সেই—কথাই পরীক্ষিতের মনে হয়েছিল তখন।

সেইজন্যেই বোধ হয় পরীক্ষিৎ সেদিন ডাক্তারের বাড়ী থেকে চলে এসেছিল। ওর মূর্ছা-ভঙ্গের জন্যে সেই কারণেই আর অপেক্ষা করেনি।

ডাক্তার তালুকদারের এবং সুমিত্রার আত্মবিশ্বাসের মধ্যে ছিল আগামীকালের সম্ভাবনার আশ্চর্য ইঙ্গিত। ওদের সেই বিশ্বাসের কাছে সেদিন সে কঠিন হতে চায়নি। ওর ধারালো ঠোঁট চোখের হিংস্রতায় উগ্র হয়ে ওঠবার আগেই পরীক্ষিৎ পালিয়ে এসেছিল।

খুব শান্ত, ঠাণ্ডা আর হাসি-হাসি জীবনের মুহূর্ত কি সেদিন এসেছিল পরীক্ষিতের কাছে? তবু তন্ময়তার মুখোস এঁটে পরীক্ষিৎ এমন একটি ব্যবহার দেখিয়ে চলে এসেছিল যা ওর স্বভাবের পক্ষেও অত্যাশ্চর্য বস্তু।

তারপর দুদিনের ইতিহাস শুধু একটিমাত্র ভাবনার ইতিহাস। যা চিন্তা করেছে এ-কয়দিন,—যাকে ভাবনা, তা যদি তার ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন হয়ে আসত, তাহলে পরীক্ষিতের গোটা দুদিন মুঁড়িয়ে একটি কথার মোড়ক শুধু জেগে থাকত। কিন্তু আশ্চর্য! তা হয়নি। ঘুমের অবচেতন রাজ্যে সুমিত্রা আসেনি,—সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছিল তবু আসেনি। সারাজীবন ধরে প্রতীক্ষায় থাকা এই আকাঙ্ক্ষাকে এ-দুদিনে সে যাচাই করে তুলেছিল, তবু চেতন থেকে অবচেতনার রাজ্যে সিঁড়ি ভেঙে সে আসেনি। বোধ হয়, সুমিত্রা আসতে পারেনি,—হয়তো অত শক্তি তার ছিল না।

[ক্রমশ :

এসেছে বরষা

হ্যাঁ অনেক সাধ্য সাধনার পর বর্ষা নেমেছে। কিন্তু বর্ষার দিনে যেমন মেঘ বৃষ্টি দেখে বেশ আনন্দ উপভোগ করা যায়; তেমনি আবার বাড়ীর গৃহিনীদের নানা ঝামেলায় পড়তে হয়। প্রথমতঃ জামা কাপড় শুকোবে না—চারদিকে স্যাঁতসেঁতে! উনুন জ্বালাতে নাকাল এর সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। সব মিলিয়ে গৃহিনীকে এই সময়টা বেশ ভেবে চিন্তে কাজ করতে হয়। তবে অসুবিধা যতোই থাকুক বর্ষাকালে মুখ-রোচক খাদ্য তালিকা তৈরী করতে পারলে কোনো অসুবিধার কথাই মনে থাকে না। এই যেমন ধরুন পরর পরর শিঙুড়ি—বেগুনী, মাছ বা ডিমভাজা একটু চাট্‌নী। বিকেলের জলখাবারের মুড়ি বা চিড়ে ভাজা তার সঙ্গে নারকেল ও কাঁচা লঙ্কা কুঁচো। অথবা চিড়ে একটু গরম জলে ভিজিয়ে নিয়ে তাকে শুক্‌নো করে কড়াইতে একটু ঘি আর কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে চিড়েটা নাড়াচাড়া করে নেবেন। পরিবেশন করার সময় একটু আদা আর কাঁচা লঙ্কা কুঁচো, সম্ভব হলে পাঁপড় ছোট ছোট করে নিয়ে ভেজে উপরে ছড়িয়ে দেবেন। এ ছাড়া পকৌড়া, পেঁয়াজী ব্যাগনের বড়া এ তো আমাদের জানাই আছে। বর্ষাকালে ছাঁচিকুমড়োর তরকারী, কচু শাক, খেঁসারীর ডাল এবং ভেজো জাতীয় কিছু নিয়মিত খাওয়া ভাল। বর্ষাকালে যদিও ইলিশ মাছ খাওয়ার রীতি চলে আসছে তবুও পেটের গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ইলিশ মাছ কম খাওয়াই ভাল।

এ তো গেল খাওয়ার কথা। বর্ষার দিনে বেশভূষার দিকেও একটু নজর দিতে হয়। যেমন নীলাম্বরী শাড়ী বা হলুদ রংয়ের শাড়ী জামা এই ঋতুতে পরলে মনটা কেমন স্নিগ্ধ মধুর হয়ে ওঠে। লাল বা কালো অথবা সাদা রং এই

বেলা দে

সময় মানায় না। আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়ে থাকে তখন মনের রংয়ে রং মিলিয়ে বেশভূষা করতে পারলে ভালই লাগবে।

বাড়ীঘর ও এই সময় বেশ ঝরঝরে করে গুছিয়ে রাখতে হয়। স্যাঁতসেঁতে ভাবে থাকলে মনটাও কেমন বিষন্নতায় ভরে ওঠে।

তাই, সময়োপযোগী খাওয়া, পরা ও থাকার ব্যবস্থা গুছিয়ে করে নিতে পারলে মনটা আপনিই ভরে থাকবে।

• • • • •

সাধারণ ইংরেজ গৃহস্থের বাড়ীতে গিন্নীরা রান্নার পেছনে আধ ঘণ্টার বেশী সময় ব্যয় করেন না। রান্নার পেছনে বেশী সময় ব্যয় করে বলে অনভ্রসর ফরাসী গিন্নীদের প্রতি এদের অবজ্ঞার সীমা নাই। রান্নার ব্যাপারে ইংরেজ গিন্নীদের রান্নাধারার দৌড় অতি সামান্য। দিনের পর দিন একঘেয়ে তরকারী সেদ্ধ করে চলেছে। বেশী সময় ব্যয় না করেও সামান্য অদল বদলে জিনিষটার স্বাদে যে তফাৎ হতে পারে সেটা এদের মাথায় আসে না।

প্রশ্নোত্তরের আসর

পরিচালনা—রাজাদি

গীতা মজুমদার, শিবপুর। তোমার চিঠি পড়ে খুব ভাল লাগল। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগেও তোমার ভূতের ভয় করে? সে কি! ওটা তোমার মনের সংস্কার—মনটাকে সর্বদা ভাল ভাল বই পড়ে অন্যমনস্ক রাখার চেষ্টা করবে। তোমার ছোট ছেলেটি সব সময় কাঁদে—তার জন্যে মন খারাপ লিখেছ। কিন্তু ঘরে বসে শুধু মন খারাপ করলেই তো হবে না তাই—সুচিকিৎসকের পরামর্শ নাও তিনি যা বলবেন তাই করো।

লীলা হালদার, বীরভূম। আমাদের 'মেয়ে মজলিশ' পড়তে ভাল লাগছে জেনে খুব খুশী হোলাম। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমাদের মজলিশের জন্য তোমার রান্না সেলাই ঘরকন্নার কথা সবই লিখে পাঠাতে পার। পরিষ্কার কাগজে লিখ।

মধুমিতা ঘোষ, শ্রীরামপুর। ভাই ঘরকন্নার কথা তো 'মেয়ে মজলিশে' যথেষ্ট জানানো হয়। তুমি কি জানতে চাইছ লিখ। আমার মনে হয় গুছিয়ে কাজকর্ম করলে সংসারে কখনই অসুবিধা হয় না। হ্যাঁ তোমার যদি সুবিধা হয় তাহলে মাটির উনুনেও রাঁধতে পার। তবে রান্না সংক্ষেপ করার জন্য গ্যাস বা ইলেকট্রিক কিম্বা কেরোসিনের উনুনও ব্যবহার করতে পার। আজকাল অধিকাংশ বাড়ীতেই গ্যাস ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু ঠিক নিয়মাবলী জানা না থাকায় মাঝে মাঝে বিপদের কথা আমরা শুনতে পাই।

সবিতা চ্যাটার্জি, বর্ধমান। তোমার লেখা বড় অস্পষ্ট তাই সব কথা বুঝতে পারছি না।

কমলকলতা পাল, ধানবাদ। না ভাই, সৎপথে থাকা এবং সত্য ধর্ম পালন করা এই তো মানুষের নীতি। মিথ্যা কখনো চাপা থাকে না। একদিন তাকে ধরা দিতেই হবে।

প্রতিমা কর্মকার, নবদ্বীপ। **বেলারাণী ঘোষ**। চিঠিতে ঠিকানা নেই। **আভা রায়**, মায়না, বর্ধমান। **সবিতা অধিকারী**, বোলপুর। **কুহেলী**, আরামবাগ। না ভাই, গায়ের রং ফর্সা করার পদ্ধতি তো আমি জানিনা তবে শীতের সময় সর ময়দা অথবা বেসন খোলা জাটা মাখলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে।

রেখা সরকার গ্রামবরত সাহা লেন, হাওড়া। **রেখা মুখার্জি**, তালতলা। ভগবানকে শুধু নিজের প্রয়োজনেই যে ডাকতে হবে তার তো কোনো মানে নেই—সকলের কল্যাণেই নিজের কল্যাণ হয় তাই সেইভাবে তাঁর চিন্তা করো।

লিখা ঘোষ, তালতলা। তুমি যদি কোনো বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নাও তাহলে তাঁরাই তোমায় ওষুধ বলে দেবেন। আজকাল নানা ধরণের ওষুধপত্র বেরিয়েছে।

অপর্ণা সরকার, জ্যোতিষ রায় রোড, নিউ আলিপুর। তোমার চিঠি এবং তাতে তুমি যে সব প্রয়োজনীয় কথা লিখেছ অন্যান্য বোনেদের জানাবার জন্য। সেগুলি টুকিটাকি কথায় জানিয়ে দেব।

সন্ধ্যা, বেলঘরিয়া শিওসদন—চিঠির জন্য ধন্যবাদ। নিজেকে কখনো ছোট এবং অবহেলিত মনে করতে নেই। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিছু না কিছু প্রতিভা আছে তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সবিতা মুখোপাধ্যায়, মহারাজ নন্দকুমার রোড, কলকাতা। **পিপ্‌সি, হালতু**—চিঠিতে পুরো নাম ঠিকানা লিখতে হয় চুলের যত্ন না করলে চুল অসময়ে উঠতে থাকে। নিয়মিত নারকেল তেল মেখে স্নান করো এবং চুলে যাতে রোদ হাওয়া লাগে সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

আরতিরানী বালা, মানভূম। অনেকগুলি সন্তান হলে তাদের মানুষ করা আজকের দিনে বেশ কঠিন কাজ; তাই পরিবারটি সীমিত করাই কর্তব্য—এর জন্য যেমন সরকারী প্রচেষ্টা চলেছে সেই সঙ্গে নিজেরাও যদি সংযমী হয়ে চলতেপারি তাহলে নিশ্চয়ই একটি সুখী পরিবার গড়ে তোলা কঠিন কাজ হবে না।

তারুতী হালদার, কোন্নগর। চিঠির জন্য ধন্যবাদ কিন্তু ভাই তুমি যে চাকুরীর কথা লিখেছ সে বিষয়ে আমার কিছু করার নেই এজন্য দুঃখিত।

স্নেহলতা বাল, ভগবানপুর। আপনি আপনাদের গ্রাম উন্নয়নের বিষয় যা লিখেছেন আমার মনে হয় এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করলে তাঁরা আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন।

রত্না সাহু, গোবিন্দ আড্ডি রোড। দুর্ঘটনা যে মানুষের জীবনে কখন কি ভাবে ঘটে কেউ বলতে পারে না—তাই সাবধানে চলাই উচিত।।

ঘরকন্নার কথা

মীরা ভট্টাচার্য্য

পথে যেতে যেতে সেদিন হঠাৎ নমিতার সঙ্গে দেখা। ব্যস্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছে। আমি যে প্রায় পাশেই আছি তা সে দেখতেই পেল না।

গলাটা একটু চড়িয়ে ডাকলাম, "নমিতা! এই নমি!"

চমকে ফিরে তাকিয়ে আমায় দেখে হেসে জিজ্ঞাসা করলো, "আরে বৌদি যে। যাচ্ছ কোথায়?"

আমি বললাম, "সেই প্রশ্ন তো আমিও তোমায় করছি। এত ব্যস্ত হয়ে চলেছ কোথায়? বিশেষ কাজে নিশ্চয়ই।"

"হ্যাঁ ভাই, বিশেষ কাজই বটে যাচ্ছি ডাক্তারখানায়। খোকনের সাতদিন জ্বর ছাড়ছে না। আজ ডাক্তারবাবুকে আবার ডেকেছিলাম। এখন যাচ্ছি ওষুধ আনতে।"

"তা তুমি কেন? তোমার স্বামী আনন্দ কোথায়?"

"তাকে তো অফিসের কাজে দিন পনের ছোল বাইরে যেতে হয়েছে। ভেতর বাইরের কাজ নিয়ে আমি একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলাম। এখন তো আমার নিজের কাজেও যেতে পারছি না। তায় মাসের শেষ। কোনরকমে দুজনে মিলে সংসার চালাই; এর ওপর যদি অসুখ বিসুখ বাধে তাহলে তো আর—। আচ্ছা ভাই চলি।" বলে বিমর্ষ চিন্তিত মুখে নমিতা চলে গেল।

আমিও ভাবতে ভাবতে নিজের পথে এগোলাম। এই যে নমিতার মত মেয়েরা; নিজেরা ঘর বাইরে পরিশ্রম করে একটি ছোট সুখী সংসার গড়ে তোলবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমরা, সবাই একটি ছোট সুন্দর সংসারেরই স্বপ্ন দেখি। স্বামী, স্ত্রী, দু তিনটি সন্তান। সুখ, সুন্দর, হাসিখুশী; সকলে যেমন নিয়ে বেড়ে উঠছে। সংসারটি সাজানো গোছানো—যেন সযত্নে রচিত একখানি ছবির বাগান।

কিন্তু আকাশে যখন কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে তখন সেই সুন্দর বাগানটি তছনছ হয়ে যাবার ভয়ে আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি নাকি?

সংসারেও মাঝে মাঝে আসে রোগ, শোক, মৃত্যুর মত ঝাপটা। মানুষের সুখ বুঝি তখন বিপ্রান্ত হয়ে পড়ে।

এর ওপর যদি অর্থের অনটন ঘটে, তাহলে বিপদের যেন আর সীমা থাকে না। তাই ভাবছিলাম, গৃহস্থের পক্ষে আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করা একান্ত প্রয়োজন।

সাধু সন্ন্যাসীর অবশ্য সঞ্চয়ের দরকার হয় না। কিন্তু যিনি সংসারী—যাঁর উপর পরিবারের অন্যান্যরা নির্ভরশীল তাঁর পক্ষে দুর্দিনের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় আবশ্যক।

বলবেন "আপনি যে ধান ভানতে শিবের গীত' গাইতে সুরু করলেন। হচ্ছিল ঘরকন্নার কথা। এর মধ্যে আবার দুর্দিনের সঞ্চয়ের কথা আসে কেন?"

'না ভাই আমার কথাটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। ঘরকন্না ভালভাবে করতে হলে সবার আগে প্রয়োজন অর্থের। অর্থের সুষ্ঠু বন্টন করেই তো ঘরকন্না চালাতে হবে।'

তাই বলছিলাম, ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে, "cut your coat according to your cloth" মানে 'কাপড়ের মাপ বুঝে জামা কাট', অর্থাৎ তোমার যা আয়, সেই বুঝে ব্যয় কর। তাই সেই আয় ব্যয়ের কথা দিয়ে ঘরকন্না শুরু করছি।

প্রায় সব সংসারেই একটা নির্দিষ্ট আয় আছে। গৃহস্থ মাসের শেষে যে পরিমাণ অর্থ ঘরে আনেন, তাই দিয়ে গৃহিণীকে সংসারের সব রকম চাহিদা মেটাতে হয়।

ধনীর গৃহিণী বা স্বল্পবিত্তের ঘরণী—দুজনেই চান সংসারকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে চালাতে।

এবারে আসল কথায় আসা যাক। এলোমেলো ভাবে,

যখন যা দরকার খরচ না করে, মাসের প্রথমে সংসার খরচের একটা বাজেট বা হিসাব তৈরী করে নিয়ে আয়ের টাকাটা যদি সেই অনুযায়ী ভাগ করে ফেলা যায় তাহলে অনেক সুবিধা হবে। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও সেই তালিকায় থাকবে।

অর্থের ব্যবস্থার পরে এবারে ঘরকন্না চালানোর ব্যবস্থায় আসা যাক।

আগেকার দিনের বিরাট যৌথ পরিবার নয়। ছোট একটি আধুনিক পরিবার নিয়ে আমরা সুরু করবো।

স্বামী, স্ত্রী, দুতিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার; চলতো বা দু একজন পোষ্যও আছেন।

ছোট একটা বাড়ি; তিন চারখানি ঘর। তারই মধ্যে সংসার গুছিয়ে নিতে হবে।

প্রথমেই শোবার ঘর দিয়ে আরম্ভ করা যাক। যে ঘরটি বড়, জানালা, দরজা দিয়ে আলো হাওয়া বেশী আসে, সেটিকে শোবার ঘর করুন। ঘরে নিজের অবস্থা অনুযায়ী দামী খাট বা সাধারণ চৌকী পাতুন। তার ওপর পরিপাটি করে বিছানা পেতে মশারি টাঙান বা সুজনী দিয়ে ঢেকে দিন। অভাবে শাড়ীর লম্বা করে পাড় জুড়েও সুন্দর বিছানা চাদর হতে পারে।

শোবার ঘরে বেশী আসবাব রাখবেন না। বাক্স পেটরা রাখতে হলে একপাশে একটি বেঞ্চি পেতে তার ওপর সাজিয়ে রাখুন। তাহলে ঘর পরিষ্কার করতে অসুবিধা হবে না।

দরজা জানালায় পরদা অবশ্যই চাই। কিন্তু শোবার ঘরে চড়া রঙের পরদা কখনও ঝোলাবেন না। হাল্কা নীল, গোলাপী, সবুজ—যে কোন স্নিগ্ধ রঙের পরদা লাগালে শোবার ঘরখানি স্বপ্নময় হয়ে উঠবে।

চড়া রঙের পরদা লাগান বসার ঘরের দরজা জানলায় ঘরে ঢুকলেই যেন মন উৎফুল্ল, সতেজ হয়ে ওঠে।

বসার ঘরে চেয়ার টেবিল রাখুন, বা ফরাস বিছিয়ে দিন—যাই করুন, সুবিধা ও সামঞ্জস্য বজায় রেখে করবেন। বাড়ীতে লোক বেশী হলে বসার ঘরটিই অনায়াসে রাত্রে শোবার জন্য ব্যবহার করা চলবে।

একপাশে একটি ছোট টেবিল বা তাকে কিছু রুচিপূর্ণ বই, দু' চারখানি মাসিক পত্রিকা রাখলে গৃহকর্তার জন্য অপেক্ষা করতে হলেও অতিথির বিরক্তি আসে না। বসার ঘরে দেওয়ালে কিন্তু আত্মীয় স্বজনের ছবি দিয়ে সাজাবেন না। তাঁরা আপনার প্রিয়জন—তাঁদের ছবি থাকুক আপনার শোবার ঘরে। বসার ঘরে রাখুন ভাল শিল্পীর আঁকা কিছু ছবি। আর রাখুন দু চারটি সৌখিন জিনিস; কিছু ফুল, অভাবে যাহোক পাতা দিয়ে সাজান। ছিমছাম পরিষ্কার ঘরখানিতে ঢুকে অতিথির দৃষ্টি আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়ে উঠবে; তবেই তো গৃহিণীর গৃহসজ্জা সার্থকতা।

শোবার ঘর, বসার ঘরের পরে এবারে আমরা যাব সংসারের আসল ঘরটিতে—রান্নাঘরে। কারণ ঘরকন্না সবই তো ওই রান্নাঘরকেই কেন্দ্র করে।

বেশীর ভাগ বাড়িতে দেখা যায় সব চেয়ে ছোট, আলো হাওয়া শূন্য ঘরখানি রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির আর সব ঘরের দিকে অবশ্য নজর দিই কিন্তু ঘুলঘুলি মাথা রান্নাঘরের দিকে ফিরে তাকাই না। অথচ সেই ঘরখানি হোল সংসারের কর্মকেন্দ্র। যেমন গঠন করতে যে খাদ্যের প্রয়োজন তা প্রস্তুত হয় রান্নাঘরে। কাজেই রান্নাঘরে যাতে প্রচুর আলো হাওয়া আসে ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সে দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এবার রান্নার সরঞ্জামের কথা কিছু বলা যাক। প্রথমে চাই একটি উনুন বা ষ্টোভ, যাতে রান্না হবে। এখন ঘুঁটে কয়লা দিয়ে জ্বালানো সনাতন উনুন রান্নাঘর থেকে প্রায় নির্বাসিত। তার স্থান অধিকার করেছে গ্যাস, কেরোসিন বা ইলেকট্রিক ষ্টোভ; এছাড়া রান্নার আরো অনেক সরঞ্জাম আছে যা এখনও সাধারণ গৃহস্থ ঘরে চলন হয় নি।

রান্না করার পক্ষে গ্যাস, কেরোসিন ষ্টোভ ইত্যাদি খুবই সুবিধাজনক। অল্প জায়গায় রান্না চলে; ঘুঁটে কয়লার নোংরা হয় না; যখন দরকার তখনই জ্বালা চলে। কিন্তু এসব জিনিস ব্যবহার করতে হয় খুব সাবধানে। একটু অসাবধানতায় একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

এর পরে আসে বাসনপত্র। সেখানেও রূপান্তর ঘটেছে। মাটির হাঁড়িকুড়ির জায়গায় একদিন এসেছিল লোহার কড়াই, পেতলের ডেকচি, কাঁসা, পাথরের থালাবাটি।

আজ তারাও প্রায় অচল। সেখানে সোজা পাল্লা এলুমিনিয়ম, ষ্টেনলেস ষ্টীল, কাঁচের বাসনপত্র। এসব বাসন ওজনে হাল্কা, পরিষ্কার করতেও সুবিধা।

প্রেসার কুকার তো এখন অবশ্য প্রয়োজনীয়ের পর্যায়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে রান্না সেরে ফেলে বাকী সময়টা অন্যকাজে লাগানো যেতে পারে। এখন আর মেয়েরা সারাদিন হেঁসেল নিয়ে বসে থাকতে চান না; আর তার সময়ও পাননা। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই মেয়েরা বাড়ীর কাজ সেরে, বাইরের কাজেও বেরোন। কাজেই রান্নাটা যত তাড়াতাড়ি, অথচ ভালভাবে করা যায় ততই সুবিধা। 'প্রেসার কুকার' বা ঐ জাতীয় বাসনে রান্না তাড়াতাড়ি হয়, অথচ তার খাদ্যগুণ ও স্বাদ সম্পূর্ণ বজায় থাকে।

রান্নাঘরের কথায় ভাঁড়ার ঘর আপনিই এসে পড়ে। আলাদা ভাঁড়ার ঘর থাকলে ভাল। না হলে রান্নাঘরের একপাশে একটি তাকে বা ছোট আলমারীতে, তেল মশলা চাল প্রভৃতি বেড়ে বেছে শিশিতে বা কৌটায় ভরে সাজিয়ে রাখুন। ছোট ছোট কাগজের টুকরায় জিনিষের নাম লিখে আঠা দিয়ে শিশি বা কৌটার গায়ে লাগিয়ে দিন। তাহলে আর কড়ায় তেল চড়িয়ে কোন্‌ খুঁজতে হবে না।

খাবার জন্য আলাদা জায়গা থাকলে সেখানে একটি টেবিল পেতে কয়েকটি চেয়ার দিয়ে সাজিয়ে দিন। আজকাল অনেকবাড়িতে টেবিলে খাওয়ার চলন হয়েছে; এতে অনেক সুবিধাও আছে। রান্না করা খাবার ছোট ছোট ঢাকা দেওয়া পাত্রে টেবিলেই রাখা যায়। খেতে বসে নিজের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী চামচ দিয়ে খাবার তুলে নেওয়া চলে। তাতে পরিবেষণের হাঙ্গামা থাকে না আর খাদ্য অপচয় হয় না।

নেহাৎ স্থান অকুলান হলে রান্নাঘরের একপাশে আসন বা পিঁড়ি পেতে খেতে অসুবিধা হবে না যদি রান্নাঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে।

আর একটা কথা আধুনিক যুগে অপ্রাসঙ্গিক হবেনা বোধ হয়। বলছিলাম যে একটা রেফ্রিজারেটার কিনে ফেলতে পারলে কেমন হয়? প্রস্তাব শুনেই চমকে উঠবেন না। দামটা একটু বেশী পড়বে? কিন্তু যেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনেই সংসারের জন্য খাটছেন, সেখানে অন্যান্য খরচ বাঁচিয়ে কিছুদিন কষ্ট করে যদি একটা 'ফ্রিজ' কিনে ফেলতে পারেন, তাহলে ভবিষ্যতে সময় ও পয়সা দুই বাঁচবে।

বিলাসিতার কথা বলছিনা। গ্রীষ্মের দিনে আইসক্রীম বা শীতল পানীয় উপাদেয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ সংসারে ফ্রিজের প্রয়োজন সেরকম নয়। বাড়িতে একটা 'ফ্রিজ' থাকলে একবেলা রান্না করে দুবেলা খাওয়া চলে। বাড়তি খাবার পচে যাবার ভয় থাকে না।

গরমের দিনে মাছ, মাংস, দুধ, ফল নষ্ট হবে না। সপ্তাহে একদিন বেশী করে বাজার করে এনে তরিতরকারী, মাছ মাংস, ফল সব 'ফ্রিজে' ভরে রাখুন। অন্ততঃ সাতদিন বাজার করার ঝামেলা নেই।

যে সব মেয়েদের ঘর ও বাহির দু'দিকই সামলাতে হয় তাঁদের পক্ষে ঘরকন্নায় এই সব আধুনিক সরঞ্জাম অত্যাবশ্যক। এতে সময় বাঁচে, পয়সা বাঁচে। আর সবার বড় কথা বেশী পরিশ্রমে গৃহিণীর স্বাস্থ্য নষ্ট হয় না। জানেন তো "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" গৃহ বলতে গৃহিণীকেই বোঝায়। ঘরকন্নার মধ্যমণি গৃহিণী যদি সুস্থদেহে, শান্তমনে ঘরকন্না করতে পারেন, তবেই তো ঘরের শান্তি বজায় থাকবে।

ফল সকলের পক্ষে সব সময়ই ভাল

ফল খাওয়া অভ্যাস করুন, যদি আজও না করে থাকেন

শরীরের পক্ষে সব ফলই সুফল দেয়। আবার রুচি বিভেদে মানুষ ফলের রসাল স্বাদটি রসনায় গ্রহণ করে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিই অবশ্য এই স্বাদের বিভিন্নতা বজায় রাখে। এক এক ঋতুতে প্রাধান্য পায় এক একটি ফল। এরা স্বাদেও যেমন বিভিন্ন ; পুষ্টিতেও তেমনি নানান ভিটামিনের পরিপূরক। শরীরের নানা ধরণের প্রয়োজন মেটায় এই ফলের মধ্যেকার ভিটামিন। বর্ষার সময়ে নরম রুচিশশা পিত্তনাশ করে। ডালপাকা মর্তমান কলা, যেমন পুষ্টিকারক তেমনি কোষ্ঠ পরিষ্কারক। এছাড়া পেয়ারার মধ্যে আছে প্রচুর পরিমাণে আয়রণ। আবার আনারসের রস দুর্বল লিভারকে সবল করতে যথেষ্ট সাহায্য করে। মুসুম্বি দেবু রক্ত কারক। আমলকের রস আবার তেমনি রক্ত পরিষ্কারক।

যাঁদের বাড়ীতে একটু জমি আছে তাঁরা কিন্তু এইসব ফলের মধ্যে বেশীরভাগগুলিই একটু চেষ্টা করলে বাড়ীতে ফলাতে পারেন। আবার কাঠের বাক্সে বা একটু বড় টবে মাটির সঙ্গে দরকার মত সার মিশিয়েও এমনি ছোটখাট ফলের গাছ জন্মাতে পারেন। বারোমেসে টম্যাটো বা ট্যাপারী এগুলিতেও পুষ্টির প্রাধান্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে। আবার আচার জেলিতেও এগুলির জুড়ি নেই। এই টম্যাটো ট্যাপরীর গাছগুলি হয়ত অন্য জায়গায়। পেঁয়াজ অবশ্য ফলের আওতায় পড়েনা। কিন্তু এতেও প্রচুর পরিমাণে পাচক রস আছে। আমরা স্যালাড খেতে এখনোকি তেমন অভ্যস্ত হয়েছি। একটু গাঁয়ের মহল ছাড়া স্যালাডকে এখনো পর্যন্ত মধ্যবিত্ত ঘর প্রায় একঘরেই করে রেখেছে। কিন্তু এই কাঁচা শাকসবজিতেও প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন থাকে। উত্তর প্রদেশবাসীরা আর পাঞ্জাবীরা ভাল করে রাঁধা মূলোর তরকারি আর ছেঁচকি ফেলে কাঁচা মূলো আর কাঁচা পিঁয়াজ দিয়ে পরোটা বা রুটি খেতে ভালবাসেন। এঁরা কাঁচা শাকেরও খান প্রচুর পরিমাণে। গুজরাটিরা আবার টম্যাটো, মূলো, পিঁয়াজ, শশা সব একসঙ্গে কুঁচিয়ে দইতে মিশিয়ে মশলা দিয়ে রায়তা তৈরী করে খান। একমাত্র বাঙালীই বোধহয় দইতে মিষ্টি খায় তাছাড়া প্রায় সব প্রতিবেশী জাতিরাই নানারকম মশলা মিশিয়ে মোলতা দই খেয়ে থাকেন।

ওদেশে আবার "ফ্রুট-চাট" বলে একরকম মুখরোচক মশলা দেওয়া টুকরো ফলের মিশ্রন বিক্রি করে। এটি খেতেও যেমন উপাদেয় আবার শরীরের পক্ষেও তেমনি উপকারি। এই জিনিষটি বাড়ীতে তৈরী করেও অনায়াসে সবাইকে পরিবেশন করে স্বাদে বিভিন্নতা আনতে পারেন। ডাঁসা পেয়ারা, শশা, টম্যাটো, মুসুম্বি, কিছু ভিজে ছোলা, ভিজে মুগ, পেঁপের সময় পাকা পেঁপে এইসব ফলগুলি সমান ভাগে নিয়ে কুচি করে কাটুন তারপর বাকি জিনিষ সব মিশিয়ে ওপর থেকে সামান্য নুন, লেবুর রস, ভিয়ে ভাজার গুঁড়ো বিটনুন একটু জোয়ান গুঁড়ো আর সামান্য ধনের গুঁড়ো মিশিয়ে টাটকা টাটকা পরিবেশন করুন। পাতায় করে তুলে কাঠি লাগিয়ে দিলে বাচ্চারা আরো মজা পাবে। এমনিতে তাদের কলে অরুচি কিন্তু এভাবে দিলে রুচি করেই খাবে তারা।

স্যালাডের কথায় বলতে গেলে বলা যায় গাজর, বীট, মূলো, শশা, পিঁয়াজ, টম্যাটো খুব পাতলা পাতলা চাকা করে কেটে নিন, সঙ্গে ইচ্ছে হলে আলু সেদ্ধ বা ডিম সেদ্ধও ব্যবহার করতে পারেন। এবার ওপর থেকে লেবুর রস, নুন, তার সঙ্গে ফ্রুটচাটেরই মশলা ছড়িয়ে দিয়ে একটু মেখে নিন। ইচ্ছে হলে লেটুস পাতাও কুচিয়ে দিতে পারেন। দুপুরের বা রাত্রের খাবারের সঙ্গে সুন্দর করে সাজান অথচ সামান্য খরচের এই ধরণের স্যালাড সকলের পক্ষেই উপকারি হবে। আরও অনেক রকমের স্যালাডও সাজান যায়। পরে আরও বলার ইচ্ছে রইল।

আম জামের পরেই আসছে পেয়ারা ফসল। ডাঁসা পেয়ারা নুন দিয়ে খেতে যেমন ভাল লাগে আবার পাকা পেয়ারার স্বাদও কিছু কম নয়। দোকানে গিয়ে আমরা প্রায়ই খোঁজ করি সোয়াডা জেলির। অথচ অল্প আয়াসেই এই সোয়াডা বা পেয়ারার জেলি বাড়ীতে তৈরী করে নেওয়া যায়। এতে খরচেও কুলোবে আর সবাই মিলে খেতেও পারবেন প্রাণভরে।

উপকরণ :—পাকা পেয়ারা দুকিলো, চিনি পরিমাণ মত। লেবুর রস আধ কাপ। আদা বাটা চা চামচের এক চামচ।

প্রণালী :—পেয়ারাগুলি চার ফালা করে কেটে একটি বড় অ্যালুমিনিয়ম বা ষ্টেনলেস ষ্টীলের ডেকচিতে ঢাকা দিয়ে সেদ্ধ চড়ান। ঘাঁটবেন না কিন্তু। বেশ ভালমত সেদ্ধ হলে একটি শক্ত মোটা কাপড়ে ওগুলি ঢালুন, তারপর শক্ত করে বেঁধে ঝুলায় একটি কানা উঁচু বাসন রেখে পোঁটলাটি টাঙ্গিয়ে দিন ধরুন বিকেলে সেদ্ধ করে টাঙ্গালে তবে রাত্রে জেলি করবেন। আর সকালে টাঙালে করবেন, দুপুরে। পেয়ারা সেদ্ধ জল পরিমাণে যতটা হবে, ঠিক ততটাই চিনি লাগবে। ঐ জলে চিনি মিশিয়ে তার সঙ্গে আদা বাটা আর লেবুর রস দিয়ে জ্বাল দিতে সুরু করুন। ঘন হয়ে আসছে মনে হলে প্লেটে একটু ঢেলে ঠাণ্ডা করে দেখুন জমে যাচ্ছে কিনা। ঠিক মত জ্বাল হলে একেবারে শিশিতে বন্ধ সোয়াডা জেলির মতই। ফ্রিজের ভিয়ার, অমনি টুকটুকে লাল আর স্বাদে গন্ধে লোভনীয় পেয়ারার জেলি পেয়ে যাবেন। এটি রাখলে থাকেও অনেক দিন।

আবার ছিবড়েগুলিও বেশ করে চটকে সামান্য মাখন, লেবুর রস আর চিনিতে মিশিয়ে শুকনো শুকনো করে পাক করলে লুচি রুটির সঙ্গে বেশ ভালই লাগে খেতে।

এরপর আসা যাক চাঁপাকলীর কথায়। এরও জেলি এত সুন্দর হয় যে আম-আনারসও সময় সময় হার মেনে যায়। অথচ তৈরী করার খরচ বা ঝামেলাও স্বাদের তুলনায় অনেক কম।

উপকরণ :—পাকা চাঁপাকলী এক কিলো। পাতি লেবু দুটি। ডিসমিস একশো গ্রাম। চিনি পরিমাণ মত। সামান্য একটু গোলাপের রং। আদার রস দুই চামচ।

প্রণালী :—চাঁপাকলীগুলি খোসা ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন। এবার সেদ্ধ চড়ান। জল বেশী দেবেন না বেশ নরম হয়ে এলে আন্দাজ করে চিনি দিন। সামান্য একটু রং ডুবে গুলে ছেড়ে দিন। একটু নুন আর তার সঙ্গে লেবুর আর আদার রসও দিন। এবার জ্বাল দিতে থাকুন। চাঁপাকলীগুলি রসে টুসটুসে হয়ে ফুলে উঠবে। আর সামান্য ঘন হয়ে আসবে রস তাহলেই বুঝবেন জেলি তৈরী হয়ে এসেছে। এটিও স্বাদে গন্ধে অপূর্ব্ব লোভনীয় হয়। ঠাণ্ডা হলে পরিষ্কার শিশিতে ভরে রাখুন এটিও বেশ কিছুদিন থাকবে।

অনেকের কাছে অস্পৃশ্য পিঁয়াজ—যদিও ফলের পর্যায়ে পড়ে না তবুও আজ মাংসের দুর্মূল্যতার দিনে অনেক সময় পিঁয়াজই হয় অসহায়ের গতি। তেমনি এই পিঁয়াজের খাবারও হয় যথেষ্ট সুস্বাদু হাতের কাছে থাকলে নিঃসন্দেহে বর্ষার একঘেয়েমি খাবারে নতুনত্ব আনবে।

উপকরণ : এক কিলো ছোট ছোট মৌটি পিঁয়াজ। রাই বড় চামচের এক চামচ। ধনে, কালোজিরে, জিরে, আদা সর্ষে সব মিলিয়ে বড় চামচের দু'চামচ। আমচুর বড় চামচের দুই চামচ। ভিনিগার বড় চামচের দুচামচ। হিং একটু (পছন্দ হলে) বাঁট নুন আধ চামচ। নুন পরিমাণ মত : হলুদ গুঁড়ো আধ চামচ। লঙ্কা গুঁড়ো বড় চামচের এক চামচ।

প্রণালী :—পেঁয়াজগুলি খোসা ছাড়িয়ে দুটুকরো করে নিয়ে নুন মাখিয়ে কিছুক্ষণ ঢাকা দিয়ে রেখে দিন। সমস্ত মশলাগুলি কাঠখোলায় অল্প ভেজে গুঁড়িয়ে নিয়ে পেঁয়াজের সঙ্গে মেশান। এবার হিংও ভেজে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে নিন। হলুদ লঙ্কাও সব এ পিঁয়াজের সঙ্গে দিন। এবার সম্ভব হলে পুরো একদিন রোদে দিন। তারপর আমচুর আর ভিনিগার মেশান। খুবই সুস্বাদু হয় এই পেঁয়াজের আচার। তুলে রাখলে এটিও অনেকদিন থাকে।

ফল, শাক-সবজি সব কিছুই তো আমাদের শরীরের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন তবে নিঃসন্দেহে সব চেয়ে বেশী চাঁহিদা মেটায় ফল। এবারের মত এখানেই ইতি করি। মা বোনেরা এই জেলি আচারগুলি চেষ্টা করে তৈরী করে দেখুন ভাল হলেই বুঝব আমার বলা সার্থক হল। সুতরাং আবার সেই ফলের কথাতেই বলা যায় যে ফলেন-পরিচয়তে।

এর কোমল স্পর্শে সৌন্দর্য বিকশিত হয়

শিশির স্নিগ্ধ সজ্জ
প্রস্ফুটিত গোলাপের
পাপড়ির মত কোমল ও
তারুণ্যের আভায় উজ্জ্বল
আমার সুন্দর দেহশ্রী
এই মেয়েই তো !

সাধনা বিউটি স্নো

একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৫

Regd. No. C 3643

মন খুশীতে ভরে যায়

26 AUG 1978

লক্ষ্মী ঘি

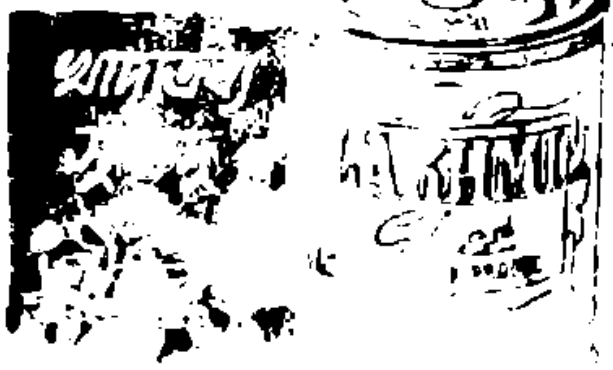

গল্পভারতী

দ্বাবিংশতি বর্ষ

ভাদ্র ১৩৭৯

CALCUTTA UNIVERSITY

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

আপনার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের জন্য

সাধনা
মৃতসঞ্জীবনী ও
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

দুটি বিশেষ ফলপ্রদ
আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়ন। একত্রে
সেবন করলে দেয় পূর্ণ সবল
ও শক্তিশালী চক্ষু।

চ্যবনপ্রাশ

বিশেষ ফলপ্রদ রসায়ন ও বাজী
রোগীদের ও চাঙ্গাকারী খুব
উপকারে আসে

বিউটি ক্রীম

ত্বক ও ত্বকের সৌন্দর্য
আরসিনের খুব সাধনায় প্রস্তুত।

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস. (লণ্ডন)
এম,সি,এস. (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব
অধ্যাপক।

Dr. Ghose

সাধনা
ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৪৮
শাখা ভারতের সর্বত্র

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেস্ট

সাধনা টুথ পেস্টও বহুতর-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ করেন তাঁদের জন্যই এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) এফ.সি.এস, (আমেরিকা) ডাবলিন কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম.বি.বি.এস, (ক্যাল)
আয়ুর্বেদাচার্য

With best compliments of

TATA STEEL

কেশীর বাঁধনে বন্যা ছিল কি বাঁধা ?

সত্যিই রমণীর কেশ তবে রমণীর শোভা

কেশে কেমিক্যালের **ক্যান্থারাইডিন**

কেশ তৈল কেশরাশিকে এক অনুদ্দাম রূপলাবণ্য ছড়িয়ে দিতে পারে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল বুনের নিয়মিত খাদ্য যুগিয়ে কেশরাশিকে পরম রমণীয় করে তোলে যা আপনার সম্পদ তথা গর্বের বস্তু।

কসমেটিকস্ ডিভিসন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর

দিল্লী ○ মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ লক্ষ্ণৌ

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

ভাদ্র ১৩৭৯,

অষ্টবিংশতি-বর্ষ

SEPTEMBER 1972

মূল্য : এক টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বার্ষিক পূজা সংখ্যা সহ—কুড়ি টাকা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীযোগবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার
সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও খাদ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী-ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত, ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

এবারে আবার মহাতীর্থ কালীঘাট	—অধীর দাশশর্মা	২৭৩
বাতাসে শিউলির গন্ধ	—উৎপল চক্রবর্তী	২৭৬
নাগরিক আগমনী গান	—বল্লাল সেন	২৭৯
বিপ্লব বহ্নি	—দীপঙ্কর	২৮১
আবার সেই জেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	২৮৯
নাটমঞ্চ	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৯৬
ছৌ নৃত্য : প্রাচ্যের বিস্ময়	—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী	৩০১
বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাহিনী		
কাউণ্ট অব মণ্টেক্রিস্টো	—চিরঞ্জীব ভরদ্বাজ	৩০৪
গ্রামীন সংস্কৃতিতে পুতুল ও পট	—কল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩০৯
লণ্ডনের চিঠি	—অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১২

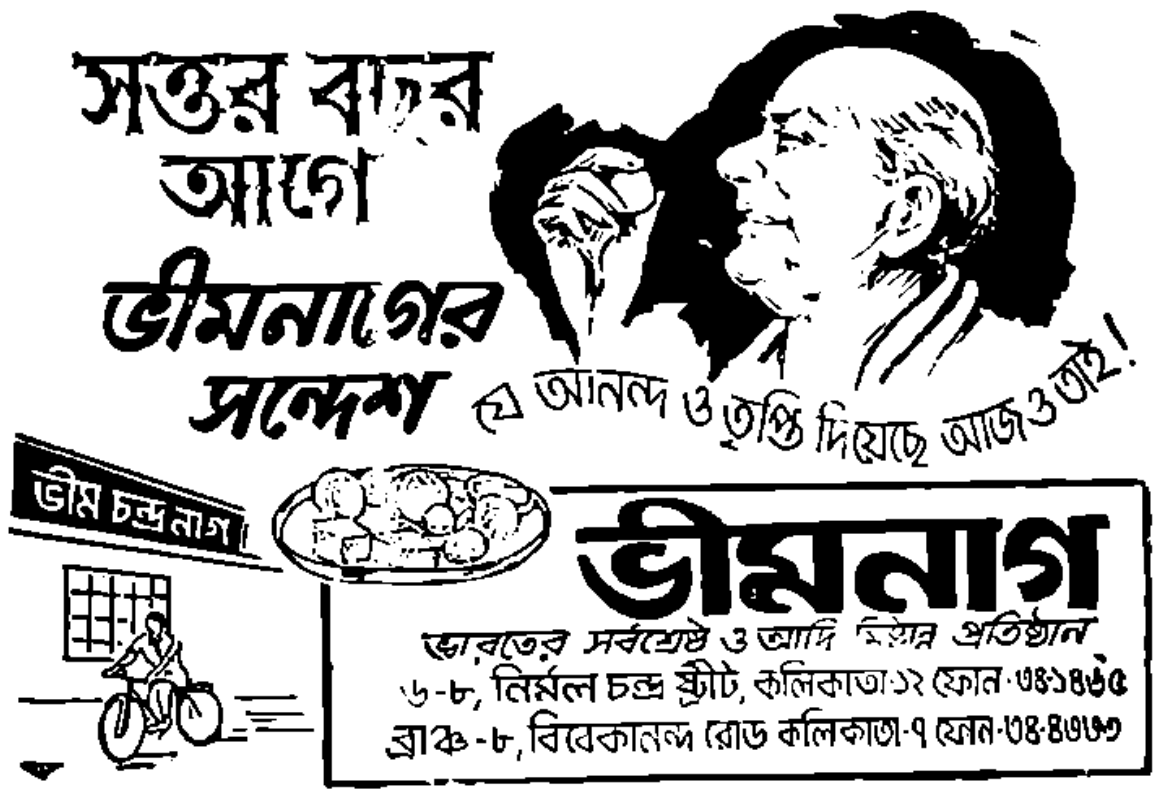

এই সংখ্যায়

যা অনিবার্য তাকে মেনে নিন	—মনস্বী	৩১৭
জীবননাট্যের খণ্ডচিত্র	—অনাথ উপাধ্যায়	৩২১
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	৩২৫
রূপান্তরাগ (গল্প)	—শিউলি সেনগুপ্ত	৩২৮
ঝরা পাতা (গল্প)	—শিপ্রা দত্ত	৩৩২
এই প্রথম		
শীত আসছে (গল্প)	—পার্থ সারথী গুপ্ত	৩৩৫
মেয়ে মজলিশ		
আজকের কথা	—বেলা দে	৩৩৮
দৈনন্দিন	—জয়শ্রী বসু	৩৩৮
আপনি কি খুবই চিন্তিত	—চিত্রা নন্দী	৩৩৯

এই সংখ্যায়

মাটির সরায় আঁকা		৩৪১
প্রশ্নোত্তরের আসর	—রাঙাদি	৩৪২
৺সুরুচিবালা সেনগুপ্ত	—জ্যোতির্ময়ী দেবী	৩৪৪
আরো কত দেবে নাথ :		
আরো আরো কত দেবে গো ! (কাহিনী)	—অন্নদাচরণ দে	৩৪৫
নিধিরাম (কাহিনী)	—দ্বিজেন্দ্র সান্যাল	৩৫২
ঘুম (গল্প)	—সুকুমার রায়	৩৫৭
কীটস্-এর শেষ ক'টি দিন	—রবীন্দ্রনারায়ণ দে	৩৬২
অপরাহ্নবতী (ধারাবাহিক উপন্যাস)	—সুবোধ সিংহ	৩৬৭

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তো তো জানতাম না

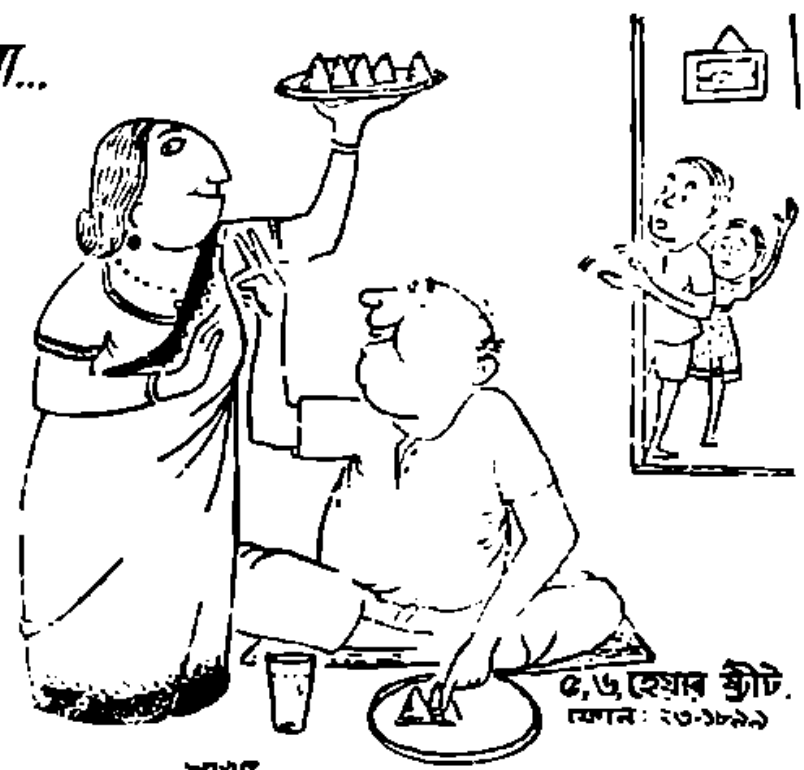

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭,রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট,কলিকাতা

ফোন : ৫৫-২৪৫০

৫,৬,হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯৯

শাখা

২৮,যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

সুলেখা
স্পেশ্যাল

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক ● রয়েল ব্লু ★ ব্ল্যাক।
ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ★ রেড ★ গ্রীন।

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক ● নেভি ব্লু ● সুপার ব্ল্যাক ● ব্লাক ব্লাউন।

ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ● এমারেল্ড গ্রীন ● স্কারলেট রেড ● ক্রিস্টাল স্কারলেট।

সুলেখা
জেনারেল

পার্মানেন্ট ঃ ব্লু-ব্ল্যাক।
ওয়াশেবল ঃ রয়েল ব্লু ● রেড ● ব্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা ● গাজিয়াবাদ

SW-4/73

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্ম্মরাঙা মর্ম্মকাহিনী

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ।

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতির অন্তরের ব্যথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতীর প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেইজন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সমর্থনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতী তার গৌরবোজ্জ্বল ২৮ বৎসরে পদার্পণ করেছে

আজই গল্প ভারতীর গ্রাহক হোন

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

পূজাসংখ্যাসহ বাৎসরিক চাঁদার হার সডাক মাত্র ২০ টাকা

যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

গল্প-ভারতী

ভারতের ও বাংলাদেশের সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৯৯ ও ৫৫-১৩৫৫

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট- **নিম।**

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দুর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

CALCUTTA UNIVERSITY

শঙ্খ ঘোষ

অষ্টবিংশতি বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
ভাদ্র ১৩৭৯

সম্পাদকীয়

মা আসছেন !

মা আসছেন, জগজ্জননী ব্রহ্মময়ী মা আসছেন, কল্যাণময়ী সর্বদুঃখহারিণী মা আসছেন সন্তানের কাছে এক বৎসর পরে। কিন্তু মা এসে কি দেখবেন ? আমরা যে আজ নিঃস্ব, সর্বহারা। আমাদের না আছে নীতি, না আছে আদর্শ, না আছে কর্তব্যনিষ্ঠা, না আছে ধর্ম। আমাদের জীবন থেকে শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা, কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবোধ চিরতরে বিদায় নিয়েছে।

আমাদের আজকের জীবন থেকে দ্রুত চলে যাচ্ছে সেই-সব মহৎ আদর্শ যে-সব আদর্শের পরিমাপ প্রত্যক্ষ লাভ লোকসানের হিসাবে হয় না। যে-সব আদর্শ হলো জীবনের উৎস। যে-আদর্শ অনুসরণ করে একদিন মানুষ মহত্ত্ব লাভ করেছে। একজন মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সে-আদর্শ জড়িত নয়, সে-আদর্শ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষকে যুগ যুগান্তর ধরে শক্তি জুগিয়ে এসেছে, শান্তি ও আনন্দ দিয়েছে।

আমার আপনার তৃষ্ণা দূর করতে এক ঘটী জলই যথেষ্ট কিন্তু সমগ্র ধরণী-মেদিনীর তৃষ্ণা দূর করতে হলে চাই আকাশের জল। এই সব মহৎ আদর্শ হলো সেই আকাশের জল। সমগ্র ধরণী-মেদিনীর জন্য আজ তাই তার প্রয়োজন।

কাজেই আমাদের আজকের জীবন থেকে যে-সব মহৎ গুণ যে-সব মহৎ আদর্শ বিদায় নিয়েছে, সেইগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে জীবনে। তা না হলে আমাদের জীবন দ্রুত পরিণত হবে মরুভূমিতে।

কাজেই আবার আমাদের নূতন করে কৃচ্ছ্র সাধন করতে হবে। বহুদিন সাধনা ও বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে জীবনের সেইসব মহৎ আদর্শকে ফিরিয়ে আনতে।

তবেই আমরা আবার মানুষ হয়ে জগজ্জননী আনন্দময়ী মায়ের যোগ্য সন্তান হতে পারব। এই হিংসা-বিদ্বেষ-হিংসা-সংকীর্ণতা-বিদীর্ণ পৃথিবীকে আমরা স্বরাজ্যে পরিণত করতে পারব। আর তখনি আত্ম-প্রত্যয়, আত্মতৃপ্তি, শান্তি ও আনন্দ নিয়ে জগজ্জননী আনন্দময়ী মায়ের আগমন প্রতীক্ষায় পরম আনন্দ লাভ করবো।

মনের দৈন্য

শুধু আমাদের দেশে নয়, আজ পৃথিবীর সবচে বড় বড় সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। এই সব সমস্যার মূল উৎস মানুষের মনের হীনতা। অন্নবস্ত্র মানুষের জীবনের বিরাটতম সমস্যা সন্দেহ নেই, কিন্তু নিছক মানবতা আজকের পৃথিবীতে কেন দুর্লভ হল, কেন আদর্শ নীতি সংশিক্ষা চরিত্র আমাদের জীবন থেকে অন্তর্হিত হল তা গভীরভাবে চিন্তা করা আজ নিতান্ত প্রয়োজন।

মানুষের মন আজ দেউলে হয়ে গেছে। আমরা আজ আত্ম-দৈন্যের চরম সংকটের সম্মুখীন। লোভ, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা আমাদের মনকে আজ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। নৈতিক মানের অধঃপতন, রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, বৈষয়িক-অসাধুতা ও দুর্নীতির চক্র থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের মানসিক পরিমণ্ডলে এক বিপুল ভাব-বিপ্লবের প্রয়োজন। এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের। কিন্তু কত বড় দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় যে তারা আজ পঙ্গু। শুধু পঙ্গু নন, তাঁরাও আজ বিশ্বধর্মান, চিত্তাদ্য তাঁর আজ আত্মসর্বস্ব। কর্তব্যবোধ ও জাতীয় সংবেদনের উচ্চ আদর্শ তাঁদের সামনে থেকে আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এবং তার কারণও খুব সুস্পষ্ট। সত্যিকারের শিক্ষার অভাবেই দেশের সর্বস্তরের মানুষকে আজ অমানুষ করেছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন বহুদিন পূর্বে অর্থাৎ স্বাধীনতা পাবার পরেই করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় নি। কেন হয় নি, কার জন্য বা কাদের জন্য হয় নি, সে-কথা আজ আর নয়। যত সত্বর সম্ভব আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন একান্ত প্রয়োজন।

যে-শিক্ষা মানুষকে অমানুষ করে সে-শিক্ষা শিক্ষাই নয়। স্বাধীনতা পাবার পর সুদীর্ঘ ২৪ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল অথচ সব চেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টির সম্বন্ধে কোন কিছুই করা হয় নি। না, হয় নি বললে ভুল বলা হয়, উল্টো পথে পরিচালিত হল। যার ফলে দেশের আশা-ভরসাস্থল যারা তাদের সংস্কার অধঃপতন তো হলোই, দেশের নৈতিক চেতনা আজ লুপ্ত প্রায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, আমাদের দেশের কর্ণধার যাঁরা তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একেবারেই নির্লিপ্ত, চেতনাহীন। মনের দৈন্যই যে এইসব নেতৃবর্গের নির্লিপ্ততার কারণ সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

নীরদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

•

ভারতের সংবাদ পত্র জগতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ অতি স্মরণীয়। এই বৎসর সর্বপ্রথম ভারতের সংবাদ পত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে মামলা হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে ব্রিটিশ সরকার পক্ষের তৎকালীন ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল মিষ্টার শিউ কলিকাতার পুলিশ কোর্টে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের মালিক যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু, সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কার্যাধ্যক্ষ ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক অরুণোদয় রায়—এই চার জনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি আইনের ১২৪এ ও ৫০০ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের ও মানহানির মামলা রুজু করেন। এবং এই চারজনকে গ্রেপ্তার করার পরওয়ানার জন্য কোর্টে আবেদন করেন। সেদিন 'বঙ্গবাসী' বাঙ্গলা সংবাদপত্র সমূহের মধ্যে প্রচারে, প্রভাবে ও প্রভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ কাগজ ছিল। এই সংবাদ পত্রটি তখন দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে এতই জনপ্রিয় ছিল যে পল্লীগ্রামে বালকেরা ঘুড়ি করিবার জন্য কাগজ চাহিতে আসিয়া যাঁহারা নিয়মিত এই কাগজের গ্রাহক ছিলেন তাঁহাদের বলিত "একখানা বঙ্গবাসী" দেবেন? তখনকার মানুষ সংবাদপত্র বলিতে 'বঙ্গবাসী'কেই বুঝিত

[পূর্বে আমরা অনেকবার কালীঘাট বলি কালী-মন্দিরের ইতিহাস শুধুই ভক্তজন নয়, রহস্যাবৃত এবং এর কোন ইতিহাস নেই বলে তথ্যাদি সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর। বহু কষ্ট স্বীকার করে এবং নানাভাবে সে-সব সংগ্রহ করতে হয়। নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পেলে যেমন আনন্দ হয় তা পরিবেশন করে পাঠকদের কৌতূহল মেটাতে উৎসাহও হয় প্রচুর। লেখক অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছেন এবং তা লিপিবদ্ধ করেছেন এই প্রবন্ধে যা জেনে উৎসাহী পাঠকদের বেশ ভাল লাগবে]

এবার আবার

মহাতীর্থ কালীঘাট

অধীর দাশশর্মা

আজ যেখানে কালীঘাটের মন্দির দাঁড়িয়ে আছে পুণ্যার্থীরা রোজ যেখানে ভিড় করে, মন্দিরের পাণ্ডারা ফুল-বেলপাতা প্রসাদ বিক্রি করে, এককালে সেখানেও গভীর জঙ্গল ছিল। হয়ত এটাও সত্যি কথা হেস্টিংস হাউসে যেখানে শত শত নেয়ের বি. টি. পড়তে আসে, এখন যেখানে আর চোর ডাকাতের উপদ্রব নেই, সেখানেও একদিন বন্য প্রাণী দেখা যেত। তারপর দিনের পর দিন বসতি বেড়ে চলে। জঙ্গল কেটে বাড়ী ওঠে। ট্রাম লাইন বসে। দেশ স্বাধীন হয়। কিন্তু কালীঘাটের দেবী মাহাত্ম্যের জন্য এখনও লোকে আসে। এখনও ঘালখাতার দিন ভক্তের ভিড়ে মন্দিরে প্রবেশ করা যায় না। দুর্গা পূজার কয়দিনের ভিড়ের রেকর্ড কেউ রাখে না। ষোড়শ শতাব্দীর সেই দুর্গম জঙ্গলে এককালে যেখানে ভক্তের সমাগম হত পাঁচজন, এখন সেখানে হয় পাঁচ হাজার। এখনও এই পীঠস্থান জাগ্রত। এখনও মা কালীর নামে লোকে মানত করে। পাঁঠা বলি হয়। সাধু সন্ন্যাসী এসে ভিড় করে। ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং আত্মারাম ব্রহ্মচারী সেই কোন্ যুগে কালীকুণ্ডে এক আশ্চর্যজনক জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন, তখন থেকেই এখানে সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়। একান্নটি পীঠস্থানের মধ্যে কালীঘাট শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান সতীর অঙ্গের দক্ষিণ পদাঙ্গুলি এখানে এসে পড়েছিল বলেই পীঠস্থানের এই মাহাত্ম্য।

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেবের পৌত্র সুলতান আজিম ওসমানের বাংলা শাসন সময়ে ইংরেজেরা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই গ্রাম তিনটি সুবাদারের নিকট টাকায় ক্রয় করেন। কলিকাতার সাথে কালীঘাটের অস্তিত্ব বহু পূর্বকাল থেকেই বিশেষ ভাবে জড়িত। গোবিন্দপুর এবং সুতানুটি গ্রামের এখন আর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সেই ছোট্ট গ্রাম কলিকাতা এখন মহানগরে পরিণত হয়েছে।

কালীঘাটের সংলগ্ন গঙ্গা এককালে সেও এরূপ ছিল না। ভাগীরথীর অগণিত বালুকারাশির স্তর পড়ায় গঙ্গা স্রোতের পরিবর্তন ঘটে। নতুবা কলিকাতা থেকে পশ্চিমাভিমুখী যে প্রশস্ত নদী এখন সমুদ্র পথের প্রধান হয়েছে একসময় এগুলো সামান্য খাত খাল ছিল। এই পথে সেই সময় লোকে তমলুক, হিজলী, উৎকল প্রভৃতি স্থানে নৌকা পথে যাতায়াত করত। যারা সেদিন গঙ্গা পথে বাণিজ্য করতে বের হতেন সেই বণিকগণ এই

কালীঘাটে দেবীর দর্শন এবং উপাসনা না করে যাত্রা করতেন না। অনেকের ধারণা এই সমুদ্র পথেই নীলগিরি পর্বত থেকে সমুদ্র উচ্ছ্বাসের ফলে শিলাস্তম্ভ নিয়ে আত্মারাম এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি সমুদ্র জলে ভেসে আসেন। এবং কালীঘাটে এসে উপনীত হন। এবং দেবীর আদেশমত শিলাস্তম্ভে কালী মূর্তি অঙ্কন করে পূজা অর্চনা করতে শুরু করেন। এই আত্মারাম ব্রহ্মচারী এবং ব্রহ্মানন্দ গিরি সঠিক কত সালে এই কালীঘাটে এসে উপনীত হয়েছিলেন বলা মুস্কিল। হয়ত সেটা ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেও হতে পারে। ১৬০৬ খ্রীঃ রাজা মানসিংহ বাংলার বিদ্রোহ দমন করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশ পান। সেই সময় মানসিংহের কাছে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য পরাভূত হন। মানসিংহ লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার নামক কোনো ব্যক্তিকে মাওরা, যশোহর, কলিকাতা, পৈকান ও আনোয়ারপুর এই পাঁচটি পরগণা এবং হেতেগড় পরগণার কিয়দংশের কানুনগোর সনদ আনিয়ে দেন। অনুমান করা হয় এই লক্ষ্মীকান্ত ছিলেন কামদেবের পুত্র। কামদেব মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী পরবর্তী বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশীর রাতে কালীঘাটে এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখতে পান। পদ্মাবতীর কথা শুনেই আত্মারাম এবং ব্রহ্মানন্দ গিরির দেবীর কথা মনে পড়ে। ঐ জ্যোতিষ্মান পদার্থ দেবীর পাষাণীভূত চরণাঙ্গুলি ব্যতিত আর কিছু নয়। লক্ষ্মীকান্ত পারসিক ভাষায় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। খুব সম্ভব বাদশাহ লক্ষ্মীকান্তের বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তাকে মজুমদার উপাধী প্রদান করেন এবং রাজস্ব আদায়ের কর্মচারী পদে নিযুক্ত করেন।

হয়ত গ্রাম-কলিকাতা পীঠস্থান বলে পরিচিতি লাভ করার পূর্বে অনেক কাল পর্যন্ত এই কালীঘাট অরণ্যসঙ্কুল ছিল। সেই সময় আশা করা যায় ভৈরবী, কাপালিক প্রভৃতি তান্ত্রিকগণ এই অরণ্যে নরবলি দিতেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই দিল্লীর পাঠান রাজত্বের সময় কালীঘাটের অনতিদূরে স্থানে স্থানে মনুষ্য বসতি গড়ে উঠেছিল। এই সময় কালীঘাটের চতুষ্পার্শ্বে বেত কচুই প্রভৃতি লতাগুল্মের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। বর্তমানের কালীমন্দিরের পূর্বদিকে বনের মধ্যে হয়ত প্রশস্ত পথও ছিল। সেই অরণ্য পথ আজ বিলীন হয়ে গেছে।

কালীঘাটের আজ যে নূতন মন্দিরটি দেখা যায় তার গোড়াপত্তন ঘটে ১৮০৯ সালে। ২৪ পরগণায় সেই সময় সন্তোষ রায়ের অসীম প্রভুত্ব ছিল। শুধু জমিদার বলে নয়, তিনি সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশের অধিপতিও ছিলেন। কথিত আছে রাজস্ব না দেওয়ার ফলে সন্তোষ রায় আলিবর্দী খাঁর সময় মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। সন্তোষ রায় মুর্শিদাবাবাদ থেকে ছাড়া পেয়ে অতি সমারোহে কালীঘাটে পূজা দেন। সন্তোষ রায় শক্ত ছিলেন। তিনিই এই মন্দিরটির সূত্রপাত করে যান। তার মৃত্যুর ৫৬ বছর পর কর্নেল বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়। সন্তোষ রায় ছিলেন লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারেরই বংশধর।

এদিকে আত্মারাম ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন আনন্দ গিরি। আত্মারামের তিরোধানের পর মন্দিরের সেবা-পূজার কাজ আনন্দগিরির হাতে আসে। আনন্দগিরির মৃত্যুর পর তার শিষ্য ভুবনেশ্বর গিরি প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে কালীমন্দিরের সেবায়েত হন। তার ভৈরবী-স্ত্রী যোগমায়া ছ মাসের এক শিশু কন্যা রেখে পরলোক গমন করলে ভুবনেশ্বর গিরি এই শিশু কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপার নিয়ে একটু বিপদে পড়েন। সেই সময় কালীঘাট মঠে জগদানন্দ সর্দারের পুত্র পরমানন্দ সর্দার নামে এক বিশ্বস্ত বলবান সেবক ছিলেন। পরমানন্দ পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে যখন মারা যান তখন তার এক শিশুকন্যা এবং স্ত্রী হৈমবতী বিদ্যমান। হৈমবতী আশ্রমের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং আশ্রমের সবাই তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ভুবনেশ্বর গিরি অনন্যোপায় হয়ে এই হৈমবতীর হাতেই উমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেন। হৈমবতীও নিজের মেয়ে তারা অপেক্ষা অধিক স্নেহে উমাকে প্রতিপালন করতে থাকেন।

সেই সময় এক ব্রাহ্মণ যুবক তার নিরুদ্দিষ্ট পিতার খোঁজে কালীঘাটে এসে উপস্থিত হন। শাঁখা বিক্রি করে তিনি নিজের পথের এবং অন্যান্য খরচ নির্বাহ

করতেন। একদিন একজন স্ত্রীলোক দু-পাল্লা শাঁখা কিনে কালীকুণ্ডে ডুব দেন। তিনি বলেন, "তুমি একটু দাঁড়াও। আমি স্নান সেরে বাড়ী গিয়ে তোমার শাঁখার দাম দেব।" ভবানীদাস অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও স্ত্রীলোকটি কালীকুণ্ড থেকে উঠে আসেন না। ভবানী দাস ভাবেন, হয় স্ত্রীলোকটি ডুবে গেছেন, নতুবা কুমীরে নিয়ে গেছে। তিনি চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেন। সেই সময় জলের ভেতর থেকে দুই হাত তুলে স্ত্রীলোকটি বলেন, "তুমি ঐ মন্দিরে গিয়ে আমার ছেলেদের কাছে আরো দু-জোড়া শাঁখা বিক্রি করে দাম নিয়ে যাও।" এই বলে স্ত্রীলোকটি অদৃশ্য হন। ভবানীদাস কিছু না বুঝতে পেরে মন্দিরে আসেন। এবং মন্দিরের পূজারীদের আদ্যোপান্ত ঘটনা বলেন। ভুবনেশ্বর গিরি এবং মন্দিরের অনেক ব্যক্তি বিস্ময়ের সাথে দেখে দেবীর হাতে রক্ষিত সেই দু-পাল্লা শাঁখা পাওয়া যাচ্ছে।

লীলাময়ীর লীলা বুঝতে পেরে হতচারী ভবানীদাসের নিকট থেকে আরো দু-পাল্লা শাঁখা কিনে দেবীর অপর দু-হাতে পরিয়ে দিয়ে কৈলাসে চলে গেলেন। এরূপ অবস্থা দেখে ভবানীদাসও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। ভুবনেশ্বর গিরি যখন শাঁখার দাম ফিরে দেন তখন তিনিও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়েন। বলেন, "আমি আর শাঁখার দাম চাইনা। ঐ চরণের এক বিন্দু ধুলো পেলেই আমি কৃতার্থ হই।"

ভবানীদাসের আর শাঁখার অনুসন্ধান করা হয় না। তিনি কালীঘাটেই থেকে যান। এবং পরবর্তীকালে ভুবনেশ্বর গিরির কন্যা উমাকে বিয়ে করেন। ভুবনেশ্বর গিরি জামাতা ভবানীদাসকে যৌতুক স্বরূপ পূর্ব প্রতিশ্রুত কালীমূর্তি এবং অন্যান্য সম্পত্তি প্রদান করেন। এই সময় একদিন ভুবনেশ্বর গিরি শাশ্বির কন্যা তারা এবং ঔরস জাত কন্যা উমার সাথে অর্থ এবং সম্পত্তির কি এক কথা নিয়ে তুমুল ঝগড়া হয়। ভবিষ্যতের একটা গণ্ডগোলের আশঙ্কা বুঝে ভুবনেশ্বর গিরি সম্পত্তির একটা বিলিবাটা করে দেন। এবং সেই বিলিবাটা মতই আজ পর্যন্ত শ্রীমন্ত এবং ভবানীদাসের বংশধরের মধ্যে সদ্ভাব আছে।

কালীমূর্তি প্রকাশের কোন সময় কার দ্বারা কালী মন্দির নির্মাণ হয়েছিল সেটা সঠিক বলা যায় না। অনেকে মনে করেন মোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অর্থাৎ আইন-ই আকবরী প্রণয়নের সময় কালীঘাট মহাতীর্থ বলে বিবেচিত হয়। মনোহরের দ্বারা এরূপ ধারণার বশে এই মন্দির নির্মাণ হয়েছিল কিন্তু এই শতাব্দীর বিদেশ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভে হুজুরী মহলকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দেয়। প্রসিদ্ধ হুজুরি মহল আপন কীর্তি রাখার জন্য কোম্পানীর কাছে কালীঘাটের ভূমি প্রার্থনা করেন হুজুরী মহলের সময় আনা করা যায় নিশ্চয় কালী মন্দিরটি ছিল। সম্ভবতঃ ১৭৭০ খ্রীঃ বহু অর্থব্যয় করে গঙ্গার ধারে, চালনি এবং কয়েকটি ঘিঞ্জিতে নিয়ে করাতেন না। তিনি ঐ অর্থব্যয়ে নিশ্চয়ই মন্দির করে দিতেন সুতরাং অনুমান করা যায় ঐতিহাসিক কালীঘাটের কালীর মন্দির অবশ্যই ছিল। এই মন্দিরটি ভাঙ্গা চুরা অবস্থায়ও ছিলনা। এই মন্দিরের পরিবর্তে পরবর্তী কালে সন্তোষ রায় বড় মন্দির প্রস্তুত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং ১৮০৯ সালে সেটি সমাপ্ত হয়। এবং অদ্যাবধি সেখানেই পূজা হয়ে আসছে।

• • •

কালীমন্দিরের রহস্য উদ্ঘাটনে যতই আমরা এগিয়ে চলেছি ততই আমাদের বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। কী রোমাঞ্চকর ও রহস্যাবৃত সব তথ্য। অপূর্ব অভাবনীয় ঘটনার দ্বার খুলে যাচ্ছে আমাদের সামনে। অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাচ্ছি আমরা। কত বিপুল উৎসাহ, পরিশ্রম ও ধৈর্য কাজ করছে এর পেছনে তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের লক্ষ্য শুধু ভারতবর্ষ নয়, এশিয়াও নয়, সারা পৃথিবীতে যেখানে কালীবাড়ী আছে আমরা তারই তথ্য সংগ্রহ করবো। এ এক অসম্ভব কাজ—প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যাঁর কাজ তিনিই করবেন, আমরা ক্রীড়নকমাত্র। এই বিরাট ভারতীয়কাজে—কর্তব্যে আমরা সকলের দেশবাসীর সর্বপ্রকার সাহায্য কামনা করি।

সম্পাদক-গ্রন্থভারতী

বাতাসে শিউলির গন্ধ

উৎপল চক্রবর্তী

একথা স্বীকার করাই ভালো, কলকাতায় বর্ষা আসে রবীন্দ্রনাথের গানে, কাশফুল নয় শিউলির গন্ধ নয়, রেডিওর নব্ ঘুরালে যখন গান বেজে ওঠে 'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে'—তখন নিশ্চিত বুঝতে পারি বর্ষা শেষ হয়েছে, শরৎ এসেছে এবারে।

এসেছে শরৎ হিমের পরশ লেগেছে হাওয়ায় পরে—এখন নগর সংকীর্তনের সুরের সঙ্গে যেন মেখামেশি। বাংলার ছয় ঋতু বার্ষিক পেরণ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য এখন আত্মগোপন করেছে কবিতার ছত্রে, চিত্রময় রূপের আড়ালে।

শুধু তার মৃন্ময় রূপৈশ্বর্য সন্তার ছড়িয়ে রেখেছে সে অকৃপণভাবে তার গ্রামে। শহর থেকে দূরে এগোলেই ধোঁয়া আর ধুলোয় ভরা বাতাসের ঘনবদ্ধ করা জটিলতা আচমকা মিউয়ে উঠে তাজা সুবাসের স্নিগ্ধতায়—বাতাসে শিউলির গন্ধ, চোখ বুজে বার দিগন্তজোড়া মাঠের বুকে, কাঁকে, কাঁকে যেন আবাহনের হাতছানি দিয়ে খুঁজতে বাধা বাড়ছে কাশফুলের গুচ্ছ, দীর্ঘকায় ধূকে ফুড়ে আনন্দিত সৌরভ ছড়িয়ে হৃদয় উন্মুক্ত করে ফুটে আছে শ্বেতপদ্ম, নীল অপরাজিতার চোখে নিঃসীম নীল আকাশ যেন বাঁধা পড়ে আছে, মনে হয়—ভাদ্রের ভরা নদীর হাওয়ার ঢেউয়ে স্পষ্ট বেজে উঠছে আগমনী গান—

শরৎ এসেছে! আকাশে, বাতাসে তার ছন্দিত চরণ ধ্বনি। কোন যন্ত্রযান্ত্র কৃত্রিম সুরের আবৃত্তি নয়, নয় কোন প্রাণহীন কথার কারুকার্য—বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রবল প্রাণের স্পন্দনে উদ্বেলিত হয়ে শরৎ তার চিরকালের সৌন্দর্য নিয়ে এখন ফুটে উঠেছে।

সত্যিই সে তার প্রাণের দ্বারে অতিথি বরণ করার জন্য আজ সর্বাঙ্গে প্রস্তুত হয়ে আছে!

এ কোন অতিথি, যার জন্যে এমন সজ্জায় বাংলার এমন আনন্দিত সমারোহ, এমন নবীন মেঘের চপলতা।

বাংলার মানুষ জানে এ অতিথি তার বড় আপন, একান্ত প্রিয়জন তারই ঘরের মেয়ে আজ বছর শেষে আবার আসছে তার ঘরে। সেই কবে তাকে চোখের জলে বিদায় দিয়েছিলো, বিজয়া দশমীর সেই ম্লান অশ্রু-সজল সন্ধ্যায় তার বড় আদরের উমারানী চলে গিয়েছিলো দূর বিদেশে, তারপর থেকে প্রতিদিন প্রতিটি ঋতুর আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতীক্ষাকে সে পরিণত করেছে নিশ্চিত প্রত্যাশায়, প্রত্যাশার মুহূর্তগুলি ভরিয়ে তুলেছে তাকে বরণ করার প্রস্তুতিতে, যেন বার বার নানা রূপের পরিচ্ছদে নিজেকে আবৃত করে সে যোগ্য করে তুলতে চেয়েছে নিজেকে, তাকে এই বরণ সজ্জা—এই শিউলি ফুলের মালা, এই পদ্মগন্ধ হৃদয়, এই খণ্ড মেঘ খচিত নীল গগনের বিস্তৃত আঁচল, এই অপরাজিতায় বরণডালা—সে আসছে।

সে আসছে, তাই বাংলার ঘরে ঘরে বেজে উঠেছে তার আগমনী গান। এতো দূর আকাশের কোন দেবী নয়, নয় সন্ধ্যার অপরিচিতার ভয় মিশ্রিত প্রহর আসনে উপবিষ্টা পরম পূজনীয় কোন প্রতিমা—এতো তারই ঘরের মেয়ে। তাই গানের বাণীতে বাংলার ও বাঙালীর আকুলতা ফুটে ওঠে—

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাবো না—
যে যা বলে বলুক লোকে কারো কথাই শুনবো না।....
যদি আসেন মৃত্যুঞ্জয়, উমায় নিয়ে যাবার কথা কয়
মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না।

এই যে একান্ত ঘরোয়া মাতৃপ্রতিম হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও সম্ভবত একমাত্র বাংলার ঘরে ছাড়া আর কোথাও উচ্চারিত

হয় না। দেবতাকে আপন করে নেয় এই দুর্লভ সাধনায় তার দরিদ্র কুটিরেও তাই সে আনন্দময়ীকে আহ্বান জানাতে কুণ্ঠিত হয় না! গানে গানে সে ডাকে—

এস মা আনন্দময়ী এ দীন কুটিরে
পা দুখানি বুলাইব নয়নের নীরে।

সে ডাকে তার দুঃখে বর্ষার চোখের জল সেই মানে, বুকের দরজায় তখনই প্রিয়জনের রথ এসে থামে।

হোক না তার ক্ষীণ কুটির, দীর্ণ সজ্জা তবু তাকেই রঙে রেখায় চিত্রিত করে সে হৃদয়ের আসন পাতে উমাকে বরণ করার জন্য। মাটির দেয়ালে নতুন করে প্রলেপ পড়ে, প্রতিটি ঘর ধোয় ধুয়ে মুছে নিখুঁত করা হয়, উঠোন নিকিয়ে তাতে পিটুলি গোলার শুভ্রতায় অলংকৃত করে যেন তার ব্যাকুল প্রতীক্ষাকেই মূর্ত করে তোলা হয়।

দরজায় লেখা হয়—

শ্রীশ্রীদুর্গামাতার আগমনে

আর এই ঘোষণায় বাড়ি নতুন করে গ্রামকে আবার আনন্দমুখর করে তোলে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দুর্গা মেলায় বা চণ্ডীমণ্ডপে বসে গ্রামের মানুষেরা আগমনী গান করেন। গান শুরু হয় সেইদিন থেকে যেদিন প্রথম ঠাকুরের গায়ে মাটি দেওয়া হয়। আর এই গানের ছন্দে কখনো কখনো উদ্ভাসিত হয় ঢাকের আওয়াজ—তার ঘোলের শব্দ যেন ডাক দিতে থাকে—পরবাসী ফিরে এসো ঘরে—গ্রামে গঞ্জে নৌকায়, পরম গাড়ীতে চেপে বাসে গৃহস্থামী সন্তানের সুখের সংলাপের ধ্বনি যেন কান পেতে শোনে গ্রামের বাতাস।

কতদিন তো হয়ে গেল, এখনো আমি সেই ঢাকের ডাক শুনতে পাই—কত ঝড় ঝঞ্ঝা, ঝাঞ্ঝা, সংগ্রাম কেটে ছিঁড়ে দুভাগ করে দিলো বাংলার হৃদয়—তবু এখনো স্পষ্ট শুনি পূর্ববাংলার আমার ছেড়ে আসা গ্রাম কুসুমীর সেই পুজোর আহ্বান! এই তো ভাদ্রমাস—আর কটা দিন পরেই সেই বোধন লগ্ন। এখন থেকেই দিন গুনতাম আমরা কখন পা রাখবো গাঁয়ের মাটিতে। শহরের কোলাহল ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠত, দমবন্ধ নাগরিক রাস্তাঘাটের সঙ্কীর্ণতা যে মনটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলার কুটিল ষড়যন্ত্রে ভীষণ হয়ে উঠত—প্রহর গুনতাম কবে এই শহর থেকে বাসে চেপে সেই স্টেশনে পৌঁছব, তারপর ট্রেন তারপর কামরার জানালায় ক্ষণিক মুক্তির পর্দায় নানা দৃশ্যের উদ্ভাসিত হাতছানি, টেলিফোনের তারে মুক্ত পাখীর লীলা, কাশফুলের নিবিড় প্রশান্তি, বটের আর্তনাদ ছাপিয়ে হঠাৎ ভেসে আসা ঢাকের বাজনার তীব্র আকুতি—তারপর সেই আদরমাখা আমাদের গ্রামের স্টেশনে, সেই দীর্ঘ রোদ্দুরে পথ, সেই উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় নিজেকে সমর্পণ সেই পথের প্রতিটি ধাপ এখনো যেন আমার গায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে, এখনো স্পষ্ট দেখি সেই বা হাতি পাকুড় গাছের ছোট বন, সেই কাঠের পুল, সেই মজুমদার বাড়ীর পুকুর, সেই বাঁশঝাড় আর তারপর সেই মণ্ডপ, সেই বেলতলা আর আমাদের জন্যে অপেক্ষারত বাইরেকোঠা।

যে যেখানে আছেন, যতদূর আছেন সবাই এসেছেন, সবাই আসছেন একে একে গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতেই দেখা হয়ে যায় কারো সাথে

—এই যে কখন এলি, কে কে এলি, তোরা কবে এসেছিস, সবাই কি এসেছেন, এবার কি নাটক করবি, রিহার্সাল শুরু হয়েছে, চাষাগানের দল আসছে তো, এবার কোন্ যাত্রা পালা হবে রে, প্রতিমা কেমন হয়েছে—কত কথা, কত হাসি অকারণ পুলকের শিহরণ! আর তারপর নিজের ঘরে একবার ঘুরে ছুঁয়ে আসা। কোথায় দিন আর কোথায় রাত—যে যার বয়স অনুযায়ী সঙ্গীর ভিড়ে একেবারে হারিয়ে যাওয়া, কখনো পুকুরের জলে সম্মিলিত সাঁতারের তরঙ্গ কল্লোল, কখনো মাছধরার ক্ষণিক তন্ময়তা, কখনো জলভরা ধানক্ষেতে অপটু হাতে চালানো টাল-মাটাল পানসীর খেলা, কখনো তারস্বরে নাটকের সংলাপ মুখস্থর কোলাহল, আরো আচমকা ঢাক বাজিয়ে খেলোয়াড় জোগাড় করে বলাখেলা, কখনো মণ্ডপ সাজানোর পবিত্র কাজে ব্যস্ততা—অধিকারী বাড়ীর প্রতিমা কেমন হলো, মজুমদারদের বাড়ীর সবাই এসেছে তো—বৈষ্ণবদের আখড়ায় কীর্তন চলছে কেমন—

সার গ্রামজুড়ে এক আশ্চর্য সজীবতা, যেন সমস্ত পৃথিবীর দুঃখ থেকে বিচ্ছিন্ন একমুঠো স্বর্গসম্ভব পরিবেশ—

রাধা কতদিন তো হলো, এখনো রক্তের স্মৃতিতে শুধু তারই যৌবন। এই ভাদ্র যখন আসে, যখন দারা বছরের নগর সভ্যতা নানাভাবে গড়ে পিটে আমাকে তীক্ষ্ণ শুধু ক্ষুরধার করে তুলতে চায়—তখন আচমকা দুয়ার থেকে অদূরে একটু গ্রামের ছায়া চোখে পড়লেই কাশফুল অপরাজিতা, পদ্ম আর নীলাকাশ আমাকে টেনে নিয়ে যায় বাংলার গোপন হৃদয়ে, যেখানে এখনো অরুণ আসে অবিকৃত রূপে, তার আসন পাতে আনন্দময়ীর শুভ্র বাতাসে শিউলির গন্ধ আবহমানের বাংলার চিরকালের স্মৃতিকে মূর্ত করে তোলে।

•

রামজয় তর্কভূষণ মহাশয়ের বয়স তখন মাত্র একুশ। একদিন তিনি একা হাঁটছিলেন অরণ্যপথ দিয়ে। হঠাৎ সম্মুখে পড়ল একটি ভল্লুক। অরণ্যের এই হিংস্র জন্তুটি থাবা উঁচিয়ে তেড়ে এলো তাঁর দিকে।

তর্কভূষণ মহাশয়ের হাতে থাকতো এক লৌহদণ্ড। তিনি তাই দিয়ে প্রহার শুরু করলেন। ওদিকে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝরতে আরম্ভ করছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তর্কভূষণ মহাশয়ের। তিনি শেষে ভল্লুকটির পেটে কয়েকটি লাথি মারতেই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

চরণ অতিক্রম করে দীর্ঘ আট মাইল পথ পায়ে হেঁটে রামজয় মহাশয় তখন চলেছেন মেদিনীপুরে তাঁর আত্মীয় বাড়ীতে।

কে এই রামজয় তর্কভূষণ? ইনি বিদ্যাসাগরের পিতামহ। এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের অপরূপ চরিত্র মাহাত্ম্য তাঁর জ্যেষ্ঠ পৌত্রের অংশে অর্পিত হয়েছিল।

নাগরিক আগমনী গান

বঙ্গাল সেন

এবার দেবীর আগমন কোন্ বাহনে ?

না। হাতের কাছে পাঁজি শহুরে লোকের থাকে না আমি চোখ দ্বাধি বাটার বিজ্ঞাপনে

বর্ষাচ্ছা আনন্দে দেবীর বাহন ছড়িয়ে পড়ে শহরের চতুর্দিকে ? অম্ব বা গজ দাবার চক ছেড়ে যেন শহরের রাস্তায় বিভিন্ন ছকে বসে যায় আমি নিশ্চিন্ত বুঝতে পারি, পুজো আসছে। শিউলীর গন্ধ নয়, ধোঁয়া আর ধুলোর চাকা বাতাসের ঘন স্তর ভেদ করে নাকে আসে দামী, কমদামী সেন্ট আর ঘামের গন্ধ. বুঝতে পারি পুজোর বাজার হয়েছে, কাশফুলের শুভ্রতা নয়, পাড়ায় পাড়ায় দামী নিশানে সান্ধ্যকালীন পুজোর আবাহন বার্তার অনুভব করি পুজো আসছে. ঢাকের ঢাকের শব্দ নয়— কান পেতে শুনি লাউড স্পীকারের আর্তনাদ কখন শুনবো বলে।

একই বাংলা একই শারদোৎসব তবু গ্রামে শহরে আজ এমনই একটা দুস্তর পার্থক্য উৎসুক মনকে বিচ্ছিন্ন করে. চোখকে চমকে দেয়।

এখন গ্রামে যখন কাশফুল, শিউলি আর পদ্মের বর্ণ-ছটা তখন শহরের গায়ে রং লাগে নানাবর্ণের জামা-কাপড়ের পাহাড় প্রমাণ সমারোহে। নিওন আর রঙীন আলোর চোখ ধাঁধানো জেল্লায় প্রতিটি বস্তুবিপণী যেন রাশি রাশি ফুল ফোটাবার খেলায় মত্ত। আর তারই টানে প্রজাপতির মতো ফুরফুরে হালকা-আনন্দে পাখা মেলে দলে দলে উড়ে আসছেন যুবক-যুবতীরা, এফুল থেকে সে ফুল, এ দোকান থেকে সে দোকান।

এখন গ্রামে যখন ঢাকে বোল দেবার জন্য হাতে পোষাক আসছে ঢাকীদের, শহরে তখন এবছর কোন্ কোন্ শিল্পীর পুজোর গান ডিস্ক হলো—তাঁদের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য অগ্রিম বায়না যাচ্ছে মাইকের দোকানে, বোধ হয় আর পোষাক আসছে আমাদের কানে—না পুলকে নয়—ত্রাসে. কেননা সংযমহীন সাংস্কৃতির নির্বিচার আত্মীয়তায় যখন গলাগলি করে প্রবেশ করে সেখানে তখন তাকে শুভধ্বনি বলতে বেশ মানসিক বল স্বীকার করতে হয়।

তবু, সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হলেও. একটা স্তব্ধ মাধুর্যতা আছে শহরের প্রাক্-পুজো আবহাওয়াতেও। গ্রামে এখন যেখানে শান্ত শুভ্র স্নিগ্ধতার ভেতর দিয়ে প্রকৃতি আর মানুষ প্রস্তুত হচ্ছে শারদোৎসবের জন্য আধুনিক সভ্যতার দর্পিত পদক্ষেপে সেখানে শহর সোচ্চারে যেন আগমনী গান ধরেছে নতুন সুরে !

'পূজার আর একমাস বাকী'—খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন যখন নীরব ঘোষণা জানায় তখন থেকে 'সাজ সাজ' রব ওঠে শহরে মুহূর্তে রঙীন বস্ত্রখণ্ডে দোকানে দোকানে আমন্ত্রণ, 'প্রাক্-পূজা সেল', কাগজে কাগজে শারদীয় সংখ্যার চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন, স্টেশনে বুকিং অফিসে দূরগামী ভ্রমণবিলাসী মানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, টুরিষ্টব্যুরো ট্রাভল এজেন্সির সিট্ রিজার্ভ করতে ব্যস্ত, পুজো অ্যাডভান্স, বোনাস নেবার জন্য শ্রমিক কর্মচারীদের উদ্গ্রীব আগ্রহ, নতুন সিনেমা কোন্‌টা রিলিজ করছে তার সংবাদ সংগ্রহ, ঘরে ঘরে পুজোর বাজেট রচনা এবং বচসা, প্রতিমার রূপবৈচিত্র্যে নতুনত্বের পরীক্ষা নিরীক্ষা—সারা শহর জুড়ে একটা তীব্র চাঞ্চল্য—হাঁ এর একটা আলাদা স্বাদ আছে বৈকি।

বস্তুত, স্বীকার করাই ভালো, ইচ্ছে থাকলেও আধুনিক মানুষের নানা কারণেই আর গ্রামে থাকার উপায় নেই। জীবিকা এবং জীবনযাপন যদি সুষ্ঠু মতো করতে হয় তার সুযোগ সুবিধে এই মুহূর্ত পর্যন্ত শহরেই কেন্দ্রীভূত। গ্রামে যদি বা কোন আবাসস্থল থাকে তা'ও ব্যবহৃত হয় অবসর বিনোদনের জন্যই। নিতান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন বলেই গ্রামে আজীবন বাস করা সম্ভব অথবা নিছক মহৎ কোন আদর্শের প্রেরণায়।

কিন্তু সাধারণ মানুষ এ দুটোর মধ্যে কোন একটির শ্রেণীভুক্তও পড়েন না। সীমা আন্তরিক বন্ধুত্ব না হলেও প্রকৃত জীবিকার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই তাঁতীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকেই সকলের, আর আদর্শহানতাই যেখানে সত্য তার আদর্শ সেখানে শহরই হলো তার উপযুক্ত ক্ষেত্র। অতএব শিউলি আর কাশফুল, তাদের বাস আর আগমনী গান যত হৃদয়স্পর্শীই হোক—হৃদয় যেখানে মানুষ ধারাতে বসেছে সেখানে সে সব দৃশ্য অবান্তর, সে সব শব্দ শ্রুতি-সুখকরও নয়। তার চেয়ে মাইকের তীব্রস্বর, রঙীন শারদ সংখ্যার প্রচ্ছদের ঔজ্জ্বল্য, শাড়ী জামার বর্ণাঢ্য, চমক, নিত্য নতুন ফ্যাশানের চিত্তাকর্ষক অগ্রগতি অনেক বেশী উত্তেজক, অনেক বেশী কাম্য।

তাৎক্ষণিক আনন্দেই এখন সুখ, চিরকালীন গভীর কোন বিষয়ে মন দেবার সময় সাধ্য সবই বোধ হয় মানুষ ধারাতে বসেছে।

তাই প্রাক্-পূজার শহরে কোলাহলে সে ক্লান্ত হয় না। বরং পূজোর কদিন গ্রামের বাড়ীতে কাটিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিয়ে আসতে সে রাজী কিন্তু প্রস্তুতিপর্বের এই আনন্দিত ক্ষণে সে নিজেকে অনুপস্থিত রাখতে অনিচ্ছুক—কেননা নাগরিক চেতনার সর্বাধুনিক মুহূর্তকে সে সব সময়ই ছুঁয়ে থাকতে চায়। এবং গ্রামের মানুষও বোধ হয় আজ তাই চায়। তাই লোকাল ট্রেনে দলে দলে তাঁরা আসে এই শহরেই। পূজোর বাজার, প্রতিমার বায়না, রেকর্ডের দাম সংগ্রহ—আধুনিক সব উপকরণই তাঁরা সংগ্রহ করেন।

তাই গ্রামে আগমনী গানের পাশেই প্যাণ্ডেলে বাজে আধুনিক গান, পোষাকেও আসে আধুনিকতা, প্রতিমার রূপবৈচিত্র্যে লাগে সাম্প্রতিকের ছোঁয়া।

আমি জানি এই-ই হয় এটাই নিয়ম। কালের বিবর্তনে নানা ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে সংস্কৃতি এভাবেই পালটায়।

এরই মিশ্রণে গড়ে উঠবে বাংলার নতুন সংস্কৃতি শহর ও গ্রামের ব্যবধান মুছে দিয়ে চিরকালীন শারোৎসব এক নতুন রূপ নেবে।

*

"একদিন দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় মনোহরে আমার বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন; রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু দুঃখিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন তিনি তখন দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেইদিন জানিয়াছিলাম যে অন্য দায়ের যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল—নীল-দর্পণ।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

গভর্ণর জ্যাকসন বেঁচে গেল

এম এ ক্লাসে সহপাঠিনী দুই বন্ধু, কমলা দাশগুপ্ত আর কল্যাণী দাস। লক্ষ্মী মেয়ের মত তারা ক্লাসে নিয়মিতভাবে হাজির হয়, নিবিষ্ট মনে অধ্যাপকদের লেকচার শোনে, নোট করে, বাড়ীতে বসে অভিনিবেশ সহকারে সেই নোট পড়ে। ম আইন পরিচালন সবাই মনে মনে বলেন, লক্ষ্মী মেয়ে!

কিন্তু এই লক্ষ্মী মেয়ে দুটিই যে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠ্য গ্রন্থ ছাড়া অন্য বইও পড়ে, নির্জনে বসে অস্ফুট স্বরে অন্য আলোচনা করে, অধ্যাপকরা তা জানবেন কি করে?

সেটা ১৯৩৮ সাল, ডিসেম্বর মাস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে সবে সমাপ্ত হয়েছে। এই অধিবেশন উপলক্ষে বেঙ্গলার আর্মির ধাঁচে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যে স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল, তাকে ভঙ্গ করে দেবার জন্য বাংলার শহরে শহরে ও গ্রামে গ্রামে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স পার্টিকে শুরু করে দিয়েছে, শাসক ইংরেজের অবিরাম অত্যাচারে নেতিয়ে পড়া জনগণের শিরায় শিরায় আবার রক্তচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সেই চাঞ্চল্যের ঢেউ এই লক্ষ্মী মেয়ে দুটিরও অন্তরে বুঝি এসে ধা দিয়েছে। তাই গোপনে গোপনে ওরাও ছটফট হয়ে উঠেছে!

কল্যাণী একদিন কমলাকে বলল, ভাই, আমাদের বাড়ীওয়ালার ছেলে দীনেশের যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাঠিচালনা জানে সে। ভেতলার ছাদে সে মেয়েদের লাঠিখেলা শেখায়। মেয়েদের একটা ক্লাবই তৈরী করে ফেলেছে দীনেশ, নাম দিয়েছে, ছাত্রী সংঘ। আমার মনে হয়—

কি মনে হয় রে? জিজ্ঞেস করল কমলা।

মনে হয়—মনে হয়, ছোটো থেকে করে কল্যাণ চুপ করে গেল।

বল, বলে ফেল কমলা, ভাবছিস কি? আমরা, আমরা দীনেশের সঙ্গে পরিচয় করি, সাহসের মেয়ের হবে বটে, লাঠিখেলা শিখি।

ঠিক বলেছিস প্রতিধ্বনি করল কল্যাণ।

দীনেশ, সেই ছেলের ভেতরে দীনেশ মজুমদার সালের আগষ্ট কলকাতার পুলিশ কমিশনার মি. হলওয়ে-

দীপঙ্কর

কার্যের অন্যতম ছিল পড়েছিল, তারপর বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে সে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে সালের ৮ ফেব্রুয়ারী কল্পন করগুপ্ত ও সুশীল দাশগুপ্তের সঙ্গে প্রাচীর ডিঙিয়ে পলায়ন করেছিল, পলাতক অবস্থাতেই যে ১৯৩৩ সালের ২ মার্চ্চ চন্দননগরের কমিশনার কুইন সাহেবকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তারপর ঐ বছরই ২২ মে ১৩৬/১-এ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাড়ীতে পুলিশ দলের সঙ্গে বিভলভার যুদ্ধের পর যে গ্রেপ্তার হয় দিয়েছিল, তারপর বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সালের ৩ জুন ফাঁসীর মঞ্চে যে গেয়ে গেছে জীবনের জয়গান

সেই দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হল কল্যাণী ও কমলার।

দীনেশ কমলাকে একদিন নিয়ে গেল শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, পরিচয় করিয়ে দিল রসিকলাল দাসের সঙ্গে।

৭১ বিডন স্ট্রীটের দোতলার মেসেও যাতায়াত ছিল দীনেশের। সেই মেস, যে মেসে সে যুগের জন-কয়েক বিপ্লবী নেতা থাকতেন, নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত, কিরণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ চন্দ্র গুহ এবং আরও দুচার জন।

সুহাসিনী গাঙ্গুলী মিত্রিকরে চাকরি করে মূক বধির বিদ্যালয়ে এবং তখন থাকে একটি বোর্ডিং-এ। কমলা তাকে দলে টেনে নিল, পরিচয় করিয়ে দিল দীনেশ ও রসিকদার সঙ্গে।

কমলা, কল্যাণী ও সুহাসিনী, তিন বন্ধু ছাত্রী সংঘের শাখাপ্রশাখা বিস্তারে ও সংঘের মাধ্যমে মেয়েদের মধ্যে বিপ্লব মন্ত্র প্রচারে আত্মনিয়োগ করল।

কল্যাণী দাসেরই ছোট বোন বীণা।

বীণা রীতিমত লক্ষ্মী মেয়ে। ১৯২৭ সালে বেথুন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ষোল বছর বয়সে সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে স্কলারশিপ নিয়ে। বেথুন কলেজেই আই এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছে। ভাল ছাত্রী। কলেজে সুনাম! কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছাপা হয়, বিতর্কে সে শুধু অংশ গ্রহণ করে না, বিতর্কে সে অপরাজেয়।

ওর বাবা বেণীমাধব দাস। সেই সুপরিচিত বেণীমাধব, একদা কটকে যে র‍্যাভেনশ কলেজিয়েট স্কুলের তিনি ছিলেন প্রধান শিক্ষক, সেই বিদ্যালয়েই পড়ত বালক সুভাষ চন্দ্র বসু। সুভাষকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। সুভাষ মেধাবী ছাত্র ছিল বলেই নয়, বালক সুভাষের মধ্যে বুঝি তিনি উত্তরকালের নেতাজীর অনুরোধের উপলব্ধি করেছিলেন।

অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ছিলেন বেণী-মাধব। অন্যায় দেখলে কখনও মুখ ঘুরিয়ে নেননি, পাশ কাটিয়ে যাননি, অন্যায়ের সঙ্গে আপোষরফাও করেননি কোনদিন, সাহসের সঙ্গে তার সম্মুখীন হয়েছেন ফলা-ফলের কথা চিন্তা না করেই। ফলে, মাঝে মাঝেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর খটাখটি লেগে যেত।

এর ফলেই তাঁকে কটক থেকে একেবারে কৃষ্ণনগর হাই স্কুলে বদলি করা হয়।

বীণা ভাল ছাত্রী এবং লক্ষ্মী মেয়ে হলেও বইয়ের পোকা ছিল না। দিদি কল্যাণী ও তার বন্ধু কমলা ও সুহাসিনীর গতিবিধি তার নজর এড়াতে পারত না। নানারকম বই নিয়ে আসত দিদি, গোপনে রাত জেগে পড়ত, বন্ধুরা এলে তাদের সঙ্গে নিচুতে বসে আলোচনা করত, চাদে দীনেশ মজুমদারের কাছে লাঠিচালনা শিখতে গিয়ে তার কাকে কাকে কি সব পরামর্শ করত ওর সঙ্গে, সহসা ওর কোথায় বেরিয়ে যেত, ফিরত অনেক দেরী করে—এ সবই দেখত বীণা।

প্রথম মনে সন্দেহ জাগল, তারপর ভয়, তারপর আরও আগ্রহী হয়ে গোপনে তথ্যানুসন্ধান করে যখন জানতে পারল যে, ওরা বিপ্লবী দলে যোগদান করেছে, বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করাই ওদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য, বীণা তখন ওদের সঙ্গে যোগদানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। দেশ কি তারও নয়! সেও কি এই দেশের মেয়ে নয়? দিদিদের মত তারও কি পরাধীনতার বেদনাবোধ নেই? সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল হাতিয়ারের ঘায়ে ভেঙ্গে ফেলবার জন্য দিদিরা যদি আত্মনিয়োগ করে থাকে, তাহলে সেও কেন পারবে না তাদের সঙ্গে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে? তবে কি তাকে ওরা অযোগ্য মনে করে? মনে করে বীণা একেবারে আক্ষরিক অর্থে বুকওয়ার্ম লক্ষ্মী মেয়ে?

ললিত বীণা যে প্রয়োজনে অহিংসীণায় রূপান্তরিত হতে পারে, জননী ও ভাষাসুলভ কোমলতা ও বাৎসল্য পরিহার করে প্রহরণধারিনী দুর্গার মত খর্পর হাতে মহিষাসুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, দিদিরা কি জানে না তা? বীণা মনে মনে সঙ্কল্প গ্রহণ করল সেও

যোগ দেবে বিপ্লবী দলে, দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে সেও এগিয়ে যাবে।

আই এ পড়বার সময়ই সহপাঠিনী সুহাসিনী দত্ত ও শান্তি দাশগুপ্তের সঙ্গে তার বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। তারা ছিল গুপ্ত বিপ্লবী দলের সভ্য। প্রাথমিক আলাপ আলোচনার পর একদিন তারা দলের নেতা ভূপালচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল গোপনে। অর্থাৎ বীণা বিপ্লবী দলে যোগদান করল। দিদি কল্যাণী এক দলে, সে দলের নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত আর বোন বীণা আর এক দলে, তার নেতা ভূপাল বসু

দুই নেতাই অবশ্য যুগান্তর দলভুক্ত। ভূপেন দত্ত থাকতেন ৭১ সিমলাপুর ষ্ট্রীটের মেসে মনোরঞ্জন গুপ্ত, অরুণ গুহদের সঙ্গে আর ভূপাল বসু ছিলেন রসময় সুর, ভবেশচন্দ্র নন্দী, প্রদ্যুম্নকুমার দত্ত, ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়, অরুণ নন্দী, মনীন্দ্র কিশোর রায়, সুকুমার চক্রবর্ত্তী এবং সত্যভূষণ গুপ্তের সহপাঠি ঢাকা শহরে। মনীন্দ্র রায় পড়তেন পগোজ স্কুলে, আর সবাই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে।

এই দলটিই বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায় ও লীলা নাগের সঙ্গে তৎপর হয়ে ঢাকা শহরে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলেন, যার প্রকাশ্য সংগঠনের নাম ছিল, শ্রীসংঘ।

১৯২৯ সালে শ্রীসংঘ থেকে বেরিয়ে আসেন এই দলটির প্রায় সবাই। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনের পর থেকে সত্যভূষণ গুপ্ত মেজর গুপ্ত নামে সুপরিচিত হয়ে পড়েন, তাঁরই নেতৃত্বে ও সহপাঠিদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে সেই অনন্য বিপ্লবী সংস্থা, যার নাম, 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স।' এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সেরই কর্মি বিনয় বসু ঢাকা শহরে গুলী চালিয়ে পুলিশের আই জি লোম্যানকে হত্যা করেছিল, গুরুতরভাবে আহত করেছিল পুলিশ সুপার হডসনকে, এই বিনয়ই আবার আরও দুজন কর্মি দীনেশ গুপ্ত ও সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্তকে সঙ্গে করে ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হত্যা করেছিল ডেলসমূহের আই জি সিম্পসনকে, এই দলেরই কর্মি বিমল দাশগুপ্ত ও ব্রতিজীবন ঘোষ খতম করেছিল মেদিনীপুরের ডি এম পেডিকে, এই বিমলই আবার ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ষ্টিভেন্সকে, মেদিনীপুরের ডি এম ডগলাসকে নিধন করেছিল এই দলেরই কর্মি প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্য, ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের তৃতীয় ডি এম বার্জকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল এই দলের কর্মি অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত, এই দলেরই ভবানী ভট্টাচার্য্য ও রবী ব্যানার্জী দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে ১৯৩৪ সালে গভর্ণর এ্যাণ্ডারসনের ওপর গুলী চালিয়েছিল। ডালহাউসি স্কোয়ার এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের কর্মিদেরই নাম পরিগ্রহণ করে আজ হয়েছে 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ' আর এ্যাণ্ডারসন হাউস হয়েছে 'ভবানী ভবন।'

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স গঠনের প্রথম দিকেই ভূপাল বসু দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেই একটি গ্রুপ গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। বীণা দল যোগ দেয় সেই দলে।

বীণা আই এ পাশ করল ১৯২৯ সালে। ম্যাট্রিকুলেশনের মত ফল না হলেও সে অধিকার করল পঞ্চদশ আসনটি। বি এ পড়বার জন্য ভর্ত্তি হল ডায়োসেসান কলেজে। একডালিয়ার রোডে তখন বীণাদের নিজেদের বাড়ী তৈরী হয়ে গেছে। বীণা সেখানে থাকত।

১৯৩০ সালে মনোরঞ্জন গুপ্তের সংগঠনে কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে নিধন করবার প্লানে অব এ্যাকশন তৈরী করা হয়। রসিক দাসের কাছে তিনটি বাছাই করা ছেলে চান তিনি। রসিক এনে দিল শৈলেন নিয়োগী, অমূল্য সেন, অতুল সেন আর দীনেশ মজুমদারকে। সেই দীনেশ, যে কমলা দাসগুপ্ত ও কল্যাণী দাসকে বাড়ীর ছাদে লাঠিচালনা শেখাত, কমলাকে যে রসিকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বিপ্লবী দলে রিক্রুট করেছিল।

টেগার্ট হত্যার জন্য সে সময় যে ধরণের বোমা তৈরী

করা হয়েছিল, তা ছুঁড়ে মারলেই বিস্ফোরিত হত না। খোলের বাইরে একটি ক্ষুদ্র সলতে, তাতে আগুন ধরিয়ে ছুঁড়তে হত! বাইরে খোলা জায়গায় দেশলাই জ্বালিয়ে আগুন ধরানো বেশ অসুবিধে। প্রথমতঃ, হাওয়ায় দেশলাইয়ের কাঠি নিভে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, না নিভলেও কাঠি থেকে ধরানো সময়সাপেক্ষ। সিগারেটের আগুন থেকে ধরানো খুব সুবিধা। ছেলেরা কেউ ধূমপান করে না, অনভ্যস্ত হাতে হয়ত সিগারেটই চট করে ধরাতে পারবে না, অথচ চরম মুহূর্তের একটু আগেই সিগারেট ধরিয়ে স্বাভাবিক ধূমপানকারীর মতই সিগারেট টানতে হবে এবং ঠিক সময়ে ওটি ফেলে ধরতে হবে সলতের মুখে।

হঠাৎ একদিন রাতে কমলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দীনেশ পকেট থেকে সিগারেট বার করে দেশলাই জ্বালিয়ে ধরাল ও মেশাখোরের মতই টানতে লাগল।

কমলা অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। শুধু দীনেশ কেন, সুধীর ঘোষ বা অন্য যে সহকর্মিদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে অথবা নেতৃস্থানীয় যাঁরা, এমন কি, কৃপাল দা—কেউ, তাঁদের একজনকেও ত কোনদিন সে সিগারেট খেতে দেখেনি। এমন কি, একটি পানও না। সে যুগে ব্রহ্মচর্যের কঠোর নিয়মগুলি বিপ্লবীদের পালন করে চলতে হত, সঙ্গে সাত্ত্বিক আহার, তার মধ্যে নেশা করবার সুযোগ কোথায়? মুখ ফুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইতস্তত: করতে লাগল কমলা, অথচ প্রশ্নটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধতে লাগল।

দীনেশ বুঝি নিজেই বুঝতে পারল তা। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, নিশ্চয়ই অবাক হয়েছ আমায় সিগারেট খেতে দেখে। হেসে বলল, কোন দিন খাইনি, আজ খাচ্ছি। কেন খাচ্ছি, পরে বলব একদিন। কিন্তু বল দেখি কমলা, আমার দেশলাই জ্বালাবার, সিগারেট ধরাবার এবং সিগারেট টানবার কায়দাটা ঠিক রেওলার ধূমপায়ীদের মত হচ্ছে কি না, না মনে হয় আনাড়ী?

কমলা চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর দীনেশ ডাকল, কমলা!

কমলা জবাব দিল, বলুন

অনেক দূরে যেতে হবে, দীনেশ বলতে লাগল, কবে ফিরতে পারব, আদৌ পারব কিনা, বলতে পারব না। যদি না-ই পারি, তাহলে কাজের নির্দেশ নেবে রসিকদার কাছ থেকে। আর রসিকদাকেও যদি না পাও, তাহলে যাবে ৭১ নিজ্জাপুর ষ্ট্রীটের মেসে মনোরঞ্জন গুপ্তের কাছে। বুঝলে?

এর কয়েক দিন পরেই ২৮ আগষ্ট বোমা পড়ল টেগার্টের মোটরের ওপর দিনের বেলা জনবহুল ডালহাউসি স্কোয়ারে। দীনেশ মজুমদার ধরা পড়ে গেল। তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল।

টেগার্টের ওপর বোমা আক্রমণের ফলে গ্রেপ্তার হলেন কৃপাল বসু, নারায়ণ রায়, রসিক দাস, মনোরঞ্জন রায় ও আরও অনেকে। কমলাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, পরে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। ডালহাউসি বোমার মামলা হল। কৃপাল বসুও দণ্ডিত হলেন অস্ত্রাঘাতের সঙ্গে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

মনোরঞ্জন গুপ্ত ফেরার হলেন। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

কৃপাল বসুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজের হাতে গড়া দলটিও ভেঙ্গে যায়।

বীণার মনে দারুণ আঘাত লাগল।

১৯৩১ সালে বীণা বি এ পাশ করল। ভর্তি হল বি টি ক্লাসে। তখন সে থাকত নিজেদের বাড়ী একডালিয়া প্লেসে। কিন্তু বাড়ী থেকে ক্লাশ এ্যাটেণ্ড করা অসুবিধা হওয়ায় সে চলে এল ডায়োসেসান কলেজ হোষ্টেলে। ডায়োসেসানেই হত বি টি ক্লাস।

১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পর বিপ্লবীরা নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। একদল এসে আশ্রয় নিয়েছিল চন্দননগরে। সে বাড়ীতে থাকতেন ওদের বন্ধু বিপ্লবী শশধর আচার্য্য। একজন অবিবাহিত পুরুষের ভাড়া করা বাড়ীতে আরও কজন পুরুষ গিয়ে থাকলে প্রতিবেশীদের মনে সন্দেহ জাগতে পারে। তাই দলের নির্দেশে সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে চন্দননগর পাঠান

হল, সে গ্রহণ করল শ্লথদের স্থীর ভূমিকা। সেখান থেকেই সে শিক্ষিকার কাজ করবার জন্ত ডেইলি প্যাসেঞ্জারী করত।

৯ সেপ্টেম্বর পুলিশ সেই বাড়ীতে অতর্কিতে হানা দিয়ে কেরারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করল।

কমলা ও কল্যাণী তখন ছাত্রী সঙ্ঘের শাখাপ্রশাখা স্থাপনে ব্যস্ত।

কিন্তু বীণা কি করবে? নেতা কারারুদ্ধিত, সহকর্মিরা ছত্রভঙ্গ, প্লান করবার, নেতৃত্ব দেবার মত কেউ নেই। অথচ একটা কিছু করবার জন্ত বীণা অস্থির হয়ে উঠেছে!

ওদিকে পর পর বৈপ্লবিক এ্যাকশন হয়ে যাচ্ছে!

রাইটার্স বিল্ডিংস-এ হানা দিয়েছে বিনয়, বাদল ও দীনেশ।

পেডিকে খতম করেছে বিমল ও ধৃতিভূষণ।

গার্লিককে হত্যা করেছে কানাই

সরোজ আর রমেন গুলী চালিয়েছে টুনোর ওপর।

টিলিয়ার্দের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে বিমল।

এলিসনকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে শৈলেশ।

বীণা অধীর হয়ে উঠল আমাকেও একটা কিছু করতে হবে। নেতা নেই, নাই-বা রইল। নাই-বা রইল বুদ্ধি ও পরামর্শ দেবার মত কোন সহকর্মি বা সুহৃদ। তবু একক চেষ্টায় একটা কিছু করতে হবেই হবে।

বীণা ছটফট করতে লাগল।

এমন সময় ১৯৩১ সালের ১৪ ডিসেম্বর কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সি জি বি ষ্টিভেনসকে নিধন করল শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী নামের দুটি মেয়ে। মেয়ে নয়, বালিকা। শান্তি ষোল পেরোয়নি, সুনীতির বয়স আরও এক বছর কম। স্কুলের ছাত্রী।

বীণা উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল।

সুহাসিনী দত্তের সঙ্গে পরামর্শ করল।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, গভর্ণর ষ্ট্যানলি জ্যাকসনকে খতম করতে হবে।

দুটি স্থানে তাকে বাগানের মধ্যে পাবার সম্ভাবনা। এক, রেসকোর্সের মাঠে প্রতি শনিবার জ্যাকসন সপরিবারে ঘোড়দৌড় দেখতে যায়। কিন্তু সেখানে বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট তার আসনটি বিশেষভাবে রক্ষিত, চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরা, ওপরে নীচে এদিকে ওদিকে অসংখ্য মানুষ, সেই ভিড়ের মধ্যে গভর্ণরের সম্মুখীন হওয়া, তাকে রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। দ্বিতীয় পথটির কথা সহসা বীণার মনে এল, সুহাসিনীও তৎক্ষণাৎ সমর্থন করল তা। আগামী বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালের প্রথম দিকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হবে, একত্রিশ সালে যারা গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে গভর্ণর জ্যাকসন কনভোকেশনে শুধু ভাষণই দেবে না, ডিগ্রোমাগুলি স্বহস্তে সেই গ্র্যাজুয়েটদের হাতে তুলে দেবে। বীণা যখন তার মুখোমুখি কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ডিগ্রোমা নেবে, ঠিক সেই সময়—

কিন্তু রিভলভার? রিভলভার কোথায় পাওয়া যাবে? বীণা আজ পর্য্যন্ত রিভলভার হাতে করেনি। ওটা চালানোও ত শিখতে হবে। কে শেখাবে?

ভাবনায় পড়ল বীণা পরিকল্পনা যতই নিখুঁত হোক, তা রূপায়নের উপায় কোথায়?

বীণা অস্থির হয়ে উঠল।

১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস। কল্যাণী কংগ্রেসের আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগ দেবার ফলে গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেছে, এমন সময় একদিন কমলা বীণাদের বাড়ীতে আসতেই বীণা তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে গেল।

কমলাদি!

কি বীণা?

আমার মনের অত্যন্ত গোপন একটা ইচ্ছা তোমায় জানাব, বীণা বলল, আগামী মাসের ৬ তারিখে কনভোকেশন, গভর্ণর ডিগ্রোমা দেবে, ডিগ্রোমা নিতে গিয়ে আমি ওকে শেষ করে দিতে চাই। কমলাদি, তুমি আমায় একটা রিভলভার দিতে পার।

কমলা বলল, তোমাদের দলের দাদাকে বল না—

দাদারা কেউ জেলের বাইরে নেই কমলাদি, বীণা

বাধা দিয়ে বলল, আমাদের দল প্রায় ভেঙে গেছে বলা যায়। কমলাদি, তুমি আমায় সাহায্য কর। দলের হয়ে নয়, আমি একাই এই অ্যাকশনটা করতে চাই।

যদি ধরা পড়ে যাও, তাহলে তোমার কি হবে বুঝতে পারছ? কমলা ভয় দেখাল।

বুঝতে পারছি, দৃঢ় স্বরে জবাব দিল বীণা, তাহলে হাসিমুখে ফাঁসীতে যাব।

কমলা রাজী হল, আচ্ছা, আমি তোমায় রিভলভার দোব।

চালানোটাও ভাল করে শিখিয়ে দিও, বীণার কণ্ঠে উৎসাহ ঝরে পড়ল, তারপর বলল, আর একটা কাজ তোমায় করতে হবে কমলাদি, পটাসিয়াম সায়নাইডের একটা প্যাকেটও দিও—

কেন? চমকে উঠল কমলা।

কাজ হাসিল হয়ে গেলে আর পুলিশের হাতে ধরা দিয়ে লাভ কি, গম্ভীর স্বরে বলল বীণা, কাজ শেষ করে পালাতে চাই না, ফাঁসীতে ঝুলিয়ে ইংরেজকেও বাহোবা পেতে দিতে রাজী নই, তাই চাই পটাসিয়াম প্যাকেট। দেবে ত কমলাদি?

কমলা ওকে জড়িয়ে ধরল, দোব। দোব রিভলভার, দোব পটাসিয়াম সায়নাইড—

একজন এ্যাসিষ্টেন্টও দিলে ভাল হয় কমলাদি; বীণা বলে উঠল।

সে কি করবে?

তাকেও রিভলভার দিও, বীণা জবাব দিল। আমি ত এই প্রথম চালাব রিভলভার, যদি ঠিকমত না পারি, তাই দর্শক হিসেবে ওখানে গিয়ে সেও রিভলভার চালাবে। অ্যাকশন যাতে কিছুতেই না নিষ্ফল যায়।

কমলা বলল, আচ্ছা, দেখব, তেমনি কাউকে পাওয়া যায় কি না।

সুধীর ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করল কমলা। সে বলল, এ্যাকশনের পরিকল্পনাটা খুব চমৎকার, ঠিকমত সব করতে পারলে গভর্ণরের মৃত্যু অবধারিত কিন্তু বীণার সঙ্গে দেবার মত তেমন কাউকেই ত দেখছি না।

কমলা জিজ্ঞেস করল, রিভলভার?

শ তিনেক টাকা দিলে আসল-করা একটা জোগাড় করা যেতে পারে।

তাই হবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই কমলা দু শো আশী টাকা এনে দিল সুধীরের হাতে, সুধীর জোগাড় করে দিল একটি রিভলভার, সঙ্গে পটাসিয়াম সায়নাইডের ছোট্ট একটা পুরিয়া।

একদিন ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের পাশে লেডিজ পার্কে নির্দ্দেশমত বীণা এসে দেখা করল কমলার সাথে। এমনিতেই বিরাট পার্কে খুব বেশী মেয়ে বেড়াতে বা খেলা-ধূলা করতে আসে না, তারপর সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই চলে যায় জনশূন্য পার্কের কোণে নিয়ে গিয়ে বীণার হাতে রিভলভারটি দিল কমলা শুধু দিল নয়, ছটি বুলেট কি করে ভরতে হয়, ট্রিগার টানতে হয় কি করে, একটা বুলেট ফায়ার্ড হয়ে গেলে কেমন আটোমেটিক আর একটা বুলেট ব্যারেলের মুখে এসে যায়, সব শিখিয়ে দিল কমলা।

কিন্তু বিষের প্যাকেটটি দিতে মন চাইছিল না তার।

বীণা বলল, কমলাদি, স্বাধীনতার জন্য অনেক ছেলে প্রাণ দিয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত প্রাণ দেয়নি কোন মেয়ে। চন্দননগরে সুহাসিনীদি ধরা পড়েছেন, কুমিল্লায় ধরা দিয়েছে শান্তি আর সুনীতি। মেয়েদের প্রাণ দেবার পথ আমিই প্রথম দেখাব, এই আমার সঙ্কল্প। তুমি আমায় বাধা দিও না কমলাদি।

একুশ বছরের মেয়ে বীণার পানে চেয়ে রইল কমলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ভাল ছাত্রী বীণা। ম্যাট্রিকে স্কলার, আই এ-তে ফিপটিনথ্, ভালভাবে বি এ পাশ করা মেয়ে। গায়ের রং কর্সা নয় বটে, কিন্তু চোখে মুখে তারুণ্যের দীপ্তি। দেশপ্রেমের আগুন যেন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। সন্ত্রাসে অটল, কিন্তু সন্ত্রাস সাধনের পর আর বেঁচে থাকতে চায় না। যেন এই সুকঠিন কাজটি করবার জন্যই বিধাতাপুরুষ তাকে ধরাধামে পাঠিয়েছেন। সর্ব্বনাশী যেন পারিপার্শ্বিক সমগ্র দুনিয়া ভুলে গিয়ে

শুধু পাখীর চোখটিই দেখতে পাচ্ছিল. বীণার সর্ব্ব অন্তর তেমনিভাবে ছেয়ে রয়েছে একটি ধ্যান, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সিনেট হল, একটি মানুষ, বাংলার গভর্ণর স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন। সেই লক্ষ্যভেদের পর তার কাজ শেষ, সে চিরবিদায় নিতে চায়।

কমলা আর বাধা দিতে পারল না।

ললিত বীণা আজ অগ্নিবীণায় রূপান্তরিত!

সে বিষের প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে দিল।

তারপর সাফল্য কামনা করে বিদায় দিল বুকে জড়িয়ে ধরে।

১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ছ তারিখ।

গম্ গম্ করছে সিনেট হল। সমাগত অতিথিরা, গ্রাজুয়েটগণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ এবং দর্শকবৃন্দ। হলের বাইরে সশস্ত্র ও সাদা-পোষাক পুলিশের কড়া পাহারা, হলের অভ্যন্তরে দর্শকদের মধ্যেও হয়ত দর্শক সেজে বসে আছে কোমরে আঁটা রিভলভার আই বি পুলিশের লোক

আলো ঝলমল সুসজ্জিত মঞ্চ। দেয়ালে ফুলের রিং, ঝকঝকে রূপো চাকা টেবিলে ফ্লাওয়ার ভাসে সুগন্ধ ফুলের তোড়া, বক্তৃতা-ডেসক-এর সম্মুখে মাইক্রোফোন।

চ্যান্সেলর জ্যাকসন প্রবেশ করল।

সবাই উঠে দাঁড়াল।

মঞ্চে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ভাইস চ্যান্সেলর কর্ণেল সুরাবর্দ্দী, বিশিষ্ট অধ্যাপক দীনেশ সেন প্রমুখ সুধীবৃন্দ।

তারপর বক্তৃতা সুরু হল।

সবার শেষে গভর্ণরের ভাষণ।

কিন্তু হঠাৎ সুরাবর্দ্দী ঘোষণা করলেন যে, এ বছর ডিগ্রোমা আর হাতে হাতে দেয়া হবে না। যারা যে-কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে, ডিগ্রোমাগুলি সেখানে পাঠানো হবে, সেখান থেকে নিতে হবে।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই পরিবর্তন কেন? চির-চরিত রীতি চ্যান্সেলরের হাত থেকে ডিগ্রোমা নেবে গ্রাজুয়েটরা, এবার কেন তা নিতে দেয়া হবে না? তাহলে কনভোকেশনের তাৎপর্য্যটি বা রইল কোথায়? এই ব্যয়-বহুল বর্ণাঢ্য সভার প্রয়োজন তাহলে কেন?

উপস্থিত গ্রাজুয়েটদের মনে এসব প্রশ্ন জাগলেও চমকে উঠল একটি গ্রাজুয়েট, সে বীণা দাস। ভাবল, নিশ্চয়ই আশঙ্কা করেছে কর্তৃপক্ষ যে, এত লোকের মাঝে গভর্ণরের এত কাছাকাছি যেতে পারার সুযোগ হয়ত গ্রহণ করতে পারে বিপ্লবীরা, তাই বিনা নোটিশে আকস্মিক এই প্রচলিত রীতির পরিবর্তন।

আস্তে বুকের ওপর হাত রাখল বীণা, ঠিক আছে ওলিভর রিভলভার।

আঙুল দিয়ে চাপ দিল, ঠিক আছে পটাসিয়াম সায়-নাইডের প্যাকেট

গভর্ণর ভাষণ সুরু করল মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে

উঠে দাঁড়াল বীণা এখুনি গুলি করবে নাকি রিভলভার? না, না, আর একটু পরে ভাষণ পাঠ আরও খানিকটা এগোক, দর্শকরা নিবিষ্ট হয়ে উঠুক।

বসে পড়ল সে

একটু পর আবার উঠে দাঁড়াল, কি ভাবল, আবার বসে পড়ল।

জ্যাকসন ভাষণ পাঠ করে চলেছে মাঝে মাঝে মুখ তুলে শ্রোতাদের পানে চাইছে

এমনি করে ও ভাষণ এক সময় শেষ হয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে সে হলের বাইরে। পুলিশ প্রহরায় গাড়ীতে উঠে চলে যাবে। তাহলে যে ব্যর্থ হয়ে যাবে আজকের প্ল্যান অব এ্যাকশন। ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে বীণা?

উঠে দাঁড়াল বীণা, তড়িত পায়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল কয়েক পা, তারপর রিভলভার বার করে ট্রিগার টানল, ফ্রাম্! ফ্রাম্! ফ্রাম্!

কিন্তু চকিতে জ্যাকসন মাথা সরিয়ে নিয়েছে, বসে পড়েছে ডেসক-এর নীচে।

বেঁচে গেছে গভর্ণর।

দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্ণেল সুরাবর্দ্দী। চেপে ধরলেন

বীণাকে? আরও ছুটে এল কজন চেপে ধরল ওকে মেঝেতে।

কিন্তু তখনো চলছে বীণার রিভলভার এলোপাথারি। যেখানে লাগে, লাগুক।

ধরে ফেলল ওরা তার হাত

ছিনিয়ে নিল রিভলভার।

বিয়ের প্যাকেটটা ব্লাউজের ভেতরেই রয়ে গেল।

বীণা ধরা পড়ে গেল।

আহত হলেন অধ্যাপক চীনেন্দ্র সেন ও আরও কয়েকজন। অবশ্য সামান্য আঘাত

তার পরের কাহিনী সহজ সরল

সেখান থেকে লর্ড সিংহ রোডে আই বি অফিস।

তারপর হাজত।

তারপর স্পেশাল ট্রাইবিউনালে বিচার। চার্জ, গভর্ণরকে হত্যার চেষ্টা।

বীণা দাসের প্রতি নয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

ললিত বীণা অগ্নিবীণায় রূপান্তরিত হয়ে অকস্মাৎ ঝড় তুলেছিল।

বীণার তার ছিঁড়ে গেল।

ঝড় থেমে গেল।

গভর্ণর ফ্রাঙ্কেসন বেঁচে গেল।

স্বদেশ আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলা দেশে বিপ্লবের কারণ, বিস্তার ও ইহা দমনের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য যে কমিটি নিয়োগ করেন তাহার নাম সিডিশন। রাজদ্রোহ কমিটি ১৯১৮ সালে তাহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিটির সভাপতি রাউলাট সাহেবের নামে উক্ত রিপোর্ট Rowlatt Act নামে সুপরিচিত।

এই রিপোর্টের প্রথম অংশে অনুশীলন সমিতির সংগঠন, সংবিধান ও কর্মপদ্ধতির বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাহার বাংলা সংক্ষিপ্তসার নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

বিপ্লবের ভাবধারায় প্রভাবিত যুবকবৃন্দ অনুশীলন সমিতি নামে একটি সংস্থা স্থাপনা করে। (অনুশীলন অর্থ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন)। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকায় উহা স্থাপিত হয়। চতুর্দ্দিকে উহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়। এক সময় ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রায় ৫০০ শাখা সহরে ও মফঃস্বলে প্রসারিত ছিল। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলেও যুবকবৃন্দ সংগঠিত হইতে থাকে। কিন্তু সকলে একই বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন। তাঁহারা একজোটে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করিলেন যাহাতে তাঁহাদের দল বৃদ্ধির সহায়তা হয় ও কার্যকলাপের সুবিধা হয়। এইরূপ পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান উপায় ছিল—সংবাদ পত্রে প্রচার, সভা সমিতিতে বক্তৃতা, জাতীয় উদ্দীপনাপূর্ণ সাহিত্য ও সঙ্গীত ইত্যাদি।

সমিতির সভ্যবৃন্দের শিক্ষার জন্য অদ্ভুত রকমের পাঠ্যসূচী স্থির করা হইয়াছিল। যথা—ভগবদ্গীতা, বিবেকানন্দ রচনাবলী, ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডির জীবন চরিত প্রভৃতি। শক্তি উপাসনার জন্য 'ভবানী মন্দির' নামক পুস্তক পাঠ করিতে হইত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর

(উনত্রিশ)

রবীন গুহের সেই কথা সেই কাজ

পরদিনই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের চিঠি এসে গেল।

আমিও তৎক্ষণাৎ গেলাম ডি সি কে ডি বোসের কাছে। বোস বললেন, সাইট সিলেকশন কমিটি আর কি করবে আপনার বাড়ী তৈরী হবে, কোন্ জায়গায় হলে সুবিধে হয়, সে ত আপনিই ভাল বুঝবেন

বললাম, তাহলেও গভর্নমেন্ট নিযুক্ত একটা কমিটি যখন আছে—

তা নিশ্চয়ই তখনই ফোন করলেন চীফ মেডিকাল অফিসার ডাক্তার পি সি সরকারকে তিনি নেই, টুরে গেছেন, তিন দিন পর ফিরবেন

তিনি ফিরে আসতেই ডাক্তার সরকার, বোস ও আমি একত্র হয়ে ফেলের পাশেই একটা বিশাল চৌকুল খাদের কাছে বাড়ী তৈরীর স্থান নির্বাচন করলাম

পরদিনই আমাদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলাম একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে কপি টু এস ডি ও, পি ডবলিউ ডি।

তার দশ দিনের মধ্যেই দেখলাম, একদিন সকালে এক লরী ভর্ত্তি কুলি এসে গেল, পেছনে রবীনবাবুর জীপ। রবীনবাবু ফিতে ফেলে মাপজোক করে খুঁটি পুঁতে দিলেন, ওরা তার সঙ্গে বসি বেঁধে দাগ দিয়ে কোদাল চালানো সুরু করে দিল।

হেসে বললাম, যতই করুন, সময় মাত্র দু মাস।

উনিও দৃঢ় স্বরে জবাব দিলেন, দেখুন না, তার আগেই শেষ করে ফেলব আর মহাষ্টমীর দিন নতুন বাড়ীর টেবিলে বসে মাংস আর পোলাউ খাব।

কিংবা নবমীর দিন এস ডি ও-র ডাইনিং হল-এ—

রবীনবাবু হেসে উঠলেন

এর কয়েক দিন পর-আমি অফিসে আসতেই ফেলার আমার ঘরে এলেন, বললেন, স্যার, আই জি এসে গেছেন শিলিগুড়ীতে, উঠেছেন তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বোধ হয় তাঁর কোন এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বোধ হয় তাঁর কোন, নিশ্চয়ই এখানেও আসবেন ইনস্পেকশন করতে

হেসে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সেক্রেটের খবর রাখি ?

না স্যার, অথেনটিক, ফেলার বললেন, শিলিগুড়ী সাব জেলের জেলার অজিতবাবুকে চিঠি লিখেছেন লাচ্ছিলিং যাচ্ছেন মঙ্গলবারে ওখানে যখন ছুটি করেছেন তখন

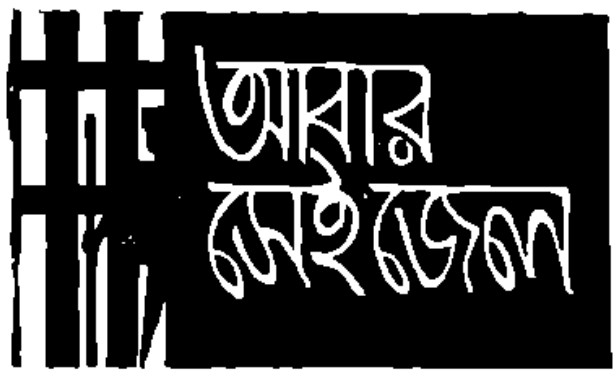

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

জেল দেখেছেন, তখন আমার বিশ্বাস এখানেও একবার আসবেন।

আসবেন, আসুন। উদাস কণ্ঠে ফেলারকে বিদায় করে দিলাম বটে, কিন্তু আমার মনটা খচখচ করতে লাগল।

ইনস্পেকশনের সম্মুখীন কখনও হইনি। হইনি ঠিক নয়। দমদম থাকতে একবার এসেছিলেন বটে। তবে আমি তখন ডেপুটি সুপার। সুপারিনটেনডেন্ট ডাক্তার এস সি মজুমদার। জেলের ম্যানুফ্যাকটরী ডিপার্টমেন্টের ভার আমার ওপর থাকলেও সমগ্রভাবে জেলের সর্ব্বাধি-

নায়ক হচ্ছেন সুপারিনটেনডেণ্ট। সেবার ডাক্তার মজুমদারের সঙ্গে যখন আই জি ঘোরাঘুরি করছিলেন, আমি সঙ্গে ছিলাম। এবার আমি সুপার, জেল আমার, কিন্তু আমাকে সাহায্য করবার জন্য কোনো ডেপুটি সুপার নেই। দমদমে দুর্ভেদ্য বর্মের মত ছিলেন ডাক্তার মজুমদার, আর জলপাইগুড়ীতে একা আমাকেই সামলাতে হবে। ডিসট্রিক্ট জেলে কোন ডেপুটি সুপারিনটেনডেণ্ট থাকে না।

জলপাইগুড়ীতে আসবার পর পত্র-যুদ্ধ অনেক হয়ে গেছে। এবার হবে একেবারে যাকে বলে, মুখোমুখি সংগ্রাম। শত হলেও ওপরওয়ালা, তাই একটু চিন্তা হল বৈকি।

জেলারকে ডেকে বলে দিলাম সমস্ত রেজার ও ফাইল একেবারে আপ-টু-ডেট করে রাখতে।

পরদিন ডি সি-কে ফোন করলাম, না, উনি কোনো টুর প্রোগ্রাম পাননি তখনও বললেন, পাওয়ামাত্র আমার একটা কপি পাঠিয়ে দেবেন

অথচ, কোথাও টুরে যেতে হলে সরকারী অফিসার, যাদের সার্কিট হাউসে ওঠবার যোগ্যতা আছে, অর্থাৎ যাদের মাইনে আটশো টাকা বা তার বেশি, তাদের একটা নিয়ম পালন করে চলতে হয়। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে টুর প্রোগ্রামটি গভর্নমেণ্টকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। ঠিক কটা বেজে ক মিনিটে হেড কোয়ার্টার্স ত্যাগ করবেন, কিসে যাবেন, কটা বেজে ক মিনিটে কোথায় পৌঁছবেন, কোথায় কদিন হল্ট করবেন, তারপর আবার কবে কটার সময় কিসে ফিরে আসবেন হেড কোয়ার্টার্সে, সবটাই অনুমোদন করিয়ে নিতে হয়। তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট হোম (ট্রান্সপোর্ট) ডিপার্টমেণ্ট মোটরের ব্যবস্থা করেন এবং সার্কিট হাউসে তাঁর জন্য স্থান রিজার্ভ করে রাখা হয়। আই জি যদি জলপাইগুড়ীতে আসেন, তাহলে নিশ্চই এখানকার হোম (ট্রান্সপোর্ট) ডিপার্টমেণ্ট ও সার্কিট হাউসের কর্তা ডেপুটি কমিশনার কে জি বোস জানতে পারবেন। বোস যখন কিছুই জানেন না, তখন আমার একবার মনে হল, হয়ত শিলিগুড়ী থেকেই পার্জিলিং চলে যাবেন তিনি, ভেতরের দিকে জলপাইগুড়ীতে আর আসবেন না। আবার মনে হল, এটা হয়ত সারপ্রাইজ ইন্‌সপেকশন, তাই ডি সি-কেও কিছু জানাননি, পাছে আমি জেনে ফেলি, আর আমার জনপ্রিয়তার অস্তিত্বের খবর ত তিনি সব সময়ই পাচ্ছেন আমার কাছ থেকে, তাই জেনে ফেলা খুবই সহজ হবে। তাই হয়ত কাউকে কিছু না বলে, না জানিয়ে অকস্মাৎ শিলিগুড়ী থেকে সোজা উনত্রিশ মাইল জীপে এসে জেলে হাজির হয়ে বলতে পারেন, খাতাপত্র দেখান।

সাবধানের মার নেই। হুকুম দিলাম, জেলার বাবু, সব রেডি করে রাখুন।

আরও দিন দুয়েক পর জেলার বললেন, স্যার, খবর পাওয়া গেছে কাল সন্ধ্যার গাড়ীতে আই জি এখানে এসে গেছেন এবং উঠেছেন তাঁর আত্মীয় রিটায়ার্ড ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পালের বাড়ীতে।

পুরো নাম কি? কোন্ পাড়ায় বাড়ী?

তা বলতে পারব না স্যার, জেলার বললেন, দু চারজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁরাও চিনতে পারলেন না।

কিন্তু কোথায়, আজ সকালে ত ইনস্পেকশনে এলেন না।

কি করে বলব স্যার, কখন হঠাৎ আসবেন।

সকালের অফিস বেলা বারোটা পর্যন্ত। বারোটা বাজতেই জেলারকে সঙ্গে করে মিঃ পাল নামীয় রিটায়ার্ড ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। যে করেই হোক আত্মগোপনকারী আই জি-কে খুঁজে বার করতেই হবে।

ডি সি-র অফিসে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞেস করলাম। কেউ বলতে পারলেন না।

গেলাম আরতি গুহের কাছে। না, তিনিও জানেন না।

পুরোনো বাসিন্দা নগেন গাঙুলীর কাছে গেলাম, দাদাবাবুর কাছে গেলাম, কেষ্টকে ধরলাম, বাবুপাড়া পাঠাগারে গেলাম। কিন্তু কেউ পাল নামীয় কোন রিটায়ার্ড ডি এম-এর হদিস দিতে পারলেন না।

প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মত অবস্থায় গেলাম আবার বাড়ীওয়ালা শেখর সান্যালের কাছে। তিনি বললেন যে, শিল্প সমিতি পাড়ার সোনাউল্লা স্কুলের উত্তর দিকের রাস্তায় একটা বড় কম্পাউণ্ডওয়ালা বড় বাড়ী আছে, সামনে ভারী সুন্দর ফুলের বাগান, তার গেটের বাইরে কি নাম পালের নেমপ্লেট দেখেছিলেন বলে মনে পড়ছে।

বেলা তখন দেড়টা হয়ে গেছে। রোদে ঘুরে ঘুরে পলকর্ষর হয়ে গেছি। ক্ষিদের পেট চৌ চৌ করছে। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে গেলাম আমরা শিল্প সমিতি পাড়ায়।

হ্যাঁ, এইবার পরিশ্রম সার্থক। পেয়ে গেছি। বাইরে নেমপ্লেটে লেখা মনোরঞ্জন পাল, সিটায়ার্ড ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট।

সোজা ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলাম হ্যাঁ, আমাদের আই জি সাহেব সস্ত্রীক এখানেই এসেছেন। মিঃ পাল তাঁর বড় ভাসুর ভাই

ভিজিং রুমে বসে খবর পাঠালাম।

একটু পরই ভেতর থেকে এলেন এবং আশ্চর্য। সত্য যে, জীবনে বোধহয় এই প্রথম হেসে বললেন, আরে মশাই, আপনারা ত কম নন। আমি এলাম ইনকগনিটো আর ঠিক আপনারা বার করে ফেললেন? আপনারা দেখছি আই বি পুলিশে চাকরি করবার যোগ্য!

আমিও হেসে বললাম, এই শহরের বেশীর ভাগ লোকই আমার চেনা হয়ে গেছে আর আমাকে চেনে প্রত্যেকটি লোক, এখানে এসে কি আর আপনি পালিয়ে থাকতে পারবেন?

তারপর নানা কথা হল।

এবং আশ্চর্য যে, আই জি হেসে হেসে কথা বলতে লাগলেন।

চা ও কেক এল।

এক সময় বললেন, হার্জিলিং যাচ্ছি বেড়াতে, তাই আর সার্কিট হাউসে উঠলাম না।

তা ভালই করেছেন স্যার, আমি বললাম, সার্কিট হাউসে কি আর আত্মীয় বাড়ীর মত যত্ন পেতেন? কিন্তু এসেছেন যখন, তখন আমাদের জেল ইনসপেকশন করুন। নতুন সুপার হয়ে এসেছি, ঠিকমত সব চালাতে পারছি কিনা দেখবেন আর প্রয়োজনমত ইনস্ট্রাকশন দিয়ে যাবেন।

বেশ, তাই হবে, রাজী হয়ে গেলেন, যাব কাল সকালে, কিন্তু গাড়ী?

বললাম, সে আমি ডি সি-কে বলে একখানা গাড়ী জোগাড় করতে পারব।

ডি সি এখন কে?

মিঃ কে জি বোস—

ও—সিনিয়র আই এ এস। আই জি বললেন, বলে দেবেন যে, সন্ধ্যার পর তাঁর বাড়ীতে যাব। আমরা নিজেরা সিনিয়র কিনা তাই সিনিয়রদের কাছে ছাড়া যাই না।

পরদিন সকাল ঠিক আটটায় ফোন এলেন আই জি।

গেটের বাইরে জেলার ও ডেপুটি জেলার রিজার্ভ গার্ডদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তরবারি নিষ্কাষিত করে অভিবাদন জানালেন।

এক সেকেণ্ড ওদের সামনে থেকে সোজা এসে ঢুকলেন আমার ঘরে এবং আমার চেয়ারে বসেই বলে উঠলেন, আপনি ত মশাই, সাংঘাতিক লোক! মিনিষ্টারকে ধরে ঠিক আপনার কোয়ার্টারটি পাল করিয়ে নিয়েছেন, অথচ আরও যে কত আর্জেণ্ট কনষ্ট্রাকশন রিকুইজিশন করে পাঠালাম, তার একটিও পাশ হল না।

বললাম, খগেনদার সঙ্গে আমার সতেরো বছরের বন্ধুতা। আর তা ছাড়াও যে রকম ত্রিপল দিয়ে চাল ঢেকে বাস করতে হচ্ছে, কোনো ভদ্রলোক তেমনিভাবে থাকতে পারে না। তাই লিখেছিলাম ওঁকে।

অন্য প্রসঙ্গে এলেন আই জি।

ওয়েল, জেলার কেমন লোক?

আমি ত ভালই দেখছি

ওর সেই বৈষ্ণবের ভড়ং নেই?

জবাব দিলাম, ভড়ং বলে আমার কিন্তু মনে হয় না।

বরং লোকটিকে সত্যিকার বৈষ্ণব ভাবাপন্ন মনে হয়। আমি যা দেখেছি—

বিনোদিনী ঘোষ ফিমেল ওয়ার্ডার সন্ধ্যার পর ওর বাড়ীতে কি করতে যায়?

সারাদিন বিনোদিনী ডিউটি দেয়, কারণ এখানে একটিমাত্র ফিমেল ওয়ার্ডার। সন্ধ্যাবেলা লক আপ করে তবে তার ছুটি। থাকে একা। তাই আমার মনে হয় জেলারবাবুর শাশুড়ীর সঙ্গে কচিৎ কখনো গল্প করতে যায়।

আই জি বলে উঠলেন, সে বুড়ী ত চোখে দেখে না, কানেও শোনে না, তার সাথে গল্প করে কি করে?

এই হচ্ছে আমাদের আই জি-র স্বরূপ। ভদ্রভাবে কথা বলতেও জানেন না। একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এমনি অশোভন ইঙ্গিত দেওয়াতে যে কতটুকু বাধে না, নীচের চাকুরেদের সম্বন্ধে তাঁর মনের ও তাদের সঙ্গে কথাবার্তা যে কতখানি অবমাননাকর হতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বেশ শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে জবাব দিলাম, যারা আপনাকে খবর দিয়েছে, তারা মিছে কথা বলেছে আপনাকে। সত্তরের ওপরে বয়স হবে মহিলার, স্বাভাবিকভাবে যতটুকু দুর্বল স্বাস্থ্য হবার কথা, তাই হয়েছেন। তাছাড়া কোনো ডিফেক্ট নেই। জেলারের বাড়ীতে যখন ছিলাম, অনেক গল্প করেছি ওঁর সাথে। চমৎকার মানুষ। মা যেমন হয়, তেমন।

হুঁ, আই জি কি যেন ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, বিনোদিনীর স্বামী এখানে থাকে না কেন?

প্রশ্ন শুনে প্রায় হেসেই ফেলেছিলাম আর কি? কোনরকমে হাসি চেপে বললাম, স্বামী কেন এখানে থাকে না, তার জবাব বিনোদিনী দিতে পারে আর পারে ওর স্বামী। হয়ত স্বামী কোথাও চাকরি করে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে এসে বৌ-এর রোজগারে বসে বসে খাওয়া পছন্দ করে না—

ওয়েল, আপনার ডেপুটি জেলার অনেক, তারপর বলেন, অফিস ওর চাকরিতে এদের কেমন দেখছেন?

আমি ত তার ভালই দেখছি, স্পষ্ট বললাম, আমার সঙ্গে জুল কো-অপারেশনে এঁরা কাজ করছেন, কোনো খারাপ কিছু দেখছি না, বরং—

আরে মশাই, উনি বাধা দিয়ে বললেন, আপনি ত সবাইকেই ভাল দেখেন। স্বদেশী করেছিলেন কিনা, তাই ভাল ভাল লোক দেখেছেন আর ধরে বসে আছেন দুনিয়ার সবাই ভাল লোক। সবার সি সি আর-এই আপনার একটিমাত্র মন্তব্য, গুড। জানেন ওদের antecedent?

Antecedent! বিস্ময় প্রকাশ করলাম, Confidential Character Roll পাঠাতে এ্যান্টিসিডেন্ট দরকার হবে কেন স্যার? গত এক বছরে যেমনটি দেখেছি, তাই ত লিখতে হবে তার আগে কেমন ছিল, সে খোঁজে যাব কেন? আপনি ত জানেন স্যার, সি সি আর-এর কোন কপি রাখার রীতি নেই অপরে ত দূরের কথা, যাতে কেউ নিজেই নিজের পুরোনো মন্তব্য না রেকার করতে পারেন, যাতে সেই মন্তব্য দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড না হন, সেই জন্যই ঐ রীতি।

যাকগে, শুনুন আমার ব্যাখ্যার কোন জবাব না দিয়ে আই জি অন্য কথা বললেন, আমি আর ভেতরে যাব না। আপনি এক কাজ করবেন, একটা কর্ম আছে, ইনস্পেকশন করতে এলে যেটা জেল থেকে ফিল্ আপ করে দিতে হয়, নানারকম স্ট্যাটিসটিক্স আর কি, সেখানা জেলারকে দিয়ে ফিল্ আপ করিয়ে আমার অফিসে পাঠিয়ে দেবেন। এখন অফিস ষ্টাফ বা সিপাইদের যদি কোন কমপ্লেন থাকে—

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু স্যার, আমার সিরিটি বইতে কি লিখব, আপনি ইনস্পেকশন করলেন?

ইনস্পেকশন? তা—মহা অসুবিধায় পড়ে গেলেন উনি, অফিসে বসে বসেই ইনস্পেকশনের কর্মটি, কি করে বলেন যে, করেছেন, অথচ গভর্নমেন্টকে ইনস্পেকশন করেছেন রিপোর্ট দেবেন বলেই সেই কর্মখানা ফিল্ আপ করে পাঠাতে বলছেন, গাজুরীটা মহা শয়তান, বোধহয় মনে মনে বললেন, তারপর আরও বারদুয়েক

তা-ও তাড়াতাড়ি করে অবশেষে বলেই বসলেন, হুঁ—লিখে নেবেন, ইমসাপেকশন করেছি।

আমি কিন্তু যা সত্য, তাই লিখেছিলাম

বললেন, ডাকুন, কার কিছু কমপ্লেন আছে কিনা।

সিপাইরা কেউ কেউ যা আবেদন জানাল, যা নিবেদন করল, তার জবাবে প্রায় ধমকের সুরে চাঁছাছোলা ভাষায় উনি যা বললেন, তার চাইতে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য অফিস টাকের সঙ্গে ওঁর ভারলগ। কিন্তু সে ভারলগ নাটকীয় পদ্ধতিতে বর্ণনা করলেই সবচে ভাল। তাই করছি।

(ডেপুটি জেলার অনঙ্গভূষণের প্রবেশ)

অনঙ্গ—(স্যালুট করিয়া ভীতিব্যঞ্জক কণ্ঠে) আমার একটা নালিশ স্যার—

আই জি—(ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) বলুন।

অনঙ্গ—ডেপুটি জেলারদের মধ্যে আমিই তার সিনিয়রমোস্ট—

আই জি—তাতে কি হয়েছে ?

অনঙ্গ—আমার পরের দুজন জেলার হয়ে গেছেন স্যার, অথচ—

আই জি—হয়ত আপনার কোন দোষ আছে, হয়ত আপনার সি সি আর ভাল নয়। আর আপনি ত জানেনই যে, আপনাকে এখানে পানিশমেন্ট ট্রান্সফার করা হয়েছে।

অনঙ্গ—এখানেও স্যার, অনেক দিন হয়ে গেল—

আই জি—(প্রায় ধমকের মত) হয়ে গেল ত কি হয়েছে ? তাহলেই আপনাকে জেলার করে দিতে হবে নাকি ? আপনার বিরুদ্ধে অনেক রিপোর্ট পেয়েছি আমি। আপনি নাকি টাকা না দিলে ইন্টারভিউ করতে দেন না, আপনার বাড়ীতে কীর্তনের সময় জেলের গুদাম থেকে বস্তাগুলো কম্বল নিয়ে যান, ততগুলো ফেরৎ দেন না, আপনি আসামীদের উসকিয়ে দিয়ে আগেকার ডাক্তারের গায় ময়লা ফেলিয়েছিলেন—ওয়েল, এমনি লোককে জেলার করা যায় না, বুঝলেন ?

অনঙ্গ— অনেক ভয়ে ভয়ে) আপনি যা বললেন, তার জবাবে শুধু একটা কথাই বলতে চাই স্যার, যে, অভিযোগগুলো তার মিথ্যা। নিশ্চয়ই কেউ বেনামী চিঠি লিখেছে—

আই জি—বেনামী হলেই বুঝি তাহা মিথ্যা ?

অনঙ্গ—তবে স্যার আমাদের সাহেবকে দিয়ে একটা এনকোয়ারি করা হোক—

আই জি—আপনাদের এই সাহেব ত দিলদরিয়া লোক, যা-ই লিখে পাঠাই, তারই রিপোর্ট দেন, কলস। When I was District Magistrate of Midnapore. এমনি বেনামী চিঠিতেই আসল খবর পেয়ে যেতাম আপনার মত ডিজঅনেষ্ট—

অনঙ্গ—আমি ত স্যার, এই সাহেবের আণ্ডারেই দেড় বছর চাকরি করছি, উনি আমার কোন ত্রুটি দেখেছেন কি না—

আই জি—ওয়েল, আপনি বড় বেশী বকেন এত কথা বললে কাজ করেন কি করে ? এই সুপারিনটেনডেন্ট ত সবাইকেই ঘোষ তুলসী পত্র দেখেন, তাই বলেই আপনাকে জেলার করতে হবে নাকি ? আগে যদি আপনি মাইনাস টু পেয়ে থাকেন, তাহলে প্লাস জোর না পাওয়া পর্যন্ত আপনার কেস কনসিডার করা যাবে না, বুঝলেন ?—যান।

(অনঙ্গভূষণ স্যালুট করিয়া চলিয়া গেলে এ্যাকাউনটেন্ট নীরেন দাশগুপ্তের প্রবেশ)

আই জি—ওয়েল, আপনিই সেই নীরেন বাবু, ডবল লেজার রাতারাতি তৈরী করে চারুবাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। কি দিয়েছিল চারুবাবু ? কত টাকা ?

নীরেন—কোন ডবল লেজার তৈরী করিনি স্যার—

আই জি—ইস্, বুঝলেন গাঙ্গুলী, একটুর জন্যে চারু বাবুকে সেবার ধরতে পারলাম না। থাকগে, আপনার আবার কি নালিশ ?

নীরেন—(অনেক ইতস্তত: করিয়া অস্ফুট স্বরে) স্যার, আমার প্রয়োজনটা—

আই জি—কেন, আপনাকে কেউ সুপারসিড করেছে নাকি?

নীরেন—স্যার, চার জন।

আই জি—আপনি ডিজঅনেষ্টি করেছিলেন বলেই আটকে রয়েছেন। তাল হয়ে চলুন, প্রমোশন পাবেন। আর আপনারা এত প্রমোশন প্রমোশন করে চেঁচান কেন বুঝি না। কাকে কখন প্রমোশন দেওয়া উচিত, সে ত আমি বুঝব, আপনারা কেন নালিশ করবেন? আমি যখন মেদিনীপুরে ছিলাম—

আমি—যখন স্যার, ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন?

আই জি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই সময়ের কথাই বলছি। তখন কি বাংলাদেশে আই এস কম ছিল কিছু? ওয়েল out of all, গভর্ণমেণ্ট আমাকেই সিলেক্ট করলেন আই জি প্রিজন পোষ্টের জন্য। আমি কি কোন দরখাস্ত করেছিলাম, না কাউকে ধরাধরি করেছিলাম? ওপর দেখলে কর্তৃপক্ষ তার আদর করে থাকে আমার রিটায়ার করবার কথা ছিল নাইন্টিন সিক্সটিনাইনের অগাষ্ট আর আজ সিক্সটিওয়ানের অগাষ্ট, তার মানে ছ মাস ছ মাস করে পাঁচ বার এক্সটেনশন পেয়ে গেছি। কেন দিল এক্সটেনশন?—ওয়েল—

আমি—মেদিনীপুরের কিন্তু স্যার, ভারী অস্তি হয়ে গেল।

আই জি—(গর্ব্বিতভাবে) ওয়েল, ত একটু হয়ত হল। অনেক অফিসার ত চাইলেই পাওয়া যায় না।—যাকগে, আপনার আর কিছু বলবার আছে?

নীরেন—না স্যার। (নীরেনের প্রস্থান)

আই জি—আর কেউ আছে নাকি?

আমি—অজিত বাবু ত বলছিলেন—কি হল? (বেল বাজাইতেই সিপাই প্রবেশ করিয়া স্যালুট করিল) আচ্ছা ত, জেলারবাবুকে জিজ্ঞেস কর, আর কেউ আই জি-র সঙ্গে দেখা করবেন কি না।

(সিপাই স্যালুট করিয়া প্রস্থান করিতেই কেরানী অজিত গুহ ঠাকুরতার প্রবেশ)

অজিত—(নমস্কার করিয়া) আমার নালিশ আছে স্যার।

আই জি—কি বলবেন চটপট বলে ফেলুন—ও—আপনারই সেই টেব্‌ল ফ্যান, যা কনট্রাকটার আপনাকে দিয়েছে—

অজিত—কনট্রাকটার দেবে কেন স্যার, আমি কিনেছি—

আই জি—কোথা থেকে?

অজিত—এখানেই একটা দোকান থেকে সেকেণ্ড হাণ্ড।

আই জি—দোকানদারকে আনতে পারেন?

অজিত—আপনি যদি স্যার ডাকেন ত গিয়ে বলতে পারি। আসবে কিনা, তা বলতে পারব না স্যার।

আই জি—আপনার ক্যাশ মেমো দেখাতে পারেন?

অজিত—ক্যাশ মেমো ছিল, কোথায় হারিয়ে গেছে। যদি জানতাম যে, আপনার কাছে বেনামী চিঠি যাবে, তাহলে স্যার, রাখতাম। চাকরি করবার সময় যা কিছু কিনব, সবটারই ক্যাশ মেমো রাখতে হবে, এ কেমন আইন স্যার? তাহলে ত রোজ যা কিনি, আলু, বেগুন, মাছ, তার জন্যেও দোকানদারের কাছে ক্যাশ মেমো চাইতে হয় কিন্তু ওদের ত ক্যাশ মেমো নেই স্যার—

আই জি—ওয়েল, আপনি নাকি প্রায়ই সিনেমায় যান, এত টাকা কোথায় পান? কত মাইনে আপনার?

অজিত—চাকরি ছাড়াও টাকা থাকতে পারে স্যার। আপনি স্যার পশ্চিমবঙ্গের লোক, দেশ বিভাগের ফলে আপনাকে আর বাড়ীঘর ছাড়তে হয়নি। আমাদের দেশ ছিল স্যার, বরিশালে। (বরিশাল কথাটি শুনিয়াই আই জি যেন চমকাইয়া উঠিলেন, একটা পেপার ওয়েট-লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিলেন, হাত থামিয়া গেল, অনেক চোখে অজিতবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন) বরিশালের বানরীপাড়া গ্রামে। বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হত। পুজোর সময় হাজারখানেক প্রজা নাটমন্দিরের উঠোনে পাতা পেতে খেত আর বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করতেন। প্রত্যেককে নিজের হাতে দুটো করে টাকা আর একখানা করে গামছা দিতেন। আমাদের বাড়ীতে যা বাসনকোসন ছিল স্যার, ওতে দু হাজার

লোকের নেমন্তন্ন চালিয়ে যেত। পাকিস্তান হবার ফলে সব গেছে। কিছুই আনতে পারিনি স্যার। বাবাও মারা গেলেন ১৯৪৭ সালেই, ভাইদের মধ্যে আমিই ছোট থাকতাম, আমার ঘাড়েই সব দায়দায়িত্ব এল। কিছুই আনতে পারলাম না স্যার, শুধু আনলাম কিছু বাসন। সেই বাসনগুলো জলের দরে বিক্রি করেও যে টাকা পেয়েছি স্যার, তাতে সিনেমা দেখা চলে। মাইনের টাকায় হাত দিতে হয় না। কিন্তু আমি নিজে খুব কম খাই, খায় আমার স্ত্রী—

আই জি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই রিপোর্টই পেয়েছি।

অজিত—চাকরি করি স্যার, আমি, আমার স্ত্রী সিনেমা দেখে, না বাজার করে, তাও কি গভর্নমেন্ট দেখবে নাকি? এই সব বেনামী চিঠিওয়ালারা না লেখে, তাতে কি একটুও সত্যি আছে স্যার? অথচ আপনারা সেই সব চিঠি পেয়েই আমাদের প্রমোশন আটকে রাখেন। যদি কোনো ব্যাটার সাহস থাকে, বুকের পাটা থাকে তাহলে আসুক না স্যার, সামনাসামনি

(আই জি বুঝিলেন যে, তাঁহার অপেক্ষাও বড় বক্তা আছেন এবং সেই বক্তার মাংসল বুক, চওড়া ঘাড়, ব্লাক-পার্টের বাহিরে লোমশ বাহু এবং মালকোচা-মারা লোয়াকেই বোধ হইতেছে যে শুধু বাক্য নয়, সামনা-সামনি কার্যেও তিনি বেশ পটু সুতরাং মেদিনীপুরের প্রাক্তন ডাঁদরেল ম্যাজিস্ট্রেট এবং বর্তমানে সেচিব-প্রতাপ ইনস্পেকটর জেনারেল বেল ছুটে বেলুনের মত চুপসাইয়া গেলেন মোলায়েম স্বরে বলিলেন—)

আই জি—আচ্ছা, আপনি প্রমোশনের জন্য একখানা দরখাস্ত পাঠাবেন আমার নামে।

(নমস্কার করিয়া অজিতবাবুর প্রস্থান)

আই জি-ও উঠলেন

জিজ্ঞেস করলাম, দার্জিলিং কবে যাচ্ছেন স্যার?

কালই যাব শিলিগুড়ীতে, তারপর হয়ত পরশু যাব দার্জিলিং।

কলকাতা কবে ফিরবেন?

দিন দশেক পর তারপরই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সন্ধ্যার পর ডি সি-কে বাড়ীতে পাওয়া যাবে?

বললাম, আমি ফোন করে জেনে নিয়ে বিকেলে আপনার ওখানে যাব

আর আপনি কখন যাবেন, আই জি বললেন, ড্রেসারকে পাঠাবেন

আচ্ছা স্যার

ড্রেসার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন

আমরা গেটের বাইরে এলাম

রিজার্ভ সিপাইরা আবার অভিবাদন জানাল।

আই জি জীপে উঠলেন

জীপ রওনা হল।　　(ক্রমশঃ)

স্টার থিয়েটার

দ্বিতীয় পর্যায়

হাতীবাগান

গোপাললাল শীলের কাছে বিডন ষ্ট্রীটের থিয়েটার বন্ধক রেখে স্টার কর্তৃপক্ষ যে টাকা পেলেন, সেই টাকা দিয়ে প্রথমেই তাঁরা কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটের ১০ কাঠা জায়গা টাকা দিয়ে রামেশ্বরকৃষ্ণ শীলের কাছ থেকে থিয়েটার ক্রয় করলেন গিরিশচন্দ্র তাঁর বোনাস বাবদ প্রাপ্য টাকার কিছু টাকা দিয়ে স্বত্বে স্টারের থিয়েটার নামক ক্রয় করলেন, এই টাকা ও মহাশয়ের ঋণ করে টাকা সংগ্রহ করে উদ্বোধন থিয়েটার তৈরি করলেন

স্বত্বাধিকারিণী হলেন মাত্র টাকা করে ভাড়া নিয়ে কাজ করে যেতে লাগলেন ষ্টেট রেলওয়ের যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের নাট্যগৃহের পরিকল্পনা অনুযায়ী থাকার মতো প্রস্তুত হয়ে বাড়িটিকে দাঁড়ালেন ধনদাস সুর সেবকের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নাম লিখলেন, কারণ তিনি শ্যামবাজার স্কুলের সঙ্গে তখন চুক্তিবদ্ধ হয়ে তাঁর এমারেল্ড থিয়েটারেই আসেন তাই স্বনামে তাঁর পক্ষে অন্য কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা সম্ভব ছিল না। অন্তরালে থেকে তিনি নিজের সব-প্রকার সাহায্য করতে লাগলেন

১৮৮৮ সনের ২৬শে মে শুক্রবার, কলেজের দিন রাত ৯ টায় হাতিবাগানের নব-নির্মিত নাট্যগৃহের উদ্বোধন হল। প্রথমে গিরিশচন্দ্র রচিত একটি কবিতা পাঠ করলেন অমৃতলাল, এরপর নসীরাম অভিনীত হল। অভিনয়ে নসীরাম—অমৃতলাল বসু, যোগেশনাথ—উপেন্দ্র মিত্র, অনাথনাথ—অমৃত মিত্র, কাপালিক—অঘোর পাঠক, সোনা—গঙ্গামণি, বিরজা—কাদম্বিনী, কাপালিক শিষ্য—বেলবাবু, তীল বালক—তারাসুন্দরী, ভূতনাথ—প্রবোধ ঘোষ, রাজময়ী—মহেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ছিলেন

গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটারে গিরিশ চন্দ্রের পরে বেশ দিন থাকা সম্ভব হল না তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে চলে হাতিবাগান এসে পুনরায় শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হলেন

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্ল মঞ্চস্থ হলো, অভিনয়ে যোগেশ—অমৃত মিত্র, রমেশ—অমৃতলাল বসু, সুরেশ—কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, বিপিন—বাবু মদন—

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নীলমাধব বাবু, কাঙালী—শ্যামাচরণ কুণ্ডু, তন্ময়ি—বেলবাবু, পিতাম্বর—মহেন্দ্র চৌধুরী, জনৈক লোক—অঘোর পাঠক, জ্ঞানদা—কিরণবালা, প্রফুল্ল—ভুবন-মোহিনী, জগদম্বি—গঙ্গামণি, ইতর স্ত্রী—ধন বিহারিনী, যাদব—তারাসুন্দরী, ম্যাজিস্ট্রেট—রামতারণ সান্যাল, জমিদার ও বাপের চরিত্রে—উপেন্দ্র মিত্র, ইন্সপেক্টর, —প্রবোধ ঘোষ, ইন্সপেক্টর ও ডেপুটি ডাক্তার—বিনোদ

ঘোষ, বাড়ীওয়ালী—এলোকেশী, খেমটাওয়ালী—প্রমদা-সুন্দরী ও কুসুম (খোঁড়া) দ্বিতীয় ব্যাপারী—অক্ষয় চক্রবর্তী প্রভৃতি।

গিরিশচন্দ্র নাট্যকার ও পরিচালক হিসাবে যোগ দেবার পর ষ্টারের খ্যাতি আরও ছড়িয়ে পড়ল। প্রায় প্রতিটি নাটকেই প্রচুর অর্থাগম হতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে গিরিশশিষ্য ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণের মধ্যে যেন খানিকটা আত্মশ্লাঘার ভাব পরিলক্ষিত হল। ১৮৯১ সনে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের পীড়া হেতু তাঁকে মধুপুর যেতে হয়। মধুপুরেই ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁকে ম্যানেজারের পদ থেকে অপসারিত করে এক পত্র দেন। এই হটকারিতায় ষ্টারের শিল্পী গোষ্ঠীর অনেকেই ষ্টার পরিত্যাগ করেন, তাঁদের মধ্যে নীলমাধব চক্রবর্তী, প্রবোধ ঘোষ, অঘোর পাঠক, সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, স্বয়ং বন্দ্যোপাধ্যায় বাবুবাবু প্রমদাসুন্দরী, মানদাসুন্দরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নীল মাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এঁরা সিটি থিয়েটার নাম দিয়ে গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করতে থাকেন। ষ্টার অর্থাৎ গিরিশ মিত্রেরা গিরিশচন্দ্র এবং সিটি থিয়েটারের নামে মামলা রুজু করেন। মামলায় সিটি থিয়েটার জয়লাভ করে। প্রকাশিত নাটক অন্যত্র অভিনীত হলে আইন বিরুদ্ধ নয় এই রায় পাওয়া যায়। ষ্টারে তখন নাট্যকাররূপে কবি রাজকৃষ্ণ রায় যোগদান করেন।

১৯০৩ সনের ১৫ই আগষ্ট প্রতাপাদিত্য অভিনীত হয়। অভিনয়ে ছিলেন প্রতাপাদিত্য—অমৃতলাল, বিক্রমাদিত্য ও রম্ভা—অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, আকবর—উপেন্দ্র মিত্র, শংকর—অহেন্দ্র চৌধুরী, গোবিন্দদাস—কালীনাথ চাটার্জি, বসন্ত রায়—অক্ষয়কালী কোঙার, চণ্ডীবর—নগেন্দ্রনাথ মুখার্জি, সেলিম—মনীলাল দত্ত, বিজয়া—নরীসুন্দরী, কল্যাণী—বসন্তকুমারী, ছোটরাণী—মৃণালিনী, প্রতাপ মহিষী—সরযুবালা, ভবানন্দ—হীরালাল দত্ত প্রভৃতি ছিলেন।

অতঃপর　　সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত সে নাট্যশালায় অব্যাহত গতিতে বিভিন্ন নাটকের অভিনয় দর্শকরা দেখলেন।

অমর দত্ত সে সময় বেঙ্গল থেটে গ্রেট ন্যাশনাল নাম দিয়ে অভিনয় করছিলেন। সেখানে ৮ই নভেম্বর বিল্বমঙ্গলের অভিনয় করে ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ষ্টার রঙ্গমঞ্চে সংসঙ্গ নাটক নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সম্পূর্ণ বিক্রয়ের (গ্রেস) শতকরা ২৫ ভাগ অংশের চুক্তিতে অমরবাবু ষ্টার থিয়েটার লীজ নেন। অমৃতলাল বসুকে নাট্য পরিচালকের সম্মান দিয়ে যে রজনীতে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন—২৫ টাকা করে সম্মানী দেওয়া হবে বলে স্থিরীকৃত হয়।

২৫শে নভেম্বর হরিনাথের শ্বশুরবাড়ী যাত্রা, ২৬শে ডিসেম্বর জীবন সংগ্রাম অভিনীত হয়।

১৯১২ : ৭ই জানুয়ারী রবিবার, হরিনাথের শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা ও রণজিৎসিংহের অভিনয় হয়। এদিন বেলা ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অভিনয় হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯১২, বাংলা ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ রবি ১-২০ মিনিটে, গিরিশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

৩০শে মার্চ খাসদখল, ১২ই জুন রঙ্গকথা, ১৭ই আগষ্ট পরপারে, ১৬ই ডিসেম্বর আনন্দ রহস্য, ২৫শে ডিসেম্বর কাল পরিণয় অভিনীত হয়।

বহু নাটক রচনা করার পর ১৯১৩, সনের ৯ই জানুয়ারী, ভোর ৫-১০ মিনিটে বাংলা বৃহস্পতিবার, ২১শে পৌষ, ১৩২২ সালে অমর দত্ত পরলোক গমন করেন।

অমরেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সম্প্রদায়ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ কিছুদিন থিয়েটার চালান—তারপর অনঙ্গ হালদার নামক জনৈক ভদ্রলোককে ষ্টার থিয়েটার লীজ দেওয়া হয়।

অনঙ্গ হালদার কয়েকটি নাটক পরপর মঞ্চস্থ করলেন। তারপর অপরেশচন্দ্র তারাসুন্দরীসহ ১৯১৯ সালে ষ্টারে যোগদান করেন এবং অপরেশচন্দ্র ম্যানেজার হন। ১৯১৯, ৮ই মার্চ ওথেলো, ৩০শে মার্চ মুখের মত, ১৭ই মে উবশী, ৯ই আগষ্ট দুমুখো সাপ, ২৬শে ডিসেম্বর বৈবাহিক। তারানিধন কেশী বিনোদন মল্লিক ফোকসান থেকে

থিয়েটার ছেড়ে দেন ১৯২০ সাল থেকে তারাসুন্দরীর সহায়তায় অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ষ্টার থিয়েটারের লেসী হন।

অপরেশচন্দ্র কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করেন বটে কিন্তু থিয়েটার ভাল চলছিল না। সেই সময় আর্ট থিয়েটার কোঃ লিমিটেড গড়ে উঠল ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। পরিচালক মণ্ডলীতে রইলেন নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস চাটার্জি, ভূপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গদাধর মল্লিক, সতীশচন্দ্র সেন, (ম্যানেজিং ডিরেক্টর), অপরেশচন্দ্র থিয়েটারের সর্ব দায়িত্ব নিয়ে রইলেন। থিয়েটারের জন্য নাটকও লিখবেন তিনি। তাঁর সমস্ত দেনা নতুন কোম্পানী পরিশোধ করবে—তিনি ৫০০ টাকা করে মাইনে পাবেন এবং প্রতি নাটকে পৃথক টাকা পাবেন। প্রবোধ গুহ সেক্রেটারী হলেন। ১৯২৩, খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন আর্ট থিয়েটারের প্রযোজনায় ষ্টারে অপরেশচন্দ্র রচিত কর্ণার্জুন মঞ্চস্থ হল।

কর্ণ—তিনকড়ি চক্রবর্তী, শকুনী—নরেশচন্দ্র মিত্র, অর্জুন—অহীন্দ্র চৌধুরী, পরশুরাম—অপরেশচন্দ্র, ভীষ্ম—ননীগোপাল মল্লিক, কৃষ্ণ—ইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়, দুঃশাসন—তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিকর্ণ—দুর্গাদাস, দুর্যোধন—প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, দ্রোণ—কালিপ্রসন্ন পাইন, ভীষ্ম—সন্তোষ দাস (ভুলো), যুধিষ্ঠির—হেমেন্দ্র রায় চৌধুরী, পদ্মাবতী—কৃষ্ণভামিনী, কুন্তি—মনোরমা, নিবৃত্তি—নিহারবালা, দৌপদী—নিভাননী, শকুনি—গোলাপ।

১৯২৪ সনের ১লা জানুয়ারী ইয়ানের বাঈ, ১৯২৪ সনে দানীবাবু আর্ট থিয়েটারে যোগদান করলে চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, বিল্বমঙ্গল, জনা, বলিদান, প্রফুল্ল, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হয়।

৩রা ডিসেম্বর রূপকুমারী, ২৫শে ডিসেম্বর রুক্মিণী। ১৯২৫, ৬ঠা ফেব্রুয়ারী গোলকুণ্ডা, এপ্রিলে জনা, বিল্বমঙ্গল। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু পরলোক গমন করেন—ষ্টার থিয়েটার দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন

১৮ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা অভিনীত হয়। ২৫শে জুলাই কবিগুরু উপস্থিত থেকে অভিনয় দেখেন। অপরেশবাবুকে রসিকবাবু বলে অভিহিত করেন কবিগুরু। ২৮শে আগষ্ট চন্দ্রশেখর অভিনীত হয়।

তারপর ষ্টারে আরও অনেকগুলি নাটক অভিনীত হল।

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণওয়ালীস মঞ্চে নাট্য মন্দির বন্ধ হয়ে গেলে শিশিরকুমার ষ্টারে (আর্ট থিয়েটারে) কিছু দিনের জন্য যোগদান করেন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে এখান থেকেই আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯৩০, ৩০শে অক্টোবর শকুন্তলা, ১৯৩১, ১৬ই মে স্বয়ম্বর ; ১৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীগৌরাঙ্গ মঞ্চস্থ হয়

১৯৩৩, মার্চ মাসে পোষ্যপুত্র, ১০শে মে মন্দির প্রবেশ, ১৭ই জুন বৈকুণ্ঠের খাতা। শিশির কুমার আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১লা জুলাই বৈকুণ্ঠের খাতায় কেদার চরিত্রে অভিনয় করেন ১৫শে ডিসেম্বর অভিমানিনী, এবং নরেন দেবের ফুলের আয়না মঞ্চস্থ হয়। আর্ট থিয়েটারের অবস্থা দিন দিনই শোচনীয় হয়ে পড়ছিল —শেষ পর্যন্ত রিসিভার নিয়োজিত হয়। হাইকোর্ট থেকে শ্রীকান্তি মুখোপাধ্যায় আর্ট থিয়েটারের (ষ্টার) রিসিভার নিয়োজিত হন। কান্তিবাবুর কাছ থেকে শিশির কুমার ষ্টার থিয়েটার লীজ নেন।

আর্ট থিয়েটারের পর শিশিরকুমার ষ্টার রঙ্গমঞ্চলীজ নিয়ে নবনাট্য মন্দির নাম দিয়ে ১৯৩৪ সনের জুলাই মাস থেকে অভিনয় শুরু করেন। ১৯৩৪, ২৪শে জুলাই বিরাজবৌ, ২৭শে সেপ্টেম্বর সধবা, ২৪শে নভেম্বর চন্দ্রের দাসী, ২২শে ডিসেম্বর বিজয়া মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৫, ২৪শে সেপ্টেম্বর শ্যামা, ২১শে ডিসেম্বর রীতিমত নাটক।

১৯৩৬ ডিসেম্বর মাসে কবিগুরুর যোগাযোগ মঞ্চস্থ হয়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত শিশিরকুমার ষ্টার থিয়েটারে থাকেন। ষ্টারের স্বত্বাধিকারিগণ তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা করেন এতে শিশিরকুমার জয়ী

হলেও উৎখাতের মামলায় তিনি হেরে যান। যোগ-যোগই শিশিরকুমারের প্রযোজিত ষ্টারে নবনাট্য মন্দিরের শেষ নাটক।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের শিশিরকুমারের পর ষ্টারের লেসী হন বিমল পাল এবং রতীন ব্যানার্জী নাট্য প্রযোজনা করেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে যতেশ গোস্বামীর বিশ্বাসভঙ্গ, ২৫শে ডিসেম্বর অমরকান্ত বক্সীর অভিসারিকা, ৩০শে ডিসেম্বর বীরেন মুখার্জীর অপরাজিতা মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩৮, ১২ই মার্চ শচীন সেনগুপ্তের কালের দাবী নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের সঙ্গে সঙ্গে বিমল পালের লীজ শেষ হয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা মঞ্চ পরিত্যাগ করে উপেন্দ্র কুমার মিত্র ষ্টারে আসেন।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় বহু উল্লেখযোগ্য নাটক ষ্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। নতুন নাটকের মধ্যে ষ্টারের এই সময়কার শেষ নাটক রাজনর্তকী। নিষ্প্রদীপ বোমাতংকিত কলকাতা নগরীতে একে একে সবকয়টি নাট্যশালার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু হাতিবাগান বাজার বোমা বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও ষ্টার রুদ্ধ হয়নি। উপেন্দ্রকুমার মিত্রের পুত্র সলিল কুমার মিত্র অতঃপর ষ্টার রঙ্গমঞ্চের হাল ধরলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্র গুপ্ত চলে যাবার পর কিছুদিন অভিনয় বন্ধ রেখে সলিলবাবু থিয়েটারের সংস্কার সাধন করেন এবং নতুন নাটক 'শ্যামলী'র প্রস্তুতি শুরু করেন। এই সময় নাট্যকার হিসেবে দেবনারায়ণ গুপ্ত ও নাট্য পরিচালক-রূপে যামিনী মিত্রসহ শিশির মল্লিক যোগদান করেন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শ্যামলী মঞ্চস্থ হয়। জন-প্রিয় অভিনেতা উত্তমকুমার এই সর্বপ্রথম রঙ্গাবতরণ করেন। প্রীকান্ত অভিনয়ের সময় নাট্য গৃহটিকে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যামিনী মিত্র বিদায় গ্রহণ করেন পরে শিশির মল্লিক মশায়ও। সেই অবধি নাট্যকার ও পরিচালক রূপে দেবনারায়ণ গুপ্ত দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৭৯—এই বিশ বছর ষ্টারে বহু জনপ্রিয় নাটক পর পর কিন দিন ধরে চলেছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই অবশ্য স্বয়ংসিদ্ধ প্রমুখ স্বনামধন্য লেখকদের উপন্যাসের নাট্যরূপ এবং এই সমস্ত নাট্যরূপই দেবনারায়ণ গুপ্তের দেওয়া।

ষ্টার থিয়েটারের ইতিহাসে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই এই থিয়েটার খোলা হয়। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন একজন অ-বাঙালী গুরুমুখ রায়। আজ ১৯৭৯ সালে যখন রঙ্গমঞ্চের শত-বার্ষিকী এবং ষ্টার থিয়েটারে উননব্বতিতম বছরে এই নাট্যশালার স্বত্বাধিকার একজন অ-বাঙালী—রতিকান্ত কংকরিয়া।

নাট্য প্রবাহ

ভিলাই ষ্টীল প্লান্ট-এর সদস্যরা সম্প্রতি ষ্টার মঞ্চে শৈলেশ গুহ নিয়োগীর ঠাঁস নাটকটি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শকদের প্রভূত আনন্দ দিয়েছেন। অভিনয়ে নির্মল চক্রবর্তী, শৈলেন মিত্র, মাধব বসু, রতীন চক্রবর্তী, পুলক সরকার, নিমাই দে, লক্ষ্মী দাস, সত্য গুপ্ত, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত চক্রবর্তী, হিরন্ময় মুখো-পাধ্যায়, কমল দে, ইন্দ্রা দে ও প্রতিমা পাল বিশেষ নাট্য নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখেন।

সিধি উন্নয়ন সন্মিলনী তাঁদের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অগ্নিদূতের ইতিহাসের মৃত্যু নাটকটি পরিবেশন করেন মণ্ডলপাড়া লেনে বিশেষ ভাবে নির্মিত মুক্তাঙ্গন মঞ্চে। নাটকটি সুঅভিনীত। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন, রতন বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম পাল, অলোক সাহা, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শ্যামল পাল।

কিছুদিন আগে কুলিটার রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর সভ্যরা বিষরূপা মঞ্চে অভিনয় করেন শৈলজানন্দের নাটক নদী বহে যায়; পরিচালনায় ও একটি মুখ্য চরিত্রের রূপায়ণে শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া তাঁদের সুঅভিনয়ে নাটকটি আগাগোড়া প্রাণ-

এর থেকে দর্শকদের মনে স্থান পাবে তাঁরা হলেন, রজনী চক্রবর্তী, শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ মুখোপাধ্যায়, চিন্ময় পাল চৌধুরী, মিহির পালধি, অজিত মুখোপাধ্যায়, বিকাশ হাজরা, ব্রজ হাজরা, নটবর দাস, অমলা চৌধুরী, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, আরতি দাস, দীপ্তি ও মিনতি মুখোপাধ্যায়।

কলকাতা পৌরসভার একটি ডিপার্টমেন্ট পরিচালিত পাকজন্ত নাট্য সংস্থা সম্প্রতি রঙমহলে অভিনয় করলেন অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায়ের সুখ্যাত নাটক অকস্মাৎ। পরিচালনায় ছিলেন এনায়েৎ পীর। রসজ্ঞ নাট্যকার শ্রীমুখোপাধ্যায়ের "অকস্মাৎ" একটি বিশেষ নাট্য-উৎকর্ষ সম্পন্ন কমেডি নাটক। সাধারণ পাবলিক স্টেজের পক্ষে এ ধরণের উচ্চাঙ্গের কমেডি আমরা আর দেখিনি বললেও অত্যুক্তি হবে না। প্রচুর প্রবল হাসির সঙ্গে এমন কিছু ঘটনা আছে এই নাটকে যা দর্শকদের হাসাতে হাসাতে অস্থির করে তোলার সঙ্গে তাঁদের ভাবায়ও। সুন্দর দলগত অভিনয়ে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা দর্শকদের আনন্দ দিলেন তাঁরা হলেন, গৌরেশ সেন, সলিল সেনগুপ্ত, নিতা গোপাল পাল, গৌরাঙ্গ পাল, দেবরঞ্জন কুণ্ডু, অজিত মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, শোভন চট্টোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, এনায়েৎ পীর, মনোজিৎ দে, সুর্য চোল, হবি তালুকদার, প্রতিমা পাল, বিপাশা গোস্বামী।

My soul, sit thou a patient looker on ;
Judge not the play before the play is done ;
Her (fate's) plot hath many changes ; every day
Speaks a new scene : the last act crowns the play.

—*Shakespeare*

ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মভূষণ উপাধির দ্বারা সম্মানিত, দিল্লীর সাহিত্য আকাডামি ও ওড়িশা শিল্প-সাহিত্য আকাডামির সদস্য, সারা ভারতের বহু সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্বর্ধিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ওড়িশী লেখক, চিন্তাবিদ ও মনীষী শ্রীকালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী পশ্চিমবঙ্গেও সাহিত্যিক মহলে একটি জনপ্রিয় নাম। নবগঠিত শরৎ শতবার্ষিকী কমিটির তিনি সভাপতি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমানে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সৎপথী তাঁর কন্যা। ওড়িশার শিল্প, সংস্কৃতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি গল্পভারতীতে মাঝে মাঝে লিখবেন—এই খবরটি পাঠকদের জানাতে আনন্দ বোধ করছি। তাঁর একটি রচনা এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম। লেখাটি ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন অমর মুখোপাধ্যায়।

—সম্পাদক, গল্পভারতী

ছৌ-নৃত্য ঃ প্রাচ্যের বিস্ময়

কালিন্দীচরণ পানিগ্রাহী

ওড়িশার জগদ্বিখ্যাত ছৌ-নৃত্য উৎসব বারিপাদা শহরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর এপ্রিল মাসে।

ভুবনেশ্বর ও কোনারকের মন্দির যেমন ওড়িশার কারু ও স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন, পারলাকিমেদীতে যেমন ওড়িশী সংগীতের প্রসার, তেমনি এই নৃত্যের প্রচলন ও বিস্তার ময়ূরভঞ্জ থেকে। ময়ূরভঞ্জের অতীত যুগের শাসকরা এই শিল্পের প্রসারকল্পে প্রভূত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

এই রাজ্যের বাইরে একদা এই নাচ পাইক নৃত্য বা সমর নৃত্য রূপে পরিচিত ছিল।

বহুদিন আগে থেকেই এর খ্যাতি। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন কলকাতায় আসেন তখন একটি বিরাট মেলা হয়। সেই মেলায় তদানিন্তন ময়ূরভঞ্জ শাসক মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও এই নাচ সম্রাট পঞ্চম জর্জের সামনে পরিবেশন করার ব্যবস্থা করেন। এই ব্যবস্থাপনায় তিনি কল্পনাতীত অর্থব্যয় করেছিলেন। এবং তাঁর ব্যয় সার্থক হয়েছিল। বিরাট মঞ্চে এই নৃত্য দেখে দর্শকরা মুগ্ধ বিহ্বল হয়েছিলেন।

সম্রাট পঞ্চম জর্জ এই অভিনব নাচ দেখে এতখানি আনন্দিত হয়েছিলেন যে পরবর্তীকালে ভাইসরয়ের কাছে লেখা একটি পত্রে তিনি তার উল্লেখ করেছিলেন।

১৯১১ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় স্টেটসম্যান এই নৃত্য সম্বন্ধে লিখেছিল—"ওড়িয় পাইক নৃত্য একটি চমৎকার ও মহান কলাকৌশল। নর্তকদের নিখুঁত পদক্ষেপ ও হস্ত সঞ্চালন, তাদের শক্ত সবল শরীরের নৃত্যনমনীয়তা, তাদের মধ্যেকার সমঝোতা আর তাদের নৃত্য ক্ষিপ্রতা সত্যিই বিস্ময়জনক—অদৃষ্টপূর্ব তো বটেই, অকল্পনীয়।"

পরদিন স্টেটসম্যান পুনরায় লেখে—"ময়ূরভঞ্জের মহারাজা কর্তৃক পরিবেশিত ওড়িয়া পাইক নৃত্য দর্শকদের এতই অভিভূত করে যে কোরিন্থিয়ান মঞ্চে পর পর কয়েকদিন এই নৃত্য পরিবেশন করার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। আগামী বুধবার থেকে সেখানে এই নৃত্যের আসর বসবে।"

ময়ূরভঞ্জ ও আশে পাশের গ্রামে নগরে এই নাচকে বলা হয় ছৌ-নৃত্য।

'ছৌ' শব্দটির উদ্ভব বোধ করি 'ছাউনি' থেকে—ওড়িয়া ভাষায় ছাউনি অর্থে সৈন্যদের ঠাঁই। সম্ভবত

অসুস্থ ও আহত সৈনিকদের চিত্ত বিনোদনার্থে সৈন্যদের ছাউনিতে এই নৃত্য প্রথম প্রচলিত হয়।

কিন্তু ছৌ-নৃত্য-বিশারদ পণ্ডিতবর্গ বলেন, প্রাচীন-কালে বনভূমে যে নাচ প্রচলিত ছিল তারই উন্নত সংস্করণ —ছৌ। তাছাড়া রামনবমী তিথিতে সারা ওড়িশায় যে উৎসব হয় এবং সেই উৎসবে বেশব বিভিন্ন নৃত্যের আসর হয়, সেইসব নৃত্যের কয়েকটির সমন্বয় সাধন করে ছৌ তার বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে।

কিছু পরিবর্তিত আকারে ও আংগিকে এই নৃত্য সেরাইকেলা ও অন্যান্য প্রতিবেশী রাজ্যে প্রচলিত। ময়ূরভঞ্জের এই নৃত্য উৎসব অনুষ্ঠান হয় তিনদিন ধরে— ১০ই থেকে ১২ই এপ্রিল। সেই সময় দুর্গাস্তবকাল প্রচলিত চৈত্র পরও অনুষ্ঠিত হয়।

রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে প্রতিদিন এই নাচ দেখবার জন্য হাজার হাজার দর্শকের ভীড় হয়। এক চতুষ্কোণ বিশিষ্ট প্রাংগণের একধারে একটি পাকা প্রেক্ষাগৃহ—সেখানে মহারাজা ও উচ্চ পারিষদ, বন্ধু, ও অতিথি অভ্যাগত বসে এই নৃত্য পরিদর্শন করেন। বসবার জন্য চেয়ার নয়, উৎকৃষ্টতম মাদুর ও মছলন্দ পাতা হয়। রাজা মহারাজা অমাত্যবর্গ জুতো খুলে রেখে ভারতীয় প্রথায় সেই মাদুরে বসেন।

দোতালায় মহিলাদের বসবার ব্যবস্থা। চতুর্দিকে আলোকমালা, পতাকা, ময়ূরভঞ্জের প্রতীকচিহ্ন। চতুষ্কোণ-স্থানের মাঝখানে দুটি ছোট ছোট মুক্ত মঞ্চ। এই মঞ্চ দুইটি দুই বিবদমান নৃত্যদলের। তাদের এক দলকে বলা হয় দক্ষিণশাহী অপরদলকে বলা হয় উত্তরশাহী। বারিপাদা শহরের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে এইভাবে দুটি নামে ও দুটি দলে ভাগ করা হয়। দক্ষিণশাহী দল রাজার তরফে এবং উত্তরশাহী দল রাণীর তরফে নৃত্য করে।

সাধারণত রাত আটটা নাগাদ নৃত্য শুরু হয়। মঞ্চের উপর এক এক দল আবির্ভূত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে শিঙা বাজে, সেই সঙ্গে করতাল, ঢাক আর বাঁশি।

তারপর দুইদল দামনের আঙিনায় নেমে আসে। সেইখানেই নৃত্য শুরু হয়। আঙিনায় বালি ছড়িয়ে রাখা হয় যাতে নর্তকদের পা পিছলে না যায়।

এই নৃত্যে কেবল পুরুষরাই অংশ গ্রহণ করে। স্ত্রীভূমিকা থাকলে তাও পুরুষদের দ্বারাই অভিনীত হয়। রামায়ণ মহাভারত ও অন্যান্য হিন্দু প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ থেকে এই নাচের কাহিনী তৈরী হয়। সেই সকল কাহিনীর মধ্যে বীররস ও যুদ্ধযাত্রার উপকরণই বেশী।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ঘটলেও ওড়িশায় চৈত্র মাসে যে উৎসব হয় তাতে নানা দেবীর আরাধনা করা হয়। এই সকল দেবীকে শক্তিরূপেই পূজা করা হয়। বানপুরের ভগবতী, কাকতপুরের মঙ্গলা, ভুবনেশ্বরের বিমলা, যাজপুরের বিরজা, কনকপুরের সরলা এবং সম্বলপুরের সমলাই—সব দেবী বিগ্রহই শক্তির প্রতীক।

ময়ূরভঞ্জে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও রাজপুরীর বিগ্রহ হলেন কীচকেশ্বরী, শক্তিরূপিনী।

কথাকলিতে আছে চোখের খেলা, মুদ্রার আধিক্য। কিন্তু ছৌ-নৃত্যে দেখা যায় শরীরের ও পেশীর খেলা, কোমর, বুক, উরু, পা, হাত এবং বাহুর পেশী এই নৃত্যে সঞ্চালিত হয় সুসমঞ্জস গতিতে, তীব্র ক্ষিপ্রতায় এবং নিখুঁত সমন্বয়ে। এই নৃত্যের আবেদন তাই ততটা মনস্তাত্ত্বিক নয়, যতটা বহিরাংগিক, আদর্শের চেয়ে বাস্তবতা, প্রতীকের চেয়ে প্রকরণ, কল্পনার চেয়ে সত্য অনুভূতিই এই নৃত্যে স্বতঃপ্রকাশিত। ওড়িশার ভাস্কর্য যেমন বাস্তব ঘেঁষা, ছৌ-নৃত্যও তেমনি।

এই নাচ নিখুঁতভাবে শিখতে শিল্পীদের কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচ বছর সময় লাগে। ছৌ-নৃত্যের পোষাকের বাহার বহু ব্যয় সাপেক্ষ। আলোর ব্যবহারও পর্যাপ্ত। বস্তুত আলোর খেলা এই নাচের একটি প্রধান অঙ্গ।

পাইক নৃত্য ছৌ-নৃত্যেরই একটি অংশ। প্রথম অবস্থায় এর নাম ছিল রামনবমী নৃত্য। মহারাজা বদুনাথ ভঞ্জ (১৮২৯—১৮৬৩), মদন সিং বাবু নামে বনভূমের এক নৃত্য বিশারদকে দিয়ে এই নাচের কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র ভঞ্জের রাজত্বকালে তিনি সেরাইকেলার ছৌ-নৃত্যের খ্যাতি শুনে নিজের রাজ্যে সেই নৃত্যের প্রচলনে আগ্রহী হন। তিনি সেরাইকেলা থেকে উপেন্দ্র বিলাল নামে এক শিক্ষককে নিজের রাজ্যে আনেন এবং উপেন্দ্র বিলাল ময়ূরভঞ্জে ছৌ-নৃত্যের পত্তন করেন বলা চলে।

আরও একজন নৃত্য শিক্ষক সেরাইকেলা থেকে ময়ূরভঞ্জে আসেন। তাঁর নাম বনমালী দাস। এই দুই শিক্ষককে বিস্তর ধনসম্পত্তি দেওয়া হয় যা তাঁদের বংশধরগণ আজো তা ভোগ করছেন

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পর চৈত্র পর কোন রকমে টিঁকে থাকলেও ছৌ-নৃত্যের ব্যাপক প্রচার হ্রাস পায়. তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীরামচন্দ্র তখন মাত্র এগারো বৎসরের বালক।

শ্রীরামচন্দ্র গদী পাবার পর তাঁর প্রথম কাজ হয়. নিজের রাজ্যে ছৌ-নৃত্যের পুনঃ প্রচলন তাঁর দুই ভাই নীল গিরির শ্যামচন্দ্র ভঞ্জদেও এবং বাউংরা রায় সাহাব ভঞ্জদেও দক্ষিণ এবং উত্তরশাখীর ভারপ্রাপ্ত হন দলের সঙ্গে তাঁরা নিজেরাও নৃত্যে যোগ দান করতেন।

এই নৃত্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র বছরে চার পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতেন। কিন্তু দক্ষিণশাখীর নীলগিরির রাজ এবং বাউংরা রায় সাহাব নিজ নিজ অঞ্চলের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার জন্যে আরও অনেক বেশী অর্থ ব্যয় করতেন পোষাকের জন্যই ব্যয় হত আট দশ হাজার টাকা

এই নৃত্যে যুদ্ধের তাণ্ডবতা, শারীরিক শক্তি ও রণকৌশলের বিভিন্ন আংগিক সংগীত ও অঙ্গ সঞ্চালনের বিস্ময়কর সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত। এক একটি নাটা মুহূর্তে যুদ্ধোন্মাদনাময় নৃত্যের প্রচণ্ড গতি ও দুই পক্ষের নর্তকদের আশ্চর্য দেহ সঞ্চালন ও যুদ্ধভঙ্গী দর্শকদের আত্মহারা করে তোলে

কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জকে যে নৃত্য দেখানো হয় তার ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামচন্দ্র প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন মাস পূর্বে থেকে তার প্রস্তুতি চলেছিল ৮ মাস ধরে চৌষট্টিজন নর্তক তাঁর রাজ্যে বসে তাঁর আতিথেয়তায় থেকে তিন জন শিক্ষকের কাছে এই নাচ শুরু করেছিল প্রাচীনকালের ভারতীয় যুদ্ধের কলাকৌশলকে এই নৃত্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল—সমস্ত সমারোহ পূর্ণ প্রতিফলিত হয়েছিল

নৃত্যের মধ্যে ঘন্টাধ্বনি বন্ধ হয়ে গেল. বন্ধ আরম্ভ হল—সবই অংগিকের মধ্য দিয়ে নাচটি-এর সময় প্রচণ্ডবেগে অস্ত্র চালনা হয়েছে. একজন অপরকে আক্রমণ করেছে—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কারুর গায়ে অপরের গা ঠেকেনি শোনা যায়, রাজা পঞ্চম জর্জ সহ সকল বিদেশী অতিথি ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ সেই নৃত্য দেখে একবাক্যে স্বীকার করেছিলেন, এ রকম নিপুণ নিখুঁত অভিনব ও জীবন-স্পন্দন নৃত্য পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

ফরাসী ঔপন্যাসিক ডুমা পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ কথাকার রূপে খ্যাত। অনেক উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তার মধ্যে কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টোর নামই সবচেয়ে বেশী। পৃথিবীর সকল ভাষাতেই বইটির অনুবাদ হয়েছে—সিনেমায় উঠেছে। তার বেশীর ভাগ কাহিনীই ফরাসী দেশের ইতিহাসের উপকরণ দিয়ে রচিত। অবশ্য এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ কল্পনামূলক। তারই সংক্ষেপিত রূপ পরিবেশিত হল।

কাউন্ট অফ মন্টিক্রিস্টো : আলেকজাণ্ডার ডুমা

—ভরদ্বাজ

ফরাসীর সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়ক নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন যুদ্ধে হেরে গিয়ে এলবা দ্বীপে বন্দী অবস্থায় দিন যাপন করছেন সেই সময় ফ্রান্সের দক্ষিণে মার্সেলস শহরে এডমণ্ড নামে একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে বাস করত।

এডমণ্ড জাহাজে কাজ করে খ্যাতি পেয়েছিল যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনি কাজে অনুরাগ, ফলে সকলেই তাকে ভালবাসতো। তার কাজে উন্নতিও হয়েছিল দ্রুত।

সংসারে ছিল শুধু এক বৃদ্ধ পিতা।

মার্সিদিস নামে একটি সুন্দরী ও ধনসম্পন্ন তরুণীর সঙ্গে তার বিবাহের কথাবার্তা চলছিল।

এই সময় এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে তার জীবনের মোড় একেবারেই ঘুরে গেল।

ঘুর দেশে পাড়ি দেয়ে সে জাহাজে ফিরছে। হঠাৎ জাহাজের কাপ্তেনের কঠিন অসুখ করল। তিনি মরবার সময় এডমণ্ডকে ডেকে জাহাজের ভার তার উপর ন্যস্ত করলেন। এডমণ্ডই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সহকারী। শুধু তাই নয় তিনি একখানা খামে-আঁটা পত্র দিয়ে প্যারিসে একজনের হাতে গোপনে পত্রখানা পৌঁছে দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। এডমণ্ড সহজেই রাজী হল।

পত্রখানা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফ্রান্সের যেসব ব্যক্তিরা তখনো নেপোলিয়নকে ভুক্ত করে ফিরিয়ে আনবার জন্য ষড়যন্ত্র করছিল, ঐ কাপ্তেন ছিলেন সেই দলের। খামের মধ্যে সেই ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র ছিল। এডমণ্ড অবশ্য এসব কিছুই জানতে পারে নি।

কিন্তু কাপ্তেন যখন এডমণ্ডকে পত্রখানা আর নির্দেশাদি দিচ্ছিলেন, সেই সময় ডানতেস নামে জাহাজের আর এক কর্মচারী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখেছিল এবং শুনেছিল। চিঠিটার মধ্যে কি ছিল তাও সে জানতো।

ডানতেস অনেকদিন ঐ জাহাজে কাজ করছে, বুড়ো কাপ্তেন মরলে সে-ই কাপ্তেন হবে, এই ছিল তার আশা। কিন্তু মাঝখান থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে ছোকরা এডমণ্ড তাকে লাথি মেরে ডিঙিয়ে কাপ্তেন হোয়ে গেল, তা ডানতেসের সহ্য হচ্ছিল না, সে হিংসায় জ্বলছিল। ঠিক করলে, এডমণ্ডকে বেকায়দায় ফেলে সরাতে হবে।

মার্সেলস-এ পৌঁছে ডানতেস ফারনাণ্ড নামে আর একজনের সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিসের কাছে এক বেনামী খবর পাঠালে যে অমুক জাহাজের এডমণ্ড নেপোলিয়নের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং তার কাছে ঐ ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত কাগজ পত্রও আছে।

এডমণ্ড আর মার্সিদিস অনেকদিন পরে মিলিত হল। বিয়ে হবে দিন স্থির। এডমণ্ড ঠিক করলে বিয়েটা আগে চুকে যাক, তারপর প্যারিসে গিয়ে চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কিন্তু বিয়ে হল না। বিবাহের জন্য সে তৈরী হয়ে বাড়ি থেকে [illegible] এমন সময় পুলিস এসে তার

বাড়ি ঘেরাও করলে প্রেপ্তার হল এডমণ্ড। এবং দুর্ভাগ্যের কথা তার কাছ থেকে শত্রুটাও পাওয়া গেল।

বিচার হল। দণ্ডাদেশ বেরুলো—চাতুর্দশ বাসক কারাগারে যাবজ্জীবন তাকে কাটাতে হবে।

• • • •

অসহ্য বন্দী দশা। প্রথম প্রথম এডমণ্ডের আশা ছিল, সে মুক্তি পাবে—তার আপীল, আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হবে না। কিন্তু কিছুই যখন হল না, তখন সে যেন পাষাণের মতো হয়ে গেল।

বছর কয়েক কাটবার পর হতাশ হোয়ে এডমণ্ড স্থির করলে, সে আর এ জীবন রাখবে না, অন্য কোন উপায় যখন হাতের কাছে নেই, তখন সে অনশন করে প্রাণ ত্যাগ করবে।

এমন সময় এক কাণ্ড

ঐ বন্দীশালায় আর একজন পণ্ডিত পাদরি অবরুদ্ধ ছিলেন, তাঁকেও এক অতি তুচ্ছ কারণে বন্দী করা হয়েছিল।

তিনি কিন্তু হতাশ না হয়ে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করছিলেন লোহার সানকি ভেঙে তার টুকরো লুকিয়ে রেখে সেটা ঘসে ঘসে অস্ত্র বানিয়েছিলেন এবং সেই অস্ত্র দিয়ে মাটি খুঁড়ে আন্দাজে আন্দাজে বাইরে যাবার সুড়ঙ্গ তৈরী করছিলেন।

তাঁর নাম ফারিয়া অসীম ছিল তাঁর অধ্যবসায় ও ধৈর্য। অনেকদিন ধরে সাবধানে অল্প অল্প করে সুড়ঙ্গ কেটে তিনি পথ তৈরী করলেন।

কিন্তু আন্দাজ ঠিক হয়নি—পথটা বাইরে না গিয়ে অন্য একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। সেই ঘরেই এডমণ্ড বন্দী ছিল।

ব্যাপার দেখে এডমণ্ড বিস্মিত ভীত। কিন্তু আনন্দও হল। এতদিন পরে তবু একটা মানুষের মুখ দেখা গেল। তার সঙ্গ পাবার সুযোগ হল।

ফারিয়াও বড় হতাশ হলেন প্রথমটা। তাঁর এত দিনের পরিশ্রম এ ভাবে ব্যর্থ হল। কিন্তু তিনি দমলেন না। এডমণ্ড প্রাণত্যাগ করার সংকল্প করেছে জেনে তাকে উৎসাহ দিয়ে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করলেন—নতুন আশায় তাকে উদ্দীপ্ত করলেন বললেন, কোন অবস্থাতেই মানুষের হতাশ হওয়া উচিত নয়। চেষ্টা, অধ্যবসায়, দৃঢ়সংকল্প, ধৈর্য এবং আশা—এর সহায়ে পৃথিবীতে অনেক কিছু করা যায়।

তারপর তারা দুজনে সুড়ঙ্গ পথটা গোপন রেখে পরস্পর মিলিত হোতে লাগল এবং তাতে এডমণ্ডের প্রভূত উপকার হল।

ফারিয়া ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। অনেক লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি এডমণ্ডকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করলেন। বছর কয়েকের মধ্যেই এডমণ্ড নানা ভাষায় পারদর্শী হল। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর জ্ঞান লাভ করল।

এমন সময় ফারিয়া সহসা সে রোগে মারা গেলেন।

তাঁর মৃত্যুতে এডমণ্ড প্রথমটা অভিভূত হয়ে গেল। তাঁর মত উপকারী বন্ধু সে তো আর পায়নি তারপর তার মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল

এখানে ওই বন্দীশালার কারুর মৃত্যু হলে তাকে কবর দেওয়া বা পোড়ানো হত না, তার দেহটা চটে মুড়ে সেলাই করে পাথর বেঁধে পাহাড়ের উপর থেকে জলে ফেলে দেওয়া হোত

ফারিয়ার মৃতদেহ যখন কারাগারের লোকেরা চটে মুড়ে বেঁধে রেখে চলে গেল তখন এডমণ্ড চটের সেলাই খুলে ফারিয়ার দেহটা বার করে নিজের ঘরে এনে বিছানার উপর চাদর মুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখে এলো, যাতে প্রহরীরা মনে করে যে সে ঘুমোচ্ছে। তারপর নিজে গিয়ে সেই চটের মধ্যে সেঁধিয়ে, ভিতর থেকে সেলাই করে দিয়ে মড়ার মত পড়ে রইল। ফারিয়া যে লোহার টুকরো দিয়ে ছুরি তৈরী করেছিলেন সেটা সে সঙ্গে নিয়েছিল।

কারারক্ষীরা খানিকক্ষণ পরে এসে সেই থলে মোড়া দেহটা নিয়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে জলে ফেলে দিলে।

জলে পড়ে পাথরের ভারে এডমণ্ড প্রথমে তলিয়ে গেল, তারপর ছুরি দিয়ে চট আর পাথর বাঁধা দড়িটা কেটে ফেলে জলের উপর ভেসে উঠল।

এডমণ্ড ছিল বড় সাঁতারু ঘণ্টা দেড়েক সাঁতার

কেটে সে দেখলে অদূরে আর একটা পাহাড় সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে সেই পাহাড়ের ডাঙায় গিয়ে উঠল। এইভাবে চৌদ্দ বছর পরে এডমণ্ড মুক্তিলাভ করল।

• • • •

পরদিন ভোরে এডমণ্ড দেখতে পেল, দূর দিয়ে একটা জাহাজ যাচ্ছে।

সে তখনই আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণে সাঁতার কেটে সেই দিকে এগিয়ে চলল এবং তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে হাত তুলে চীৎকার করতে লাগল।

দেহ ক্রমে অবশ হয়ে আসছে চেঁচাবারও শক্তি ক্রমে লোপ পাচ্ছে। এডমণ্ডের দু' চোখে অন্ধকার নামছে।

এমন সময় জাহাজের একজন খালাসী তাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি জাহাজের নৌকা জলে নামিয়ে তার কাছে এলো এবং তাকে তুলে নিয়ে গেল। জাহাজে উঠেই এডমণ্ড অজ্ঞান হয়ে পড়ল আর কিছুক্ষণ দেরী হলেই সে মারা পড়ত নির্ঘাৎ।

একটু সামলে নিয়ে এডমণ্ড তার পরিচয় দিয়ে জানালো যে সে একটা জাহাজে কাজ করত, কাল রাত্রে সেই জাহাজ ডুবে গেছে। সে কোন রকমে এতক্ষণ জলে ভেসে ছিল।

জাহাজের লোকেরা ছিল ভাল। তারা তাকে যত্ন করে খাইয়ে দাইয়ে চাংগা করে তুললো।

সে জাহাজে কাজ করত, জাহাজের কাজকর্ম সে ভালই জানে—এই খবর জেনে জাহাজের কাপ্তেন তার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করে তাকে সেই জাহাজেই কাজে নিযুক্ত করল। তাদের একজন ঠিক এই রকম ভাল লোকের দরকার ছিল। এডমণ্ড সেই জাহাজেই ঘরে গেল। যেন নতুন জীবন পেল সে।

সেই দিন রাত্রে এডমণ্ডের মনে পড়ল, ফারিয়া মরবার আগে তাকে এক গুপ্তধনের সন্ধান বলে ছিলেন। সেই গুপ্তধনের ইতিহাস হল এই রকম :

বহুদিন আগে রোমে আলেকজান্দার বর্জিয়া নামে এক পোপ ছিলেন। যদিও পোপ হলেন সমস্ত ক্রিশ্চানদের ধর্মগুরু, তাঁরা সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন, তাহলেও তাঁদের মধ্যে মাঝে মাঝে অসৎ লোকেরও দেখা পাওয়া যেত। আর আলেকজান্দার বর্জিয়া ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে অসৎ চরিত্রের মানুষ। যেমন তাঁর অর্থলিপ্সা, তেমনি তাঁর লাম্পট্য। তিনি তাঁর ছেলে সীজার বর্জিয়া আর মেয়ে লুক্রেসিয়ার সাহায্যে অতি নোংরা উপায়ে বিরাট ধন সঞ্চয় করেছিলেন।

সেই সময় কার্ডিনাল স্পাডা নামে একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন। কার্ডিনাল পদটা হল পোপের ঠিক পরেই। পোপ টাকার জন্যই যে স্পাডাকে কার্ডিনালের পদটা দিয়েছিলেন তা স্পাডা ভাল করেই জানতেন এবং পাছে পোপ লোক লাগিয়ে তাঁর ধন কেড়ে নেন সেই ভয়ে তিনি তাঁর সব ধনরত্ন গোপনে মন্টিক্রিস্টো নামে একটা ছোট দ্বীপে এক পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে পুঁতে রেখে দেন সেই ঐশ্বর্যের কথা তিনি উত্তরাধিকারীদের বলে যেতে পারেন নি, একটা অদ্ভুত কালীতে লিখে রেখে ছিলেন। ফারিয়ার সঙ্গে স্পাডার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি প্রায়ই স্পাডার লাইব্রেরীতে বসে পড়া শোনা করতেন। স্পাডার মৃত্যুর বহুদিন পরে ফারিয়া স্পাডার লাইব্রেরীর পুরানো বই খুঁজতে গিয়ে ঐ কাগজখানার সন্ধান পান। কিন্তু তার পর দিনই তাঁকে বিদ্রোহীদলের একজন চাঁই বলে গ্রেপ্তার ও বন্দী করা হয়। ফলে তিনি মন্টিক্রিস্টোতে গিয়ে সেই ধনরত্নের সন্ধান করতে পারেন নি। মরবার পূর্বে ফারিয়া এডমণ্ডকে সেই গুপ্তধনের কথা বলে যান এবং আরো বলেন যে, এডমণ্ড নির্ভয়ে সেই ধন নিতে পারে। কারণ স্পাডার বংশের কেউ আর দুনিয়াতে নেই। সুতরাং সেই ঐশ্বর্য যে খুঁজে পাবে তারই হবে।

এডমণ্ড ফারিয়ার কথাটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

কিছুদিন কাজ করবার পর একদিন তাদের জাহাজ যখন মন্টিক্রিস্টোর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সে প্রস্তাব করল যে ঐ দ্বীপে জাহাজ নোঙর করে শিকার করা হোক।

মন্টিক্রিস্টো একটা খুব ছোট দ্বীপ। লোকালয়

নেই। বুনো ছাগল আর হরিণ চরে বেড়াতো। কাজেই প্রচুর শিকার পাওয়া যাবে বলে সকলেই তার কথায় উৎসাহ সহকারে রাজী হল।

জাহাজ বেঁধে কয়েকজন বন্দুক প্রভৃতি নিয়ে নৌকা করে সেই দ্বীপে গিয়ে উঠল।

সেখানে গিয়ে একটু পরেই এডমণ্ড একটা বড় পাথরের উপর থেকে পড়ে গিয়ে তার পা ভাঙলো। কিন্তু সেটা ছিল তার অভিনয়। খুব যন্ত্রণাকাতর ভাব দেখালো, যেন নড়বার চড়বার শক্তি নেই। জাহাজের লোকেরা বললে তাকে ধরাধরি করে জাহাজে নিয়ে যাবে তারা। কিন্তু তাতে এডমণ্ড ঘোর আপত্তি জানালো। বললে, নড়াচড়া করলেই সে মরে যাবে। তার চেয়ে তার সঙ্গীরা বরং এক কাজ করুক, কিছু খাবার, একটা বন্দুক আর কিছু গুলিবারুদ রেখে তারা চলে যাক, পরশু আবার ফেরবার পথে তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তার জন্যে অনর্থক জাহাজ আটকে রাখা উচিত হবে না। সে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করলে নিশ্চয়ই দু'দিনে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে।

তার সঙ্গীরা প্রথমটা এ প্রস্তাবে রাজী হল না। একা সে এই দুর্গম সাপ ও হিংস্র জন্তু অধ্যুষিত জায়গায় থাকবে কেমন করে? একজন না হয় তার সঙ্গে থাকুক।

তাতেও এডমণ্ডের আপত্তি। কেউ থাকলে যে তার গুপ্তধনের সন্ধান ব্যর্থ হবে। তাই সে সকলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জাহাজে পাঠিয়ে দিলে। অগত্যা তারা তার কাছে পর্যাপ্ত খাবার, একটা বন্দুক, কিছু গুলিবারুদ আর একটা শাবল রেখে জাহাজে ফিরে গেল।

তাদের জাহাজটা দিগন্তের আড়ালে চলে যেতেই এডমণ্ড উঠে পড়ল এবং তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া দাওয়া করে সেই পার্বত্য গুহার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

কালো পাথরের পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে কোন গুহাই তো চোখে পড়ে না। খুঁজে খুঁজে হয়রান হল এডমণ্ড। সারা দিন ঘুরে ঘুরে একটা বুনো শিয়ালকে তাড়া করে তার পিছনে পিছনে সন্ধ্যার আগে সে একটা গুহার কাছে এসে পড়ল।

স্থানটা পাহাড়ের মাঝামাঝি। বাইরে থেকে দেখা যায় না। জঙ্গলে ঢোকা। শুধু একটা পাথরের গায়ে চিহ্ন দেখে সে ধরতে পেরেছিল।

গুহার মুখটা ছোট, সেই মুখে একটা প্রকাণ্ড পাথর চাপা দেওয়া। সে পাথর সরানো দুঃসাধ্য। অনেক চেষ্টার পর সে বুদ্ধি করে বন্দুকের নল যে বাক্স দিয়ে রেখেছিল তারই খানিকটা পাথরের নীচে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে। প্রচণ্ড শব্দ করে পাথরটা আলগা হয়ে গেল। তখন শাবলের সাহায্যে সে সেটাকে সরিয়ে ফেলল।

পাথরটা সরে গিয়ে গুহার মুখ পরিষ্কার হল। তখন একটা কাঠকে মশালের মতো জ্বেলে নিয়ে এডমণ্ড সেই গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। দেখল, সামনে চার কোনা একটা পরিষ্কার ঘর।

জারিয়া বলে দিয়েছিলেন, গুহার দ্বিতীয় ঘরের কোনে ধনরত্ন আছে। কিন্তু কোথায় সেই দ্বিতীয় ঘর? তার চিহ্নও তো চোখে পড়ে না। হতাশায় এডমণ্ড আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। তার এত শ্রম কী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল?

এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল, একদিকের দেওয়ালের পাশে একটা চারকোণা পাথরে আংটা লাগানো রয়েছে। একটা মোটা ডাল দিয়ে চাড় দিতেই পাথরটা খুলে এলো। এডমণ্ড উৎসাহিত হল। দ্বিতীয় গুহার ঢোকবার পথ সে খুঁজে পেয়েছে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কিন্তু আবার হতাশায় সে মুষড়ে পড়ল। ঘরটা খালি। কোথাও কিছু নেই।

মাথায় হাত দিয়ে সে বসে রইল কিছুক্ষণ। তার পর তার মনে পড়ল, জারিয়া বলেছিলেন, ঘরের কোনে পোঁতা আছে সেই গুপ্তধন। সে তখন শাবল দিয়ে একটা কোনের মাটি সরাতে লাগল।

তার এত কষ্ট, এত অধ্যবসায় শেষ পর্যন্ত তাকে ঈপ্সিত ফল প্রদান করল। হাত দুই মাটি সরাতেই শাবলের ঘায়ে ঠং করে আওয়াজ হল। তারপর সে টেনে তুললো একটা কাঠের সিন্দুক, লোহার পাত জড়ানো, তার গায়ে একটা প্রাচীন তালা ঝুলছে

শাবলের সাহায্যে এডমণ্ড সহজেই সিন্দুকের তালাটা খুলে ফেলল।

তারপর যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা দেখে সে যেন ঠিকরে পড়ল, তার মাথা ঘুরতে লাগল।

সিন্দুকের মধ্যে রাশি রাশি মণিমাণিক্য, তাল তাল সোনা, আর অসংখ্য সোনার টাকা। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ঐ সিন্দুকটার মধ্যে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ ছিল। এখন সে সব তার একার।

• • • •

কিছু ক্ষণ মাথায় এডমণ্ড বাইরে এসে দাঁড়ালো। নতজানু হয়ে ভগবানকে ধন্যবাদ জানালো। তারপর সেই গুহার মুখেই সারারাত শুয়ে রইল।

পরদিন ভোরে উঠে পোটা কতক বাছাই করা হীরক খণ্ড আর কয়েকটা সোনার টাকা পকেটে নিয়ে সিন্দুকটা যেমন ছিল তেমনি বন্ধ করে রেখে গুহার মুখটা ভাল করে বুজিয়ে দিয়ে, সমুদ্রের ধারে চলে এলো। অবশিষ্ট আহার যা ছিল তা খেল। তারপর তাদের জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

নির্ধারিত সময়ে জাহাজ এলো এবং তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। সে যে ইতিমধ্যে সেরে উঠেছে তা দেখে তার সঙ্গীরা বিলক্ষণ আনন্দ প্রকাশ করল। এডমণ্ড তখনো অবশ্য ভান করে একটু একটু খুঁড়িয়ে চলাফেরা করতে লাগল।

তারপর একদিন এক সুযোগে সে মার্সেলস-এ গিয়ে উপস্থিত হল। অনেকদিন পরের ব্যাপার, তাহলেও তার ভয় ছিল, কেউ যদি তাকে চিনে ফেলে। সে যে এখন চেনা দিতে চায় না।

সেখানে পৌঁছে সে যা খবর পেল তা মর্মান্তিক। খবর নিয়ে জানলো, তার বাবা অনেকের হাতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করে মারা গেছেন আর মার্সিদিস কিছুদিন তার জন্য অপেক্ষা করে ফার্নাণ্ড নামে একটি লোককে বিয়ে করেছে।

এডমণ্ড মনে দারুণ আঘাত পেল। যাই হোক সে নিজেকে সামলে নিল, তারপর হীরেগুলো বিক্রি করে অনেক টাকা হাতে পেয়ে একটা ছোট জাহাজ কিনলে। সেই জাহাজে করে আর একবার মন্টিক্রিস্টোতে গিয়ে সে গুপ্তধনের সিন্দুকটা নিয়ে এলো।

ব্যস! তারপর আর তাকে পায় কে? আর কোন দুঃশ্চিন্তা নেই। সে হল পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

তারপর বছর কয়েক ধরে সে খোঁজ খবর নিলে, কারা তার সর্বনাশ করেছিল এবং তার বাপকে কষ্ট দিয়েছিল। তখন সে নিজের নাম নিয়েছে—কাউণ্ট অফ মন্টিক্রিস্টো। বিরাট বাড়ি। এলাহি কাণ্ড! আগেকার সেই গরীব এডমণ্ডকে কেউ চিনলো না। বিখ্যাত ধনী, বিরাট দাতা কাউণ্ট অফ মন্টিক্রিস্টোকে সবাই খাতির করতে লাগল

যারা তার অবর্তমানে তার বাপের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছিলেন এডমণ্ড খুঁজে খুঁজে তাঁদের বার করল এবং নানাভাবে তাঁদের সাহায্য করল।

তারপর তার মনে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগল। যারা তার বাপকে লাঞ্ছিত করেছে, তার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করেছে, এইবার তাদের পালা।

ফার্নাণ্ড এবং ড্যাংলার ইতিমধ্যে বেশ বড়লোক বনেছিল কিন্তু এডমণ্ডের তুলনায় কিছুই নয়।

তাদের সঙ্গে আলাপ হল এডমণ্ডের। তারা মহা সমাদরে কাউণ্টকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল।

তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে তাদের সর্বস্বান্ত করবার সুযোগ যার করল এডমণ্ড। টাকার জোরে সে এমন ষড়যন্ত্র-জাল পাতলে যাতে তার শত্রুরা সহজেই আটকা পড়ল।

ফার্নাণ্ড নানারকমে অপদস্থ হয়ে শেষ কালে আত্মহত্যা করলে, ধনশালী ড্যাংলার শেষ পর্যন্ত রাস্তার ভিখারীতে পরিণত হল, আর যে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বিনা দোষে শাস্তি দিয়েছিল তার চাকরি গেল, তার স্ত্রীপুত্র বিষ খেয়ে মরে গেল এবং সে নিজে শেষ পর্যন্ত পাগলা গারদে গেল।

কাউণ্ট অফ মন্টিক্রিস্টোর সব সাধই পূর্ণ হল। কেবল দুঃখ রয়ে গেল মনে যে সে জীবনে তার প্রেমাস্পদাকে পেল না।

গ্রামীণ সংস্কৃতিতে পুতুল ও পট

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

শৈশবের অন্যতম আকর্ষণ পুতুল আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর খেলার সামগ্রী হলেও তার গড়ন ও ঢং-এ দীর্ঘদিনের মনন ও সমাজদৃষ্টির বেশ সুন্দর একটা পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমানে সহরের শিশুদের হাতের মেলার পুতুল নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়ে নূতন রূপ ধারণ করলেও গ্রামের শিশুরা এখনও চিরাচরিত মাটির পুতুলেই তাদের খেলার শখ মিটিয়ে থাকে। যদিও মেলা আর পার্বণে পুতুলের চলন যে ক্রমেই কমে আসছে এটা বেশ লক্ষ্য করা যায়। এই চলিত পুতুলের ক্রমিক ক্ষীয়মানতার দুইটি কারণ বেশ স্পষ্ট; এর প্রথম কারণ অর্থনৈতিক কারণে গ্রামীণ শিশুদের চিত্তবিনোদনের জন্য পুতুল জোগাবার প্রেরণা সাধারণ গৃহস্থ সমাজে কমে আসছে; আর অন্যদিকে খেলনা পুতুল তৈরী করে বিক্রী করা ব্যবসায়িক দিক থেকে মোটেই লাভজনক বলে আর গণ্য হচ্ছে না। এই কারণেও যারা পুতুল তৈরী করত তারা আর পুতুল নির্মাণে তেমন উৎসাহ বোধ করছে না। অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে প্রচলিত পুতুল শিল্প যে অচিরকালের মধ্যে অতীতের স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পুতুল শিল্পের বর্তমান অবস্থা খুব উৎসাহব্যঞ্জক না হলেও এর ঐতিহ্য ও সামাজিক মূল্যকে কোন মতেই খাটো করা যায় না। শিশুরা চিরকালই কল্পনাপ্রবণ ও সেই সূত্রেই পুতুলের অনুরাগী। চারদিকে সচরাচর আকারে বড় ও আয়তনের বাইরেকার প্রমাণ দেহ মানুষ বা পশুপক্ষী শিশু মনে এক অপরিসীম বিস্ময় ও রহস্যের সঞ্চার করে আসছে যাদের গতিপ্রবণতা পারিপার্শ্বিক জগতের চলৎশক্তিহীন বৃক্ষলতা অপেক্ষা অনেক বেশী। এ তাই ক্ষুদ্রাকারে তৈরী করা এই সব মানুষ বা পশুপক্ষীর আকারে গড়া পুতুল শিশু মনকে এই সব বহুস্তরপূর্ণ অস্তিত্বের মৌলিকরূপ সম্বন্ধে সচেতন করতে সাহায্য করে। পরিপূর্ণ অবয়বে গড়ে ওঠা মানুষ যেমন শিশুর নিকট এক গভীর বিস্ময়ের পাত্র—ক্ষুদ্র আকারে গড়া এই পূর্ণাবয়ব মানুষের প্রতিরূপ নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে তার এই প্রতিরূপের হাত পা মাথা মুখ দেহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে মানুষকে বুঝবার চেষ্টা করে, চেষ্টা করে পুতুলের আকারে তৈরী গরু ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, বাঘ, সিংহ সম্পর্কে ধারণা গড়ে তুলতে। পুতুল নিজে সচল না হলেও শিশুর মনোজগতে সন্তরের বনমানুষ পশুপক্ষী অপেক্ষা এই পুতুলই অনেক বেশী পরিচিত অনেক বেশী সহজ। শিশুদের নিকট পুতুলের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগের অন্তর্নিহিত কারণটি অনেকটা এই ধরণের হলেও এই উপলব্ধিটিকে বেশ ভাল করে না বুঝতে পারলে শিশুদের জন্য পুতুল তৈরী করা যায় না। আর এই দিক থেকে পুতুলের কারিগরকে দেশকাল বিশেষে তাই শিশু মন কি চায় সেই সম্পর্কে বেশ ভালকরে ওয়াকিবহাল হতে হয়েছে—আর এখানে তাই প্রাচীন মিশর আর গ্রীস রুরাট আর মহেঞ্জোদরো পাটলীপুত্র আর চীনের পুতুলের সামান্য শিশুবিদদের বিশেষ কোন বিস্ময় সৃষ্টি করে না।

বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলে যেসব পুতুলের প্রচলন রয়েছে সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। অঞ্চলভেদে পুতুলের জগতে বেশ কিছু বৈচিত্র্যও যে না দেখা যায় তা নয়। অবশ্য পুতুল বলতে এককথায় আমরা কলকাতার সহরের লোকেরা অনেক সময় কৃষ্ণনগরের পুতুলই বুঝি। রথের কিংবা অন্য সব মেলায় কুমোরটুলীর পটুয়াদের দেওয়া দোকান যার প্রচুর আবির্ভাব এখন চোখে পড়ে। কৃষ্ণনগরের পুতুলের বয়েস কিন্তু খুব বেশী নয় আর তার সংবেদন শিল্পমন অপেক্ষা পরিণত মানসকে উদ্দেশ করেই সৃষ্টি হয়েছিল—যার প্রমাণ আছে। ইংরাজ আবির্ভাবের

গোড়ার দিকে হয়ত কুটীরশিল্প সাহেবদের চিত্তবিনোদনের জন্য এই পুতুলশিল্পের প্রবর্তন হয়েছিল আর সেই জাতের অনুরাগীদের দৌলতে পাশ্চাত্যদেশেও ঐ পুতুলের কদর হয়েছিল। কিন্তু অতি স্বাভাবিক ও বাস্তবধর্মী বেশভূষা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখাবয়ব সম্বলিত এই সব পুতুল ঠিক ঐতিহ্যবাহী বা সমাজধর্মী বলে কখনও গণ্য হয়নি এবং শিশুমনেরও সংবেদক হয়ে ওঠেনি। অবশিষ্ট ভারতে বিশেষ করে বারানসী মুরাট দক্ষিণভারত বা রাজস্থানের কিছু পরিমাণে বাস্তবধর্মী কিছু পুতুলের প্রচলন আছে তা যার সঙ্গে কেটনগরের পুতুলের যোগ থাকলেও এ পুতুল ঠিক গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পুতুল নয়। গড়নে, মুখাবয়বে এবং বর্ণোজ্জ্বল আভরণ ও পরিচ্ছদ সজ্জায় লক্ষিত নূতন গ্রাম বা নাড়াজোলের পুতুলে কিছু পরিমাণে কেটনগরের পুতুলের নৈকট্য থাকলেও ঘোলাই বেলেরই রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নামে পরিচিত এই সব পুতুলে গ্রামীণ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অনেক বেশী স্পষ্ট। এই সব পুতুল যেমন শিশুদের হাতে পড়ে তাদের পুতুল নিয়ে খেলার অভিলাষ পরিতৃপ্ত করতে পারে তেমনি পরিণত মনেরও যে এই সব পুতুলের আকৃতিতে তৃপ্তিলাভ করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বর্ণের প্রলেপ থাকলেও কালীঘাটের কাঠের মাথা পুতুল কিন্তু এই সব পুতুলের ঠিক সগোত্র নয়। কালীঘাটের মন্দির সংলগ্ন দোকানগুলিতে একসময় এই ধরণের পুতুল খুবই দেখতে পাওয়া যেত; বর্তমানে এই পুতুলের চাহিদা থাকলেও জোগান নেই বললেও চলে। পুতুলকারীকে ঠিক শিল্পপর্যায়ে ফেলা চলেনা। যেমন অনেক সময় আমাদের গুরুগম্ভীর দেবপ্রতিমাও শিল্পকীর্তি হয়ে উঠতে পারেনা। পুতুল ঠিক কারুশিল্পও নয়। পুতুলের সার্থকতা তার সমাজমূল্যে—তার চিত্তবিনোদনের ক্ষণিক সফলতা বিধান, তার দেহগঠনের মৌলিকত্বকে শিশুমনের পরিধির আয়তনে আয়ত্ত করার কৌশলে। এই সব বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কালীঘাটের পুতুলগুলি খুবই অর্থপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময় ছিল। পুতুলের জগতে এই জাতেরই সগোত্র বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র প্রচলিত বর্ণপ্রলেপবিবর্জিত নানা ভঙ্গীর নরনারী আর পশুমূর্তি সম্বলিত মা বা একক দণ্ডায়মান নারী বা পুরুষের মূর্তি—এই জাতের পুতুল ব্যাপক প্রচলিত দেখা যায়। নরম মাটিতে আঙুল দিয়ে টিপে নাকমুখ করে আর শরীরটা গড়ে কোথাও হাত পা-র কেবল ইঙ্গিত দিয়ে আবার কোথাও হাত পা কিছুটা মানানসই করে করা এই ধরণের পুতুল পরে পুড়িয়ে নিয়ে পাইকারী হারে হাটে বাজারে মেলায় পার্বণে বিক্রি হত, আর চলতও খুব। অত্যন্ত সহজলভ্য এই ধরণের পুতুলের উদাহরণ ছিল ঐ কৌশলেই তৈরী হাতী আর ঘোড়ার পুতুল—যার সমাবেশ এখনও গ্রামাঞ্চলের মন্দির বা পীরের থানে সুপ্রচুর লক্ষ্য করা যায়। এখানে এসে দেখা যায় শিশুর ক্রিয়া-ভঙ্গী আর পরিণত বয়সের মানুষের ব্রতমানসের ভাগ এসে মিলিত হয়েছিল। ষষ্ঠী পূজা উপলক্ষ্যে এই ধরণের পুতুল তৈরী হত গৃহবধূদের হাতে হাতে পিটুলী আর হলুদের উপকরণে। আর এই মৌলিক দেহগঠনে বিধৃত হয়েছিল বহুসহস্র বৎসরের ঐতিহ্যময় পুতুলের ধারাবাহিকতা যার পূর্বগামীদের সন্ধান পাওয়া যায় মহেঞ্জোদরো আর হরপ্পায়, বৈশালী আর পাটলীপুত্রে, বেড়াচাঁপা, তমলুক আর বাণগড়ে।

আর এই পুতুলের ঐতিহ্যের সগোত্রীয় অন্যতর যে শিল্প এখনও বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির অনুসঙ্গ হয়ে আছে তা হচ্ছে পট। পটও একসময়ে গ্রামজীবনের অঙ্গ বলেই মনে করা হত যার অপরিহার্য স্থলাভিষিক্ত হয়েছে ফোটো গ্রাফের ছবিতে। ক্যালেণ্ডারের চিত্রে আর সচিত্র পত্র পত্রিকা থেকে কেটে নেওয়া ছবিতে। পরিচ্ছন্ন করে নিকোনো মাটির গৃহপ্রাচীরের বাইরে নানা বর্ণের রেখাভিত্তিক ছবি এখনও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামীণ সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। প্রাচীরে চিত্রিত এই বৈচিত্র্যপূর্ণ অলঙ্করণ রীতির সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরস্থ সজ্জা কর্মে ব্যবহৃত পটচিত্রের যে একটা যোগ ছিল ধারাবাহী, কোন গৃহস্থের কুটীরে প্রবেশ করলে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বাংলাদেশের গৃহোপকরণের স্থায়িত্বের ক্ষণিকতার ফলে বাংলার গৃহগত বহু ঐতিহ্যই আজ বিলুপ্ত। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী উপকরণে নির্মিত ভারতের অন্যান্য বহু অঞ্চলের গৃহে এখন এই ঐতিহ্যও সুস্পষ্ট হলেও বাংলার

গ্রামে দীর্ঘস্থায়ী আবাসগৃহের অভাবে গৃহাভ্যন্তরের ধূপসজ্জার ধারাবাহী পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবুও প্রাচীন নানা ধরণের পটেও কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া কঠিন নয়। পটের ধারাবাহিকতা বিধৃত ছিল পেশাজীবী পটুয়াদের প্রদর্শিত গুটোনা পটে যার প্রচলিত পরিচিতি ছিল যমপট নামে। এখন কখনও সখনও গ্রামের পথে পটুয়াদের দেখা পাওয়া গেলেও তারা পট বেচিয়ে আর জীবিকা অর্জন করতে পারেনা। তাই তাদের পটের ধারাবাহিকতা এখন অনেকটাই স্তিমিত। লম্বা ধরণের যেসব পট পটুয়াদের ঘর থেকে সংগৃহীত হয়ে এখন যাদুঘরের সংগ্রহে আশ্রয় নিয়েছে তা থেকে এদের রূপ ও ঐশ্বর্য সম্পর্কে অবহিত হতে হয়। কুশলী হাতের দ্রুততানে মোটা রেখায় আঁকা ভারী আয় চওড়া কিন্তু সমতল চালের মাথুর আর পত্রমূর্তি সবুজ পাতা ডালপালা আর কাণ্ডে সমৃদ্ধ গাছ কালীঘাট পটের উদ্ভব হয়েছিল নিশ্চিতভাবেই কলকাতার বাইরে কোন পল্লীপ্রান্তে।

অনেকে অনুমান করেন কালীঘাটের পটুয়ারা নতুন গ্রাম থেকে কালীঘাটে বাসাবাড়ি নিয়ে ব্যবসায়ের পত্তন করেছিল। এই পটচিত্রের পেছনে চলিত শিল্পের মূর্তিবিন্যাসের (Iconography) সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্য করা যায় কালীপ্রতিমার রূপায়ণে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের এক বিশিষ্ট আকৃতির প্রস্তরখণ্ডকে, তিনটি চোখে ভূষিত করে আর স্বর্ণের জিহ্বা ও রৌপ্যনির্মিত হাত বিন্যাস করে মাতৃকারূপের যে বিমূর্ত প্রতিকল্প সৃষ্টি করা হয়েছিল, কালীঘাটের পটুয়া যাত্রীসাধারণের জন্য সেই বিমূর্তরূপকে চিত্ররূপে রূপান্তরিত করে তাদের কর্মতৎপরতা আরও করেছিল বলে মনে হয়। তীর্থদর্শনের স্মৃতিচিহ্ন রূপে এই কালীমূর্তি সংগ্রহের যোগান দেবার পরও পটুয়ার যে সময় উদ্বৃত্ত থাকত তাই সে প্রয়োগ করেছিল পারিপার্শ্বিক সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রবল শ্লেষের চিত্রায়ণে। এ যেন যম পটেরই নূতন রূপায়ণ বা রাঢ়খণ্ডের পারলৌকিক পটেরই নাগরিক সংস্করণ। গ্রাম থেকে নগর জীবনে উপনীত গ্রামীণ পটুয়ার এই সমাকৃষ্টিতে স্বভাবতই চলিত শিল্পের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। জার্মানি থেকে আমদানীকরা শিল্প সম্পর্কহীন রসবিচ্যুত তৈলছাপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কালীঘাটের পটের কালাবসানে বাংলার এক দীর্ঘ প্রসারিত গ্রাম সংস্কৃতির অবসানই সূচীত হয়ে ছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এঁকে বেঁকে বয়ে যাওয়া নদী এই সব মিলেই আঁকা হত এইসব পট। এদের বিষয়বস্তু ছিল সমাজের অতি জনপ্রিয় সব কাহিনী যেমন, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, বেহুলা কাহিনী, এমনি আরও কত কি। গ্রামের জীবনের সঙ্গে এই সব ঐতিহ্যবাহী কাহিনী কেবল গ্রামবাসীদের অবসর জীবনকেই রসসিক্ত করত তা নয় লোকশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই সব পটের অবদান ছিল অনস্বীকার্য আর এই পটবিন্যাসে রেখা বিন্যাস ও বর্ণ যোজনার যে পারদর্শিতা লক্ষ্য করা যায় গ্রামীণ শিল্পবোধের ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে দ্বিধা করা যায়না। এই পটচিত্রের সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় সরা আর হাড়ির গায়ে আঁকা নানা ধরণের ছবির। হাড়ির গায় সাধারণতঃ বর্ণালী অলঙ্কার আর ফুললতা পাতার সমাবেশেই বেশী কোনে পড়ে। তবে বরিশাল অঞ্চলের মনসার ঘটের ঘাড়বাঁকানো সর্পাকৃতির সঙ্গে সমিবদ্ধ মনসাদেবীর মূর্তি বা চিত্র রূপসমৃদ্ধ গড়নের বেশ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে গণিত হবার দাবী রাখে। আর এই শিল্পধারারই সগোত্র পূর্ববঙ্গে প্রচলিত সরা চিত্রের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ সব সরার বাঁকান পিঠের ওপর আঁকা হত পরম যত্নে দুর্গা, লক্ষ্মী ইত্যাদি দেবীর মূর্তি। এখনও কলকাতার বাজারে পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ীদের তৈরী দুর্গা লক্ষ্মী সরার মধ্যে চিরাচরিত গ্রামশিল্পীর গভীর ও সুবিস্তারী শিল্পসংবোধের স্পর্শ অনুভব করা যায়। এই সরার ঠিক সগোত্র না হলেও কালীঘাটের পট গ্রামজীবন থেকে নাগরিক জীবনে উত্তরণের এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দলিল হিসেবে তার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছে বলা যায়।

অমরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বংশপরম্পরা :

দাসেক্স কাউন্টিতে এক ছোট শহর বাই। সেখানে নতুন মেয়র নির্বাচিত হল স্যার এ্যালেক ডিক্সার। সেই সূত্রে বর্তমান যুগেও একটি অতীতের প্রতিধ্বনির খবর পাওয়া গেল। ইতিহাস ও ব্রিটিশ কনষ্টিটিউশনের ছাত্র মাত্রেরই 'রটন্ বরো'-র বিষয় জানা। স্যার এ্যালেকের পিতা, পিতামহ, বৃদ্ধ পিতামহও পর্যায়ক্রমে ঐ শহরের মেয়র ছিলেন।

নিজের দেশে এমন দৃষ্টান্তের নজির পাই না। কৈশোরে গোরালন্দগামী ট্রেনে বিক্রমপুর যাচ্ছিলাম। চাকদহ স্টেশনে এক প্রবীণ ভদ্রলোক উঠে ট্রেনের একমাত্র অপর কিশোর যাত্রীটির সঙ্গে জমিয়ে বসলেন। আমার বিষয় সকল প্রশ্নের জবাব শেষ করে জানতে চাইলাম তাঁর পরিচয়। তিনি একটি কার্ড হাতে দিলেন—পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জমিদার এ্যাণ্ড চেয়ারম্যান চাকদহ মিউনিসিপালিটি।

গান্ধী আন্দোলনেরও আগে, অতএব সাতেপাঁচে। চোখ ঠেলে কপালে উঠলো। তিনি বললেন—বাইশ বছর চেয়ারম্যান।

তার বহু পর হিন্দুস্থান ইন্সিওরেন্সে কাজ করতে গেলাম। পদের অবল বদলও হল সময় মতো। চাকদহের চেয়ারম্যানকে ভুলতে পারিনি। পঞ্চানন বাবুর ছেলে স্নেহাস্পদ কমলের সংস্পর্শে এলাম, দ্বিরুক্তি না করে তাকে রাণাঘাট অফিসের ভার দিলাম। সেই সূত্রে সকল খবরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। পঞ্চানন বাবু আজীবন চেয়ারম্যান ছিলেন, তাঁর ভাই এবং ছেলেও কমিশনার হয়। কিন্তু চার পুরুষের নজির তো পাই না।

ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনীর ওপর কটাক্ষ ক'রে এখানকার কাগজগুলো বলতে কসুর করে নি, ভারতবর্ষটা নেহেরুর পারিবারিক কারবার।

সিদ্ধার্থ শঙ্করের পরিচয়টা বোধহয় ভুলে গেছে, নইলে কিছু একটা বলতো। যদিও উইনস্টন চার্চিলের পর তার নাতী চার্চিলের ঘটনাটা প্রায় সমসাময়িক। হ্যারল্ড ম্যাকমিলনের ছেলেই মন্ত্রিত্ব করতে এসে গেছেন—এক্ষেত্রে আর থাকটা ভাঙা পড়ে নি।

এখানে পারিবারিক কারবারের বহু দৃষ্টান্ত আছে কিন্তু সে সব ওদের চোখে পড়ে না অপরের ওপর কটাক্ষ করবার সময়।

দুই সতীনের মিল :

লেমিংটন মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার রেমণ্ড স্ট্যানলি। তার অবসর ও রোজগার, এক মাইল ব্যবধানের, দুটো বাড়ীতে ভাগাভাগি করতে গিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছে। এক বাড়ীতে থাকে নিজের বিয়ে করা বৌ ও চারটি সন্তান, অপরটিতে তার রক্ষিতা ও তার দুটি সন্তান। দু-আঙ্গনার টানাপোড়েনে নাজেহাল হয়ে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের কাছে একটা বড় বাড়ীর দরবী জানিয়েছে, যাতে বৌ এবং রক্ষিতাকে নিয়ে এক ঘরে সুখে বসবাস করতে পারে।

মিউনিসিপ্যালিটির হাউসিং ও হেল্থ কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ কুপস্ বলেন—বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হবে। নৈতিক চরিত্রের বিচারক আমরা নই।

রেমণ্ডের বৌ লিলিয়ান ৪৪, আর রক্ষিতা প্যাট ৩৩—দু-জনেই জানিয়েছে, এক বাড়ীতে তারা সুখে বসবাস করতে পারবে।

লণ্ডনের পশ্চিমাংশে একটা পুরানো বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে শুনলাম—এখানে এককালে রাজার রক্ষিতা বাস করত। রাজার ডাকনাম ছিল বার্টি। রাণী সে পথ দিয়ে যেতে আসতে পাছে ফিরিয়ে টুপি দিতে হয় সেটা আড়াল করে রাখতেন।

তাতে তো আর মনের উল্লাস চাকলোর লাঘব হ'ত না।

ইংরেজের ইংরাজী :

টেলিগ্রাফে একটা খবর দেখলাম

দক্ষিণ কেনসিংটনের একটা দোকানের জানিকায় লেখা :

"Barmaid needed five evenings a week. Must be thoroughly experienced or useless."

প্রায় বছর পোনের আগে, আমি সবে এসেছি। অতএব আগের চোখ দিয়েই ইংরেজদের দেখি। তখন লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলের হাউসিং ম্যানেজমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করি। সেখানে এক রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে চেনা হয়। সে বৃহত্তর লণ্ডনের অন্যতম মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার। তার সহকর্মীরা সব নিরক্ষ ধরণের, তাই আমার সামনে খুব রাজনৈতিক বক্তৃতা ছাড়ত। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে ভারতীয়, চীনা ও জাপানীদের ইংরেজী শব্দের ব্যুৎপত্তি ও উচ্চারণ নিয়ে টিপ্পনিও কাটত। তার একটা ছিল—Queen Victoria is a nice man.

সে চাকরি ছেড়ে যাই অবশ্য। ইংরেজদের ইংরেজী ভাষার ওপর উক্তধরণের কত ব্যুৎপত্তি দেখলাম, কিন্তু সেই লোকটার আর দেখা পাই না।

কুকে হাত দিয়ে কথা বলতে শিখলে টিটকারি দেবার স্পৃহাটা লোপ পায়।

লোংরা লোকে চান করে :

ঐ সময়ের আর একটা ঘটনা। ২৮ সালে এখানে খুব গরম পড়ে। এক রবিবার বার তিন চান করতে হয়, তবুও রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'ল না। পরদিন সকালে কাজে গিয়ে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলুম—উঃ, কাল কি গরম গেছে। আমি তো বার চারেক চান করেছি, তুমি ক'বার করলে?

বিজলা কাগজে তামাক পাকাতে পাকাতে অবাক হয়ে চাইল আমার পানে, বললে—চান! চান করতে হবে কেন?

—অত যে গরম, ঘামেই তো চান হ'ল। সেটা ধুয়ে শরীরটা ঠাণ্ডা করতে হয় না!

আমার কথা যেন তার কানেই গেল না। আগে অবাক করে জবাব দিলে—নোংরা লোকে চান করে।

আর কি বলতে পারি তাকে! বুঝলাম, যুদ্ধের আগে তৈরি বাড়ীগুলোতে কেন বাথরুম হ'ত না। কেন গায়ের যত ময়লা ঢাকা থাকত কর্সা চামড়ার তলায়। তাইই জলুসে লাগত চোখে ধাঁধা, তাইই চোটে ভূত হয়ে ছিলাম দু-চারশো বছর।

আজও তো সবাই কর্সা রং দেখে মনে করে—ওঃ, না জানি কত গুণি জ্ঞানী।

Say it again :

ঐ লোকটির আর একটা কথা না ব'লে পারছি না। তার নাম রিচার্ড, ঐ নামের অপভ্রংশ হয় ডিক। এককালে সে ছিল রাজমিস্ত্রী, তখন সে সুপারভাইজার। আমাদের দেশে যে ধরণের কাজ পায় পাশ করা ওভারসীয়ার। এখানে অত লাগে না, কাজ চালাতে পারলেই বড় কাজ পাওয়া যায়। তারও ওপরওলা জন, সংক্ষেপে জ্যাক। সে ছিল ছুঁতোর। কিন্তু তখন ছিল কনট্রাক্ট ম্যানেজার। আমাদের দেশে অমন কাজ পায় পাশ করা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।

একটু ভেঙ্গে বলতে হয়। রাজমিস্ত্রী ও ছুতোর প্রভৃতি সকলকে এখানে চার বছর শিক্ষানবিশী থাকতে হয়, ইস্কুলেও যেতে হয়। পাশ বা ফেলে যায় আসে না

তাতে নকুল দেখে ঘরবাড়ী তৈরির প্রথা রপ্ত হয়। তাই কিছু বুদ্ধি ও নেতৃত্ব থাকলেই ওপরে উঠতে পারে ব্রিটেনের সর্বত্র। হলাতে কিন্তু সেটি হবে না, সেখানে তার জন্য পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে। কুলিগিরি ছাড়া সব কাজেই সার্টিফিকেট নিতে হবে।

আমি ডিকের অফিসের কাজ করে দিতাম, আসলে আমার বস ছিল অন্য লোক। ডিকের সঙ্গে প্রায়ই আমার খটাখটি লাগত। ওকে পরোয়া করতুম না বড় একটা। জ্যাক ছিল আমার বন্ধু, ডিক হিংসেয় জ্বলত। শেষে আমরা ঠিক করি—আর কার্যক্ষেত্রে নয়, বাইরে আমরা বেলাবেলা করব। পরস্পরের বাড়ীতেও যাব।

জ্যাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবার মূলে একটা কাহিনী ছিল। তখন তার মা মারা যায়। তার মনে উদয় হয় পারলৌকিক তত্ত্ব জানার বাসনা। তাই আমার কাছে যত প্রশ্নের অবতারণা। যত শুনতো, তত কথা বলত। আমার সব খবর নিত। পরে দেখে তারিফ করত। ডিক তার কিছুই বুঝত না। এক দিন দেও গান নিয়ে পড়ল, তারপর তা নিয়ে গিয়ে তার ইসকুলে পড়া মেয়েকে দিয়েও পড়ালো। তার বৌ ও মেয়েও অফিস এলে আমার সঙ্গে খুব কথা বলতে চায়। ডিকের হাড় গরম হয়।

একদিন আমার কাজের সামনে এসে অযথা বেফাঁস কথা ব'লে ফেলে।

আমি ক্ষেপে উঠে বললাম—আমার কাজে তোমার অত উঁকি মেরে দেখার কি আছে? A man who has respect for himself has respect for others.

—Say it again

বললাম কয়েকবার। কান খাড়া করে শুনলো, যেমন বুঝল তেমনই জবাব দিল—I should have respect for myself! Why should I? I am not a respectable man.

হে ভগবান! কার সঙ্গে এতদিন তর্ক করেছি?

কর্তব্য নিষ্ঠা

৫-ই জুন সকালে লণ্ডনের পশ্চিমাংশে প্রিন্সেস বিয়াট্রিস হাসপাতালে আগুন লাগে। তাতে নবজাত শিশু ও প্রসূতিরা বিপন্ন হয়। ডিউটি শেষ হবার পর দু-জন পুলিশ—রবার্ট টেইলর ও জন স্টোনবারা তখন পাশেই একটা কাফেতে জল যোগ করছিল। সে সব ফেলে তারা ছুটে গেল শিশু মহলে, ঘন নিরোধক ধোঁয়া আর আগুনের হলকার মধ্য দিয়ে।

ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী এক পর্যটক, রবার্ট অ্যারন অবাক হয়ে দেখছিল তাদের কাণ্ড। সে বলে—অদ্ভুত দৃশ্য! লোক দুটি অগ্নিশিখার পিছনে অদৃশ্য হচ্ছে বার বার, আবার ফিরে আসছে বাচ্চাদের কোলে করে। এ যেন নাটক-সিনেমার ব্যাপার, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

প্রথমে সতেরোটি শিশু তারপর কুড়িটি প্রসূতি নিরাপদে স্থানান্তরিত করল তারা দুজন। উপস্থিত সকলের স্তুতি বর্ষণের জবাবে তারা বলে—এটা কিছুই নয়। যা করেছি তা আমাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত। পুলিসের পক্ষে যখনো অফ-ডিউটি নেই।

"যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেন সংস্থিতা।"

যারা মন্ত্র না জেনেও তার মর্ম বোঝে তারা ওপরে ওঠে, সুখে থাকে। যারা মন্ত্র জেনেও মর্মার্থ মনে রাখে না তারা তলিয়ে যায়। দুঃখ পায়, ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য রেখে যায় অন্ধকার দুঃখময় জীবন।

দুজনই ঠিক:

আজুনা কিছুদিন ধরে পরপর কয়েক প্রতিষ্ঠানে কেজন বুদ্ধিপ্রসূত আন্দোলনে, ধর্মঘটে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার বহু ওলট পালট হয়ে চলেছে। পোস্ট অফিস, ইলেকট্রিসিটি, মিউনিসিপ্যালিটি, ডাক্তার, শিক্ষক, কয়লা, মিল মিস্ত্রি, মোটর ও ডক প্রভৃতি কতই না বল, আরো হচ্ছে। তার ওপর ঝুলছিল—ব্রিটিশ রেল ও লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট (আণ্ডার গ্রাউণ্ড) এসব খবর সকলেরই জানা, তবে তাতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কতখানি অবনতি হয়েছে, এবং তার ফলে জনসাধারণ কোথায় এসে পড়েছে এবং আরো কতদূর যাবে সেই বিষয়ে বলতে পারে শুধু নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞেরা। তবুও ইতরজনে একবাক্যে বলবে—বড় বড় ইউনিয়নগুলো কর্তৃপক্ষের গলায় পাড়া দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করেছে

বটে, কিন্তু তার বাইরে রয়েছে অগণিত জনসাধারণ। তাদের অবস্থা বড় সঙ্গিন। সব জিনিসের দাম বাড়ছে, কমছে শুধু টাকার দাম। যা হয়েছে তা দূর থেকে কেউ বুঝবে না। যদি কেউ তা পারে, তা থেকে শেখবার অনেক কিছু পাওয়া যায়। ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারের লোকগুলো যেমন এখানকার ছাল, তারা সাবধান হয়। যে অনুপাতে এপারে লালবাতি জ্বলে ওপারে ততটা হতে পারে না। ওরা হাঁসটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, এরা তাকে কেটে ফেলতে চায়। শুধু চামড়া, কাটেও।

যে ভাবেই হোক ব্রিটিশ রেলের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারটা নিষ্পত্তি হয়েছে। হাতে টাকা নেই তাই দিতে চায় ১লা জুন থেকে, কর্মীরা চায় ১লা মে থেকে। এই নিয়ে আর এক দফা চললো। ভালমত চললে, ব্রিটিশ রেলের যে ক্ষতি হত তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষতি হত, প্রত্যেক কর্মীর ব্যক্তিগত ভাবে। এই এক মাসের কামাই-এর চাইতে তাদের পকেট থেকে অনেক বেশী যেত। তবুও জেদ বজায় রাখতে হবে নিশ্চয়

এই নিয়ে দুই জন ডেলি টেলিগ্রাফে দু'খানা বিরোধী ভাবের চিঠি ছাপা হয়। তার মর্মার্থ দেওয়া হল :

মিঃ ই. বে. অ্যাণ্ডার লিখছেন—

"এক কালে আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলে চালকের কাজ করতুম, এখন করি কর্ণওয়াল থেকে ব্রিটিশ রেলে। রেল কর্মচারীর বেতন সম্পর্কে সরকার যে যুক্তি অবতারণা করে তাতে আমি অভিভূত।

আরো শোন যে লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট তার কর্মচারীদের ব্রিটিশ রেলেরই অনুরূপ বেতন বৃদ্ধি করতে রাজী এবং সেটা দেওয়া হবে ১লা মে থেকে। ব্রিটিশ রেল তা দিতে চায় কিন্তু ১লা জুন থেকে। ব্যবটা মাত্র এইটুকুতে পৌঁছেছে এখন।

ব্রিটিশ রেলের ড্রাইভারদের অনেক ভারী মালগাড়ী নিয়ে অনেক বেগে গাড়ী চালাতে হয়, তারা এত নিপুণ যে লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের ড্রাইভাররা কিছুই নয় তাদের তুলনায়। সরকার ও রেল কর্তৃপক্ষ কি ক'রে আশা করে যে এমন উচ্চতর দক্ষ চালকরা অমন নিম্নতর লোকের চাইতেও কম পারদর্শী নিষ্পত্তি করবে—এটা আমার ও আমার মতো বহু সহযাত্রীদের বোধাতীত

লণ্ডন ট্রান্সপোর্টের ট্রেনগুলোও যেমন হালকা তেমন মন্থর গতি, তার ড্রাইভারদের শিক্ষা ও দক্ষতা উপেক্ষণীয় —আলোকার ট্রামে চালকের তুলনাতেও কম দক্ষতা লাগে।"

"ঠিকই তো।"

মিঃ ফ্র্যাঙ্ক উইমিল বলছেন—

"ইতরজনের দুর্ভোগ দেখে রেলওয়ে উইনিয়নের নেতা স্যার সিডনি গ্রীন বললেন—ব্যাপারটা জনসাধারণের চাইতে আমায় বেশী কষ্ট দিচ্ছে।

অমন উক্তিটা খুবিয়েডক ও মডারেট নেতারই উপযোগী। কিন্তু আমি তার শেষের যুক্তিটা বুঝলাম না। যেহেতু তার ইউনিয়ন মেম্বাররা তাকে সমর্থন করেছে তাই তিনি বলেন—এখন সরকারের কর্তব্য তাদের দাবীর অনুরোধ পূর্ণ করা।

যদি সরকার রেলওয়ে বোর্ডকে নির্দেশ দিত যারা পয়সা দিয়ে টিকিট কাটে সেই যাত্রীদের ব্যালট নিয়ে দেখ যে তারা এ ব্যাপারে বোর্ডের কার্যকলাপ অনুমোদন করে কি না। তখন স্যার সিডনি গ্রীন সরকারের কর্তব্য বিষয়ে একমত হতেন কি ?

ব্যালট-টা গৌণ নয়। আমার মতে মুখ্য বিষয় এই যে, আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হবে কার দ্বারা ? গণ নির্বাচিত সরকার না ক্ষমতাশালী ট্রেড-ইউনিয়নের পালামি ?

অগণিত নাগরিকের মতো আমিও এক অসহায়। আমার অবসর গ্রহণের দিনও কাছিয়ে এসেছে, তার জন্য যা কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছি সে সব ভেস্তে গেছে এমন ভাবে মুদ্রাস্ফীতি বা বেতন স্ফীতির ফলে এবং আমিও বিপদসঙ্কুল অবস্থার কাছাকাছি এসে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছি। এক্ষেত্রে যে সরকার এই বিপদ বন্যার সংরোধনে প্রযত্ন আমি তার সম্পূর্ণ সমর্থক।

আমি যানবাহনের অসুবিধা ভোগ করেও রেলকর্মীর এই ভয়াবহ দাবীর বিরোধিতা করে যাব।"

"খুবই ঠিক কথা।"

"ওরেল ওয়েল, দু-জনই ঠিক হয় কেমন করে ?"

এই নিয়ে লাগল আমার গৃহাভিমুখি ব্রিটিশ মেলের যাত্রীদের বাকযুদ্ধ। অবশ্য মজা দেখার জন্য আগুনটা আমিই ধরিয়ে দিয়েছিলাম দুখানা চিঠি পড়ে।

"আমাদের ট্রেন চালাতে যদি বেশী ক্ষমতা লাগে, তবে ম্যাণ্ডার ঠিকই বলেছেন।"

"কি রকম করে! দুটোই তো ইলেকট্রিক ট্রেন, গতি দরকার মতো বাড়ানো কমানো যায়।"

"আণ্ডার গ্রাউণ্ডের স্টেশন কাছাকাছি, সারফেস ট্রেনে তা বেশ দূরে, তারই ওপর স্পীড নির্ভর করে।"

"ড্রাইভাররা তো গায়ের জোরে ট্রেন টেনে নিয়ে যায় না।"

"হালকা গাড়ীর চালক হিসাবে দরী ড্রাইভারদের অনেক কম পাওয়া উচিৎ, কিন্তু তারা পায় অনেক বেশী।"

"ম্যাণ্ডারের যুক্তিগুলো অনবদ্য।"

"উইমীজই ঠিক বলেছে। আমাদের মাসটা বেড়ে যাক।

"আচ্ছা তর্ক থাক আমরা কোন দিকে চলেছি! এর শেষ কোথা ?"

"আওসিস্তাং।"

"হোঃ হোঃ হোঃ"!

"তার মানে ? ভেঙে বল না।"

সন্ধ্যের সংবাদপত্র সামনে তুলে ধরল এক যাত্রী।

"মাওয়ের মূলকে এবার হোমসেক্রেটারীর মাসিক বেতন ১৬ পাউণ্ড, পাইলটের বেতন ১৯ পাউণ্ড। তা সত্ত্বেও তাদের বেশ সস্তায় হয়।"

"কপ্! খায় কি রে বাবা !

"কেন! খুব সস্তা খাবার হচ্ছে বেত। সেটার অভ্যাস হ'য়ে সব ক'টা টাকাই উদ্বৃত্ত হয়।"

এটা ভারতীয় অভিব্যক্তি, ইংরেজদের বোধগম্য নয়। যখন বুঝল তখন আর একটা—হোঃ হোঃ হোঃ!

বেড়ালের বাড়ী (ক্যাট-হাউস)

(১) "মে মাসের গোড়ায় একজন খবরের কাগজে লিখল —ভিক্টোরিয়ান যুগে রাস্তা থেকে রূপোপজীবিনীদের যখন হটিয়ে দেওয়া হয় তখন রাস্তার ধারে নীচের তলায় ঘর ভাড়া করে, এবং জানালার পাশে পোর্সিলিনের বেড়াল রাস্তামুখো ক'রে আমন্ত্রণ জানায় এ বিষয়ে কেউ কি কিছু বলতে পারে ? লেখক মিঃ এলডার্ড)

(২) "তার জবাবে মেরি ফেনেল লেখেন—কোপেন হেগেনের এক অংশের নাম নিবোদার। সেখানে এক সারি ঘরের বাড়ী আছে। ডেনমার্কের রাজা চতুর্থ ফ্রীডিয়ান সেগুলো তৈরি করান তাঁর নাবিক পরিবারের জন্য।

শুনেছি যে নাবিকরা সমুদ্রযাত্রা শুরু করবার পর তাদের বৌ রা ঘর নির্জন বোধ করত। অতএব তারাও অমনি ভাবে জানলার সামনে বেড়াল রেখে—স্বাগতম জানাতো।

বেড়ালের মুখটা যখন পথের দিকে তখন বুঝতে হবে ঘরে মরদ নেই। আর বেড়ালের মুখটা যখন ভেতরমুখো তখন বুঝতে হবে—কর্তা ঘরে আছে, এখন হবে না।"

এই সূত্রে মনে পড়ল কালিদাসের একটি ছোট গল্পের শ্লোক : এক পান্থ সন্ধ্যায় গ্রামের প্রান্তে এসে এক বাড়ীতে রাত্রীটার জন্য আশ্রয় চায়। বাড়ীতে শুধু অল্প বয়সের একটি বৌ। সে খুব মিনতি করে পথিককে জানায়—আমার শাশুড়ী একমাসের জন্য পিত্রালয়ে গেছেন; স্বামীও বিদেশে কাজ করেন, এই যে পূর্ণ চন্দ্র—এখন কত রাত আর আসবে, তবুও তার শীঘ্র আসার কোন সম্ভাবনা নেই, আমি যুবতী একলা, তুমিও যুবক। কি করে তোমায় এখানে আশ্রয় দিতে পারি !

অর্থাৎ এক রাত কেন, একমাস থেকে যেতে পার। কোন অসুবিধে হবে না।

যা অনিবার্য তাকে মেনে নিন

। সুমন্ত্রী ।

নতুন এসেছি এই কলেজে। ক্লাশে পড়াচ্ছি। নোট দিচ্ছি। ছাত্রছাত্রীরা লিখছে কি না লক্ষ্য করতে গিয়ে চমকে উঠলুম। একটি মেয়ের ডান হাতের আঙুল মাত্র তিনটি। আমি দুইতে তার বাঁ হাত খুঁজছিলুম এবং আশ্চর্য্যে বিস্ময়! বাঁ হাতেও তিনটি আঙুল। সর্বসাকুল্যে মোট ছয়টি।

অথচ বিবি তরতর করে লিখে চলেছে মেয়েটি। যারা পাঁচটা আঙুল নিয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে চলেছে আর হাতের গতি। কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে মনেই হয় না।

ক্লাশ শেষে ডেকে নিলুম তাকে। হাতদুটো পাশীর আড়ালে লুকোবার কোন চেষ্টাই সে করলো না, যা করবে বলে আমিও ভনিতা না করে জিজ্ঞাসা করলুম,

—তোমার কি জন্ম থেকেই হাতটা অমন—

কথা শেষ না হতেই সপ্রতিভ হেসে বললে,

—হ্যাঁ, জন্ম থেকেই।

—কোন অসুবিধে হয় না?

—মাঃ। শুধু জল তুলবার সময় বা কিছু টানতে হলে একটু অসুবিধে হয়।

—এর জন্ত কোন ব্যবস্থা করো নি, মানে ভাক্তারী।

সলজ্জ হেসে বললো—না। এর আর কি করা যাবে।

ওর নিশ্চিন্ত ভাবটি সপ্রশ্ন বিস্ময়ে অনুভব করলুম। আমার মনে সম্পূর্ণ নতুন একটি চিন্তার জন্ম দিলো। এমন দুশ্চিন্তা মুক্ত ও হলো কি করে?

• •

—আমার নাম কাঞ্চনচন্দ্র সাউ।

সবাগত ছাত্রটির দিকে সপ্রশ্ন তাকালুম আমি।

—তোমার পা খোঁড়া কি জন্ম থেকেই?

—না। বাস একসিডেন্টে ভেঙে গেছে।

—অসুবিধে হয় না?

—হয়। কিন্তু কি করা যাবে!

—কেন? অপারেশন করালে তো ঠিক হয়ে যেত?

দুঃখিত মুখে বললো কাঞ্চন,

—অত টাকা পাবো কোথায় বাবা শিক্ষকতা করেন—

—তাহলে?

আমার দুশ্চিন্তায় যেন কৌতুকই বোধ করল সে। বললে,

কি করা যাবে! এটা তো মেনে নিতেই হবে।

•

আর একদিন আর এক ছাত্র অশ্বিনী যে তার ভাই-এর সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্ত আমার কাছে এলো। সবিস্ময়ে দেখলুম, তার ভাই এর দুটো পায়েরই পাতা দুমড়ানো। উল্টো করে সে পা ফেলে। খুঁড়িয়ে হাটে।

—আমার জন্ম থেকেই এরকম।

জিজ্ঞাসা করতে সে জানালো,

—এভাবেই সব করতে পারি, এমন কি মাঠে লাঙল চালানো পর্যন্ত!

—আমাদের ভাইদের মধ্যে ওই সবচেয়ে ভালো লাঙল চালায়, আমরা মোটে পারি না। এমন কি ও যা দৌড়ায় না—

আমি নির্বাক। বলে কি

বাস্তবিক, আমি ভাবতেই পারি না, আমার যদি অমন হতো তাহলে এমন নিশ্চিন্ত হতে পারতুম কি না!

কল্পনায় শিউরে উঠি, আমার একটি পা নেই, বা অক্ষম, বগলে ক্রাচ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, পদে পদে অসুবিধে— অসম্ভব! এভাবে পথচলা যায় কি! অবজ্ঞা, বিরক্তি, অসহায়তা আমাকে তাহলে একেবারেই পঙ্গু করে ফেলত।

না। ছুপাতে চলেও যখন জীবন যাত্রার পথে ঠিক মতো চলতে পারিনা, তখন অ-পঙ্গু হয়ে চলা যে দুঃসাধ্য তা কল্পনাতেও সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি না।

তাহলে! ওরা এভাবে নিরুদ্বিগ্ন, নিশ্চিন্ত হলো কি করে?

দুশ্চিন্তামুক্ত হবার কোন সহজ মন্ত্রে ওরা দীক্ষিত?

ভাবছিলুম। উত্তর খুঁজছিলুম।

কিন্তু উত্তরটা যে বহুদিন থেকে আমার কাছেই নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছে আগে বুঝিনি।

বুঝলাম সেই মুহূর্তে যখন মনে পড়ল আজ একমাস পার হয়ে গেল আমি এই নতুন জায়গায় এসেছি একমাস!

আমি যেন ক্ষণকালের জন্য এক তীব্র অস্বস্তিময় অনুভূতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠলুম। আমি কি করে এতদিন আছি! আর কতকাল এখানে থাকতে হবে।

দীর্ঘ দশবছর ছিলুম একজায়গায়। সেখানকার পরিবেশ সেখানকার মানুষ, আশপাশের প্রকৃতি এবং প্রতিবেশী সকলের সঙ্গেই এক গভীর হৃদ্যতার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলুম। আমি যে সরকারী কাজের জন্য এখানে আছি, সেকথা প্রতিদিনের নানাকাজের ভীড়ে কখনোই মনে পড়ত না। উৎসব—অনুষ্ঠান, নানা স্তরে বেসরকারী মানুষদের সহজ সহযোগিতা সাহচর্য পেয়ে স্থায়ী বিশ্বাস জন্মেছিল এইখানেই আমার ঘরবাড়ী—আমি যেন আজন্ম কাল থেকেই এখানেই বাস করছি।

তারপর হঠাৎ একদিন আচমকা, নীলাকাশ থেকে বজ্রপাতের সেই পুরাতন উপমাকে মনে করিয়ে দিয়ে এল ট্রান্সফার অর্ডার। অনিবার্য। কিন্তু বিষয়টি এত হতচকিত করে দিলো আমাকে এবং সেখানকার প্রায় সবাইকেই যে প্রথমত তা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য বলেই মনে হলো। এমন কি যে রিলিজ দিনে যাবার জন্য পা বাড়াতেই হলো সেদিনও মনে হলো আমি যাচ্ছি না। এবেলা স্নেহ বেড়াতে যাওয়া, আবার ফিরে আসব।

আর যখনই হয়েছি এমন একটি জায়গায়, কলকাতা থেকে যার দূরত্ব যেন দীর্ঘ! এবং পরিবেশও সেখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অপরিচিত মুখের মেলা, বিদ্যুতের আলো স্পর্শ করেনি চারপাশের অন্তত দুতিন মাইল এলাকাকে, খবরের কাগজ পৌঁছয় বিকেলে, ঘরে ঘরে রাজে না রেডিও, সিনেমা হলের দূরত্বও অন্তত ছয়মাইল, পঠন-পাঠনের বিষয় ছাড়া। অন্য বিষয়ে কথাবলবার লোক খুঁজে বের করতে হবে যথেষ্ট অনুসন্ধান চালিয়ে।

হায়! এ কোথায় এলাম। প্রথম পদার্পণ করে মনে হয়েছিল এই মুহূর্তেই আমাকে ফিরে যেতে হবে! এক মুহূর্তও আমি এখানে থাকতে পারবো না প্রতি পদক্ষেপে আমার ফেলে আসা জায়গাটি টানছিল।

ফিরতে পারলাম কই? সরকারী নিয়মে সেদিন ফিরতে তো পারলামই না, পরপর ছয়দিনও নয়। শনিবার ক্লাশের কাজ শেষ হওয়া মাত্র রওনা হলেম আবার পুরানো কর্মস্থানের দিকে! এবং ফিরে গিয়ে মনে হলো আমি এখান থেকে চলে যাই নি, এবং আর কোনদিন ফিরতে হবে না আমাকে নতুন কর্মস্থলে।

না। সে'ও সম্ভব হলো না। একদিন যাবেই আবার ফিরতে হলো। আবার সেই অন্ধকার পরিমণ্ডল, আবার বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অরণ্যময় পরিবেশ, আবার সেই নতুন মুখের সারিবদ্ধ ছবি! আবার ছয়দিন।

ছয়দিনও কাটলো। টাকা মিতে হয়, ফিরে আসি ঘরে, পারতপক্ষে কারো সঙ্গে কথা বলি না, নতুন মায়ার আর জড়াতে চাইনা।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন অধ্যক্ষ অনুরোধ জানালেন সবিনয়ে।

—আপনি যদি এবার স্বাধীনতার রজত-জয়ন্তী উৎসব পালনের জন্য একটা প্রোগ্রাম করেন তবে খুব ভালো হয়!

—আমি!

আমি যথেষ্ট বিস্মিত হবার ভান করলাম।

—আমি এসব কিছুই জানি না, পারি না।

অধ্যক্ষ হাসলেন। বেশ প্রত্যয়ের হাসি। যেন আমি এড়াতে চাইছি এটা তিনি ধরে ফেলেছেন। বললেন,

—আমি জানি, আপনি কি জানেন আর জানেন না।

আমি রিকোয়েষ্ট করছি।

রিকোয়েষ্ট! রাখব না ভেবেছিলুম। কিন্তু সরকারী

কাজ বলে নয়, আমার মনের ভেতর যে কমাট শূন্যতা ছিল তার থেকে মুক্ত হবার জন্য, অন্ততঃ অল্প সময়ের মুক্তিলাভ করবার জন্যই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেলুম।

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটা পরিকল্পনা রচনা করা গেল। দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠান, ভারতবর্ষের রূপসজ্জা তুলে ধরবার জন্য রূপসজ্জা মূলক অনুষ্ঠান, বাংলার আসর সম্পদের বাস্তবরূপ দেবার জন্য আঞ্চলিক গানের আসর, স্বদেশী যাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে ক্রমে জড়িয়ে পড়তে হলো। এবং প্রায় দিবারাত্র যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হলো।

যাত্রার রিহার্সাল দেখে ফিরছি, একদল ছাত্র ঘিরে দাঁড়ালো। না, ঘেরাও নয়। সহাস্য মুখে অনুরুদ্ধ জিজ্ঞাসা।

—স্যর! আপনি প্রতিসপ্তাহে এখানে থাকেন না কেন?

কি বলব। সাধ্যমতো উত্তর দিলুম।

—আমাদের এখানে আপনার ভালো লাগছে না। তাই না?

—প্রথম প্রথম লাগছিল না।

স্বীকার করলাম অকুণ্ঠ ভাষায়।

—তবে এখন—

—এখন ভালো লাগছে

আমি চমকে উঠলাম উত্তর দিতে গিয়ে। কি করে বলি, ভালো লাগছে। তাহলে। এখানে আসার মুহূর্ত থেকে যে ভালো না লাগা কাজ করছিল তা কি হারিয়ে গেছে ভালোলাগার ভীড়ে? এই যে সারাদিন মেতে আছি এদের নিয়ে, এদের সংস্রাব সবই কি আমার উদ্বেগ দুশ্চিন্তাকে ঘুরে সরিয়ে দিয়েছে!

সেই দুশ্চিন্তার কি সবটাই আজ তিরোহিত! তাও তো নয়! তবে—

আমি দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বললাম,

—মানে কি!

—আপনি না এলে আমাদের অবস্থা কি যে হতো বলতে পারি না।

ছেলেদের একজন বললে

—এত ফাংশান হতোই না।

মুখোমুখি প্রশংসাতে লজ্জিত ও বিব্রত হলাম তাছাড়া অংশত কথাটা অসত্যও বটে। বললাম,

—ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তা নয়।

—তাহলে?

—আসলে তোমাদের নিয়ে একটা কিছু করানোতে আমারই লাভ হয়েছে বেশী!

—আপনার লাভ হয়েছে কেন?

—এখানে এসে খারাপ লাগছিল খুবই। সময় কাটছিল না। অথচ সময় কাটাতে তো হবে। সেটা যাতে ভালো ভাবে কাটে সেই চেষ্টাই করছি আর কি।

বলতে বলতে আমি নিজেই সম্পূর্ণ অন্য এক অনুভূতিতে তখন তলিয়ে গেছি। আমার তখন সেই ছাত্রীটির হাত মনে পড়ছে যার মোট দুটি আঙুল, সেই ছাত্রটির পা যা ভেঙে গেছে বাস অ্যাকসিডেন্টে, সেই ছাত্রের ভাই-এর কর্মতৎপরতা যা বিকৃত পায়েও অসম্ভব নয়!

আর চকিতে মনে পড়ল একটা গল্প।

সারা বার্নহার্ড নামে সেই প্রখ্যাতা অভিনেত্রীর গল্প। গল্প নয় সত্য ঘটনা। একসময় তিনি ছিলেন বোধহয় সারা পৃথিবীর মধ্যেই সবচেয়ে কর্মব্যস্ত অভিনেত্রী। প্রায় শেষ জীবনে তিনি এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পান। ডাক্তার পরামর্শ দেন সেই পা'টি কেটে ফেলতে। একজন অভিনেত্রীর কাছে বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। তৎসত্ত্বেও সারা আশ্চর্য নির্লিপ্ততার সঙ্গে অপারেশন করতে রাজী হয়ে গেলেন। অপারেশন করার আগে যখন তাঁর ছেলে কাঁদছিল, তিনি তখন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, চিন্তিত হয়োনা। আমি এখুনি ঠিক হয়ে ফিরে আসছি। এমনকি ও. টি তে যাবার সময় তাঁর অভিনয় জীবনের একটা দৃশ্যও আবৃত্তি করে শোনালেন। একজন জিজ্ঞাসা করলেন, এসব কি আপনি নিজের মনকে ভোলাবার জন্য করলেন? তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন,

—না। ডাক্তার ও নার্সদের আনন্দ দানের জন্য করছি। তাদের তো যথেষ্ট পরিশ্রম হবে।

সেই আশ্চর্য নির্লিপ্তি সেই মেনে নেওয়া। অনিবার্যতার মুখোমুখি হয়ে তাকে গ্রহণ করা।

মনে পড়ল আর একটি ছড়া,

প্রতিটি সমস্যার আছে দুইটি বিষয়
একটি কিছুই নেই। অপরটি সমাধান!
সমাধানের পথ যদি থাকে তাতে চলো,
না থাকলে মনকে মেনে নিতে বলো।

হ্যাঁ! যা অনিবার্য তাকে মেনে নিতেই হবে তাতেই শান্তি।

সেই শান্তি পেয়েছিলেন মহান দার্শনিক সক্রেটিস। বিষপান তাকে করতে হবে—এ অনিবার্য জেনে শান্ত কণ্ঠে বিষের পাত্র তিনি পূর্ণ করেছিলেন। অনিবার্যকে এড়ানো যাবে জেনেই যীশুখৃষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হবার মুহূর্তেও অবিচল কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন,

—ওরা জানে না ওরা কি করছে, ওদের ক্ষমা করো।

এই অনিবার্যতাকে মেনে নিতেই হয় কিন্তু তাকে স্বীকার করে কিভাবে সেই মুহূর্তগুলিকে আরো সুন্দর আনন্দময় করে তোলা যায় তার চেষ্টাই ফুটে ওঠে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

—মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান!

এত কথা বলা গেল না ছাত্রদের। শুধু বললুম,

—থাকতে যখন হবেই তখন কি ভাবে ভালো করে থাকা যায় তার চেষ্টা করতে হবে তো!

—স্যার। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

আচমকা বাধা দিলো একজন ছাত্র। যদন গোপাল দে!

—একটা কেন অনেকগুলো করনা।

—স্যার! আমার একটু বাড়ী যাওয়া দরকার। বাড়ীতে মুক্তিমা পথ চেয়ে থাকবে। অথচ প্রিন্সিপাল ছাড়ছেন না। আবাসিক কলেজ তো। না বলে যেতেও পারছিনা! কি হবে?

কি হবে?

একমুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললুম,

—যা হবার তা হবে। ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই করেন মান তো?

—হ্যাঁ মানি।

তৎক্ষণাৎ মাড় নাড়ল মদনমোহন। বুঝলাম স্বীকৃতিটা ভাল নয়।

—তাহলে তো ঠিকই আছে। থাকতে যখন হবেই এখন তাকে মেনে নাও। একটা দিন অপেক্ষা কর। কেমন?

—ঠিক আছে।

খুব যে আনন্দের সঙ্গে বলল তা নয়, তবে মেনে যে নিলে তা বোঝা গেল।

সেকি আমার কথায়! না ঈশ্বর বিশ্বাসের উদাহরণ হিসেবে। আমি জানি না। শুধু জানি, অনিবার্যকে ওভাবে গ্রহণ করতেই সুখ! যা ঘটে গেছে তাকে মেনে নেওয়াতেই দুশ্চিন্তার মুক্তি! তাতে যদি পথ চলার অসুবিধেও হয়—তবুও সেই অসুবিধে কখনোই চলার গতিকে চিরকালের জন্য রুদ্ধ করতে পারবে না। আমার চারপাশে এমন উদাহরণ কি কম আছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

দুটি ছাত্র সায়েন্স কলেজে প্রাকটিকাল পরীক্ষা দিতে গেছে।

পরীক্ষা শেষ হলে তারা দুটি ফেরার সময় দেখল দোতলার একটা ঘরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একাকী একটা তক্তাপোষের উপর শুয়ে আছেন।

দেখতেই যখন পেলাম তখন একবার প্রণাম করে যাব না?

ছাত্র দুটি ধীরে ধীরে তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের উপর হাত রেখে প্রণাম করল।

উঠে বসলেন।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ছাত্রদের প্রশ্ন করে জানলেন, তারা পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফিরছে

অনাথ উপাধ্যায়

বললেন, সেই সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা দিয়েছিস এখন অবধি। দুপুরে কী খেয়েছিস?

একটি ছাত্র আমতা আমতা করে বললে আজ্ঞে স্যার! এইবার বাড়ি গিয়ে খেয়ে নেব।

মাথা নেড়ে আচার্যদেব বললেন—বুঝেছি। তাই তোদের মুখ এমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে।

তক্তাপোষ থেকে উঠলেন। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসার পরিচয় জানালেন তাদের বুকে একটি করে ঘুসি মেরে। বললেন—খাওয়া দাওয়াটা সময়মত করতে হবে! পেটে খিদে রাখলে চলবে না। চল কাটলেট কচুরি সিঙ্গাড়া নয়, লুচি, ঘুগনি সহযোগে ভাল জলখাবার। আয় আমার সঙ্গে।

এই বলে তাদের টেনে নিয়ে গেলেন তাঁর শোবার ঘরে।

নিজের হাতে একটি প্রকাণ্ড টিন নামালেন, তাতে ভর্তি ছিল মুক্তির মোয়া।

ছোট একটা আলমারি থেকে বেরুলো এক রেকাবি সন্দেশ—কেউ বোধ হয় তাঁকে দিয়ে গিয়েছিল।

দুটো প্লেটে ছাত্র দুটিকে কয়েকটা মোয়া আর সন্দেশ দিয়ে বললেন—নাও। খেয়ে নাও।

কী বিপুল স্নেহ তাঁর আচরণে আর কথায়! ঠিক যেন পিতা স্নেহ করছেন তাঁর পুত্রদের।

ছাত্রদের মধ্যে একজন ছিলেন পরবর্তী জীবনে অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র সেন। তিনি সেই ঘটনাটা যখনই বলতেন তখনই তাঁর দুচোখ জলে ভরে উঠত।

উপাধি ছিল অনেক লম্বা—সার পি, সি, রায়, এম. এ., পি. আর. এস., পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি., সি. আই. ই., কে. টি।

কিন্তু মানুষটিকে দেখলে কি বোঝা যেতো যে তিনি এত খেতাব পেয়েছেন?

আধ ময়লা, খাটো ধুতি, জুতোর অবস্থাও তেমনি। আজকাল যেরকম পোষাক পরে কোন ভৃত্য বা পিওনও রাস্তায় বেরুবে না।

রমেশবাবু আর আর একটা ঘটনা বলেছেন—"একদিন মনে আছে, একটা খাটো ধুতি পরেছেন এক দিকটা হাঁটুর উপর উঠে গেছে, কাছাটা ঠিকমত গোঁজা হয়নি, শার্টের উপর একটা ধুলিধূসর কালো কোট। আমি ল্যাবোরেটারিতে কাজ করছিলাম। ডেকে বললেন, ওরে কে আছিস ওখানে। যা তো অমুক নম্বরে একটা ফোন করে দিয়ে আয়! বলবি, আজ আমি ওদের মিটিং-এ

যেতে পারবো না, আমায় এখুনি বাঙ্গালোর যেতে হচ্ছে। সেখানে গভর্নিং বডির একটা জরুরী সভা আছে।

এই ভাবেএই বেশে বাঙ্গালোর? গভর্নিং বডির মিটিং-এ যোগদান? অবাক হয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে। চললেন বাঙ্গালোর।"

পোষাক-আসাকের প্রতি কোনদিন কোন ভ্রুক্ষেপ ছিল না তাঁর।

একবার এক মস্ত সাহেব-রাজপুরুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বললেন—দয়া করে যদি অমুক হোটেলে বিকেল ঠিক পাঁচটায় আসেন, আমি সেই সময় ঠিক পৌঁছে আপনাকে উঠিয়ে আমার ঘরে নিয়ে যাব। আমি লাট-সাহেবের সঙ্গে কথা বলে ঠিক পাঁচটায় হোটেলে ফিরবো।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও সেই সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কিছু গরজ ছিল। বস্ত্রাপীড়িত উত্তরবঙ্গের কথা তাঁকে জানাবেন, জানাবেন তাঁর সংকট-ত্রাণ সমিতির কর্মোদ্যমের বিবরণ আর সেই সঙ্গে গভর্নমেণ্টের সহযোগিতার জন্য অনুরোধ করবেন।

গেলেন প্রফুল্লচন্দ্র। সেই বড় হোটেলের প্রবেশ পথের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

তখনো পাঁচটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

দরজার সামনে তকমাধারী প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া দ্বারপালক।

তিনি দরজার সামনে ঘোরাঘুরি করছেন দেখে দ্বারবান বললে, এই, তোম কিসকো মাংতা?

সম্বোধন শুনে আচার্যদেব এক মুহূর্ত চমকে উঠলেন, তার পরেই তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বললেন, জমাদার সাহেব, একজন আসবেন এখুনি। তাঁর জন্যে···

—উহ্ তো সামঝা। লেকেন তোমরা বাবু কিধর যায়! তোমকো তো ভিতর যানে নাহি দেগা! তোমরা বাহুকো আনে দো।

মাথা নেড়ে আচার্যদেব বললেন, আমি ভিতরমে নেহি যায়গা, দারওয়ানজী। হাম এইখানেই অপেক্ষা করব।

ভাল হিন্দী বলতে পারতেন না। তাঁর হিন্দী শুনে ছাত্ররা হাসতো!

দারওয়ান বললে, হাঁ্যা, ইধর যাও। সামনেসে খাড়া যাও রহো। আবি সব সাহাব লোগ আয়েগা।

প্রফুল্লচন্দ্র একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

পাঁচটা বাজলো।

সাহেবের তো দেখা নেই।

ইংরাজদের নিয়মানুবর্তিতার উপর প্রফুল্লচন্দ্রের অগাধ আস্থা ছিল।

মিনিট তিনেক পরে।

প্রকাণ্ড এক ডায়মলার মোটর এসে দাঁড়ালো হোটেলের দরজায়।

মোটরের সামনের সীটে বসেছিল আরদালি। সে নেমে মোটরের দরজা খুলে দিলে। সাহেব নামলেন।

হাঁ্যা। সাহেব বটে! তেমনি লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি পোষাক। আর তেমনি ব্যক্তিত্ব।

হোটেলের দারওয়ান লম্বা সেলাম জানালো।

সাহেব এদিক ওদিক দেখছেন।

ওই যে স্যার পি. সি দাঁড়িয়ে। ছুটে গেলেন তাঁর কাছে। দুই হাত বাড়িয়ে তাঁর দু হাত ধরে ক্ষমা ভিক্ষার সুরে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার পি. সি.। দেরী হোয়ে গেল! কিন্তু আমার দোষ নেই। পথে একটা প্রকাণ্ড জ্যাম···

আচার্যদেব হাসতে হাসতে বললেন, দেরী হয় নি। পরীক্ষায় দু'চার নম্বর গ্রেস দেবার মত, সময়ের বেলাতেও দু'চার মিনিট গ্রেস দিতে হয়।

এদিকে হোটেলের দারওয়ানের দু'চোখ তখন কপালে উঠেছে!

কী দাংঘাতিক ব্যাপার!

যে-সাহেবের সামনে কেউ যেতে পারে না সহজে, সেই সাহেব এই ময়লা কাপড় পরা লোকটাকে যেন গুরুর মতো খাতির করছেন! লোকটা যদি বলে দেয় সাহেবকে তাহলে তো তার চাকরি গেল!

হাত বাড়িয়ে আচার্যদেবকে পথ দেখাতে দেখাতে সাহেব তাঁকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

দারওয়ান এবার আচার্যদেবকে লক্ষ্য করে দুবার সেলাম জানালো।

একটি ছাত্র তাঁর বড় প্রিয় ছিল। মেধাবী ছেলে। কিন্তু বড় গরীব। একটা অতি দরিদ্র মেসে একটি ঘর নিয়ে থাকে।

একদিন খবর পেলেন ছাত্রটি অসুখ হয়ে পড়েছে। সারাদিন তাঁর মনটা উতলা হোয়ে রইল সেই ছাত্রটির জন্যে।

সন্ধ্যার পর আর থাকতে পারলেন না। গেলেন ছাত্রটিকে দেখতে।

ওরে বেহঁস, ছাত্রটির অসুখ বেশ বাড়াবাড়ি!

মেসের মালিককে বললেন, ডাক্তার এসেছিল?

মালিক আমতা আমতা করে বললে—আজ্ঞে···

বললেন, বুঝেছি! এখনি এ পাড়ার সবচেয়ে ভাল ডাক্তার যিনি আছেন তাঁকে ডেকে নিয়ে এসো!

মালিক ডাক্তার আনতে গেলো।

আচার্যদেব ছাত্রটির মাথায় গিয়ে বসলেন। কপালে হাত রাখলেন।

ইস! কপালটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মেসের একজনের কাছ থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া সংগ্রহ করে ছেলেটির কপালে জলপটি লাগিয়ে দিলেন।

একটু পরে ডাক্তার এলেন।

তিনি চিনতে পারলেন আচার্যদেবকে। প্রণাম করে অবাক হোয়ে বললেন, স্যর আপনি···

—হ্যাঁ গো! আমি! ভূত প্রেত নই! কিন্তু কোন কথা নয়। ছেলেটাকে ভাল করে পরীক্ষা কর!

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন।

বললেন, ভয় নেই! কোন উপসর্গ নেই। তবে জ্বরটা বেশী। আমি একটা পুরিয়া আর একটা মিক্সচার লিখে দিচ্ছি। একটা পুরিয়া এখনি দিতে হবে। আর মিক্সচারটা আজ রাত্রের মধ্যেই দু'ঘণ্টা অন্তর তিনবার খাওয়াতে হবে। তাহলেই আমার বিশ্বাস জ্বরটা কাল সকালের মধ্যেই কমে যাবে। কিন্তু একটা কথা!

—কী কথা বল!

ডাক্তার বললেন, আজ রাতটা কাউকে এর পাশে থাকতে হবে। রাত্রে প্রস্রাব করতে উঠলে, একে ধরতে হবে। নইলে হয়ত মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারে!

কিন্তু কে সারারাত জেগে রোগীকে পাহারা দেবে? আচার্যদেব বললেন—আমি থাকবো!

ডাক্তার স্যার মালিক—দু'জনেই অবাক! আপনি থাকবেন? কিন্তু শোবেন কোথায়?

—কেন! মাটিতে! ছেলেটার তক্তাপোষের কাছে! একটা মাদুর দিও শুধু। বালিশ নাহলেও চলবে!

—স্যার! আপনি নয়। আমরা অন্য কাউকে বলছি। ব্যবস্থা করছি!

—না, না। অন্য কেউ নয়। আমিই থাকবো।

সেই রাত্রে, সেই ভাঙা-দেওয়াল ঘরের চিড়-খাওয়া মেঝের একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করলেন—আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম. এ., সি. আর. এস. ইত্যাদি ইত্যাদি!

ঠিকমতো ওষুধ খাওয়ালেন। কপালে জলপটি দিতে লাগলেন।

ভোর বেলাই ডাক্তার আবার এলেন! পরীক্ষা করে বললেন, আশ্চর্য! ওষুধটা খুব ধরেছে! জ্বর প্রায় নর্মাল! পালস রেগুলার। স্বাভাবিক ভাবেই ঘুমোচ্ছে।

আচার্যদেব বললেন—থ্যাঙ্ক ইউ ডাক্তার। তোমার ওষুধের গুণ আছে।

এবার ডাক্তার আর থাকতে পারলেন না, তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করে বললেন—আমার ওষুধ নয় স্যার! ওষুধে যে দেবতা ছিলেন সারারাত। মরা মানুষ থাকলেও যে বেঁচে উঠতো।

এমনি ছাত্রবৎসল ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। এমনি মানবদরদী।

১৯২৬ সালে উত্তরবঙ্গে বন্যার সময় দেখেছি তাঁর ব্যাকুল সেবাপরায়ণ মূর্তি! অহোরাত্র দুর্গতদের জন্য টাকা সংগ্রহ করতে ঘুরেছেন।

উত্তর কলকাতায় হেমন্তকুমার বসু, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার, রাজেন্দ্র চন্দ্র দেব প্রমুখ জ্যেষ্ঠদের পুরো ভাগে রেখে আমরা গান গেয়ে পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষা করে বেড়িয়েছি—

উত্তর বঙ্গে এসেছে প্লাবন নদীগ্রাম সব একাকার!
চারিদিকে শোন উঠিয়াছে আজ প্রাণ যায় হাহাকার!
ভাঙতে কালের ভেরী বাজিল আবার।
ভাসিতেছে প্রাণীকুল হের চারিধার
ভাসে যেন তৃণগুচ্ছ না পেয়ে আধার।
গৃহিণী বালক নারী হা অন্ন হা অন্ন করি
ভয়ন্ন বিদারী রবে করিছে চিৎকার।
ভাঙতে কালের ভেরী বাজিল আবার!

এই ছাত্রবৎসল মানবদরদী মহামানবের পঞ্চম বন্ধুর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন—কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে-দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকেই পেয়েছে।—আচার্য নিজের জয়কীর্তি নিজেই স্থাপন করলেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, শাখার দিয়ে নয়—প্রেম দিয়ে।"

টমাস আলভা এডিসনের মতো আবিষ্কারক ও বিজ্ঞান সাধক পৃথিবীতে বোধকরি আর দ্বিতীয় নেই। সারা দিন কাজ আর কাজ। কত তিনি যে আবিষ্কার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু বড় ভুলো মন ছিল তাঁর। অনুক্ষণ বিজ্ঞানের সাধনায় মগ্ন থাকার দরুণ জগতের অন্য সব কিছু ভুলে যেতেন। তাঁর এই ভুলো মনের চরম প্রকাশ দেখা দিল তাঁর বিবাহের সময়। পছন্দমত মনে ঠিক হয়েছে, বিবাহের দিন এসেছে। মনের খাতীতে ধূমধাম হচ্ছে। কিন্তু কোথায় বর। তাঁর তো কোন পাত্তা নেই। তখন তাঁর বন্ধুরা ছুটলেন তাঁর ল্যাবোরেটোরিতে নিয়ে দেখলেন, এডিসন একটা পরীক্ষা নিয়ে ব্যাপৃত। বন্ধুরা বললেন, 'এ কী কাণ্ড তোমার! এখনো এখানে! ওদিকে যে লগ্ন বয়ে যায়।' এডিসন অবাক—'কিসের লগ্ন!' 'কিসের আবার তোমার বিয়ের! মনে নেই, আজ যে তোমার বিয়ে।' এডিসন বললেন, 'ও তাইতো! একদম ভুলে গেছি! কিন্তু ভাই পরীক্ষাটা শেষ না করে তো যেতে পারছি না।' বন্ধুরা ক্ষেপে উঠলেন, 'রাখো তোমার পরীক্ষা! পরীক্ষা করবার অনেক সময় পাবে! নাও, এখন চল।' এডিসন কিন্তু যেতে নারাজ! বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা—তাকে মাঝ পথে ফেলে যাওয়া! কিন্তু বন্ধুরা আর কোন কথাই শুনলেন না। জোর করে এক রকম চাং দোলা করে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ের আসরে নামালেন! সবাই অবাক! এ কী রকম বর। আধময়লা জামাকাপড়, রুক্ষ-মাথার চুল, যেন এক ঘাটতুলে পাগল! সবাই হতচকিত নির্বাক! চারদিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে এডিসন মৃদু হাসলেন, তারপর সমবেত অভাগতদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমার এই অপ্রস্তুতির জন্যে আপনারা আমায় মার্জনা করবেন। একটা আবিষ্কারের পরীক্ষা শেষ করতে ব্যস্ত ছিলাম। পরীক্ষা সফল হয়েছে, এখন আপনাদের আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, কাল থেকে ঘরের মধ্যে একটি বোতাম টিপে আপনারা ইলেকট্রিক আলো জ্বালাতে পারবেন।' এডিসনের আবিষ্কারের ফলে সেই প্রথম পৃথিবীতে ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌-এর প্রচলন হল।

বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা

এবার হঠাৎ বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতা নিয়ে দারুণ হৈ চৈ হয়ে গেল। এতাবৎকাল আমরা বিশ্বের দাবা প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে তেমন কোন খবরাখবর পেতাম না। ছোট বেলা থেকেই জানতাম, দাবায় রাশিয়াই সবার সেরা, তাকে কেউ হারাতে পারে না। একজন রাশিয়ান দাবাড়ুর নাম অনেকদিনই শুনেছি—চেরেফভ। তিনি নাকি অপরাজেয় ছিলেন।

এ বছর হঠাৎ জানা গেল, রাশিয়ার বিশ্ব বিজয়ী দাবা খেলোয়াড় বোট্রিন স্প্যাসকিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন আমেরিকার দাবা খেলোয়াড়—ববি ফিশার।

চ্যালেঞ্জ যখন পেয়েছেন তখন খেলতে হবে বৈকি। আইসল্যাণ্ডে সেই দাবার খাসর আসর বসল। বিরাট ব্যাপার! কী আড়ম্বর। কল্পনাতীত। আর সবচেয়ে বড় খবর বেরুতে লাগল—ফিশারের আচরণ, হুঁহি তুহি! এক্ষুণি হোনেসে নেহি খেলেঙ্গে! এই হোনা চাই, ওই হোনা চাই। কত বায়নাক্কা। খেলা বুঝি পণ্ড হল।

যাক। শেষ পর্যন্ত ফিশার আসরে নামলেন। তারপর তাঁর কী মেজাজ! বাপ রে! পান থেকে চুন খসলেই হৈ চৈ চিৎকার! শেষ পর্যন্ত কিন্তু জিতলেন। যা অনেকেই আশা করে নি! 12½—8½ পয়েন্টে স্প্যাসকিকে পরাজিত করে ফিশার বিশ্ব বিজয়ীর খেতাব অর্জন করেছেন। সেই সঙ্গে পেয়েছেন প্রচুর অর্থ!

এই সঙ্গে এই খেলার বিষয়ে অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা গেছে। যথা, কোন আমেরিকান দাবাড়ু এর আগে বিশ্ব-খেতাব লাভ করতে পারেন নি। এই বারকার খেলায় ফলাফলে, এই খেলায়, রাশিয়ার দীর্ঘ দিনের একটানা ছাব্বিশ বছরের আধিপত্য লোপ পেল! ফিশারের আগে যে এগারোজন বিশ্ব-খেতাব পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে শেষ পাঁচজনই রাশিয়ার। সবচেয়ে বেশিবার জিতেছেন রাশিয়ার মিখাইল।

জ্যোতির্ময়

ফিশার-স্প্যাসকির এই লড়াই-এ চব্বিশটি খেলা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। তিনটি খেলা বাকি থাকতেই অন্য পরাজয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

একুশটি খেলার মধ্যে ফিশার জেতেন সাতবার। স্প্যাসকি তিনবার এবং সমান—সমান এগারোবার।

বিশ্ব-খেতাব জয়ের ফলে ফিশার পেয়েছেন—নগদ পুরস্কার ১৫৬,০০০ ডলার! স্প্যাসকি পেয়েছেন ৬৮০০ ডলার। ১৯২৯ সালে নিজের ভাই ভাই পেট্রোসিয়ানকে হারিয়ে স্প্যাসকি বিশ্ব-খেতাব পেয়েছিলেন। ফিশারের বয়স ২৯। স্প্যাসকির ৩৫।

ইতিপূর্বে আন্তর্জাতিক দাবা খেলার আসরে ফিশারের সঙ্গে স্প্যাসকির পাঁচবার লড়াই হয়েছিল। তার ফলাফল—স্প্যাসকির জয় তিনবার; ড্র দুবার।

ফিশারের সম্বন্ধে অনেক চিত্তাকর্ষক তথ্য জানা গেল। মাত্র তের বছর বয়সে তিনি আমেরিকার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হন। পরের বছরেই আমেরিকার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন। পনের বছর বয়সে তিনি ইনটারন্যাশনাল গ্র্যাণ্ড মাষ্টার খেতাব লাভ করেন—ইতিহাসে অভূতপূর্ব—এ পর্যন্ত কেউই মাত্র ১৫ বছর বয়সে এই খেতাব অর্জন করতে পারেন নি! তারী অদ্ভুতধর্মী আক্রমণাত্মক খেলোয়াড়—ঝুঁকি নিয়ে খেলেন—সবচেয়ে বড় হল তাঁর জেতবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

মিটমিক অলিম্পিক

এবছরের অলিম্পিক বোধকরি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। খেলার মাঠে এরকম রাজনৈতিক বিদ্বেষ প্রসূত হিংস্রতা আর কখনও দেখা যায় নি সংবাদপত্র মারফত এসব খবর এতই জেনেছেন এবং জানছেন যে আর সে সব কথায় পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। এই বছরের অলিম্পিকে দেখা গেল আমেরিকা এবং রাশিয়ার প্রাধান্য। বহু বিশ্ব রেকর্ড ভাঙলো বহু চমক প্রদ ফলাফল দেখা গেল।

বিশ্বভিত্তি অলিম্পিক ক্রীড়ার চূড়ান্ত পদক-তালিকা

দেশ	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
রাশিয়া	৫০	৪৭	২৩	১৯
আমেরিকা	৩৩	৩১	৩০	৯৪
পূর্ব জার্মানী	১৩	১১	১৬	৪০
পঃ জার্মানী	১৩	১১	১৬	৪০
জাপান	১৩	৮	৮	২৯
অষ্ট্রেলিয়া	৮	৭	২	১৭
পোল্যাণ্ড	৭	৪	১০	২২
হাঙ্গেরী	৬	১৩	১৬	৩৫
বুলগেরিয়া	৬	১০	৫	২১
ইটালী	৪	৩	১০	১৮
সুইডেন	৪	৬	৬	১৬
বৃটেন	৪	৫	৯	১৮
রুমানিয়া	৩	৬	৭	১৬
কিউবা	৩	১	৪	৮
ফিনল্যাণ্ড	৩	১	৪	৮
হল্যাণ্ড	৩	১	১	৫
ফ্রান্স	২	৪	৭	১৩
চেকোশ্লোভাকিয়া	২	৪	২	৮
কেনিয়া	২	৩	৪	৯
যুগোস্লাভিয়া	২	১	২	৫
নরোওয়ে	২	১	১	৪
দঃ কোরিয়া	১	১	৩	৫
নিউজিল্যাণ্ড	১	১	১	৩
উগাণ্ডা	১	১		২
ডেনমার্ক	১			১
সুইজারল্যাণ্ড		৩		৩
কানাডা		২	৩	৫
ইরাণ		২	১	৩
বেলজিয়াম		২		২
গ্রীস		২		২
অষ্ট্রিয়া		১	২	৩
কলোম্বিয়া		১	২	৩
লেবানন		১		১
মঙ্গোলিয়া		১		১
তুর্কী		১		১
আর্জেন্টিনা		১		১
টিউনিশিয়া		১		১
উঃ কোরিয়া		১		১
পাকিস্তান		১		১
মেকসিকো		১		১
নাইজেরিয়া			২	২
ব্রেজিল			২	২
স্পেন			২	২
ইথিওপিয়া			২	২
জামাইকা			১	১
ঘানা			১	১
ভারত			১	১

অলিম্পিকে ভারতীয় প্রতিযোগিদের শোচনীয় ব্যর্থতা

এত বেদনা লাগে প্রত্যহ খবরের কাগজ খুলে দেখি একটির পর একটি প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত অগৌরবের মধ্যে ভারত হেরে যাচ্ছে। কেন যে এরকম হয় বুঝি না। আমাদের খেলোয়াড়দের মধ্যে দক্ষতার অভাব নেই বলে মনে হয়। আসল গলদ বোধকরি কর্মকর্তাদের ব্যবস্থাপনায় এবং প্রশিক্ষনে।

ভারতীয় হকি করবে গেল।

হল মিউনিক-এ যাবার সময় কর্মকর্তাদের কি আস্ফালন—এবার আমরা স্বর্ণপদক সংগ্রহ করে আনব। কত আড়ম্বর। কত ব্যাপার। তারপর সেখানে গিয়ে প্রতি খেলাতে দেখা যেতে লাগলো ভারত অতি কষ্টে স্বস্তি দিচ্ছে। তারপর খেলা পড়ল চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে। ইদানিং কালে পাকিস্তানের কাছে ভারত কয়েক বারই হেরেছে। এবার সকলের ধারণা হয়েছিল ভারত পাকিস্তানকে হারাবে। কিন্তু পারলনা। পরিষ্কার গোলে হেরে গেল। তারপরই যা হয় ঘরের মধ্যে কোঁদল। ইতিমধ্যেই ভারতীয় হকি ফেডারেশনের নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান পি, সাহনী এবং অন্যতম সদস্য বলবীর সিং পদত্যাগ করেছেন। না করে উপায় ছিলনা। প্রাক্তন অলিম্পিক অধিনায়ক পৃথ্বিপাল সিং হকি প্রশাসনের উপর মহলে পরিবর্তনের জোরালো দাবী জানিয়েছেন।

ধ্যানচাঁদ বলেছেন, ফেডারেশন একজন শিক্ষক ও একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা না বুঝে প্রশিক্ষক ঠিক করেছিলেন। ফলে গোড়ায় গলদ। তাঁর মতে এ প্রশিক্ষনের দায়িত্ব পাতিয়ালা প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠানের উপর দেওয়া উচিত ছিল।

তিনি আরও অনেক কথা বলেছেন যা প্রতিসুখকর নয়। মোটের উপর ভারতীয় হকির এই শোচনীয় গ্লানির জন্য অনেক জল ঘোলা হবে। অনেক কথার তুবড়ি উড়বে। তারপর আবার যে কে সেই। আমাদের শাসন এবং সমাজ ব্যবস্থার সর্বস্তরে যে অসত্যতা, অবক্ষয় এবং অপচয় ঘটেছে আমাদের দেশের খেলার জগতেও সেই পাপ অনুপ্রবেশ করেছে। আসলে কিন্তু খেলোয়াড়রা ঠিকই আছেন—অবশ্য দুচার জন বয়স্কো খেলোয়াড় যে নেই—তা নয়—কিন্তু তাঁদের মধ্যে নিষ্ঠার বা চেষ্টার অভাব নেই। অভাব তাঁদের ঠিকমত পরিচালনা করার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে সততা, শিক্ষণ, ঐক্য ও আদর্শনিষ্ঠ মনোভাব। এক কথায় আজ আমরা খেলার জগতেও চরিত্রভ্রষ্ট। (ক্রিকেট ছাড়া)। এই চারিত্রিক দুর্গতি যতদিন না ফিরে আসবে ততদিন ভারতকে এই গ্লানী ভোগ করতে হবে।

এবারের অলিম্পিকের হকিতে ভারতের পরাজয় সম্পর্কে তথাকথিত সমালোচকদের অভিমত

মিউনিক থেকে এ সম্পর্কে যে সমালোচনা শোনা গেল তাতে সমালোচকরা বিশেষ করে ক্ষুব্ধ হয়েছেন গোল রক্ষকের ব্যর্থতা ও ফরওয়ার্ডদের গোল করার অক্ষমতা।

ভারতীয় দলের পয়লা নম্বর গোলরক্ষক হেরিক্স আগাগোড়াই ঘাড়ের চাপে ভুগছিলেন। তাঁর গোলরক্ষার পদ্ধতি অলিম্পিক মানের উপযোগী ছিল না। বিভাগীয় খেলায়ও তাঁর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি গোল হয়েছে। তথাপি সেমিফাইনালের আগে চার্লসকে কেন সুযোগ দেওয়া হয়নি এটা বাস্তবিক দুর্বোধ্য। ভারতীয় দলের পুরোভাগের খেলোয়াড়রা গণ্ডা গণ্ডা সুযোগ অপচয় করার সময় বারবার পশ্চিম রেলের সুযোগ-সন্ধানী সেন্টার ফরোয়ার্ড বলবীর সিংয়ের কথা মনে হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁকে দলভুক্তই করা হয়নি। বলবীর দলে থাকলে হয়ত খেলার চেহারা ফিরে যেত। সেন্টার ফরোয়ার্ড ধারাবাহিক ভাবে পাড়াধারক ব্যর্থতা সত্ত্বেও কুলবন্ত সিংয়ের বদলে অন্য কোন খেলোয়াড়কে সুযোগ দেওয়ার কথা কেন চিন্তা করা হয়নি এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয়!

এছাড়া পেনাল্টি কর্ণার হিট নেওয়ার সময়ও ভারতীয় দল মাথা খাটিয়ে কাজ হাঁসিল করতে পারেনি। মুখবেনের পেনাল্টি কর্ণার হিট অবরোধ করার জন্যে পাকিস্তানী দল তাদের সবচেয়ে দ্রুতগামী খেলোয়াড়কে কাজে লাগিয়েছে। বল মাঠার সঙ্কেত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৃত্তার্ধের মাথার দিকে ছুটে মুখবেনের হিটের পথ আটকে দিচ্ছিলেন। তখন বলটি হিট না করে মুখবেন যদি পাশের কাউকে হিট করার জন্যে ঠেলে দিতেন তাহলে হয়ত ফল অন্যরকম হত। কিন্তু ভারতীয় দলের চিন্তায় এমন কোন পরিকল্পনাই ঠাঁই পায়নি।

রূপানুরাগ

শিউলি সেনগুপ্ত

আজ রবিবার। সুকান্তর কাছে যাবার দিন। এই একটা দিনই সুকান্তর সঙ্গে দেখা হয় শুভব্রতর। আর বন্ধু সুকান্তর প্রতি শুভব্রতর টানটা বরাবরই বেশী। সপ্তাহে একদিন দেখা না হলে দুজনের মনে হয় কি যেন হয়নি! বেরোবার মুখেই মা বললেন, সুকান্তকে জিজ্ঞেস করিস আমার কাজ সে কতদূর করেছে? আর বালিগঞ্জের মেয়েটিকে তুই দেখবি না তো?

—না। শুভব্রত দৃঢ়ভাবে জবাব দিয়ে বেরিয়ে গেল। এই এক জ্বালা! বিয়ে···বিয়ে—কত ছবি, কত সম্বন্ধ বাতিল করল তবু মা নাছোড়বান্দা। শুভব্রত যখন সুকান্তর বাড়ি পৌঁছল তখন বেলা দশটা। সুকান্ত বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজের ওপর চোখ বোলাচ্ছিল। শুভব্রতর মার কথাটা মনে পড়ল সবচেয়ে আগে। বলল,—কান্ত, মাকে যেন কি করে দিবি বলেছিলি?

—মাকে?—সুকান্ত হেসে ফেলেছিল। কাজটা করছি। তবে বেশ শক্ত কাজ। অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে করতে হবে।

—মাকে আমি কি বলব তাই বল।

—বলবি, হচ্ছে।

—কফি খাওয়া—

—বোস। বলে আসি ভেতরে। সুকান্ত উঠে চলে গেল। ফিরে এল একটু পরে। হাসি-হাসি মুখে বলল, —কফি আসছে। তবে সঙ্গে চিংড়ির কাটলেট। মাসে বাদুরই সুবুদ্ধি হয়েছে। হাফকিলো চিংড়ি আনিয়ে কাটলেট তৈরী করতে বসে গিয়েছে। খোকাটা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে পেঁয়াজ কেটেও চোখের জল থেকে নিস্তার পাচ্ছে না।

—হঠাৎ চিংড়ির কাটলেট?

—আরে আমিও তো অবাক হয়ে গিয়েছিলাম প্রথমে। তবে এখন বুঝলাম ওটা বিয়ের বাজারে দর বাড়ানোর জন্য। মাসেটা বুঝলি কে? যখন বাদুকে দেখতে আসবে আর জিজ্ঞেস করবে রান্না জানে, গান জানে, মা সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বলতে পারবেন, গলা, কথা বলেই বুঝতে পারবেন। নিজের মেয়ে বলে বাড়িয়ে বলছি না আর রান্না! মা আমার রান্নায় দ্রৌপদী। চিংড়ির কাটলেট থেকে সুরু, ওই দেখ ব্রত বলতে না বলতেই চলে এসেছে। এই বাদু তখন এতক্ষণ তোর প্রশংসা করছিলাম। বলছিলাম, বোনটা আমার ভাগ্যি লক্ষ্মী।

বাদু একটু হেসে বলল,—কাটলেট খাবার লোভে ভাগ্যি লক্ষ্মী বলছিস। অন্য সময় মুখপুড়ি ছাড়া কথা নেই। তারপর ব্রতদা কেমন আছ? মাসীমা?

—ভালো।

সুকান্ত তাড়া দেয়,—বাদু যা। আরো দুটো কাটলেট ভেজে পাঠিয়ে দে। ষোটে দুটোতে পোষায় নাকি আমাদের? বাদু চলে যেতেই সুকান্ত বলে,—ব্রতরে একটা ভালো খবর আছে।

—কি খবর কান্ত? কাটলেটে সবে কামড় বসিয়েছে শুভব্রত।

—একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল।

শুভব্রত মৃদু হেসে বলল,—ব্যাস আর কি, মনের মধ্যে ছবি আঁকা হয়ে গেল।

—আরে তুই কবি ভাই চট করে এখন রিমার্ক করতে পারলি। কিন্তু সুর তাল মিলিয়ে যেমন একটি পুরোপুরি গান হয় ব্রত, সেরকম রঙ, রেখা নিয়ে তবেই পূর্ণ হয় একটি ছবি। আমার মনের পটে রেখা পড়েছে সবে, রঙ ধরেনি।

—তা ধরাবে কে!

—দিন যে দিন। এক একটা দিন যাবে আর এক একটা পড়বে। লাল, নীল সবুজ—

শুভব্রত হেসে বলল,—শেষটায় সাদা।

—সাদা মানে ?

—সাদা মানে ধু ধু মরুভূমি,…

—পরিষ্কার হল না।

—মানে মেয়েটি শেষকালে আর একটি ছেলের গলায় মালা দেবে।

—সে তো আমিও। আর একটি মেয়ের গলায়—

—দেখ ব্রত ভালোবাসা নিয়ে কারবারে, ইয়ার্কি মার কিন্তু ঠকবাজি করিস না।

—দেখ ব্রত তোরা কবি। তোদের কাছে ওসব ভালোবাসা টালোবাসা সেন্টিমেন্টে গুড়গুড়ি দেয়। কিন্তু আমরা প্রাকটিকাল লোক সেন্টিমেন্টগুলো পিটিয়ে পিটিয়ে লোহা লক্কড়ের মত নীরস প্রাণহীন করে তুলেছি।

শুভব্রত, সরোষে হেসে বলে,—তুই তো কথা-বার্তায় কবি বুলের বাবা-ঠাকুর্দাকেও হার মানাচ্ছিস।

—আসলে এসব হল মহাত্মাণী চেনাবের কথা।

—চেনাব ?

—হ্যাঁ।

—কোথাকার ? পাঞ্জাবের ?

—আরে না। আমার হৃদয়ের।

—আরে যাদের সেন্টিমেন্টে লোহা-লক্কড়ের মত কঠিন তাদের হৃদয় নেই।

সুকান্ত বলে,—নারে সিরিয়াসলি শোন ব্যাপারটা।

—বল।

—সেদিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। সন্ধে হব হব। রাস্তার লাইটগুলো জ্বলে উঠেছে। আমার সামনে দেখি একটি মেয়ে চলেছে, পরনে জলো সুতীর মত কি যেন—

—সুতী। শুভব্রত হতবাক।—মেয়ে সুতী পরে ?

—হ্যাঁ। ব্রত ডিস্টার্ব করিস না। তাহাই আসবে না। মেয়েটার—

শুভব্রত আবার বলে,—সুতী পরলে অঙ্গলে থাকা উচিত।

—শোন ব্রত, তোর বউ যদি পরে তাকে বলিস। অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে পার্সোনাল মতামত খাটানো উচিত নয়। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মেয়েটার ফিগার ভারী সুন্দর। আর চুলগুলো কাটা, শেষ করা। হঠাৎ দেখি একটা লাল টুক-টুকে ব্যাগ টুপ করে পড়ে গেল রাস্তায়। আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগটা তুলে ডাকলাম, শুনুন !—সুকান্ত নড়ে-চড়ে বসল।—মেয়েটা এতক্ষণে ঘুরে দাঁড়াল। মুখটা দেখতে পেলাম। চোখ দুটো আশ্চর্য কালো। আর তেমনি বড়। ঠোঁটটা ডালিমের দানার মত টুকটুকে লাল। রঙটা চাপা, কিন্তু সতেজ। কালো মেঘের গায়ে রামধনুর রঙ যেমন তেমনি বাইরের মেয়েটির রঙে। ঠোঁটের বাঁক দুটো ভারী সুন্দর। মনে হয় অনুরাগ, অভিমান, সব মিশে আছে ওই ফোলা ফোলা ঠোঁট দুটিতে। যা হোক সে আমায় বলল,—আমায় বলছেন,

—হ্যাঁ।

—বলুন। কণ্ঠস্বর খুব স্পষ্ট।

—আপনার ব্যাগ। —ব্যাগটা এগিয়ে দিতেই মেয়েটি প্রায় গর্জন করে উঠল,—সরি ! ওটা আমার ব্যাগ নয়। রাস্তার মেয়েদের ঘরে আসল রমণীর তারতম্য আপনাদের পড়াশুনোর কোন্ সাবজেক্টের কোন্ চ্যাপটারে আছে, জানাবেন কি ? জানলে সুবিধে হয়। আমি একটা গ্রান্স দিতে পারি। মেয়েটি শেষ করা চুলে ঢেউ তুলে চলে গেল। কিন্তু একটু এগিয়েই আবার ফিরে এসে বলল,—সরি ভীষণ সরি। ব্যাগটার বর্তমান মালিক আমি। ওটা আমার বন্ধুর সঙ্গে বদল হয়ে গেছে। খেয়াল করিনি। মাপ করবেন। তারপর অনেক কথাবার্তা হল। এই হল চেনাব—আর এই চেনাব হল আমার হৃদয়ের অধীশ্বরী।

শুভব্রত ব্যঙ্গ করে বলল,—তারপর, তুই আর চেনাবের সঙ্গে মীট করিসনি ?

—হ্যাঁ আর একদিন দেখা হয়েছিল বাসে। বড্ড ভিড় ছিল। কথা হয় নি। তবে ও আমায় দেখে হেসেছিল। হাসিটা বলেছিল, চিনেছি। আর সেদিন আগে সুন্দর দেখাচ্ছিল চেনাবকে। অরেঞ্জ পাড়ের একটা শাড়ি পরেছিল। মস্ত বড় খোঁপা মাথায়। কপালে একটা বড় টিপ। মনে হচ্ছিল ও যেন এই মাঠের দিঘির জলে ডুব দিয়ে এল। এত উজ্জ্বল ছিল ওর চেহারা।

শুভব্রত এবার ঠাট্টা না করে পারল না,—চেনাব তোকে সত্যি কবি করে দিয়েছে। তারপর ?

—তারপর একদিন সর্দিতে কাশিতে বিব্রত হয়ে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। ডাক্তারবাবু ছিলেন না। তাই অপেক্ষা করতে হল। ঠিক সে সময় চেনাব এসে দোকানটায় ঢুকল। মুখটা বিষণ্ণ মলিন। আমায় দেখতে পায়নি। আমি উঠে গিয়ে দাঁড়ালাম, কার ওষুধ !

ও খুব চমকে উঠে বলল,—বাব্বা আপনি। খুব চমকে উঠেছিলাম।

আমি আবার বললাম,—কার অসুখ !

চেনাব ম্লান হেসে বলল,—আমার। শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। দুর্বল লাগে। ডাক্তারবাবু তাই একটা টনিক দিলেন। আর ঠিক সেই সময় সামনের রাস্তাটায় পর পর মোটা চারেক বোমা ফাটল। আর সেই শব্দ শুনে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি থাকেন কোথায় !

চেনাব বলল—কাছেই। আর এ তো আজকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে সুকান্তবাবু। কিন্তু আপনি এখানে কি করছিলেন ?

বললাম,—আর বলবেন না। কাশিতে ক'দিন রাত্তিরে ঘুমোতে পারছি না। তাই ডাক্তারবাবুর কাছে এসেছিলাম।

চেনাব বলল,আসি। ওষুধ নেওয়া হয়ে গেছে।

বললাম,—চলুন, এগিয়ে দিই আপনাকে। সে রাত্তিরে কথাবার্তায় আমরা আরো একটু ঘনিষ্ঠ হলাম। তা সে ঘনিষ্ঠতার কথা আমাদের দুজনের। তুমি তৃতীয় ব্যক্তি, কিন্তু আসল কথা চেনাবের জন্মদিন সামনের সপ্তাহে। ওকে তোর কথা বলেছি। ইয়ং লেডি আধুনিক কবিদের দারুণ ভক্ত। আর সাহিত্যিক মহলে তোর নামটা সবাই জানে। আর যারা সাহিত্যের রস পান করে চেনাব তাদেরই দলে। শুধু একটা কথা বলে, কবিদের একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে কবিতাগুলো একটু সোজা না লিখে অত শক্ত করেন কেন ? হয়তো তোর সঙ্গে দেখা হলে এ প্রশ্নটা করবেই। তৈরী থাকিস ! কখন চেনাব নেমন্তন্ন করতে হাজির হবে জানি না।

শুভব্রত হেসে বলল,—চেনাবকে সামনে পেলে বুঝিয়ে দেব।

—তুই সন্ধ্যেবেলা বাড়ি থাকিস তো ?

—হ্যাঁ সাতটার পর থাকি।

—মাসীমাকে বলবি আমি খুব চেষ্টা করছি।

—আচ্ছা। রাস্তায় নেমে শুভব্রতর কি হল কে জানে ? সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে এপাশে ওপাশে একটি মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কালো গভীর দুটো চোখ বড় বড় পালক দিয়ে ঘেরা। ডালিমের দানার মত টুকটুকে ঠোঁট—যার গায়ের রঙে কাজল মেঘের বুকে রামধনু রঙের বাহার। কোথায় সেই মেয়ে ? শুভব্রত কেমন যেন মনে হয় মেয়েটার সে শিগগির দেখা পাবে। মেয়েটা যেন তার অনেক চেনা।

দিন তিন চার বাদে সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে শুভব্রত সবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে, মা এসে বললেন,—শুভ, সুকান্ত এসেছে। সঙ্গে একটি মেয়ে।

—মেয়ে ! এই সেরেছে। শুভব্রত লাফ মেরে উঠে বসে এলোমেলো চেহারাটা শুধরে নিয়ে বৈঠকখানায় এসে হাজির হল।

ওকে দেখেই সুকান্ত অমায়িক হেসে উঠে দাঁড়াল। —আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন মিস চেনাব মিত্র। আর ইনি তরুণ কবি শুভব্রত বোস। আমি আমার ভূমিকাটা সেরে নিই। মিস মিত্রের জন্মদিন শনিবার। সেই উপলক্ষ্যে একটা ঘরোয়া আসরের ব্যবস্থা হয়েছে। মিস মিত্রের বন্ধু গান গাইবেন, শুভ তুই কবিতা পড়বি আর আমি কতগুলো ফুড়ুড়ে গল্প বলব।

চেনাব এবার বলল,—শনিবার আপনার যাওয়া চাই। আপনার কবিতার কিছু কালেকশন নিয়ে যাবেন।

সুকান্ত বলল,—মিস মিত্র বসুন···আমি মাসীমার সঙ্গে দরকারি কথাটা সেরে আসি।

শুভব্রত প্রচণ্ড লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু এবার জোর করে চোখ তুলল। দেখল চেনাবের সেই গভীর দৃষ্টি। তরুণ কবি শুভব্রতর বুকের মধ্যে দুরদুর করে উঠল। একটা অচেনা চঞ্চলতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল তাকে।

চেনাব ধীরে ধীরে বলল,—আপনি অনেকদিন কবিতা লিখছেন ?

—তা বছর আষ্টেক হবে।

—কার কবিতা ভালো লাগে ?

—প্রথমে রবীন্দ্রনাথ। তারপর আরো অনেকে।

—আপনি লেখেন কখন ?

—কিছু ঠিক নেই। ইচ্ছে হলেই পেন কাগজ নিয়ে বসে পড়ি।

সুকান্ত একগাল হেসে ঘরে ঢুকে বলল,—কাজ হাসিল। আমার নির্বাচনের সাফল্যে মাসীমা তোলাদাকে মিষ্টি আনতে পাঠিয়েছেন। আচ্ছা চেনাব শুভব্রতর সঙ্গে আমার একটা নিরিবিলি টক্ মানে কথা আছে। শুভব্রতর হাত ধরে টান দিয়ে সুকান্ত বারান্দার এধারে নিয়ে এল। ভুঁকুনি দিয়ে বলল, —ই, পিত বুঝছিস না কিছু ? চেনাবকে চিনিস না ? আগে ছোটবেলায় দেখিস নি ও আমার পিসতুতো বোন।

—তোর বোন ! শুভব্রত হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ও তোর হট্ ফ্যান। অবিশ্যি কবিতার। কলকাতায় এসে কিছুদিন আগে একটা সাহিত্য সভায় তোকে দেখে একদম কুপোকাত। ওর মা-ও পাত্র খুঁজছে। আর এদিকে মাসীমাও পাত্রী খোঁজার দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। কিন্তু পাত্রী তো আমার হাতের মুঠোয়। মাসীমাকে বললাম, চেনাবের কথা। একদিন দেখিয়ে দিলাম। মাসীমা বললেন,—আমার তো পছন্দ হয়েছে ; কিন্তু শুভ্রকে একবার দেখানো ভালো। যা গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে। এরপর আমার কাজ হল তোকে চেনাব সম্বন্ধে একটু সজাগ করা। চেনাবের গল্প বলে তোর মানসলোকে আমি পদাবলীর রূপানুরাগ পর্বটাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। যা হোক আমার কাজ শেষ। মাসীমার আজ চেনাবকে খুব পছন্দ হয়েছে। সেদিন দূর থেকে বেশে বুঝতে পারেন নি। আর চেনাব তোকে আগেই পছন্দ করেছে। এবার তুই ?

—হ্যাঁ আমিও।

সুকান্ত বলল,—আমিও কি ?

শুভব্রত একগাল হেসে বলল,—আমারও পছন্দ হয়েছে। তবে একটা কথা চেনাব কি সুন্দরী পরে ?

—নারে। সুকান্ত হো হো করে হেসে বলে—ওটা কাল্পনিক। কাল্পনিক হবেই তো। অভিনয় তো কম করতে হল না, তোমার মত গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলেকে বাগে আনতে। তারপর চিৎকার করে ডাকল,—চেনাব চল।

শুভব্রত অস্থির হল। সে কি। এখুনি যাবি ?

সুকান্ত ঠিক করে হেসে বললে,—ওসব গল্প-টল্প এখন হবে না। বিয়ের পর হবে। ধৈর্য ধরে থাক বুঝলি ? চেনাবের সঙ্গে দেখা করার জন্য ছলছুতো খুঁজিস না। আমার কাছে তাহলে ঠকেই যাবি।

ঝরা পাতা

শিপ্রা দত্ত

ক্লান্ত অবসন্ন দেহে সীতার চিঠিখানা হাতে নিয়ে সীতা বসে রইল। সে যেন পাথরে গড়া মূর্তি, দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। উঠবার শক্তি যেন নেই। পা যেন পাথরের মত ভারী হয়ে গেছে।

মনে প্রবল ঝড় উঠেছে। স্মৃতির পাতাগুলি কে একটির পর একটি উল্টে যাচ্ছে। হৈতো হাওয়ার আঘাতে একটি বৃক্ষের সব পাতাগুলি যেন ঝরে পড়ল পত্রশূন্য বৃক্ষে সেই যেন একটি মাত্র পাতা হাওয়ায় এখনও দুলছে।

সাধন নিয়োগীর অভাব অনটনের সংসারেও শান্তি ছিল। দেশ বিভাগের প্রবল ধাক্কায় সবস্ব খুইয়ে তিনি এপারে এসে উঠেছিলেন। শ্যামবাজারে একটা অতি পুরানো বাড়ীর দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে আছেন।

স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে। বড় ছেলে সমিত কিন্তু আধুনিক ছেলেদের মত নয়। মা বাবা ভাইবোনদের প্রতি ছিল তার গভীর টান। সাধনবাবু মার্চেন্ট অফিসের কেরানী। যে আয় তার, তা টানে আনতে, বাঁয়ে কুলোত না। তবু সংসারটি সুখের ছিল।

সমিত মা ও বোন গীতার সঙ্গে কত জল্পনা কল্পনা করতো। নিজে সে টিউশনি করে পড়াশুনা করতো। দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছিল মা বাবার চেহারায়। অকাল বার্দ্ধক্যে নুয়ে পড়েছিলেন উভয়ে। পুষ্টিকর খাদ্যাভাবে ভাইবোনেদের কাঠি কাঠি চেহারা। সংসারের সর্বত্রই দারিদ্র্যের করাল ছায়ার চিহ্ন। সমিত বলতো, কোন রকমে একটা চাকরী জোগাড় করে, সংসারের এই খরা কালের চেহারাটা সে বদলে দেবে। গীতাকে বি. এ. পাশ করিয়ে বিয়ে দেবে। ছোট ভাইবোনদের ভাল ভাবে মানুষ করবে।

সংসারের নানা অভাব অনটনের মধ্যেও সমিত কাউকে মুষড়ে পড়তে দেয়নি। যখনই সে বাসায় থাকতো, নানা হাস্যকৌতুকে সে সবাইকে চাঙ্গা করে তুলতো।

এতদিনের আশা তার সফল হতে চলেছে। সাধনবাবুর সংসারে আনন্দের ঢেউ উঠলো। সমিত কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ পাশ করেছে। তারই প্রিয় প্রফেসারের সুপারিশে বিষ্ণুপুর কলেজে চাকরী প্রায় ঠিক হয়েছে। কর্মের ইন্টারভিউ চিঠি এসেছে।

প্রফেসার জানিয়েছেন ইন্টারভিউটা লোক দেখানো। হাতে হাতে এপয়েন্টমেন্ট লেটার সমিত পাবে ও প্রফেসার-দের বেনটাও দেখে আসবে। বিকেলে সমিত মা বাবাকে প্রণাম করে তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। পরের দিন বিকেলে ফিরবে এই ছিল কথা।

গীতা আনন্দে উৎফুল্ল। বিকেল হতে মা মেয়ে বসে আছে সমিতের অপেক্ষায়। সময় যেন কাটতে চায় না। গীতার মনে হচ্ছিল ঘড়ির কাঁটা কে যেন পিছন দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে কলকাতা নগরীকে রাত্রিবাস পরিয়ে দিল। সাধনবাবুও আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে অধীর আগ্রহে ফিরেছেন। গীতা ঘর বার করছে। মা বাবাও উন্মুখ অপেক্ষায় বসে আছেন ঘরে।

সেই প্রত্যাশিত মুহূর্ত এলো, সকলের সব আশা আনন্দের দীপকে এক দমকা হাওয়ায় নিভিয়ে দিয়ে। সমিতের মৃত রক্তাক্ত দেহ নিয়ে এলো কয়েকজন।

চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে, সমিত ট্রেনে কাটা পড়েছে। পকেটে তার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত এপয়েন্টমেন্ট লেটার, যার থেকে তার ঠিকানা পেয়ে আগন্তুকরা তার শব নিয়ে এসেছে।

সাধনবাবুর পরিবারে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। এই দৃশ্য দেখে সাধনবাবু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। এই শকে তাঁর স্ত্রী পাগল হলেন।

গীতা সেবার বি. এ পরীক্ষা দিয়েছিল। সেই তখন হতে সংসারের জোয়াল সে কাঁধে নিলো। কারণ সাধন-বাবুর জ্ঞান ফিরে পেলেও, দেহ মন তাঁর ভেঙে গেছে। নানা ব্যাধি তাঁর জর্জর দেহে আশ্রয় নিয়ে, তাঁকে পঙ্গু করেছে।

গীতার মা মানা চিকিৎসায় যদিও ভাল হলেন, তবু সম্পূর্ণ নয়। মাঝে মাঝেই রোগটা যখন আবার দেখা দিতো, ঘুমের ওষুধ খাইয়ে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হতো। এই ভাবে দুঃখ কষ্টে গীতার কর্মবহুল দিনগুলি গড়িয়ে চলেছিল।

একটা স্কুলে চাকরী ও কয়েকটা টিউশনি নিয়ে সে সংসারের হাল ধরলো। এরই মধ্যে বি. টি ও এম. এ টা পাশ করে নিল। জ্ঞান বুদ্ধির জন্ত নয়, আয় বৃদ্ধির জন্ত।

ছোট ভাই অমিত এবার হায়ার সেকেণ্ডারী দিয়ে কলেজে ঢুকেছিল। গীতা মনে মনে কল্পনা করছিল, আর তিনটা বছর পর অমিত যদি একটা চাকরী ধরতে পারে, তবে তার বোঝা কিছুটা হাল্কা হবে। গীতা যা রোজগার করছে, সবই সংসারের পিছনে শেষ হয়ে যাচ্ছে।

ছোট বোন সীতা ক্লাশ নাইনে পড়ে। পড়াশুনায় তার তেমন মন নেই। সংসারের কাজেও মাকে সে বিশেষ সাহায্য করে না। প্রায়ই বেড়িয়ে বেড়ায়। অথর্ব বৃদ্ধ বাবা যাকে সীতা কেয়ার করে না। মা গীতাকে জানান প্রায়ই সীতা স্কুলে যায় না। সব সময় তার উড়ো উড়ো মন। গীতা বেরিয়ে গেলেই নানা ছেলে এসে সীতাকে ডাকা ডাকি করে, সীতাও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। গীতাকে অন্ন সংস্থানের জন্ত সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়। সীতার উপর নজর রাখা তাই সম্ভব হতো না। মার মানিসে গীতা সীতাকে শাসন করে। সীতা নীরব থাকে।

দিনগুলো এই ভাবেই কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন ভোরে এক পুলিশ ভ্যান এসে গীতাদের বাড়ী ঘেরাও করে। বাড়ী সার্চ করলো। কিছুই পেলো না, তবু যাবার সময় অমিতকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে গেল। পুলিশ দেখে অমিত পালাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি।

যাবার সময় পুলিশ অফিসার গীতাকে জানিয়ে গেল, অমিত একজন নকশাল নেতা। শুনিয়ে গেল ভাইটির উপর একটু নজর রাখা উচিত ছিল। কলেজে ভর্তি করিয়ে-ছিলেন কিন্তু ভাইটি কলেজে যায় কিনা সেই খোঁজটুকু নেওয়া উচিত ছিল। এমন উঠতি বয়সের ছেলেকে এতটা স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই সে এমন বিপথে যাবার সুযোগ পেয়েছে।

গীতা নীরবে এই অভিযোগ মাথা পেতে নিল। কারণ কি ভাবে গীতার দিন কাটে তাতো এদের বলা যায় না। ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত গীতার জীবনে এতটুকু অবসর নেই, ছকে ঢালা কর্মতালিকা। কিন্তু এরই মধ্যে কয়েকদিন টিউশনি কামাই করে ভাইয়ের জন্ত সে নানা জায়গায় ছুটোছুটি করলো। তবু ভাইকে ছাড়িয়ে আনতে পারলো না। তার বিরুদ্ধে নাকি অনেক চার্জ।

আঘাতের পর আঘাতে সাধনবাবুকে যেন আরও অথর্ব করে দিল। বংশের শেষ দীপটুকুও এবার নিভে যাবে। নকশালদের একবার এ্যারেষ্ট করলে, জীবন নিয়ে খুব কমই ফেরে। বিশেষ করে সে যদি নেতা হয়।

পুলিশ অফিসারের অভিযোগ শুনে গীতার মনে হয়েছে, সত্যি অমিতের দিকে নজর রাখা তার উচিত ছিল। দাদা থাকলে, এমন হতো না। কিন্তু গীতা একা আর কত দিক সামলাবে? এত ভার যেন সে বইতে পারছে না।

নিজের দিকে তাকাবার অবসর ও জীবনে তার হবে না। দাদার ইচ্ছে ছিল, দাদার বন্ধু সরোজদার সঙ্গে গীতার বিয়ে দেয়, কিন্তু এসব চিন্তা এখন গীতার জীবনে বিলাস। সরোজদা অবশ্য এ প্রস্তাব গীতাকে দু'একবার দিয়েছিলেন। কিন্তু গীতা তার বিরাট সংসারের দায়িত্বের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সরোজদা অপেক্ষা করতে চেয়ে-ছিলেন। গীতা জানিয়েছিলো, এ জীবনে তার ছুটি মিলবে না। সরোজদা অবশেষে গীতারই বন্ধু অরুন্ধতীকে বিয়ে করেছেন।

অমিতের ব্যাপার নিয়ে গীতা তা যখন ব্যস্ত, সীতার রাগ যেন তখন আরও হাল্কা হয়ে পড়ল। সীতাকে রাত আটটার সময় ধর্মতলার একটি ছেলের সঙ্গে ঘুরতে

সীতা। ছেলেটির চেহারা ও পোষাক দেখে সীতা বুঝেছিল, সীতা বখাটে ছেলের দলে পড়েছে।

রাত্রে বাড়ী ফিরতে সীতা সীতাকে ডেকে ছেলেটির কথা জিজ্ঞেস করেছিল। প্রথমত, সীতা তা অস্বীকার করে। সীতা যখন রেগে গালে একটা চড় বসিয়ে দিল, তখন সে সোমেনের পরিচয় দিয়ে বলেছিল,

সোমেনের সঙ্গে আমি মেলাতে দিয়েছিলাম। তুই তো সারাদিন বাইরে বাইরে ঘুরিস। আমি একজন পাগল, আর একজন বুড়াকে নিয়ে জীবন কাটাবো—এটাই কি তোর মনে করেছিস? আমার কি কোন সাধ আহ্লাদ নেই?

মা বাবা সম্বন্ধে এমন উক্তি করতে শুনে, সীতার গালে সীতা আরও দু'একটা চড় বসিয়ে বলেছিল, খুব শিক্ষা হয়েছে কতকগুলো লোফারের সঙ্গে মিশে। মা বাবাকে বলছিস্ পাগল, বুড়ো। স্কুলে না গিয়ে এইসব বখাটে ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। তোর বয়সে কখনও দেখেছিস আমাকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে এইভাবে ঘুরে বেড়াতে? মাসে মাসে তোর পিছনে কেন এত টাকা ঢালছি?

স্কুলে গিয়ে কি হবে? সারাদিন সংসারের কাজ করলে পড়ার সময় কোথায়? আমিই তো তোর চারটায় উঠে রান্না করে রেখে যাই। তুই তো শুধু ঘর দুটো ঝাড় দিস্। মা-ই তো অত সব কাজ করেন। আমি উদয়াস্ত বাইরে বাইরে ঘুরছি কাদের জন্য? এত হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করছি কাদের জন্য? সাধ আহ্লাদের সময় তোর এরই মধ্যে কি ফুরিয়ে যাচ্ছে যে লেখাপড়া বাদ দিয়ে তা পুটতে যাচ্ছিস্!

সীতা কোন উত্তর না দিয়ে না খেয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরদিন রাত্রে সীতা, সারা দিনের টিউশনি, স্কুল, বাজার সেরে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরেছে, তখন মা একটা চিঠি দিলেন। চিঠিখানা তিনি সীতার টেবিলের উপর পেয়েছেন! চিঠিখানা সীতার হাতের লেখা।

দিদি,

তোদের মুক্তি দিয়ে গেলাম। তোদের বোঝা হয়ে আর থাকতে চাই না। তোদের শাসনও আর মেনে নিতে চাই না।

আমার সঙ্গী সাথীরা যখন আমারই চোখের সামনে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাচ্ছে, তখন আমাকে দিনের পর দিন দুই শোকাতুরা রোগীর সেবার জন্য বদ্ধ অন্ধকার ঘরে দিন কাটাতে হচ্ছে। একটু আমোদ আহ্লাদ করবার জন্য আমাকে চুরি করে বের হতে হয়। এমন পরিবেশে আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবার জন্য আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। আমার খোঁজ করিস না। ফেরাবার চেষ্টা করেও লাভ হবে না। কারণ আমি এখন সাবালিকা। দরিদ্র মূর্খ মেয়ের, এ পথ ছাড়া, আর কোন গতি নেই।

মা বাবাকে তুই দেখিস্।

ইতি

সীতা।

এই প্রথম

['এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বেশ কিছুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এইভাবে ভাবায়িত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করেছিলাম। ইহা অল্প দিনের মধ্যেই লেখক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যাঁদের সত্যিই প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন সেইসব লেখক-লেখিকাদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ভাবে নতুন লেখক তৈরী হয়। একদিন এইসব লেখক-লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেন না তা কে বলতে পারে!

নূতন লেখক-লেখিকাদের রচনা অন্য পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও আমাদের পত্রিকায় তাঁরা 'এই প্রথম'। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, রচনা যেন অপেক্ষাকৃত ছোট হয় তা না হলে স্থানাভাবে কোনদিনই প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির উল্লেখ করবেন এবং লেখার সঙ্গে নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিশ্চয়ই দেবেন।

—সম্পাদক]

শীত আসছে

পার্থসারথি গুপ্ত

—শীত আসছে।

—তাতে কি হয়েছে?

—কি আবার হবে। বুঝতে পারছ কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।

—আবহাওয়ার রিপোর্ট থেকে ঠিক বোঝা না গেলেও, ক'দিন আগেই অক্টোবরের পাতাটা ছিঁড়েছি।

—অক্টোবরের পাতা ছেঁড়ো আর জুনের পাতা ছেঁড়ো তাতে কিছু যায় আসে না। দিন করছ কিছু!

—হ্যাঁ, তাও করছি। মা পরশুদিন একটা বোরোলীন কিনে এনেছে। বেরোবার আগেও একবার আলতো করে ঠোঁটে বুলিয়ে এসেছি।

অসীম ঠোঁটে একবার আঙুল ছোঁয়াল। আবার কেমন শুকনো শুকনো ঠেকছে। দুপুর দু'টো, ফাঁকা রাস্তা। দূরে একটা লালরঙ মার্কা টেম্পো আসছিল। সেটাকে দেখেই অসীমের হঠাৎ মনে হ'ল এই মুহূর্তে তার রাস্তা পার হওয়ার একান্ত দরকার। অথচ অন্য ফুটপাথে গেলে কি হবে ভেবে পেলো না। বুকের ভিতরটা ধচধচ করে উঠল। প্রথমে ভেবেছিল, টেম্পোটা চলে গেলে পার হবে। শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে টেম্পোটাকে খুব কাছাকাছি রেখে রাস্তা পার হয়ে গেল।

এপারে এসে অসীমের খেয়াল হল, মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এতক্ষণ বেশ রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটছিল। এবার ছায়ার মধ্যে এসে গা'র কাঁটা দিয়ে উঠল।

—বুঝতে পারছ শীত আসছে?

—এবার পারছি।

—ও আর এমন কি। এবার যা শীত পড়বে, শতাব্দীর শীতলতম শীত।

—চুলচন্দন পড়ুক তোমার মুখে।

—কেন? তোমার তা'তে কি লাভ?

—আমার আর কি! আমাকে তো সেই দাদার ছোট হয়ে যাওয়া সোয়েটারটাই এবছরও পরতে হবে। লাভ হবে দুপুর। ওর মামা আমেরিকা থেকে ওকে একটা দুর্দান্ত কোট এনে দিয়েছে। ও বেচারার দুঃখ কিসে ঐ কোট পরলে কোলকাতার লোক ওকে চাঁদা করে

ভিজতে পাঠিয়ে দেবে। এবার ও আপ্ ফিটিয়ে পরতে পারবে।

অসীম আবার হাতা ক্রশ করল। তারপর একবার চারদিক চেয়ে নিল। কেউ তাকে দেখছে নাকি? দেখবার মত কাউকে দেখতে পেল না আশ্বস্ত হয়ে অসীম হাঁটতে শুরু করল।

মোড়ের চায়ের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় দোকান থেকে সমবেত গলায় আওয়াজ পাওয়া গেল, কি রে চন্দি কোথায়?

প্রশ্নটা সরাসরি অসীমের মস্তিষ্কে আঘাত করল। সত্যিই তো কোথায় যাচ্ছে সে? এতক্ষণ একবারও ভাবেনি। তবু বলল,—এই একটু রবিদের বাড়ি।

—রবি বাড়ি নেই। সিনেমা গেছে।

—তুই গেছিলি ওদের বাড়ি?

—হ্যাঁ, এই তো আসছি।

—মুশকিল হল। আমার অনার্সের একটা খাতা নিয়ে এখনও কেরত দেয়নি তোর সঙ্গে তো সন্ধ্যের পর রবির দেখা হবে?

—তা হবে। কেন?

—ওকে খাতার কথাটা বলিস।

—কেন, তুই যাবি না?

—বলতে পারছি না। অনেকগুলো কাজ আছে। খুব চেষ্টা করব আসতে।

—উঠছিস কেন? এখন তো আর কাজ নেই।

মানে, যত তাড়াতাড়ি কাজগুলো সারতে পারি ততই ভালো। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে, আজ আবার পাড়ায় একচোট হয়ে গেছে।

—আরে বোস না। রবিদের বাড়িতে যতটুকু সময় থাকতিস ততটুকু অন্ততঃ থাক। আমিই না হয় চা খাওয়াচ্ছি।

সময় লেকের স্টপেজে এসে বাসে তুলে দিল অসীমকে।

বাসে উঠে খেয়াল হল অসীমের কোথায় যাবে সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে শুধু শুধু উঠে এল চায়ের দোকানটা থেকে।

কণ্ডাক্টর টিকিট চাইবার আগেই কিছু না ভেবে অসীম বিবেকানন্দ পার্কের স্টপে নেমে গেল।

আরে প্রবীর যাচ্ছে না!

হ্যাঁ তাই তো। সঙ্গে কে? ও আচ্ছা, ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে। একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে। ধরলেই বলবে, ইয়ে, আমার মাসতুতো বোন অমুক। আর ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ওরা হয়ত দিব্বি "তুই তুই" করে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করে দেবে। এটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না অসীম। প্রেম করছে তাতে লজ্জা পাওয়ার কি আছে? যেন একটা পাপ করছে। ঠিক এইরকম ডিফেন্স করেছিল অশোককে, প্রেম করিস স্বীকার করার সাহস নেই?

—যাঃ! সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেই প্রেম হয়ে গেল!

এরকম নানা বড় বড় কথার জালে অসীম কাৎ হয়ে যায়। ওর ইচ্ছে হয় ডিফেন্স করার তাহলে প্রেম করে কি করে? শুধু চিঠি লিখে আর দু বেলা টেলিফোন করে?

প্রবীরের খুব কাছাকাছি গিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে বলল, কি স্যর, দিনদুপুরে···ঘাড় ঘোরাতেই অসীম টের পেল একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। লোকটা প্রবীর নয়, প্রবীরের মত দেখতে। এরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় আগে সে কোনদিন পড়েনি।

লোকটা ততক্ষণে আস্তিন গুটোতে শুরু করেছে প্রিয়ার সামনে অপমান! অসীমও আমার হাতা গুটোতে লাগল। একটা রামেলা হতে পারে মনে করে লোকটার সঙ্গিনী লোকটার আমা ধরে টানতে লাগল, এই কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও না।

—তুমি সরো। এদের জন্যই কি ভদ্রলোকেরা এখানে আসতে পারবে না?

অসীম বুঝল ওরা অসীমকে ছিনতাই পার্টির লোক মনে করেছে। অসীম অনায়াসেই লোকটাকে মেরে শুইয়ে দিতে পারে তবুও মেয়েটার চোখে চোখ রাখতেই তার ফুলে ওঠা পেশীগুলো মিইয়ে গেল।

সে অদ্ভুত মোলায়েম গলায় বলল, ভুল হয়ে গেছে দাদা।

কোন রকমে কথাটা বলেই অসীম উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। কয়েকটা কথা আবছা ভাবে কানে এল, বুঝলে, এগুলো আসলে রাফ্‌ল কাণ্ডয়ার্ড, রুখে দাঁড়াও, ব্যাস, ফুরফুর্‌র……।

বুকের ভিতরটা ধচধচ করতে লাগল। ওরা তাকে ভুল বুঝল। মনে হল ওদের ডেকে বলে, বিশ্বাস করুন, আমাকে যা ভাবছেন আমি তা নই। আপনাকে বন্ধু ভেবে ভুল করেছিলাম।

ইস্, ঐ মেয়েটা যদি চেনা কারুর কিছু হয়! ভীষণ খারাপ দাঁড়াবে ব্যাপারটা। যাক্‌, যা হবার হোকগে। তোমরা শালা ভদ্রলোক। থুঃ!—থুথু ছিটোবার ভঙ্গী করে বিড়বিড় করে বলল, জানাই আছে কত ভদ্রলোক তোমরা। —এবার অসীম একটু সান্ত্বনা পেল।

লেকের ধারে রোদ্দুর দেখে একটা জায়গায় বসল।

—কি রোদ্দুরে বসলে যে?

—ভাল লাগছে বসতে।

—শীত লাগছে?

—তা লাগছে একটু আধটু।

—শীত আসছে তাহলে!

—হুঁ।

—এই শীতে তোমার যেন কোথায় যাবার কথা ছিল?

—কোথায়?

—মনে করে দেখো।

—চিড়িয়াখানায়?

—তাছাড়া।

—ওহো, কানপুর।

—হ্যাঁ, যাবে না?

—না।

—কেন?

—সাগরকে পেয়েছি।

—কথা দিয়েছিলে যে আরেকজনকে?

—কথা দিয়েছি, কথা রাখব। এই শীতে না হয়, পরের শীতে দেখা হবে। দেখা একদিন করবই। তখন যদি ওর বিয়ে হয়ে যায়, ওর বরের সঙ্গেও আলাপ করব। ছেলে থাকলে ছেলেকে আদর করব।

—আর ও যদি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে?

—থাকবে না। কেননা ও আমার প্রেমিকা ছিল না, ছিল বন্ধু। আমার অন্যান্য ছেলে বন্ধুর মতোই একজন বন্ধু।

আজ কি হয়েছে! সবাই, অতীতের সব চরিত্রগুলোই যেন এসে কৈফিয়ৎ চাইছে। অসীম কি পাগল হয়ে যাবে? অসীমের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে মনে করে অসীম তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলল। সে স্পষ্ট শুনতে পেলো, কানের কাছে কেউ যেন ফিসফিস করে বলে উঠল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে।

অসীমের ধারণ ভয় করতে লাগল, সে বোধহয় আর তার বাড়ির রাস্তা চিনে যেতে পারবে না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে বাস স্টপে চলে এল। প্রথম যে বাসটা এল সেটা রুটনম্বার ৩৯/এ। উঠবে কি উঠবেনা ভাবতে ভাবতে বাস ছাড়ার মুহূর্তে লেডিজ সীটে সাগরকে দেখতে পেয়ে অসীম ফুটবোর্ডে পা রাখল। সে কিছুতেই বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না বলে এতক্ষণ ভয় পাচ্ছিল, এখন সাগরকে দেখে সে ভয় থেকে মুক্তি পেল।

অসীম ভাবল, সাগরকে হারালে চলবে না। ওকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। ওই পারে একমাত্র আমার ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে। ইচ্ছে হল সাগরকে গিয়ে বলে, আমি সারাদিন ধরে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখনও খুঁজে পাইনি। তুমি প্লীজ আমার একটু সাহায্য কর। তাছাড়া আমার সন্ধ্যের আগেই বাড়ি পৌঁছতে হবে।

দারুণ ভীড়ের জন্য অসীম সেই মুহূর্তে এক পা'ও ভিতরে যেতে পারল না।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল থেকে '৬৭তে হায়ার সেকেণ্ডারী ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি এস সি পাশ করেছেন। পূর্বে ছোট-খাটো পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখার আগ্রহ খুব। সম্ভাবনাও আছে।

আজকের কথা

বেলা দে

দেশে দেশে আজ কত পরিবর্তন! সমস্ত পৃথিবীটা পরিবর্তনের দোলায় দুলছে। পরিবর্তন আসছে আমাদের চোখের সামনে। সেদিনও পরিবর্তন আসতো আর আজো আসছে। পরিবর্তনের অপ্রতিরোধ্য গতিকে রোধ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সেদিনের তুলনায় আজকের পরিবর্তন অত্যন্ত দ্রুতগামী—আজকের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা এবং নিয়মকানুন কোন্ মুহূর্তে যে বদলে যাচ্ছে, তা কেউ কল্পনাও করতে পারলো না। অথচ পরিবর্তিত পদ্ধতিকে আমরা সযত্নে বুকে ধরে লালন করতে লাগলাম তাই আজকের দিনে মানুষের গতি যেখানে চন্দ্রাভিমুখী সেখানে কোনো পরিবর্তনই আমাদের আশ্চর্য করে না বরং আমরা মনে করি এটাই সভ্যতার প্রসাদ পরিবর্তন এবং অগ্রগতিই সূচিত করে যে সভ্যতার রথে চড়ে দুরন্ত বেগে আমরা এগিয়ে চলেছি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন এলো আমাদের নারী জগতে ও। সভ্যতার প্রথম আলোকে নারী-পুরুষ সবাই ছিল স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ। কারো গতি-বিধির উপর সেদিন কোনো নিয়ন্ত্রণের বেড়া ছিল না। কিন্তু অপ্রতিরোধ্য পরিবর্তন যেদিন এলো, সেদিন পুরুষ নিজের আধিপত্য বিস্তার করে নারীকে করলো বন্দিনী। সে পরিবর্তনও স্থায়ী হল না। তাই পরিবর্তনের প্রচণ্ড স্রোতে আবার সেই পুরুষই বন্দিনী নারীর মুক্তির জন্য তোলপাড় আরম্ভ করলো। নারী মুক্তির আনন্দে গা ভাসিয়ে দিলেন। পশ্চিমী দেশগুলিতে নারী স্বাধীনতার প্রথম উন্মেষ ঘটলো।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গিয়ে সে দেশে মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে চমকে উঠেছিলেন। এবং নিজের দেশের মেয়েদের বন্ধনমুক্ত উন্মোচনের সুকঠোর সংকল্প নিয়ে দেশে ফিরে এসে শুরু করলেন মেয়েলী আন্দোলন। সূচনা হলো নতুন যুগের জেগে উঠলো নারীসমাজ। নারী জাগৃতির নতুন ইতিহাস রচিত হলো। আজ আমরা সমানাধিকার পেয়েছি স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকেই। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে নারী জাতির এতটা অগ্রগতি অনেক দেশই কল্পনা করতে পারেনি। এই অগ্রগতি সারা বিশ্বকে বিস্মিত করেছে এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। তবে সেইসঙ্গে আমাদের দায়িত্ব এই স্বীকৃতির মর্যাদা রক্ষা করা—সেদিক থেকে আমরা নিশ্চয়ই পিছিয়ে পড়ব না। স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরে এই হোক আমাদের সংকল্প।

দৈনন্দিন

জয়শ্রী বসু

মাঃ, আর পারা যায় না। কড়াটা নামিয়েই ছুটতে হয় মেয়ের ভাগাদার আলমারি খুলতে, ওদের কাজের আমা কাপড় বার করে রাখা হয় নি। (গ্যাসটা বন্ধ করেছি তো না কামাই যাচ্ছে আবার)। একি ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে, সার্টের বোতাম নেই, উঃ। এত তাড়ার মধ্যে সেদাই করি কখন? বাথরুমে আবার পুত্রের গলা; কি হ'ল? সাবানটা নেই? ও তাই তো, আনানো হয় নি।

সাড়ে আটটা বেজে গেছে, খাবার দিতে বুঝি দেরী

হয়ে গেল। হিমসিম খাওয়া আমার এই সময়। কি হয়েছে, এত সব মুখ ভার কেন? ভাত সব পড়ে রইল যে, রোজ রোজ এক রান্না হ'চ্ছে? মুখে দিতে ইচ্ছে করে না? এই সময় কি খাওয়া যায়? আর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রান্না অত ভাবার সময় কোথায়?

নাঃ! অসহ্য! সত্যিই সংসার অসার। নইলে দেখুন আজ বাড়ীর কর্তা থেকে ছোটটি অবধি রাগ করে হাঁড়িমুখ করে বেরিয়ে গেলেন, আমি যে ওদের জন্যেই সারাদিন খাটছি তা কারুর খেয়াল নেই। আমার আর কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। কি করি? ও হোঃ! কার একটা চিঠি এল না সকালে? কোথায় আবার তাকে রাখলুম আবার খুঁজতে হবে, এইখানে টেবিলে ছিল, এ'কি রান্নাঘরে কখন রাখলুম?

আমারই চিঠি; খোলাই হয়নি, রাখা পিয়েছে। বেচারী বিয়ের পর কতদূর চলে গেছে। বাইরে কাজে যাচ্ছে আবার ঘরের সমস্ত কাজ, ওদেশে তো লোকজনও পাওয়া যায় না আবার। কি করে করছে প্রশ্ন করেছিলুম তার উত্তর দিয়েছে। চিঠিটা পড়তে পড়তে খুব উৎসাহী হয়ে উঠি। ও সব কাজ ভাগ করে নিয়েছে রুটিন করে, সপ্তাহে ও দিনে, তাই ওর কোনও অসুবিধে হয় না।

এই মুহূর্তে আমিও কাগজ কলম নিয়ে বসে পড়ি। আগে দৈনিক কাজের খসড়া তৈরী করি। তারপর তার সময় ভাগ করে নিই। যেমন সকালে ও বিকেলে এতক্ষণ রান্না ঘরের কাজ, তার সঙ্গে বিশ্রাম ও বই পড়ার জন্যেও সময় করে নিই। এরপর কাজের সাপ্তাহিক বিশেষ ভাগ করে নিই, ইস্ত্রি, সেলাই, চিঠি লেখা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার আরও একটা কাগজ নিই। এতে আমি সপ্তাহের রান্নার মেনু তৈরী করতে আরম্ভ করি। সকাল, বিকেল, দুপুর, রাত্রি, এই চার বেলার আলাদা আলাদা করে, যাতে আর একরকম না হয়। এর মধ্যে আবার মুস্কিল আছে যদি আবার একটা জিনিষ এর মধ্যে না পাওয়া যায় তাই আবার তার বদলেও আর একটা কিছু লিখে রাখি ভেবে।

আজ থেকেই এটাকে অনুসরণ করা যাক্। লেখা কাগজগুলো আজকের মতন ফিল এঁটে তুলে রাখি। কাল আরেকবার বসে পরের সপ্তাহের রান্নার মেনু তৈরী করব।

এখন আমার চিঠি লেখার সময়। দেখি কতগুলো চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি, সত্যি অনেক চিঠি জমে আছে। এর পর উঠে দেখি আজকের মেনু কার্ডে কি কি রান্নার কথা রয়েছে। আমার এখন সত্যি খুব ভাল লাগছে। মাথাটাও বেশ হাল্কা হয়ে গেছে, মনটাও খুব ঠাণ্ডা।

কটা বাজলো? না ঠিক ঘড়ির দিকে চেয়েই চলতে হবে। আশা করছি এর পর থেকে আর বাড়ীর লোকেদেরও মেজাজ ঠাণ্ডা থাকবে। ভবিষ্যতে আমাকে আজকের মতন নাকাল হ'তে হবে না। আশা করতে পারি, কি বলেন?

"আপনি কি খুবই চিন্তিত?"

চিত্রা নন্দী

বর্তমান কালকে কেন্দ্র ক'রে অর্থনৈতিক সমস্যা মানুষের মনে জাল বিস্তার করে আসছে। এ সমস্যা এত প্রবল থেকে প্রবলতর রূপ নিতে চলেছে যে মানুষের ধরা ছোঁয়ার ভিতরে তাকে একটি দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা হিসাবে রাখলে মনে হয় ভুল হবে না। কারণ সাম্প্রতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই বাজেটের প্রয়োজনীয়তা এত প্রকট রূপ নিতে বাধ্য হয়েছে।

আমরা যদি সামান্য জিনিষের প্রতিধানে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে চলি তবে পছন্দসই জিনিষ কি আমাদের মনে স্বস্ত হয়েই থাকবে?

আমাদের ইচ্ছার থেকে কখনও আয় বেশী হতে পারে না। কিন্তু আপনার, আমার বা সকলেরই দূরদৃষ্টি বলে দেবে এই সমস্যা থেকে কোন সুন্দর অথচ সীমিত লক্ষ্যে পৌঁছনও সম্ভব।

কিন্তু বাজেট অনুযায়ী চলা প্রতিটি মানুষের নিয়ম বিরুদ্ধ। বহুজনই এটা সমর্থন করেন না। আবার কেউ কেউ যথেষ্ট উৎসাহভরে আরম্ভ করেন কিন্তু সংকটকাল উপস্থিত হওয়া মাত্রই তাঁরা আবার পূর্বের রীতিতে ফিরে যান। আবার অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা চিন্তা করেই অনেকে বেশ কিছুদিন ধরে বাজেট চালান।

আগামী ভবিষ্যতের সুঠাম এবং আশাপ্রদ পরিকল্পনা-গুলি যাতে এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে সেদিকে নিশ্চয় আমাদের লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। অনেকের বৈশিষ্ট্যই হল হাত ভরে গেলেই তা তৎক্ষণাৎ খরচা করা। আরও সত্য এই যে, আয়ের অঙ্ক বাড়া মাত্র খরচও বাড়ে। তবে বাজেটপ্রথা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেই দেখা যায়। অতি ধনী পরিবারের এটা লক্ষ্য নয়। এক টাকা রক্ষা করা যাদের কাছে অতি প্রয়োজন বাজেট তাঁদের জন্য।

অতিরিক্ত আয় অথবা সীমিত আয় বাজেট সবক্ষেত্রেই করা যায়। অবশ্য স্বল্প আয়েতে বাজেট বেশী প্রয়োজন। মানুষের জীবনে সাময়িক ভাবে প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেওয়া আশ্চর্য নয়। সেক্ষেত্রে আপনি আবার সুস্থ, সবল জীবন যাপন করতে পারবেন এই জমানো টাকায়।

স্বামী-স্ত্রীর জীবনের চলার পথ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শুধু তাই নয়। সন্তানকেও সেই দিকে বুঝতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। যাতে পিতামাতার প্রতি তাদের মমতা এবং সহযোগীতা থাকে। তাহলে সংসারে চরম দুর্দশা উপস্থিত হলেও তারাও সাহায্যে অংশগ্রহণ করতে পারবে। অন্যথায় এর ব্যতিক্রমও আশা করা যায়। যদি আপনি আপনার আয় ব্যয় সম্বন্ধে চিন্তিত হন, তবে বাজেট করুন।

বিভিন্ন পরিবারের বিভিন্ন ধরণের আয় এবং লক্ষ্য আছে। আপনি দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আপনার ডায়রীর পাতায় ক্রমান্বয়ে সাজান। ঐচ্ছিক হলেও যেগুলি আপনার ক্ষমতার বাইরে সেগুলি বাদ দিয়ে দিন। তা ছাড়াও যে সব জিনিষ বাদ দিলে এমন কিছু ক্ষতি হবে না সেগুলিও কাটতে পারেন। এবারে প্রয়োজনীয়তা বুঝে একটা সুন্দর তালিকা তৈরী করুন।

আচ্ছা আপনি কি একটি বাড়ী তৈরীর স্বপ্ন দেখেন? আপনার সন্তান পড়ুক কোন নাম করা স্কুল-কলেজে? সব কিছুই পূর্ণ হতে পারে। কিন্তু বিনিময়ে কি মূল্য দেবেন বলুন তো?

আপনার প্রয়োজনীয় তালিকাখানি অবশ্যই বাস্তবসম্মত এবং যুক্তিপূর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী হিসাব রাখতে আপনি বাধ্য।

সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়ে বাকী কিছু টাকা যদি রাখতে পারেন তবে সেটা অনর্থ ব্যয় না করে কোন জমা প্রকার হিসাবে রাখতে পারেন। যেমন জীবন-বীমা, পোষ্ট-অফিস সেভিংস অ্যাকাউন্ট, National Savings Certificate ইত্যাদি।

বাড়ীর প্রয়োজনীয় জিনিষের খরচার প্রতি বাড়ীর গৃহিণীরই লক্ষ্য থাকে বেশী। কিন্তু তা যেন নিজের আয়ত্তাধীন হয়। এই বাজেট নির্ধারণে যাঁরা বিশেষ পারদর্শী তাঁরা শুধু যে প্রথম মাসেরই হিসাব প্রথম থেকে করেন তা নয়, প্রয়োজন বুঝে আগামী তিন মাসেরও হিসাব নিয়ে থাকে। এই হিসাব করা আপনাকে ব্যয় বাহুল্যের চাপ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং যথেষ্ট হিসাবী হতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত বা বিশদভাবে লিখিত বাজেট আপনার অসুবিধারই কারণ হবে। সহজ করুন। এগুলি আপনি শতকরা হিসাবেও লিখতে পারেন।

একটাকে যদি সাপ্তাহিক খরচ ক্রমান্বয়ে তালিকাভুক্ত করেন তাহলে বোধহয় বেশী সুবিধা হয়। যদি মাসান্তের আগেই আপনার সীমাবদ্ধ টাকা ফুরিয়ে আসতে দেখেন তবে শেষের কটা দিনগুলির খরচ পূর্বের তুলনায় কিছু কম করা প্রয়োজন।

এটা ধ্রুব সত্য যে আপনার বন্ধু অথবা প্রতিবেশী যদি আপনার থেকে বেশী সংসার মালিক হন তবে কখনো

সময়ে ভাল রাখতে যাবেন না। এটা মারাত্মক ভুল। অনেক সময় আমরা অতিরিক্ত ব্যয় ভুলে অনেক অপ্রয়োজনীয় বস্তুও কিনে ফেলি।

বর্তমানে কিস্তিতে জিনিষ কেনা চালু আছে। কিন্তু এর জন্য জীবনে অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। অনেক সময় পরিশোধ করার ক্ষমতা না থাকায় নানা ভাবে ঋণ বেড়ে যায়। অসাবধানতার বশে যে খরচা হয়ে যায় তার জন্যই এই বাজেট। সুন্দর এবং পূর্বপরিকল্পিত বাজেট আপনাকে একটা বস্তুগত নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবে এবং আপনার সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করবে।

মাটির সরায় আঁকা

ঘর সাজানোর মেয়েদের ছুটি নেই বললে কি ভুল হবে? মোটেই নয়। ঘর যেমনই হোক না কেন, তার সৌন্দর্য্য বিকাশ সাধনে এক মেয়েরাই উৎসাহী। বহুভাবে তারা ঘরের রূপ পালটায়।

আমি যে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করছি তা মোটেই ব্যয়বহুল নয়। একটি মাটির সরা প্রথমে ভাল করে ধুয়ে রোদে শুকিয়ে নিন। তারপর মিহিদানা শিরীষ কাগজ দিয়ে সরার উল্টোপিঠটা ভাল করে ঘষে নিন। তারপর কালো ভুষোর সাথে পাতলা শিরীষ গুলে (বেশ জলের থেকে শিরীষের ভাগ বেশী থাকে) সরার উল্টো পিঠে মাখিয়ে নিন। শুকোলে দেখুন খানিকটা কালো বার্নিশের মত লাগবে। এইভাবে আরও একবার মাখিয়ে নিয়ে শুকোতে দিন। রং যেন সব জায়গায় সমান হয়।

এবার আপনার অঙ্কিত কাগজখানিতে আলপিন দিয়ে আঁকার ওপর বরাবর ফুটিয়ে যেতে থাকুন। এখন ঐ কাগজখানি সরার কালো রং করা পিঠে বসিয়ে সাদা পিনওয়ালা পেন্সিল দিয়ে ফুটোর মুখে মুখে দাগ দিয়ে যান। এবার কাগজ উঠিয়ে সাদা শক্ত পেন্সিল দিয়ে কালো সরায় আঁকা সাদা বিন্দুগুলো যোগ দিন।

তারপর শক্ত তুলি করে অপর পাত্রে রাখা গলিত মিটসে অল্প করে আঁকার ওপর বুলিয়ে নিয়েই অপর এক তুলি দিয়ে সোনালী গুঁড়ো রং ঐ আঁকার ওপর দিয়ে বুলিয়ে যান আস্তে আস্তে। এমন ভাবে রং দিতে হবে যেন সোনালী রং ঐ শিরীষে আটকে যায়।

এবার সরার ওপর দিকে দুটি গর্ত করে তার মধ্যদিয়ে দেয়ালের মাঝখানে ঝুলিয়ে দিয়ে দেখুন কেমন সুন্দর লাগে। ঘরের রূপ অনেকখানি ফুটে ওঠে এর সাহায্যে। এটি শুধু যে আপনি দেওয়ালে টাঙাবেন তা নয়। রুচি অনুযায়ী এটি শো-কেসে কিংবা ঘরে কোন সেলফ্ থাকলে তাতেও রাখতে পারেন। এগুলি বসবার ঘরেই রাখে।

সরার উল্টোদিক ছাড়াও সোজা দিকেও করা যায় তবে সেটা কোলানোর থেকে সেল্‌ফে দাঁড় করিয়ে রাখলে দেখতে সুরুচি সম্পন্ন হয়।

প্রশ্নোত্তরের আসর

পরিচালনা—রাঙ্গাদি

অনু রায়, মেদিনীপুর—মুখের ত্বক সত্যিই সৌন্দর্য হানি করে। তুমি রাত্রে শোবার সময় ঈষদুষ্ণ জলে মুখটা ধুয়ে অল্প ক্রীম মেখে শোবে। এছাড়া নিয়মিত ছোলাপ খাবে যাতে পেট পরিষ্কার থাকে।

শিপ্রা শর্মা, হালতু—সংসারের ঝামেলা সহ্য করতে পারছ না, ইচ্ছে করছে যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে। তাতেই কি শান্তি পাবে? তার চেয়ে বরং সকলের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সংসারে যাতে শান্তি হয় তাই করবার চেষ্টা কর।

মহুয়া ঘোষ, হুগলী, রাধারাণী মিস্ত্রী, রামনগর, ২৪ পরগণা—চুলের যত্ন করো, নিয়মিত ভাবে চুলে রোজ বাতাস লাগাবার চেষ্টা করো।

অনিমা চ্যাটার্জি, উত্তরপাড়া সবিতা রায় চিঠিতে ঠিকানা নেই। **শিখা দাসগুপ্ত, চন্দননগর**—বেশ তো রান্নার প্রণালী যদি পাঠাতে চাও নিশ্চয়ই পাঠাবে তবে খুব পরিষ্কার করে লিখবে যাতে পড়তে পারি।

ছবি ঘোষ দস্তিদার, শ্রীরামপুর—তোমার কলেজের ছেলেটি হঠাৎ মারা যাওয়ায় তুমি অস্থির হয়ে পড়েছ—কি করলে শান্তি পাবে জানাতে বলেছ. বোন, মনটাকে স্থির রেখো যিনি তোমার একমাত্র সন্তানকে নিয়েছেন তিনিই তোমায় শান্তি দেবেন।

স্নেহ দাস, শ্রীরাম চ্যাং লেন, শালিকা—তুমি লিখেছ মেয়েরা সাজতে ভালবাসে বলেই তারা নানা ভঙ্গিতে সাজে কিন্তু তাই বলে তাদের যা তা ভাবে সমালোচনা করা উচিত নয়। তোমার কথা মানি কিন্তু যুক্তি দিয়ে যদি দেখাতে পারতে তাহলে নিশ্চয়ই দেখতে আজকালকার অধিকাংশ মেয়েরা যে ভাবে সাজসজ্জা করে পথেঘাটে চলাফেরা করে সেটা ঐতিহ্যময় একটি সভ্যদেশের পক্ষে নিশ্চয়ই সুস্থ মনোভাবাপন্ন কোনো অধিবাসীর পক্ষে ভাল নয়। মেয়েরা সাজতে ভালবাসে ঠিক কিন্তু তাকে মনে রাখতে হবে সৌন্দর্য যেখানে রুচিকে ছাড়িয়ে যায়, আড়ম্বর যেখানে বাহুল্যে পরিণত হয়—সেখানে রূপের শ্রী থাকে না। রঙে রসে, গন্ধে, বসনে ও ভাবভঙ্গিতে অন্যের চোখে বিভ্রম জাগিয়ে তোলাই নারীর কাজ নয়।

সবিতা বসু রায়, হালতু—ঠিক করেছ এবারে পুজোয় অযথা পয়সা নষ্ট না করে দুঃস্থ মা বোনেদের সেবায় সে টাকা দেবে। তোমার মত মেয়েই তো আজকের সমাজে প্রয়োজন বেশী। বেশ তো অন্যান্য দেশের উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু জানা থাকলে লিখে পাঠাতে পার

অনুপমা সাহা, বোলপুর—মেয়েরা অর্থাৎ যারা আজকের দিনেও চাকুরীজীবি নন এবং সংসারের কাজেও সারাদিন কাটান না, কাজ শেষ করে যে সময়টুকু পান, সে সময়টা নষ্ট না করে বাড়ী বসেই নানা ধরণের হাতের কাজ করতে পারেন। টুকিটাকি দিয়েও যথেষ্ট কাজ করা যায়। আমাদের পত্রিকায় এই ধরণের হাতের কাজের কথা আমি নিয়মিত বোনেদের জানাব। এই যেমন চিত্রা নন্দী পাঠিয়েছেন মন্টীর সরায় আঁকার কথা আশাকরি ওঁর লেখাটা এই সংখ্যায় ছাপার পর বোনেরা তুলতে পারবেন এবং আমাদের জানাবেন। সকলের চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

সুপ্রভা বসু রায়, রামরাজাতলা। তুমি লিখেছ বাংলা সাহিত্যে নারীর অধিকার নিয়ে প্রথম কে গল্প বা উপন্যাস লেখেন? দেখ, আমার যতদূর মনে হয় শরৎ-সাহিত্যেই নারীর অধিকারের রূপটি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শরৎচন্দ্র কেটি, লিলি বা শিশির চরিত্র অঙ্কিত করেন নি, শরৎসাহিত্য আমাদের বিমলা, সুচরিতা

বা পত্রিকার সভ্যপদ নেয় না। এদের জন্য এখানে লিটল ম্যাগাজিনের পাহাড় নেই, সভাসমিতি নেই, পার্টি নেই। নারীর দুঃখে সহানুভূতিসম্পন্ন সমাজসংস্কারকের হয় তো এদের জন্য দরদ উদ্রেকই হবে। কিন্তু শরৎসাহিত্যে নারীর কণ্ঠে এক অভিনব সুর বেজে ওঠে সহানুভূতির উত্তরে। সে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়; এই সহানুভূতির কোনো মূল্য নেই তার কাছে। আমরা রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্তর কাছে বলতে শুনেছি—"বাইরে থেকে বাইরের সামাজিক ব্যবস্থা দেখে তোমরা ভেবে মরে যাও, আমাদের মেয়েরা বাড়ীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে চিররাত কাজ করে বলে, তাদের মতো হীন আর বুঝি কোনো দেশেই নেই। নিজেদের একটু উঁচু করবার চেষ্টা কর, যদি কোথাও কিছু পত্রিকার গলদ থাকে, সে শুধু তখনই চোখে পড়বে—তার আগে নয়।" এ শুধু রাজলক্ষ্মীরই কথা নয়, পুরুষের জন্য শরৎসাহিত্যের সকল নারীরই অন্তরের কথা। হয় তো বা এ কথা প্রগতিশীল নারীজীবনের পক্ষে গৌরব নয়; তবুও অধিকার যে তার মোটেই নেই, শরৎসাহিত্যের নারী তা স্বীকার করে না। কমল প্রকৃতি দুএকটি নারীকে বাদ দিলে শরৎসাহিত্যের প্রায় সকল নারীই বাইরের প্রভুত্ব প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করে চাবির গোছা, রান্নাঘর বা ভাঁড়ারঘর নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে চায়। আজকের নারী-প্রগতির যুগে এই সব নিয়ে থাকার মধ্যে নারী জীবনের যথার্থ সার্থকতা আছে কি না জানিনা কিন্তু শরৎ সাহিত্যের নারী আপন নারীজন্মের সার্থকতা এর মধ্যেই সন্ধান করে।

রেখা ও রেবা সমাদ্দার, বনগাঁ। তোমরা রবীন্দ্রনাথের মূল্যপ্রাপ্তি কবিতাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছ। সুদাস মালীর বাগানে অসময়ে একটি পদ্মফুল ফুটেছিল। তার জন্য ক্রেতাদের মধ্যে খুব দাম কষাকষি চলল, কেননা তারা এই ফুলটি বুদ্ধদেবকে উপহার দিতে চাইছিলেন। এই ফুলটির জন্য ক্রেতারা এত দাম দিতে চাইছেন দেখে মালী ভাবলে যার জন্য এত গরজ করে এরা ফুলটি কিনতে চাইছে—এইফুলটি তিনি সে নিজেই কিনে না করে স্বয়ং বুদ্ধদেবের চরণে দেয় তাহলে কেমন হয়—এই ভেবে যেখানে ভগবান বুদ্ধ বসে আছেন সেখানে উপস্থিত হল। তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়তেই সুদাসমালী আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইল। বুদ্ধদেব জিজ্ঞেস করলেন কি প্রার্থনা তোমার! কিন্তু বুদ্ধের অপূর্ব সৌম্যমূর্তি দেখে মালী বিস্ময়ে ও আনন্দে এমনি অভিভূত হল যে তার ফুলটির জন্য তাঁর কাছ থেকে যে মূল্য কিছু নেবে এ কথা সে ভুলেই গেল—সে চাইল বুদ্ধের চরণের এককণা ধূলি মাত্র।

হীরারাণী হালদার, বাঁকুড়া। অঞ্জলি কোঙার, নারায়ণপুর, বর্দ্ধমান। হাঁ রান্না বা সেলাই বোনার টুকিটাকি পাঠাতে পার তবে পরিষ্কার করে লিখবে।

অনিমা বসাক, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট। চিঠির জন্য ধন্যবাদ। **সোনা দেবী ও দেবশ্রী সেন।** পরিষ্কার করে ঠিকানা লিখ।

অনিমা দে বিশ্বাস, হাওড়া। তোমাদের চিঠি পড়ে খুব দুঃখ পেলাম। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেই যে সবাই একটানা সুখশান্তিতে কাটাতে পারবে তা ঠিক নয়—কোনো মানুষের জীবনেই একাধারে সুখশান্তি আসে না, তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই বোন! মনটাকে শক্ত করে সংসারের কঠিন কর্তব্যে ব্রতী হও এই কামনা করি।

মিনু দে, হাটখোলা। তোমার ছোট বোনটি কারুর মতামত না নিয়েই নিজের মতে বিয়ে করেছে তার জন্যে তোমরা খুব অশান্তিতে আছ—কি করবে বল? যুগের পরিবর্তনে আজ সবকিছু বিপরীতমুখী—সে লেখাপড়া শিখেছে, বড় হয়েছে এমন অবস্থায় যদি স্বাধীন ভাবে নিজের মতে বিয়ে করে তার জন্য দুঃখ করো না বরং আশীর্বাদ কর তাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। অবশ্য তোমাদের বিশেষ করে বাপমার বা তাঁদের অবর্তমানে অভিভাবক যিনি তাঁর মতামত না নিয়ে বিয়ে করা একেবারেই ঠিক নয়। তাতে মঙ্গল হয় না অমঙ্গলই হয়।

৺সুরুচিবালা সেনগুপ্ত

জ্যোতির্ময়ী দেবী

একদা খ্যাতনামা লেখিকা সুরুচিবালা সেনগুপ্ত সম্প্রতি পরলোক গমন করেছেন।

একসময়ে নানা পত্র পত্রিকায় মেয়েদের কাগজ 'মহিলা' 'মহিলা মহলে' তাঁর গল্প উপন্যাস আমরা সকলেই দেখেছি। পাঠকপাঠিকার দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করেছিল তাঁর লেখা। আমার মত সেকেলে পাঠিকারা তা জানেন।

সুরুচিবালা ভক্তকবি রজনী সেন—কান্ত কবির ভগিনী একসময়ে সুলেখিকা ('প্রবাসী' 'ভারতী') অমৃতাসুন্দরী দাশগুপ্তার কন্যা ছিলেন কান্ত কবির ভাগিনেয়ী।

উত্তর বঙ্গের এই শিক্ষিত সাহিত্যানুরাগী পরিবারের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সুরুচিবালা পেয়েছিলেন। লেখার হাত তাঁর মধুর সংযত ও সুন্দর ছিল। আবার লেখাতে কঠিন ইঙ্গিতে সমাজদর্শনও দেখতে পাওয়া যায়। যা একালে বা সেকালে সহজে লোকে বলতে পারত না সাহস করে।—মেয়েরা তো নয়ই।

তখনকার বাংলা দেশে দেশাচার ও লোকাচারের কঠিন বৈধব্য আচারের বিধান তাঁর লেখায় পাই শিশু বা বালিকা ৬।৭ বছর বয়সের বিধবাকেও বৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনের লৌকিক বিধানে একাহার অর্থাৎ একবেলাই খাইয়ে রাখার নিয়ম। পরিজন বা অবোধ শিশু বিধবাগুলিকে একটি ঘরে আহার্য্য অন্নব্যঞ্জন খাইয়ে দিয়ে সারাদিন অনাচমনে মুখ না ধুইয়ে সেই উচ্ছিষ্ট অন্নখানির কাছাকাছি বসিয়ে খেলা করিয়ে ভুলিয়ে রাখতেন। সন্ধ্যাবেলা অবধি। তারপর সেই আধোয়া থালাতেই আবার অন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে তাকে "একাহার ব্রতটা" পালন করিয়ে নেওয়া হ'ত। 'শাস্ত্র সম্মত' বিধানে। 'আঁচানো' হয়নি তো! অর্থাৎ "আইনও আছে আইনের ফাঁকও আছে!" সুরুচিবালাই দেখিয়ে দিয়েছিলেন সাহসের সহিত। কোন সময়ে একবার এক পত্রিকায় তাঁর একটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য লেখা পড়ি—মনে হয়েছিল বেশ লেখেন তো মহিলাটি কে? সেই সেকালে তো অন্তঃপুর পর্দা। ইচ্ছা করলেও কারুর সঙ্গে কারুর পরিচয় সহজ হত না। সুরুচিবালা ও আমরাও সেই যুগের মানুষ অর্থাৎ ৭০।৮০ বছর আগের কাল।

নিজের প্রচার করেননি একালের লেখিকাদের মত। তাই আত্মজনেরাও তাঁকে প্রচারিত করেন নি এখনকার মত। তবুও কিন্তু সাহিত্যে ও চিত্রজগতে সুপরিচিত ছিলেন। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী মহিলা মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকায় যে তাঁর অভিনয় অপূর্ব হয়েছিল অনেকেরই মনে আছে। তারপর গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর তিনি বহুচিত্রে অভিনয় করেছেন। সর্বভারতীয় নারী ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি একবার য়ুরোপেও ভ্রমণ করে এসেছেন।

সংসার ও সমাজ জীবনে সকলের মতই শোক তাপ দুঃখ ভোগ করেছেন। কিন্তু কখনোই ভেঙে পড়েননি। শেষ কয়েকবছর তাঁকে শোক দুঃখের আঘাত অভিভূত করে রেখেছিল তাঁর এক পুত্রের বিয়োগে।

আমাদের দেশে খ্যাতনামা কবি ও লেখিকাদের আদি তো (১৮৫৫) স্বর্ণকুমারী দেবী—মানকুমারী, অনুরূপা, নিরুপমা, কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা, শৈলবালা, প্রভাবতী দেবী প্রমুখ নিয়ে। পরে আরো লেখিকা ও কবিরা এসেছেন সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। তাঁরাও সেই একই উত্তরাধিকারের দায়দায়িত্ব বহন করছেন কথা ও কাব্যে।

সুরুচিবালা এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তিনী লেখিকা এবং চিত্রাভিনেত্রী রূপেও অবিস্মরণীয়া। যাঁরা প্রায় সকলেই ঘরোয়া ভাবে শিক্ষিতা। প্রাচীনপন্থী সমাজের দুহিতা পত্নী মাতা।

সুরুচিবালা তাই আমাদেরই এক অতি আপনজন এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়া।

আরো কত দেবে নাথ,
আরো আরো কত দেবে গো !

অজয় চরণ দে

সন্ধ্যা উত্তরে গেছে অনেকক্ষণ। আষাঢ়ের আবেশ ভরা বিজলী আলোর রেশগুলি গঙ্গার বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। দূরের আকাশে কয়েকটি বড় বড় তারা হাল্কা মেঘের পর্দাগুলিকে সরিয়ে দিয়ে চেয়ে আছে তাদের দিকে অনিমিখে। মনের বাসনাটা, নীচে নেমে এসে যদি গা ভাসিয়ে দিতে পারতো স্নিগ্ধ শীতল এই আলোক লহরীদের সাথে আর ওদেরই মত তালের ছন্দ দোলায় দোল খেতে খেতে শুনতে পেতো মায়ের গান। —মা গান গাইতে গাইতে ডুবে গিয়েছিলেন, গানের মাঝে। কিন্তু আমার সারা মনটাকে যেন ছুঁয়ে বসেছিল, ওঁর গানের এই স্তবকটি—

"সুখ দুঃখ যত এসব অম্বিকা, তোরে ভুলাইতে দারুণ বিভীষিকা,
ইথে পেয়ে ভয়, যে তোরে ভুলে রয়,
তার কি কখনও (তোর) ওই অভয় চরণ মেলে।
...যাগো, নই মা আমি তোর
তেমন অবোধ ছেলে।"

আমরা ঘাসে পোয়ে বসেছিলাম ঋষিকেশ পরমার্থ নিকেতনের দেবীদাসের ঘড়ি-ঘরটির কোণ ঘেঁসে। বর্ষাতি রাত বলে কাছে কিনারে লোকজন বড় একটা কেউ ছিল না। তাই শীতল পরিবেশে ছিল শুধু মা গঙ্গার কল গুঞ্জন আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। মায়ের গানের অন্তিম রেশটুকু ওদের ওই ঐকতানে মিলে যেতে লাগল ধীরে ধীরে।.....

সহসা সাত আট বছরের একটি ছেলের হাত ধরে এক মহিলা এসে মায়ের পায়ে প্রণাম করলেন এবং ছেলেকেও প্রণাম করালেন। একটু পরেই এক ভদ্রলোক, তিনিও এসে মাকে প্রণাম করলেন। মা যেন কোন্ এক অজানা দেশ থেকে ফিরে এসেছেন, এমনি বেহুলো চোখে চেয়ে রইলেন ওদের পানে।

মহিলা বললেন, আমি তোমার কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটের মেয়ে ধরা, ইনি তোমাদের জামাই, আর খোকন সন্তাব্রত।

.....মা যেন হাতড়ে ফিরছিলেন স্মৃতির গহন ওহাটি। এবার মনে পড়তেই আনন্দের আতিশয্যে খোকনকে এক-হাতে অন্য হাতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, এই সন্তাব্রতকে দেখে এসেছিলাম মাত্র পাঁচ মাসেরটি। লাহিড়ী মশায়ের রোগ শয্যার পাশে ঘুমন্ত শিশু, যেন ঝড়ে উপড়ে পড়া আধ শুকনো গাছটির পাশে ছোট একটি কুন্দ ফুলের গাছে ফুটে আছে একটি কুন্দ ফুল। তা কবে এলি মা তোরা ঋষিকেশে, কটা দিন থাকবি তো ?

লাহিড়ী মশায় : আমার নীচে একেবারে জলের ধারটায় বসেছিলাম, শুনছিলাম মা আপনার গান। আপনার মেয়ে কিন্তু ঠিক চিনতে পেরেছিল, বলছিল আমায়, আমাদের অগস্ত্যকুণ্ডের আনন্দময়ী মা যে গো ; যিনি দশাশ্বমেধ ঘাটে বসে শুধু গানই গাইতেন, আর চোখের জলে ভেসে যেতেন। কত রকমে আমাদের বুঝ-প্রবোধ দিতেন, আর কত ভাবেই না সাহায্য করতেন।

মা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, কবে এলেন এখানে, ক'দিন আমরা আপনাদের কাছে পাব, তা তো বললেন না ?

লাহিড়ী মশায় : এসেছি এখানে মাত্র দু' দিন, উঠেছি গীতাভবন দু নম্বর যাত্রী নিবাসে। আর ফিরে যাব মা, কাশী তিনটি দিন পর। তারপর যদি ভগবান দয়া করেন,

ইচ্ছা আছে ভগবান কেদারনাথ বদরীবিশাল আর অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে যাব কাশীবাসীদের।

ধরা : আমরা তো মা জুলাই-এর মাঝামাঝি ফিরে আসছি কাশীতে। চল না মা কাশী, কটা দিন তোমায় কাছে পাব। কাশী ছেড়েছ কতদিন হয়ে গেছে। আমাদের কাশী যে আঁধার হয়ে গেছে তোমায় ছেড়ে। তা একটু মনও কেমন করে না গো তোমার ?

মা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সাথে বলেন, মোটে তিনটি দিন এখানে পাব তোদের! তবে কাশীবাসীর বাড়ি শুনে কত যে আনন্দ হচ্ছে। অন্য কোথাও যাবার কথা হলে, হয়ত আর কটা দিন আটকে রাখতাম। ....তা এখন তো দেখছি ঘড়িতে বেজে পঁয়তাল্লিশ, চল দেখি দেখে আসি তোদের যাত্রী-নিবাসের বহরখানি। কাল সকাল পাঁচটার আগে হাজির হব, আমাদের সত্যব্রতের মত ধামে—বলে কোলে বসা খোকনের সারা গায়ে স্নেহময় হাতখানি বুলিয়ে দিলেন।.....

ওদের ঘরখানি দেখে ফিরে এলাম আমরা আপন আস্তানায়।

পাঠ কীর্তন সেরে ঠাকুর শয়ন দিয়ে আমরা প্রসাদ পেলাম। কিন্তু নূতন পাওয়া এই সত্যব্রতদের ইতিহাসটি না শুনতে পাওয়া অবধি আমি মোটেই স্বস্তি পাচ্ছিলাম না, অথচ মা নীরব।.....

বিছানায় শুয়ে মা বলতে শুরু করলেন—

ধরা আমার মা ধরিত্রী গো অনি! তার কথা মনে হলে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ঐটুকু মেয়ের চরণে লুটিয়ে পড়তে চায় আমার সারা দেহ মন। অথচ তোমরা বলবে, বুড়ো মানুষের মুখে ঐ কচি মেয়ের প্রতি অমন ধারা কথায় ওর অবজ্ঞা হবে যে! আসলে কিন্তু মনুষ্যত্বের বিচারে বয়সটা কিছুই নয়, গুণটাই বড়।.....তাই সব কাজ চুকিয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে বলব, এখন ওদের পুণ্যময়ী কথা।.....

এক নাগাড়ে কম করে অন্ততঃ দশটি বছর এই ধরা মেয়েটিকে দেখেছি কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটে। শ্বশুর কুষ্ঠ রোগে শয্যাশায়ী স্বামী বিভূতি লাহিড়ীর মুখ পানে চেয়ে বসে থাকত; মামুলি এক আধ ঘণ্টা সময়, তাও নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কদাপি তাকে তার স্বামীকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে দেখিনি। দশাশ্বমেধের মত সদা কোলাহলময় ঘাট, তাতে কত অন্ধ আতুর ভিখারীর ছড়াছড়ি। তাদেরই এক ভিখারী বস্পতি এরা।

ধরার শ্যামলা রং, কিন্তু অপরূপ ওঁর উজ্জ্বল মধুর ছিপছিপে কলাবেলয়ী রূপ! ধরা ধরিত্রীর ক্ষুব্ধ সংস্করণ, সাধারণীকৃত তথা সর্বংসহা, কিন্তু ধরা ছোঁয়ার উর্ধ্বে, সকল সীমার অতীত। দু পাঁচ বছর গেলে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলাম, 'বজ্রাদপি কঠোর মৃদুনি কুসুমাদপি' এই ধরা মেয়েটিকে।.....আমাদের ভগবানটি যেমন কল্পনার অতীত অদ্ভুত বিচিত্র, তাঁর তৈরী পৃথিবীটায় কোন কোন প্রাণ বাস্তবিকই এমনই আশ্চর্য্য অপরূপ ও বিস্ময়কর, যে 'দেবা: ন জানন্তি', মনুষ্য তো কোন ছার!

সকাল সন্ধ্যায় স্নান জপ ও গানের জায়গা আমার দশাশ্বমেধ ঘাট। একদিন ঘাটে বসে আপন মনে গান গাইছিলাম। মা গঙ্গার দীপ আরতি শেষ হয়ে গেছে। সহসা চোখে পড়ল একটি ঝকঝকে মোটর গাড়ী থেকে প্রায় আশি বছরের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সুন্দর সুবেশ একটি যুবকের হাত ধরে নীচে নেমে এলেন। এসে বসলেন কিনা গলিত কুষ্ঠ রোগী ওই ভিখারীটির বিছানার উপর। কারা এঁরা, কেন এসেছেন, কী এঁদের কথা বলা, কেউ জানে না।.....কিন্তু রাত দশটায় জপ সেরে ঘরে ফিরার মুখে মেয়েটাকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, এই বুড়ো মানুষটি ওর বাবা কাশীরাজের মহারাজা বর্তমান নরেশ স্টেটের অবসরপ্রাপ্ত দিগপাল এডভাইসার, সাথের যুবকটি সহোদর ছোট ভাই, আসানসোলে বিখ্যাত এক কোলিয়ারীর ইঞ্জিনিয়ার। বাপ ছোট ভাইটিকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, মেয়ে জামাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু ধরা বলেছিল তার বাবাকে, শ্বশুরকুলের যথোপযোগী মর্যাদা নিয়ে যেদিন দাঁড়াতে পারবেন ওঁর

জামাই, সেদিন যাবেন তিনি তাঁর শ্বশুরালয়ে, মুখ দেখাবেন সভা সমাজে। তার আগে নয়, কোন মতেই নয়।.....এমন কি তাদের দেওয়া যথারীতি অর্থ সাহায্যের প্রস্তাবটিও সাশ্রুনেত্রে প্রত্যাখ্যান করেছিল ধরা, ওই একই যুক্তি দেখিয়ে। তাই বলে বাপ ভাইকে অশ্রদ্ধা বা অনাদর করে নি সে কোন কালেই। বরং বাপের চরণ-ধূলিটুকু পরম শ্রদ্ধাভরে আপন মাথায় ছুঁইয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে লেপে দিয়েছিল কুষ্ঠরোগী স্বামীর দারা দেহে।

জ্ঞানদীপ্ত মহামহিমান্বিত কাশীধাম, তথা ঘন কৃষ্ণময়ী ধ্বনিকার অন্তরালে গহন গভীর অন্ধকারময় জগৎ নরক কাঁদ রহস্যময়ী, যেমন আলোর দিব্যোজ্জ্বল প্রকাশ তেমনি ঘনঘোর আঁধারে ঢেকা। কোন্‌ বয়সের সুশ্রী মেয়ে মানুষ, পতি যার গলিত কুষ্ঠরোগে ভগ্নস্থিত, তার অসহায় পথের ভিখারী, তাকে বিপথে নিয়ে যেতে প্রেত পিশাচদের আবার অভাব—বৃন্দাবনের রাজা কাশীতে? কত ছল, কত চাতুরি, কত কৌশলের জাল বিস্তার। কত ধনীর দান পুণ্যের খয়রাতী, কুটনী বুড়ীদের কত না মনোসোনা। কোঁটা তিলক কদাক্ষের বহরে দাম্ভ মেকে অকপটতার ভণ্ড তপস্বীদের কত না মায়াকান্না, তাকে ঘুকে নিতে কত না সলা-পরামর্শ, ষড়যন্ত্র।

আমি ধরার কাছে এসে বসলে, অথবা কচিৎ কোন কারণে ধরা আমার কাছে এলে, সব খুলে বলত—আলো আঁধারে ছাওয়া তার দৈনিক জীবনের ঘটনা-পঞ্জী।

ধরা আমাকে মা বলত—আমি ধরাকে আপন পেটে ধরা মেয়ে বলেই জানতাম; অথবা সাবিত্রী বলে মনে মনে পূজো করতাম। আমি আমার মেয়ে জামাইকে যখন যা মনে আসত, সে নামেই ডাকতাম আদর করে। কখনও বেহুলা লখীন্দর, কখনও নল দময়ন্তী, শ্রীবৎস চিন্তা বা ধরা রোগ। কিন্তু ভেবে পেতাম না, কী দিয়ে সেবা করব এই যুগল বিগ্রহকে.....দিনে একটি বার ভাত খাই, তাও পূর্ণিমা অমাবস্যা একাদশী তারপর এটা সেটা পাল পার্বণ ত কাশীতে লেগেই আছে, যার জন্য হাঁড়ি চড়ত না। তবু যখন যেটি ধরতাম, তাকে তত্ত্ব চচ্চড়ি খোল অম্বল, পাতার দোনায় বা মাটির পুরুষা করে আগে নিয়ে দিয়ে আসতাম আমার মেয়ে জামাইকে, পরে ঘরে ফিরে এসে প্রসাদ পেতাম। যদি কোন কারণে ধরা রোগের সেবায় কোন কিছু পৌঁছে না দিতে পারতাম কোন দিন, সে দিন আমার নিজের আহারটাও কটু বিস্বাদ বলে মনে হত।.....ধরা অন্ত সবার কাছে অধরা থাকলেও আমার কাছে কিন্তু সম্পূর্ণ ধরা দিয়েছিল!

বোধহয় দশটি বছর পরে, দেখা গেল ধরার দেহে মাতৃ লক্ষণ। সলজ্জ স্নান নত নেত্রে আমার পা দুখানিতে তার হাত দুটি রেখে ধরা বলেছিল গুরু কঠোর ত্যাগ বৈরাগ্যের অনুশাসনেই কাটিয়ে দিলেন এতটা দিন। কোন সাধেই মিটল না মা, ওঁর সন্তা জীবনটিতে। বিয়ের মাত্র দুটি বছর পরই যে এই কালে কুষ্ঠ রোগ প্রকাশ পেয়েছিল ওঁর দেহে।.....

মাত্র দুটি ভাই বোন ওরা, বাপের অতুল বিষয় সম্পদ। তাই ওর বাবা, মা বাপ হারা, তিন কূলে কেউ নেই, নিতান্ত গরীবের ছেলে, অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করা কৃতী চাত্রটিকে ধরা জামাই করে নিয়ে এসেছিলেন। কথা হয়েছিল বছর নামকরা এক বড় ব্যারিষ্টারের স্নেহ ছায়ায় প্রবেশনারি শেষ করিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে স্বাধীন ভাবে প্রাকটিশ করতে পাঠাবেন। কিন্তু দৈবগতিকে নির্দিষ্ট সময়ের মাত্র দুটি মাস আগে এই বিপর্যয়। আর অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে জামাতা বাবাজী যাত্রা করেছিলেন কাশী নিরাভরণা পত্নী ধরা সহ, শ্বশুরালয়ের সমূহ ধন সম্পদ বিভব বিলাসকে দু হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে।

গাহিড়ী মশায় শুধু যে শ্বশুরবাড়ীর সংস্রব ছেড়েই এলেন, তা নয়। বিদ্যা বুদ্ধি তাঁর যতই থাকুক, এই কুৎসিৎ কাল ব্যাধির অজুহাতে সমগ্র সভ্য সমাজের সংস্রব থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে নিলেন। ফলে ধীরে ধীরে তাঁদের শিরোধার্য করে নিতে হয়েছিল দারিদ্র্যের অন্তিম সীমা—ভিক্ষাবৃত্তি। ....অবারিত উদার আকাশের তলে চির ভিখারী বিশ্বনাথের কাশীতে সমূহ জন জনার্দনের আশ্রয় তাঁরা নিয়েছিলেন। এমন কোন বাড়ি বিশেষের

বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত আদিপত্যের কনক কোষাগার হতে দু হাত পেতে দয়ার দান পাবার তুলনায় আঁজলা ভরা দশাশ্বমেধের গঙ্গাজল ছিল তাঁদের কাছে অধিক আদরের বস্তু।

বাইরের মান সম্ভ্রমের মুখে ছাই দিয়ে সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন ভিতরের শৈল আর মর্যাদাকে। বরণ করে নিয়েছিলেন আমার ধরা দ্রোণ, বড় কথা শীত গ্রীষ্ম ভয় ভীতি ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি কত কি সব বিষ কাঁটার বন। অথচ অমি গো, এমনি আশ্চর্য্য আমার নীলকণ্ঠ বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য যে শান্তি তৃপ্তি আনন্দ ও প্রেম রূপে রকমারি হত পারিজাত ফুল আর অমৃত ফলের উদ্ভব হয়েছিল ওই বিষ কাঁটারই নন্দন বনে!

সত্যব্রত যখন পাঁচ মাসেরটি, তখন কাশী ছেড়ে এসেছিলাম আমি। কালস্রোত বয়ে চলে অবাধ গতিতে, আমরাও বয়ে চলেছি তার স্রোতধারায়। জানিনা কেমন করে সাবিত্রী মা আমার তার পতিদেবতাকে রোগমুক্ত করে নিয়ে এসেছে আজ হৃষিকেশ স্বর্গাশ্রমে।....

সব শুনে বিস্ময়ের অবধি থাকে না আমার। যতক্ষণ ঘুম না আসে, ভাবতে থাকি এই ভিখারী দম্পতির কথা! সহসা মনে পড়ে এঁদেরই কথা মাকে বলতে শুনেছিলাম, সঙ্গোত্রজী ফিরত পথে ধরালীতে কালী কমলী বাবার ধর্মশালায়। যমুনা ও মায়ের নিভৃত আলোচনা প্রসঙ্গে শুনেছিলাম বটে, পাতিব্রত্য ও আধ্যাত্মিকতা কেমন করে এই ধরিত্রীকে ধরে রাখে, রাখে তাকে বাঁচিয়ে।

• • •

পরের দিন ভোর হতে না হতেই হাজির হয়েছি ধরালের ঘরের সামনে। দেখলাম ওরা তিন জনে পাশের শিব মন্দির থেকে নীচে নেমে আসছে।

ধরা পূজার থালি ও গঙ্গাজলের ঘটিটি ঘরের বারান্দায় রেখে মাকে প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। খোকাও প্রণাম করল। লাহিড়ী মশায় প্রণাম করে বললেন, আপনার স্নেহে আমায় আর সতুকে ঘুম থেকে তুলে দিল একেবারে শেষ রাতে। তারপর প্রাতঃকৃত্য করিয়ে নিয়ে আমাদের তৈরী করে রেখেছে, যেন আপনারা এলেই নিশ্চিন্তে বসতে পারি আপনাদের কাছে।

মা : ধরা আজ তোরা আমাদের ঘরেই প্রসাদ পাবি

সতুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলেন, সতুধন, মামুর সাথে তোমরা যাও আমাদের ঘরে। সময় হলে দুবটী কারো হাতে ঘাতে পাঠিয়ে দেব. গীতা ভবনের দোকান থেকে, তারই একটা ব্যবস্থা করে আমিও একটি যাচ্ছি ঘরে।

সবে বেলা দশটা। এরই মধ্যে ঠাকুরকে নিবেদন করে আমাদের সবার প্রসাদ পাওয়া হয়ে গেছে।—তার হয়েছে ধরাত্রোণের ব্রত উদ্‌যাপনের কাহিনী।

.....সে দিন ছিল নাগ পঞ্চমী। টিপ টিপ বৃষ্টি, সারা পথ ঘাট জল কাদাময়। বিকেলের দিকে বৃষ্টিটা থামতেই কোথা থেকে দুটি বেদে বেদেনী দশাশ্বমেধে এসে উপস্থিত।

বিশ্বনাথের কাশীই আমাদের আশ্রয়, কিন্তু আমরা ভিখারী। আর এরা বেদিয়ারা আশ্রয়ের পরোয়া করে না—যাযাবর, নিজের রোজগার করে সংসার চালায়—ভিক্ষা করে না।

আমাদের ভিজে স্যাঁতসেঁতে নোংরা ছেড়া বিছানাটার পাশ ঘেঁসেই ওরা ঝুড়ি ডালা করে বসল : আপন তরীতরা সহ ছোট বড় দুটি ঝিল্লী নামিয়ে। বেলা তখন চারটে বাজে হবে।

আকাশে মেঘের আড়ম্বর থাকলেও এক ঝলক রোদ এসে পড়েছে। বেদের হাতে তুবড়ি বাজে, আর বেদেনীর হাতে কালনাগিনী বিশাল ফণা মেলে দুলতে থাকে তুবড়ির তালে তালে। পাশের বড় ঝিল্লীটির ডালা খুলতে বেরিয়ে এল শঙ্খচূড় এক জোড়া। এমন চকচকে উজ্জ্বল গায়ের রং আর সরোষ গর্জন ওদের মনে হচ্ছিল যেন এইমাত্র কোন পাহাড় থেকে তাজা ধরে নিয়ে এসেছে তিনটি কাল সাপকে। বিষদাঁত একটারও ওপড়ান হয়নি। তিনটি মহাকালকে কখনও উবু হয়ে বসে, কখনও চাঁটু গেড়ে, কখনও একটি বা দুটি চাঁটু সামনে দোলাতে

দোলাতে দুটি হাত দশটি অঙ্গুলির নৃত্যচঞ্চল অপরূপ গতি-ছন্দে নাচাতে থাকে তিনটি কাল নাগ নাগিনীকে, নিজে কাল ভুজঙ্গিনী সম ললিতলাস্যে কৃষ্ণতনু বেদেনী।

লোকে লোকারণ্য। কাশীতে দেশী বিদেশী কত মানুষই আসে, কিন্তু অমন অপরূপ রূপসী বেদিনী, সারা অঙ্গের ভাঁজে ভাঁজে রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে ওর। এমন নিপুন হাতে, তাও বিদ্যুৎগতি যেমনকে তেমন মজুদ, তিন তিনটি জলজ্যান্ত কাল সাপ নিয়ে খেলা, কেউ কখনও দেখা ত দূরের কথা শোনেওনি কানে। লোক যেন ভেঙে পড়েছে, উৎকট আগ্রহে। তার মাঝ আবার নাগ পঞ্চমী। তাছাড়া দারুণ দিনের পর দুইয়ের বিরতি হতেই লোকেরা হাঁফ ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছে, তাদের নিস্তাকার মুখ। আকর্ষণ দশাশ্বমেধ ঘাটে। রাস্তার ওপাশের পশ্চিমের পাকা বাড়ীগুলির গলি ঘুঁজি ডিঙিয়ে এপাশের অশথ গাছটির ঘন পাতার আবরণটি ভেদ করে অস্তগামী সূর্যের কিরণরাও এসে যোগ দেয়, বেদে বেদেনীর নিপুণ হাতে সাপ খেলা দেখবে বলে।

বেদে যেন আত্মহারা মত্ত বিহ্বল। তার মুখে ডুবড়ি বেজে চলে অদ্ভুত আবেগে অনুপম ছন্দের তরঙ্গ তুলে। দর্শকেরাও যেন সব মন্ত্রমুগ্ধ। ডুবড়ির তালে তালে শ্বাস প্রশ্বাস বয়, বুকের স্পন্দনটাও বুঝি ওদের ওই একই তালে একই ছন্দে উঠে পড়ে। ওরা ভেবে ঠিক করতে পারে না, মাথা গুলিয়ে যায় যে সাপেরা দেখবে ওরা, না বেদেকে দেখবে অথবা দেখবে বেদেনীকে।

কালনাগিনীকে খেলাতে খেলাতে যুগল শঙ্খচূড়কে সামলান কঠিন হয়ে উঠে। তাদের উগ্র ফণার দোলনিও হিংস্র চোখ দুটির দিকে বেদেনী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার ! এই ভিলেকমাত্র অবসরে কালনাগিনী লোকব্যূহের পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ে লাহিড়ী মশায়ের বিছানায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে কালকূট বিষ ঢেলে দেয় প্রচণ্ড দংশনে।

ডুবড়ি ছুড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বেদে। ক্ষীপ্রহস্তে শঙ্খচূড় যুগলকে গলা টিপে ধরে ঝিনীতে বন্ধ করে ফেলে সে।

কালনাগিনীর কাল ফণা বেদেনীর বক্ষস্থলীতে বন্ধ হয়। বেদেনীর হাতটি জড়িয়ে ফেলে কালনাগিনী প্যাঁচের পর প্যাঁচে। যেন কৃষ্ণ কম্বলরাশি পরিয়ে দিয়েছে কেউ তার সুডৌল হাতখানিতে। চারিদিকে হায় হায় ধর ধর মার মার চীৎকার।....

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেছে। পথে পড়া ভিখারী, পতিত কুষ্ঠ রোগী, দুচার দশটি কেন, দু চার দশ হাজার, থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি ? কে তাদের জন্য মাথা ঘামাবে !....উধাও হয়ে সরে পড়েছে বেদে বেদেনী, তল্পী তল্পা গুটিয়ে। ফেলে রেখে গেছে শুধু দুটি দুতরো ফুল, ক টুকরো কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গা, সাপের দেহের চাপ লেগে হয়ত ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, টুনকো কাঁচের চুড়ি কটা গাছা, আর ছেঁড়া ন্যাকড়ায় জড়ান ছোট্ট একটি পুটুলি।

....আমরা যেন শ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম সব কথা, তন্ময় হয়ে। দাদু ঘুমিয়ে পড়েছিল মায়ের কোলে মাথাটি রেখে।

ধরা বলতে থাকে কম্পিত কণ্ঠে—সেদিন সেই হিমশীতল নির্মম মুহূর্তে মনে মনে ভেবেছিলাম ওই মহামহিমময়ী সাবিত্রী বেহুলা আদি দেবীদের নামে যে তুমি আমায় ডাকতে আদর করে তাঁদের অদৃষ্ট লিপি আমার অদৃষ্টেও ঘটে গেল। ঘটে গেল তাঁদের জীবন নাটকের প্রথম অংশটি কিন্তু আমি চুকরে কেঁদে উঠে বলেছিলাম, তোমারই নাম করে—মাগো, এবার পরের বাকী অংশটাতে কী ঘটবে বলে দাও মাগো বলে দাও।—ওর অসাড় স্পন্দনহীন দেহখানির পাশেই ঘুমিয়েছিল খোকন। ওইত এখনও চিতা জ্বলছে হরিশ্চন্দ্র ঘাটে। দেখে মনে পড়েছিল, হরিশ্চন্দ্র শৈব্যা রোহিতাশ্বের সেই যুগ যুগ ভয়ঙ্করী কালরাত্রির কথা—আর আজ তারই কিছুটা অদল বদল করে তারই প্রতিচ্ছবি দশাশ্বমেধ ঘাটে—আমারই সোনা অদৃষ্টে ঘটে গেল ! কিন্তু এর অবিশ্যি ফলাফলটি, কী দাঁড়াবে,—মা, মা গো ! ....ধরা কণ্ঠস্বরকে সংযত করতে চেষ্টা করে,.....কয়েকটি মিনিট নীরবে কেটে যায়।.....আবার শুরু হয় কাহিনী—

রাত্রির শেষ যাম। মা গঙ্গার শীতল বাতাসে রাক্ষসীর চোখেও তন্দ্রা এল। তন্দ্রার মাঝে স্বপ্ন দেখলাম, বেদেনী আমার পাশে এসে বসল। আমি আমার সকল বোধ শক্তি তখন হারিয়ে বসেছিলাম : তাই তাকে দেখে আমার মনে ভাল মন্দ কোন কিছুরই রেখা পাত করল না। শুনলাম বলছে সে, ধুতরো ফুল দুটি তোর সোয়ামীর কপালে ছুঁইয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিবি, আর ভাঙ্গা কাঁচের চুড়ির টুকরোগুলো তোর হাতে বাঁধা এয়োতী লাল সুতোয় তোর বাঁধা, আছে না? ওতে ছুঁইয়ে চুড়ির টুকরোগুলো গঙ্গার জলে চুবিয়ে দিবি। আর এই নে সিঁদুর পরিয়ে দিচ্ছি তোর সিঁথিতে—বলে তার আপন হাতের আঙুলটি বুলিয়ে নিল নিজের সিঁথিতে আর সিঁদুর মাখা অঙ্গুলিটিতে আমার সিঁথিতে এঁকে দিল সিঁদুর রেখা। তার পর হঠাৎ চকিত আমার মুখখানি আলগোছে তুলে ধরে আদর করে বলল—তুলো ভাগ্যিমানী মেয়ে, সোয়ামী তোর ভাল হয়ে যাবে। কাল সকালেই দেখবি সব কুষ্ঠের দা সেরে গেছে তার। সাদা দাগ দু একটা যা থাকবে, তার জন্যে ভাবিস নে। বাবি তোরা আসছে বোশেখ চৈত্র নাগাদ কেদারনাথে। ধামের বেতস কুণ্ডের জলে নাইলেই ওর রোগের নাম নিশানা কিছুই আর থাকবে না। তার পরে কাশীতে এসে বিশ্বের অন্নপূর্ণার পুজো দিবি। খরচা কিছু রেখে গেলাম ছাকড়ার পুটলিতে বেঁধে, ওতেই শুরু করবি গেরস্থালি। বলে একটা দমকা হাওয়ায় আমার সারা শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেন উড়ে চলে গেল ঝড়ের বেগে।—···

ঘুম ঝেড়ে উঠে সোজা হয়ে বসলাম।·····ওর পায়ে হাত দিয়ে দেখলাম, হিম শীতল দেহে যেন উষ্ণতার আভাস। বুকে হাত দিতে মনে হল জল-স্পন্দন, নাকে যেন শ্বাস প্রশ্বাস—বুঝি অকাতরে ঘুমোচ্ছেন প্রভু আমার।—···আমি আনন্দে দিশেহারা, অথবা দুঃখ-শোকে হতচেতন আমি, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।·····আমার সকল ব্যথার পূজা কি সার্থক হল আজ? বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাই কি বেশ বেদিনীর বেশ ধরে প্রভুর আমার নূতন জীবন দান করে গেলেন? অথবা—আমি, আমি পাগল হয়ে গেছি?·····প্রভুর গায়ে হাত দিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু সাহস পাই না। ভাবি, কত কাল পর, শান্তিতে একটু ঘুমোচ্ছেন। পিশাচীর পরশে সেই শান্তির ঘুম টুকু যদি ভেঙ্গে যায়।·····অথবা যদি দেখি, সব শরীর তাঁর হিমশীতল, নিস্পন্দ। সুখ স্বপ্ন আমার কুটি-কুটি হয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় যদি!·····

কিন্তু বেদেনীমায়ের স্নেহ মধুর ঢল ঢল মুখখানি মনে পড়তেই, মনে বল পাই। তখনই উঠে পড়ি···ফেলে যাওয়া বাবার কানের ধুতরো ফুলদুটি পরম শ্রদ্ধা ভরে তুলে নিয়ে বুলিয়ে দিই ওঁর মাথার কপালে, মায়ের হাতের চুড়ির টুকরোগুলি ছুঁইয়ে নিই আমার এয়োতিতে। তারপর আস্তে ধীরে ফুল দুটি ভাসিয়ে দিই মা গঙ্গার বুকে, আর চুড়ি টুকরোগুলিকে অঞ্জলিতে রেখে চুবিয়ে দিই মা গঙ্গার গভীর জলে। ফিরে আসি এক আঁজলা শান্তি জল নিয়ে, ছিটিয়ে দিই ওঁর সারা শরীরে ও বিছানায়। এবার ওঁর পায়ে মাথাটি আমার রাখতে পরশ পাই উষ্ণতার। গায়ের ছেঁড়া চাদরটা সরিয়ে দেখি, হাত দেখি, হাত চোখে জল করে। বিশ্বাস করতে পারি না যে দেহের ওঁর সকল ক্ষত শুকিয়ে ভরাট হয়ে গেছে। অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র কয়েকটি সাদা সাদা দাগ। সব শেষে গাঁট বাঁধা ছাকড়ার পুটলিটি খুলে ফেলতে দেখি তাতে রয়েছে নগদ কিছু টাকা—আর অতি উজ্জ্বল এক টুকরো জলজলে পাথর—হয়ত সাপের মাথার মাণিক।····

পরশু এসেছি আমরা কেদারনাথ বদরীনাথ যাত্রার শ্রীধামে হয়ে। মাগো তোমাদের আমাই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। অদ্ভুত অঘটন ঘটনার কথা কী-আর বলব মাগো, ওঁর অসুখত আগেই ভাল হয়ে গিয়েছিল শরীরে সাদা সাদা দাগ যে কটি অবশিষ্ট ছিল কেদারে রেতস কুণ্ডের পূত পবিত্র জলের স্পর্শে তার চিহ্নমাত্রও রইল না। মাগো, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাই বেশে বেদেনী সেজে এসেছিলেন—পাপিনীর পাপ মোচন করতে, আর পরম সার্থকতায় ভরে দিতে আমার প্রভুর শুকনোর তপস্যাকে

সারাটি দিনও কেটে গেলেই রাত দশটা বাজতে চলল, অথচ কেউ কাউকে ছেড়ে দিতে রাজী নয়, এমনি মনের অবস্থা আমাদের। শেষ পর্যন্ত মা-ই জোর করে ধরা-ধরি পাঠিয়ে দিলেন। ঘুমন্ত সতুকে আমিই বুকে করে তুলে নিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলাম পাঠশালায় ওদের ঘরে।

এক টুকরো কাগজে ওদের ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যাবার সময় ধরা বলে গেল, কাশীতে শ্বশুরবাড়ী মহল্লায় আমরা বাড়ী নিয়েছি। উনি গত পুজোর পর থেকে বারানসী দেওয়ানি আদালতে ওকালতিতে যোগ দিয়েছেন আর বাবা বিশ্বনাথ মা অন্নপূর্ণার কৃপায় এই সামান্য কয়েক মাসের মধ্যে বেশ সুনামও পেয়েছেন মাগো—এ যে তোমাদের দশজনেরই আশীর্বাদ।.....সব শেষে মায়ের দুটি হাতে ধরে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে বলে গেল ধরা, তা যেখানেই থাক না কেন এবার থেকে কাশীতে এসে দু পাঁচ মাস কাটিয়ে যেতে হবে তোমাদের প্রতি বছর। তারপর আমার দিকে তার সেই দারুণ জগতটার করুণা রসে উপছে পড়া চোখ দুটি তুলে বলেছিল—এখনও আর অনুদার পরের চাকরি করতে হয় না: কিন্তু অবসর জীবনে কাশীতে চরি স্টাকা. এই লেখা, সংসর্গ কোনটারই কোন অসুবিধা বা অভাব হবে না। খেলার সাথী হবে ভাগ্নে সত্যব্রত আর সেবার ভার নেবে ছোট বোন ধরা।

আমি নীরবে চেয়েই ছিলাম, জবাব কিছু দিতে পারি নি। একবার দেখছিলাম চেয়ে আমার বোনটির পানে, আবার আমার মায়ের পানে। আমার সারা অন্তরাত্মাটি যেন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছিল, অঘটন ঘটন পটিয়সী আমার মায়েদের যদি কৃপা হয়, তবে কোনটা অসম্ভব নইলে আমার মত হতচ্ছাড়া অপদার্থ একটী অনাত্মুষের ভাগ্যে কখনও কি সম্ভব হত, দেবতাত্মা হিমালয়ের চারধাম পরিক্রমার সৌভাগ্য, আর সমগ্র তীর্থ পথটির প্রতিটি মুহূর্ত কত না রত্ন মানিকের আহরণ করে নিয়ে এসে, তা কিনা হিমতীর্থের শেষ পাঠশালা এই হৃষিকেশে এসেও কুড়িয়ে পেতাম ধরা দ্রোণের মত ঋষি দম্পতি ভগিনী ভগিনীপতিকে, আর সত্যব্রতের মত তাপস কুমার আমার ভাগ্নেটিকে

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে আমার ভাবসমাহিত মন, গেয়ে উঠল একটি গান—

আরো কত দেবে নাথ
আরো আরো কত দেবে গো।.....

• • •

"ভগবানের নিকটে কি চাহিব তাহা আমরা জানি না। আমরা কি প্রার্থনা করিব তাহাই অহরহ পরখ করিতেছি। আজ বলিতেছি খেলা, কাল বলিতেছি ধন, পরদিন বলিতেছি মান—এমনি করিয়া সংসারকে অবিশ্রাম মথন করিতেছি। কিসের জন্য? আমি যথার্থ কি চাই, তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য। মনে করিতেছি—টাকা খুঁজিতেছি, বস্তু খুঁজিতেছি, মান খুঁজিতেছি কিন্তু আসলে আর কিছু নয়, কাহাকে যে খুঁজিতেছি তাহাই নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। আমার প্রার্থনা কি তাহাই জানি না।

যাঁহারা অন্তরের প্রার্থনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন তাঁহারা বলেন—একটি মাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই—"অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমার নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র, তোমার যে প্রসন্ন মুখ তাহার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।"

—রবীন্দ্রনাথ

নিধিরাম

দ্বিজেন্দ্র সান্যাল

ব্যতিক্রম হ'লেই একটু ভাবনায় পড়তে হয়। তাই হোল। ঘুম আসে না, সঙ্গে সঙ্গে আসে বিরক্তি। ভাবি, এমন তো হয়ই, তবে মাথা গরম করা কেন? সন্তিকারের নেতা আর ক'জন হয়। এক দল শ্রাবক জোটাতে পারলেই তো নেতা! সোনায় সোহাগা হয় যদি অতিরঞ্জন, অতিশয়োক্তির সঙ্গে দুটি বাহু অনুক্ত ভাষণ, নেতার দুলিতে ও দুলিতে ভক্তরা 'অহো প্রভু' বলে সাধুবাদ (!) করলে আরো পাঁচ জন সমধর্ম বলযুক্ত হয়।

কিছু বিরক্ত ভক্ত শ্রবণে আসে না, প্রতিবাদ না ক'রে, তথাকথিত ভদ্রতার খাতিরে মৌন সম্মতি প্রদান ক'রে। ফলে স্পষ্ট বাড়ে, ক্রমশঃ ঘোর মিথ্যা সাদা মিথ্যায় পর্যবসিত হয়

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের একটি বড় সহর নানা প্রদেশের বিদ্বান ও গুণিরা সমবেত হ'য়েছেন একটি "হলওয়াসা"র। বরযাত্রী তখনো। বিকালে সেখানেই বৈঠক হবে, 'নেতা' আসবেন পৌরোহিত্য করতে। সব ঠিক। অকস্মাৎ ফোনধ্বনি হইল তখন, সাজ সাজ সভ্যগণ, কর বস্ত্র সম্বরণ, নেতার্পণ প্রকোষ্ঠে সভা আয়োজন।

শ্রাবকরা আপ্যায়িত বোধ করলেন। একটি ভদ্রলোক তিনি একটি ব্যাপক সমিতির অধ্যক্ষ, বিদ্রোহ করে, যা তা বলতে আরম্ভ করলেন। কর্তাপদলেহীরা কানে আঙুল দিলেন, ভদ্ররা সাধুবাদ করলেন। এই সময়ে একটি চরিত্র সংশোধনী নারীমূর্তি আবির্ভূতা হ'য়ে, ঐ অধ্যক্ষ বিশেষকে ব'ললেন "আপনি অমন করছেন কেন, ওঁকে বলছি সব ঠিক করে দেবেন" এই বলে তিনি পিছু ফিরলেন—আহা! এমন এপিঠ-ওপিঠের সাদা বিরল। পাকা রং, কপালে কোথা থেকে কেশরস্ত তা হয়ত বোঝাই দুষ্কর হোত, যদি না, দয়া করে, কণক প্রলেপে, পাতা কাটার মত কেশ-বিকার সৃষ্টি করতেন। কবরীর স্থান অধিকার করেছে কেশবটিকা; সাজ পোষাক প্রায় নোংরা পর্যায়। তিনি মূল ঘটনাস্থল থেকে নিষ্ক্রান্ত হোলেন—হট্টগোলে যোগ দিতে আরো সবাই এলেন।

"সারা ভারত হিন্দী প্রচার আয়োগ"—উদ্দেশ্য স্পষ্ট—কিন্তু এতে বহু মেরুকো-ধের দেখলাম। এ গোষ্ঠীতে আপাততঃ আমি একক বাঙ্গালী তবে সৌভাগ্য বলতঃ পরে বুঝেছি, ঐ অধ্যক্ষ মহাশয় আমার ঘরে দ্বিতীয় জন-এর কাছে দিনমানে যা জেনেছি, তা পরে বলছি, অবশ্য সংক্ষিপ্তসার এই আস্তানাটি চমৎকার ও নূতন। প্রায় ২ কাঠা জমির উপর, দুটি রাস্তার কোণে, ১০ ফুট ক'রে ছেড়ে ইংরাজীর ইউ অক্ষরের ছকে তৈরী। ভেতরে কোল বারান্দা প্রায় ৮ ফুট চেটালো তিন সেট ঘর, প্রত্যেক সেটে ৩টি দাঁড়াবার কামরা প্রত্যেক সেটের জন্য পর্যাপ্ত কলঘর ইত্যাদি। উপর তলায় তিন ভাগে সরকারী পাঠাগার—সুন্দর সিঁড়ি ইত্যাদি। ময়লা হবে, এই ভয়ে ঝাঁঝরার হুকুম নেই এখানে। তার জন্য অনতিদূরে চাকর, ঝাড়ুদার ও দরওয়ানের ঘর ও বারান্দার উপর তিন সেট ব্যবস্থা।

দূর থেকে দেখা গেল অন্য দিকের একটি ঘর থেকে একটি নবরত্নকান্তি প্রৌঢ় আসছেন—চন্দন চর্চিত, যেন পূজা করে উঠেছেন—দূর থেকেই 'নমস্কার' বলে উচ্চধ্বনি করলেন—মেয়েলী কণ্ঠে! সকলে প্রতিনমস্কার ক'রে গুনগুনিয়ে বলল "রাম রাম" (আমরা যে সুরে কল্যাণকামী হ'য়ে বলি দুর্গা দুর্গা)। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে 'অধ্যক্ষ'র পানে চাইলাম, তিনি ঠোঁট প্রায় না খুলেই বলে দিলেন

'পরে বলব'। এই বার নানা অনুযোগ। শুনে পূজারী বললেন, "এ তো বড় অন্যায়, আমি দেখে নিচ্ছি—বেটাকে কটি করে দেব।" এই বলে তিনি টেলিফোন বুথে গিয়ে দরজা বন্ধ করলেন।

বেরিয়েই বললেন "এক চোট হ'য়ে গেল—বেটাকে বুঝিয়ে দিয়েছি আমরা ওর ভাবেদার নই। সূচনাপত্রে যেমন আছে তেমনি হবে—আইন ও সংবিধান দুই আমাদের পক্ষে—চালাকী।"

প্রায় সকলেই ধন্য ধন্য করে উঠলো, রূপসীর মুখে বিজয়িনী হাসি. কিন্তু অধ্যক্ষ যেন সন্দিগ্ধ, ব'ললেন, "ঘা খুর্ত লোক, আঁচালে তবে বিশ্বাস" হিন্দী ভাষা।। অতএব সকলে নিজ নিজ ঘরে ২।৩ বা ৭ জনে দল করে ফিরে গেলেন।

অধ্যক্ষ খাটের উপর দোপাসনের মত ব'সে আরম্ভ করলেন "জানেন বাবুজী, আমাদের আয়োগের উদ্দেশ্য বড় মহৎ কিন্তু কতকগুলো "সোয়ার্থি ভীউ" (স্বার্থান্বেষী জীব। একে রেখে ঢেকে বলতে দিচ্ছে না। ঐ যে 'বঙ্গলা ভগৎ' বকধার্মিক টিকে দেখলেন, উনি ভাতে কালোবাজার (৩।৪টা মদের দোকান, প্রচুর টাকা তবে ক অক্ষর গোমাংস, তাই ঐ রূপসীটাকে 'ঘর বসিয়েছে' (অর্থাৎ প্রায় বিবাহ করেছে-), ছোট জাত, টাকার জোরে ভদ্র পরিবেশে, উন্নত কাজে ঢুকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা চায়, লোকে ওর মুখ দেখে না সকালে। পা চেটে হাড় বার ক'রে দেয় 'পদবীদার'দের....."

আমি নিবেদন ক'রে বললাম, "দেখুন হিন্দী আমরা সে যুগে ভালো ভাবে শিখেছি, কিন্তু আজ যে সরকারী মার্কা হিন্দীর প্রকোপ দেখছি তাতে ভাষাটা মার খেয়ে যাবে। দৈনিক কাগজে আমার বলিষ্ঠ মতামত দেখে প্রেমী বন্ধুরা এখানে পাঠালেন—আমার উদ্দেশ্য তা হ'লে সফল হবে না!"—সামনে উপবিষ্ট অধ্যক্ষ এবার ঝুঁকে প'ড়ে, যেন তর্জনীর খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, "আপনি পলিটিক্স, টাাক্স বা ডিপ্লোমাসী বোঝেন"? উত্তর দিলাম বুঝি, পারি না। নতাৎ মুদ্রায় অধ্যক্ষ হো হো ক'রে হেসে বললেন 'বাড়ী যান, বাড়ী যান, এ সব ভদ্র লোকের জায়গা নয়। কাজ হয় না, ঐ তিনটি হয়, না বললাম, আর হয় নোংরামী—আমি কেন আছি জানেন, শুধু ওদের হালাকান করতে—" বাধা দিয়ে বললাম, "আপনাদের সংবিধান সাধু—ভিন্ন ভাষার সমীকরণ, অন্য ভাষার রত্ন সম্ভার আহরণে, হিন্দীর সমৃদ্ধি সাধন—" চেঁচিয়ে উঠলেন অধ্যক্ষ "আরে রাখুন, ওসব গালভরা, লোক ভোলানো বুলী, আসলে ওসব 'ঢোংগ' (ভণ্ডামী), সমাজও জানে, শুধু হাজার হাজার টাকার ব্যবস্থা ক'রে দেয়, পরোক্ষ ভাবে....."

এমন সময় যেন বাইরে চঞ্চলতার আভাস পাওয়া গেল. অধ্যক্ষ বললেন, "আসুন তো, মনে হচ্ছে পাঁচ"। বাইরে এসে দেখি একটি সুন্দরী মহিলা প্রবেশ পথে ঢুকে যেন পূজারীর ঘরের দিকে চলেছেন—কলহাস্যে লোককর্ণ। সঙ্গে একটি দেশী সাহেব, যেন বড়ই ফার্ড। অধ্যক্ষ নীচু স্বরে বললেন, "ইনি ভেরী গুড", বাটী এক বর্ণ হিন্দী জানে না, মালিক পরিবারের আভিজাত্যের বড়। তাই, এত জন সম্ভ্রান্তকারের প্রেস্টিজ কর্মকে অপমান করে, "ঐ" মহিলাটির কাঁধে বন্দুক রেখে ভদ্রলোককে বধ ক'রে, এই বুদ্ধুটাকে মহাময়ী করেছে, অবৈধ ভাবে, আর কেউ প্রতিবাদও করল না এই ভীষণ অবিচারের।

যে মহিলাটিকে অধ্যক্ষ দেখালেন, তিনি খুব মোটা বাঁধা শরীর নানা ভাবে। ফুঠো চুলের আকুল কবরী। বড়লোকের মেয়ে বলে মনে হোল। একটি প্রায় বিগত যৌবন কালো টাকপড়া লম্বা লোক তার গা ঘেঁসে দাঁড়ালো। তার চোখে লোলুপ চাউনী। চোখের ভাষা যদি বুঝাবার বুঝতে ভুল না ক'রে থাকি, তাহলে ব্যাপারটা পবিত্র মনে হোল না। কৌতূহল, পীড়া দিতে আরম্ভ করল। অধ্যক্ষ জনতার দিকে এগিয়ে গেলেন। নানা রকম বাদ বিবাদের কথা চলল।

শুধু এক জায়গায় দেখলাম তিন জন ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে শান্ত কথোপকথনে রত। তিন জনেরই মূর্তি সুন্দর, সৌম্য ও দীর্ঘ। আকৃষ্ট হোলাম এবং যেন অজ্ঞাতসারেই তাঁদের কাছে উপস্থিত হোলাম। পরিচয় পর্ব শেষ হ'লে একজন অতি চমৎকার হিন্দীতে মৃদু ভাবে বললেন,

"আপনি বাঙালী, এখানে আপনি কী পাবেন আমাদের কুলীন আহ্মণ বারাণসীর, কাশীনাগরী প্রচারিণি সভা। কিছু আদান-প্রদানের ইচ্ছা থাকলে সেই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এখানে পাঞ্জাবী ভাষার চাপে হিন্দীর পরাভব হচ্ছিল বলে কতকগুলি হিন্দী সাধক, সাধু উদ্দেশ্যে এই দলটির সূচনা করেন। আমরা বিশ বছরে কত রূপই দেখলাম এর। এখন এটি মালিক-সার! ভাবক গোষ্ঠিতে পরিণত হ'য়েছে—কাজ কিছুই হয় না সব ফাঁপা শব্দ, এবং ভবিষ্যতে কাজ গুছিয়ে নেবার আয়াসে, প্রচার ও প্রতিষ্ঠা প্রকল্পিত প্ল্যানিং করা। বিভিন্ন অ-হিন্দী সহরে বার্ষিক অনুষ্ঠান করে লোক ভোলানো ও হৈচৈ। এবার বাইসোয়ে ব্যবস্থা করার কথা, তাই এর বৈঠক ডাকা হ'য়েছে তবে আসল কথা, মালিক এখন সরকারী কাজ থেকে অবসর নিচ্ছেন, তাঁর অবসরোত্তর বাস্তুভার কিছু বন্দোবস্ত করে নেবেন ভাবছেন

আপনিই যেন মুখ থেকে বেরিয়ে এলো এ মালিকটি কে ও কী? অন্য একজন শান্ত স্বরে এর যা উত্তর দিলেন তা সুসংস্কৃত ও রুচিমধুর "অপ্রিয়ভাষণ ও অনৃতভাষণের মাঝে বেছে নেওয়া খুব দুরূহ কাজ, অপ্রিয়ভাষণে রুচি নেই, অথচ মিথ্যা বলাও অন্যায়। আপনি বরং ঐ কাশীর ব্রাহ্মণটিকে জিজ্ঞাসা করবেন—উনিও আমাদের মত ২০ বছর এই আরোগের সঙ্গে জড়িত, উগ্র কিন্তু স্পষ্ট ভাষী।" তখন আমি আমার রুম-মেট ঐ কাশীর ব্রাহ্মণ, যাকে আমি ইতিপূর্বে অধ্যক্ষ বলে উল্লেখ করেছি, তাঁর বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলাম, জানলাম তিনি হিন্দী ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, অতি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। মালিকের বাড়ী যেতে নারাজ, কারণ পরে তাঁর কাছে জেনেছি।

এমন সময় দেখা গেল পূর্বোক্ত সাহেব "বাবুয়া"টি টেলিফোন বুথের দিকে ছোর পায় যাচ্ছেন। ঐ তিন জনের মাঝে যিনি সব চেয়ে বেশী সৌম্য, তিনি বললেন, "আসুন বাবুজী, আমাদের ঘরে, এখানে খুব হৈ চৈ হবে অরুচিকর, তার চেয়ে আসুন আলাপ করি আপনার সঙ্গে। গেলাম, কিন্তু সে সব কথা পরে বলছি। শুধু বলে রাখি নেতার নাম জানলাম 'রামদেন মালিক' এবং তাঁর স্ত্রীকে লোকে বলে "বেগম দেবী" সব নামকরণের ইতিহাস পরে অধ্যক্ষ পণ্ডিতের কাছে জানলাম, যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করব।

বেশ নির্মল আনন্দে সময়টি কাটছিল। এই তিন ত্রিমূর্তির নাম, জানলাম পঃ দেবীপ্রসাদ শুক্ল, ভালচন্দ্র গুপ্তা ও শঙ্করী সহায় (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও কায়স্থ-ক্ষত্রীয়)। তিন জনই অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কেন্দ্রীয় অফিসার, দিল্লীতেই থেকে গিয়েছেন এখন। প্রথমটি রেলওয়ে বোর্ডে, দ্বিতীয়টি শিক্ষা ও তৃতীয় বিত্ত বিভাগে ছিলেন। এখন এঁরা এখানে অবহেলিত ও অপমানিত যদিচ এঁরাই অর্থ সংগ্রহ করেছেন ও নানা রকমের সুবিধার বন্দোবস্ত করেছেন, এ কথা পরে পণ্ডিত-অধ্যক্ষর কাছে জেনেছি। কিন্তু কী ভদ্র এঁরা, কোনও অনুযোগ নেই, শুধু বলেছিলেন ২৫ বছর আগে স্বামী দয়ানন্দের এক শিষ্য এ অঞ্চলে হিন্দী ভাষা ও দেবনাগরী লিপির প্রচলন প্রয়াসী হন। উত্তর প্রদেশের পুরুষোত্তম দাস টণ্ডন সহায় হন, কিছু দিনের জন্য আচার্য নরেন্দ্র দেবও সঙ্গে ছিলেন। তখন উর্দু লিপি চলত সহরে। ধীরে ধীরে হিন্দী লিপি ও পরে গুরুমুখী প্রচলিত হোল ব্যাপকভাবে। অনেক কাজ হোল। হঠাৎ বামদেন চুপ হয়ে ঢুকলেন, আর এখন····

এমন সময়ে বাইরে তীব্র হর্ণের শব্দ করে একটা মোটর ক্যাঁ—চ করে থামলো, আমরা স্বভাবতই ভাবলাম মুখটি জানলা থেকে সবাই দেখতে গেলাম। শঙ্করী সহায় বললেন "জরুরী ডাকে সাহেব এলেন বোধহয়"। দেখা গেল একজন, প্রায় ৬ ফুট লম্বা, সাহেবী সাজে অপূর্ব সুন্দর পুরুষ, গাড়ী থেকে নেমে, জোর গতিতে প্রবেশ করছেন। কী বলু শরীর কী অদ্ভুত সুন্দর মুখমণ্ডল। এক কথায় এমন সুন্দর পুরুষ জীবনে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। হঠাৎ বলে ফেললাম, "এ তো যেন খাঁটি সাহেব বাচ্চা"! ভালচন্দ্র মিষ্ট ভাষায় বলেন "সত্য, কিন্তু খাঁটি নয়। মার নাম রমিয়া, এ দেশীয় কোরী (নমশূদ্র) আয়া।"

বাধা দিয়ে শুক্ল গম্ভীরস্বরে বলেন, "ও সব কথা পরে

হ'তে পারবে! এখন ভদ্রতার খাতিরে, প্রধানকে তাঁর পদের মর্যাদা প্রদর্শন করতে, আমাদের ওখানে যেতে হয়।"

যখন অকুস্থানে উপস্থিত হোলাম, আমরা চার জন, তখন দেখি পূর্বোক্ত পূজারী মালিককে একটি বেশ বড় ফুলের মালা পরিয়ে বলছেন "যাসে যাকী লয় হায় ওহাঁহী ওহাকো রাম" (যাকে যে ভক্তি করে, সেই তার ভগবান) নারায়ণ যেমন সিংহরূপ ধারণ ক'রে, দুষ্ট হিরণ্যকশিপুকে "পচাড়" (বধ) করেছেন, আপনিও তেমনি সরকারকে ঘুরিয়েছেন, এটা একটা বিরাট কীর্তি"। অধ্যক্ষ যেন আর সহ্য করতে পারলেন না, বললেন "লীলাদাসজী" (এই প্রধান পূজারীর নাম জানলাম) রোজ-প্রতাহ সরকারের বিরুদ্ধে কত রায় উচ্চ ন্যায়ালয় দেয় তার বোধ হয় আপনি খবর রাখেন না, এতে "আও ভগত" আসা নয়। করবার কী আছে? এবার বেশ বিরক্ত কণ্ঠে মালিক বলেন "সুখদেওজী, আপনি দেখছি সবসময়ই আমার কীর্তিকে ছোট করে দেখতে ও দেখাতে প্রয়াসী, অথচ জানেন আজই সকালে এক বৃদ্ধ, অযাচিত ভাবে আমার বাড়ীতে এসে ব'লে গেলেন 'আপনি শেষ পাতাবে কেশরী।' হো হো করে হেসে অধ্যক্ষ আসন চড়িয়ে বলেন, বলেন 'ভেবে দেখুন ঘুঘটা ডেকে ছিল তো, ঠিক মত না হলে ত্রিকাল দর্শীটি মহারাজ রণজিৎ সিংকে উড়িয়ে, লালা লাজপৎ রায়কে মুছে ফেলে, তাঁদের মুকুট কেড়ে নিয়ে আপনার মাথায় পরিয়ে দিয়ে কী করে বললেন "এই শেষ"! নিন্ এবার ঘোষণা করুন আপনি "মৌরুসী প্রধান" লীলাদাস আপনাকে একটি খাঁটি সোনার জয়মালা পরাবেন।

লীলাদাস এতক্ষণ যেন একটি অদৃশ্য থালা হাতে দাঁড়িয়েছিলেন, বিরাট হাঁ'র গবাক্ষে ফোকলা দাঁতের এলোমেলো শোভা। কতকটা না বুঝেই বলে ফেলেন "হুজুর, অজয়।" যোবানলে যেন ঘৃতাহুতি হোল। অসভ্যের মত চীৎকার করে বলে উঠলো "তাঁর মানে রামদেন মিথ্যা-বাদী"। স্থির, অথচ গম্ভীর কণ্ঠে সুখদেও বললেন "ঠিক উত্তর দিতে আমাদের ভদ্রতা বাধা দেয়, দুষ্ট ও মূর্খ লোক নিজের সুবিধা মত অর্থ ব্যক্ত করে, তবে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারে।"

হঠাৎ দেখলাম যেন উপস্থিত মণ্ডলী ন'ড়ে চ'ড়ে স্পষ্ট তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। মালিকের কাছে দল বেঁধেছে হতশ্রী জরাযৌবনারা। একটি কৃশ ও কৃষ্ণকায় ক্যাটারাক্ট চশমাধারী দাঁত বাঁধানো বৃদ্ধ এবং আরো ৪।৫ জন। লীলাদাস (সন্ত্রিক) এক দলের নেতা, ২।৪ জন সুশ্রী মহিলা এবং ২।৩ জন প্রৌঢ় তার দলে। সুখদেওর দলে, আমরা চার জন তো এসেই পড়েছিলাম উপরন্তু ছিল যুবকের দল। অবস্থা প্রতিকূল দেখে নরম সুরে মালিক গুরুলকে বলেন "আমি আপনাদের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি এবং অপদস্থ পদে পদে আমাকে, আমার স্ত্রীকে অপমান করেন" যেন ভদ্রলোককে একটি যুবক বলে "অপমান বোধ করলে তো ভদ্রলোকেরা পদত্যাগ করে, আপনাকে তো কেউ এখানে থাকতে বলে না।" শান্ত ভাবে অন্তরের ভাব গোপন করতে উদ্যত হয়ে দেবীদাস বলেন "শুনুন আমি বলছি—সুখদেও ফোড়ন দিলেন "হাঁ, বোলো বিনা প্রমাণ" (উচিৎ কথা বল) গুরুল বলেন "মালিকজী, ভেবে দেখুন কেন এই অসন্তোষ! কেউ বোকা নয়, বিশ্বাস করুন, সকলেই প্রায় সব কিছু বোঝে, তবে হয়ত কিছু বলে না আমার মনে হয় ভদ্রতার মোহে আমরা ন্যায্য স্থানেও প্রতিবাদ করার শক্তিই যেন হারিয়েছি। আপনাকে পরামর্শ দানের স্পর্ধা করছি মনে করবেন না, কিন্তু মনে হয় আত্মম্ভরিতা যথার্থ শক্তির পরিচায়ক নয়। যারা করে তারা বলে না, যারা বলে তারা করে না এটা মোটা কথা। আপনি আত্মস্থ হউন"। বস্তুতঃ প্রায় সকলেই মুগ্ধ হোলেন, তবে হিতবাক্যে দুষ্ট লোক তৃপ্ত হয় না প্রায়শঃই ক্ষিপ্ত হয়। এখানেও তাই হোল। মালিক দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বলেন "আমার বাসায় সভায় রাজী না হলে, এ সভা বন্ধ হোক"। সুখদেও জলে উঠলেন "খারকি! আমরা এইখানে সহ-প্রধানকে বসিয়ে সভা করব।" গুরুল মীমাংসা প্রয়াসে রত ছিলেন "দেখুন লোক হাসাবেন না, আয়োগ শুরু হ'য়েছে। তাড়াতে অপরের প্রতিষ্ঠানের মূল্য হবে,

পূর্বসূরীদের অপমান হবে। তাই বলি, সুদিন ফিরুক তার ব্যবস্থা করুন সংবিধান মত। যদি উপস্থিতদের মত হয় প্রবীনের বাড়ীতে বৈঠক করার তাই হোক"। সুখদেও বলেন "কাহু তো মুহ্ওয়া চাটে, চরণা চাটে কোয়; মা বিন্ গুহে নয়ন্ সন্। সুখ দেওয়া ন হোয় (কেউ মুখ চাটে, কেউ পা; এমন ওঁচা লোকের দলে সুখদেও থাকে না) গাত কিড়মিড় ক'রে মলিক সংযম হারিয়ে বলে ফেলেন "আমার প্রদেশে গেলে কোমরে দড়ি দিয়ে কাটকে বেঁধে দিতাম।" তৎক্ষণাৎ সুখদেও বলে উঠলো "পুরোসি কৃতবিস্তোসি দর্শনিয়োসি পুত্রকঃ যস্মিন কুলে তুমুৎপন্ন, গজস্তত্র ন হন্যতে"

যাক স্থির হোল সুখদেও ও আমি ঐ ভিন্নতর ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁদের গাড়ীতে দিল্লী ফিরব, দুপুরে খাওয়ার পর, কিছু বিশ্রাম ক'রে তাই হলো। পথে যে সব কথা শুনলাম, তাই ঘুরে ফিরে চিন্তার রাজ্যকে আলোড়িত করল, ফলে রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাৎ।

এখানে দুটি কথা বলে রাখি। প্রথম, সব কথা বার্তাই হিন্দীতে হয়েছিল, সেই অনুযায়ী বাংলায় লিপিবদ্ধ করলাম। দ্বিতীয়, ঐ স্নেহপূর্ণ পরিবেশে চারটি অভিজ্ঞ ব্যক্তির সম্যক পরিচয় ও প্রীতি লাভে ধন্য হয়ে যা পেয়েছি, তা যথা সময়ে পরিবেশন করব বাংলার পাঠক সমাজকে। সবোপরি, বহুদিন পর, হঠাৎ ট্রেনে ধরা দিল বন্ধু বিবিধার্থ।

ইটালীর নেপলস্ সহরে এক মেলায় বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ক্যারুসো বেড়াতে গেছেন। মেলার এক পাশে এক বৃদ্ধ গায়ক প্রাণপণে গান জুড়েছে দুটো পয়সা পাবার জন্য, কিন্তু গান তার জমছে না। শ্রোতা নেই বললেই হয়।

একটু দূরে আর একজন সুবেশ তরুণ গায়ক বেহালা হাতে হাসি মুখে গান ধরেছে, লোকের ভিড় সেখানেই বেশী।

বৃদ্ধের করুণ মুখ দেখে ক্যারুসোর মনে দুঃখ হোল। তিনি ভাবলেন, এখানে তো লোকে আমাকে চেনে না,—দেখা যাক বৃদ্ধকে একটু সাহায্য করা যায় কি না।

তাই ভেবে তিনি গান ধরলেন বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মেলার লোকজন যেন চমকে উঠলো। একী কণ্ঠস্বর! একী মধুর গান! ছুটে এলো তাঁরা বৃদ্ধের পাশে। শেষে এমন হলো মেলা ভেঙ্গে লোকজন সব ছুটে এলো সেখানে। এমনকি সেই তরুণ গায়কটিও।

টাকা পয়সা পড়তে লাগলো বৃষ্টির মত বৃদ্ধের টুপিতে। টুপি উথলে উঠলো। বৃদ্ধ আনন্দে আত্মহারা হয়ে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখে ততক্ষণে ক্যারুসো চলে গেছেন। তাঁর পরিচয়ও কেউ সেখানে পেলো না।

ঘুম

সুকুমার রায়

জানালার মুখোমুখি গলির রাস্তার আলোটা আমার সাধনার প্রতিবাদ। আমি ঘুমের সাধনা করি। বহু রাত্রি পর্যন্ত তাসের আড্ডা করতুম। হেরেছি বিস্তর—টাকাও হারিয়েছি। বহু রাত্রি পর্যন্ত পড়েছি কিছুকাল। দেখলুম আমার স্ত্রী নীলা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, হয়ে চলেছে নির্বাক। ডাক্তার সাবধান করে দিলেন—যদি গৃহিণীকে উন্মাদ রোগের কবল থেকে বাঁচাতে চান তবে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ওর সংগে থাকুন, গল্প গুজব করুন, ওর ঘুমের সময়ে একসংগে ঘুমোন। নাহলে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সেই সময় থেকে আমি নীলার সংগে। গল্প করি অনেক, বিছানায় গিয়ে অপেক্ষা করি। অনেক কথা বলি। ঘুমিয়ে পড়ে নীলা। আর আমি? আমি ঘুমের সাধনা করি। কোথায় ঘুম? একের পর এক রাত্রি কাটে। ডাক্তার বলেন ওষুধের অভ্যাস করবেন না। বেশ তো, কিন্তু কোথায় সে? কোথায় ঘুম?

নীলা বলে তোমার চোখে ঘুম নেই কেন আমি জানি। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় সারা রাত পড়া অথবা অঙ্কের কথা ভেবে রাত কাটানো—এতে কি আর ঘুম আসতে পারে?

ভাবনার জন্যে ঘুম হয় না, না কি ঘুম হয়না বলে ভাবনা এসে চেপে বসে মনে, এ কথা নীলা বুঝতে চেষ্টা করে না। ঘুম সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকের বহু ব্যাখ্যাই চলিত আছে। লাভ কি সে সব বলে? আমি বলি, জানো নীলা, আসল কথা—আমার চোখের কুম্ভকর্ণ চুরি হয়ে গেছে। কে সেই চোর তাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছি। সে জন্যেইতো আমি সারা রাত। তারপর তোমাকে বলি রাত্রির কথা, সে কথা লিখি।

তা তুমি যা বলো—এসব নাকি তোমার নিজ জীবনের কথা নয়।

যা চোখে দেখেছি তাই তো বলেছি, অথবা যা চোখের ওপর ঘটে যাচ্ছে তাই তো শোনাচ্ছি। তুমি কি ভাবছ এ সবের সংগে আমার সম্পর্ক গভীর?

না না, আমি তা ভাবছি না মোটেও। কিন্তু ওবাড়ির সন্ধ্যার কথা যে ভাবে বললে মনে হয়, কি জানি, হতেও পারে। আমি ভাবি, যে জীবন ফেলে এসেছ পেছনে, তাকে নিয়ে আমার ভাবনা কেন?

নীলার নরম পায়ের ওপর হাত বাড়িয়ে ওকে আলতো করে টেনে নিই কাছে। সারাদিনের ক্লান্ত দেহটিকে নিশ্চিন্ত স্থিরতায় এলিয়ে দেয়। আর বেশী কথা হয় না। ও হয়ত ভাবে আমার মনের মধ্যে অনেক কিছু সঞ্চিত রয়ে গেছে। সে সব কথা জানতে পারে নি। এক টুকরো সন্দেহ বাসা বেঁধে আছে মনের কোন প্রান্তে দেখে। প্রতিদিন একটি অঙ্গীকার নিয়ে আমি দপ্তর থেকে ফিরে আসি নীলার কাছে দেহের ও মনের সব জমানো কথা অনাবৃত করে দেব। অনেক কথা বলে বলে সম্ভবত নীলাকে একটু ভাল করতে পেরেছি। নীলা জিজ্ঞেস করে, সারারাত কি তোমার দুশ্চিন্তা?

আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

নীলা বলে, আমার তো তোমার জন্যেই থাকতে পারে? কেন তোমার ঘুম হয় না?

আমি বলি, সে কি আর ভাবনার বিষয়!

নীলা বোধ হয় নিশ্চিন্ত হতে পারে না। এমনি করে নিশ্চিন্ত হতে পারে না অতীত জীবনের কথা অথবা গল্প শুনে। অতীত ইতিহাস—সামান্যই জানে আমার কাছে। আমার এক বৌদি একদিন বেড়াতে এসে

আলাপ করেছিলেন সন্ধ্যাদের কথা। সন্দেহের সেই তো সূত্র। সব কথা বলে মিটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম নীলার এই সন্দেহ আর ভাবনা।

মাত্র সাত ফুট রাস্তার ওপারে যে বাড়িটা তারই একতলার দুটো অন্ধকার কোঠার ভাড়াটে সন্ধ্যারাণী, তার স্বামী ও ছেলেপুলে। সন্ধ্যাকে প্রথম দেখেছিলাম এক যুগ আগে। আমার দিয়ে ছাদের কার্নিশ বরাবর যে একফালি আকাশ তাতে জ্বলছে এক যুগ আগেকার কুমারী সন্ধ্যার চোখ দুটো, দুটো তারার মতো। তখন আমার কলেজের পড়া শেষ হয়েছে, এই বৌদির আমন্ত্রণে দেখা করতে গিয়েছিলাম তাদের গ্রামে মামার ছেলের। ওদের গ্রামের বাড়িতে দোতলা দালান অনেক অনেক পুরোনো কোঠা, বনেদি ঘর। একটি দোতলার ঘরে থাকবার জায়গা হয়েছিল। সেদিনই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সন্ধ্যারাণীর সংগে। বাপের বাড়িরই মেয়ে—সিধা চোখ, টিকালো নাক, ছোট কপাল, রাশি রাশি ঘন কালো চুল—এক কথায়, দেখেছিলাম অপূর্ব। বৌদি অগোচরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন পছন্দ হল? বন্ধুর মতো লাগবে না ওকে যে পারে?

আমি হেসে বলেছিলাম, বেশ তো বুঝতে দিন। অমৃতকেও ভাল করে বুঝতে হয়, জানতে হয়।

খুশিই হয়েছিলেন বৌদি, বলেছিলেন, বেশ তো দুদিন এখানে থেকে দেখুন। ওর বাপ নেই। আমার কাকীমাই মানুষ করেছেন।

এরপর বৌদিদের বাপের বাড়িতে কয়েকদিন ছিলাম। গ্রামের থিয়েটারে পার্ট করেছিলাম। সবার মধ্যে জমিয়ে বসেছিলাম। সন্ধ্যারাণী আমার মনটাকে অধিকার করে নিয়ে হলা পাকিয়ে যখন একেবারে আমার শরীরের কাছাকাছি এসে পড়েছিল, বৌদি তখন বাধা দিয়েছিলেন। বৌদি একদিন সোজাসুজি হেসে বলেছিলেন, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান, অমৃত ফল পাবার ব্যবস্থা করুন, তবে তো সব ভালো হবে। নয়তো ওই হতভাগী ছেলে-মানুষটিকে বিপদে ফেলে লাভ হবে কিছু?

সহজ ভাবেই হেসে বলেছিলেন কয়েকটি কথা, কিন্তু ভালো লাগে নি মোটেও। বৌদি আমার দূর সম্পর্কীয়া হলেও, ছিলেন কাছের মানুষ। কিন্তু, এবার থেকেই যেন দূরে চলে গেলেন। এক যুগ পরে সন্ধ্যা ওর স্বামীর সঙ্গে ছেলেপুলে নিয়ে যখন এসে এ গলিটার ভাড়াটে হয়ে ঢুকলো, চিনতে পেরেও যেন চিনতে পারলুম না। সন্ধ্যাও প্রতিবেশির মতোই পরিচয় করে গিয়েছিল নীলার সংগে। কিন্তু বৌদিটি এসে একদিন নষ্টামি করে গেলেন পুরোনো কথা মনে করিয়ে দিয়ে এবং তাও নীলার সামনে,—দীপেন ঠাকুরপো এই আমার সেই খুড়তুতো বোন সন্ধ্যা। যার—

কথাটি আমি বেশ পাল্টে বলে দিয়েছিলাম, ও হ্যাঁ, আপনি যাকে বিয়ে করতে বলেছিলেন, এ সেই বুঝি? কিন্তু আমি যে অপেক্ষা করেছিলাম নীলার জন্যেই।

নীলাও হেসেছিল। কিন্তু বৌদি ছাড়বার পাত্রী ন'ন, বলেছিলেন, সেবার তো আমার বাপের বাড়ীতে কয়েকদিন ছিলেন, নাটকে সুন্দর অভিনয় করেছিলেন, তাড়াতাড়ি ভুললে চলবে কেন?

এরপর নীলাকে বুঝিয়ে বলেছিলাম—জীবনে এমন কত ঘটনাই না ঘটে, কিন্তু নিবন্ধ একচোখো। দুজনার মিলন ঘটিয়েছে নিবন্ধ। নীলা সে সব বুঝেছে, কিন্তু তবু হয়তো কিছু ভেবেছে।

একটি একটি করে মুহূর্ত রাত্রির কবলে খসে পড়ছে। রাত্রি বাড়ছে। একটু আলতো করে হাল্কা চাদরটা গায়ে টেনে নিয়েছে নীলা। আশ্চর্য এই গরমের মধ্যেও চাদর চাই। জানি, দেহের উত্তাপেই নিদ্রার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত এবং রক্তের চাপেই তার রূপান্তর। শরীরটা চালু থাকার জন্যেই দিনের তাপের সংগে দেহের তাপ বাড়ে। বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত দেহের তাপ আসে শেষ সীমায়, তারপর তাপের অধোগতি। রাত্রিতে দেহের তাপ পড়ে আসে। একটা মিথ্যে শীতলতার ভাবও আসে শরীরটা জড়িয়ে। সে জন্যেই হাল্কা চাদর না হলে চলে না নীলার। কিন্তু শীতলতার শেষ পর্যায় শেষ রাতে, এ জন্যই আমি অপেক্ষা করি শেষ রাত্রির জন্যে।

দরজায় টুক্ টুক্ করছে কে ? ও ডেইল নম্বর বাড়ির কালীপদ। সে সাধারণত আসে রাত্রি বারোটার পর। সঙ্গে করে নিয়ে আসে কুখ্যাত চৌধুরীকে। কালীপদ ঢুকে পড়ে নিজ বাড়িতে। ঢোকবার আগে 'মা' 'মা' করে গলা ছেড়ে দুটো চীৎকার দিয়ে জানিয়ে দেয় ও এসেছে। কিন্তু অসহ্য গোলমাল প্রায় প্রতি রাত্রিতেই শুরু করে দেয় চৌধুরী। কাছেই ওর বাড়ি। দূর থেকে "কোথায়!" "কোথায়!" চিৎকার শুনলেই বোঝা যায় চৌধুরী আসছে। ঝন্ করে দরজা খুলে যায়। তারপর প্রায়ই প্রহারের শব্দ নারী কণ্ঠের চিৎকার! একটু হল্লা। বৌকে ধরে পেটায় অসহ্য। কয়েকটি রাত আগে একদা ছুটে গিয়েছিলাম চৌধুরীর ওখানে।

একি মশায়? রাত্রি এগারোটার পর প্রতি দিন হল্লা করেন কেন? সব চেয়ে বড়ো কথা দরজার চোখের সামনে পাড়া রাৎ করে আপনি বৌকে পেটান।

আপনাকেতো চিনি বলে মনে হয় না।

আমার সঙ্গে পাড়ার একটি ভদ্রলোক ছুটে এসেছিল। বললে, চিনতে হবে না মশাই। ঠিক ঠিক নাগরিক না হতে পারলে পাড়া ছাড়তে হবে।

চৌধুরী বলেন আমার বাড়িতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কি করব -সে ব্যাপারে আইন দেখাতে এসেছেন?

বেগতিক দেখে চৌধুরীর স্ত্রী ছুটে এসেছিল, বললে, চৌধুরী মশায় কারো ভাড়াটে নয়। আপনারা কেন বাড়ি চড়াও করছেন।

বল্লাম, দশজনকে ডিস্টার্ব করে অশোভন ব্যবহার করা আইন সংগত নয়। যা করবেন বাড়ির ভেতরে করবেন।

ভদ্রলোক বললে, অভদ্রতা কখনো নয়।

চৌধুরী কি বলতে যাচ্ছিল, ওর স্ত্রী দরজা দুম্ করে বন্ধ করে দিলে। আহত হয়ে ফিরে এসেছিলাম যেন। এর পর দুচারদিন উৎপাতটা কমে গিয়েছিল। আবার শুরু হয়েছে। সবার চোখ ঘুমে বন্ধ হয়ে আছে চৌধুরী যেন জানে তাই আবার হল্লা করে।

রাস্তার কুকুর কণ্ঠে ঐকতানের সঙ্গে বহু দূরের হুকার অনেক ঝগড়ার সুর ভেসে আসে। একটু দূরেই যেন মারামারি হচ্ছে। দালালের গলার সুর পঞ্চমে চেপেছে। সর্বদাই দালালের বাড়ির সামনে কোন একটি ঘটনা ঘটে। একদিন জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বড়ো মুস্কিলে পড়েছিলাম। রাত বারোটা নাগাৎ দালাল বাড়ি ফিরে আসে, এরপর শোনা যায় একটা হল্লা। বেরিয়ে জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিলাম সেদিন, মশাই আপনার বাড়িতে প্রায়ই রাত বারোটা একটায় কি এমন হয়, যে ঘুম ভেঙ্গে যায়?

দালাল একটানা উত্তর দিয়েছিল, কি লজ্জা! মশায় আপনি টের পেয়েছেন আপনাকে বলতে দোষ নেই। জানেন, আমি দালালী করে দিন কাটাই, এখানে সেখানে যাতায়াত করি, একটু এটা সেটা খানা ভোজন করি, তাই রাত্রিতে বাড়ি ফিরতে হয় দেরি। কারো সঙ্গে দেখা বড়ো একটা হয় না। রোজই এসে দেখি, মশায় যে মশায়, সুদর্শন বাটা আমার বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে আর মস্তি জানালার কাছে দাঁড়ানো বলুন কি অবস্থা হতে পারে।

দালালের কণ্ঠে মালিকের সুর। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দালালের স্ত্রী মস্তি জানালার পাশে। স্পষ্ট বলে ফেললে, কেন মিথ্যে কথা বলছ? নিজের বৌ সম্বন্ধে কেউ এমন কথা বলে কখনো। বেহায়া কোথাকার। শুনলেন তো বিশ্বাস বাবু কেমন লোকের সঙ্গে আমি ঘরকন্না করি। সুদর্শন আমার খুড়তুতো ভাই, দূর সম্পর্কের হোক, মানুষ হয়েছে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এখন সে পাগল। আমি চাই না ও এখানে আসে, কিন্তু ওকে দমায় কে? বাধা দিলেও আসে, ঝিলিবিলি চিঠি লেখে। বাবুকে সে সব দিয়েছি। বাবু ওকে ধমকেছেন। এখন সে চুপিচুপি এসে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে।

দালাল হেসে বলে, এর কি উপায় করি বলুন তো? মার খাবে, গালি খাবে। আবার আসবে, ছাড়বে না।

দালালের স্ত্রী বললে, আমি বলেছিলাম—চলো এ বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও চলে যাই।

কোথায় যাব, বলুন। এ ভাড়ায় অন্য বাড়ি পাবো? এ পাড়ায় তো কোন দোষ নেই। আগে তোমার চরিত্র ঠিক করো।

এবারে মন্ত্রী সরোষে বললে, শুনলেন ওর কথা?

আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলতে বাধছে না। নিজে কি করে আসছ রাত দুপুরে? তাতে লজ্জা হয় না? আমার চরিত্র যদি খারাপই হয়ে থাকে তবে ও বাড়ির চৌধুরী যেমন করে বৌকে মারে তেমনি করে মেরে ফেল না কেন?

দালাল বললে নাও, শুনলেন তো কথা? আমি যা পারবো না ভাই। মেরেছেলে ঠ্যাঙানো।—আমি কাপুরুষ নই। মদ খাই কিন্তু মাতাল নই। কেন খাই? মনের দুঃখে। দেখে দেখে বাঁচতে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে।

দালালের স্ত্রী বলে, এ সব কি শুধু মনের অবস্থার কথা? বলুন। তার চেয়ে আমি তো বলি আমাকে বিষ এনে দাও, মেরে ফেল।

দালাল বললে, শুনলেন তো? এ সব করে আমি পুলিশের হাতে যাই আর কি? চলুক এমনি করে যতদিন চলে। আমি কাউকে কিছু বলব না।

ফিরে এলাম। অনুপস্থিত সময়ের আগন্তুক সুদর্শনকে কখনো দেখিনি। মনে মনে একটা চেহারা ভেবে নিচ্ছি। শুধু রাত্রি একটা নাগাৎ প্রায়ই বুঝতে পারি সুদর্শন এসেছে। বোধ হয় এসে জানালার কাছে দাঁড়ায় কিসফিস করে কথা বলে। মন্টি এসে দাঁড়ায় কাছে কখনো প্রত্যুত্তর দেয় না, চলে যেতে বলে। এরপর প্রতিদিনই দালালের চীৎকার। ওকে নিয়ে সুন্দর গল্প তৈরি করা যেতে পারে, যতক্ষণ ঘুমের অপেক্ষায় থাকি।

চং চং করে কোথা থেকে ভেসে আসে রাত্রি দুটোর ঘন্টা। বাহু প্রসারিত করে দিই নীলার দিকে। ঘুমের ঘোরে নীলা কাৎ হয়ে কপোলতল ন্যস্ত করে আমার হাতে। অচেতন জীবনের এক টুকরো নিশ্চিন্ততার মাধুর্যক্ষণ। সন্দেহ নেই, অভিমান নেই, ঘৃণা নেই—ঘুমে বিভোর। ঘুম রাজ্যের দুয়ারে বসে যদি ছবি আঁকতে পারতুম তবে এঁকে রাখতুম নীলার মুখখানি—স্থির অচঞ্চল টানা চোখ দুটো নরম টোল খাওয়া মাংসল বুক দুটো—আকাংখার পূর্ণ স্তম্ভিত মূর্তি—কিন্তু চঞ্চলতাও নেই, বিস্ময় নেই।...সন্ধ্যারাণীর ছেলেটা ও বাড়ি থেকে পেটের ব্যথায় চেঁচায়। রাত্রি গড়িয়ে চলে, দেয়াল ঘড়ির কাঁটা নিস্তব্ধতাতে ঢিল ছুঁড়ে এগিয়ে যায়।

ছাব্বিশ নম্বরের একতলার ভাড়াটে ঘর থেকে কান্না আসছে কি? একবার উঠে জানালা দিয়ে তাকাই। হাঁ এখান থেকেই বীণার কান্না শুনতে পেতাম অনেক রাতে। সুধীরবাবু আমাদের আপিসেই কাজ করেন। ঘরে অনেক সুখ দুখের আলাপ করতেন। মেসে থাকতেন আর দেশে, মানে বাংলা দেশে, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে টাকা পাঠাতেন প্রতি মাসে পরে। হঠাৎ একবারে কি হল, অত্যন্ত বিব্রত হয়ে বাড়ি ছুটে গেলেন, আমাকে অনুরোধ করে গেলেন কোন প্রকারে অল্প ভাড়ায় একটা বাড়ি ঠিক করে দিতে। সুধীরবাবু বাড়ি থেকে আর আসেন না। চাকরি বুঝি যায়, অবশেষে যখন ফিরে এলেন তখন তিনি রুগ্ন, অল্প কয়েকদিনে বয়েস প্রায় যেন দশ বছর বেড়ে গিয়েছে। ছাব্বিশ নম্বর বাড়ির ঘরটা পাওয়া গেল, আমার সুপারিশে বাড়িওয়ালা রাজি হলেন। সুধীরবাবুর স্ত্রী আর দুই মেয়ে রুমা ও উমাকে নিয়ে এসে উঠলেন। বড়ো আর ছোটো মেয়ের মাঝামাঝি ছিল একটি ছেলে। বহুদিন হল তার কোনো খোঁজ খবর নেই। ওরই অপেক্ষায় পরিবারকে দেশে রেখেছিলেন—যদিই বা কখনো খবর পাওয়া যায়। অসুস্থ সুধীরবাবুকে দেখতে আমি প্রায়ই ওর বাড়ি যেতুম। রুমা প্রতি মুহূর্তেই কাঁদছে আর কাঁদছে। বাপকে শুশ্রূষা করতে করতে অন্তরে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে মুখচোখ। সুধীরবাবু সেরে উঠেছেন, দপ্তরে কাজে যোগ দিয়েছেন। কোনো এক সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। রুমাকে ডেকে আমার সামনে বললেন, এখন আমি কি করতে পারি দীপেনবাবু, বলুন। রুমাকে যতই বোঝাচ্ছি সে বুঝতে চাইছে না। জীবনে কত একসিডেন্ট হয়ে যায়; ওর জীবনের ঘটনাটিও একসিডেন্ট ছাড়া আর কি। এ দুনিয়ায় কত কিছু ঘটে, কে বা ক'জনা জানতে পারে। ও যে কেঁদে কেঁদে একেবারে পাগল হবার উপক্রম হয়েছে।

রুমা দুহাতে কেঁদে উঠল, বলল, বলো আমার জন্ম হয়েছিল কেন? বলো আমি, আমি কি পাপ করেছিলাম। কেন? কেন?

সুধীরবাবুর কাছে সব শুনেছিলাম আগেই, আমার কাছে ইনি মনের ভার লাঘব করেছিলেন। গ্রামের কয়েকজন দুর্বৃত্ত রুমাকে কোন এক রাত্রিতে বাড়ি থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আর যখন রুমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যায় তখন রুমা অচেতন। এরপর সুধীরবাবু ওদের নিয়ে আসবার জন্যে দেশে যান। সুধীরবাবু যে কথা বলে ওদের বোঝাতে চেষ্টা করেন আমিও সে কথাই বলি, রুমা এ সত্যিই একটি অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি। এতে তো কারো কোনো করবার ক্ষমতা ছিল না। কাজেই এখন আর এ সব কথা মোটেও ভাববে না।

এরপর কত তৈরি করা ঘটনাই না বলে বুঝিয়ে এসেছিলাম রুমাকে। ভেবেছিলাম রুমা বুঝেছে। ধীরে ধীরে মানসিক ভারটা কেটে যাবে! কিন্তু মনে পড়ে কয়েকদিন আগেকার এক ভীষণ রাত্রিতে রুমা বিষ খেল। হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল, কিন্তু বাঁচাতে পারা গেল না। এই ঘটনায় জড়িয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে কয়েকটি রাত্রি আর দিন কাটিয়ে দিতে হয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝেই ওবাড়ি থেকে কান্না শোনা যায়, বেশ বুঝতে পারি কেন এ চাপা কান্নার রেশ আসে।

ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্। পুলিশের বুটের আওয়াজ। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। চব্বিশ নম্বর বাড়ির দোতালায় যে ভাড়াটে থাকে, বিশিষ্ট ভদ্রলোক সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রায়ই পুলিশ তাকে খোঁজে, ধরে নিয়ে যায় থানায়। বেশ বুঝতে পারি রাত্রির ঘণ্টার গুরুতা এখন ভাঙবে। কোলকাতার অনলসে নিদ্রাহীন রাত্রির গুরুতা, আমার কাছে দুর্ঘটনা আর কান্নার ধ্বনি। ক্রন্দসীর বুক চিরে বালিহাঁসের দল চলেছে কোন দূরের জলাধারে, জানালা দিয়ে ধ্বনি করে পড়ছে আমারি কাছে। বাইরের আলোটা আরো গাঢ় মনে হচ্ছে। চক্ চক্ করে খানিকটা সরষ রক্ষিত জল খেয়ে নিলুম। এবারে ঘুম আসবে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাম চলার শব্দ দূর থেকে ভেসে আসবে। দু'একজন পথচারী বেরুবে গঙ্গায় প্রাতঃস্নানের উদ্দেশ্যে। রাস্তার আলোটা গলে দিনের আলোয় মিশে যেতে থাকবে। নীলা পাশ ফিরে শুলো। ঘুম ভেঙে যাবার বেশি দেরি নেই। এবারে কোলকাতার প্রবহমান শব্দ সমুদ্রের সুরু হবে কল্লোল প্রবাহ। আমি অনেক দূরে, নীলা অপেক্ষা করে থাকবে। অপেক্ষা করাও ভালো। বুঝবে এ ঘুম আমার চোখে কত ভাবনার মূল্যেই না পাওয়া। আমার ঘুম ভাঙানোর সাধনা করে অনেক বেলা অবধি ঘুমবে। মনে ভাববার জট জমবে। আর ঘুমের শেষে আমি সে জট ছাড়িয়ে দেব একটি একটি করে গল্প বলে—নিদ্রাহীন রাত্রির গল্প।

• •

আজকের দুনিয়ায় মেয়েরা জন্ম থেকেই বাপের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকে, কেননা বাপের অনেক কাজ কাজেই শিশু কন্যার প্রতি মনোযোগ দেবার মত অবকাশ তাঁর কোথায়। এতে কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি হয় সংসারের, মেয়েরা না পায় আনন্দ না পারে লোক চিনতে।

পিতা যদি প্রত্যহ কিছুকালের জন্য তাঁর কন্যাদের সঙ্গে কালযাপন করেন তাহলে আদর্শ পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে তাদের একটা ধারণা সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে মেয়েরা তাদের পিতার চেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের সঙ্গে মিশতে চাইবে না। আজকের দিনে মেয়েদের যখন সমাজে ছাড়তেই হবে তখন আদর্শ চরিত্র পিতার প্রভাবটি তাদের মনে স্থান পেলে তা বহু ক্ষেত্রে জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় মেয়েদের রক্ষা করবে। এ কথাগুলি বলেছেন লুইকটেইনের সেন্ট মাইকেল বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী মিস কে. এণ্ড্রুজ।

কীট্‌স এর শেষ কটি দিন

রবীন্দ্র নারায়ণ দে

প্রাচীনতম সভ্যতার ঐতিহ্য বুকে নিয়ে পৃথিবীর যে অংশটি আজও মহাকালকে উপেক্ষা করে সগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেই রহস্যময়ী রোম-এর হাত-ছানিতে সাড়া দেয় নি এমন পর্যটক খুব কমই আছেন।

হাজার হাজার বছর ধরে কত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক অপার বিস্ময়ে রোম-এর ধ্বংসাবশেষ-এর মধ্যে অতীতের ক্ষীণ পদধ্বনী শোনার চেষ্টা করেছেন।

গভীর নিশীথে কলোসিয়াম, রোমান-ফোরাম-এর ধ্বংসস্তূপের ওপর কান রাখলে আজও রোমুলাস্, জেস্‌পাসিয়ান, স্পেটিমিয়াস্, ক্রটাস্, এ্যান্টোনিও, ক্লিও-পেট্রার চাপা কণ্ঠস্বর শোনা যায়, সম্রাট নীরোর হুঙ্কার শোনা যায়, রক্তাপ্লুত জুলিয়াস্ সিজারের আর্তনাদ শোনা যায়।

ভেটিকানে সেন্ট পিটার্স-এর গির্জার সারি সারি বিশাল স্তম্ভের আড়ালে ভেমেন্টো, মাইকেল্ এ্যাঞ্জেলো, র‍্যাফেল, বার্নিনীর দীর্ঘনিঃশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে···।

কিন্তু এ সব কিছুর অন্তরালে এই রোম সহরের আর এক প্রান্তে এক হতভাগ্য কবির নীরব হাহাকার চাপা পড়ে আছে।

যারা আড়াই হাজার বছর আগের মানব সভ্যতার নিদর্শন সন্ধান করতে আসেন তাদের অন্তর হয়তো মাত্র দেড়শো বছরের প্রাচীন এক হতভাগ্য মুমূর্ষু কবির দুঃখে ব্যথিত হবে না।

কিম্বা হাজার হাজার লিরার বিনিময়ে যারা কণ্ডাক্‌-টেড্ ট্যুর্ করতে আসেন তাদের অনেকের ভাগ্যেই উপেক্ষিত কবির স্মৃতি বিজড়িত এই সাধারণ বাড়িখানি দেখার সৌভাগ্য হয় না।

আমার মত যাঁরা পায়ে হেঁটে রোম পরিভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন তাঁরা যদি সহরের উত্তর প্রান্তে বর্গীস্ ভিলার কাছে আর টাইবার নদী থেকে প্রায় আধ মাইল পূর্ব দিকে ভিয়া কন্‌ডোটি আর ভিয়া ডেল্ ব্যাবুইনো রাস্তার সংযোগ স্থলে এসে দাঁড়ান তবে তাদের এই অনাড়ম্বর সাধারণ বাড়িটি চোখে পড়তে পারে।

বাড়িটির নাম কীট্‌স-সেলী হাউস্। ইংলণ্ডের ভাগ্য বিড়ম্বিত কবি কীট্‌স এবং সেলীর নামে উৎসর্গীকৃত বাড়িটিতে অবশ্য কোনদিন সেলী আসেন নি।

বাড়িটির সামনে, রাস্তার অপর পারে হাজার হাজার পর্যটকের ভিড় হয় সুবিখ্যাত স্প্যানিস্ স্টেপ্‌স (Plaza De Spagna) দেখার জন্যে। গগনচুম্বি পাথরের এই সিঁড়ির দু পাশে সাদা, এবং লাল গোলাপের সমারোহ। অগণিত দর্শকের পদস্পর্শে মুখরিত এই স্প্যানিস্ স্টেপ্‌স রোম-এর একটি দর্শনীয় স্থান।

স্প্যানিস্ স্টেপ্‌স এর পাদমূলে রাস্তা এখানে খুব প্রশস্ত নয়। কীট্‌স-সেলী নামাঙ্কিত বাড়িখানিও কোন সুদৃশ্য গাম্ভীর্য পূর্ণ বিশাল অট্টালিকা নয় প্রায় দেড়শো বছর আগে এই বাড়িটির চার তলার পাশাপাশি দু খানি ঘর ভাড়া নিয়ে কীট্‌স বাস করেছিলেন। কিন্তু খুব বেশি দিন নয়।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ফিনস্‌ব্যারীতে এই ভাগ্যবিড়ম্বিত অসাধারণ কবি প্রতিভা জন্ কীট্‌স-এর জন্ম হয়।

জন্মক্ষণ থেকেই বোধ হয় ভাগ্যদেবী কাব্যপ্রেমিক কীট্‌স-এর সঙ্গে প্রবঞ্চনা শুরু করেন।

ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কীট্‌সকে আকৃষ্ট করেনি তাই পরবর্তী জীবনে চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষানবীশির পথ

অনুসরণ করেন। তারপর তিনি সন্ন্যাসীর কাষায়বস্ত্রে পদার্পণ করেন।

ইংরাজী সাহিত্যের দুর্ভাগ্য সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ভাবে কীট্‌স কোনদিনই সাহিত্য সাধনা করার সুযোগ পান নি।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিস্‌ ফ্যানী ব্রাউন, এক তরুণীর সঙ্গে বিবাহের জন্যে কীট্‌স অঙ্গীকৃত হন। কিন্তু অভিশপ্ত কীট্‌স-এর জীবনে এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

বোধ হয় ঠিক তখন থেকেই তাঁর জীবনে ঘন অন্ধকারের ছায়া নেমে এসেছিল।

যে লিরিক কাব্য সাহিত্যের জন্যে কীট্‌স অমর হয়ে আছেন সেই কাব্য প্রতিভাই হয়তো তাঁর জীবনের চরম দুঃখের কারণ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় কীট্‌স-এর কবিতাকে নির্মম সমালোচকরা কখনো সহানুভূতির চোখে দেখেন নি। হয়তো এ দুর্ভাগ্য কবির নয়, এ দুর্ভাগ্য ইংরেজী সাহিত্যের।

তাই কীট্‌স-এর এক অন্তরঙ্গ শিল্পী বন্ধু জোসেফ্‌ সেভেরেন্‌ এর সঙ্গে তাকে কোন এক অজ্ঞাত দিনে ইংলণ্ড ছেড়ে চলে আসতে হয়।

তখন সমগ্র বিশ্বের চিন্তাশীল মনীষীদের সমস্ত দুঃখ, গ্লানী ধুয়ে মুছে ফেলার ত্রিবেণী সঙ্গম ছিল ইটালীর ভেনীস, ফ্লোরেন্স, রোম কিম্বা নেপ্‌লস।

হয়তো এই আকর্ষণেই একদিন বায়রন্‌, সেলী, হাওথর্ণ, লংফেলো, ব্রাউনীংকেও ইটালীতে আসতে হয়েছিল। বন্ধুর সঙ্গে কীট্‌স প্রথমে নেপ্‌লস, পরে রোম-এর এই বাড়িটিতে এসে ওঠেন। তখন তার আর্থিক অবস্থাও স্বচ্ছল নয়।

কবিতার তীব্র সমালোচনার নির্মম কষাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কীট্‌স-এর স্পর্শকাতর মনে যে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল হয়তো তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল দুরারোগ্য ক্ষয়রোগ। ১৮২০ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে যে রোগের কোন সুস্পষ্ট চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হয়নি!

কিন্তু চরম মানসিক উদ্বেগের মধ্যেও এই মৃত্যু পথযাত্রীকে নির্মম সমালোচনার কটূক্তি উপেক্ষা করে নি।

কীট্‌স-এর তখন কবিতাগুচ্ছের মূল তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

"Endymion". "Poems". "Hyperion". "Lamia". "Isabella"-কে কেন্দ্র করে সমস্ত ইংলণ্ডে তখন সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে……।

দেখলে মনে হয় কবির সজ্জাকণ্টকি আজ আর তাঁর কোন স্মৃতি বিজড়িত নয়। দেড়শো বছর আগে ঘরখানি যে অবস্থায় ছিল আজ যদি ঠিক সেই অবস্থায় দেখতে পেতাম তবে আরো ভাল হত।

ঘর দুখানি এখন কীট্‌স এবং তাঁর শিল্পী বন্ধু সেভ্‌রেন এর স্মৃতির সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত

কীট্‌স-এর ব্যবহারের পাণ্ডুলিপিগুলি সুরক্ষিত কাঁচের বাক্সের মধ্যে সযত্নে সংরক্ষিত।

ঘর দুখানিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে শুধু অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে ঘরের সিলিং টিকে নীল এবং হলদে রং এখন প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে

ঘর দুটিতে পর্যটকের ভিড় নেই যে সামান্য কজন এসেছেন সবার মুখেই সমবেদনা ও সহানুভূতির ছায়া।

সেভ্‌রেন-এর আঁকা কীট্‌স-এর অন্তিম কালের একটি বিষাদপূর্ণ ছবি সবাইকার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—

—মুমূর্ষু কবির অসহায় কাতর দৃষ্টি……ঠোঁট দুটি অবাক্ত ব্যথায় ঈষৎ উন্মীলিত……

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কীট্‌স-এর মৃত্যু হয়।

সমস্ত পরিবেশটা আমাদের দেশের একটি কবির কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দেশেও একদিন একটি কবি জন্মেছিলেন। তার নাম পুকান্ত ভট্টাচার্য।

নির্মম ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র একুশ বছর বয়সে তাঁর জীবনেও পূর্ণচ্ছেদ নেমে আসে।

সেভ্‌রেন এর একটি চিঠিতে কীট্‌স-এর অন্তিম কালের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করা আছে।

"Dont be afraid, I will go easily.

—Thank God it has come."

এই রোম এর মাটিতেই কীট্‌সকে সমাধিস্থ করা হয়।

পোর্‌টা স্তান্ পাওলো—প্রটেস্টাণ্ট সেমেট্রী।

প্রাচীন রোম এর দক্ষিণ প্রান্তে রোমান প্রাচীরের সংলগ্ন পোর্‌টা স্তান্ পাওলোর সমাধি ক্ষেত্রের ঘন সবুজ গাছের ছায়ায় ঘেরা পাশাপাশি দুটি সমাধি—একটি কীট্‌স আর একটি সেভ্‌রেণ। এখানে সেলীরও সমাধি আছে।

কীট্‌স এর অভিশপ্ত জীবনের আক্ষেপ তাঁর ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কবির ইচ্ছে ছিল তার সমাধির ওপর লেখা থাক—"Here lies one whose name is writ on water."

• • •

সকালে গঙ্গাস্নান তারপর হাটবাজার। আলু-পটল এনেই কি নিস্তার আছে ছাত্রটির। বাটনা বেটে কুটনো কুটে উনুন ধরিয়ে রাঁধতেও হবে নিজেকে। রান্নার পর নিজে খেয়ে আর তিনজনকে খাইয়ে বাসন মেজে তবে তার পড়াশুনা।

রাত্রেও ঐ রান্না করতে হবে নিজের হাতে, স্কুল থেকে ফিরেও অবসর নেই। তাহলে পড়াশুনা করবে কখন?

আর্যানি গির্জার ঘড়িতে রাত বারটা বাজল। ছাত্রটি তখন উঠে বসলো। সারা রাত্রি ধরে চলল তার পড়াশুনা।

গির্জার ঘড়ি আর কি বাজবে! বাঙালীর ছেলে আর কি অধ্যয়ন তপস্যায় বসবে বিদ্যাসাগরের মত!

অপরাহ্নবতী

সুবোধ সিংহ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"কি হয়েছে ! কি হলো ?"

"আমি পালিয়ে এসেছি, দাদু !"

"একা ?"

একা ! একা এসেছে এইটুকু ছেলে ! কলকাতার রাস্তা—মোটর ট্রাম, বাস ; ছেলে-ধরা, বদমাস, গুণ্ডা ঠিক রাস্তা না চিনে ভুল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা সব আশঙ্কার কথাই তার মনে পড়ল। সুব্রতকে কোলে তুলে নিল, বুকে জড়িয়ে ধরল : তারপর চুমু দিতে গিয়ে দেখল একদিকের গাল জবা ফুলের মত লাল—স্পষ্ট পাঁচ আঙুলের একটি নিষ্ঠুর ছাপ ওর সুন্দর নরম আর কোমল গালে ফুটে উঠেছে।

পরীক্ষিৎ সে বিষয়ে একটা প্রশ্নও করল না, ওর ফোঁপানির কান্না এখনও মাঝে মাঝে বুকটাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দুলিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ব্যাপারটা খুব সাধারণ মায়ের ধমকানি অথবা বাপের শাসন নয়। নিশ্চয়ই কোন অবিচারের শাসন ওর সুকুমার মনে সাংঘাতিক একটা আঘাত করেছে। ভোমরার মত কালো উস্কোখুস্কো চুল নিয়ে, খালি পায়ে, নিতান্ত সাদাসিদে বেশভূষা পরে ও রাস্তা দিয়ে অন্ধের মত ছুটে এসেছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। কোনরকম পরিণামের কথা ভাবেনি, ভাবেনি এই দুঃসাহসের জন্যে তাকে কতখানি নিগ্রহ সহ্য করতে হবে। ডাইনে বাঁয়ে ঠিক মোড় বেঁকে বেঁকে সে চলে এসেছে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে। হায়রে ! ও জানে না ওর আশ্রয় কত দুর্বল, ওর এই হাত দুটোর জোর কত কম, কত কম ওর ভালবাসা প্রকাশের অধিকার।

নিজেই বাথরুমে নিয়ে গিয়ে সাবান দিয়ে তার হাত-মুখ ধুইয়ে দিল। ওর আলমারি থেকে সুব্রতর ভালো একটা গরম সুট, মোজা, এমন কি জুতো পর্যন্ত বা'র করে পরাল। রামেশ্বর এসে খাবার দিয়ে গেল। বিকেল হতে অনেক দেরী কিন্তু ওকে একটু সুস্থির ও সাবধান করা দরকার। ওর ভীত মুখ, শঙ্কিত চোখ, বিগড়ে যাওয়া মেজাজ, ভেঙে পড়া নার্ভের পক্ষে এখন প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন কিছু স্বাস্থ্যপূর্ণ বলকর পানীয় ও কিছু পুষ্টিকর আহার।

বোধ হয় খিদেও লেগেছিল ভয়ঙ্কর—অথবা শরীর ওর ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করতে চাইছে। সুব্রত সাবড়ে দিল দুই এক মিনিটে ওর প্লেটের সমস্ত খাবার। আর তাই দেখে পরীক্ষিতের বুকের ভিতরটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল, ওর গলার কাছে এসে তা যেন একটা বাধা ধরিয়ে দিল।

এক ফাঁকে পরীক্ষিৎ ফোনে সংক্ষেপে জানিয়ে এল তপতীকে সুব্রতর পালিয়ে আসার খবর। ওদিক থেকে এলোপাথাড়ি একটা উত্তপ্ততা অবিশ্যি ভেসে পড়েছিল, কিন্তু পরীক্ষিতের জবাবে দুর্জয় ক্রোধের আক্রমণের আঁচ পেয়ে সাময়িকভাবে তা একটু শান্ত হল বোধ হয়। বাইরে বেরিয়ে পড়া উদ্বেগ, খোঁজাখুঁজি, ছুটোছুটি

এতক্ষণে বোধ হয় ধরমুখো হয়েছে। এখন নিশ্চয়ই গবেষণা করে এই ভীষণ ডাকাতে ছেলেকে যার গাল টিপলে এখনও দুধ পড়ে যে এখনও ভালো করে ডিম খেতে কোটেনি কী করে শাস্তি দেওয়া যায় তারই পরামর্শ হচ্ছে ও-বাড়ীর মাথা-ওয়ালা উঁচু মহলে। এবং সেই সঙ্গে পরীক্ষিৎ এটাও পরিষ্কার ধারণা করতে পারল যে তার সম্বন্ধেও একটা গুরুতর মজলিস বসে গেছে কোড়ন কাটতে বাকী নেই কিছু। পরীক্ষিৎ মানুষটি যে সুব্রত ছেলেটির পক্ষে কতখানি অনিষ্টকারী তা একটা বই লিখেও ফুরানো যায় না এবং ছেলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদীদের গবেষণা নীরবে হাজু হয়ে তপতীকেই শুনতে হচ্ছে।

"কি হলো কোনে এতক্ষণ ?" সুব্রত এতক্ষণে অনেকটা সামলিয়ে উঠেছে কিন্তু পরবর্তী শাস্তির ভয়ের সম্বন্ধে এখনও ভীষণ উদ্বেগ আছে।

"তোমার যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

"হুঁ !....কি বললো মা ?"

"তোমার মাকে তো সে বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি ! তোমার কাছ থেকেই সত্যি কথা শুনবো। আচ্ছা ! এবার বলতো কি হয়েছিলো ?"

"লাট্টু নিয়ে খেলা করছিলাম আমরা—আমি তো লাট্টু চালাতে জানি না—তুমি তো জান ! আমি লাট্টু চালাতে শিখেছি দাদু ?"

"না—তুমি লাট্টু ঘোরাতেই জানো না !"

"তা হলে আমি কি করে মন্টুর মাথায় লাট্টু ছুড়বো ? সেই কথাটা বলতো। আমি ওদের খেলা দেখছিলাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। নিপু—নিপুকে চেনো দাদু ?"

"না। নিপু চেনবার দরকার নেই !"

"সেই নিপু ছুড়লো লাট্টু আর দোষ হল আমার।—বুড়ীটা সেখানে ছিলই না একদম—সে এসে বললো, 'তোমারই কম্ম' ! আমি কি ছুড়তে পারি দাদু ? বল না,—আমি ছুড়েছি কিনা।"

"তারপর ?"

"তারপর মন্টুর কপাল দিয়ে খুব রক্ত পড়লো। নিপু, রতন, চুনী আর বিশু ভাই দেখে কোথায় যে পালিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। বুড়ী এসে ধরলো আমাকে।

"কোন্ বুড়ী ?"

"আমার দিদি বুড়ী নয় ! সে তত পাজী নয় ; ওর একটা বোন—রাক্ষসীর মত চেহারা।"

"কি করলো বুড়ী ?"

"এসেই—'আমি নিজের চোখে দেখেছি', আরো কি সব বললো—কিচমিচ্ কিচমিচ্ করলো—ওর কথা বুঝতে পারি না কিছু !—'তুই করেছিস।"

"তুমি কি বল্লে ?"

"আমি বললাম—'না'।"

"তুমি বলেছ তো আমি মারি নি ?"

"তাই তো বলেছি ! ও বদ্ধ, মিথ্যেবাদী, পাজী, শয়তান—শয়তান বলবে কেন ? মিথ্যেবাদী বলুক, পাজী বলুক কিন্তু শয়তান কেন বলবে ও ? আমি কি ঈশ্বরের বৌ চুরি করেছি ! আমি বললাম—'খবরদার ! শয়তান বলবে না !—দাদুকে বলে দেবো'—এ দাদু নয়। অন্য বাড়ীর দাদু !"

"এই রে ! খেয়েছে !"

"তুমি বলনি আমাকে ? শয়তান, তার কা বাচ্চা, শালা—এ-সব কথা ভদ্রলোকের ছেলের বলতে নেই ? পাপ হয়—ভগবান রাগ করে ? বলনি তুমি ? শেষে—শোনই না সবটা !—'এক থাপ্পড় মেরে তোর দাদুর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবো।'—ঈস্ ! মুণ্ডু ঘোরাবেন উনি। আচ্ছা দাদু। ও তোমার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারে দাদু ?—'কে করেছে বল সত্যি করে' !"

"তুমি কি বলেছ এর উত্তরে ?"

"নিপু করেছে বল্লাম, 'তোমার নিজের নাতি' !"—'কখনোই না ! কখখনো না ! হতেই পারে না ! তোমাকে দেখেছি তুমিই দলের পাণ্ডা !'—পাণ্ডা মানে কি দাদু !—আমি বল্লাম 'মন্টুকেই জিজ্ঞাসা কর না'।"

"জিজ্ঞাসা করেছিলো ?"

"করেছিলো তো—।" সুব্রতর চোখ এইবার আবার ছলছল করে উঠল।

"কি বললো মন্টু?"

"মন্টু?" চোক গিলল সুব্রত—"মন্টু বললো আমি করেছি। আর তখখুনি বুড়ী আমাকে ঠেলে ধরলো—চুলের মুঠি ধরে বললো—'এইবার মারি এক চড়।'—'মাকে বলে দেবো।'—আর তখনি ঠাস করে এক চড়!"

"কিন্তু তুমি পালিয়ে এসে ভাল করোনি সুব্রত!"

"আমি কি পড়ে' পড়ে' মার খাবো?"

"সকলে কি ভাববে ভাবো?"

"কি?"

"তুমিই দোষ করেছ, নইলে পালিয়ে যেতে না!"

"আমি লছমন গোয়ালার কাছ থেকে একটা মন্তর শিখে নেবো। এমন মন্তর জানে না—যে তোমাকে ভেড়া বানিয়ে দিতে পারে। মন্তরটা শিখে বুড়ীকে মন্তরটা খাওয়াবো। তখন কি হবে বুড়ীর বলতো?"

"বোধ হয় বুড়ীর খিদে বেড়ে যাবে—আর হরদম রান্নাঘরে কাটবে তোর মা'র।—ওরা যাবে কবে?"

"অনেক অনেক দিন পরে। গঙ্গাতে স্নান করে'—তারপর যাবে। মন্তরের আসল কথাটাই তুমি শুনলে না দাদা!"

"বল!"

"মন্তর খেয়ে ও স্বপ্ন দেখবে। ভগবান মা দুর্গা গায় অসুর মূর্তি ধরে এসে ওকে এমন চাবুক মারবে যে—বুড়ী হাউ-মাউ করে কাঁদবে। সত্যি কথা না বললে তো অসুর ওকে ছাড়বে না। তোর হলে বুড়ী সকলের কাছে তখন সত্যি কথাই বলবে। সত্যি কথা যখন বলবে তখন সকলেই বুঝবে—না তো! সুব্রত তো কোন দোষ করেনি!"

"ঐ মন্তরটা আমারও দরকার।"

"শিখবে?"

"হুঁ।"

"না—।"

"কেন?"

"আমি কাউকেই শেখাবো না।—দেখনা তুমি বলে বলে বুড়ীটার কি মজাটা করি!—তখন বলবে, ভাই এ মন্তরটা আমাকে শিখিয়ে দাও, শিখিয়ে দাও। তোমাকে শেখাবো না!"

"আমি কি অপরাধ করলাম?"

"শেখাব। আজ।—। তুমি যদি আমাকে আজ ও বাড়ীতে না পাঠাও তাহলে তোমাকে শেখাবো। মা কখন এখানে আসবে বাদু?"

"মাকে আসতে মানা করে দিয়েছি।—আমার কাছে থাকবে তো তুমি?"

ফোনে তপতীর সঙ্গে সেই রকমই কথা হয়েছিল। ও থাকবে আজ রাতটা এখানে। থাকার কথাতে সুব্রত আজ অসুখী নয়। বাপমায়ের খবরদারি এবং শাসনের তাবিটা লাঘব হলে সন্তানের জীবনে অকস্মাৎ যে উৎসবের আনন্দ জাগে আজ এইমাত্র সুব্রতর মুখে চোখে সে সেই আনন্দের আভাস দেখতে পেল। ওর ছোট্ট অল্প কয়েক বছর বয়সের বাক্তিত্ব তার চেয়ার টুল মত কাজ করবার একটা সুযোগ পেয়ে গেল এতদিন বাদে। বিকেল পর্যন্ত ও পরীক্ষিতের টেবিলে বসে মাথা গুঁজে নীরবে অনেক-গুলো রঙের ছবি এঁকে গেল। ছবিগুলো খুব সম্ভব কোন এক বিশেষ গ্রহলোকের অদ্ভুত আকৃতির মানুষেরই ছবি। কিন্তু ছবিগুলোর তাৎপর্য বুঝতে হলে সুব্রতর মনের সন্তরালে ডুবিতে নেমে আসতে হবে। ও যেখানে নিগৃহীত, অবিচারে শাসিত, বিশ্বাস করে মর্মাহত হয়েছে সে জগতে ওর দুঃখটা অসুর হয়ে ওঠে প্রভুভক্ত ভৃত্যের মত ওর সমস্ত কাজ, সকল ইচ্ছে, অনেক স্বপ্ন পূরণ করে যাচ্ছে। বিকেলে পরীক্ষিতের সঙ্গে বাগানে গিয়ে অনেক তথ্য জানবার জন্যে তার মন জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল। সুব্রতও এমন লোককে খুশী করতে চায় যে খুশী হবার কদর বোঝে।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ একটা ছবি পরীক্ষিতের মনে দোল খেয়ে গেল। সে ছবি তপতীর জীবনের ছোট একখানি অপরিচিতির অংশ। ওর মনের যা কিছু সুন্দর একটি অমর্যাদায় পড়ে তার সমস্তটুকুই যেন

ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এখন সে কি করছে? ভাবতে গিয়ে পরীক্ষিৎ এমন একটি বেদনার কাছে এল যা তাকে আকুল করে তোলে অসহিষ্ণু ও অপারগ একটি দুঃখে। যার নিদ্রা ওর সব-চেয়ে বেশী বাজে, সেই নিদ্রাতে ভরে গেছে ওদের বাড়ী। হয়তো এ নিদ্রেতে রণেশেরও নীরব অনুমোদন আছে অনিচ্ছায় তপতীও হয়তো ওদেরই দলে ভিড়েছে। পান খেয়ে, যাও কস্মিন-কালেও খায় না, এমন পোজের মানুষ হয়ে স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে প্রাণান্ত চেষ্টা করছে। মন্থর গতিতে চিবিয়ে চিবিয়ে আর মাঝে মাঝে মুখ হা করে পান খাচ্ছে আর এই মুখ খোলার সুযোগে অলক্ষিতে ওর মনের বিষম আহত আবেগকে মুক্তি দিচ্ছে। ঠিক এই ভাবের চিত্রটি মাঝে মাঝেই পরীক্ষিতকে ভীষণ বাড়া দিয়ে যায়। এবং প্রত্যেক বারেই পরীক্ষিতের সহজ ব্যক্তিত্বকে তা যেন একটি নিদারুণ অসহায় ভীরুতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। আজও সেই মাকড়সার জালের মধ্যে সে জড়িয়ে যাচ্ছিল, প্রাণান্ত চেষ্টা করেও কোন রকম উদ্ধারের পথ যেন সে খুঁজে পাচ্ছিল না। তখনই তার মনে হল সুব্রতকে রেখে বোধ হয় সে ঠিক করে নি। মনে মনে তখনই স্থির করল ওকে আজই সন্ধ্যার আগে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।

[ক্রমশঃ

সন্ধ্যার পর হান্স অ্যাণ্ডারসন বেরিয়েছেন সন্ধ্যা ভ্রমণে। শীতের রাত্রি। বাহিরে ভীষণ তুষারপাত হচ্ছে। পথঘাট নির্জন। মাঝে মাঝে নিতান্ত প্রয়োজন দু'একজন লোককে দেখা যাচ্ছে পথে বেরুতে।

অ্যাণ্ডারসন একটা ছোট বাড়ীর সামনে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন: শিশুদের হাস্যকলরব জানলার ভেতর দিয়ে বাহিরে আসছিল। তিনি দাঁড়িয়ে শুনলেন। শিশুরা এরকম হাসছে কেন? একটু কান পেতে রইলেন অ্যাণ্ডারসন।

চমৎকার গল্প বলছেন এক বৃদ্ধা। কী সে-সব মজার গল্প! অ্যাণ্ডারসন তখন ভুলে গেলেন নিজের গন্তব্যস্থল। চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন সেইসব গল্প।

বাড়ী ফিরে এসে ভাবলেন শিশুরা অফুরন্ত আমোদ পায় যে-সব গল্প শুনে সে-সব গল্প লিখলে কেমন হয়?

তারপর থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিশু গল্প রচয়িতা হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি [illegible]
[illegible]
[illegible]

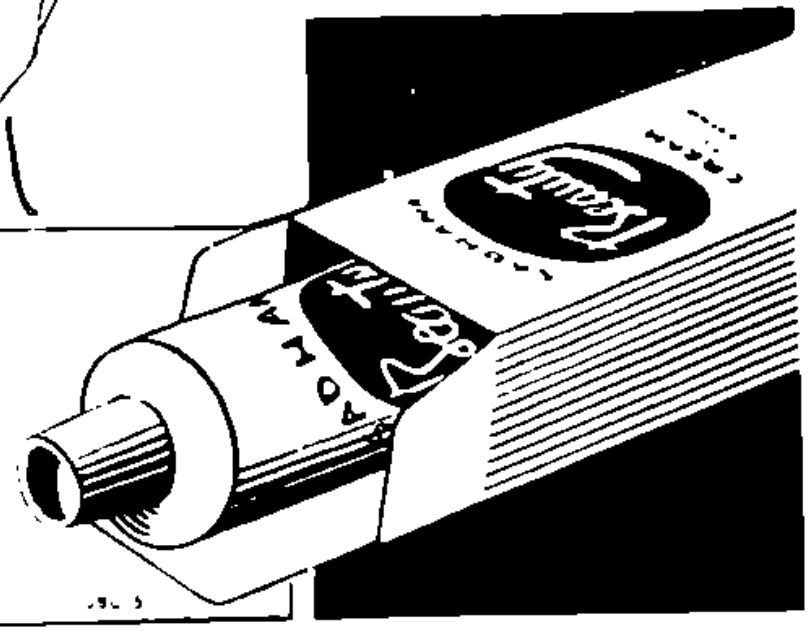

সাধনা ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

Regd. No C 3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও প্রীতিকর করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

দীপালী সংখ্যা * ১৩৭৯

আপনি ?

কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবি,

সরকারী কর্ম্মচারী, শিক্ষক

অথবা

ছাত্র ?

যে কাজেই নিযুক্ত
থাকুন না কেন,
সেই কাজের মূল্য
সম্পাদন-এর অর্থই
হ'ল আপনার নিজের
ও দেশের কল্যাণ সাধন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল রূপায়নে
সহযোগিতা করে ত্রিপুরাকে
সমৃদ্ধ করে তুলুন।

ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন
অধিকার থেকে প্রচারিত।

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করতে থাকলে তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন | **সাধনা টুথপেষ্ট**

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৩৮

স্বনাম ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এল,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের ইন্ডাস্ট্রিয়াল শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য

অনেক সিগারেটই খেয়ে দেখলাম-
আসল তামাকের স্বাদে
উইল্‌স প্লেনের
তুলনা হয় না

(আর ৮০ পয়সা* প্যাকেট—দামের
সুবিধা ত' বটেই)

উইল্‌স প্লেন খান
-ভাল লাগবে

*

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

শারদীয়া সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৭৯,

অষ্টবিংশতি-বর্ষ

গল্প ভারতী

NOVEMBER 1972

মূল্য : দুই টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র

বার্ষিক পূজা সংখ্যা সহ—কুড়ি টাকা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোপবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

১১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ

৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

ফলমূল ও শাকসব্জি সংরক্ষণ করুন বিনা আয়াসে

আপনি কি আপনার পছন্দসই ফলমূল বা শাকসব্জি দীর্ঘ বছর ধরে খেতে চান ? তাহলে যে কোনও একটী সর্বজনীন সংরক্ষণ কেন্দ্রে চলে যান। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন এই কেন্দ্রগুলিতে আপনার পছন্দসই ফলের জ্যাম, জেলী, চাটনী, স্কোয়াশ, রস, আচার ও মার্মালেড সংরক্ষণ করা হয়। সংরক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, সেবা করার একটী সময় ঠিক করুন। ওদের জিজ্ঞাসা করুন কত ফলের সঙ্গে কত চিনি লাগবে। প্রয়োজনীয় পরিমাণ ফল ও চিনি নিয়ে এ কেন্দ্রে মিনিটের সময়ের মধ্যে চলে যান। টিনবন্দি করিয়ে নিন বা অন্য যে কোনও ভাবে সংরক্ষিত করিয়ে নিন। এর জন্য খরচ হবে সংসামান্য।

প্রশিক্ষণ :— আপনি সংরক্ষণের প্রণালী যদি শিখতে চান তাও শিখতে পারেন।

প্রশিক্ষণের জন্য কোনও খরচ খরচা নেই। মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যে আপনি সংরক্ষণের কৌশলটী শিখে নিতে পারবেন আর তার জন্য একটী সার্টিফিকেটও পাবেন।

সর্বজনীন সংরক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করুন

১৫৭/বী, 'ব্লক-'এফ'
নিউ আলীপুর
কলিকাতা-৫৩
টেলিফোন : ৪৫৫৪০৭

১০৩/এ, বোরিং ক্যানাল রোড
পাটনা-১
টেলিফোন : ২৫৬৫৪

কেয়ার অফ মেসার্স প্রাসাদ
রাইটস কোং
কম্পাউণ্ড, উলুবাড়ি
গৌহাটী-৭
টেলিফোন : ৬৬৭৪

৫৯৮ 72·357 Ben

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট- **নিম।**

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত
পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর
বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে,
মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে
বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দুর করে
শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

ভারতের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করুন

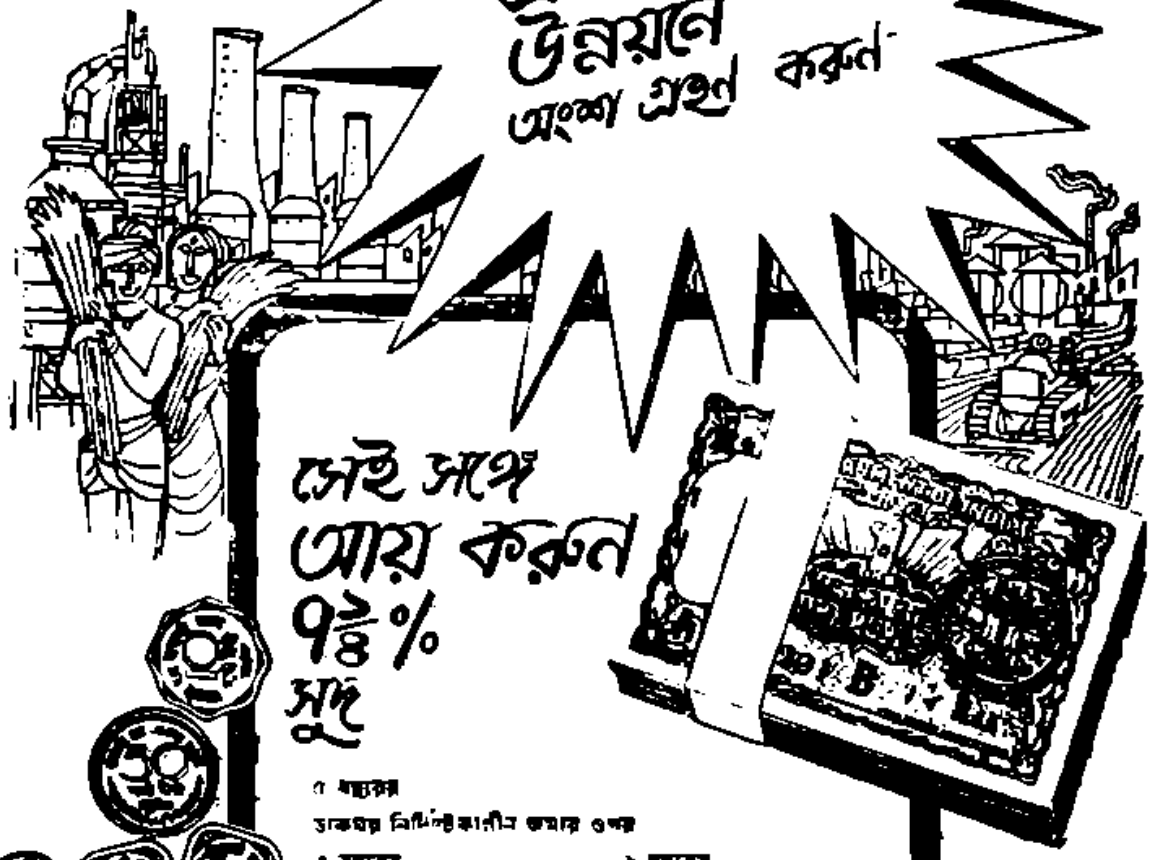

সেই সঙ্গে আয় করুন ৭½% সুদ

৫ বছরের
ডাকঘর বিনিয়োগকারীর জন্যে ওপর

৫ বছরের জন্যে ৭%

১ বছরের জন্যে ৬%

এই সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটির ও ডিপজিটের ওপর প্রাপ্য সুদ নিয়ে বছরে মোট ৫০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর আয়কর প্রদেয় না।

আপনার ডাকঘর কিংবা আপনার জেলার জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার জেলা সমন্বয়কের কাছে খোঁজ করুন।

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

বিজ্ঞাপন নং 212

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত, ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

রাজু কতদিন একা থাকবে ?

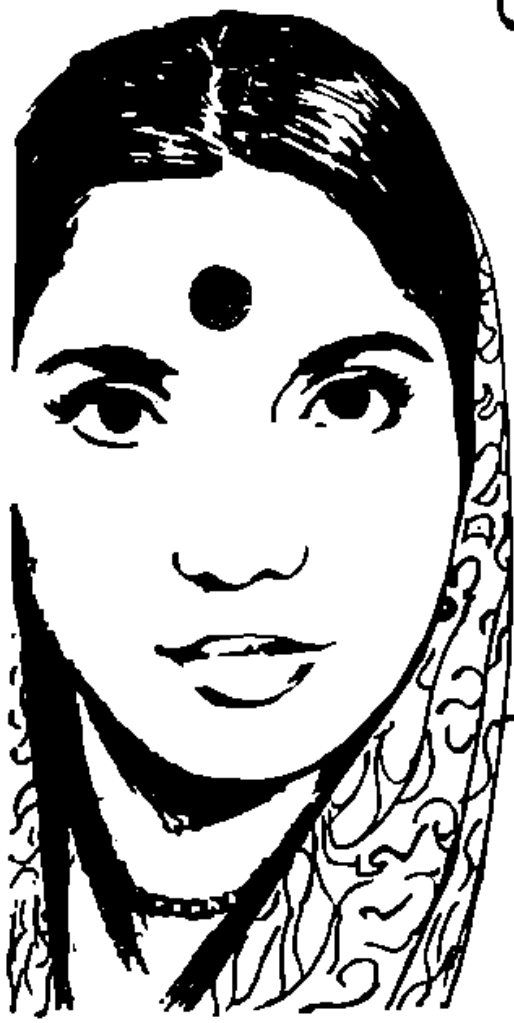

রাজু দুবছরের হতে না হতেই চম্পার শ্বাশুড়ী আর একটি নাতির মুখ দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ওঁর চিন্তাধারাই ছিল ঐ রকম।

কিন্তু চম্পা জানে যে রাজুকে আরও এক বছর অন্ততঃ আদর-যত্ন করতে পারলে ও ভালোভাবে বড় হয়ে উঠবে।

বাচ্চাদের জন্মের মধ্যে যথাযথ ব্যবধান রাখলে বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো হয়।

এই সংখ্যায়

*

সম্পাদকীয়

এবারে নিউ দিল্লী কালীবাড়ী ৪

ঢাকা নগরীর একটি প্রাচীন কালী মন্দির (রমনা) ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান সংকলন : উৎপল চক্রবর্তী

মঙ্গল পাণ্ডে

ক্ষুদিরাম ১৫

কানাইলাল

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৭

ভগৎ সিং ১৯

সূর্য সেন ২৫

দীনেশ গুপ্ত ২৭

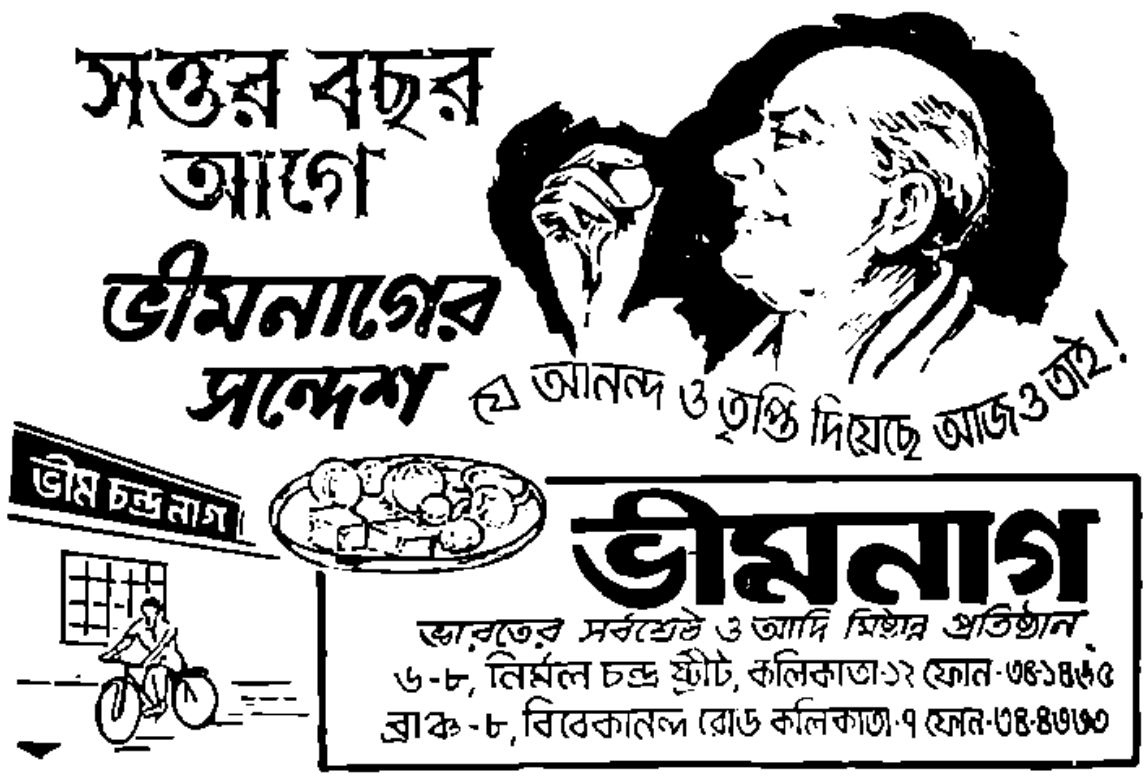

এই সংখ্যায়

গল্পের আসর		৩১
মহাজীবন	নির্মলেন্দু গৌতম	৩৩
সাদা কালো	সুব্রত ভদ্র	৩৭
যা রটে তা বটে !	সুবোধ সুন্দর রায়	৩৯
শরীরে সূর্যের দাগ	কিরণশঙ্কর মৈত্র	৪৫
যখন যেমন	তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭৮
কলম	অমিয় চৌধুরী	৫২
একক পদাতিক	অনিল কুমার দলুই	৫৯
অংক	নয়নকুমার রায়	৬৮
অলৌকিক	সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৭৫
বাঙালী মানসে মা কালী	অনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৭৭

এই সংখ্যায়

দীপালী ভারতের ঘরে ঘরে		৮৫
সেদিনের দীপালী উৎসব	তনাথ উপাধ্যায়	৮৭
এই রাত দীপালীর	গৌরীশংকর দে	৮৮
দীপান্বিতা : দীপাবলী : দেওয়ালী	শ্রমিতাকুমারী বসু	৯০
পূর্ববাংলার সেকালের কালীপূজা	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	৯৬
দক্ষিণের দীপাবলী	ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৯৯
দেওয়ালী পরব—বিহারে	জ্যোতির্ময়ী দেবী	১০৬
উত্তর ভারতের দেওয়ালী	অভয়ঙ্কর	১০৯
মহারাষ্ট্রের দেওয়ালী	কমলা ভাগবত	১১২

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

প্রকাশ চন্দ্র দত্ত

৫,৬, হেয়ার স্ট্রীট.
ফোন : ১৩-১৮১১

শাখা
২৮; যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

৩৩, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৩-১৪৫০

এই সংখ্যায়

দীপালী ও ভাইফোঁটা		১১৫
দীপান্বিতা উৎসব ও মেয়েরা		১১৬
দেওয়ালী উৎসবের খাবার	শকুন্তলা	১১৭
দীপালীর আলোক সজ্জা	বাণী গুহঠাকুরতা	১১৮
বাংলার উৎসব দেওয়ালী	শুক্লা বসু	১২০
লক্ষ্মীব্রতের আলপনা	কল্যাণী মুখোপাধ্যায়	১২১
লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর ব্রতের কাহিনী	অনীতা গঙ্গোপাধ্যায়	১২৩
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা	বেলা দে	১২৫

দীপালির
সাদর অভিনন্দন

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

হেড অফিস : কলিকাতা

আজকের শুভদিনে আমাদের
সমস্ত গ্রাহক ও দেশবাসীর সুখ
ও সমৃদ্ধি কামনা করি এবং
জাতিগঠনের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টায়
আমাদের সামিল হওয়ার সঙ্কল্প
জানাই আবার নতুন ক'রে।

UCO-14/72

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

পশ্চিমবঙ্গ

প্রতি কপি : ১৫ পয়সা বার্ষিক : ৭৫০ টাকা
'পশ্চিমবঙ্গ' বিজ্ঞাপন প্রচারেরও উপযুক্ত মাধ্যম

বিজ্ঞাপনের হার
তৃতীয় প্রচ্ছদ—২০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা—১২৫ টাকা
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা—৭৫ টাকা

গ্রাহক হবার জন্য ও বিজ্ঞাপন প্রচারের শর্তাবলী
সম্পর্কে নিম্নে ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

বিজনেস ম্যানেজার
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৩, আর. এন. মুখার্জী রোড, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি ৩১৬০।৭২

বাজার মাত করেছে

আপনাদেরই চাহিদায়
রুবি ডাস্টের কদর দিন দিন
বেড়েই চলেছে

লিপটনের রুবি ডাস্ট

গুঁড়ো
চায়ের
রাজা

কেশরি বাঁধনে বন্যা ছিল কি বাঁধা ?

ক্যাম্ফারাইডিন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর
দিল্লী ○ মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ লক্ষ্ণৌ

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর শক্তিসাধনায় এক নবযুগের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি ধ্যানে মৃন্ময়ী বঙ্গজননীর মধ্যে চিন্ময়ী মা'কে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ যে শক্তিসাধনায় বাঙালীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন—উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন তাহার উত্তর সাধক।

স্বদেশী যুগে বাংলার যে-সব বীর সন্তান দেশ-মাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাঁদের শক্তি সাধনার গুরু ছিলেন ঋষি বঙ্কিম, স্বামী বিবেকানন্দ ও উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

আজ আমরা শক্তিসাধনার তাৎপর্য একেবারেই বিস্মৃত হয়েছি, যার ফলে আমরা আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম-চেতনা হারিয়ে ফেলে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি।

একমাত্র শক্তিসাধনার দ্বারাই সম্ভব নানা সমস্যা-জর্জরিত এই জাতির পুনর্জাগরণ ও প্রতিষ্ঠা। কাজেই আমাদের আবার একান্তভাবে শক্তিসাধনায় আত্ম-নিয়োগ করতে হবে।

শক্তিপূজার উৎসব অনুষ্ঠানের আনন্দমুখর পরিবেশকে আরোও আনন্দোজ্জ্বল করতে আমাদের এই আয়োজন।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিমিটেড

আবিষ্কারক : রসোমালাই

কলিকাতা ঃ ব্যাঙ্কালোর

অষ্টবিংশতি বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা
দীপালী ১৩৭৯

সম্পাদকীয়

CALC... UNIVERSITY LIBRARY

জয় মা কালী !

কালী মূর্তির পরিকল্পনা কে করেছিলেন জানি না, তিনিই করে থাকুন তিনি মহাসাধক সেই সাধক-প্রবর এই দুঃখ-দারুণ ভীষণ মূর্তিকে মা বলে ডেকেছিলেন। মায়ের সে মূর্তিটিকে তিনি কোথাও শোভন, সুন্দর বা কোমল করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। মায়ের সেই সংহার রূপকেই তিনি জননী বলে সম্বোধন করেছেন।

এই প্রতিমা আনন্দময়ী প্রতিমা নয়।

জীবনের উষালগ্নে মমতাময়ী যে-জননীর সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়, সেই জননীই এখানে প্রকটিতা হয়েছেন তাঁর সত্যরূপে।

কালী তো কালের তদাংশ।

সেই তদাংশ আমাদের এই অনিত্য এবং ক্ষণস্থায়ী জীবনকাল।

সেই ক্ষণস্থায়ী এবং ভঙ্গুর জীবন বিনাসক্ত এবং নির্লিপ্তির মহাকালকে স্পর্শ করে তারই ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালী।

সেই কালী কি বলেছেন ?

বলেছেন—এখানে জীবনের চেয়ে মৃত্যুই সত্য।

কিন্তু এই মৃত্যুর বিভীষিকা দেখে তোমরা ভয় পেয়ো না উভয় হস্ত উত্তোলন করে তাই তিনি বলছেন 'মাভৈঃ'।

যে-মা আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি, সেই মা-ই আমি তোমাদের সংহার করবো।

তার জন্য মায়ের লজ্জার সীমা-পরিসীমা নেই।

মা তাই লজ্জায় জিব কেটেছেন।

প্রকৃতির এই অমোঘ সত্য মাকে পালন করতেই হবে।

কিন্তু এই মৃত্যুর সিংহদ্বার অতিক্রম করে মা-ই আমাদের নিয়ে যাবেন নব নব জীবনের অমৃতলোকে।

সৃষ্টি-রহস্যের এই খেলাটা ভাল জমবে না বলে মৃত্যু এবং তার পরবর্তী জীবনের মাঝখানে মায়ারূপিনী মা-ই টেনে দিয়েছেন বিস্মৃতির একটি কৃষ্ণ যবনিকা

এ তো গেল আমার নিজের তৈরি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

কিন্তু এ সব-কিছুকে নাকচ্ করে দিয়ে সেই নির্বাক মৃন্ময়ী প্রতিমাকে কথা বলালেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কথা বলালেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে।

সে-মন্দির এখনও রয়েছে। সে-প্রতিমা এখনও জাজ্বল্যমান।

এখন আর সে-প্রতিমা কারও ডাকে সাড়া দেয় না!

তাই'লেই মনে হয় তিনি সর্বঅন্তর্যামী আর সবার অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিতা। পুলকিত হৃদয়ের ঐকান্তিক ডাক শুধু শুনতে পান তিনি।

শুধু শুনতে পাওয়া নয়, শুনতেও পান, জবাবও দেন।

জবাব দেন তিনি প্রশ্নকর্তার অন্তর্লোক থেকে।

যে-অন্তর সদাজাগ্রত এবং নির্মল, জবাবের প্রতিধ্বনি ঘর সেইখানে।

ধ্বনি প্রতিধ্বনি যাই হোক, সে-সব জ্ঞানের কথা মানুষ অনেক সময় উপলব্ধি করতে পারে না।

এ-সব শাস্ত্রিত্য পরিহার কর।

এ তোমার অহঙ্কার। এ তোমার লোভ।

অহঙ্কারী এবং লোভী কখনই শান্তি পায় না।

দীন এবং বিনয়ী হও—যদি শান্তি চাও।

চাই মায়ের ওপর অগাধ বিশ্বাস।

মা বলেছেন, 'যে আমাকে অনুসরণ করে সে কখনও অন্ধকারে পথ হারায় না।'

সুতরাং মাকে অনুসরণ কর। তিনি তোমার সঙ্গেই রয়েছেন। একটি মুহূর্তের জন্ত মার কথা বিস্মৃত হয়োনা।

তোমার মধ্যে কি আছে মার কাছে কিছুই অবিদিত নয়। অন্তর্যামী মা সবই জানেন।

নিজেকে কোনোদিন শ্রেষ্ঠ মনে কোরো না। আত্মপ্রাণ মহা পাপ। মার চোখে তুমি হয়ত অপরের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হতে পার।

সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

• • •

"আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র ধ্যানদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, মায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ। দ্বন্দ্ব-দ্বৈন-দ্বিধা-দ্বন্দ্বিত-পীড়িত বাংলার বুকে যখন মৃত্যুর তাণ্ডব-লীলা চলিয়াছে, তখন দেবমাতৃকার ভবা কালিকার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া তিনিই বলিয়াছিলেন—

'কালী-অন্ধকার-সমাচ্ছন্না কালিমাময়ী। হৃতসর্বস্বা—এইজন্ত নগ্নিকা। আজ দেশের সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী। হায় মা।

'কলকাতার দুর্গোৎসবে' তিনি তাঁহার অনুকরণীয় ভাষায় বলিতেছেন—যদি দশভুজা দশপ্রহরণধারিণী জননীকে আবার বসাইবার প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহা হইলে আলস্ত ও ইন্দ্রিয়াসক্তি বিসর্জন দিতে হইবে এবং সকল ভেদ-বুদ্ধি পরিহার করিয়া ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইতে হইবে।"

শক্তি সাধক কমলাকান্ত

প্রশান্তকুমার রায়

বাংলার শক্তি সাধনার মধ্যযুগি—যেন একটি বৃন্তে দুটি প্রস্ফুটিত ফুল, যাঁদের প্রাণারাম সঙ্গীত লহরী বাংলার মাঠে-ঘাটে পথে-প্রান্তরে আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বাঙালীর শক্তি-সাধনা যতদিন থাকবে ততদিন তা চলবে তাঁদের মা-মা বলে ডাক সমগ্র জাতীর জীবনে এক নব-জীবনের সঞ্চার করছে। সেই দুই সাধক প্রবর-হালি-শহরের রামপ্রসাদ আর বর্ধমানের কমলাকান্ত। সাধক রামপ্রসাদ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেই বলেছি, এবার-কমলাকান্ত।

বাংলার এগারশ উনআশি সাল।

বর্ধমান রাজ প্রতিষ্ঠিত একশ আট শিব মন্দির শোভিত অম্বিকা-কালনা, সুধবনী নদী যার অঙ্গ বিধৌত প্রবাহিত। বিদ্যাবাগিশদের পাড়া, ভট্টাচার্যদের ঘর—

সাধক কমলাকান্ত জন্মেছিলেন এই ঘরে। পিতা ছিলেন ঘরের ভট্টাচার্য, মায়ের নাম মহামায়া দেবী। কমলাকান্ত ছিলেন জ্যেষ্ঠ আর কনিষ্ঠ শ্যামাকান্ত। যারা জন্মদের কাছে চালায় ছিল তাঁদের মামার বাড়ী। শৈশবেই কমলাকান্তের পিতা মারা যান, তাই তিনি মায়ের সঙ্গে চলে আসেন মামার বাড়ী চালায়। চালায় তখন ছিল রাঢ়ের অন্যতম সংস্কৃতির পীঠস্থান।

বর্ণের আদি-ক। ক-এর এক অদ্ভুত মাহাত্ম্য আছে! ক-এ কৃষ্ণ, ক-এ কালী। ভক্ত প্রহ্লাদ ক-এর কৃষ্ণে বিভোর, দিবানিশি শুধু হা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বলে কেঁদেছেন। ভক্ত কমলাকান্ত-ও তাই—কালী, কালী বলে পাগল হয়েছেন। খুঁজে বেড়িয়েছেন শুধু শুধু করে, তাঁকে পাওয়া যায় কিনা, অবশেষে সন্ধান পেয়েছেন, প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়েছেন মা, ভক্তের সকরুণ প্রার্থনাকে উপেক্ষা করেন নি। তাই তো বলি, ডাকার মতো ডাকলে মাকে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। যা ঘটেছিল কমলাকান্তের। নিশুতি রাত, মাঝে মাঝে পাঁচার দু'একটা কর্কশ শব্দ। কিন্তু বালকের প্রাণে ভয়-ডর নেই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে —শেষে মা বিশালাক্ষী দেবীকে দর্শন করে শিমুল গাছের তলায় শকুনুতির আসনে বসে বালকটি ধ্যানে মগ্ন। আড়ালে লক্ষ্য করে চলেছেন টোলের পণ্ডিত মশায় শেষে ভোর হল। গাছের পাতার ফাঁকে সূর্যের কিরণ গা স্পর্শ করল বালক ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরল। টোলের পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই দেবতার কোন অংশ মনে করে প্রণাম জানালেন সেই বালকের উদ্দেশে। বালক কমলাকান্ত কিছু দিনের মধ্যেই হলেন সব বিষয়ে পারদর্শী। কী লেখাপড়ায়, কী বাক-বিতণ্ডায়, কী আবৃত্তিতে আর সঙ্গীত রচনায় তো কথাই নাই—সঙ্গীত প্রবর।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতে বাঙ্গালীর মনে ভক্তির উৎস উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যার কাছে, তাঁর যত আবার, অভিমান, যত প্রার্থনা। সবই তার সঙ্গীতে আমরা পাই। তিনি চেয়েছিলেন, কেবল মায়ের চরণ। তাঁর কামনা,—যেন অন্তে কালী নাম করতে করতে প্রাণটা "যায় যা বেরিয়ে"।

বীরভূমে বামাক্ষেপা মহাশ্মশানে মার সাধনা করেছিলেন। তাঁর পূর্বে বর্ধমানে কমলাকান্ত তাঁর সাধন-সঙ্গীতে বাঙ্গালীর মনে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করেছিলেন। আর তার পরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলা দেশে কমলাকান্ত বিশেষ কোন স্থান পান নি, এমনকি তাঁর জন্মস্থানেও।

তার শৈশব কাল যে স্থানে অতিবাহিত হয়েছে, সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই নেই, তাও অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশে। অবশ্য যার ব্যপ্তি ভক্তের অন্তরে সদা সর্বদা, সামান্য স্মৃতিস্তম্ভে তার কিবা এসে যায়!

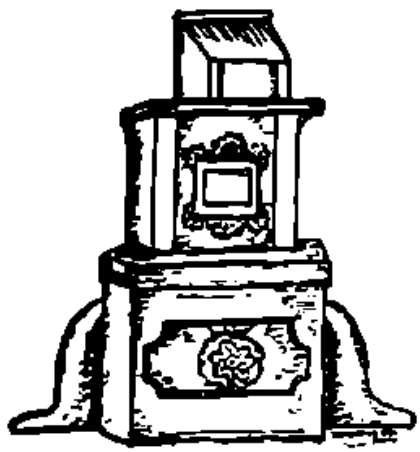

এই স্মৃতিস্তম্ভে লেখা আছে :—

"স্বর্গীয় প্রভাকর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহধর্মিণী শ্রীমতি ইন্দুমতী প্রণয়ন, রামপ্রসাদ ও রামেশ্বর শতাব্দির শ্রেষ্ঠ মাতৃ-পদাবলী রচয়িতা সাধক প্রবর শ্রীকমলাকান্ত।

এই স্থানে তাঁহার পূতস্মৃতি-প্রস্তর স্থাপিত হইল। ১৫ই চৈত্র, ১৩৭৬ সন, ২৯শে মার্চ ১৯৭০ সাল।

—সাধক কমলাকান্ত স্মৃতিরক্ষা কমিটি চাষা। বর্ধমান সংস্কৃতি পরিষদ, বর্ধমান।

বর্ধমানের মাঠে ঘাটে ঘুরলে আজও কমলাকান্তের সেই প্রাণমাতান সঙ্গীত শুনতে পাওয়া যায় যেমনটি তিনি গেয়েছিলেন :—

আর কিছু নাই শ্যামা, তোমার কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারী,
দেখে হলাম-সাহস-ভাঙ্গা।
জাতি বন্ধু সুত-দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
বিপদকালে কেউ কোথাও নাই,
ঘর বাড়ী ওড় গাঁয়ের ডাঙ্গা॥
নিজগুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দেখ,
নইলে কপ করে যে তোমায় পাওয়া
সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥
কমলাকান্তের কথা মাকে বলি মনের ব্যথা
আমার তপের মালা, ঝুলি-কাঁথা,
তপের-তপে হইল ভাঙ্গা॥

সাধক রামপ্রসাদের নাম, যার কিছু কিছু জীবনী সবাই অল্প বিস্তর জানেন, কিন্তু কমলাকান্ত সম্বন্ধে প্রায় সবাই অজ্ঞ। কমলাকান্ত পদাবলী লোকের মুখে মুখে ফিরছে পল্লীর বিস্তৃত অঞ্চলে, কিন্তু কে কমলাকান্ত, কোথাকার কমলাকান্ত তা জানেন না অনেকেই। এমন কি বর্ধমান শহরেরই অনেকে আজ কমলাকান্তকে চেনেন না। এ দোষ আমাদেরই। আজকের দিনে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারা আমাদের গ্রাস করতে বসেছে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সহজ, সরল ভাবটির ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানছে, তখন সেই সব সাধক প্রবরদের কথা আমাদের বার বার মনে পড়ে।

"মন্ত্র আমার মন-ভ্রমরা
কালী-পদ নীলকমলে।
চরণ কালো ভ্রমর কালো
কালো কালোয় মিশাইল।
সুখ দুখ সমান হ'ল
আনন্দ সাগর উথলে॥"

—কমলাকান্ত

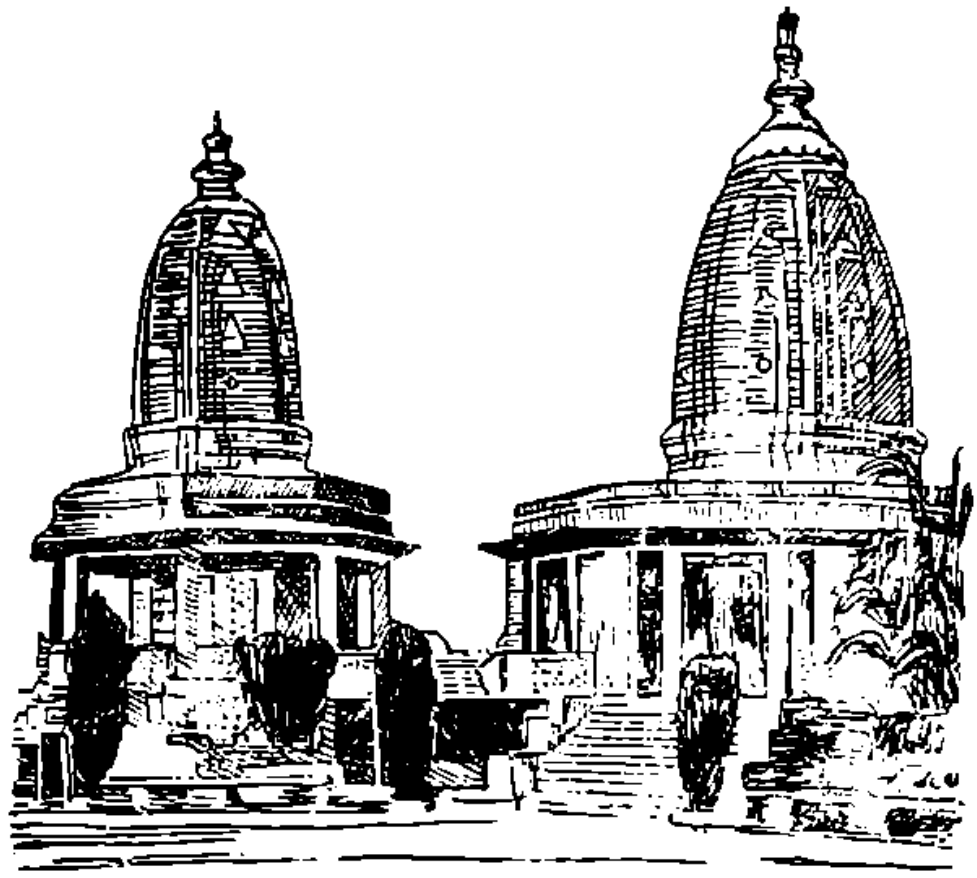

এবারে নিউ দিল্লী কালীবাড়ি

কালী মাইকী জয়!

এ ধ্বনি সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তোলে—আজো! এই "মৃত্যুরূপা মাতা" বাঙালীকে যতখানি উদ্দীপিত করেছে, তার বীরত্ব, বীর্য আর মরণপণ সংগ্রামী জীবনকে উদ্বোধিত করেছে, তার আর তুলনা নেই। এই দেবীই তো বাঙালীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন।

তাই বাঙালী যেখানে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনা আর মা কালীর নাম। সে নামের এমনি দুর্বার শক্তি যে ভারতের বহু স্থানেই তা অল্পকালের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। গড়ে উঠেছে—কালীবাড়ি!

নিউ দিল্লী কালীবাড়ির উদ্দীপনাময় ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তার আগে উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই বাঙালীরা কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু নিউ দিল্লীর কালীবাড়িই বোধ করি আজ সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বাঙালী ও অ-বাঙালীর চিত্তে দুর্নিবার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচার করতে, বাঙালীর ঐতিহ্যকে প্রচার করতে নিউ দিল্লী কালীবাড়ির আজ অগ্রণী ভূমিকা।

বেশী দিনের কথা নয়। ১৯২১, ভারতবর্ষের রাজধানীতে একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সেখানকার বাঙালীদের মনে জাগ্রত হয়। ১৯১১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী যখন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল তখন অনেক সরকারী আপিসও দিল্লীতে চলে গেল এবং সেই সঙ্গে গেলেন প্রচুর সংখ্যক বাঙালী সরকারী কর্মচারী।

দেখতে দেখতে বাঙালী সমাজ গড়ে উঠল সেখানে। আসল ভ্রাতৃত্ববোধ বলে তাদের আদানপ্রদান

সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে ধর্ম চর্চাও চাই! চাই একটি কালীবাড়ি!

দিল্লীর বাঙালীরা উদ্দীপ্ত অনুপ্রাণিত। খোঁজা সুরু হল। বেয়ার্ড রোড ও সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা রাস্তার ধারে একটি পুরাতন জীর্ণ মন্দির খুঁজে পেলেন।

"পুণ্য লোভীর নাই হল ভীড়
শূন্য তোমার অংগনে,
জীর্ণ যে তুমি দীর্ণ দেবতালয়...."

সেই জীর্ণ মন্দিরকে সংস্কার করে হরিপদ গুপ্তের সহায়তায় স্থাপিত হল কালীমূর্তি। দিল্লীর আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল—কালী মায়িকী জয়!

দেখতে দেখতে সেই মন্দিরের জনপ্রিয়তা অভাবনীয় বৃদ্ধি পেল! উৎসবের সময় জনতাকে যেন সামলানো যায় না!

এই ছোট মন্দিরে মায়ের বাস করা অসম্ভব। তাঁর জন্য চাই আরও প্রশস্ত স্থান। অধিষ্ঠিত ভক্তের তাই হল আকুল প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে ১৯৩৭ সালে নিউ দিল্লী হরি সভা স্থাপিত হয়েছিল। সেই সভার বিশিষ্ট সদস্য শিবদাস গুপ্তের নেতৃত্বে তিনশ হিন্দু বাঙালীর সই করা এক আবেদন-পত্র সরকার বরাবরে পেশ করা হল—একটি উপযুক্ত কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাই। তদানিন্তন বড়-লাটের কার্যকরী পরিষদের সভ্য-সার নৃপেন্দ্র নাথ মিত্রের কাছেও একটি ডেপুটেশন গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ জে. কে. সেনকে চেয়ারম্যান ও ই এস. পি চট্টোপাধ্যায়কে সেক্রেটারী নির্বাচিত করে একটি অস্থায়ী কমিটিও গঠন করা হল। তারপর দীর্ঘ দিন সরকারের সঙ্গে কথা চালাচালি ও দেখাসাক্ষাতের পর ভারত সরকার এই উদ্দেশে এক খণ্ড জমি দিতে স্বীকৃত হলেন—লোথার রিজ রোড (বর্তমানে মন্দির মার্গ)—এই রাস্তার ওপর এক একর জমিতে কালীবাড়ি স্থাপনের পরিকল্পনা গতি-বেগে স্পন্দিত হল।

১৯৩১ সালে একটি স্থায়ী কমিটি ও অছি পরিষদ গঠিত হল এবং এই অছি পরিষদ মাত্র ১০০০/- টাকা প্রিমিয়ম দিয়ে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে জমির দখল নিলেন। তারপর দিল্লীর প্রধান কমিশনার ও অছি পরিষদের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী লীজের দলিল সম্পাদিত হল।

১৯৩৪ সালের ৮ই এপ্রিল স্যার নৃপেন্দ্র নাথ সরকার নতুন মন্দিরের শিলান্যাস করলেন। বর্তমান কালীবাড়ি যেখানে অবস্থিত, সেই জায়গাটি সে সময় ছিল অত্যন্ত পাথুরে অসমতল, ১০০০০/- টাকা ব্যয় করে জমিকে সমতল করা হল। ৫৭০০০/- টাকা ব্যয়ে ১৯৩৮ সালে মন্দির, পুরোহিতদের থাকার জায়গা ও সীমানা-দেওয়ালের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হল টাকার অভাবে ধর্মশালা, নাট মন্দির প্রভৃতির কাজ স্থগিত রইল।

১৯৩৮ সালের ২৩শে অক্টোবর দিল্লীর আকাশ আবার মুখরিত হল—কালী মায়িকী জয়। সেই দিন স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

তারপর শুরু হল একটি ধর্মশালা নির্মাণের কাজ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কালীবাড়ি সমিতির সভাপতি। প্রধানত তাঁর ও সেই সঙ্গে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের ক্লান্তি-হীন উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় (সেই সঙ্গে ছিলেন এক দল নিঃস্বার্থ কর্মী ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে ১,৩৬,৮৫০ টাকা ব্যয়ে ধর্মশালা নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হল। ১৯৫০ সালের ১১ই মে এই ভবনের শিলান্যাস করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং ১৯৫১ সালের ২৪শে আগস্ট তিনিই নবনির্মিত ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তারপর ধর্মশালাটি আরও বড় হয়েছে, সাতটি কক্ষ সংযোজিত হয়েছে, এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৩৫,১২৫ টাকা।

সারা বছর ধরেই ধর্মশালায় মানুষের আনাগোনা। স্থান সংকুলান হয় না। রান্নাবাড়িটিও যাত্রীদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়! তাই একটি প্রশস্ততর রান্নাবাড়ির নির্মাণের কাজ শুরু হল ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে। শেষ হল ঐ বছরের আগস্ট মাসে। খরচ হল ১৮,০০৬/-

এর আগে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পালা করে প্রতি

বছর দুর্গা পূজা হত। কিন্তু কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর কেন নানা স্থানে মায়ের পূজা? এই তো রয়েছে উপযুক্ত মাতৃ বন্দনার অংগন। ১৯৫৫ সাল থেকে নিউ দিল্লীর দুর্গাপূজা কালীবাড়িতেই প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিউ দিল্লীর কালীবাড়িতে দুর্গাপূজা এক দর্শনীয় স্মরণীয় সাম্বৎসরিক ঘটনা। লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে—ভেদাভেদ নেই। ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মায়ের প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়ান দরিদ্রতম নাগরিক ও শ্রমিক! রাজন্যবর্গের পাশে নগণ্য মানুষ।

কালীমন্দির থাকবে, অথচ শিব মন্দির থাকবে না—তা কি হয়? কালীবাড়ির বিস্তীর্ণ চত্বরের এক পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের নিউ দিল্লী শাখার সেক্রেটারী স্বামী স্বাহানন্দ সেই মন্দিরের শিলান্যাস করলেন। এই মন্দির নির্বাণের সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন শ্রীভোলানাথ মল্লিক ও তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী। ১৯৬৪ সালের আগস্ট মাসে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর তার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সম্পন্ন হয়। মন্দিরটির জন্য ব্যয় হল আনুমানিক ২৫০০০,০০ টাকা। মন্দিরটি শ্রীভোলানাথ মল্লিকের পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা মল্লিকের নামে উৎসর্গীকৃত।

ভারতের রাজধানীতে কালীবাড়ি আজ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সর্বশক্তিময়ী মায়ের আরাধনা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক চর্চারও আজ এক অগ্রণী পীঠস্থান। এখানেই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হরিসভা, মহিলা সমিতি ও তৎসংলগ্ন প্রাইমারী স্কুল এবং নিউ দিল্লী বাঙালী ক্লাব তাঁদের দপ্তর চালনা করেন। এখানে একটি সাধারণ পাঠাগারও আছে—নগেন্দ্র রক্ষিত রীডিং রুম। ধর্মশালাতে সভাসমিতি ও ধর্মচর্চার জন্য আছে একটি প্রশস্ত হল।

বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটি একটি ত্রিতল গৃহের নির্মাণ কার্য শুরু করেছেন। আনুমানিক ব্যয় হবে ৩ লক্ষ টাকা। গৃহের নাম হবে 'বিবেকানন্দ ভবন।' ১৯৬৪ সালের ২৫শে মে ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারক ও বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস এই ভবনের শিলান্যাস করেন। ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও অতিথি-অভ্যাগতের স্থান সংকুলানের জন্য এই নূতন ভবন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হয়।

এই নূতন ভবনে বড় একটি হল থাকবে আর থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব সরঞ্জামবিশিষ্ট একটি মাঝারি মঞ্চ! এই কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। কালীবাড়ি সমিতির সভাপতি তাই সর্ব-সাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

নিউ দিল্লী কালীবাড়ি বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চায় যে মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, যে কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে তা অভিনন্দনীয় তো বটেই সেই সঙ্গে সর্বতোভাবে সকলের সাহায্য পাবারও একান্ত যোগ্য!

নিউ দিল্লী কালীবাড়ির এই নব উদ্যম মায়ের কৃপায় যে সর্ব সার্থকতা লাভ করবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

"সকলই তোমারই ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি।"

মায়ের কৃপা পেলে মানুষ কী না করতে পারে। কালী মাইকী জয়।

ঢাকা নগরীর একটি প্রাচীন কালীমন্দির

ত্রিপুরাশঙ্কর সেন

মন্দিরের ছবি—অধ্যাপক শ্রীসুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

'মৃত্তবেণীর গঙ্গা যেথায়
মুক্তি বিতরে বঙ্গে,
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই
তীর্থে বরদ বঙ্গে।'

—বলেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ। বাস্তবিক, বহু সাধকের পদরেণুপূত এই বাংলার সাধনার ত্রিবেণীসঙ্গম রচিত হয়েছে—বৈষ্ণব-সাধনা, শক্তি-সাধনা ও বাউল-সাধনার ত্রিধারা এই বাংলা দেশে মিলিত হয়েছে।

সকলেই জানেন, শক্তি-সাধনা ভারতীয় সাধনার একটি প্রধান ধারা হলেও বাংলা দেশ যেন শক্তি সাধনারই পীঠস্থান। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব যাকে কলির অশ্বমেধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে তার ভেতর বাঙ্গালী-মানস ও বাঙ্গালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে। এ কালের একজন লেখক বলেছেন,—বাঙ্গালী যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন, সেখানে অন্তত একটি কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিংশ শতকের প্রথম পাদেও বাংলার বিপ্লবী তরুণের দল করালবদনী শ্যামা মাকে সাক্ষী করে রক্তাক্ষরে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করেছে—'দেশ মাতৃকার বন্ধন মোচনের জন্যে আত্মদান আমার জীবনের ব্রত'। তারও বহু পূর্বে শক্তিসাধক ও শাক্ত সঙ্গীত রচয়িতা মহারাজ কৃষ্ণকুমার মায়ের নাম গান করে অম্লান-বদনে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন।

এ কালে আমরা বাংলার যে অঞ্চলকে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা দেশ বলি, সেই পূর্ববঙ্গেও শক্তিসাধকের অভাব ঘটে নি। বাংলা দেশের যে সকল কালীমন্দির সাধক বা সিদ্ধ পুরুষের স্মৃতি-বিজড়িত তাদের ভেতর ত্রিপুরা জেলার বেহারের কালীবাড়ি (ঠাকুর সর্বানন্দ এখানে সিদ্ধিলাভ করেন। এখানে পৌষ সংক্রান্তির মেলায় বহু ভক্ত সমাগম হয়), ঢাকা জেলার মহেশ্বরদী পরগণার অন্তর্গত চিনিসপুরের কালীবাড়ি (দ্বিজ রাম-প্রসাদের সিদ্ধিক্ষেত্র। কারো কারো মতে 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতায় যে সব গান প্রচলিত আছে, সেগুলি চিনিসপুরের রামপ্রসাদের রচিত, কিন্তু এ মত প্রতিষ্ঠিত হয় নি) এবং ঢাকা নগরীর উত্তরে নির্জন পরিবেশে অবস্থিত রমনার কালী-মন্দির ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। শোনা যায়, ষোড়শ শতকের বাংলার অন্যতম বীরাচারী তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরির উপাস্য ছিলেন এই কালিকা দেবী। ব্রহ্মানন্দ শুধু সাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী' ও 'তারারহস্যের' তিনি ছিলেন রচয়িতা। এই দুখানি গ্রন্থ শক্তি সাধকদের গৃহে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। সকলেই জানেন, ইদানীন্তন কালে পূর্ববঙ্গে শুধু ব্যাপক গণহত্যাই হয় নি, কতকটি দেবালয়, মঠ ও আশ্রম বিধ্বস্ত বা বিলুপ্ত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ইতিহাস যাঁর অনুগামী পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বর অভিযানের ফলে রমনার এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কালীমন্দিরটি একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

এই মন্দিরের চতুর্দিকের নির্জন পরিবেশ ছিল সাধনার অনুকূল। দিবসেও এখানে জন কোলাহল ছিল না, চতুর্দিকে দৃষ্টি-পাত করলে বৃক্ষলতার শ্যামল শোভা চোখ জুড়াত। মাঝে মাঝে বিহগের কলগান কর্ণে প্রবেশ করতো। সোপানাবলী অতিক্রম করে মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হলে এবং দীর্ঘাকৃতি, করালবদনা শ্যামার মূর্তি দর্শন করলে মন স্বভাবতই শান্তভাব ধারণ করতো। অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রজনীতে মন্দির-দ্বারে উপবেশন করলে মন যেন ভক্তিমিশ্রিত ভয়ের ভাবে আপ্লুত হতো।

অধিকার বাদ ভারতীয় সাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলেও তন্ত্রশাস্ত্রে অধিকারি ভেদে সাধনার ভেদ অতি সুস্পষ্ট। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—ভাব ত্রিবিধ, পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব, আচারও ত্রিবিধ, পশ্বাচার, বীরাচার ও দেবাচার বা দিব্যভাবের সাধকদের জন্যে বিহিত আচার। কোনো মানুষ স্বভাবতই তমোগুণী, তাদের জন্যে পশ্বাচার যারা স্বভাবত রজোগুণী, তাদের জন্য বীরাচার আর যারা স্বভাবত সত্ত্বগুণী, তাদের জন্যে দিব্য ভাবের সাধনার বিধান দেওয়া হয়েছে।

আমরা জানি, দুরাচার ব্যক্তিমাত্রেই নাস্তিক হয়, অনেক অসৎ ব্যক্তির জীবনেও ভক্তির স্ফুরণ দেখা যায়, যদিও সে ভক্তি তামসী ভক্তি। নাস্তিক পাষণ্ডের চাইতে কিন্তু ভক্তিমান দুরাচার শ্রেষ্ঠ, কেননা, কোনো এক শুভ মুহূর্তে সাধুসঙ্গের ফলে তাদের জীবনে পরিবর্তন এসে যেতে পারে। 'যাহা বাহান্ন তাহা তেপ্পান্ন' গল্পটি এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। মহাভারতে শুধু রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্মই বিধৃত হয় নি, এতে দস্যুবৃত্তি অর্থাৎ ডাকাতদের আচরণ-বিধিও বর্ণিত হয়েছে। এ সব কথা বলছি এই জন্যে যে এক সময় বহু ডাকাত নাকি অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্যে রমনার কালী-মন্দিরে প্রায় শঙ্কটহর পরিহিতা কালীর চরণে প্রার্থনা জানাতেন। এ কথা শুনে অনেকেই হয়তো বলবেন—ডাকাতেরা হচ্ছে সমাজ বিরোধী আর যারা দেবতার নাম নিয়ে পরধনাপহরণে বহির্গত হয়, তারা তো অধিকতর দোষী। কিন্তু যারা যে সমাজ বিরোধী, এ কথা স্বীকার করেও আমাদের বলতে হয়—বাংলা দেশের ভবানী পাঠকের কথা স্মরণ করুন, চিন্তা করুন আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের কথা যাঁরা বহু বিপ্লবীকে স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন-সংগ্রহ করার প্রেরণা দিয়েছিলেন। ফলতঃ, বাংলার ডাকাতদের ভেতর এমন চরিত্রবান লোকও ছিলেন যাঁরা আমাদের নমস্য। বস্তুত এই সব ডাকাতদের কথা না জানলে বাংলার ইতিহাস পুরোপুরি জানা যায় না। (এ সম্পর্কে পরলোকগত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বাংলার ডাকাত' দ্রষ্টব্য।)

এই মন্দির-সম্পর্কে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলছি। এই

বিংশ শতাব্দীতেই মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মহাশক্তি-রূপিণী কালিকা দেবীর রথযাত্রা উৎসবের প্রবর্তন হয়। প্রতি বৎসর এই উপলক্ষে এখানে ভক্ত-সমাগম হোতো। অদ্ভুত রামায়ণে কথিত আছে—রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে বধ করলে তাঁর ভ্রাতা সহস্রানন রামকে বলেন—'আমাকে জয় না করলে তোমার লঙ্কা বিজয় সমাপ্ত হবে না। তুমি আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর'। শ্রীরামচন্দ্র কিন্তু তাঁকে কিছুতেই পরাভূত করতে পারলেন না। তখন মহাশক্তি-রূপিণী সীতাদেবী কালিকা মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং রথে আরোহণ করে যুদ্ধযাত্রা করেন। সীতাদেবী-কর্তৃক সহস্রানন নিহত হলে শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কা-বিজয় সম্পূর্ণ হয়। কালিকা দেবীর রথযাত্রার মূলে ছিল এই কাহিনী। আমরা একাধিকবার মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে রথারূঢ়া কালিকা দেবীকে দর্শন করেছি। সমাগত ভক্তজন অনুভব করেছেন —যিনি শক্তিমান, তাঁকেও চরম বিজয়ের জন্যে মহা-শক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

রমনার এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ দেবালয়ের ওপর বর্বর আক্রমণের কথা স্মরণ করে মানুষ চিরদিন অত্যাচারীদের ধিক্কার দেবে। যে হিংসা-প্রবণতা ও ধর্মান্ধতা প্রাচীন বিশ্বের সভ্যতার নিদর্শন আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়কে অগ্নিসাৎ করেছে, মানুষের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সমূহ ধূলিসাৎ করেছে, উত্তর কালের নর-নারী তাকে কখনো ক্ষমা করবে না। রমনার এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে অথবা সন্নিহিত কোনো স্থানে হয়তো আর একটি মন্দির গড়ে উঠবে কিন্তু বাংলা দেশের অধিবাসীরা যা হারাল, তা আর ফিরে পাবে না। শুধু মহাকাল বা ইতিহাস চিরদিন এই মন্দিরের অস্তিত্বের নীরব সাক্ষী হয়ে থাকবে।

পূর্ব বাংলার ঢাকা নগরীর প্রসিদ্ধ রমনা কালীবাড়ী। গৌরবোজ্জ্বল ও বহুদিনের ঐতিহ্যবাহীএই ঐতিহাসিক কালীমন্দির একদিন ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে এক নির্জন পরিবেশে অবস্থিত ছিল। চারিদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত ও বৃক্ষাদি পরিব্যাপ্ত এই নির্জন কালীমন্দির-প্রাঙ্গণ একসময় ভক্ত, সাধক ও বিপ্লবী দেশ-প্রেমিকদের পীঠস্থান ছিল। অতি নির্জন পরিবেশের দরুণ বহু বিপ্লবীর এখানে দীক্ষা হত। এইখানে বসে তাঁরা প্রতিজ্ঞাপত্র সহি করেছেন ও দেশমাতৃকার বন্ধন-মোচনের জন্য উৎসর্গ করেছেন তাঁদের জীবন। আজ এই সব কথা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই পবিত্র কালীমন্দির অসভ্য পাকিস্তানী সৈন্যদের বর্বর আক্রমণের ফলে আজ নিশ্চিহ্ন।

এই মন্দিরের ইতিকথা ও ছবি প্রকাশের প্রেরণা ও উৎসাহ যিনি আমাদের দিয়েছেন, তিনি হলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবনীকার শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র ঘোষ। তাঁর উৎসাহ না পেলে একাজ আমরা করতে পারতেম-না। সেজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

—সম্পাদক গল্পভারতী

অমাবস্যার ঘন অন্ধকারে চরাচর ব্যাপ্ত।

শূচীভেদ্য অমানিশার ভীষণতা আরো ভয়াবহ করে তুলেছে ঘন মেঘের বজ্রনির্ঘোষ। প্রচণ্ড বেগ মাঝে মাঝে গর্জন আর অবিরাম বারি পাতের তীব্র ঝঞ্ঝায়, অমাট অন্ধকার যেন সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস করবার প্রবল আক্রোশে মত্ত।

লোকালয় থেকে বহুদূরে অরণ্য-সঙ্কুল নির্জন এক ভূখণ্ডে ঘন মসীলিপ্ত এই পটভূমিকায় ঘোরতর এক কৃষ্ণ-মূর্তি যেন জগতের সমস্ত পাপকে নির্মূল করার জন্য ভয়ংকর এক সংহার বাসনায় পাষাণ প্রতিমায় পরিণত হয়ে স্থির প্রতিজ্ঞায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঝড়ের গর্জন, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ প্রহার, বারিপাত সঙ্কুল অরণ্যের উন্মত্ত অস্থিরতা যখন রাত্রিকে করে তুলছে ভয়ংকর, রহস্যময়—তখন ত্রিনয়নী সেই মূর্তির সর্বাঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে যেন প্রচণ্ড ক্ষাত্র-তেজ! সমস্ত অশিবকে ধ্বংস করে তার রুধির পান করে দেবী হয়ে উঠেছেন ভয়ংকরা, তাঁর হাতের খড়্গ ঝলসে উঠছে ক্ষণপ্রভায় চকিত আলোতে, তাঁর নর-মুণ্ডমালায় বীভৎসতা যেন দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে প্রতিশোধ স্পৃহায়, আর তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসছে যেন প্রতিজ্ঞার পাবক শিখা! পায়ের নীচে শুদ্ধ মহাকাল!

এই ঘোরা করালবদনা মহাকালীর মূর্তির চারদিকে ঘুপঘুপের ঘন আবরণ আর নীচে ক্ষীণ আলোক-শিখাময় একটি মৃৎপ্রদীপ—যেন এই পারাপারহীন অতল অন্ধকারে আলোকস্তম্ভের মতো পথের নিশানা দেবার

স্তব্ধ স্থির হয়ে আছে মায়ের সম্মুখে রক্তকরবীর গুচ্ছ!

জনমানবহীন এই মহানিশায় দেবী অর্চনার জন্য তার উপস্থিত হয়েছেন একজন পুরোহিত। তাঁর ললাটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার উদ্ভাস, শক্ত চিবুকে কঠিন এক শপথের অঙ্গীকার, কম্পিত ঠোঁটে এক অমোঘ মন্ত্র উচ্চারণের পবিত্র সংকল্প।

গম্ভীর তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে ক্ষরিত হচ্ছে মহাবাণী, আর সেই বাণীতে অভিভূত হয়ে তাঁরই সামনে নতজানু হয়ে বসে আছেন এক বলিষ্ঠ যুবক।

অবিরাম তার হৃদয়ে কম্পিত হচ্ছে—

—জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত! মা! জগজ্জননী শ্যামা মা—মা,—তোমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমি—আমার স্বদেশ

হাঁ, দেশের মুক্তি তাঁকে আনতেই হবে! দানব যখন মায়ের বুকের রক্তপান করার জন্য উদ্যত, তখন কোন মূর্খ সন্তান ঘরে চুপ করে বসে থাকতে পারে? তাই সেই পাপের অসুর উৎপাটনের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সে স্থির-সঙ্কল্প। আর দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন কামনায় সে মহাকালীর আশীর্বাদভিক্ষু

জানে সেই বিপ্লবী যুবক, পাপনাশিনী এই ভয়ংকরা দেবীর কাছে তাঁকে দীক্ষা নিতে হবে, এইখানে রক্তের অক্ষরে তাকে শপথপত্র লিখে দিতে হবে—তার পর এক দুরন্ত দুর্গম পথে অভিযান—

—ঝড়ের গর্জনে বিদ্রোহের হাহাকার বাজে—

ঘরে ঘরে শুনা হলো আরামের শেষ শয্যাতল—তার কানে বাজে।

যারা কয়, যারা কয় যাত্রীদল, এসেছে আদেশ। সেই আদেশ সেই নির্দেশ নিয়েই আজ যখন সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করে অন্ধকার এক ভয়াবহ পটভূমি রচনা করেছে, অবিরাম বজ্রনির্ঘোষ আর বৃষ্টির অঝোর বর্ষণ যখন ঢেকে দিয়েছে পরিচিত দৃশ্যপট—তখন লোকালয় থেকে বহুদূরে এই মায়ের মন্দিরে সে এসেছে সেই অগ্নিময়ে দীক্ষা নিতে!

এই ভাবেই তাকে দীক্ষা নিতে হবে। এই ভাবেই সবাইকে, সব বিপ্লবীকেই দীক্ষা নিতে হয়!

মায়ের ত্রিনয়নেই বরাভয়—চরম ভাবের হবেই। নতজানু সেই যুবক রক্তকরবা অর্ঘ্য দেয় মায়ের চরণে। নিজের রক্তে তিলক আঁকে—লিখে দেয় প্রতিজ্ঞাপত্র! পবিত্র গীতা ছুঁয়ে উচ্চারণ করে শপথ বাক্য!

দীক্ষা দেন পুরোহিত! তারপর এক মহাশক্তির আশীর্বাদ পেয়ে যেন নবজীবন লাভ করে সেই যুবক শুরু হয় তার "দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার"-পার হবার সুকঠিন অভিযান!

সে তো আজকে নয়—আজ কত বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎখাত করার জন্য যে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়েছিল—সিপাহী বিদ্রোহের সময়—তারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে-ছিল ১৯০৫, ১৯৩০, ১৯৪২ সালে!

আর সেই রক্তকরবা অগ্নিময় দিনগুলি যাদের অমিত বীর্য্য অকুতোভয় অসীম সাহসিকতায় দাবানলের মতো পরাধীন জাতির মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল মৃত্যুপাগল ঘরছাড়া সন্ন্যাসী প্রতিম সেইসব তেজময় ছেলেদের অগ্নিময়ে দীক্ষা হতো ঐভাবেই।

মহাকালীর আশীর্বাদ না নিয়ে এ পথে তাঁরা আসতেন না। এইভাবেই একের পর এক—সংখ্যাহীন মহা-

বিপ্লবীরা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামে।

কি সুকঠিন সাধনা এবং নিষ্ঠা ছিল তাঁদের দীক্ষা-গ্রহণের আগের দিন উপবাস অথবা নিরামিষ আহার গ্রহণ, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান! তারপর দীক্ষান্তে সেই মহামন্ত্র জপ করা—

—জন্ম হইতেই তুমি মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত হ্যাঁ! তা জানতেন তাঁরা। তাই—কোন ভবিষ্যতের প্রতিদানের প্রত্যাশা না রেখে, পাই পাই সমান অর্থের লালসায় নিয়ন্ত্রিত না হয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে তাঁরা আত্মদান করেছেন দেশমাতৃকার পদতলে! মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ বলিদান হয়েছে কে তার হিসেব করবে? খ্যাত অখ্যাত কত বিপ্লবী জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েছেন দেশের মুক্তি কামনায়—কে স্মরণ করে তাঁদের?

শুধু ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্য সেন নন—অবজ্ঞাত, অজ্ঞানিত বহু মানুষ দেশকে ভালবেসে কি ভয়ানক ঝুঁকি নিয়ে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন—প্রয়োজনে নিজে ফাঁসিতে পড়েছেন সম্মুখ সমরে কে তার হিসেব রাখে?

আজ দেশ স্বাধীন যাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম অনন্যসাধারণ নিষ্ঠায় দুঃসাহসিক সাধনায় পবিত্র আত্মত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা—তাঁদের অনেকেই অন্ধকারের আড়ালে রয়ে গেলেন। তাঁদের পরিচয় সকলের সামনে তুলে ধরা এই মুহূর্তে আমাদের জাতীয় কর্তব্য একাজ যদি আমরা না করি তবে দেশমাতৃকা কখনোই আমাদের ক্ষমা করবেন না।

মহাকালীর মহাপূজার এই দিনে মায়ের সেই সব সুযোগ্য সন্তানদের তাই স্মরণ করি—যাঁরা মায়ের চরণ স্পর্শ করে দীক্ষা নিয়ে দেশের মুক্তিসংগ্রামে আত্মদান করেছেন আর যাঁরা আজো বেঁচে আছেন—তাঁদের সবাইকে এই মহাশক্তির আবাহনের দিনে স্মরণ করি—

অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে আকাঙ্ক্ষা করি মায়ের আশীর্বাদের—আমরা যেন তাঁদের মতো হতে পারি!

আর এই স্বপ্ন সত্য হয়েছে সেদিন প্রতিটি সংগ্রামী বাঙালী যুবকের জীবনে। তাঁরা নিজেদের সব ভুলে গিয়েছে দেশমাতৃকার সেবায়। নিজেদের বলে তাঁদের কিছু ছিল না। তাঁরা সর্বস্ব, নিজেদের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন দেশজননীর মুক্তির জন্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি রক্তবিন্দু সেদিন তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে নিঃশেষ করেছিলেন মায়ের মুক্তিসাধনায়।

কী আদর্শ জীবন! কী দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! দেশপ্রেমের কী অপরূপ চারিত্রিক অভিব্যক্তি। ভাবতেও চমক লাগে আজ।

কত রক্ত দিয়েছে সেদিন সেই সব সংগ্রামী যুবকেরা —কত দুঃখকষ্ট পেয়েছে, তাঁরা কত ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন সেদিন সে সব কথা আজ কেউ কি মনে করে? তাঁদের কথা ভেবে তাঁদের আত্মার কল্যাণ কামনা কেউ কি করে? দেশের আজকের সাংবাদিকরা একবারও কি মনে করেন সেই সব অমূল্য জীবনের বীরত্ব ও ত্যাগের অমৃত কাহিনী পরিবেশন করে সত্যিকারের দেশসেবার কর্তব্য পালন করি? না, না, তা তাঁরা একবার ভুলেও মনে করেন না। আমরা অকৃতজ্ঞ আমরা ভণ্ড। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তাঁদের রক্তের বিনিময়ে এইটুকুই যথেষ্ট।

• • •

তারকনাথ দাস মহাশয়ের সঙ্গেই বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাস কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং তাঁরই নির্দেশক্রমে অনুশীলন সমিতির তৎকালীন কলিকাতার অফিস ৪৯ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে কিছুদিন অবস্থান করেন। এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সমিতির কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইয়া পড়িলে নেতা পি. মিত্র পুলিনবাবুকে ঢাকায় ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। পূর্ববঙ্গে পুলিনবাবুর নেতৃত্বাধীনে অন্ততঃ দশহাজার কর্মীকে বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে—সমিতির সর্বাধিনায়কের এই সময় ইহাই ছিল নির্দেশ।

ইহার পূর্বেই কলিকাতায় অবস্থান কালে পুলিনবাবু পি. মিত্র মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই দীক্ষাগ্রহণের বর্ণনা পুলিনবাবু নিজেই আমাদের বলেছিলেন; পি. মিত্র মহাশয়ের আদেশমত একদিন একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা লইলাম। ধূপ দীপ নৈবেদ্য পুষ্প চন্দনাদি সাজাইয়া ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি. মিত্র যজ্ঞ করিলেন, পরে আমি আসনপিঁড়ি (সিংহ যেমন করিয়া শিকারের উপর লম্ফ প্রদানে উদ্যত হয়) বসিলাম। আমার মস্তকে গীতা স্থাপিত হইল; তদুপরি অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি. মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান ছিলেন। উভয় হস্তে ধারণ করিয়া যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে যজ্ঞাগ্নি ও পি. মিত্রকে প্রণাম করিলাম।

বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কী ধরার ধূলায় হবে হারা।

স্বর্গ কি হবে না কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী সে কী শুধিবে না এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কী আনিবে না দিন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান

নজরুল

ভক্ত সাধকের কণ্ঠে মাতৃপূজার মহামন্ত্র উচ্চারণের লগ্ন এল। শক্তিরূপিনী মহাকালীর কাছে শক্তি প্রার্থনায় একাগ্র হয়ে উঠেছেন সমগ্র দেশবাসী। ঘন অন্ধকারেই আরাধনা শুরু হয়েছে মহাঘোরা মহাকালীর—জানেন ভক্ত সন্তান দল—অশিবের অন্ধকার দূর করবার শক্তি দেবেন ঐ মহামায়া— এই অন্ধকারেই ফুটে উঠবে আলোর শতদল।

শুধু এ কালের মানুষেরাই নন, জানতেন বিগত যুগের ভক্ত সন্তানেরা, জানেন চিরকালের মাতৃসাধক শক্তিপিপাসু মুক্তি সাধকেরা— এই মায়ের প্রসন্ন আশীর্বাদ ব্যতিরেকে সিদ্ধি লাভ কখনোই সম্ভব নয়।

"It is the Cause and not merely the death that makes the martyr"

যখন বিদেশী শাসকের নিষ্ঠুর পীড়ন এক ঘন অন্ধকারে সমগ্র দেশকে নিমজ্জিত করেছিল তখন মাতৃসাধক, মায়ের পূজারী সন্তানদল স্থির বিশ্বাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন এই মায়ের আশীর্বাদ নিয়েই রক্তপানোদ্যত বিদেশী অসুর নাশন করতে হবে।

তাই অগ্নিগর্ভ দিনগুলোতে যখন জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে, নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন তাঁরা দেশের মুক্তিসংগ্রামের মহাব্রতে তখন সবাগ্রে শীর্ষ নিতেন তাঁরা এই মায়ের কাছ থেকে।

বুকের রক্তে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করতেন তাঁরা। জানতেন বিশ্বাসও করতেন জন্ম থেকেই তাঁরা মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। সেই মা যেন মহাকালী তেমনি দেশমাতৃকাও; এই ভারতের—এই বাংলার কত কোটি প্রাণ মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্মবলিদান দিয়েছেন নিঃস্বার্থভাবে, নিষ্কম্পচিত্তে স্বদেশের প্রতিষ্ঠায় দেবতুর্লভ মাতৃপ্রেমে—আজ তার হিসেব নেবার দিন এসেছে।

এই তো সেই মহালগ্ন যখন শত শত তরুণ-প্রাণ যাঁরা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গিয়েছেন তাঁদের পুণ্য স্মরণ করতে হবে।

"Their blood is shed in Confirmation of the noblest Claim."

আজ তামসিকতায় যখন দেশ আচ্ছন্ন তখন মহাসাত্ত্বিক মহীয়ান্‌সিক সেই সব মাতৃভক্তদের আমরা মনে মনে স্মরণ করি— তাঁদের প্রতিটি রক্তবিন্দুতে যে প্রতিজ্ঞা যে স্বাধীনতার কামনা রক্তবীজের মতো দেশময় ছড়িয়ে দেবার জন্য তাঁরা প্রস্তুত রেখেছিলেন ফাঁসীর দড়িতে আত্মদান করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই দেশের মাটিতে, এই মহাপূজার দিনে তাঁদের সেই জীবনদান যেন মহাকালীর কাছে আত্মদান—যেন দেশ মাতৃকার কাছে নিজেদের বলিদান –

—যার কোন তুলনা অলস মন্থর গতানুগতিক সুখী দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোথাও মেলে না। আমরা সবাই কৃপার্ত—সেই মহাশক্তিপুরুষদের আশীর্বাদ ভিক্ষু।

ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের যে জয়গান শুনিয়েছিলেন তাঁরা—আমরা আজো কান পেতে আছি সেই সুরের জন্য— আমার জীবনে নভিয়া জীবন আগো রে সকল দেশ'—এই অগ্নিবাণীমন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে আজও এদেশের আকাশে বাতাসে।

যদি একবার আমাদের শ্রবণ উৎকর্ণ হয়, যদি একবার তাঁদের পূতজীবন স্রোতের ক্ষণিক স্পর্শও অন্তিকৃত করে আমাদের চিত্তকে তবে মুহূর্তেই অপসারিত হয়ে যাবে এই অন্ধকার।

আমরা বিশ্বাস করি—দেশের এই দুর্দিনে একবার পূর্বাচলের দিকে তাকালেই সেই সব সূর্যসেনাদের দেখতে পাবো আমরা—তাঁদের আলোকস্পর্শে আমরাও বিশুদ্ধ হবো—আমরাও গেয়ে উঠব ধন্য হলো ধন্য হলো মানবজীবন— আর সেই উদ্বেগে এই মহাপূজার লগ্নে আমরা চট্টগ্রামের সেই সব সূর্যসেনানীদের জীবন কাহিনী সংগ্রথিত করলাম। অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যাক তাঁদের অমৃতময় জীবন ও বাণী।

রচনা ও সংকলন—উৎপল চক্রবর্তী

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে ঃ মঙ্গল পাণ্ডে

আমাদের গৌরব, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং জাতীয় বিদ্রোহের সূচনা হয়—এই দেশেই, এই বাংলায়। ১৮৫৭ সালে—পলাশির যুদ্ধের মাত্র একশ বছর পরে!

দুর্বার দাপটে তখন ইংরেজ সরকার এ দেশীয় মানুষদের পায়ের নীচে রেখে সাম্রাজ্যলোলুপ থাবার নেশায় সমস্ত শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হিংস্র। সকল শ্রেণীর কর্মচারীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন আর বে-আইনী ষড়যন্ত্র! এমনকি দেশরক্ষার কাজে যাঁরা প্রধান সহায়ক সেই সিপাহীদেরও পর্যুদস্ত করার জন্য এক ঘৃণ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ইংরেজরা!

ব্রাউন বেস বন্দুকের জায়গায় নতুন এন্‌ফিল্ড বন্দুকের প্রচলন হয়েছে! দমদম, মীরাট ও আম্বালাতে এই রাইফেল চালানো শেখানোর কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে! শিক্ষার কাজ এবং এই নতুন বন্দুকের কার্যকারিতা সিপাহীদের মনে সন্তুষ্টির ভাবই জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই একটা বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হলো।

এই বন্দুকের টোটা একরকম চর্বি মেশানো মোড়কে আটকানো থাকত, বন্দুকে ভরার আগে তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলতে হতো। সিপাহীরা সন্দেহ করলেন এতে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে—যা হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মের ক্ষেত্রেই অস্পৃশ্য।

ইংল্যাণ্ড থেকে ১৮৫৩ সালে এই টোটা ভারতের সৈন্যবাহিনীতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিলো। বাংলার সৈন্যদলের এডজুটাণ্ট জেনারেল কর্ণেল টাকার এই টোটা দেখেই বুঝেছিলেন—এগুলি সিপাহীদের অসন্তোষের কারণ হবে। তিনি উর্দ্ধতন অফিসারদের কাছে চিঠি লিখলেন কিন্তু সেই চিঠি ধামা চাপা দেওয়া হলো। বরং দমদম ও মীরাটে এই টোটা তৈরীর কারখানা খোলা হলো। সরকার অবশ্য টোটার মোড়ক দাঁতে না কেটে হাতে ছেঁড়ার পরামর্শ দিলেন কিন্তু তাতে সন্দেহ আরো বাড়ল।

এমনই সময় দমদমে একদিন বাবুর্চিখানায় একজন নিম্ন জাতীয় খালাসী জল পান করার জন্য এক ব্রাহ্মণ সিপাহীর লোটা চাইল। সিপাই তা দিতে অস্বীকার করায় সে বলল,

"—তুমি তো জাত নিয়ে খুব গর্ব করছ। কয়েকদিন সবুর কর, সাহেবরা যে শুয়োর ও গরুর চর্বি দিয়ে টোটা তৈরী করছে তা যখন দাঁত দিয়ে কাটতে হবে, তখন দেখব তোমাদের জাত কোথায় থাকে?"

যা ছিল অনুমান তা সত্য বলে প্রমাণিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাকে ব্যারাকে উত্তেজনা ছড়িয়ে গেল। লেফটেনাণ্ট রাইট তার উর্দ্ধতন অফিসার মেজর বনটিন্‌কে ২২শে জানুয়ারি রিপোর্ট করলেন। বনটিন তাঁরও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানালেন। মিঃ হিয়ার্সে 'অত্যন্ত জরুরী' মার্কা মারে কলকাতায় এডজুটাণ্ট জেনারেলকে তা জানালেন। কিন্তু এবারও কর্তৃপক্ষ নীরব রইলেন।

২৮শে জানুয়ারী আবার এক রিপোর্টে হিয়ার্সে জানালেন,

"...এইসব 'ভিত্তিহীন আজগুবী গুজব' না হয় উপেক্ষা করা যেত কিন্তু রাণীগঞ্জে একজন সার্জেণ্টের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার এবং টেলিগ্রাফ অফিস সমেত আরো তিনটি অফিসও গত চার দিনের মধ্যে

ব্যারাকপুরে ঘটে যাওয়াতে···আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে অসন্তুষ্ট সিপাহীদের দ্বারাই এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।"

জানুয়ারী মাস থেকেই গোলোযোগ শুরু হলো। ব্যারাকপুরের অগ্নিকাণ্ড ভারতব্যাপী বিদ্রোহের মশাল জ্বালিয়ে দিল! তীরের মুখে এক টুকরো কাপড় জড়িয়ে তাতে তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে ধনুক দিয়ে ছুঁড়ে বাংলোতে আগুন লাগানোর পদ্ধতি সিপাহীরা শিখেছিলো সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের কাছ থেকে।

৬ই ফেব্রুয়ারী সামরিক আদালতে যদিও বলা হলো এই টোটার মোড়ক কোন চর্বি দিয়ে তৈরী নয়—তবু তা প্রমাণিত না হওয়ায় বিদ্রোহ ঘনীভূত হলো। হিয়ার্সে এবার লিখলেন।

'...এইরূপ সংকটের অবস্থায় সব সময়েই এই রকম ঘটেছে এবং আমাদের রাজত্ব যতদিন থাকবে ততদিন এই রকমই ঘটবে। স্যর চার্লস মেটকাফ ঠিকই বলেছিলেন যে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবেন যে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্ব আর নেই'—।

তিনি লিখলেন,

'...পূর্বে বন্দুকের জন্য যে রকম টোটার কাগজ তৈরী হতো, যদি সম্ভব হয় নতুন বন্দুকের জন্যও তদনুরূপ কাগজ তৈরীর ব্যবস্থা অবলম্বন করার হুকুম দেওয়া হোক।'

এবারও কর্তৃপক্ষের নীরবতা। হিয়ার্সে জানালেন, —'আমরা একটা প্রকাণ্ড বিস্ফোরক বোমার উপর বাস করছি'! হ্যাঁ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আসন্ন। গোপন বৈঠক হয়েছে সিপাইদের ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপুর দখলের ষড়যন্ত্র করা হলো, কিন্তু আগে থেকে খবর পেয়ে সিপাইদের নানা স্থানে বদলী করে দিলো কর্তৃপক্ষ। ফলতঃ বিদ্রোহের আগুন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল।

১৮ই ও ২৫শে ফেব্রুয়ারীতে পাঠানো বহরমপুরের সিপাইদল কর্নেল মিচেলের স্তোকবাক্যে না ভুলে ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্যারেডের সময় নতুন টোটা নিতে অস্বীকার করল। মধ্যরাত্রিতে তারা সমস্ত হুমকিকে অগ্রাহ্য করে বারুদখানা আক্রমণ করে মাস্কেট বন্দুক ও তার টোটা নিয়ে লাইনে চলে গেল।

কর্নেল তখন গোলন্দাজ বাহিনীকে ডাকলেন। সিপাহীরা বললেন ওদের না সরানো পর্যন্ত তাঁরা অস্ত্র সমর্পণ করবেন না। ৮০০ সিপাহীর এই চ্যালেঞ্জ শুনে গোলন্দাজ বাহিনীর কর্নেল নীরবে মেনে নিলেন। মাত্র ছ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদের নতুন নবাব বাস করতেন। রাজভক্ত এই নবাব ইংরেজদের বড়ই প্রিয়পাত্র ছিলেন! ফলে তার নেতৃত্বে যেখানে স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেখান থেকে শুরু হতে পারল না এখন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম! বাংলার দুর্ভাগ্য! দুর্ভাগ্য মুর্শিদাবাদের!

২২০ মাইল দূরে ব্যারাকপুরে সিপাহীদের হাঁটিয়ে এনে নিরস্ত্র করা হলো!

ভারতের তৎকালীন রাজধানী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের বিদ্রোহী সিপাহীদের গ্রেপ্তার করল বিশ্বাসঘাতক এক সিপাহী বাহিনী! ব্যারাকপুরের অবস্থা ভয়াবহ হয়ে উঠল। সিপাহীরা বুঝল এবার চূড়ান্ত আঘাত হানবে ইংরেজরা। তাই এই চরম মুহূর্তে প্রচণ্ড আঘাত হানবার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন ছাব্বিশ বছর বয়স্ক এক তরুণ সিপাহী—মঙ্গল পাণ্ডে! ইউনিফর্ম পরে, কোমরে তলোয়ার, কাঁধে বন্দুক নিয়ে তাঁর কুঠি থেকে বেরিয়ে এলেন এবং ডাক দিলেন সহ-কর্মীদের! কোর্ট গার্ডেনের সামনে উত্তেজিত সিপাহীরা জমায়েত হতে লাগল। লেফটেনান্ট বগ্ এবং মেজর হিউসন মঙ্গল পাণ্ডেকে নিরস্ত্র ও গ্রেপ্তার করার হুকুম দিলেন। কিন্তু কোন ফল হলো না। তাঁরা একসঙ্গে মঙ্গল পাণ্ডেকে গুলী করলেন। মঙ্গল পাণ্ডে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে তলোয়ারের আঘাত হানবার আগেই শেখ পল্টু নামে একজন সিপাহী পেছন থেকে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বগ ও হিউসন আহত হলেন। তাঁরা চলে যাবার পর পল্টু পাণ্ডেকে ছাড়তেই মঙ্গল সাথীদের আবার ডাক দিলেন।

—নিকাল আও, পল্টন নিকাল আও হামারা সাথ।'

এবার এলেন কর্নেল হুইলার এবং হিয়ার্সে। মঙ্গল

পাণ্ডে ওঁদের লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেই এক চূড়ান্ত বিস্ময়ের আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁর সঙ্গী সাথীরা কেউই নেই—সবাই ইংরেজদেরই পক্ষে! হতাশায় ক্ষোভে নিজের বন্দুক নিজের বুকে রেখে পা দিয়ে ট্রেগার টানলেন। রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন বীর মঙ্গল পাণ্ডে!

কিন্তু তখনও মৃত্যু হয় নি! শুরুতর জখম হয়ে ছিলেন। অবশেষে ৮ই এপ্রিল সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হলো ও ৮ই এপ্রিল ব্যারাকপুরে সকলের সামনে তাঁকে ফাঁসীতে ঝোলানো হলো।

একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এই ফাঁসীর দৃশ্য বর্ণনায় লিখছেন,

—'ব্যারাকপুরের প্যারেড গ্রাউণ্ডের কেন্দ্রস্থলে ফাঁসীর মঞ্চ তৈরী করা হলো। কামানের শব্দ হওয়া মাত্রই সৈন্যবাহিনী এসে একটি বর্গের তিন দিকে দাঁড়িয়ে গেল। ষষ্ঠি গার্ডদের একটি অংশ অপরাধীকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। তাদেরই পেছন ইংরেজ সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে কোয়ার্টার গার্ডের করেদী সিপাহীরা।.....মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসীর পর তাদের আবার মঞ্চের সামনে দিয়ে মার্চ করিয়ে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হলো।.....চারজন নীচ জাতীয় নেটিভ ফাঁসীর দড়ি গলায় পরিয়ে দেয়।'

ভারতের প্রথম জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে হাসিমুখে বরণ করলেন মৃত্যু। কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নয়—দেশের জন্য প্রাণ দিলেন নির্ভীক চিত্তে, জড়ালেন না কোন ষড়যন্ত্রে। যদিও পরদিন ফাঁসী হলো জমাদার ঈশ্বর পাণ্ডের।—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম শহীদ মঙ্গল পাণ্ডের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যিনি জীবনের জয়গান গাইলেন—স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ তাঁকে প্রণাম জানায়।

• • •

'জগতের ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি আত্মশক্তিতে বিশ্বাসবান লোকের ইতিহাস। বিশ্বাসই ভিতরকার দৈবশক্তিকে জাগ্রত করে। বিশ্বাসবলে মানুষ যা খুশী করতে পারে।
যে মুহূর্তে একটা মানুষ বা একটি জাতি নিজের উপর বিশ্বাস হারায় সেই মুহূর্তে সেই-মানুষ বা সেই-জাতি মরে যায়।
প্রথমে আত্মশক্তিতে বিশ্বাস কর, তারপর ভগবানে বিশ্বাস! একমুঠো শক্তিমান লোক জগৎটা উলটে দিতে পারে। আমাদের চাই অনুভব করবার হৃদয়, চিন্তা করবার মস্তিষ্ক আর কাজ করবার হাত।

—বিবেকানন্দ

'হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী' ঃ ক্ষুদিরাম

কাঁসাই নদীর পাড়ে এক ঘন জঙ্গল। তার ভেতরে বুড়ো শিবের মন্দির। জাগ্রত দেবতা একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেখানে এসে অবাক হয়ে গেলেন এক কিশোর। সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন।

—মন্দিরে এত লোক শুয়ে আছে কেন ?

—ওরা হত্যে দিচ্ছে।

—কেন ?

—দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে। পলকে দীপ্ত হয়ে উঠলো সেই কিশোর।

—আমিও হত্যে দেবো ?

—সেকি ? কি রোগ হয়েছে তোর ?

—রোগ নয়—

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলো সেই কিশোর,

—হত্যে দেবো যাতে আমাদের দেশ ইংরেজের কবল থেকে মুক্তি পায়।

আর যে কথা সেই কাজ! শিব মন্দিরের চত্বরে চব্বিশ ঘন্টা ধরে হত্যে দিলো সেই কিশোর! চারদিকে

তাকে খোঁজার জন্যে বেরিয়ে পড়ল গুপ্তা-কাঙ্ক্ষীরা। শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ এসে সেইদৃশ্য দেখে অভিভূত হন। গাঢ় কণ্ঠে বলেন,

—তোর মতন ছেলেদের নিয়ে আমি একটা দল গড়ছি, যারা দেশের জন্যে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারবে। তোকে আমি সেই দলে চাই।

উল্লসিত হয়ে ওঠে কিশোর।

—আমি রাজী।

—বেশ তাহলে তোর দীক্ষা নিতে হবে।

চাপা উত্তেজনায় অস্থির হয়ে ওঠে কিশোর। একদিন বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর সাইকেল চেপে ধরে।

—আমাকে একটা রিভলভার দিতে পারেন ?

বিস্মিত হেমচন্দ্র বলেন,

—কেন ?

—সাহেব মারবো।

হাসেন হেমচন্দ্র,

—পাবে। সময় মতো ঠিক পাবে।

কাঁসাই-এর ধারে ঘন বনের ভেতর এক ভাঙা বাড়ী। তার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে শক্তিরূপিনী মহাকালীর মূর্তি সত্যেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্রের হাতে গড়া তরুণ বিপ্লবীদের আরাধ্যা দেবী, দীক্ষাদাত্রী। মাতৃ মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে দীক্ষা গ্রহণ করলো সেই কিশোর। সত্যেন্দ্রনাথ তিনটি বিল্বপত্র কিশোরের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,

—যার পায়ের কাছ থেকে ঐ কৃপাণ তুলে নিয়ে নিজের বুক কেটে রক্ত বার করো। সেই রক্ত দিয়ে এই তিনটি বিল্বপত্র ভিজিয়ে মায়ের পায়ে অঞ্জলি দাও, আজ থেকে তোমার জীবন মায়ের কাছে বলি প্রদত্ত।

নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে সেই কিশোর।

বয়স মাত্র ষোল বছর।

নাম ক্ষুদিরাম।

জন্মেছিলেন ১৮৮৯ সালে মেদিনীপুরের মৌবানি গ্রামে, ৩রা ডিসেম্বর তারিখে, বাংলা ১২৯৬ সাল ১৯শে অগ্রাণ, মঙ্গলবার বেলা ৪টায়।

তিন মুঠো ক্ষুদ দিয়ে তাঁর মা বাবার কাছ থেকে কিশোরকে কিনে নিয়েছিলেন এক আত্মীয়া। উদ্দেশ্য মনকে ফাঁকি দেওয়া, ক্ষুদিরামের আগে দুভাই অকালে মারা গিয়েছিলো। ক্ষুদিরামের সাত বছর বয়সেই বাবা মা মারা গেলেন। এবার সেই আত্মীয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মেদিনীপুর শহরে পালিয়ে এলেন ক্ষুদিরাম, সেখানে আশ্রয় মিলল ভগীপতি অমৃতবাবুর বাড়ীতে। কিন্তু দুরন্ত এই বালকের পড়াশুনোয় অনাগ্রহ এবং দুরন্তপনায় তাঁরাও অস্থির হয়ে উঠলেন।

অবশেষে শিক্ষক-গুরু সত্যেন্দ্রনাথের দলে পাকাপাকি ভাবে চলে এলেন ক্ষুদিরাম।

মেদিনীপুরে পুরনো কেল্লায় একবার স্বদেশী মেলা হল। 'সোনার বাংলা' নামে এক বিপ্লব-গর্ভ পত্রিকা বিক্রীর অপরাধে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু সত্যেন্দ্র নাথের আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে সেযাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন। যদিও সত্যেন্দ্রনাথের চাকরী চলে গেল। তখন 'শক্তি-সমিতি'র সদস্য ক্ষুদিরাম আচমকা একদিন সরকারী ভ্যান লুট করে বিপ্লবী ফাণ্ডে প্রচুর টাকা দিলেন।

এবার আত্মগোপনের পালা। কলকাতায় তখন শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং বারীন্দ্র ঘোষের 'বন্দেমাতরম' এবং অপর দুটি কাগজ সন্ধ্যা ও যুগান্তর বিপ্লবী আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ বাণী বহন করে দাবানল সৃষ্টির কাজে লিপ্ত ছিল। কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড এই সব কাগজের লেখকদের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা পরিচালনা করতেন এবং প্রখ্যাত বিপিনচন্দ্র পালকে আহ্বান জানালেন শ্রীঅরবিন্দের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে। অস্বীকার করলেন বিপিনচন্দ্র। সমবেত জনতা চীৎকার করে উঠল 'বন্দেমাতরম'। একজন বালক নাম সুশীল সেন অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে পড়ায় একজন পুলিশ সার্জেন্ট তাকে ধরে—সে ঘুঁষি মারে—পরে কিংসফোর্ড প্রকাশ্য আদালতে সুশীলকে বেত্রাঘাতের হুকুম দেন। মুরারীপুকুর বাগান বাড়ীতে কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র করা হলো। একটা মোটা বই-এর মধ্যে করে বোমা পাঠানো হল, দুর্ভাগ্যক্রমে কিংসফোর্ড মজঃফরপুরে বদলী হওয়াতে সেটা যথাযথভাবে কাজে লাগলো না।

বারীন্দ্র ঘোষ মজঃফরপুরে গিয়ে কিংসফোর্ড হত্যার জন্য দুজনকে নির্বাচিত করলেন। আগ্রহে এগিয়ে এলেন ক্ষুদিরাম। অপরজন প্রফুল্ল চাকী। ছদ্মনাম নিলেন ক্ষুদিরাম—দুর্গাপ্রসাদ, প্রফুল্ল—দীনেশ। মজঃফরপুরে এক ধর্মশালায়, কিংসফোর্ডের বাড়ীর সামনেই উঠলেন তাঁরা। রোজ যান সন্ধ্যে বেলায় কিংসফোর্ড। ফেরার পথে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। পথের ধারে বোমা হাতে অপেক্ষা করছেন দুইজন। দুর্ভাগ্য তাঁদের। কিংসফোর্ড নয়, তাঁর গাড়ীতে করে সেদিন বাড়ী ফিরছিলেন মিঃ কেনেডী ও তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে। নির্ভুল হাতে ছোঁড়া বোমায় গাড়ীতে আগুন ধরে গেল, মারা গেলেন কেনেডী পরিবার।

মুহূর্তে পা থেকে হাতে খুলে সমস্তিপুরের দিকে পা চালালেন ক্ষুদিরাম। প্রফুল্ল ওয়াশিপুরের দিকে। অবশেষে ওয়াইনি ষ্টেশনে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত ক্ষুদিরাম এক মুদির দোকানে যখন কেবল জলপান করতে যাবেন তখন অকস্মাৎ তাঁকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

হতাশায় এবার ভেঙে পড়লেন ক্ষুদিরাম যখন শুনলেন কিংসফোর্ড মরেন নি। মজঃফরপুর ষ্টেশনে প্রচণ্ড ভীড় বন্দী অগ্নিশিশুকে দেখার জন্য।

দীপ্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করলেন ক্ষুদিরাম—বন্দেমাতরম!

জনতার প্রতিধ্বনি—বন্দেমাতরম।

পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিলেন ক্ষুদিরাম,

—'পাঁচ ছদিন আগে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমি মজঃফরপুরে আসি।—আমার সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তার নাম দীনেশচন্দ্র রায়।—এই কাজ করার জন্য কেউ আমাকে নিযুক্ত করেন নি। সন্ধ্যা যুগান্তর আর অন্য সব কাগজ পড়ে আমার মনে এই সংকল্প জাগে।'

বিচার শুরু হলো এবার। না, প্রফুল্ল চাকী বা দলের কারো নামই বললেন না তিনি।

—আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। পিতার নাম

৺ত্রৈলোক্যনাথ বসু। আমি জাতিতে কায়স্থ এবং পেশায় ছাত্র।

তারপর নিশ্চিত ফাঁসী জেনে নিজের কাজের সমর্থনে নির্ভীক ভাবে উত্তর দিতে থাকেন।

জজ রায় দিলেন প্রাণদণ্ডের।

জিজ্ঞাসা করলেন জজানুযায়ী একজন উকিল সতীশবাবু।

—তোমার মনে কোন দুঃখ বা আফশোস আছে?

—বিন্দুমাত্র না।

—তোমার মনে কোন ভয় হয় কি?

—ভয়?

বিস্মিত ক্ষুদিরাম দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন,

—কিসের ভয়? আমি কি গীতা পড়ি নি?

বিচারের দিন রায় বেরোবার পর বিবৃতি দিলেন ক্ষুদিরাম,

—আমাকে যদি অনুমতি দেন, তাহলে যাবার আগে আমি দেশের তরুণদের জানিয়ে যেতে চাই, কি করে বোমা তৈরী করতে হয়।

—মৃত্যুর আগে কোন শেষ ইচ্ছা যদি থাকে

জিজ্ঞাসা করলেন আর এক উকিল কালিদাস বাবু।

স্থির কণ্ঠে বললেন ক্ষুদিরাম,

—একমাত্র সাধ, কাল ফাঁসিতে যাবার আগে যদি মা চতুর্ভুজার একটু প্রসাদ পাই।

১১ই আগষ্ট ১৯০৮ আর এক মঙ্গলবার—বাংলার ১৩১৫-র ২৭শে শ্রাবণ!

ফাঁসির দড়ি গলায় তুলে হাসলেন ক্ষুদিরাম। জল্লাদকে বললেন,

—হাঁ ভাই, ফাঁসির দড়িতে তোমরা বোম মাখাও কেন?

আর তারপর—

—বন্দেমাতরম—

বাংলার প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদ হলেন ক্ষুদিরাম।

কত বছর তো গেল। যমকে ফাঁকি দেবার জন্য তাঁকে ক্ষুদ দিয়ে কিনেছিলেন তাঁর আত্মীয়া।

সফল হয়েছিলেন বৈ কি! ভারতবর্ষের সকল মানুষের হৃদয়ের বিনিময়ে তাঁকে পরমআত্মীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—আর অমর হয়েছেন ক্ষুদিরাম।

• • •

স্বদেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ যে কত গভীর ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রকাশ রয়েছে তাঁর সংগীতে ও কবিতায়।

তিনি নির্ভীক-চিত্তে, মুক্ত কণ্ঠে জন্মভূমির স্বাধীনতা কামনা করেছেন বহুবার। শুধু কামনা করেই ক্ষান্ত হননি, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি নানাভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন, বিপ্লবীদেরও। তাঁর মন প্রাণ উত্তাল হয়ে উঠেছে সংগ্রামের তুঙ্গ মুহূর্তগুলিতে।

নিজের "ত্রাণ" কবিতাটিও তার একটি স্বাক্ষর—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছভয়,
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
— —
এই দাসত্বের রজ্জু,
চূর্ণ করি' দূর করো।
মঙ্গল প্রভাতে মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।"

'ওরা চরণে দলে গেল মরণ শঙ্কারে' ঃ কানাইলাল

'....কানাইলাল কি ধাতুর তৈরী বস্তু তাহা আমরা পূর্বে বুঝি নাই।....শেষে যখন সে বিপদের কাল-বৈশাখীর দিনে আপন শক্তির পরীক্ষা আপনি দিল, তখন তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে, আমরা বন্ধ-পুরীর মাঝে জীবনের আঁধার নিশায় তাহাকে চিনিলাম শুধু হারাইতে! সে ছিল সেই ধাতুর গড়া মহাপ্রাণ বীর যাহারা স্বভাববশে পরের জন্য অযাচিত হইয়া জীবন দেয়, সে ছিল ভারতের চতুর্বর্ণের মাঝে ভগবানের গড়া ক্ষত্রিয়। ....সে বড় সাধের মরণ মরিতেই আসিয়াছে, মরিয়াই তাহার সুখ....

মরণের আশাপথ চাওয়া দিনগুলি সে ঘুমাইয়া ও গীতা পড়িয়া কাটাইত।....মরিবার দিন প্রাতে চারটার সময় তাহাকে বধ্যমঞ্চে লইতে আসিয়া সকলে দেখিল, সে অকাতরে ঘুমাইতেছে। একটি ঘুম হইতে তার জাগরণ আর একটা দীর্ঘতর নিবিড়তম ঘুমের জন্য। তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় উঠানে বেড়াইতে বাহির হইয়া সে আমার ও অনেকের কুঠুরির সামনে দাঁড়াইয়া বিনম্রভাবে বিদায় নমস্কার করিয়াছিল....সে সহাস্য প্রসন্ন জ্যোতির্ময় রূপ আমি কখনও ভুলিব না, কানাই তখন মহাতাপস, প্রকৃত সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী।....আমাদের দেশ যৌবনের আত্মদানের শেষ গুটিক কানাই।....যে কোন দেশে কানাইয়ের তুলনা নাই, কারণ এ বীরপূজার জাতি নাই, গোত্র নাই, দেশ নাই, যেখানে যখন মানুষ প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইয়া আর্তত্রাণ ব্রত ধরে, সেইখানে তখনই সে নমস্য।'

কানাইলালের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেছেন একজন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ।

আর একজন শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, —'আজ যখন চারিদিকে শুনিতে পাই যে, অহিংসা পরম ধর্ম,....তখন চুপ করিয়া তাহা শুনি বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কানাইলালের পরম শান্ত মুখচ্ছবি মনে পড়ে। একি হত্যাকারীর চোখ? একি অধার্মিকের চোখ! অন্তরাত্মা সে কথায় সায় দেয় না, মন শুধুই বলে যে ধর্মের জন্য হিংসা অহিংসার অতীত। ভগবানের হাতের যে যন্ত্র সে আমাদের পাপ-পুণ্যের হিসাবের ধার ধারে না।....যতদিন বাঙ্গালা থাকিবে, বাঙ্গালী থাকিবে, ততদিন কানাইলাল অমর।'

হাঁর থিয়েটারে বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামী অভেদানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দের বলিষ্ঠ মন্ত্রের অন্যতম প্রবক্তা। ওজস্বী ভাষায় সেই বক্তৃতা শ্রোতাদের মনে বিদ্যুৎ সঞ্চার করছে। তরুণ কানাইলাল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছেন সেই ভাষণে।

ভাষণ শেষে ফিরে এলেন তিনি নিজ বাসভূমে—চন্দননগরে। ১৮৮৭ সালে জন্মাষ্টমীর দিন তাঁর জন্ম। ছোটবেলায় কিছুদিন কেটেছে পিতার কর্মস্থল বোম্বাইএ। অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ এই কিশোর বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৯০৭ সালে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে চন্দননগরে স্বদেশীসভা হলো। যদিও ফরাসী পুলিস তাতে বাধা দিলো। ধৈর্য হারালেন না কানাইলাল। দুরন্ত ডানপিটে শক্তিমান কানাই। বিপিনচন্দ্রের নিউ ইণ্ডিয়া আর শ্রীঅরবিন্দের বন্দেমাতরম্ পড়ে দেহে ও মনে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নিচ্ছিলেন। কথা বলতেন কম—কাজ করতেন দৃঢ় প্রত্যয়ে। ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে অধিকাণ্ডের মুখোমুখি হয়েছেন, বন্ধু যতিলাল রায়ের উদ্বেগ বুঝে অসাবধানে রাতে একাকী গেছেন শ্মশানে। মন্ত্রণ সাহেবকে বুঝি

মেরে লাহেরা করেছেন, বিদিশীবর্জনের চেয়েও উত্তাল হয়ে বিদেশী-সার্কাসের সামনে পিকেটিং করেছেন।

ইতিমধ্যে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর থেকে গিয়ে কলকাতায় বারীন্দ্র ঘোষের দলে যোগ দিলেন। তাঁর সঙ্গে কানাইলালের বড় ভাই আশুতোষের ঘনিষ্ঠতা ছিল। কানাই সরাসরি গুপ্ত আন্দোলনে যোগ দেবার অনুমতি চাইলেন। উপেন্দ্রনাথ দেরী করতে চাইলেন—কিন্তু কানাইয়ের আগ্রহাতিশয্যে বারীন্দ্রকুমার তাঁকে দলে নিলেন।

মনস্তাম সফল হলো। কিন্তু মুরারীপুকুরে শুধু বোমা বানিয়ে কি হবে? কাজ চাই। গেলেন চাটগাঁয়ে কুলী-দের মধ্যে কাজ করতে—কিন্তু বাধ সাধল চক্ষু। ফিরে এসে গোপীমোহন দত্ত লেনে হেমচন্দ্র ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত ইত্যাদিদের সঙ্গে বোমা তৈরীর কাজে লাগলেন।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লচাকীর কর্মঅভিধানের পর অকস্মাৎ মুরারীপুকুর থেকে গ্রেপ্তার হলেন বারীন্দ্রকুমার, উল্লাসকর ইত্যাদিরা এবং নানা জায়গা থেকে নরেন গোঁসাই, অরবিন্দ, কানাইলাল—প্রায় সকল বিপ্লবীগণই!

আলিপুরে মামলা শুরু হলো। বারীন্দ্র কুমার জেল ভেঙে পালাবার গুপ্ত ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এবং আচমকা পুলিশী নির্যাতনের চাপে নরেন গোঁসাই রাজ সাক্ষী হতে রাজী হলেন।

বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি মৃত্যু—কানাই লাল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন।

দলনেতা বারীন্দ্র কুমার আপত্তি করলেন। গোপনে দুটি রিভলবার তিনি জেলের মধ্যে সংগ্রহ করেছিলেন। জেল ভেঙে পালাবার আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়।

এমতাবস্থায় বাইরের বিপ্লবীরাই নরেনের ব্যবস্থা করবে, ভেতরে অত গণ্ডগোল করবার দরকার নেই!

কানাইলাল মনে মনে অস্বীকার করলেন এর যৌক্তিকতা। সহযোগী সত্যেন্দ্রনাথের ছিল হাঁপানীর অসুখ। সেই সুযোগটি নিলেন তিনি। তিনিও রাজসাক্ষী হবেন এবং সেজন্য যাতে উভয়ের বিবৃতি একই হয় এই পরামর্শ করার জন্য নরেন গোঁসাই এর সঙ্গে দেখা করার আবেদন করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে!

নরেন সত্যেন্দ্রনাথের মূল উদ্দেশ্য আদৌ বুঝতে পারলেন না।

এদিকে কানাইলাল গোপনে বারীন্দ্র কুমারের রিভলবার দুটি সংগ্রহ করে নিজের শোবার কম্বলের তলায় রেখে অসহ্য পেটব্যথার অভিনয় করলেন। তাঁকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে গিয়ে তিনিও বললেন, তিনি অ্যাপ্রুভার হবেন। এবং এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রের সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চান। সেই ব্যবস্থাই হলো। রিভলবার একটি চালান হলো সত্যেন্দ্রের কাছে। পেট ব্যথা সারল। তিনি 'সেল'-এ ফিরলেন।

পরদিন নরেন গোঁসাই এল সত্যেন্দ্রের কাছে। সত্যেন উঠে জানলা দিয়ে দেখলেন কানাই দাঁত মাজায় অছিলায় সিঁড়ির নীচে প্রস্তুত। আর দেরী নয়। মুহূর্তের মধ্যে কোমর থেকে রিভলবার বের করে নরেনকে গুলী করলেন সত্যেন। সিঁড়ি দিয়ে আহত নরেন উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। প্রস্তুত ছিলেন কানাই। তিনিও পশ্চাদ্ধাবন করলেন। ঘনঘন রিভলবারের আওয়াজে জেল প্রাঙ্গন চমকে উঠল। জেলার যোগেনবাবু দেখলেন রিভলবার হাতে কানাই আর সত্যেন ছুটছে নরেনের পেছন পেছন। বেশীক্ষণ নয়! পালাবার পথ নেই আর! ডেকের উপর পড়ে গেল নরেন! ঝুঁকে পড়লেন কানাই আর সত্যেন। গুনে গুনে গুলী গুলো উজাড় করলেন নরেনের শরীরে।

—এমনি করেই বিশ্বাসঘাতক মরে।

—আর যেন কেউ বাঙ্গলাদেশে বিশ্বাসঘাতকতা না করে।

বিচার শুরু হলো। ৭ই সেপ্টেম্বর। বিচারক হায়রা জজ মো সাহেব।

কানাই বললেন,

—আমিই নরেনকে হত্যা করেছি!

—একাজ করলেন কেন?

—কারণ সে বিশ্বাসঘাতক···দেশের শত্রু।

—এই পিস্তল কোথা থেকে পেয়েছেন ?

—সে কথা শুনে কি হবে ? ধরে নিন, ক্ষুদিরামের মাসীমাই এসে আমাকে ওটি দিয়ে গেছেন।

ফাঁসির হুকুম দেবার পর বিচারক জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমার আর কিছু বলবার আছে ?

—না,

নির্ভীক কানাই বললেন,

—নরেন গোঁসাইকে হত্যা করার জন্যে যে অপরাধ তা আমার একার প্রাপ্য। আমারই রিভলবারের গুলীতে নরেন মারা যায়।

১৯০৮ সালের ১০ই নভেম্বর ফাঁসির দিন ধার্য হলো। নিঃশঙ্ক নিরুদ্বিগ্নচিত্ত মহাবীর কানাইএর দেহের ওজন বাড়ল—মন আনন্দিত। জেল ওয়ার্ডাররা বিস্মিত। দাদা অরবিন্দ তখন আলিপুর জেলে। ভাইকে দেখার দুর্দম বাসনায় যখন তিনি আবেদন করলেন প্রহরীদের কাছে—তখন আইন অগ্রাহ্য করে প্রহরীরা বললেন,

'—আমরা পিছন ফিরে দাঁড়াচ্ছি, আপনি এই অবসরে স্পর্শ করে নিন।'

শ্রীঅরবিন্দ একবার বলেছিলেন,

'একটি পৌরুষহীন জাতি আমরা চাই না, যারা কেবল কাঁদতে পারে, আঘাত হানতে জানে না !'

কানাইলাল মৃত্যুকে অশঙ্ক চিত্তে বরণ করে বাঙ্গালীর দীপ্ত পৌরুষকেই জাগ্রত করে গেলেন।

৫

• • •

....আজ সহসা সামনের সেই বিপুল মহাগর্জন তার শান্ত গতির বুকে জাগিয়ে তোলে প্রলয়-আলোড়ন.....যে-দুর্নিবার, যে-অশান্ত, যে-সুবিশাল, যে-মহাভয়ঙ্কর অথচ যে-ঈপ্সিত চির সুন্দর ছিল দূরে, সে-এসে গিয়েছে স্পর্শের সীমানার মধ্যে। মেঘচুম্বী তরঙ্গের মূর্ত্তিতে সে করে আহ্বান। যে আহ্বান বাজে নদীর অন্তরে। তার শান্তগতির ধারায় জেগে ওঠে মেঘ-চুম্বী তরঙ্গ, ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায় দুই তটের বাঁধন। উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গ ! তরঙ্গর ডাক দেয় তরঙ্গকে। মহাকাল রুদ্রসাজে আসে পৌরোহিত্য করতে। তরঙ্গ মিশে যায় মহাতরঙ্গে। জীবন-মৃত্যু একই সঙ্গে উত্তাল, উদ্দাম হয়ে উঠে !

'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'

ঃ সত্যেন্দ্র বসু

মেদিনীপুরের কাঁসাই এর ধারে ঘন জঙ্গলে ঢাকা এক পোড়োবাড়ীর নিভৃতে মহাশক্তিরূপিনী মাতৃমূর্তির সম্মুখে দেশের জন্য সর্বস্বত্যাগ প্রাণ বিসর্জনের প্রস্তুতি এবং নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মোৎসর্গের জন্য কিশোর ক্ষুদিরামকে দীক্ষা দিচ্ছেন একজন যুবক। স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

জানেন সত্যেন্দ্রনাথ, এই কিশোর একদিন বুড়ো শিবতলায় দেশের মুক্তির জন্য হত্যা দিয়েছিল। সতর্ক দৃষ্টিতে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন তাকে। দেখেছেন দেশের মুক্তির জন্য যে কোন স্বার্থ বিসর্জন দিতে এই কিশোর প্রস্তুত। তাকে তাই নিজের গুপ্ত সংগঠনে ডেকে নিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে মেদিনীপুর উত্তাল।

এমন সময় কিছু সংগ্রামী যুবক সংগ্রহ করা কঠকর হয় নি। দীক্ষান্তে ক্ষুদিরামকে স্বদেশী মেলায় পুস্তিকা বিতরণের ভার দেন সত্যেন্দ্রনাথ। ধরা পড়ে ক্ষুদিরাম। অসামান্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দেন তখন তিনি। পুলিশকে বলেন,

—এ কাকে ধরেছ এ যে ডেপুটিবাবুর ছেলে!

তৎক্ষণাৎ পুলিশ ক্ষুদিরামকে ছেড়ে দেয়। কিন্তু পরে এই ছলনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় স্কুলের চাকরীটি চলে যায়। এবার তিনি কলকাতায় বারীন ঘোষের দলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ব্যারিষ্টার পি. মিত্তিরের পরিচালনায় ১০৮ নং আপার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। বাঘাযতীন এর অন্যতম নায়ক ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে বৈপ্লবিক দীক্ষা লাভ করেন। পরে ফিরে এসে মেদিনীপুরের মিঞা বাজার অঞ্চলে আবার গুপ্ত সমিতি গড়েন।

অসাধারণ মেধাবী কর্মী সত্যবাদী আর আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এসব গুণ পেয়েছিলেন তাঁর খুল্লতাত কবি রাজনারায়ণ বসুর কাছ থেকে। কবি 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামে একটি বই লেখেন—এবং তাঁর স্বপ্নকে সফল করার জন্য তাঁরই দৌহিত্র অরবিন্দ ঘোষ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্র নাথ সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। সত্যেন্দ্র নাথ ১৮৮২ সালের ৩০শে জুলাই মেদিনীপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। অভয় চরণ বসু তাঁর পিতার নাম, মাতা তারাসুন্দরী দেবী।

পড়াশুনোয় অত্যন্ত কৃতী ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। এনট্রান্স পাসের পর বি. এ পড়তে কলকাতায় আসেন পরে স্বাস্থ্যের কারণে আবার ফিরে আসেন স্বগৃহে। এখানে আর একজন বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগোর সহায়তায় গড়ে তুললেন বিপ্লবীদল। এদিকে কিংসফোর্ড হত্যার ষড়যন্ত্র মামলায় ক্ষুদিরাম ধরা পড়ায় পর ব্যাপক হারে গ্রেপ্তার শুরু হলো। সত্যেন্দ্রনাথ দাদার বাড়ীতে থাকতেন। ভোরের দিকে ভারী বুটের আওয়াজে দাদার ঘুম ভাঙতেই পুলিসের লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে সত্যেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। তারা ভেবেছিলো ক্ষুদিরামকে পিস্তল সরবরাহ করেছেন সত্যেন্দ্র নাথ। কলকাতার আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হলেন তিনি। পুরনো সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হলো। এরই মধ্যে আচমকা নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী

হওয়াতে সত্যেন্দ্রনাথ ও সহযোগী কানাইলাল তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন। বারীন্দ্র কুমারের সংগৃহীত পিস্তল সুকৌশলে জোগাড় করলেন কানাইলাল। অসুখের ছলনায় হাসপাতালে গেলেন সত্যেন্দ্র।

তারপর অ্যাপ্রুভার হবেন এই লোভ দেখিয়ে নরেনকে ডাকলেন নিজের কাছে। আলাপ হতো প্রতিদিন। সন্দেহ করতেন না নরেন। কানাই একদিন অসুখের ছলনায় হাসপাতালে এসে রিভলবার দিয়ে পরিকল্পনা বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন।

নির্দিষ্ট দিনে প্রহরী হিগিনসের সঙ্গে নরেন এলেন। হিগিনস্ সরে গেল। কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা রিভলভার মুহূর্তে তুলে ধরলেন সত্যেন্দ্র। গর্জে উঠল রিভলবার। প্রাণ ভয়ে আহত নরেন পালাতে লাগলেন। হিগিনস ছুটে এল রিভলবার কাড়তে। আহত হলো। নীচে নেমে নরেনকে দেখতে পেলেন না সত্যেন। এক কনেষ্টবলের চোখের ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন। লিন্টন নামে নরেনের স্নেহরক্ষী এগিয়ে এল। ভয়ে পালাতে বাধ্য হলো। প্রস্তুত ছিলেন কানাই। গর্জে উঠল তাঁর রিভলবারও। নর্দমায় মুখ থুবড়ে পড়লেন নরেন। একে একে তাঁর দেহের উপর সব কটি গুলী নিঃশেষ করলেন কানাই এবং সত্যেন।

—Finished—

তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন।

দেশময় ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বাসঘাতক হত্যার এই সকল কার্যক্রম। কাগজের অফিসে বসে অরবিন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন শুনলেন তখন তিনি আনন্দে নাচতে লাগলেন এবং সন্দেশ কিনে সকলকে খাওয়ালেন।

বিচার শুরু হলো।

—তোমার কিছু বলার আছে?

—না। আমি কোন দোষ করি নি।

বিচারক মুষড়িয়ে পড়লেন। কার গুলীতে নরেন নিহত হয়েছেন?

পাঁচজন জুরির মধ্যে তিনজনই বললেন সত্যেন নির্দোষ।

তবু ফাঁসীর হুকুম হয়ে গেল।

তাঁর সুরবালা দেখা করতে এলেন। তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন সত্যেন। বললেন মাকে বলতে তাঁর একছেলে তো আমেরিকায় আছে—দেখতে চাইলেই যেমন দেখা যায় না তাকে, তেমনি আমিও দূর দেশে থাকি। আমার আত্মা মাকে ঘিরে থাকবে। তার তো মৃত্যু নেই!

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীকে দেখতে চাইলেন তিনি। গরাদের ওপারে এসে দাঁড়ালেন এক আচার্য।

—আপনি আমাকে বলে দিন কি করে শান্তিতে মরতে হয়? অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন আচার্য—

—যাবার সময় তোমার পিতা আর পিতৃব্যকে স্মরণ কর। তাঁরা দুজনেই মহাপ্রাণ ধার্মিক ছিলেন।

শেষ প্রার্থনা বাক্য উচ্চারণ করলেন,

'—হে ভগবান, আমাকে শান্তিতে প্রাণত্যাগ করতে শিক্ষা দাও! আমাকে বল দাও! হে সর্ব শক্তিমান। আমি তোমার নিকট যাবার জন্যই পিপাসার্ত হয়েছি।'

১৯০৮ সালের সেই দিনে পিছমোড়া করে বাঁধা সত্যেন্দ্রকে ফাঁসীর মঞ্চে নিয়ে আসা হলো। হাসলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

সেই হাসি মৃত্যুঞ্জয়ী এক বীরের যিনি জানতেন নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

• • •

সিডিশন বিল পাশ উপলক্ষে লিখিত "কণ্ঠরোধ" প্রবন্ধের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ শাসক গোষ্ঠীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, ওইরূপ নিগ্রহ-নীতির ফল অকল্যাণকর হইবে। প্রজাপক্ষের অন্তরে পোষিত অসন্তোষ প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশের দ্বার-সমস্ত পথ না পাইয়া গোপনে গোপনে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; কেবল তাহাই নহে, সেই রুদ্ধিত অসন্তোষ কোন না কোন উপায়ে নিজকে প্রকাশ করিবেই, হয়তো বা অতি ভয়ঙ্কর রূপে।

'ওরা সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে' ঃ ভগৎসিং

১৯২৩ এর একদিন কানপুরে দুই তরুণ স্কুলের ছাত্র বটুকেশ্বর দত্ত এবং অজয় ঘোষ বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে আলাপ হলো এক পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে। চালচলন গ্রাম্য ছেলেদের মতো। তবে মনে প্রচণ্ড তেজ। বটুকেশ্বর এবং অজয়ের মতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বোদ্ধা হবার জন্য দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আলাপ হলো মাত্র। পরে আবার দেখা হলো আর একদিন। এবার প্রকাশ্যে বিপ্লবের আলোচনা কিন্তু সবারই এক কথা। দেশ যেন ঝি মি য়ে পড়ছে। ভগৎ সিং ১৯১৫ সালের পাঞ্জাবী বিপ্লবী কর্তার সিং এর কথা বললেন। আলোচনার শেষে ঠিক হলো কানপুরে একটি জিমনাসিয়াম গড়ে তোলা হবে। এটিই হবে বিপ্লবীদের মিলন কেন্দ্র। কাজ শুরু হলো। আচমকা কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন অনেক বিপ্লবী। তাদের বিপ্লবী দলও ভেঙে গেল—তারা ভিন্নজন বাদে। ভগৎ সিং পাঞ্জাবে ফিরে গিয়ে 'নওজোয়ান ভারতসভা' নামে একটা দল করলেন। সেখানে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হতো যাতে প্রয়োজনের সময় সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে পারেন তাঁরা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এল সাইমন কমিশন। দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদ উঠল। লাহোরে এই ঘটনা চরম আকার ধারণ করল। ভারতপূজ্য লালা লাজপতরায় পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হলেন। এবং এরই ফলে পরে প্রাণত্যাগ করলেন।

ভগৎ সিং এর বাসনা পূরণের দিন এল। যে পুলিশ কর্মচারী মিঃ সাণ্ডার্সের পরিচালনায় পুলিশ লালাজীকে আহত করেছিলো— একদিন দেশবাসী সচমকে লক্ষ্য করল সেই মিঃ স্যাণ্ডার্স নিহত হয়েছেন।

ভগৎ সিং এবার সামরিক শিক্ষার আয়োজন সম্পূর্ণ করে তুলতে উঠে পড়ে লাগলেন। বাংলা দেশ থেকে বোমা বানানো শেখানোর জন্য লাহোরে এলেন বিপ্লবী যতীন দাস। ভগৎ সিং তা শিখে নিয়ে একদিন পুরনো বন্ধু বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে পরিষদ ভবনে ঢুকে বোমা ফাটালেন। সেখানে তখন শ্রমিকদের সম্পর্কে একটা বিল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

বটুকেশ্বর এবং ভগৎ সিং পালাতে গিয়ে ধরা পড়লেন। বিচার শুরু হলো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ইতিমধ্যে লাহোরে বোমার কারখানা আবিষ্কার হওয়াতে মামলা মোড় ঘুরলো। এই সেই বিখ্যাত 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'!

ভগৎ সিং অনশন শুরু করলেন। বাংলার যতীন দাসও

সরকার বেকায়দায় পড়ে স্পেশাল অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। আদালতে আনতেই ভগৎ সিং ও সঙ্গীরা ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিলেন। প্রচণ্ড বিক্রমে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল বিপ্লবীদের উপর। বন্দীরা সত্যাগ্রহ ঘোষণা করলেন। এবার সরকার শুরু করলেন বিচারের প্রহসন। পাঁচমাস ধরে প্রহসন চালাবার পর ১৯৩০ সালের অক্টোবরে ভগৎসিং রাজগুরু এবং শুকদেবের ফাঁসীর হুকুম হলো। দেশের লোক ভগৎসিং এর প্রাণ রক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বড়লাট আরউইনের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আলাপ আলোচনা চলছিল তখন। আশা ছিল এবার প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত হবে। কিন্তু না। করাচী কংগ্রেসের মুখেই ভগৎসিং এর ফাঁসি হয়ে গেল। বয়স তখন তাঁর মাত্র ২৪ বছর। অনন্ত উষার মতো তাঁর আবির্ভাব। ক্ষণিক দীপ্তিতে সমগ্র ভারতের অন্তর উদ্ভাসিত করে তিনি ডাক দিয়ে গেলেন সকলকে—সেই আলোতে পথ চিনে চলতে।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যাঁরা জীবনের জয়গান ঃ সূর্য সেন

'তখনো ভোর হয় নি।....সেদিন কি আমি কল্পনাও করতে পেরেছিলাম যে....সেদিন পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের সঙ্গে আর এক নতুন সূর্যের সঙ্গে পরিচয় হবে আমার ?....

—আপনি কি একজন স্বদেশী ? আপনি নিশ্চে রাজনৈতিক ডাকাতি করেছেন, সাহেব মেরেছেন !'

—না, এমন কিছু করিনি এখনো....

দ্বিধাহীন শান্ত সুরে উত্তর পেলাম,

—যা বলে তোমাকে খুশী করতে পারব। দেশ-কর্মী হতে হলে মনকে আগে প্রস্তুত করতে হবে।....মনে কর পুলিশ তোমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করছে—পারবে তুমি ঠোঁট বন্ধ করে রাখতে ? ভালো করে ভেবে বল—দেশের জন্য, বিপ্লবের জন্য কতখানি ত্যাগ স্বীকার করতে পারবে ?

....উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তিনি বাধা দিলেন, —'না আজ নয়।....ভালো করে ভেবে আমাকে জানিয়ে যেও !'

কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ....তখন কে জানত চট্টগ্রাম সহরের একপ্রান্তে কর্ণফুলী নদীর তীরে ক্ষুদ্র বিদ্যালয় এক কুটিরের একান্ত নির্জনতায় সমাহিত রয়েছেন ভারতের একজন মহান্ দেশপ্রেমিক ও সর্বজনবরেণ্য বিপ্লবী নেতা ? কে জানত, সেই নিরীহ শিক্ষকের স্থির প্রশান্ত চোখদুটি একদিন জ্বলে উঠে মাতৃ-ভূমির দ্বিশতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে ! কে জানত, অতি সাধারণ চেহারার এই মানুষটিকে চট্টগ্রামের বীর সন্তানেরা দিকে দিকে তাদের অবিসংবাদী নেতা বলে মেনে নিয়ে তাঁর পতাকা তলে সমবেত হবে ? কে জানত, সেই স্বল্প বাহু অতোধিক স্বল্প শব্দগুলোর অধিকারী একদিন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির বৃহত্তম আয়োজনকে ব্যর্থ করে—তার সমগ্র ক্ষমতাকে উপহাস করে বৎসরের পর বৎসর চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তুলবে ?

কে এই মহাপ্রাণ 'মহাবিপ্লবী ?'....

লিখেছেন অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রামেরই আর এক বীর সেনানী অনন্ত সিং,

—'ইনিই মাষ্টার দা, আমাদের প্রিয়তম নেতা মাষ্টার দা, মাষ্টার সূর্য সেন !'

হ্যাঁ, সূর্য সেন ! দু অক্ষর বিশিষ্ট সূর্য নামটি যেন তাঁর সমগ্র সত্তার এক যাদুময় তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা ! ভারতবর্ষের সশস্ত্র আন্দোলনের ইতিহাসে সূর্যপ্রতিম একটি ভাস্বর অনুপ্রেরণা—যাঁর পবিত্র আলোক স্পর্শে একসময় সারাদেশে জ্বলে উঠেছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা, উদ্ভাসিত হয়েছিল সকল বিপ্লবীর অন্তর সত্তা ! জন্মেছিলেন চট্টগ্রামেই ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ তারিখে রাজমণি সেনের ঘরে ! উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন মুর্শিদাবাদে। সেখানে পাঠ্যাবস্থাতেই দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য কৃতসংকল্প হন এবং পাঠান্তে চট্টগ্রামেই শিক্ষকতা নিয়ে ফিরে আসেন। অসাধারণ জনপ্রিয় ছিলেন এই শিক্ষক —শুধু পাঠ্যতালিকার বইগুলিই নয়—পরাধীন ভারতের তৎকালীন রাজনীতির শিক্ষাও ছাত্রদের দিতেন তিনি। তাঁর কথা তরুণ চিত্তগুলিতে অসাধারণ স্পন্দন জাগাতো —স্বতঃস্ফূর্ত ভালোবাসায় তিনি হলেন সবার 'মাষ্টারদা' !

প্রথমে চট্টগ্রামেরই এক গোপন বিপ্লবী দলে তিনি যোগ দেন এবং পরে মতভেদ হওয়াতে, সহরের দেওয়ান

বাজার অঞ্চলে 'সাম্যাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। নামে আশ্রম হলেও এতে বিপ্লবী কার্যকলাপের পাঠ দান করা হতো এবং ফলে গোয়েন্দা বিভাগের কড়া নজর ছিল এর উপর। অবশেষে ১৯২৩ সালে সাম্যাশ্রম ত্যাগ করে 'সুলুকবাহার' নামে এক বাড়ীতে মাষ্টারদা আশ্রম নেন। ১৯২১-এ গান্ধীজী ডাক দিলেন অহিংস আন্দোলনের। কিন্তু বিপ্লবীরা এ-পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অবশেষে অনন্ত সিংহের নেতৃত্বে মাষ্টারদার নির্দেশে ১৯২৩-এ এক রেলডাকাতি করে অর্থসংগ্রহ করা হলো। পুলিশ এটি মাষ্টারদার কাজ মনে করে তাঁদের গ্রেপ্তার করবার জন্য জাল পাতেন। অপরিসীম সাহসিকতার সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করে মাষ্টারদা ও সহকর্মীরা বেষ্টনী ভেদে পালিয়ে যান এবং নায়েরবেদা পাহাড় অঞ্চলে গেরিযুদ্ধ শুরু হয়। পরাজয় অনিবার্য জেনে মাষ্টারদা ও অম্বিকা চক্রবর্তী সায়নাইডের পান করেন কিন্তু অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যায়! তাঁরা [illegible]! পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও পরে প্রমাণাভাবে [illegible]।

এরপর দীর্ঘ আড়াই বছর অন্তরালে থেকে মাষ্টারদা সংগঠনকে শক্তিশালী করে তুলতে চেষ্টা করেন। অবশেষে ১৯২৬-এ তিনি গ্রেপ্তার হন। মেদিনীপুর জেল থেকে তাঁকে বোম্বাইএর রত্নগিরি জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯২৮-এ আবার মুক্তিলাভ করেন।

অনুশীলন ও যুগান্তর—বিপ্লবী দলের এই দুইটি শাখা তখন পরস্পর বিবদমান দুটি দলে পরিণত হয়েছিল। এর অগ্রগতি আরো ব্যাপক হলে মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হবার আশংকাতে মাষ্টারদা আপ্রাণ চেষ্টা করলেন দুটি দলকে একসূত্রে গ্রথিত করতে! কিছুটা সফলও হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯২৯-এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী তীব্র গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছে! এই সুযোগটির সদ্ব্যবহারের জন্য মাষ্টারদা চট্টগ্রামের বিপ্লবীশক্তিকে সংহত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

অতীতের অনুকরণ করে ব্যক্তি হত্যা নয়, সন্ত্রাস নয়, সমগ্র শাসন ব্যবস্থার উপর চূড়ান্ত আঘাত হানবার জন্য বিপুল এবং অপ্রতিরোধ্য এক আয়োজন করলেন সূর্য সেন। ১৯২৯-এর মাঝামাঝি সময়ে মাষ্টারদার আহ্বানে এক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দিলেন সুভাষচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রমুখ দেশনায়কগণ! যুব সম্মেলন ছাত্র সম্মেলন, নারী সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো! কিন্তু দুটি অঘটন ঘটে গেল। রামকৃষ্ণ বিশ্বাস নামে এক বিজ্ঞানের ছাত্র বোমার ক্যাপ তৈরী করবার সময় গুরুতর ভাবে আহত হলেন এবং জেলা কংগ্রেসের নির্বাচনী সভায় বিভেদের অপরাধে প্রতিপক্ষের হাতে পর্যুদস্ত হলেন মাষ্টারদা স্বয়ং! কিন্তু কিছুতেই তাঁর উদ্যমকে দমিত করা গেল না। এল ১৯৩০ সাল। বিপ্লবের অগ্নিশিখাকে সমগ্র জেলায় ছড়িয়ে দেবার আয়োজন সম্পূর্ণ প্রায়! কিন্তু অকস্মাৎ আর এক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়লেন আর এক বিপ্লবী তারকেশ্বর দস্তিদার। এতেও মনোবল ক্ষুণ্ণ হলো না কারো। ইতিমধ্যে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক এল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে! মাষ্টারদা এই সুযোগটি হাতছাড়া করলেন না। গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্য এক ইস্তাহার পত্র বিলি করলেন—আগামী ১৯শে এপ্রিল থেকে তাঁর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন সুরু হবে। পুলিশ বিভ্রান্ত হলো!'

চরমক্ষণ আগেই স্থির করা ছিল। ১৮ই এপ্রিল। মাষ্টারদার নেতৃত্বে স্থাপিত হয়েছিল ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মি—চট্টগ্রাম শাখা। এই বাহিনী জেলা পুলিশের কেন্দ্রীয় অস্ত্রাগার, সামরিক কেন্দ্রের অস্ত্রাগার, টেলিগ্রাফ ভবন, টেলিফোন ভবন ধ্বংসের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, নির্মল সেন প্রভৃতি বিপ্লবীদের নেতৃত্বে কয়েকজন শক্তিশালী সুশিক্ষিত বিপ্লবী যথানির্দিষ্ট সময়ে মুহূর্তের মধ্যে পরিকল্পনাকে কাজে রূপান্তরিত করলেন। বিপ্লবের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে হতচকিত হয়ে গেল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। সমগ্র চট্টগ্রাম সহর দখলে এল বিপ্লবীদের। স্বাধীন বিপ্লবী জাতীয় সরকার গঠিত হলো!

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলেও প্রতি আক্রমণের সুযোগ নিতে ভুললো না সুচতুর ইংরেজ। বিপ্লবীরা দুর্ভাগ্যবশতঃ

সহরের কেন্দ্রস্থলে প্রবেশের পথ না পেয়ে ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন। প্রচণ্ড সংঘর্ষ সুরু হলো পাহাড়ে! লোকনাথ বলের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা অসীম প্রাণশক্তি আর অসীম সাহসিকতার পরিচয় রাখলেন। নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, টেপরা বল, মতি কানুনগো, অর্ধেন্দু দস্তিদার, শশাঙ্ক দত্ত, নির্মল লালা, বিনোদ দাশগুপ্ত, মধু দত্ত, পুলিন ঘোষ ও প্রভাস বল সহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। প্রায় অলৌকিক ক্ষমতায় মেসিনগানের গুলি অগ্রাহ্য করে মাষ্টারদা এই মরণপণ লড়াইকে তীব্র করে তুললেন। সন্ধ্যাবেলায় সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে, গেরিলা প্রথায় সংগ্রামের উদ্দেশ্যে পাহাড় থেকে তাঁরা নেমে এলেন। এদিকে মূল দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত ফেণি স্টেশনে পুলিশের দ্বারা বেষ্টিত হন কিন্তু সাফল্যজনক তৎপরতায় তাঁরা বেরিয়ে আসেন বেষ্টনী ভেঙে এবং ফরাসী অধিকৃত চন্দননগরে সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্যের আশ্রয়ে আত্মগোপন করেন। সেখানে ১লা সেপ্টেম্বর প্রচণ্ড লড়াই হবার পর তাঁরা গ্রেপ্তার হন। অনন্ত সিংহ আগেই আত্মসমর্পণ করেন। জেল থেকে তাঁদের মুক্ত করার জন্য মাইন পুঁতে জেল ভাঙার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন মাষ্টারদা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা ব্যর্থ হয়। পরে আদালত গৃহ ধ্বংসের পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়—কিন্তু তবু নিরুৎসাহ হন না মাষ্টারদা! গেরিলা পদ্ধতিতে অত্যাচারী শাসকেরা একের পর এক বিপ্লবীদের হাতে নিহত হতে থাকেন। ১৯৩২-এ নির্মল সেন ও মাষ্টারদা ধলঘাটে শ্রীসাবিত্রীদেবীর বাড়ীতে আত্মগোপন করেন। খবর পেয়ে পুলিশ বাড়ীটী ঘিরে ফেলে এবং সম্মুখ সমরে নির্মল সেন মারা যান। মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা পালাতে সমর্থ হন। এরপর ইউরোপীয়ান ক্লাব ধ্বংসের পরিকল্পনা নেন মাষ্টারদা। এবং শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর অধীনে প্রথম দল অকৃতকার্য হয়। শৈলেশ্বর বিষপানে আত্মহত্যা করে! ঐ মাসেরই ২৪শে তারিখে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে আর একটি দল সাফল্যজনক ভাবে ক্লাব ধ্বংস করে কিন্তু ধরা পড়ার আগেই প্রীতিলতা আত্মহত্যা করেন পরের বছর ফৈয়ালা গ্রামের শ্রীকীরোদপ্রভা বিশ্বাসের বাড়ীতে ব্রজেন সেন ও মাষ্টারদা আশ্রয় নেন। কিন্তু প্রতিবেশী নেত্র সেন বিশ্বাসঘাতকতা করায় পালাতে গিয়ে এক গুর্খাসৈন্যের সঙ্গে অন্ধকারে ধাক্কা লাগায় তিনি গ্রেপ্তার হন। এক বিশেষ আদালতে তারকেশ্বর, মাষ্টারদা ও কল্পনা দত্তের বিচার হয়। ১৯৩৪ এর ১২ই জানুয়ারী মাষ্টারদাকে ফাঁসীতে ঝোলানর সিদ্ধান্ত নেয় সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুর ইংরেজ!

মাষ্টারদার একজন সহকর্মী শ্রীভোলা মজুমদার সেই মর্মান্তিক ঘটনার স্মৃতি উদ্ধার করে লিখছেন,

'আমাদের সামনে মাষ্টারদার ফাঁসি হবে। এর কত মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক তা প্রকাশের ভাষা নেই।.... ভাবতাম মাষ্টারদা'র দিনগুলো নির্জন সেলের মধ্যে কি ভাবে কাটছে। রাত্রির নিস্তব্ধে মনে হত, যেন দূর থেকে তাঁর অভয় বাণি শুনতে পাচ্ছি।....মাষ্টারদা চেঁচিয়ে বলছেন, 'ভাইসব, বিদায়। আজ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছি। দুঃখ কোর না। আমি জানি আমার স্বপ্ন সফল হবে। বিপ্লবের বহ্নি জ্বালিয়ে গেলাম। তাতেই আমার মৃত্যুর শান্তি।' তখন সমস্ত কারাকক্ষের কয়েদী ও রাজবন্দী সোচ্চারে 'বন্দেমাতরম্' ও 'মাষ্টারদা জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে দিলো। অবিরাম 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে সমস্ত কারাপ্রাচীর প্রকম্পিত হয়ে উঠল। সান্ত্রীরা রাইফেল হাতে কারাকক্ষে ঢুকে আমাদের নিদারুণ প্রহার করতে লাগল। তবু আমাদের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে—'বন্দেমাতরম্' 'মাষ্টারদা জিন্দাবাদ'। সারা রাত্রি চলবে এভাবে নির্মম অত্যাচার।'

লিখছেন, অন্যতম সহকর্মী ব্রজেন সেন,

'১৯৩৪ সালের ১১ই জানুয়ারী রাত বারোটায় চাপা কণ্ঠে উচ্চারিত হল জেল সেলের মধ্যে বন্দেমাতরম্—'বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক্!....সশস্ত্র গুর্খা প্রহরী-বেষ্টিত জেল-সেলের দরজা ইংরেজ কর্মচারীরা অতি সন্তর্পণে খুলে নিদ্রিত মাষ্টারদা'র উপর বন্য হিংস্র পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে দাঁত মুখ ভেঙ্গে খেতলে হত্যা করে মৃত দেহখানি ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে দেয়।'

এরপর অনেক অহিংসার্ত দিন ভারতের স্বাধীনতার সূর্যকে প্রকট করেছে! বহু বিপ্লবীর আত্মত্যাগে, শেষ রক্ত বিন্দুর পবিত্র স্পর্শে ঘুম ভেঙেছে ভারতবর্ষের। কোটি কোটি মানুষের ঘুমন্ত চেতনা এবং তারপর—এক অজ্ঞাত কারণে তাদের সেই অবিরাম দেবতাদুর্লভ আত্মদান বিস্মৃত হয়েছে—হৃতে চলেছে স্বাধীন দেশ। দুর্ভাগ্য আর দুর্ভোগের অন্ধকার নেমে এসেছে দেশের বুকে!

তবু এখনও যাঁরা আলোর প্রত্যাশী তাঁরা সেই এক সূর্যের জন্য সূর্যমুখীর মতো উন্মুখ হয়ে আছেন—সেই সেই সূর্য—যাঁর অপর নাম সূর্য সেন।

•

উনিশ শ' পাঁচ বাংলার যৌবনকে যে ক্ষাত্র-বীর্যের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল, কংগ্রেসের অহিংসাবাদে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

সুভাষচন্দ্র জীবনের প্রথম চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সেই নব-সন্তান ধর্মে নিজেকে দীক্ষিত করেন···তাঁর দীক্ষাগুরু—বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দ, তাঁর শিক্ষাগুরু দেশবন্ধু···তিনি ছিলেন তাঁদের মানস-সন্তান··· উত্তরাধিকারী। এবং উপযুক্ত সন্তান ও শিষ্যের মতন তিনি একান্ত নিষ্ঠা সহকারে জীবনের পবিত্রতম ধর্মের মতন গুরুদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন। নীরবে সেই আদর্শ অনুসরণ করে নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে ছিল একটা বিরাট নিঃশব্দ প্রস্তুতি।

বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের তাঁর চরিত্রের ভিত্তি, 'ব্রহ্মচর্য'···যে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য এনে দেয় দুর্বার প্রাণশক্তি, অগ্নিতেজ, অনন্তবীর্য···দিয়েছিলেন তাঁকে জীবনবোধ। এ-জীবন মায়ের চরণে বলি প্রদত্ত। শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন তাঁকে স্বাধীনতার আদর্শ। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ। ভারতীয়ত্ব, অসংখ্য শক্তির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্র। দেশবন্ধু তাঁকে দিয়েছিলেন বাঙালীর প্রাণের বৈশিষ্ট্য, অনির্বাণ প্রাণ-বহ্নির আশীর্বাদ। বাংলার এই তিনজন মহাপুরুষের দান লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে থাকে। বিলুপ্ত-স্রোতা বাংলার জীবন-জাহ্নবী আবার নতুন করে যেন তাঁর অন্ত ভেদ করে প্রবাহিত হলো। সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলো বাংলা, বাংলা হয়ে উঠলো সুভাষচন্দ্র।

'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন' ঃ দীনেশ গুপ্ত

সেই ১৯৩০ সাল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সবচেয়ে অগ্নিগর্ভ বছর। এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের বীর সৈনিকরা দেশ মুক্তি যজ্ঞের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সবখানে তার থেকে স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছেন বাংলার তরুণেরা।

৮ই ডিসেম্বর। ডিরিয়পুরের পাইপ রোডের মোড়ে এসে মিলিত হলেন তিনজন তরুণ। নিখুঁত সাহেবী পোষাকে পরণে। ট্যাক্সি পাল্টে এবার তাঁদের গন্তব্যস্থল রাইটার্স বিল্ডিংসের দিকে যাত্রা করলেন তাঁরা। অকুতোভয়, অপ্রতিরোধ্য, স্থির লক্ষ্য, বজ্রের মতো কঠোর!

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আর ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া হিসেবে সাধারণ মানুষ এবং রাজবন্দীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু হয়েছে। আলিপুর জেলের বন্দীদের উপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জের ফলে আহত হয়েছেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। সারা বাংলার বিপ্লবী তরুণচিত্ত এর প্রতিশোধ নেবার জন্য বদ্ধপরিকর।

এই ভয়ংকর অত্যাচারের নায়ক কর্ণেল সিম্পসন এখন বিপ্লবীদের লক্ষ্য। কোন ক্ষমা নেই। অত্যাচারীকে নিঃশেষে মুছে ফেল পৃথিবী থেকে।

ট্যাক্সির আরোহী তিন যুবকের রক্তে আগুনের নেশা, চোখে লক্ষ্যভেদী অর্জুনের একাগ্রতা! রাইটার্সের সামনে নামলেন সেই তিন বাঙালী সাহেব। এইখানেই কর্ণেল সিম্পসন একটা ঘরে বসে বাংলার প্রশাসন পরিচালনা করেন। কিন্তু আর কতক্ষণ? দৃঢ় পদক্ষেপে নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালেন ওরা। সর্বাধিনায়ক জিজ্ঞাসা করলেন,

—তোমরা প্রস্তুত? পটাসিয়াম সায়নাইড ঠিক রেখেছো?

—হ্যাঁ আমরা প্রস্তুত।

—দেন রেডি ফর দ্য ফাইনাল অ্যাকশান।

—ওকে!

সুকঠিন প্রতিজ্ঞার হাতে ধরা আছে তিনটি অগ্নি বালিকা। সিম্পসনের ঘরের সামনে এসে বললেন তাঁরা,

—আমরা দেখা করতে চাই সাহেবের সঙ্গে।

পথরোধ করল চাপরাশি।

—স্লিপ লাগবে।

নীরব উপেক্ষায় তাকে পাশ কাটিয়ে ভিতরের ঘরটা ঠেলে ঢুকলেন তিনজন। মুখোমুখি স্বাধীনতার পরম শত্রু সিম্পসন। মুহূর্তমাত্র। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একসঙ্গে তিনটি রিভলবার। লুটিয়ে পড়লেন সিম্পসন।

—হু ইজ, নেকস্ট?

সর্বাধিনায়ক বললেন,

—ফাইনান্স মেম্বার আলবিয়ন ব্যানার্জি।

মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড আক্রমণ। মুহুর্মুহু রিভলবারের গর্জনে আতংকে বিস্ময়ে দিশেহারা হয়ে গেল সমগ্র প্রশাসন বিভাগ। জুডিসিয়াল সেক্রেটারী মিঃ নেলসন আহত হলেন, মিঃ মার আর্দালীর সেহনে লুকিয়ে পালালেন। সহকারী ইলপেক্টার জেনারেল অব্ পুলিস

মিঃ জোনস কয়েক রাউণ্ড গুলি খরচ করে কিছুই করতে পারলেন না। খবর গেল লালবাজারে কুখ্যাত টেগার্টের কাছে।

ডেপুটি কমিশনার গর্ডন ও বার্টকে নিয়ে এবং বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে রাইটার্সে এলেন টেগার্ট!

প্রতিপক্ষ মাত্র তিনজন তরুণ! কিন্তু জীবন মৃত্যু যাঁদের পায়ের ভৃত্য—কোন মারণ অস্ত্র তাঁদের হৃদয়ে এতটুকু ভয়ের কাঁপন জাগাতে পারে না!

শুরু হলো ঘি্ নট থ্রী, রাইফেল এল. এম. জি আর রিভলবারের হুঙ্কার—বন্দেমাতরম মন্ত্রের অমোঘ উচ্চারণ—তিনজন অগ্নিশিখার লেলিহান শিখার সর্বগ্রাসী আস্ফালন—ইতিহাস বিখ্যাত 'বারান্দা-ব্যাটেল'—অসিম যুদ্ধ!

সর্বাধিনায়ক বললেন,

—সমস্ত জাতি আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। উই উইল-ফাইট টু দি লাস্ট!

একজন সহকারীর বাঁ হাতে আচমকা গুলি এসে বিঁধল!

—এনিথিং রং ক্যাপটেন।

হাসতে হাসতে অবিচলিত সহকারী বলেন,

—নাথিং মেজর। ওকে!

আর একজনের রিভলবার হঠাৎ নীরব হয়ে যায়।

—এনিথিং রং লেফটেন্যান্ট?

—আমার গুলি ফুরিয়ে গেছে! আই অ্যাম গ্লাড ওয়েটিং ফর ইউ ফাইনাল অর্ডার।

মুহূর্তমাত্র! কঠোর আদেশ এল সর্বাধিনায়কের।

—তুমি সায়নাইড খেয়ে ফেলো। উই আর অলসো ফলোয়িং ইউ।

আর একজন সহকারীকে বললেন,

—পিস্তল রেডি রাখো। এক গুলিতে নিজেকে খতম করবে।

আমিও তাই। বলো বন্দেমাতরম!

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের ভিত্ কাঁপিয়ে তীব্র জয়োচ্চারণ হলো—বন্দেমাতরম!

সায়নাইডে লুটিয়ে পড়লেন একজন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল! সব শেষ।

সব শেষ?

এঁরা কারা—মাত্র তিনজন এসে যাঁরা ইংরেজদের দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করে একজন প্রশাসককে হত্যা করে—কয়েকজনকে আহত করে বীরের মৃত্যু বরণ করলেন স্বেচ্ছায়? কৌতূহলী ইংরেজ এবার এগিয়ে এল। না দুজন মরেন নি তখনো। শুধু বিষপানকারীই মৃত। তাঁর পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল পরিচয় পত্র।

—বি. এন. সে।

একি সত্য পরিচয়? তিনদিন মৃতদেহ আটকে রাখা হলো! অবশেষে বরানগরের টি. গুপ্ত এসে সনাক্ত করলেন ভাইপোর মৃতদেহ। না। বি. এন. সে নয়—ওঁর আসল নাম সুধীর গুপ্ত। ডাক নাম বাদল।

আর দুজন! আহত সর্বাধিনায়কের মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন চার্লস টেগার্ট!

—হু আর ইউ?

হাসি ফুটে ওঠে রক্তাক্ত মুখে।

—আই অ্যাম বিনয় বোস। আই অ্যাম গ্লাড বিনয় বোস। বিস্ময়ের আঘাতে চমকে উঠলেন চার্লস টেগার্ট! এই সেই বিনয় বোস! ঢাকার লোম্যানের হত্যাকারী! সেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবী বিনয়? একে বাঁচিয়ে ফাঁসিতে ঝোলাতেই হবে।

কিন্তু না। জানতো না সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দম্ভ, এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া মূর্খতা আর বীরের মৃত্যু যাঁর কাছে কাম্য—তাঁর শুধু দেহকে বাঁচিয়ে রাখার সাধ্য কার? তিনি তো এমনিতেই অমর।

হাসপাতালে নিজের মাথার ব্যাণ্ডেজ ছিঁড়ে আঙুল ঢুকিয়ে রক্ত সৃষ্টি করলেন বিনয়। না, কোন স্বীকৃতি নয়, কোন প্রশ্নের উত্তর নয়? একটিই ওঁর নিজের জিজ্ঞাসা—কেমন করে স্বাধীন হবে? একটিই উত্তর এই-ভাবে আত্ম বলিদান দিয়ে। ১৩ই ডিসেম্বর ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হাসপাতাল থেকে আলিপুরের কনডেমড্ সেলে আনা হলো অপর সেনানী দীনেশকে।

মিঃ গার্লিকের নেতৃত্বে শুরু হলো বিচার। উদাসীন দীনেশ, দার্শনিক দীনেশ, রসিক দীনেশ, অকুতোভয় দীনেশ, রবীন্দ্রভক্ত গীতার মর্মজ্ঞ দীনেশ নির্বিকার।

—আমি আমার কাজ করেছি, এবার ওরা ওদের কাজ করুক। দেশ জুড়ে উঠল তুমুল প্রতিবাদ।

—দীনেশের প্রাণদণ্ড মেওয়া চলবে না!

কিন্তু কুচক্রী শাসকের কানে সেকথা ঢুকল না। বিচারের রায় হলো প্রাণদণ্ড। স্বয়ং জেলার এসে বললেন, দীনেশ, শিটিশান করুন। মার্সি? দয়া? কার কাছে চাইব? পাশের সেলে আছে চট্টগ্রামের আর এক বীর বিপ্লবী রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। তাঁরও ফাঁসীর দিন গোনা শুরু হয়েছে! এই তো পরম পাওনা। ঈশ্বরের পরম অনুগ্রহ! ক্ষুদ্র নীচ মানুষের কৃপাকণার প্রত্যাশী তারা কেন হবে?

হ্যাঁ অথচ বিশ্বাস তাঁর ঈশ্বরের প্রতি। বৌদিকে লেখা এক চিঠিতে লিখছেন দীনেশ,

.....'ভগবান মঙ্গলময়। বিপদের সময় যদি এ কথাটা ভুলিয়া যাই, তবে আমাদের চেয়ে দুর্ভাগা আর কে? যাহাতে অমঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না, তাহার ভিতর দিয়াও ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রকাশিত হইতেছে। অজ্ঞান আমরা, তাই চোখ থাকিতেও এটা দেখিতে পাই না।' আর এক চিঠিতে আছে, ...'ভগবানের আশীষ যারা পায় অশেষ দুঃখ ভোগে তাদেরই কপালে।....ভগবান যাকে আসল কাজের জন্য বেছেনেন, তার সুখ সম্পদ সবকিছু যেন ধূলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল।.....যাকে তিনি কাজের ভার দেন, সে ভার বহন করার মতো শক্তিও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন তিনিই।

—.....শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে...
মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।'....

হ্যাঁ বীর বিপ্লবী, গীতার বিশ্বাসী দীনেশের কাছে মৃত্যু তো জীবনেরই আর এক রূপান্তর। লিখছেন তিনি,

—'মনে হয় মরণকে আমরা ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই।....মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে।—

ফাঁসী হবে ৭ই জুলাই। ৬ই জুলাই তোর চারটের জেলার এলেন সেলের সামনে।

হাসি মুখে দাঁড়ালেন দীনেশ।

—আমি প্রস্তুত।

ফাঁসীর মঞ্চে উঠতে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল হাংম্যান! হাসলেন দীনেশ। ধরবার দরকার হবে না। আমি নিজেই উঠছি। হাত পিঠমোড়া করে বাঁধা হলো, চোখ ঢাকা কালো টুপি মাথায়, হাংম্যান পরিয়ে দিল ফাঁসীর দড়ি! চারটে ত্রিশ মিনিট।

—বন্দেমাতরম—

মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হলো না। দীনেশের নশ্বর আত্মা দেহত্যাগ করল।

দীনেশের বিপ্লবী গুরু শ্রীনিভূষণ সেন লিখেছেন,

—সাতমাস বেঁচেছিল দীনেশ আলিপুর জেলের কনডেমড সেলে। সে দেশ আজ ভারতবর্ষের প্রাণতীর্থ। এই পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে দীনেশের যে গভীর উপলব্ধি তা আজ সমগ্র জাতির বিপ্লবী দর্শন।'

জানতেন দীনেশ, জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করলেই মহাজীবনের সন্ধান মেলে। আর সেই মহাজীবনের সন্ধানই মানুষের জীবন দর্শনের মূলমন্ত্র।

সেই মন্ত্রের সাধক ছিলেন দীনেশ গুপ্ত—স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিক যে মন্ত্রের সাধনা করলে ব্যক্তি জীবন ও জাতীয় জীবন মহিমান্বিত হয়ে উঠবে।

"রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানকারীদের অন্যতম বি ভি-র কর্মি এবং মেদিনীপুরে বি ভি-র প্রথম শাখা সংগঠক দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী হয়ে গেছে গত বছর ৭ জুলাই। যে স্পেশাল ট্রাইবিউনাল দীনেশকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল, তার প্রেসিডেন্ট আলীপুরের সেসন্স জজ গার্লিককে হত্যা করেছে সান্তকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের কর্মি কানাই ভট্টাচার্য্য ।৭ জুলাই। ২৮ অক্টোবর ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্নোর ওপর বিপ্লবীরা আক্রমণ চালিয়েছিল। ২৯ তারিখেই আবার কলকাতায় ইয়োরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সের ওপর গুলী চালিয়েছিল বি ভি-র কর্মি বিমল দাসগুপ্ত, পেডি নিধন ব্যাপারে যাকে গ্রেপ্তারের জন্য আড়াই হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল।

১৯৩২ সাল ৩০শে এপ্রিল সময় যখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা, মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যেই আটটি বিষয়ের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত শেষ করে যখন নবম বিষয়টি আলোচনার সূত্রপাত করা হবে, ইন্সটিটিউটের সভাপতি ডগলাস যখন ডিসট্রিক্ট বোর্ডের কিছু কাগজপত্র স্বাক্ষর করছে মাথা নীচু করে, প্রভাংশু আর প্রদ্যোতের চোখে চোখে তখন মারাত্মক এক ইঙ্গিত ঝলক দিয়ে উঠল। তারপরই গর্জ্জে উঠল রিভলভার পর পর দুবার।

তিনটি লক্ষ্য ভেদ করল, একটি ডগলাসের হাতে, আরেকটি বুকে, তৃতীয়টি ওর পেটে। চেয়ারের ওপর চলে পড়ল সে।

চমকে উঠল অর্ডারলীরা, চমকে উঠল গার্ডরা, চমকে উঠল সাদা পোষাক-পরা আই বি-র লোকেরা। সবাই প্রায় একযোগে রিভালভার বার করল।

কিন্তু অনতার হৈ চৈ, চীৎকার, ইতস্তত: ছুটোছুটি, হুটোপুটির মধ্য দিয়েই ছুটে বেরিয়ে এল ওরা দুজন।

বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়ল প্রাঙ্গণে। প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রধান গেট। গেট পেরিয়ে রাজপথ।

রাজপথে পড়ে দুজনে প্রাণপণে ছুটতে লাগল। পশ্চাতে ধেয়ে আসছে অস্ত্রধারী পুলিশের দল আর তাদের সঙ্গে খোলা রিভলভার উঁচিয়ে তমলুক মহকুমা হাকিম জর্জ্জ। ঘন ঘন গর্জ্জে উঠছে এদের হাতের অস্ত্র, অথচ একটিও লক্ষ্য ভেদ করতে পারছে না। আততায়ী দুজন একেবেঁকে ছুটছে।

কিছুদূর গিয়েই দুই রাস্তার মোড়ে একখানা বাড়ী, 'অমর লজ'। মুহূর্ত্তের জন্য পাশাপাশি এল ওরা, কি একটা কথা হল, তারপরই দেখা গেল দুজন ছুটছে দু' রাস্তায়, একজন উত্তর-পূর্ব দিকে, আরেকজন সোজা দক্ষিণে।

হকচকিয়ে গেল পুলিশের দল। এখন কোন্ দিকে যাবে? কে কার পেছনে ধাওয়া করবে? ভাগাভাগি হতেও ওদের ভয়। তাই একজনকে ছেড়ে দিয়ে ওরা দ্বিতীয় জনের পেছনেই ধাওয়া করল সবাই মিলে। সে প্রদ্যোৎ।

প্রভাংশু চলে গেল চোখের আড়ালে। চতুর ছদ্মবেশী সে। প্রকাশ্য দিবালোকেই তার বলিষ্ঠ শরীরের সঙ্গে মানানসই মোটা একটি পাকানো গোঁফ স্পিরিট গাম দিয়ে নাকের নীচে এঁটে নিয়েছিল, যাতে কেউ না চিনতে পারে। সত্যিই কেউ চিনতে পারেনি।

বাড়াজোল রাজ কাছারির উত্তর সীমান্তে এসে প্রভাংশু লক্ষ্য করল তার পেছনে পুলিশ নেই, কেউ নেই। দাঁড়াল সে। তারপর ধীরে ধীরে এগোল সতীকুণ্ডগামী সড়ক দিয়ে। এল লাল দীঘির পাড়ে। গোঁফ জোড়া ফেলে দিল দীঘির জলে, ফেলে দিল জুতো জোড়া তারপর রিভলভার ও অবশিষ্ট বুলেটগুলি একটি কালভার্টের নীচে সাবধানে লুকিয়ে রেখে মাণিকপুরের দিকে রওনা হল শান্ত স্নিগ্ধ সুবোধ বালকের মত। ধীরে ধীরে প্রবেশ করল শহরে, উঠল গিয়ে ছোট মামা অমল বসুর বাড়ীতে। যেন অপরাহ্নকালীন চায়ের আসরে যোগ দিতে এসেছে সে। পরদিন সোজা কলকাতায়।"

গল্পের আসর

বাইরের সঙ্গে প্রায় সব সম্পর্ক ছিন্ন।

মাসে একবার করে দেখাশোনার ব্যবস্থা·· বাসন্তী দেবী আসেন···কারামুক্ত হয়ে ··স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে কারাগারে···

সাহেব প্রহরী দাঁড়িয়ে

স্বামী স্ত্রীতে কথা হয়···সাহেবের শুনতে অসুবিধা হয়···

সাহেব বলে উঠেন, Please, speak loud,...I can't hear!

দেশবন্ধু গর্জন করে ওঠেন, I refuse to obey·· বিদায় না নিয়েই চলে আসেন নিজের কুঠুরীতে··

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখাশোনা, সব বন্ধ হয়ে গেল···

কারাগার থেকে যেদিন বেরিয়ে আসবেন, কারাগারের মধ্যে একটি লোকের হলো বড় অসুবিধা

মধুর তার নাম পাকা আসামী ···দশ বারো বার ডাকাতির অপরাধে জেল খেটেছে····

জেলের মধ্যে দেশবন্ধু তাকেই বেছে নিয়েছিলেন, তাঁর কাজকর্ম করবার জন্যে····

প্রথম প্রথম মধুর মনটা ভয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতো কিন্তু তিনদিন যেতে না যেতে তার কি হয়ে গেলো, একদণ্ড দেশবন্ধুকে ছেড়ে থাকতে পারতো না

বন্ধুর মতো সে নিজের জীবনের সব কথা দেশবন্ধুকে বলে যেতো, দেশবন্ধু একমনে তা শুনতেন ···

এমন করে তার কথা জীবনে তো কেউ শোনে নি। মধুর মনে হলো, তার জেল-খালাসের "ছুটি" হয়ে গিয়েছে, সে বেঁচেই গেছে দেশবন্ধু জেলে আসবার সময় তাকে আশ্বাস দিয়ে এলেন, যখন তার ছুটির সময় হবে, দেশবন্ধু তাকে নিয়ে যেতে আসবেন--

কারাগার থেকে বাইরে এসে বিপুল কাজের মধ্যেও দেশবন্ধু সেকথা ভোলেন নি···

যেদিন মধুর ছুটি পেয়ে জেলের বাইরে এসে দাঁড়ালো··· দেখে একজন লোক তাকে নিয়ে যাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে···

দেশবন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছেন তাকে নিয়ে যাবার জন্যে। তিনি ঠিক করলেন, মধুরকে তাঁর খাসভৃত্য করে কাছে কাছে রাখবেন···আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবেরা সকলে বারণ করলো···খুনে ডাকাত···কখন কি করে বসে ঠিক নেই···

দেশবন্ধু কারুর কথা শুনলেন না, তিন বছর মধুর তাঁর কাছে কাছে অষ্টপ্রহর ছিল ··

আজ দেশবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে মধুরের কথাও বলতে হলো···

থানা থেকে জমাদার মধুরের খবরাখবর নিতে আসতো··· বলতো···যা বেটা, তুই মানুষ হয়ে গেলি।

মহাজীবন

নির্মলেন্দু গৌতম

আপিসে এসে অরবিন্দবাবু খবর পেলেন কালকেই তাকে বাইরে যেতে হবে দিন দুয়েকের জন্য।

বাইরে যেতে অরবিন্দবাবুর আপত্তি নেই। কিন্তু ক'দিন থেকে শরীরটা ভালো যাচ্ছে না ব'লেই বাইরে যাবার খবরে একটুখানি অস্বস্তি বোধ করলেন। কিন্তু আপিসের কেউকে কিছু বললেন না এ নিয়ে।

কাগজপত্র সব বুঝে নিয়ে টিফিনের আগেই আপিস থেকে বেরিয়ে পড়লেন অরবিন্দবাবু। হাঁটতে হাঁটতে ধর্মতলায় এসে জিনিসপত্র কিনলেন। তারপর বাড়ি ফিরলেন একটা ট্যাক্সি করে।

কমলা অরবিন্দবাবুকে অসময়ে ফিরতে দেখে অবাক হলো। বললো, 'হঠাৎ এতো তাড়াতাড়ি, ট্যাক্সি ক'রে ফিরলে যে।'

'কাল আপিসের কাজে দিন দুয়েকের জন্য বাইরে যেতে হবে। তাই চ'লে এলাম। তৈরী হয়ে নিতে হবে তো।' যেন কৈফিয়ৎ দিলেন অরবিন্দবাবু। কারণ কমলা ইদানিং প্রায় রোজ তার শরীর সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করছে।

'কোথায় যাবে?' কমলা একটু অবাক হয়ে শুধালো।

জায়গার নাম বললেন অরবিন্দবাবু।

অরবিন্দবাবুর আনা জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে কমলা বললো, 'তোমার শরীর তো ভালো যাচ্ছে না ক'দিন থেকে।'

'দু'দিনে আর এমন কি খারাপ হবে!' যেন কৈফিয়ৎ দিলেন অরবিন্দবাবু।

কিছু সময় ভেবে কমলা বললো, 'না ক'রে দিলে কি হতো!'

'আপিসের কাজ, সব সময় না করা যায় না।'

কমলা আর কিছু বললো না। কেবল চিন্তার কিছু রেখা তার মুখখানাকে অসহায় করলো।

অরবিন্দবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্রেনের টাইম টেবিলটা নিয়ে বসলেন এবার।

অল্পক্ষণ পরেই বসার ঘরে ফিরলো নিরু। এই সময়েই ওর ক্লাস ছুটি হয়ে যায়। ঘড়ি থেকে চোখ ফিরিয়ে অরবিন্দবাবু নিরুর দিকে তাকালেন। নিরু অবাক হয়ে শুধালো, 'তুমি কখন এসে বাবা?'

'এই তো মিনিট পাঁচেক আগে।' অরবিন্দবাবু ঘড়ি দেখলেন।

'হঠাৎ? টাইম টেবিল দেখছো কেন?' নিরু অবুঝের মতো শুধালো এবার।

'বাইরে যেতে হবে আপিসের কাজে।'

'সে কি, ক'দিন থেকে তো তোমার শরীর ভালো যাচ্ছে না।' একটু যেন উদ্বিগ্ন হলো নিরুর কণ্ঠ। ঠিক কমলার মতো কিছু রেখা তার মুখে ফুটে হলো।

দীর্ঘ ক'রে সিগারেটে টান দিয়ে অরবিন্দবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'এ বয়সে শরীর একটু আধটু খারাপই থাকে মাঝে মাঝে। তা নিয়ে ভাববার কিছু নেই।'

নিরুকে চিন্তিত দেখালো আরো। নিরুর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসলেন অরবিন্দবাবু। সব সময় নিরু তার জন্যে ভাবে। কখন যে বড়ো হয়ে রমণীয় মমতায় অরবিন্দবাবুকে তার সমস্ত ভাবনার মধ্যে তুলে নিয়েছে নিরু, অরবিন্দবাবু তা বুঝতেই পারেন নি। শুধু যখন অনুভব করেন, তখন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর মনে হয়, এই সুখটুকু নিয়েই তিনি নিজেকে অনেক বড়ো বলে ভাবতে পারেন।

নিরু মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে বললো, 'আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে?'

'পাগল নাকি? যাচ্ছি আপিসের কাজে, হোটেলে উঠবো, বাইরে বাইরে থাকবো। সারাদিন কোথায় রাখবো তোকে?'

নিরু কিছু বললো না। চুপ ক'রে রইলো। কিছু যেন গভীরভাবে ভাবছে নিরু।

অরবিন্দবাবু বললেন, 'দু'দিনের জন্য যাচ্ছি। পারলে আগেই ফেরে আসবো কাজটা।'

'তাই করবে। হোটেলে তোমার সহ্য হবে না।' কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে চাইলো নিরু।

মনে মনে হাসলেন অরবিন্দবাবু। নিজেকে সুখী বলে ভাবতে পারলেন। নিরুকে কেন জানি মায়ের মতো লাগছে।

একটু সময় বসে থেকে নিরু কলেজের শাড়ি পাল্টাতে চলে গেলো ভেতরে।

টাইম টেবিল দেখে খুশিমতো সকালের দিকের একটা ট্রেন বেছে নিলেন অরবিন্দবাবু। তাড়াতাড়ি পৌঁছে কাল থেকে কাজ শুরু করতে পারলে শুধু একটা রাত্রি ওখানে থাকলেই চলবে।

কথাটা ভেবে অরবিন্দবাবু নিশ্চিন্তে সিগারেট টানতে থাকলেন।

খুব সকালে উঠে কমলা আর নিরু দু'জনে মিলে গুছিয়ে দিলো সব। তার পর রান্নাঘরে চলে গেলো কমলা। নিরু একটা কোমরে আঁচল গুঁজে ছোটো হোল্ড-অলটা বেঁধে ফেললো। অরবিন্দবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন সব কিছু। বাঁধতে বাঁধতে নিরুর ছোট্ট কপালে ঘাম চিক্ চিক্ করলো, চুলগুলো এলোমেলো হয়ে লেগে রইলো কপালে। শিল্পী-শিল্পী দেখালো নিরুকে।

সুখী মানুষের মতো মেয়ের কাজ দেখলেন অরবিন্দবাবু।

নিরু এবার কাছে এসে বললো, 'সব গুছানো হয়ে গেছে। তুমি এবার খেয়ে নাও বাবা।'

'যাই।' বলে উঠে দাঁড়িয়ে ঘড়ি দেখলেন অরবিন্দবাবু। আর বেশী সময় নেই। ট্যাক্সি পেতেও তো সময় লাগবে।

'একটা সুটকেস আর ছোট্ট বেডিং সঙ্গে নিচ্ছো। ট্রেনে উঠতে নামতে কিন্তু অসুবিধে হবে না তোমার।' আঁচলটা কোমর থেকে খুলে নিয়ে মুখ মুছে নিরু বললো।

অরবিন্দবাবু বললেন, 'দরকার হ'লে নিজেই সুটো দু'হাতে নিতে পারবো।'

নিরু বললো, 'তা পারবে। কিন্তু নেবে না।'

হেসে অরবিন্দবাবু বললেন, 'আচ্ছা।'

কমলা খাবার সাজিয়ে বসেছিলো।

অরবিন্দবাবু বললেন, 'এতো সকালে বেশী খেতে পারবো না।'

কমলা বললো, 'বেশী মিই নি। হোটেলের খাওয়া সেই রাত্রে খাবে। এ টুকু না খেলে সারা দিন কাজ করবে কি ক'রে?'

নিরু বললো, 'না সত্যি বলেছে কিন্তু। তুমি খেয়ে নাও বাবা।'

অরবিন্দবাবু কিছু না বলে খেতে শুরু করলেন। নিরুর মমতায় তার মাকে মনে পড়ছে।

খেতে খেতেই নিরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা ট্যাক্সি ডাকতে হবে এবার।'

'দাঁড়াও রঘুকে বলে আসি।'

নিরু দ্রুত পায়ে চলে গেলো রঘুকে বলতে।

রঘু মানে পাশের বাড়ির ছেলে। নিরুর কাজ ক'রে দেবার জন্য সব সময় এক পায়ে খাড়া।

নিরু চলে যেতে কমলা বললো, 'ও তোমার জন্যে খুব ভাবছে।'

কমলার মুখ থেকে কথাটা শুনতে ভালো লাগলো অরবিন্দবাবুর। খেতে খেতে মুখ তুলে বললেন, 'শরীরটা ক'দিন থেকে ভালো যাচ্ছে না বলেই বেশী ভাবছে।'

কমলা বললো, 'তা হবে।'

অরবিন্দবাবু খেতে থাকলেন আবার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নিরু ফিরে এলো। ব্যস্তভাবে বললো, 'রঘুকে বলে এসেছি। ও চলে গেছে ট্যাক্সি ডাকতে।'

কমলা বললো, 'ওয়াটার ক্যারিয়ারে জল ভ'রে দে নিরু।'

'ওহ্ হো। ভুলেই গিয়েছিলাম।'

বের হলো নিরু। অরবিন্দবাবুকে ঠিক মতো রওনা করিয়ে দেবার সব দায়িত্বটাতো নিরুর।

ঘরে এসে জামাকাপড় পরে তৈরী হতে হতেই বাইরে ট্যাক্সি থামবার শব্দ পেলেন অরবিন্দবাবু। ছেলেটা খুব তাড়াতাড়িই ট্যাক্সি পেয়েছে যা'হোক। নিশ্চিন্ত হলেন অরবিন্দবাবু।

নিরু তেমনি ব্যস্তভাবে বললো, 'ট্যাক্সি এসে গেছে।'

'আমিও রেডি।' অরবিন্দবাবু বললেন সঙ্গে সঙ্গে।

রঞ্জু এলো ঘরে। একবার জিনিসগুলো দেখে বললো, 'আমি বেডিংটা নিয়ে যাচ্ছি। নিরুদি, আপনি সুটকেসটা নিয়ে আসুন।'

নিরু আর রঞ্জু বেডিং, সুটকেস আর ওয়াটার ক্যারিয়ারটা নিয়ে চলে গেলো।

অরবিন্দবাবু পেছনে পেছনে এলেন খবরের কাগজখানা নিয়ে। ট্রেনে সময় কাটাতে হবে তো।

সময় হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই ট্যাক্সিতে উঠে অরবিন্দবাবু আর সময় নষ্ট করলেন না। ট্যাক্সি চলতেই পেছনের কাঁচের মধ্য দিয়ে একবার নিরু, কমলা, রঞ্জুকে দেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে সামনের দিকে ফিরে সীটের মধ্যে পিঠ ডুবিয়ে বসলেন। অনুভব করলেন নিজের মমতার বৃত্তটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। সেই বৃত্তের মধ্যেই নিজে সুখ ধরে আছেন বুকের মধ্যে।

ঘরটা ছোট্ট হলেও যে হোটেলে এসে উঠলেন অরবিন্দবাবু, সে হোটেলটা মন্দ নয়। যে ঘর পেলেন সে ঘরটাও খুব পছন্দ হলো অরবিন্দবাবুর। বেশ খোলা মেলা আলো-বাতাস-খেলা ঘর।

হোটেলে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবার সময় ছিলো না। সুটকেসটা খুলে কাগজপত্র বের করে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লেন অরবিন্দবাবু। যতো তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফেলতে পারবেন ততোই তো সুবিধে।

তাছাড়া নিরুর কথাও মনে পড়লো অরবিন্দবাবুর। নিরু ভাবছে। আজ হয়তো কলেজে যাবে না। কলেজে গেলেও ক্লাসে মন থাকবে না নিরুর। কেবল অরবিন্দবাবুর কথাই ভাববে নিরু।

বেরিয়ে অন্যমনস্কভাবে অরবিন্দবাবু হোটেলের কাছ থেকেই রিকসা উঠলেন।

সারাদিন কাজ করলেন অরবিন্দবাবু। যতো তাড়াতাড়ি পারলেন অর্ধেকের অনেক বেশী কাজ তুলে ফেললেন। আগামীকালই ফিরবেন অরবিন্দবাবু।

হোটেলে ফেরার সময় কিন্তু একদিনে অতো বেশী কাজের কষ্ট অনুভব করতে থাকলেন। মাথার মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হলো। নিশ্চয়ই কিছু সময় বিশ্রাম নেয়া উচিত ছিলো তার।

হোটেলে এসে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলেন অরবিন্দবাবু। সারা দিনের পরিশ্রমটুকু মুছে ফেলতে চাইলেন। কিন্তু মাথা ধরা কিছুতেই কমলো না। একটু যেন অসহায় বোধ করতে থাকলেন তিনি।

হোটেলে একটা ছেলেকে পাঠিয়ে চা আনালেন অরবিন্দবাবু। চায়ের সঙ্গে একটা এসপিরিন খেলেন। কিন্তু মাথার মধ্যে অস্বস্তিটুকু তেমনি রইলো।

একটু ফাঁকায় বেড়িয়ে এলে কেমন হয়!

স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সুটকেস থেকে ধুতি পাঞ্জাবী বের করলেন। বড়ো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ধুতি পাঞ্জাবী পরলেন, বুকে স্নিঠে পাউডার বুলালেন অনেকখানি। সযত্নে চুল আঁচড়ালেন। তারপর দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

আকাশে এখন গোধূলীর রঙ লেগেছে। আকাশ মাটিতে একটা রক্তাক্তভাব। মাথার অস্বস্তিটুকুর জন্য সেই রঙ সমস্ত অনুভূতি দিয়ে অনুভব করতে পারছেন না অরবিন্দবাবু।

সিগারেট খেতে ইচ্ছে করলো না বলে প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করেও ফের পকেটে ভরে রাখলেন। কোথায় যাওয়া যায় গভীরভাবে ভাবতে থাকলেন।

কাছাকাছি একটা নদী আছে। কাজের ফাঁকে জায়গাটা সম্পর্কে একে ওকে জিজ্ঞেস ক'রে একটা ধারণা তৈরী ক'রে নিয়েছেন অরবিন্দবাবু। কাজেই নদীর কাছাকাছি ফাঁকায়, শীতলতায় যাবার জন্য হাঁটতে থাকলেন এবার। মনে মনে শীতলতাই যেন প্রার্থনা করছিলেন অরবিন্দবাবু।

অল্প সময়ের মধ্যে নদীর কাছে পৌঁছে গেলেন অরবিন্দবাবু। নরম বালিতে পা ডুবিয়ে জলের কাছে এলেন আস্তে আস্তে। জুতোজোড়া বালিতে ডুবে বিচ্ছিরি হয়ে উঠলো। অরবিন্দবাবু তা নিয়ে ভাবলেন না।

আশ্চর্য শান্ত এবং স্নিগ্ধ চারদিক। গোধূলীর রঙ আরো গাঢ় হয়েছে চারদিকে। এখন একটু যেন কালচে দেখাচ্ছে দূরের গাছপালাকে। পাখীর ডাকে মুখর হয়ে আছে একটু দূরে নদীর ওপর প্রায় ঝুঁকে পড়া বটগাছটা। স্রোতের শব্দ চারিদিকের স্নিগ্ধ ছবিকে রমণীয় করে তুলেছে।

অঞ্জলি ভ'রে নদীর উলটোল জল খানিকটা তুলে নিয়ে চোখে মুখে দিলেন অরবিন্দবাবু। কেন জানি তার মনে হচ্ছিলো, মুখে চোখে জল দিলে আরাম পাবেন তিনি। তার বুকের মধ্যে এবার স্রোতের শব্দ সেঁধ উঠলো।

জলের কাছাকাছি বালির ওপর এসে বসে পড়লেন অরবিন্দবাবু। ঠাণ্ডা জল চোখে মুখে ছিটিয়ে এখন সত্যি সত্যি আশ্চর্য আরামে চোখ বুঁজে আসছে। মাথার যন্ত্রণা অনেকখানি কমে গেছে। ওপরের কোলাহল, নদীর স্রোতের মধ্যে আকাশ, চারদিকের স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতা—সব অরবিন্দবাবুকে যেন সঙ্গ দিচ্ছে। বালির ওপরই খানিকটা কাত হয়ে আরাম ক'রে শুয়ে পড়লেন তিনি। চোখ বুঁজলেন একটু সময়ের জন্য। নরম বালির ওপর শুয়ে এবার ঘুম পাচ্ছে তার।

আস্তে আস্তে বাতাস উঠে আসছে নদীর স্রোত ছুঁয়ে। অরবিন্দবাবুর চোখে মুখে চুলে—সারা শরীরেই খেলে যাচ্ছে সে বাতাস। নিরুর কথা মনে হলো সঙ্গে সঙ্গে। মাথার যন্ত্রণা হলে এমনি করেই তালপাতার পাখাখানা দিয়ে বাতাস করে নিরু। যতোক্ষণ না তাঁর মাথার যন্ত্রণা কমে যায় কিংবা ঘুমিয়ে পড়েন তিনি, ততোক্ষণ মাথার কাছে নিরু বসে থাকে। ভাবতে ভাবতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন অরবিন্দবাবু। নিরুই যেন তাঁকে আস্তে আস্তে বাতাস ক'রে চলেছে। নিরুর মমতা যেন বহুদূরের এই শহরের নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে, পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেছে নিরু।

অরবিন্দবাবু চোখ বুঁজেই রইলেন।

ক্রমে বিকেল, সন্ধ্যা ঘনালো। রাত্রির পাখীর ডাক শোনা গেলো নদীর ওপর ঝুঁকে থাকা বটগাছ থেকে। অরবিন্দবাবু এবার চোখ খুললেন, আকাশের দিকে তাকালেন। তারার আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে আকাশ। বিচিত্র এবং বিপুল অনুভবে অরবিন্দবাবু যেন জন্মের পর এই প্রথম গভীরতম শ্রদ্ধায় নতশির হলেন।

স্রোতের শব্দ তেমনি বুকের মধ্যে বেজে যাচ্ছে। চারিদিক তেমনি স্নিগ্ধ সুন্দর। নিরু তাকে বাতাস করে চলেছে তেমনিভাবে।

চিরকালের আলোয় এবার অরবিন্দবাবু অবলীলায় রমণীর এক মহাজীবনের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

• • • •

"এই যেখানে আমরা পড়ছি শুনছি চাকরীর উমেদারি করে বেড়াচ্ছি, দশটা পাঁচটায় জুতোর খাটুনি খেটে কী যে করছি তার ঠিকানা নেই, এই জাদুকরের মিথ্যে ভারতবর্ষটাকেই আমরা সত্য বলে ঠাউরেছি···একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে—পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ। সেইখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুঝছি, কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারবো না।"

রবীন্দ্রনাথ

সাদা কালো

সুব্রত ভদ্র

মেয়েটা অন্ধকারের মধ্যেই আন্দাজের ওপর ভর করে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিলো। দিনের বেলা এখানে অনেকে বেড়াতে আসে। কেউ কেউ পাশাপাশি এসে বসে রডোডেনড্রন গাছগুলোর নীচে, লাল লাল ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আবার কেউ কেউ আর একটু এগিয়ে গিয়ে প্রায় হাজার ফিট নীচের খাদটার দিকে তাকায়।

মেয়েটা এগিয়ে যাচ্ছিলো। কেন যেন একটু ভয় ভয় পেলো। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর দেহটা এবরো খেবরো পাথরের গায়ে ধাক্কা খেতে খেতে নীচে পড়ে গিয়ে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হবে।—না: ভয় পেলে চলবে না। ভাবলো মেয়েটা, এ ভাবে বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। আকাশের দিকে তাকালো একবার, বহুক্ষণ আগের দেখা ক্যাসিওপিয়াকে দেখা যাচ্ছে না।

—কে? ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটা, একটা দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের গায়ে যেন ধাক্কা লাগলো। হ্যাঁ—হ্যাঁ মানুষটাই তো। হাত দিয়ে অনুভব করলো ও, গরম, গরম, জীবন্ত জীবন্ত। আবার চীৎকার করে উঠলো—কে?

—আমি, উত্তর এলো এক পুরুষকণ্ঠের, আমার নাম পিটার্স।

—আপনি এখানে কেন?

—আকাশের নতুন তারা খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। উত্তর দিলো পুরুষ কণ্ঠ। কিন্তু আপনি—আপনি এখানে কেন? সামনেই তো বিরাট খাদ—আর একটু হলেই পড়ে যেতেন যে। ভাগ্যিস আমার গায়ে ধাক্কা লেগেছিলো।

অন্ধকারে মেয়েটার একটি দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। বাধা পড়লো তার সংকল্পে। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভেবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

—আপনি কাঁদছেন? পিটার্সের গলা শোনা গেল

মেয়েটি উত্তর দিলো না। পিটার্স বললো—বলুন না আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি কোনো মোটিভ নিয়ে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো মেয়েটি। বলল—আমি আত্মহত্যা করতে এসেছিলাম।

—আত্মহত্যা! পিটার্সের কণ্ঠে চমক। অন্ধকার আকাশে একটা উল্কাপাত হলো। পিটার্স বললো—কিন্তু কেন?

—সে অনেক কথা। বলল মেয়েটি। একটি ছেলেকে আমি ভালোবাসতাম। সে আমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে আমার ভার্জিনিটি নষ্ট করেছে।

পিটার্স চুপ। এক সময় বললো—ছি, তার জন্যে আপনি আত্মহত্যা করতে এসেছেন। কেন নিজের জীবনটাকে এভাবে নষ্ট করে ফেলবেন। আর তাছাড়া সমাজ, রাষ্ট্র আপনার কাছ থেকে কিছুতো আশা করতে পারে।

—কি?

—এই ধরুন অনেক কিছু। আপনার যতটুকু সাধ্য।

—আপনি কি এ্যামেরিকান? প্রশ্ন করলো মেয়েটি।

—হ্যাঁ। উত্তর দিলো পিটার্স। আমি মহাকাশ গবেষণার ছাত্র। আমি নতুন নতুন অজানা তথ্য আবিষ্কার করে আমার দেশের জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করবো। আপনিও কি এ্যামেরিকান?

—হ্যাঁ।

—কি নাম আপনার?

—বার্ব বেজেন্স।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। এক সময় পিটার্স বললো—কি হবে আত্মহত্যা করে। ফিরে গিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখুন।

—স্বপ্ন। টেনে টেনে উচ্চারণ করলো বার্ব। যেন এই মুহূর্তে এ শব্দটা ওর কাছে নতুনের মতো অবিশ্বাস্য।

পিটার্স বলল—হাঁ স্বপ্ন। নিজের তার সাথে দেশের। আমরাই তো দেশের এক একটা শক্তি. সব মিলে সেই মহা-শক্তিকে আরো কিছুটা বাড়িয়ে তুলি, আমরা যেন স্বর্গকে আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে নামাতে পারি—এই স্বপ্ন মিল যেজেগ।

—সত্যি, আপনার কথা শুনে আমার আবার বাঁচতে ইচ্ছে করছে। বার্বের কণ্ঠ স্বাভাবিক হয়ে এলো। খানিকক্ষণ থেমে বলল—আচ্ছা চলি—আপনার কথা মনে থাকবে।

—দাঁড়ান। বাধা দিলো পিটার্স। বললো. এ রাতে আর কোথায় যাবেন? আর তাছাড়া পথ হারানোর সম্ভাবনা বেশী—বিপদও কম নয়। তার চেয়ে আসুন গল্প করে বাকী রাতটুকু কাটিয়ে দিই।

দুজনে বসলো। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখছে না। শুধুমাত্র অবস্থিতির স্পষ্ট অনুভূতি পাচ্ছে।

পিটার্স বললো:—আপনি তো ভালোবাসার জন্যে আত্ম-হত্যা করতে যাচ্ছিলেন—আমি যদি আপনার বন্ধু হতে চাই —আপনাকে বিয়ে করতে চাই।

—পিটার্স! বার্বের গলা কাঁপছে।—তুমি কি আমাকে নেবে তোমার সঙ্গী করে?

—প্রতিজ্ঞা করছি।

কিন্তু আমি যে মা হতে চলেছি।

—তার পাচ্ছো কেন তোমার সেই অনাগত সন্তানকে জানতেও দেবোনা যে আমি ওর বাবা নই।

—পিটার্স! গাঢ় আবেগ করে পড়লে বার্বের কণ্ঠে। খুঁজে খুঁজে একখানা হাত পেলো পিটার্সের। সেটি ধরে চুমু খেলো। বললো-এই রাত আর ঐ তারাভরা আকাশ আমাদের ভালোবাসার সাক্ষী হয়ে থাক।

ওমা সেই রাতে কালো পাথরের আকাশ ভরা তারাদের সাক্ষী মেনে ভালোবাসার চুমু খেলো। তারপর পাহাড়ের কোলের ওপরেই হাত ধরাধরি করে ঘুমিয়ে পড়লো।

২

চোখের ওপর সূর্যের আলো পড়তেই ঘুম ভেঙ্গে গেল পিটার্সের। ধড়মড় করে উঠে বসলো। কই কেউতো নেই কাছে! বার্ব কোথায়? তবে কি সবটাই স্বপ্ন দেখেছে পিটার্স! না—না তা কেন. ঐতো একটা মেয়েদের চুলের লাল ক্লার্ক পড়ে আছে। বার্ব কোথায়? বার্ব—চীৎকার করে উঠলো পিটার্স। ওর ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো দূর পাহাড়ের গায় ধাক্কা লেগে। হাওয়া লেগে দু একটা রডোডেনড্রন ফুল ঝরে পড়লো ওর কাঁধে। এগিয়ে গেল পিটার্স। তবে কি—পকেট থেকে টেলিস্কোপ বার করে ফোকাস করতেই চমকে উঠলো। দৃষ্টিটা হাজার গুণ বর্দ্ধিত হয়ে গিয়ে পড়লো নীচে পড়ে থাকা একরাশ রক্তাক্ত মাংস পিণ্ডবৎ একটি সোনালী চুলের মেয়ের মৃতদেহের ওপরে। পিটার্স চোখ বুজলো।

গল্পটা বলে প্রখ্যাত মহাকাশ বিজ্ঞানী ডঃ পিটার্স নেলসন চোখ বুজলেন, তারপর আস্তে আস্তে সমাহিতের মতো বললেন—জানো রাইটার, যখন অন্ধকার ছিলো তখন আমাদের কোনো বর্ণবৈষম্য ছিলোনা। আমরা তখন অনেক কাছাকাছি এসেছিলাম। ভালোবেসেছিলাম। কিন্তু ভোরের আলোয় বার্ব দেখলো আমাকে। ওর মন বোধ হয় সাড়া দেয়নি। তাই ওর জাতীয় লজ্জা ঢাকতে গিয়েই ও আত্মহত্যা করলো। নইলে ও ভুলতো কেমন করে সে একটি সাদা চামড়ার এ্যামেরিকান মেয়ে হয়ে পিটার্স বলে একটা নিগ্রো ছেলেকে রাতের আঁধারে ভালোবেসে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলো। ভালোবেসেছিলো।

যা' রটে তা' বটে !

সুবোধ সুন্দর রায়

ঠিক গ্রামও নয়, আবার শহরও নয়। আধা শহর। আধা গ্রাম। রেলওয়ে জংশন, তিনটে কলেজ। গোটা পাঁচেক স্কুল, ইলেকট্রিক লাইটের কলমলানি, গীর্জা, মন্দির, লঞ্চি,, সেলুন, ষ্টেশনারী দোকান সব কিছু মিলিয়ে দেখতে গেলে মনে হয় বুঝিবা শহর। আবার রেল লাইন পেরিয়ে ধানের ক্ষেত। ভেতরের দিকে মাঝে মাঝে মেঠো পথ। বন বাদাড়। স্থানে স্থানে ঝোপ জঙ্গল, পুকুর, গাছপালা, গাছের উপর বিহঙ্গের কাকলি সমস্ত কিছু দিয়ে বিচার করলে মনে হয় এটা বুঝি গ্রাম। অতীন এসেছে ছ' মাস। ছ'মাস হ'ল এসেছে এই আধা শহর, আধা গ্রামে। এখানকার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকতা পেয়েছে। বহু জায়গায় দরখাস্ত দিয়ে যখন বিফল হ'ল তখন রবিবাসরীর এক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত দিয়ে ছিল এখানকার হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বাংলা শিক্ষকের পদের জন্য। ইণ্টারভ্যু হ'ল। সিলেক্ট কমিটি ওকেই মনোনীত করলেন। ছ'মাস আগের কথা। মনে পড়ে অতীনের, এসেই হেড-মাষ্টারকে নমস্কার করেছিল। আমাকে এই স্কুলের বাংলা শিক্ষকের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

আপনিই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়। আরে দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন ! বসুন !

চেয়ারে বসতেই হেড মাষ্টার মশাই বল্লেন, এখানেই থাকবেন ঠিক করেছেন, না কাছে পিঠে কোন আত্মীয় স্বজন আছেন ?

কেউ নেই। এখানেই থাকতে হবে।

আপনাকে চাটুয্যেদের বাড়ীতে ঠিক করে দিচ্ছি। ওখানেই থাকবেন। অসুবিধা হ'লে বলবেন।

চাকুরী জীবনের প্রথম দিনটার কথা সকলেরই মনে থাকে। স্মৃতির রোমন্থন করতে করতে আর একজনের কথাও মনে পড়ে যায়। সেই দিকেই পা দুটো এগিয়ে চলছে। সামনেই মেয়েদের কলেজ। তারপর গীর্জা। তারপরই সেই শান বাঁধানো ঘাট। সেই ঘাটেই রোজ আসে সে এই সময়। কোনদিন পুকুরে বাসন মাজতে বসে। বাসন মাজার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর চোখদুটো তুলে তাকায় সামনের দিকে। ওর চোখদুটো একজনকে খুঁজে বেড়ায়। প্রতিদিন। প্রতিদিনই দু'জোড়া চোখের মিলন ঘটে। মেয়েটি চোখ নামিয়ে নেয়। আবার তাকায়। এই রকম চলে চোখের খেলা। কোনদিন বা ও খেজুর ঝুড়োয় ঘাটের পাড় থেকে। ঘাটের পাশেই খেজুর গাছ। পেকে টস্‌টসে হয়ে থাকে খেজুরগুলো। খেজুর পাড়ার একটা কোটা নিয়ে আসে। গাছ থেকে পাড়ে আর খায়। খেজুর খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে মুখ তুলে তাকায় সামনের দিকে। প্রতিদিনকার অভ্যাস মত ওর চোখ আর দুটো চোখের দৃষ্টির নেশায় ঘুরে ফিরে মরে, অতঃপর আর দুটো চোখ ওর চোখের দিকে তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরবে সেই আশায়।

অতীন বড় চওড়া রাস্তাটা ধরে এগুতে থাকে। গীর্জা পেরিয়ে আসে সেখানে থেকে পুকুরটা স্পষ্ট দেখা যায়। পড়ন্ত রৌদ্রের রক্তিমাভা সমস্ত দিগন্ত ছড়িয়ে ফেলেছে। গীর্জার আস্তে আস্তে স্ত্রী-পুরুষ ঢুকছে। যীশুর স্তব-স্তুতি আরম্ভ হ'বে আর একটু বাদেই। রাস্তা ধরে লোকজন যাওয়া আসা করছে। ওর দিকে দু'একজন তাকায় মুখ তুলে। কেউ বা চলে যায় আপন মনে। কেউ দ্রুত পায়ে চলে ট্রেন ধরার জন্য। এখান থেকে ট্রেনের হুইসেল শুনা যায়। অতীন তাকায় শান বাঁধান ঘাটের দিকে। নাঃ এখনও আসেনি। ইতস্তত পায়চারী করতে থাকে। পায়চারী বন্ধ করে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় রেললাইন পেরিয়ে যেখানে ধানের ক্ষেতে বর্ষার জল নেমেছে সেই দিকে। ধানের গোড়াগুলো ডুবে আছে জলে। শীষগুলো জলের

উপরে মেঠো হাওয়ায় ধীরে ধীরে আন্দোলিত হচ্ছে। কতক্ষণ বিহ্বল দৃষ্টিতে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়েছিল খেয়ালই নেই। সম্বিৎ ফিরে আসতেই তাকায় আবার ঘাটের দিকে। এসেছে। সে এসেছে। এক পাল্লা বাসনে ছাই মাখা শেষ করে তাকিয়ে আছে সুন্দর চোখদুটো তুলে। সামনের দিকে চোখ দুটো। অতীনের বিহ্বল হয়ে যাওয়া মূর্তির দিকে চোখ দুটো স্থির। এবার দু'জোড়া চোখ এক জায়গায় এসে স্থির হ'ল। কেউ কারুর চোখ থেকে চোখ নামায় না। মিনিট দুয়েক ওর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তারপর। তারপর আর পারল না। নামিয়ে নিল চোখ মেয়েটি। বাসনগুলো পুকুরের জলে ভাল করে ধুয়ে ধুয়ে ধুতে লাগল এবার। ধোয়া শেষ হ'লে কাঁখে তুলে নিল বাসনের পাল্লা। কিছুদূর গিয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে আবার সেই দৃষ্টি। স্থির, নিষ্কম্প দৃষ্টি। বড় সুন্দর লাগল অতীনের কাছে। রোজই লাগে। রোজই আসে ও শুধু মেয়েটির চাহনি দেখতে। অতীনও তাকায় ওর দিকে ঠিক চোখের হিসাব হয়। বাস্। আর কিছু নয়। কেউ কোন কথা বলে না। ছ'মাস ধরে চলছে এ খেলা।

আজ মেয়েটি এসেছে একটু আগে। এসেই একবার তাকাল সামনের দিকে। না এখনও আসেনি পুরুষটি। একটি একটি করে বাসনে ছাই মাজা শেষ করে আর চোখ তুলে তাকায় সামনের দিকে। খোঁজে। খোঁজে আর দুটো চোখ। ওর সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ হয়ে থাকে আর দুটো চোখের নেশায়। কখন আসবে পুরুষটি। এসেই তার সরল মন নিয়ে পলকহীন চোখে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে। দেখবে ওর বাসন মাজা। কতক্ষণে চার চোখের মিলন হবে সেই আশায় ওর যৌবনের প্রতিটি তন্ত্রীতে যেন ঝড় খেলে যায়। বাসন মাজা, ধোয়া শেষ হয়ে গেছে। তবু কিছুক্ষণ বসে থাকে সামনের দিকে চেয়ে। অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। বাসনগুলো কাঁখে করে নিয়ে উঠে পড়ে এক ঝাঁকে। বাড়ীর দিকে চলতে থাকে। একটু পথ যায় আর পেছন ফিরে তাকায়। না আসে নি এখনও। বাড়ীতে গিয়ে বাসনগুলো ধরে ধরে সাজিয়ে রাখল। তারপর। তারপর খেজুর গাছার একটা কোটা নিয়ে আবার সেই ধানক্ষেতের ঘাটের উদ্দেশ্যে চলল। কিছুদূর আসতেই দৃষ্টি স্থির হ'ল সামনের দিকে চেয়ে। এসেছে সে। এসেছে যুবকটি। যুবকটির চোখ খোরাকের করছে আর দুটো চোখের অন্বেষণে। মেয়েটি এল। এসেই বাঁশের কোটা দিয়ে খোঁচা দিতে আরম্ভ করল পাকা টসে-টসে খেজুরের গায়ে। ঝুপ করে এক ছড়া খেজুর পড়ে গেল মাটিতে। কুড়িয়ে নিল ছড়াটা। তারপর। তারপর একটা একটা করে খেজুর ছড়া থেকে ছাড়ায় আর মুখে পোরে। আজকে ওর স্থির দৃষ্টি আর নেই। একটি করে খেজুরের বিচি হাত দিয়ে মুখ থেকে ফেলে আর সামনের দিকে এক পলকের জন্য তাকায়। এক পলকেই দেখে নেয় সব। ছড়াটা শেষ করে ফেলেছে কখন তবু নড়ার নাম নেই। বাড়ীতে যাবার প্রবৃত্তি নেই। এবার ওর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল যুবকটির দৃষ্টির প্রতি। চোখ আর নামায় না। মুখে স্মিত হাসি। অতীন অভিভূত হয়ে যায়। বড় সুন্দর লাগে ওর হাসিটি। ওর চোখের ভাষা। ওর চোখ দুটোতে এমন একটা আকর্ষণ ছিল যা আর একটা স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। অবিকল সেই চোখ দুটি। একই রকম চাহনি। মনটা আনমনা হয়ে যায়। স্মৃতির অতলে ডুবে যায় অতীন। ছোট্ট গ্রাম। গ্রামের নাম জিয়াগঞ্জ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর। ছোট্ট বার বছরের মেয়েটি এই সৌন্দর্যের ভেতর খেলা করত। ওদের বাড়ীতে ছিল বাইশটা আম গাছ। ঘুম থেকে উঠেই আম গাছের তলায় এসে দাঁড়াত। প্রতিদিন দেখতো কোন্ কোন্ আম পেকেছে। তারপর একসময় দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরত ওর দাদাকে। আব্দারের সুরে বলত, দাদা গাছ থেকে দুটো আম পেড়ে দেবে।

আজকাল তুমি বড্ড বেশী আম খাচ্ছ।

যাহ্, কই আবার বেশী আম খেলাম। সেই কালকে একটা আম খেয়েছিলাম। একে কি বেশী খাওয়া বলে? কাপড়ের খুট ধরে টান দিত। ওঠ না দাদা গাছে ওঠ।

দাঁড়াও দাঁতটা মেজে নি। আম খাওয়ার লোভে তুমি না হয় সাত-সকালে উঠে পড়। কিন্তু আমার অত ভোরে ঘুম ভাঙে না।

ঘুম ভেঙে গেলে কি করব? আমি কি আম খাওয়ার লোভে উঠি?

অতীন গাছে উঠত। পাকা দেখে গোটা চারেক আম পেড়ে আনত তারপর হাসির কাছে ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিত আমগুলো।

বারে। এখানে সবগুলো ফেললে যে। তুমি এর ভেতর থেকে দুটো তুলে নাও।

আমার লাগবে না। সবগুলো তোমার।

আমি কি রাক্ষস। অত বড় বড় চারটে আম আমি কখনও খেতে পারি। তুমি দুটো তুলে নাও বলছি।

বেশ, তুমি রাক্ষস নও। আমিই রাক্ষস। কিন্তু ভোরবেলা উঠেই আমার গাছে আম পেড়ে দোড় হয় না।

মেবে না তুমি এখান থেকে দুটো তুলে। আমি সবগুলো পুকুরের জলে ফেলে দিয়ে আসব একুনি।

ভক্ষ্য বস্তু অর্ধেক না নিলে এইভাবে কথায় কথায় অভিমান করত হাসি ওর দশ বছরের বড় দাদার উপর। খাবার জিনিষ যেখান থেকেই পাক না কেন অর্ধেক রেখে দিত অতীনের জন্যে। অতীন তা না করলে কথায় কথায় সে কি অভিমান। হাসির চোখ দুটো ছিল বড় সুন্দর। অভিমানের সময় সেই সুন্দর চোখ দুটো তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত হাসি। ঠিক যেন এই মেয়েটির মত। অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে হাসির চোখের সাথে মেয়েটার চোখের। অবিকল যেন এক চোখ। মনে হয় হাসিই যেন অভিমান করে বড় বড় চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাই তো অতীন আসে রোজ ওর চোখের দৃষ্টিতে কি ভাষা আছে পড়ার জন্য।

আর এক দিনের স্মৃতি মনে পড়ে অতীনের। আজ স্কুলের মাঠে জিয়াগঞ্জ আর নারাণপুরের টিমের খেলা। সাদা কাপড় পরে অতীন প্রস্তুত হয়েছে। হাসি কোত্থেকে সুন্দর একটা বাক্সে তুলে রাখা ফ্রক পরে এসে জড়িয়ে ধরে দাদাকে। আমিও যাব তোমার সাথে খেলা দেখতে।

মেয়েরা খেলা দেখে না। মাঠে মেয়েদের যেতে নেই।

যাবে রুমাদি, বকুলদি ওরা সবাই তো গেল। ওদের দেখেই তো জানতে পারলাম আজ মাঠে ভাল ম্যাচ আছে। তুমি তো আর আমাকে নেবে না। তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।

এমনি কথায় কথায় ছিল হাসির অভিমান। অভিমান হলে বড় বড় চোখদুটো তুলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। সুন্দর চোখদুটো অভিমান করলে আরও সুন্দর দেখাত।

বাধ্য হয়ে নিতে হত সঙ্গে করে। খেলার মাঝে হাতে তালি দিয়ে উঠত। খেলা শেষ হলে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত। অতীন হাসির হাত ধরে মাঠের পথ ধরে এগুতে থাকত বাড়ীর দিকে। চারিপাশে ক্ষেত। অজস্র মটর ক্ষেত। কচি কচি মটরশুঁটি ঝুলে থাকতো ক্ষেতের ভেতর। হাসি বায়না ধরত। দাও না দাদা। তুলে দাও না দুটি।

তুমি আজকাল একটু স্থূল রাক্ষস হয়েছ।

বারে। দুটো মটরশুঁটি চাইলেই বুঝি কেউ রাক্ষস হয়।

ক্ষেতে ঢুকে পড়ত অতীন। তুলে আনত আস্ত খুঁটে করে মটরশুঁটি। তারপর ফেলে দিত হাসির ফ্রকের ভেতর।

ও ফ্রকটা তুলে ধরত। মটরশুঁটি পেয়ে সে কি আনন্দ। বলত, তুমি এর ভেতর থেকে অর্ধেকটা তুলে নাও দাদা।

বাইশ বছরের যুবক। তার মটরশুঁটির প্রতি তত্তটা লোভ নেই। সে বলত। তুমি খাও। আমি দেখব।

তুমি না নিলে আমি সব মাটিতে ফেলে দেব বলে ফ্রকটা আলগা করে ধরত। মটরশুঁটিগুলি মাটিতে পড়ার উপক্রম হতেই অতীন ধরে ফেলত ওর ফ্রকটা। ফ্রকটা গুটিয়ে দিতে দিতে বলত, রাগ করেছ। রাগ করতে নেই। এই তুলে নিচ্ছি। খোসা ছাড়িয়ে অতীনও মটরশুঁটি চিবোতে চিবোতে চলত মেঠোপথ ধরে। হাসির মুখে হাসি ফুটে উঠত।

যে দাদার অর্ধেক প্রাপ্য ভাবত সব সময়, দাদার প্রতি যার এত টান, এত ভালবাসা, দাদার সাথে পুকুরে গিয়ে হাত পা ছুড়ে সাঁতার শেখার কৌশল আয়ত্ত না করলে যার স্নান হত না, রাত্রিবেলা দাদার পাশে না শুলে যার ঘুম হত না সেই হাসিই চলে যায় অতীনকে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের মত। আটাশ দিনের নিমোনিয়া ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার হয়ে সেই হাসিই মারা যায়। মারা যাবার দুদিন আগে বলেছিল, দাদা দোকান থেকে একটু

তালমিছরি এনে দেবে। বড্ড তালমিছরি খেতে ইচ্ছে করছে।

তুমি তালমিছরি আজকাল একটু বেশী খাচ্ছ।

আর খাব না দাদা। আজকেই শেষ। আর কোনদিন চাইব না।

হাসি বুঝতে পেরেছিল এই তার শেষ তালমিছরি খাওয়া। ভাবতে ভাবতে জলে ভরে আসে অতীনের চোখদুটো। অতীন এনে দিয়েছিল তালমিছরী।

বার বছর বয়সেই মারা গিয়েছিল হাসি। বেঁচে থাকলে মেয়েটির বয়সীই হ'ত। কতই বা বয়স হয়েছে ওর। বড় জোর আঠার। ছ' বছর আগে মারা গেছে হাসি। তখনও মেয়েটি তাকিয়ে অতীনের দিকে। স্থির, নিশ্চল দৃষ্টি। হাসিও বেঁচে থাকলে এমনি চোখ তুলে তাকিয়ে থাকত তার দাদার দিকে। সে চোখের ভাষা পড়তে পারে অতীন। সে চোখের ভাষায় লেখা আছে অসহায়ের সুর, সে চোখে আছে অভিমানের ব্যঞ্জনা। মনে হয় মেয়েটিও আসবে তার কাছে আবদার করতে। অভিমান জানাতে। চোখের ভাষা পড়তে জানে অতীন। হাসি আর মেয়েটির চোখের চাহনিতে একই কথা। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে অতীন। কিন্তু কেউ আসে না তার কাছে অভিমান, আবদার জানাতে।

পরের দিন অতীন এসে দাঁড়ায় বটগাছের তলায়। এখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখতেই সুবিধা। বটগাছে অজস্র ফল পেকেছে। কাকগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। খাওয়া খাওয়া ফলগুলো টুপটাপ করে মাটীতে পড়ছে। মানুষেও নাকি পাকলে এ ফল খায়। ঘড়ির দিকে তাকাল অতীন। একটা হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে এসেছে। লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে শাঁখের ফুঁ উঠছে। দূরে স্টেশনের ধারে বিজলী বাতিগুলো জলে উঠেছে। অতীন তাকিয়ে দেখল দূরে ওদের বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে মেয়েটি। হাতে বাসনের পাঁজা নেই। নেই খেজুর পাতার ঝাঁকনি। সুন্দর পরিষ্কার একটা শাড়ী পড়েছে। সেই স্থির দৃষ্টি। ও দেখতে পেয়েছে অতীনকে। অতীনের উপর ওর দৃষ্টি স্থির। আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। কাছে এল। এসেই একখানা ভাঁজ করা কাগজ দিল অতীনের হাতে। চিঠি। চিঠি একটা। অতীন এক নিমেষে পড়ে ফেলল চিঠিটা। তখনও মেয়েটি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে। অতীনের মনে হ'ল ও চোখদুটো বোধ হয় হাসির প্রেত চোখ। চিঠিটা আর দশটা চিঠির মত নয়। দীর্ঘ এক প্রেম পত্র। অতীনের দেহ, মন সব কিছু কামনা করে ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা হয়েছে চিঠিটা। চিঠিতে আজকে রাত্রে তার ঘরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে মীরা হালদার। চিঠির নীচে নাম সই করা ছিল মীরা হালদার। শুধু আমন্ত্রণ জানানোই নয়, আজকে রাত্রে তাদের প্রেমের প্রথম রাত্রি উদ্‌যাপিত হ'বে। সাক্ষী থাকবে নক্ষত্রখচিত আকাশ। অতীন কোন কথা ভাবতে পারে না। মাথার শিরদুটো দপ্ দপ্ করে ওঠে। তবুও বলে, আচ্ছা আসব আজ রাত্রে, বলে আস্তে আস্তে একটা টোকা মারে ওর গালে।

আজকে অতীনের বহু কাজ। কলকাতায় যেতে হ'বে। কিছু মার্কেটিং করতে হ'বে কলকাতা থেকে। কলকাতা থেকে যখন ফিরল তখন রাত সাড়ে দশটা। জিনিষপত্রগুলো নিজের ঘরে রেখে মীরা হালদারের বাড়ীতে আসে। নিঝুম বাড়ী। কেউ কোথাও নেই। অতীনকে দেখেই মীরা হালদার এগিয়ে আসে। তাকে একটা ঘরের ভেতর নিয়ে যায়। দরজা বন্ধ করে দেয়।

অতীন জিজ্ঞেস করে, তোমার নাম মীরা হালদার?

হুঁ।

তোমরা ব্রাহ্মণ?

হুঁ।

তোমার মা, বাবা আছেন?

হুঁ।

তোমার বয়স কত?

উনিশ।

কতদূর লেখা পড়া করেছ?

ক্লাস টেন।

বানান ভুল কর কেন? আমার পড়াশুনা কর। তুমি রোজ তাকিয়ে থাক কেন আমার দিকে চেয়ে? কি দেখ?

আপনিই তো দেখেন। আপনিই তো রোজ বিকেল

হ'লে বটগাছের তলায় এসে দাঁড়ান। আমি কি করব বাড়ীর সামনে, ঘাটের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

তুমি দুষ্টু হয়েছ। দুষ্টুমি করতে শিখেছ। ও ভাষায় আমাকে চিঠি লিখেছ কেন? জান ও ভাষায় চিঠি লেখা অপরাধ। তুমি যা' করতে চলেছ তাতে হালদার বংশকে লোকে অপবাদ দেবে। কলঙ্ক রটবে তাদের নামে।

দিক্ অপবাদ। রটুক কলঙ্ক।

তোমার দিকে আমি তাকিয়ে থাকতাম কেন, কি দেখতাম রোজ জান? আমার একটা হারিয়ে যাওয়া বোনকে খুঁজে পেতাম তোমার চোখের ভেতর। তার চোখদুটোও অবিকল ছিল তোমারই চোখের মত। আমি তোমাকে বোনের চেয়ে বেশী কিছু ভাবতে পারি না। আমি তোমাকে আজকের ব্যবহারের জন্যে কিছু বলব না। কিন্তু ভবিষ্যতে তুমি অন্য কাউকে এরকম চিঠি লিখো না। এর ফল ভাল হয় না। তোমাকে আমি সুন্দর পাত্র জোগাড় করে দেব।

মীরা হালদারের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে, আমি বুঝতে পারি নি, আমায় ক্ষমা করুন।

বোন কি ভাইয়ের কাছে কোন অপরাধ করতে পারে, বলে মাথায় একটা হাত রাখে অতীন।

মীরাকে জিজ্ঞেস করে সব কিছু জেনেছে। সমস্ত কিছু জেনেছে অতীন। ওর মা, বাবা বৃদ্ধ হয়েছে। দু'জনেরই চোখ খারাপ। চোখে ভাল দেখতে পায় না। মীরার একটি মাত্র ভাই। দাদা ওর। জামসেদপুর আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীতে কাজ করে। মাসকাবারে টাকা পাঠিয়ে দেয়। তাতেই সংসার চলে। অতি হীন অবস্থা ওদের। কোনরকমে খেয়ে পরে আছে। কি রাখার কথা ভাবতেই পারে না ওরা। তাই রোজ বাসন মাজতে আসে ও পান বাঁধান ঘাটে।

রাত্রি সাড়ে বারটার সময় ফিরল অতীন ঘরে।

পরের দিন সমস্ত জায়গায় রটে গেল অতীন রাত কাটিয়েছে মীরা হালদারের ঘরে। ছোঁড়াকে দেখে প্রথমেই আমরা সন্দেহ করেছিলাম ছোঁড়া খেজুরতলার ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করে? মতলব ভাল নয় প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম আমরা, বলে করেছেন। একজন উত্তরে বলে, করবে আবার কি? ঐ মাগীটাকে দেখতে আসতো রোজ। ওটার সাথে যে মজেছিল ছোঁড়া। দু'একজন আফশোষের সুরে বল, তুই শেষকালে মাস্টার হয়ে এই কীর্ত্তি করলি। একজন ভীড় ঠেলে এসে বল, সর্ব্বনাশ করেছে মেয়েটার। সর্ব্বস্ব হরণ করেছে। সতীত্ব নষ্ট করেছে ছুঁড়িটার।

বিচার সভা বসল। বহু লোক জড় হ'ল। হেড মাস্টার মশাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনিও এসেছেন। সভার ভেতর একজন উঠে দাঁড়িয়ে বল, আমরা এই দুর্নীতির বিহিত করব। বিচার করব। আমাদের দুটি প্রস্তাব আছে। এক প্রস্তাব স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে। তাঁর কাছে আমরা আবেদন জানাবো অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্কুল থেকে ছাটাই করার জন্য। আর এক প্রস্তাব অতীন-বাবুকে ঐ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। যার চরিত্র নেই সেরকম লোকের এখানে স্থান হবে না।

হেড মাস্টার মশাই উঠে দাঁড়িয়ে সভাকে উদ্দেশ করে বল্লেন, আপনারা পরের মুখে ঝাল খাবেন না। গুজবে কান দেবেন না। অতীনবাবুকে আমি ভাল করে চিনি। তিনি চরিত্রবান। নিশ্চয়ই আমরা ভুল বুঝেছি তাঁকে।

সভার মধ্যে থেকে একজন উঠল। তার কণ্ঠে শ্লেষ, চরিত্রবান লোকেরা অন্ধকার ঘরে রাত কাটায়।

আর একজন দাঁড়াল। হেড মাষ্টার মশাইকে উদ্দেশ করে বল, ঐ তল্লাটে যে কেলেঙ্কারীর কাহিনী সর্ব্বত্র রটে গেছে তাকে আপনি উপেক্ষা করে ঐ সভাকেই ছোট করছেন। যা' রটে তা' বটে।

সমস্ত সভাই সায় জানাল। তারা সমস্বরে ধ্বনি করতে লাগল, যা' রটে তা' বটে। হেড মাষ্টার মশাই নাক দিয়ে মাছি তাড়াতে চাইছেন। সে হবে না।

হেড মাষ্টার মশাই যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন জনতাকে শান্ত করার জন্যে। কিন্তু ক্ষিপ্তমুখী জনতার কাছে পরাজয় ঘটল তাঁর। কোন কথাই তিনি বলতে পারলেন না।

দিন দু'য়েক বাদে অতীন স্কুল-সেক্রেটারীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল, তার আচ্‌ভার্স্ কেরেক্টারের জন্য তাকে স্কুলের শিক্ষকতা থেকে ছাটাই করা হ'ল। চিঠিতে অবিলম্বে

ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে। চিঠিতে লেখা ছিল চরিত্রই শিক্ষকতার মানদণ্ড। যার চরিত্র নেই তার পক্ষে শিক্ষকতা করা বাতুলতা মাত্র।

অতীন ট্রেনে উঠেছে। কলকাতা যাবে সে। দুটি কলেজের ছাত্র প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধ্বনি দিচ্ছিল, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

অতীন চোখ নামিয়ে নেয়। তার কেবলই হাসির চোখদুটোর কথা মনে পড়ে, আবার, অভিমানের অভিব্যক্তিতে ভরা চোখদুটো। সে চোখের সাথে জগতের অন্য কোন মেয়ের চোখের মিল নেই। সব ভুল, সব ভুল। পৃথিবীর কোন মেয়ের চোখের সাথেই হাসির চোখের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য নেই।

• • • •

—লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক মিনার্ভায় সিরাজউদ্দৌলা অভিনয় দেখিতে আসিয়াছিলেন। কলিকাতা তখন রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বেলিত। সিরাজউদ্দৌলাও এই আন্দোলনের একটি অংশবিশেষ হইয়া পড়িয়াছিল। যেদিন তিলক রঙ্গালয়ে পদার্পণ করেন সেদিন দর্শকরা অভিভূত হইয়া পড়েন। তিলক যখন বক্সে প্রবেশ করিবামাত্র দর্শকবৃন্দের কণ্ঠোচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" শব্দে রঙ্গমঞ্চ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। দর্শকবৃন্দ তখন সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া, গিরিশচন্দ্র তখন রঙ্গমঞ্চের উপর কবির চাচার অভিনয় করিতেছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই নতজানু হইয়া বালগঙ্গাধর তিলককে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। গিরিশচন্দ্র সেদিন ইংরাজীতে এই মান্য অতিথির অভিনন্দনে যাহা বলিয়াছিলেন তা আজ কাহারও মনে আছে কিনা জানিনা। দুঃখের বিষয় তাঁহার কোন জীবনীলেখকও তাহা লিখিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করেন নাই। তবে শুনিয়াছি সেদিন মাননীয় অতিথি ও দর্শকবৃন্দ গিরিশচন্দ্রের সেই অভিনন্দন শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রথম রজনীতে দর্শকবৃন্দের মধ্য হইতে একজন মুসলমান কবি গিরিশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করিয়া দুইছত্র কবিতার আবৃত্তি করেন। কবিতাটির ভাবার্থ এই—
'হে গিরিশচন্দ্র তুমি সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিনন্দন গ্রহণ কর।'

শরীরে সূর্যের দাগ

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

[ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অন্যতম কনিষ্ঠ অঙ্গরাজ্য নাগাভূমি। এ-রাজ্যে প্রধানত তেরটি উপজাতির বাস। প্রত্যেকটি উপজাতি ভাষা-পোষাক-পরিচ্ছদ-উৎসব-অনুষ্ঠান প্রভৃতি দিক দিয়ে অনন্য। 'শরীরে সূর্যের দাগ' চাখেসাঙ উপজাতির উপকথাকে ভিত্তি ক'রে রচিত। কাহিনীতে, ব্যবহৃত স্থান ও চরিত্রনামে উপজাতি বৈশিষ্ট্য বিধৃত।]

এ-কাহিনী বিগত এক বিধৃত কালের। নাথাজুবাসো বস্তির এক বীর যোদ্ধা ভিন্ন উপজাতীয়দের সঙ্গে সংগ্রামে যখন প্রাণ দিলেন তখন পেছনে পড়ে রইল পতিপ্রাণা স্ত্রী আর স্নেহাস্পদ দুই পুত্রসন্তান।

স্ত্রী সিখোসের ইচ্ছে হচ্ছিল সেও বীর স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরলোকে পা বাড়ায়, কিন্তু দুই শিশু পুত্রের কথা ভেবে তা পারে না। ছেলেদের সে সব বিষয়ে পারদর্শী করে তোলায় আত্মনিয়োগ করল। স্বামীর মৃত্যুশোক বুকে বহন করে সে তাদের খেলাধূলা, যুদ্ধবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের উপযুক্ত অনুশীলনে উদ্যোগী ও উৎসাহী করে তুলতে লাগল। এই ভাবে তার সন্তানরা হয়ে উঠল সাহসী, শক্তিশালী, সমর-নিপুণ।

বড় হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিতার কথা মনে হলো এবং মা'র কাছে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু স্বামী-শোকাতুরা সিখোসে ছেলেদেরকে কখনই স্বামীর কথা কিছু বলত না। ফলে ছেলেদের মনে পিতা সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেই থাকে।

একদিন দুই ভাই তাদের সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে কাঠের লাটিম নিয়ে খেলছিল। ছোট ভাই অন্য এক সাথীর লাট্টুকে তার লাটিম দিয়ে এমন জোরে আঘাত করল যে—সে-ছেলেটির কাঠের লাট্টু ভেঙে দু'খণ্ড। খেলার সাথী রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল--

হতভাগা, পাজী, তুই কেন আবার লাটিমের উপর তোর তেজ দেখাচ্ছিস? যদি বাপের বেটা হোস্—ফিরং থাকে তো তোর বাপকে যারা মেরেছে—তাদের উপর কেন প্রতিশোধ নিস্ না?

—দুই ভাই প্রথমে এই কথা শুনে হতচকিত হয়ে গেল। তারপর তখনই দৌড়ে বাড়ীতে গিয়ে মা'কে জিজ্ঞেস করল—

মা, সত্যি ক'রে বলো তো—আমাদের বাবাকে কারা মেরে ফেলেছে?

—তারা মায়ের কাছে খুলে বলল—খেলতে গিয়ে আজ কি রকম অপমানসূচক কথা শুনেছে সঙ্গীদের কাছে।

সব শুনে সিখোসে বললে—

আমার সোনার বাছারা, শোন তাহ'লে—তোমাদের বাবা যুদ্ধ করতে গিয়ে শত্রুদের হাতে প্রাণ দেন। তোমাদের ভাগ্যেও যেন এমনটি না-ঘটে! সাবধানে থেকো।

মায়ের কথা ছেলেদের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলে। দুধ বয়সে পা দিয়েই তারা ঠিক করল—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ তারা নেবেই। মনের এই দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে দুই ভাই নিজ নিজ নাগা বর্শা আর দাও রোজ ধার দিয়ে দিয়ে তীক্ষ্ণ করতে লাগল আর অভ্যাস করতে লাগল যুদ্ধের নানা কায়দা-কসরৎ।

এই ভাবে নিজেদের পরিপূর্ণ প্রস্তুত করে তারা দুই ভাই রওনা দিল প্রতিবেশী গ্রামের দিকে—সেখানকার অধিবাসীরা হত্যা করেছিল তাদের পিতাকে। আশ্চর্যের বিষয়—তাদের শত্রুরা ছিল এক অদ্ভুত ধরণের বহুরূপী। মানুষের শরীরে তারা মাথা ও নেজকে বাঘের সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করতে পারত, পারত অন্য হিংস্র প্রাণীরও রূপ নিতে।

কিন্তু শত্রুদের এই অদ্ভুত শক্তির কথা জেনেও তারা নিরস্ত হলো না। দুই ভাইই ছিল আত্মশক্তি আর আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। আকাশের বজ্রও বুঝি তাদের সেই সাহস আর দৃঢ়তায় ফাটল ধরাতে পারত না।

হেঁটে হেঁটে এক সময় তারা ভয়ঙ্কর বহুরূপী শত্রুদের গ্রামে এসে হাজির। গ্রাম-প্রবেশদ্বারে খানিকক্ষণ বিশ্রাম ক'রে তারা আস্তে আস্তে বস্তির মধ্যে ঢুকল। খানিকটা এগিয়ে দেখে—শত্রুরা একটা নতুন বাড়ী বানাচ্ছে। দুই ভাই তখন তাদের চীৎকার করে বলল—

ওহে বিদ্‌ঘুটে, কুশ্রী ছাড়া জীবেরা, বেরিয়ে এসো। সাধ্য থাকে তো আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

উত্তরে সেই ভয়ঙ্কর শক্তিশালী শত্রুরা অবজ্ঞাভরে বলল—যা—যা, পুঁচকে ছোঁড়ারা কোথাকার! অতো লম্বাচওড়া করিস না। তোদের সঙ্গে আমাদের কিসের যুদ্ধ? তাড়াতাড়ি পালা, নয়ত তোদের তাজা মাংসেই রাত্রের ভোজ হবে আমাদের।

দুই ভাই বলে—তোমাদের হম্বিতম্বি এখনই শেষ হবে। আমরা সাধাজুবাসা গ্রাম থেকে এসেছি। বলো, আমাদের পিতাকে কেন মেরেছিলে? আমরা আজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব—তোমাদের রক্ত হবে আমাদের পানীয়—

এই স্পর্ধার কথা শুনে বহুরূপী শত্রুরা খুব রেগে গেল এবং রূপ বদলে বাঘ-ভূত ও লেজ নিয়ে ভয়ঙ্কর ভাবে ছুটে এসে এই দুটো অর্বাচীন ছোকরাকে মারতে গেল। দুই ভাই একটু পিছু হটে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো আর গ্রাম-প্রবেশদ্বারের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা শত্রুদের সবাইকে যুদ্ধ করে হত্যা করল। তারপর শত্রুদের মাথা কেটে লতায় গাঁথতে রেখে যতগুলি পারল কাঁধে ঝুলিয়ে নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরতে লাগল।

ফিরবার পথে তারা চীৎকার করে বলতে লাগল—ও হোঃ—ও হোঃ—আমরা বিজয়ী—আমরা বিজয়ী—

হঠাৎ তাদের কানে এলো—কে যেন তাদের কণ্ঠস্বরই অনুকরণ করে প্রতিধ্বনিত করছে। তারা অবাক হয়ে চারদিক দেখল—কে এমন করছে। কিন্তু তখন আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না।

দুই ভাই আবার যাত্রা শুরু করল। কণ্ঠে তাদের বিজয়-ধ্বনি। এবারে ছোট ভাই আগে আগে চলল আর বড় ভাই পেছনে পেছনে তাকে পাহারা দিয়ে।

খানিকক্ষণ যেতে না যেতেই আবার তাদের বিজয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি শোনা গেল। তখন তারা চীৎকার করে বলল—তুমি যদি মানুষ হও তবে তোমার আর নিস্তার নেই। তোমাকে আমরা ধ্বংস করবই। একটু অপেক্ষা কর।

বস্তুত এই প্রতিধ্বনিকারী ছিল তাদের একজন শত্রু—যে কোনোক্রমে যুদ্ধে এদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল। সে নিজেকে সন্তর্পনে লুকিয়ে সর্পরূপে দুই ভাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে আসছিল এবং সুযোগ খুঁজছিল—কখন এদের হত্যা করবে। এইভাবে হঠাৎ একসময় সে এদের সামনের রাস্তায় বিরাট এক অজগরের রূপে গ্রাস করবার জন্য বসে রইল। বড় ভাই ছোট ভাইকে সাহস দিল কাছে গিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলতে। আর যেই ছোট ভাই অজগরের কাছে গিয়েছে অমনি সে প্রকাণ্ড হাঁ করে তাকে গিলে ফেলল। কিন্তু ছোট ভাই সাপের পেটের মধ্যে যাবার আগেই বড় ভাই দা'ও দিয়ে এক কোপে অজগরকে দু'ভাগ করে ফেলল। ছোট ভাই জীবন্ত বেরিয়ে এলো মৃত সাপের উদর থেকে।

একটু বিশ্রাম নেবার পরে আবার তারা বাড়ীর দিকে রওনা দিল। এবার একজনের কাঁধে শত্রু-শিরের মালা অন্য জনের দ্বিখণ্ডিত অজগরের দেহ।

শত্রুদের ও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে দুইভাই অনেক দিন পরে ঘরে ফিরেছে। এতদিন নিখোঁজে ছিল একা। তার নিঃসঙ্গ দিন ছিল দুঃসহ। তাই পুত্রদের অনুপস্থিতিতে উপজাতির এক পুরুষকে ইতিমধ্যে সে তার সর্বস্ব সমর্পন করে বসেছে, সময় কাটাচ্ছে তার উষ্ণ সাহচর্যে।

এমন অসময়ে ছেলেরা এসে হাজির। ঘরের দরজা বন্ধ দেখে তারা মা'কে দুয়ার খুলতে বলল। কিন্তু নিখোঁজে দুয়ার আর খোলেই না। তখন তারা চীৎকার করে বলল—

আমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছি। মা, আমরা পিতৃ-

হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছি, শত্রুদের ধ্বংস করেছি, নিয়ে এসেছি তাদের মুণ্ড। তুমি কি দরজা খুলবে না মা?

সিংঘাসে বুঝতে পারল—পুত্রেরা সত্যিই বিজয়ী হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু অন্য পুরুষের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে, অতীত-বিস্মৃত সিংঘাসে দরজা খুলবে কি করে?

তাই ঘরের ভিতর থেকেই সে বলল—

আমার স্বামী যুদ্ধে শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে আমার ছেলেদের ভাগ্যেও ঘটেছে সেই একই ঘটনা। আর আমার কোনো সন্তান নেই। আমার কিসের দরকার দরজা খুলবার?

পুত্রেরা তখন বলল—যদি তুমি তোমার বিজয়ী পুত্রদের জন্য দরজা না খোলো—খুলো না। আমরা তবেই বাঁচি। বিদায় মা—। কিন্তু যাবার আগে বলে যাই—যখন সূর্যাস্তের আগে আপন খুশীতে তুমি ঘরের বাইরে আসবে—পশ্চিম আকাশে তোমার শান্ত দৃষ্টি মেলে, তুমি সত্যদৃষ্টি লাভ করবে।

—জননীর জন্যে ঐ অন্তিম বার্তা রেখে তারা পশ্চিম দিগন্তে যাত্রা শুরু করল। অবশেষে প্রায় দিনাবসানে, সিংঘাসেও একসময় তার পতিতের বাহুপাশ থেকে উঠে এসে বাইরে দাঁড়াল, তাকাল পশ্চিম অম্বরে। দেখল—সুদীর্ঘ উপত্যকা প্রান্তে পর্বতলায় বঙ্কিম অস্তায়মান সূর্যের শরীরে তার সন্তানরা বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সিংঘাসের সর্বশরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। ভূমিতলে সে পড়ে গেল মূর্ছিত হয়ে।

সিংঘাসের সে মূর্ছা হলো মৃত্যুরূপিণী।

•

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রবাসী পত্রিকাই একদিন ছিল এদেশের শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সমস্ত প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের রচনা সম্ভারে সে-পত্রিকা হয়েছিল অদ্বিতীয়। প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের খেয়াল হ'ল 'প্রবাসীর' চেয়েও উৎকৃষ্ট একখানি মাসিক পত্রিকা বের করার। যার আকৃতি হবে প্রবাসীর চেয়েও মোটা, চিত্র সম্পদও অধিকতর উজ্জ্বল, রচনা সম্ভারও বিশিষ্ট এবং মূল্য হবে দ্বিগুণ। এ বিষয়ে হরিদাসবাবুকে অনেকে উৎসাহ দিলেন আবার অনেকে দিলেনও না। হরিদাসবাবু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে সম্পাদক পদে বরণ করে প্রবাসীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পত্রিকার নামকরণ করলেন "ভারতবর্ষ"। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় "ভারতবর্ষ" পত্রিকা প্রকাশিত হবার আগেই হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে দ্বিজেন্দ্রলালের অকাল মৃত্যু ঘটল। দ্বিজেন্দ্রলাল মহাউৎসাহে এক আনন্দে পত্রিকার সম্পাদনায় আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। এবং প্রথম পাতায় ছাপাবেন বলে "ভারতবর্ষ নামে একটি কাব্য রচনা করেছিলেন:

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
সেদিন বিশ্বে সে কি কলরব সে কি মা ভক্তি সে কি মা হর্ষ"

যখন যেমন

তরুণ মজোপাধ্যায়

মহিমবাবুকে নিয়ে তাঁর স্ত্রী নিভারানী ও তার ছেলে অর্ঘ তটস্থ হয়ে থাকে। এতটুকু অন্যায় সহ্য করতে পারেন না মহিমবাবু। ন্যায় অন্যায়ের বিচারবোধ অবশ্য সবার সমান নয়। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছরের মহিমবাবুর চোখে যেটা অন্যায়, তাঁর স্ত্রী ও কুড়ি বছরের ছেলে অর্ঘর চোখে সেটা নাও হতে পারে। চরিত্র, মেজাজ এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে ওঠা ধ্যানধারণার ওপর এ বোধটির তারতম্য নির্ভর করে কতকটা। মহিমবাবু ভারি অমায়িক, সদালাপী ও পরোপকারী মানুষ। পাড়ায় সুনাম আছে। তবু তাঁর মেজাজের সঙ্গে কিছু একটা খাপ না খেলেই তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েন। প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন হলে যে কোন পরিণতির ভয়ে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারেন।

স্ত্রী-পুত্রসহ মহিমবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন—হরিদ্বার, দিল্লী, আগ্রা। অর্ঘ বড় হয়েছে, সেই তত্ত্বাবধায়কের কাজ করছে এই পথযাত্রায়। বাপের মতই দৃঢ় মজবুত স্বাস্থ্য। সেই মানসিকতায় গড়ে ওঠা চৌকস ছেলে। যৌবন কালে অনেক দেশ ঘোরার অভিজ্ঞতা মহিমবাবুর আছে। তিনি চান অর্ঘও অভিজ্ঞ হয়ে উঠুক। অনেক ক্ষেত্রেই তাই তিনি ছেলের ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকেন। যেমন, যাত্রার সময় অতিকায় সরীসৃপের মত 'ডুন এক্সপ্রেসে' তাঁদের আসন নির্দিষ্ট সিপার খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। খান তিনেক কামরা ঘেঁটাতে উঠতে যান, নাম খুঁজে পান না চার্টে। শুধু বিরক্তিকর ছোটাছুটির পরিশ্রম। অর্ঘ একজন কণ্ডাক্টার ধরে মিঠে কড়া শুনিয়ে তাকে দিয়ে আসনের হদিস জেনে তবে ছাড়ল। এর পর গাড়িতে আলো নেই। মহিমবাবু বললেন—সে কি; দু রাত্রি একদিনের জার্নি। এ কি অব্যবস্থা। অর্ঘ বাবা মাকে অন্ধকারে বসিয়ে রেখে, মিনিট দশেকের মধ্যে আলো জ্বালিয়ে হাসতে হাসতে ফিরে এল। জলের ব্যবস্থা, বিছানা পেতে ফেলা—সব আয়োজনই হল, ভাবে করে ফেলল অর্ঘ, মহিমবাবু খুশি হলেন, নিভারানী আত্মপ্রসাদ বোধ করলেন।

এইভাবেই যাত্রাপথে খুঁটিনাটি অনেক সমস্যার সমাধান অর্ঘ করেছে। মহিমবাবুকে কোথাও কোন গোলমেলে ব্যাপারে বড় একটা জড়িয়ে পড়তে দেওয়া হয়নি। অর্ঘ মায়ের নীরব সঙ্কেতে সবকিছুই বেশ সুনিপুণভাবে সামলে যাচ্ছে।

হরিদ্বারে আগে থেকে ব্যবস্থা করা এক ধর্মশালায় উঠে, সেখান থেকেই ঋষিকেশ, লছমনঝোলা, দেরাদুন, মুসৌরি একের পর এক বেশ বেড়ান হল, মানুষগুলি আদব কায়দায় ভাল। ট্যাক্সি, টাঙ্গা, রিক্সার বাহকরা শুদ্ধ ব্যবহার করলেই বেশ শুদ্ধতা করে। বাঙলার সীমানা পার হোতেই অর্ঘ নিজেকে মানিয়ে চলার পদ্ধতি অবলম্বন করে সব ক্ষেত্রেই বেশ সফল হয়েছে। হরিদ্বারে বাঙালী হোটেলে খাওয়া—তাদের মাছি মত মেন্থুর সঙ্গে হিসেব মত খাওয়া মহিমবাবুর পছন্দ হচ্ছিল না। বিশেষ করে একদিন "পাতে ফেলে রাখলে চার আনা লাগবে" এই নির্দেশনামা কানে আসতেই মহিম বাবু বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। নিভারানী তারপরের দিনই রূপাকের আয়োজন করলেন। অর্ঘ ভাড়ায় সব বাসনপত্র যোগাড় করে ফেলল।

এত সাবধানতা ও সতর্কতা সত্ত্বেও মহিমবাবুকে নিয়ে অঘটন এড়ান গেলনা। হরিদ্বার থেকে দিল্লি বাসে যাত্রা করে, দিল্লি আজমীর গেট পৌঁছান গেল বেলা প্রায় বারটায়। রোদ্দুর, গরম একটানা ছ' ঘণ্টার পথশ্রান্ততো আছেই। যাত্রীরা নেমে দাঁড়াতেই এক পাল কুলি এসে দাঁড়াল। কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই বাসপক্ষর বাসের ওপর থেকে রূপারূপ নামাতে লাগল। টানা-হ্যাচড়ান একটা হৈচৈ কাণ্ড। মহিমবাবুদের একটা ট্রাঙ্ক আর বেডিং ওপরে ছিল।

একটা বড়া মার্কা কুলি প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেবার মত করে ও দুটো নামাল। তারপরেই—ইয়ে কিসকা মাল হ্যায়—বলে চেঁচাতে লাগল। মহিমবাবু ও অর্ঘ ত্বরিতপদে এগিয়ে গেলেন কাছে। বললেন—হামারা মাল। মহিমবাবু ঝুঁকে দেখলেন ট্রাঙ্কটার একটা কোণ তুবড়ে গেছে। কুলিকে বললেন—ইয়ে ক্যায়া কিয়া? কুলি কথাটার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বললে—ঐসা হোতা হ্যায়। তার এ ধরণের নির্বিকার উত্তর শুনে মহিমবাবুর চোখদুটো জ্বলে উঠল। নিতারানী স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে প্রমাদ গুণলেন। কুলি জানতে চাইল, মাল কোথায় যাবে। অর্ঘ তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বলল—ট্যাক্সি নেবে। কুলি বললে—দু মালকা দু রুপয়া লাগেগা। মহিমবাবু ছেলেকে পাশে সরিয়ে দুপা এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—ইয়ে ক্যায়া হিসাব? কুলি বললে—উতরানে কা এক রুপয়া। ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডতক পৌঁছানেকা এক রুপয়া। বাকী?

মহিমবাবু বললেন—হম এক রুপয়া দেগা। বাকী?

কুলিটা ঝাঁকিয়ে উঠল—দিল্লি কভি আয়া নেহি ক্যায়া?

ধৃষ্টতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মহিমবাবু সামলাবার চেষ্টা করছেন নিজেকে। অর্ঘ কুলির সঙ্গে একটা রফা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। মহিমবাবু এক ধমক দিলেন ছেলেকে। বেডিংটা ডান হাতে নিলেন। বাঁ হাতে ট্রাঙ্কের এক ধার ধরলেন, আর এক ধারটা অর্ঘকে ধরতে ইঙ্গিত করলেন। অর্ঘ একটু ইতস্তত করে আর একটা পার ধরতেই মহিমবাবু অবলীলাক্রমে পা বাড়ালেন। এই সময় অঘটনটা ঘটে গেল। কুলিটা খপ করে মহিমবাবুর হাত ধরে বেডিংটা কেড়ে নিল। আর মহিমবাবু মুহূর্তমাত্র দেরি না করে বিল-চল-ঘুসি সহ কুলিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরাশায়ী করলেন। যাত্রী ও কুলিরা প্রথমটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর কিছু লোক হৈ চৈ করে মহিমবাবুকে অতিকষ্টে ছাড়িয়ে নিয়ে এল। কুলির দল ক্ষেপে উঠেছে। যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ঘটনার সূত্রপাতটা গোড়া থেকেই জানে। মহিমবাবুই একা এতগুলো লোকের মহড়া নিতে প্রস্তুত। কুলির এতবড় সাহস গায়ে আগে হাত দেয়। ট্রাঙ্ক নামাতে গিয়ে ভেঙেছে, পয়সা অতিরিক্ত চায়। না দিলে যাত্রীর হাত চেপে ধরে। এসব জুলুম।

শেষ পর্যন্ত মহিমবাবুর অকাট্য যুক্তি, প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে একক নির্ভীক প্রতিরোধ প্রচেষ্টা বেশ কিছু যাত্রীসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কুলিটা ভৎর্সিত হল। পুলিশ ডেকে জুলুমবাজী বন্ধ করার কথা উঠতেই মিটমাটে আগ্রহী কয়েকজন কুলি এগিয়ে এসে যা হবার হয়েছে, বলে মহিমবাবুর মালপত্তর তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে এল। ওঁরা একটা হোটেলে এসে উঠলেন।

নিতারানী নিরাপদ জায়গায় এসে বললেন—তোমার প্রকৃতি এতটুকু বদলাল না।

ফ্যান চালিয়ে, একটা চেয়ার টেনে বসে মহিমবাবু বললেন—সমঝদার, বুদ্ধিমেত মানুষ নিজের প্রকৃতি পালটায়ে এটাই ঠিক কথা নাকি?

অর্ঘ এতক্ষণ গম্ভীর হয়েছিল। বাবার আচরণে ক্ষুব্ধ। জানলার ধারে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল বললে—তবু স্থান কাল পাত্র একটু বিচার করে চলতেই হয়।

মহিমবাবু ধমক দিলেন—তুমি থাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান অমন মাপজোখ বিচার করে হয় না।

—তাতে ঝুঁকি আছে। কুলিরা আর পাঁচজন মিলে আমাদের মারধোর করতে পারত। আমাদের সমর্থক যে পেতামই এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

—হ্যাঁ ঝুঁকিতো আছেই। এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি তো থাকবেই। তাই বলে—।

নিতারানী বাধা দিয়ে বললেন—থাক খুব হয়েছে—এবার খাবার দাবারের যোগাড় দেখ।

এরপর দিল্লি অবস্থানকালে মহিমবাবু নিজেকে যেন একটু গুটিয়ে নিলেন। স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে ঘোরেন ফেরেন নানা ঐতিহাসিক জায়গা দেখেন, কিন্তু কোন বিষয়েই বেশী কথা বলেন না। সায় দিয়ে যান। ছেলের ওপর সব ছেড়ে দিয়েছেন। অর্ঘরও মনে হল বাবা হয়ত নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন। তাই ছেলের বিচার বুদ্ধির ওপর কোন কথা বলেন না। যে কোন ব্যবস্থাপনায় সে অবশ্য বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে, কিন্তু দ্বিরুক্তি না করে উনি সায় দিয়ে যান। এইভাবে একদিন আগ্রাও ঘুরে আসা হল। এবার

করার পালা। রাত্রে নিভারানী স্বামীকে বললেন তুমি যে একেবারে চুপ মেরে গেলে। কি হল তোমার?

—কিছুই না। বেশতো আছি। আমাকে নিয়ে তোমাদের কি কোন অসুবিধে হচ্ছে?

—না। তা হচ্ছে না। তবে, কবে কোন গাড়িতে ফিরবে। বার্থ রিজার্ভ করা দরকার—!

—অর্ঘতো সব ব্যবস্থা বেশ করছে। আমার ভাবনা কি। মহিমবাবু হাসলেন।

—তবু ছেলে মানুষ তো!

তাতে কি হয়েছে। আমার উপযুক্ত ছেলে তাছাড়া আবি তো সঙ্গেই আছি।

মহিমবাবু প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু মনে মনে এতদিন উনি ভেবেছেন। নিজেকে প্রশ্ন করেছেন বারবার। যুগের তালে তাল না রাখতে পেরে তিনি কি পেছিয়ে পড়ছেন? নাকি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখানেই প্রতিশীল হয়ে আছেন, আর এগোতে পারছেন না? আর অর্ঘ তার সবারই উপরন্তু নতুন যুগের অগ্রদূত স্থান কাল পাত্রের মাপকাঠিতে নিজেকে নিরীক্ষিত করে কালের গতির সঙ্গে অনায়াসে অবগাহন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এতো সুবিধাবাদী নীতি! চিত্তবৃত্তির লাগাম ঢোক বুজে, জায়গা বুঝে, সময় বুঝে কি সব সময় টেনে ধরে রাখা যায়? এই সুবিধাবাদ স্বার্থসর্বস্ব। এরই বোঝা মাথায় নিয়ে সারা দেশটা কি খাবি খাচ্ছে না? মহিমবাবু নিজের প্রশ্নোত্তরের গোলক ধাঁধায় পড়ে থেই খুঁজে পাচ্ছেন না। একটা আপসও করতে পারছেন না। স্ত্রীকে এ বিষয়ে কিছু বলা বৃথা। তিনি স্বামী ও সন্তানের ভাবাদর্শের মধ্যে শুধু একটা সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। এই কাজের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন, এর বেশী তিনি ভাবতে পারেন না।

অর্ঘ টিকিট কেটে নিয়ে এল। বিদেশ জায়গায় একদিন আগে তিন খানি বার্থ সে রিজার্ভ কিভাবে করিয়ে নিয়ে এল সেটাই বাহাদুরীর কথা। গল্প করে শোনাল। নিভারানী বললেন—দেখলে কি রকম কাজের ছেলে! মহিমবাবু হেসে সায় দিলেন।

দীর্ঘ দু-রাত্রি, পুরো একদিন ট্রেনে কাটিয়ে, সকালে স্ত্রী-পুত্রসহ বেশ নিরাপদেই হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলেন মহিমবাবু। কোথাও কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি। পথে খাওয়া দাওয়া, রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত এসব কিছুই হয়নি। ভোর বেলায় বাঙলা দেশের সীমানায় ঢুকতেই সবলে বিশেষ করে অর্ঘ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। নিজের পরিবেশ, নিজের জায়গা, বিদেশ বিভূঁয়ের মত নিজেকে আগলে সামলে রাখার অত বাধ্যবাধকতা নেই। ভেণ্ডারদের সঙ্গে বাঙলায় কথা বলতে পারায় কত না তৃপ্তি। ঐতো বাঙলা দেশের গাঁয়ের বধূরা পুকুরঘাটে জড়ো হয়েছে। গরু ছুইছে চালাঘরের নীচে ক'জন। চাষীরা মাঠে নেমেছে। শ্যামল কোমল সেই আমাদের সোনার বাংলা দেশ।

অর্ঘ বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সবার সঙ্গে বেচে কথা বলা, কে কোথায় কোলকাতায় যাবে তার হদিস বলে দেওয়া এসব নিয়ে সে বেশ ব্যস্ত আছে। তার এই হাসিখুসি প্রফুল্লভাবটুকু অনুধাবন করছেন মহিমবাবু নীরবে। নিভারানী এক সময় বললেন—তুমি হাসছ কেন? মহিমবাবু বললেন—কৈ, না তো!

হাওড়া ষ্টেশনে সবই চেনা জানা—আপন আপন ভাব সব জায়গায়। কুলি ডেকে মাল নামান হল। তড়ি ঘড়ি ব্যস্ততার কিছু নেই। ধীরে সুস্থে কুলির মাথায় মাল তুলে দিল অর্ঘ। টুকিটাকি জিনিষ হাতে নিল। গাড়ির ভেতরটা আর একবার চোখ বুলিয়ে এল। তারপর কুলিকে বলল চল। কুলি বললে - দু'রূপয়া দেগা বাবু। মাল ভারি আছে। ওর কথার কর্ণপাত না করে অর্ঘ বাবা মাকে সঙ্গে নিয়ে সোৎসাহে এগিয়ে চলল। নিভারানী মৃদুস্বরে বললেন—একটু দরদস্তুর করে নিলে পারতিস্। আবার অশান্তি না হয়। অর্ঘ বললে—এখানে আবার অশান্তি। সাত রাজ্য ঘুরে এলাম কিছু হতে দিলাম না—আর এখানে করে এসে—চলো চলো।

কিন্তু ট্যাক্সিতে মাল তুলে দেবার পরই অশান্তিটা হল। অর্ঘ এক টাকা কুলিটাকে দিতেই, সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল অর্ঘর মুখের দিকে।

অর্ঘ হেসে বললে—ক্যায়া হুয়া?

—দু রূপয়াকা বাত হয়।

—কে বাত করল। তুমি যা বলবে তাই দিতে হবে নাকি? তোমাদের ঝুলুম তোমাদের মুলুকে অনেক সহ্য করেছি। এ আমাদের মুলুক। যাও ভাগো। অর্ঘ বেশ ধমকে উঠল।

কুলিটা বললে—কাঃ বাবু! আচ্ছাতো কুছ বকসিশ্ তো দেন বাবু।

—কুছ্ নেই। যাও ভাগো। ওঠো তোমরা।

কুলিটা নিরাশ হয়ে বিরস বদনে ফিরে যাচ্ছিল। মহিমবাবু ওকে কাছে ডাকলেন। এক টাকা পকেট থেকে বের করে ওর হাতে দিলেন। ও হাতটা মাথায় ঠেকিয়ে খুসি মনে চলে গেল।

অর্ঘ বললে—একি করলে বাবা?

মহিমবাবু গাড়িতে উঠে এসে বসলেন। বললেন—ঠিক করলাম কি না বুঝতে পারছিনা। তবে স্থান কাল পাত্র সুবিবেচনা বলে ওকে বঞ্চিত করতে মনটা যেন সায় দিল না। তুমি কিছু মনে কর না বাবা।

নিভারানী স্বামীর মুখের দিকে একবার চাইলেন। ওঁর তখনকার হাসিটার মূঢ় অর্থ এবার বুঝলেন। আর কথা না বাড়িয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে তাগাদা দিলেন।

• • •

এই সময় পানী ব্যবসায়ী মে, এক, ম্যাডান গড়েরমাঠে তাঁবু খাটিয়ে সিনেমা দেখাতে সুরু করলেন। অধিকাংশই "প্যাথেফিলম্স্"—বিলিতি ছবি। অবশ্য তারও অনেক আগে হীরালালবাবু তাঁর "হরেল বায়োস্কোপ" দেখাতেন ক্লাসিক থিয়েটার প্রভৃতি সাধারণ রঙ্গমঞ্চে। অভিনয় শেষে অতিরিক্ত আকর্ষণ রূপে বায়না নিয়েও বাহিরে গিয়েও এঁরা বায়োস্কোপ দেখাতেন। বড়লোকদের বাড়ীতেও উৎসব অনুষ্ঠানেও এঁরা যেতেন। এক জায়গায় এই বায়োস্কোপ দেখাতে গিয়ে অভিজ্ঞতাও আমার হয়েছিল বড় কম। গ্যাস করতে লাগলো ঘণ্টাখানেক। আলো ঠিক করতে আরো আধ ঘণ্টা। ফোকাস ঠিক করতেও লাগলো অনেকক্ষণ। কত আর ধৈর্য থাকে আর বলুন? বড় বিরক্ত হয়েছিলুম সেদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখে খুশী হলুম যদি মাঝে মাঝে ছিঁড়ে না যেতো।

কলম

অমিয় চৌধুরী

কলমটা সে এখানে এই আলমারীর বই-এর মধ্যে গুঁজে রেখেছিল, আশ্চর্য, অম্লানের তো সে কথা একবারও মনে পড়েনি। অথচ কাণ্ড ভাখো, যদি খানেক আগে শর্মিলাকে এ নিয়ে কত কথাই না শোনাল, শর্মিলার হাতে লক্ষ্মী নেই, সংসারের কোন্ জিনিষটা কে কোথায় হাতিয়ে নিচ্ছে, সেদিকে খেয়াল থাকে না মোটেই। তিন বছরের রোগা ছেলেটা সেই সময় চ্যাচাচ্ছিল, তাকেও দু-চার ঘা দিয়েছে। অম্লান চাকরটাকে ধেরা করেছে, ঠিকে ঝি-টার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দু-চারটে প্রশ্ন ছুড়েছে। মোটের ওপর, যাকে বলে ধুন্ধুমার, সেই রকম একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছেড়েছিল। কিন্তু একবারও স্মরণে আসেনি, ও নিজেই কখন্ কলমটা অযতনে আলমারীর এই বইটার মধ্যে গুঁজে রেখেছে।

এখনই কি আর সেই! কাল অম্লানের জ্ঞানেক গঙ্গারাম এসেছিল। গঙ্গারামের ছোট বোন মানে ঊর্মিলার বিয়ের দিন ঠিক হয়েছে। দিন সাতেক পরে বিয়ে। আগে থেকেই তাই বড় বোন শর্মিলাকে নিতে এসেছিল। অম্লান গঙ্গারামের সঙ্গে শর্মিলাকে এই ঘণ্টা খানেক আগে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। ষ্টেশনে গিয়ে ওরা শুনল, ট্রেন আজ তিন ঘণ্টা লেট্। শর্মিলা অপেক্ষা করতে বলেছিল অম্লানকে, ট্রেন এলে অম্লান ওদের ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে তবে যাবে। কিন্তু অম্লানের একটা বড় কাজ বাকী ছিল। অম্লান স্থানীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদককে কথা দিয়েছে, আজই রবীন্দ্রনাথের ওপর আলোচনা লিখে দেবে। এতদিন হাজার সেক্রেটারী পরীক্ষার খাতা নিয়ে দিন-নিশি খাটছিল, দু-দণ্ড নিশ্বাস নেবার সময় পাচ্ছিল না। গতকাল সে সব ঝুট্-ঝামেলা মিটিয়ে ফেলেছে। আজ সকালেই খেটে-খুটে লিখে সন্ধ্যের দিকে লেখাটা সম্পাদকের দপ্তরে পৌঁছে দিয়ে আসবে। এবং ঠিক সেই কারণেই ভোর ভোর ওদের ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়েই আর অপেক্ষা করেনি, সরাসরি বাড়ী এসে আলমারী খুলল। আর তখনই রবীন্দ্ররচনাবলীর কাব্য-খণ্ডটি টানতেই, টুক করে কী যেন পড়ল মাটিতে।

ঘাড় হেঁট করে মেঝের দিকে তাকাতেই প্রথমে অম্লানের চোখ দুটো ঈষৎ কুঁচকে গেল, এবং তারপর সকালের নির্মেঘ আকাশের মত ঝলমল করে উঠল। বুকের ভেতরটা ঢেউ ঢেউ আনন্দে দোল খেল। কলমটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে এক মনে খানিকক্ষণ দেখল। গোল্ডক্যাপ্ কালো পাইলট্ পেন্, বেঁটে ও ছোট নিব্, চুঁচলো মুখের গলার কাছে রূপোলী আংটা, দুমিটা পাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলে দেখল, হ্যাঁ সেই টিউব-ফিটেন্ পাইলট্ পেন্। হারিয়ে-যাওয়া বাচ্চাকে দীর্ঘ তিন পর ফিরে পেলে মা যেমন করে তার বুক-পিঠ-ঘাড়, গলা, মাথা বা গালে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে দেখে হাসি-কান্না মেশান বিচিত্র এক অনুভব নিয়ে, অনেকটা তেমনি করেই যেন অম্লান পেনটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। সাদা কাগজে নিজের নাম সই করে নিব-টার বর্তমান অবস্থা যাচাই করতে গিয়ে দেখল, পেনে কালি নেই। আবার মুখ খুলে টিউব-এর পেটে চাপ দিয়ে কালি ভরল। মুখটা লাগিয়ে আলমারীর মাথা থেকে নোংরা কালি-ঝুলি-মাখা ন্যাকড়ার টুকরোটা নিয়ে পেনটার গলা মুছল।

আশ্চর্য। এই পেনটার জন্যে মন কেমন করার চোটে অম্লানের মেজাজটাই যেন তিরিক্ষি হয়েছিল। এমন নয়, এই পেন্ বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। খুলতে না হলেও একটু চেষ্টা-চরিত্তির করলে, বা চার টাকা বেশী দাম কবুল করলে এমন জাপানী পাইলট্ পেন পাওয়া এমন কিছু শোনাই ব্যাপার নয়। না, তার জন্যে নয়।

আসলে চুয়ান্নিশ বছরের অম্লান, বছরের পর বছর মাষ্টারী করতে করতে সময়ের সিঁড়ি পেরিয়ে এসেছে অনেক।

এখন শরীরের বাঁধন হয়েছে আলগা, কালো লম্বা মাঝে মাঝে সাদা দাড়ির ভিড় ক্রমশঃই বাড়ছে, গোঁফের মাঝামাঝি জায়গাটা বলতে গেলে বেমালুম সাদা হয়ে গেছে, মুখের তাঁজে তাঁজে ঘটাচে রং ধরেছে, চোখের কোলগুলো বসতে সুরু করেছে, চোখদুটোতেও যেন গোলমাল-টোলমাল কিছু হয়েছে, অনেক দূরের জিনিষ ঠিক ঠাওর হয় না আজকাল; তবু চুয়াল্লিশের প্রায় তিলোচালা শরীরের আড়ালে ছাব্বিশের অম্লানকে আড়াল করে রাখতে পেরেছে ঐ পেন্‌টার মধ্যে। অম্লান এই পেন্‌টা হাতে নিয়ে, পেন্‌টাকে গালে ছুঁইয়ে, অথবা বুক পকেটে গুঁজে আঠার বছর আগে অতি সহজেই মনটাকে পাঠিয়ে দিতে পারে, এবং রমা এক বোধে নিজেকে সিক্ত করতে পারে। সুখ-দুঃখের বিনিদ্রবোধে অবসর সময়টা ভরে রাখতে পারে।

কলমটা সম্পর্কে শর্মিলা অনেকবারই তো জিজ্ঞেস করেছে, অম্লানের কাছ থেকে যুক্তিগ্রাহ্য কোনও উত্তর না পেয়ে অভিমান করেছে, ঠোঁট ফুলিয়েছে। দশ বছর আগে অম্লানের হাতে কলমটাকে দেখে নববধূ শর্মিলা বলে উঠেছিল, ইস্! কী সুন্দর পেন্! কোথেকে পেলে গো! পেন্‌টা অম্লানের হাত থেকে নিয়ে নিজেতে উপহার-পাওয়া নীল প্যাডের ওপর হিজিবিজি আঁকিবুঁকি করে কলমের তত্ত্বতত্ত্বের সন্ধান গতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিল। বার বার জিজ্ঞেস করেছিল, বলো না গো কোথায় পেলে পেনটা। অম্লান আজে বাজে দুচারটে কথা বলে শর্মিলার ঔৎসুক্য চাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু শর্মিলার চোখ বড় সতর্ক। ঐ কলমটির প্রতি অম্লানের এক বিশেষ মমতা তাকে সন্দিগ্ধ করেছিল। সময়ে অসময়ে তাই ঐ কলম নিয়ে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত খোঁটা দিতেও ছাড়েনি। অম্লান সচেতন হাসি দিয়ে ঐ সমস্ত উক্তির উত্তর দিয়েছিল সত্যি, কিন্তু আসল কথাটা বলতে পারেনি। সময়ে সবই ঠিক হয়ে যায়। সুতরাং একটি কলমকে কেন্দ্র করে অসন্তোষের ধোঁয়া বেশীদিন জীবিত থাকেনি অম্লান শর্মিলার মধ্যে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একসময় সে ধোঁয়া মিলিয়ে গেছে। বিশেষ করে বছর তিনেক আগে শর্মিলা খোকনের মা হওয়ার পর থেকে ওর সবটুকু নজর গিয়ে পড়েছে খোকনের ওপর। মা শর্মিলা অথচ একটা কলমের মত ছেলে ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর আর প্রয়োজন বোধ করে না। বলা ভালো ভাবটা এমনি যা জানা হয়নি, তা অজানাই থাক্। অথবা থিতিয়ে পড়া ময়লা গুলিয়ে সংসারের জল ঘোলা করে কাজ নেই।

তবু অম্লান কথাটা বলতে পারেনি। বলা যায় না। চুয়াল্লিশের অম্লান যে ছাব্বিশ বছরের চড়া রঙের ছাপ কাটা অম্লানকে মনের জিব দিয়ে চেটে চেটে ওর অবসর মুহূর্তগুলো রমনীয় ব্যথায় ভরে রাখার লোভটুকু আজও ছাড়তে পারে না, এ কথা শর্মিলাকে বলা যায় না। শর্মিলাকে বলা যায় না, অম্লান তপতীকে ভালবেসেছিল। সেই তপতী, যে এখনও এক টুকরো স্বপ্নের মত বুকের পাঁপুটে টল্ টল্ করে ভোরের শিশিরের মত। ছিপছিপে গড়নের তপতীর সুডৌল বুকের উত্তাপ এখনও তো মাঝামাঝি হয়ে আছে এই কলমটায়।

ঘন পক্ষপুটে জল নিয়ে তপতী বলেছিল, আমি পরীক্ষা দেব না।

তখন অম্লান সবে ইংরেজিতে এম-এ পাশ করে গ্রামের কো-এডুকেশন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে মাষ্টারী করতে ঢুকেছে। একদল শ্রেণীর ছাত্রী তপতীর দিকে তাকিয়ে ওর যৌবন মন কিছু যেন চেয়েছে, কোন্ এক চৈত্রের ধূলি-ওড়া দাবদাহ বেলায় ওরা বুঝি কাছাকাছি এসেছে, গাঢ়তর স্বপ্নের ঘ দেখেছে ওদের দুজনেরই চোখে, নীতি নিষ্ঠার ব্রীড় ভেঙে দিয়ে মিলে গেছে, মিশে গেছে বসন্ত বেলার সুখী ও দুঃখী অম্লান তপতী বাসা বাঁধার কথা চিন্তা করেছে। সেই তপতী বলেছিল, আমার পড়াশুনো কিছু হয়নি, আমি পরীক্ষা দেব না।

অম্লান যেন নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছিল। বলেছিল, কেন, আমার জন্যে? আমিই তাহলে তোমার পড়াশুনো মাটি করলাম?

—না, তা বলছি না। তপতী সামনের গা-ঝাঁঝা ফুলে ঢাকা শিমুল-গাছটার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, জানো, অন্য সব সাবজেক্ট আমি কোনও রকমে ম্যানেজ করতে পারি তবু তোমার ঐ ইংরেজিটা আমার কিছুতেই আসে না।

অম্লান চুপ করেছিল। আর সাতদিন পরই তপতীর ফাইন্যাল পরীক্ষা। এর মধ্যে যে ওকে পড়িয়ে টড়িয়ে তৈরী

করে নেবে তারও উপায় ছিল না। তাছাড়া, এমনিতেই তপতীর ইংরেজি ডিং খুবই কাঁচা। আকাশ পাতাল অনেক ভেবেছিল অম্লান। শেষে বলেছিল, ঠিক আছে তুমি পরীক্ষা দাও, সেটার যখন আমাদের স্কুলে, তখন ইংরেজি পেপার দুটো আমি কোনওরকমে ম্যানেজ করে নেবো!

—কি করে ম্যানেজ করবে? তপতী বড় কালো চোখ তুলে তাকিয়ে ছিল অম্লানের দিকে। অম্লান হেসেছিল। বলেছিল, টুকলিফাই।

—ওরে বাবা, ওসব টুক্‌লি ফুক্‌লি আমার দ্বারা হবে না!

—না, তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি পরীক্ষার হলে খাতা পেয়ে যা পারো, আবোল-তাবোল লিখে খাতা ভর্তি করে দিও। তারপর আমি দেখবো।

আশ্চর্য! সেদিন কত সহজে ব্যাপারটা ম্যানেজ করেছিল অম্লান। একদিকে তপতী পরীক্ষার হলে লিখছে। অন্যদিকে আর একটা ঘরে প্রশ্নপত্র ও খাতা নিয়ে ঘুম ঘরের একেবারে পিলেকোঠায় গিয়ে দরজা বন্ধ করে অম্লান তপতীর নাম, রোল নাম্বার, লিখে প্রশ্নোত্তর লিখে দিচ্ছে। এমনি করেই দুটি পেপারই, জমা দেওয়ার আগে কায়দা করে বদলে, তপতীর লেখা খাতাগুলো পকেটে পুরে, নকল খাতা দুটোর ওপর ইনভিজিলেটরের জন্য নির্দিষ্ট ইনিসিয়ালের জায়গায় সুরথ-বাবু আর মদনবাবুর ইনিসিয়াল জাল করে জমা দিয়ে দিয়েছিল। অবশ্য সুরথবাবু যেন একটু সন্দেহ করেছিলেন, তবে কিছু বলেননি। মদনবাবুর রিটায়ার করার বয়েস হয়ে গেছিল, চোখে ভাল দেখতে পেতেন না। ইনভিজিলেশন দিতে গিয়ে সারাক্ষণ শুধু চেয়ারে বসে বসে ঢুলতেন। কে কোথায় কি করছে অত দেখতেই পান নি।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় খুশী খুশী তপতীকে একেবারে বুকের মধ্যে সাপ্‌টে ধরেছিল অম্লান। আর, যেন ঝড় জলে উথাল পাথাল কোনও সমুদ্রের ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে এসে অম্লান তপতীর সামনে দাঁড়িয়েছে, এমনি এক প্রশস্যের উজল চোখ নিয়ে তাকিয়েছিল তপতী।

অম্লান পকেট থেকে কলমটা তুলে তপতীর দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, এই নাও তোমার কলম, তখন খাতা লিখবার জন্য তোমার কাছ থেকে নিয়েছিলাম।

তপতী অম্লানের হাত থেকে কলমটা নিয়ে বুকের ভেতরে ব্লাউজে গুঁজে রাখল। পরক্ষণেই অম্লানের গালে দাঁড়ির ওপর হাত বোলাতে বোলাতে হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে কী যেন ভাবল; তারপর সোজা হয়ে বসে নিজের বুক থেকে আবার কলমটা তুলে নিয়ে অম্লানের হাতে দিল, না, এ কলমটা তুমিই নাও।

—ও, ওটা বুঝি আজকের খাটুনির পারিশ্রমিক। কলমটা তখনও তপতীর বুকের উত্তাপে উষ্ণ। উষ্ণ কলমটা অম্লান চেপে ধরল বুকের ওপর।

অবাক্ লাগে অম্লানের, এই এত বছর, প্রায় আঠার বছর পরেও এই কলমটাকে চেপে ধরলে বুকের গভীরে স্মৃতিরা সবাই কথা বলে ওঠে। অম্লান কলমটার চিকন চাকন শরীরে তপতীর শরীরের মাতাল করা উত্তাপ পায়। আর সেই উত্তাপটুকুর লোভেই শরীরের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে কলমটাকে মাঝে মাঝে বুকে চেপে ধরে অম্লান। অথচ তপতী তো পারেনি অম্লানের সঙ্গে চলে আসতে। কুড়িখানা হালের জমির মালিক রমেশ বাঁড়ুজ্যে অম্লানের মত নেহাৎই এক স্কুল মাষ্টারের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায়নি। না চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু তপতী তো পারত অম্লানের সঙ্গে এসে সদরে রেজিষ্ট্রী কোরে ওদের স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটির এক আইনানুগ স্বীকৃতি আদায় করতে। ভীরু তপতী তা পারেনি বরং ওদের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অম্লানকে এই সংসারের স্কুলে আসতে হয়।

অম্লান আবার কলমটার দিকে তাকাল। আশ্চর্য কোনও বস্তুর মত কলমটা যেন নতুন মনে হচ্ছে অম্লানের কাছে। এক মাস কলমটা দেখেনি অম্লান। এমন সন্দেহও হয়েছিল, বলা যায় না শর্মিলা হয়ত বিক্রি করে দিয়েছে কলমটা। সংসারের টানাটানি তো লেগেই আছে। আজ তিন মাস থেকে স্কুলে মাইনে পাওয়া যায়নি। সংসার চলছে না। অন্যান্য জিনিষপত্তর না হয় ধারে ধারেই আনছে। কিন্তু খোকার বেবীফুড তো আর ধারে দেবে না। এমনিতেই তো বাজার থেকে বেবীফুড উধাও হয়ে গেছে। মাস খানেক আগে রতনের হোমিওপ্যাথী দোকানে কিছু মাল এসেছিল। অম্লান রতনের বাঁধা খদ্দের। তাই রতনই অম্লানকে ফোন

বলেছিল, বাবু, এই সময় বেশী ফুলের কৌটো কিন্তু এসেছে দু-একটা নিয়ে রাখুন, পরে আর পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে রতন একথাও বলেছিল, বেশীক্ষণ ধারে দেওয়ার সামর্থ ওর নেই, অম্লান যেন সেদিকটা একটু বিবেচনা করে। কথাটা এসে শর্মিলাকে অম্লান বলেছিল। তারপরেই দেখছে, পেনটা পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং বেশীক্ষণ কিনবার জন্যেই যে শর্মিলা ওটা বিক্রি করে বসে আছে এমন ধারণা হওয়া অম্লানের পক্ষে খুব একটা অসঙ্গত ছিল না। পরে অবশ্য শর্মিলার কান্নাকাটি দেখে এধরণের ধারণার চিড় ধরেছিল। এমন অম্লান ভেবেই নিয়েছিল, পেনটা হারিয়ে গেছে। অথবা বলা যায় না, অম্লান অন্যমনস্ক তো কম নয়, কোনও গল্প বা কবিতার ভাবে বুঁদ হয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সেই অবসরে কেউ টুক্ করে পকেট থেকে তুলে নিয়েছে।

কিন্তু এখন দেখছে, কলমটা রাস্তায় পড়ে যায়নি, শর্মিলা বেশীক্ষণ কিনবার জন্যে বিক্রি করে ফেলেনি বা কোনও পকেটমার অম্লানের অন্যমনস্কতায় কলমটির গায়ে হাত করে চক্ষুদান করেনি। কলমটা যেমনকার ঠিক তেমনিটিই আছে। এই মাসাধিক কাল অম্লানের মনসিক অশান্তির মূলে যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, তবে তা গোটাগুটিই অম্লান নিজে। সুতরাং নিজেকে আসামীর কাঠগড়ায় তুলে, অম্লান আত্মগ্লানি অনুভব করল। ভাল করে ঘুমুতে না দেখে বাড়ীর ভাবৎ মানুষকে উত্যক্ত করার জন্যে সত্যিই এখন খুব খারাপ লাগছে। ভাগ্যে শর্মিলা আজ ভোরের ট্রেনে বাপের বাড়ী গেছে। সামনে থাকলে এতক্ষণ অম্লানের মুখের ওপর চোখা চোখা কয়েকটি জবাব নিক্ষেপ না করে ছাড়ত না।

সে যাই হোক, আপাততঃ যখন কলমটা পাওয়াই গেল, তখন এইটা দিয়েই পত্রিকার জন্যে লেখাটা ঠিক করে রাখা যাক। কিন্তু এ কী! অম্লান হাত ঘড়ির দিকে তাকাতেই ওর চোখ কপালে উঠল। সাড়ে আটটা বেজে গেল এরই মধ্যে। অম্লান জানলার দিকে তাকাল। ভোরের ভিজে ভাবটা কেটে গেছে। সকালের কাঁচা রোদ এসে সামনের কাঁঠালের সবুজ পাতায় ঢাকা লিচু গাছটার গায়ে পড়েছে। রাস্তার জল দিয়ে সেই ঝরঝরে গাড়ীটা অনেকক্ষণ আগেই পেরিয়ে গেছে। কাজ কর্মে ব্যস্ত মানুষ। দরজাটা গা কাড়া দিয়ে গোলমালের সমুদ্রে খলবলিয়ে গা ধুয়ে নিতে সুরু করেছে।

নাঃ, থাক, লেখাটা তা হলে আজ স্কুল থেকে ফিরে রাত্রেই তৈরী করে রাখবে। সম্পাদক মশাই অবশ্য দু-চার কথা না শুনিয়ে ছাড়বেন না। তা আর কি করা যাবে। আজ তো স্কুল না গেলেও নয়। আগে থেকে জনপাঁচেক শিক্ষক ক্যাজুয়েল লিভের দরখাস্ত দিয়ে রেখেছেন। তার ওপরে অম্লান অনুপস্থিত হলে, হেডমাষ্টারের পক্ষে কাজ চালানোই মুস্কিল হয়ে পড়বে। এমনিতেই তো এখনও ছ'মাস পুরো হয়নি, এরই মধ্যে দশদিন ক্যাজুয়েল লিভ খেয়ে বসে আছে অম্লান, আর মাত্র পাঁচ দিন হাতে আছে। তা বিপদ-আপদ, বা জরুরী দরকার পড়লে তখন তো আবার ছুটির প্রয়োজন হতে পারে! এখনই যদি সব ফুরিয়ে বসে থাকে, তখন কী করবে। লেখাটার জন্যে সম্পাদক যদি তেমন কোনও অন্যায় কথা বলেন, অম্লানও মুখের ওপর কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দেবে, বিনা পয়সায় লেখা দিই এইটাই যথেষ্ট মনে করবেন। তার ওপর যদি কথা শোনাতে আসেন তাহলে লেখা দেওয়াই বন্ধ করে দেব। মনে রাখবেন লেখা আমার পেশা নয়, নেশা।

তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। আজ থেকে ছেলেদের ষান্মাসিক পরীক্ষা সুরু হচ্ছে। তাড়াতাড়ি খেতে হবে। অতএব অম্লান জামা গেঞ্জি খুলে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখল। তারপর কাপড় ছেড়ে গামছা পরে বাথরুম-পায়খানা সেরে গতকাল ধোবাবাড়ি থেকে আসা কাপড় জামার পাট ভেঙে বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে পরল। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। ঘাস খানেকের ভার-ভার ভাবটা কেটে গিয়ে এখন অনেকটা হাল্কা মনে হচ্ছে। অম্লান মহলা জামার পকেট থেকে কলমটা তুলে যে জামাটা নতুন পরল তার বুক পকেটে গুঁজে রাখল।

কী যে ভুলো মন ওর, সব সময়ে কেন যে এমন হয়! অভ্যাস মত রান্না ঘরের চৌকাঠের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজেকে বড় বোকা ও হাবা বলে মনে হল। লোকে যে বলে বারো বছর মাষ্টারী করলে লোকে লম্বা কান বিশিষ্ট বিশেষ এক জীবে পরিণত হয় মিথ্যে নয়। আজ ভোরে যে শর্মিলা

তার বোনের বিয়েতে বাপের বাড়ী গেছে এবং অম্লানকে যে হোটেলে খেতে হবে আজ, শুধু আজ নয়, প্রায় দশ বারো দিন অর্থাৎ যতদিন না শর্মিলা ফিরে আসছে ততদিন সে কথা অম্লান ভুলে মেরে বসে আছে। তাই রান্নাঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল! ছিঃ! থুঃ থুঃ! অম্লান তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে, হনহনিয়ে হেঁটে এসে বড় রাস্তায় পড়ল।

হোটেলে খেয়ে হাত মুখ মুছতে মুছতে, সিগারেট চিবুতে চিবুতে যখন রাস্তায় নামল, তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্বাস গণল। অম্লানের হাতে ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজে। উঃ! বড্ড দেরী হয়ে গেল! অম্লান দ্রুত পা চালাল কোনও দিকে না তাকিয়ে। কিন্তু স্কুলে গিয়ে দেখল পরীক্ষা বসে গেছে, মিনিট পনের আগে।

প্রধান শিক্ষক অম্লানকে দেখে বললেন, যাক্ আপনি এসেছেন তাহলে! আমি ভেবেছিলাম, আপনিও বুঝি আজ এ্যাবসেন্ট হলেন।

অম্লান অস্বস্তি বোধ করল। কাচুমাচু হয়ে বলল, স্যার, আমি বুঝতে পারছি। আমার একটু লেট হয়ে গেছে। কিন্তু কি করব বলুন, আজ হোটেলে খেতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল!

—হোটেলে কেন! প্রধান শিক্ষক চশমা খুলে তাকালেন অম্লানের দিকে, বাড়ীতে অসুখ নাকি আপনার।

—না স্যার। আজ আমার স্ত্রী গেল বাপের বাড়ী, আমার শ্যালিকার বিয়ে।

—ও তাই বলুন।

প্রধান শিক্ষক চশমাটা নাকের ব্রীজে আটকে টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ তুলে নিলেন। তারপর আবার অম্লানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি 'এইট-বি' রুমে যান কাউকে না পেয়ে কেরানীবাবুকেই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম ঐ রুমে।

—আচ্ছা, স্যার।

হেড মাষ্টার লোকটাকে অম্লানের খারাপ লাগে না। অদ্ভুত বেলাজ ঠাণ্ডা করে কাজ করতে পারেন। আর সেই জন্যেই যেন দু-চারজন সহকারী শিক্ষক তাকে পেয়ে বসেছে। যখন ইচ্ছে আসে, যখন ইচ্ছে যায় অর্থাৎ শৃঙ্খলা বলে কোনও জিনিসই নেই। অম্লান তাড়াতাড়ি গিয়ে কেরানীবাবুকে পাঠিয়ে দিল অফিস রুমে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে চেয়ে দেখল। রুমটা তেমন বড়ো নয়। গোটা পঁচিশেক বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্র ডেস্কে মাথা গুঁজে লিখে চলেছে। অম্লান ডেস্কের ফাঁকে ফাঁকে এধার ওধার বেশকবার পায়চারি করল। তারপর দরজার পাশে লাগান চেয়ারে এসে বসল। বেশ লাগে অম্লানের এই পরীক্ষার সময়টা। সাধারণ অবস্থায় ক্লাসে গোলমাল থামাতে গিয়ে কী সাংঘাতিক চ্যাচাতে হয়। মাঝে মাঝে যেন গলা কেটে যায়। তবু গোলমাল থামে না। আবার নিজের ক্লাসের গোলমাল থামল তো, পাশের ক্লাসে কোনও কারণে মাষ্টার মশাই এর আসতে দুমিনিট দেরী হলে হট্টগোলের চোটে এ ক্লাসে পড়ান দায় হয়ে ওঠে। অথচ এই পরীক্ষার সময়। চ্যাচাতে হয় না, বকাবকি করতে হয় না, চাবুকের ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্নপত্র বিলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন অদৃশ্য যাদুমন্ত্রে সবকিছু নীরব হয়ে যায়। এই এত বড় স্কুল ঘর, প্রায় সাড়ে চারশ' ছেলে উপস্থিত, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে এখানে জন প্রাণী নেই। অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য। অম্লানের ইচ্ছে করে, এমনিভাবে অগাধ শান্তি বুকে নিয়ে যদি সারা বছর থাকা যায়! অগাধ শান্তির স্বাদে বুঝি আমেজ আসছে অম্লানের। চোখ দুটোর ওপর যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে কেন! নাকি এক মাস খিটখিটে ভাব নিয়ে কাটিয়ে আজ রুমটা পাওয়ার পর থেকে রুমের গায়ে ভলতীর ঘ্রাণ পেয়ে আবেশ লাগছে শরীরে। ভলতীর পাউডার মাখা বুকের ঘ্রাণ নাকে এসে লাগছে।

হঠাৎ বিসের যেন গণ্ডগোল উঠছে। চমকে চোখে তাকাল অম্লান। উৎকর্ণ হল। হ্যাঁ, পাশের ঘর থেকেই তো চ্যাচামেচির আওয়াজ আসছে। অম্লান ফট করে উঠে দাঁড়াল। পাশের ঘরে সিদ্ধার্থবাবু ইনভিজিলেশন দিচ্ছেন। চড়া গলায় কোন এক ছাত্র কথা কাটাকাটি করছে সিদ্ধার্থবাবুর সঙ্গে। অম্লান নিজের রুমের পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলল, তোমরা যেমন লিখছো, লিখে যাও, গণ্ডগোল কোরো না, আমি দেখি একটু পাশের রুমে কি হল।

অম্লান পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, প্রবীন শিক্ষক সিদ্ধার্থবাবুর চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। থর্ থর্ করে কাঁপছেন: তুই, তুই আমার গায়ে হাত তুললি সিধু!

বছর দশের বয়েসের সিধু অম্লানকে দেখেই গলা নামিয়ে ফেলল। তারপর অম্লানের দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার, আমরা আপনাকে সবাই ভক্তি করি কেন জানেন স্যার, আপনার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব নেই। সিধু হঠাৎ চপ করে অম্লানের পায়ে মাথা ঠেকাল। বলল, কিন্তু স্যার ঐ সিদ্ধার্থবাবু একটা শয়তান। আমরা সবাই ওকে ঘৃণা করি।

- স্যাট্ আপ্! নন্‌সেন্স: একজন বয়স্ক শিক্ষকের সম্পর্কে ও কথা বলতে তোমাদের লজ্জা করা উচিত। অম্লান নিজেকে সামলাতে পারল না, জোরে ধমকে উঠল।

হৈ হট্টগোল শুনতে পেয়ে ততক্ষণে হেডমাষ্টারমশাই এসে দাঁড়িয়েছেন ক্লাসের মধ্যে। উনি স্বভাব সুলভ গাম্ভীর্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সিদ্ধার্থবাবুকে, কি হয়েছে সিদ্ধার্থবাবু?

সিদ্ধার্থবাবু তখনও কাঁপছেন থর্ থর করে: স্যার, স্যাট্, স্যাউণ্ড্রেল হ্যাজ্ এ্যাসলটেড্ মী।

—হোয়াই। হেডমাষ্টার মশাই মুহূর্তে রুপ্ করে জ্বলে উঠলেন। হেডমাষ্টারের এমন অগ্নিমূর্তি এর আগে কোনও দিন দেখেনি। অবশ্য অম্লান নিজেও গর্‌গর্ করছে রাগে। অম্লান দেখল, প্রধান শিক্ষক মশাই আগুনে চোখে ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, তুই মাষ্টার মশাই-এর গায়ে হাত তুলেছিস্?

সিধু এবারও গলা চড়াল না। কিন্তু বড় স্পষ্ট করে বলল, স্যার, মাষ্টার মশাই-এর গায়ে হাত তোলা আমার অন্যায় হয়ে গেছে, আমি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি, কিন্তু উনি অন্যায় করলে কি শাস্তি দেবার কেউ নেই?

—ওঁর অন্যায় তোমরা কোথায় দেখলে? প্রধান শিক্ষক মশাই জিজ্ঞেস করলেন।

সিদ্ধার্থবাবু হাকড়ে উঠলেন, হ্যাঁ অন্যায় করেছি বৈ কী? চুরি চাদ বই-এর পাতা নিয়ে চুরি করছিলে, আমি সেগুলো তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অন্যায়ই তো করেছি। বাহবা, বাহবা।

সিধু তেমনিই প্রধান শিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, আমি বই-এর পাতা নিয়ে চুরি করছিলাম এ কথাও মিথ্যে নয়। কিন্তু উনি তো তার থেকেও অনেক বড় অন্যায় করেছেন—সেই জন্যেই তো—

—বলছি তো তোমাকে, কথা বাড়াচ্ছ কেন, স্পষ্ট করে বলো, ওঁর কী অন্যায় তুমি দেখলে? প্রধান শিক্ষক এবার গর্জে উঠলেন।

যারা ও রুমে পরীক্ষা দিচ্ছিল, তারা এতক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। ওঁদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার ওদেরই মধ্যে একজন কথা বলে উঠল। দশম শ্রেণী থেকে প্রথম হয়ে যে এবার একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ছে। সেই শুভ্রজিৎ সরকার। শুভ্রজিৎ উঠে দাঁড়াতেই প্রধান শিক্ষক মশাই ওর দিকে তাকালেন। অম্লানও ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল। পড়াশুনোয় তো ভাল নিশ্চয়ই, ব্যবহারের দিকে থেকেও ছেলেটি বেশ লাজুক, নম্র ও বিনয়ী। অম্লান ওকে জানে। অম্লানই ওদের সেকশনে ইংরিজি পড়ায়।

শুভ্রজিৎ সবিনয়ে বলল, স্যার, আপনার মুখের ওপর তো কই আমরা কোনও কথা বলতে পারি না। ঐ অম্লানবাবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁকে জিজ্ঞেস করুন একদিনও কি উনি আমাদের ক্লাসের কোন ছেলের কাছ থেকে দুএকবার পেয়েছেন। স্কুলের কোনও মাষ্টার মশাই তো এ কলঙ্ক আমাদের দিতে পারবেন না। অথচ সিদ্ধার্থবাবুর ওপরে কেউ সন্তুষ্ট নয় কেন? কথাগুলো বলে একটু থেমে শুভ্রজিৎ প্রধান শিক্ষক মশাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার ঐ সলিলের খাতাটা টেনে নিয়ে একটু দেখুন তো।

শুভ্রজিৎ ওর সামনের বেঞ্চির একটি বড় ছেলের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। প্রধান শিক্ষক মশাই ভ্রু কুঁচকে তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। অম্লানের দিকে একবার, একবার সিদ্ধার্থবাবুর দিকে তাকালেন। তারপর সলিলের কাছে গিয়ে ওর খাতাটা ডেস্ক থেকে তুলে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলেন: কই এর খাতার মধ্যে কোনও কাগজ-পত্তর নেই তো।

একাদশ শ্রেণীর প্রথম ছাত্র বলল, না স্যার তা বলছি না, আমি বলছি খাতাটায় লেখাগুলো একটু দেখুন তো, হাতের লেখা চিনতে পারেন কিনা।

হাতের লেখা! প্রধান শিক্ষক মশাই আবার চোখ রাখলেন ঐ খাতাটার পাতায়। মুহূর্তে মুখের রং বদলে

গেল। তবু খাতাটা জানলার কাছে আলোয় নিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সোজা সিদ্ধার্থবাবুর বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার এখনও তো পরত্রিশ মিনিট হয়নি পরীক্ষা হলার পর, এরই মধ্যে বারো পাতা এমন ছোট ছোট অক্ষরে লিখে ভরে ফেলল কি করে? হাউ স্ট্রেঞ্জ! তাছাড়া হ্যাণ্ড রাইটিংটাও তো—

—ইয়া স্যার, ওটা সিদ্ধার্থবাবুরই লেখা। সলিল মাসে একশ করে টাকা দিয়ে সিদ্ধার্থবাবুর কাছে প্রাইভেট পড়ে। তাই গোটাগুটি খাতাটাই সিদ্ধার্থবাবু বাড়ী থেকে লিখে নিয়ে এসে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন হলের মধ্যে। উনি ভেবেছিলেন, আমরা কেউ জানতে পারব না। শরজিতের মুখে রক্তিম রেখা।

—ও আই সী! ইংলিশ ফার্ষ্ট পেপারের কোশ্চেনও তো সিদ্ধার্থবাবুই করেছেন! প্রধান শিক্ষক মশাই গুম্ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের চুপ করে বসে পরীক্ষা দিয়ে যাবার উপদেশ দিয়ে, সিদ্ধার্থবাবু শিবু আর সলিলকে ডেকে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন গটগট করে। সিদ্ধার্থবাবুর ঘরে আবার কেরানীবাবুকে আসতে হল।

আর অজানের মুখ কালো হয়ে এল। নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে অসাবধানে চেয়ারে কাপড় লেগে ধরজার সঙ্গে বুকের ধাক্কা লেগে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ দিকের পাঁজরার একটা হাড়ে খটাং করে কী যেন লাগল। আচমকা ব্যথায় ঘাড় কাৎ করে বাঁ দিকে বুকটার ওপর চোখ পড়তেই অজান ভয়ংকরভাবে আঁৎকে উঠল, তপতীর গোল্ডক্যাপ কলমের ক্লীপটা জানলা দিয়ে গলে আসা আলোয়, গোখরো সাপের খল চোখের মত চকচক করছে। এর থেকে ঘুচ্ছিত চকচকে জলঘটা হারিয়ে গেছিল, সেইটাই তো ভাল ছিল।

•

কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে আমার বঙ্গভারতীকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজসভায় মনের মত করিয়া বিভূষিত করিতে পারিব, কি করিলে আমার বঙ্গসাহিত্যকে কালে ভারত-সাহিত্যে পরিণত করিতে পারিব, সকল প্রদেশের মনীষার ফলে বঙ্গভূমিকে ফলবতী করিতে পারিব—এই চিন্তা আমাদিগকে করিতে হইবে। বাহু প্রসারণ করিয়া সমগ্র ভারতকে আলিঙ্গন করিতে হইবে—আপনার বুকের মধ্যে টানিয়া লইতে হইবে—বাংলার রামপ্রসাদের করুণ সুরে নিদ্রিত গুর্জরের চৈতন্যসম্পাদন করিতে হইবে, আবার রাজপুতনার ভট্ট কবির উৎসাহপূর্ণ সংগীতের সঞ্জীবনমন্ত্রে বঙ্গসাহিত্যের কোমল প্রাণে নবীন আশার আলোক ফুটাইতে হইবে।

—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একক পদাতিক

অনিলকুমার বসুই

জানলের ওপর বার বার নিজের নাম লেখে অদিতা। নানা ছাঁদে, নানা আকারে নিজের নাম লিখে সে চেয়ে চেয়ে দেখে। নেহাৎ ছেলেমানুষী। তবু সকালবেলা এ ছেলে-মানুষী তাকে পেয়ে বসে। প্যাডের পাতা অবে যায়।

কালরাতে ঘরে ফিরে শুয়ে পড়েছিল। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, মনে নেই। কাপড় ছাড়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। পড়িয়ে পড়েছিল বিছানার ওপর। ফুল স্পীডে চালিয়ে দিয়েছিল সিলিং ফ্যান। ঘরের আলো নেভান হয়নি। ঘুমের মাঝে ছিল না স্বপ্নের মিছিল।

ট্যাক্সী ছোরে ছুটেছিল। ড্রাইভারের সিটে সরদারজীর চেহারা নিখর চুপ। রাস্তার ল্যাম্প পোষ্ট পিছিয়ে যাচ্ছিল এক একটা কটকায়। সামনের দিক থেকে ছুটে আসা গাড়িগুলোর হেড লাইটের আলো ওদের চান করিয়ে দিয়েছিল। সরদারজী কি যেন বলছিল, বোঝা যাচ্ছিল না। ট্যাক্সির ভুরভুরে পরিবেশের মধ্যে গা ডুবিয়ে দিয়ে অদিতা মুক্তির স্বাদ পেয়েছিল।

এ দু-কামরার ফ্ল্যাটটা তার একার। ভাবতেই তার বেজায় ভাল লেগেছিল। এটা তাকে জোগাড় করে দিয়েছিল শম্পা। সে নিজের নামে নিয়েছিল। সেদিন কে জানত, এখানে সে বাস করবে একা। এ ঘরের আর কোন দাবীদার নেই। যদিও সেদিন ছিল পুলকেশ।

চাকার দ্রুতগতির মাঝে কোথা হারিয়ে গিয়েছিল পুলকেশ। নামটা একবার মনের মধ্যে জেগেই মিলিয়ে গিয়েছিল। চলন্ত ট্রেন থেকে দেখা গাছ হয়ে যাওয়া টেলিগ্রাফের মত। ফ্ল্যাট, মুক্তি, গতি—সব কিছু মিলিয়ে নেশার ভাব এসেছিল তার মনে। কোন একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরতে পারছিল না—সব মিলিয়ে একটা আচ্ছন্নতা তাকে পেয়ে বসেছিল।

বাড়ি ফিরেছিল রাত করে। সুধা বলেছিল—কোথা ছিলে দিদিমনি, রাত এগারটা বেজে গেছে। কখন বাড়ি যাব?

সুধা তার বাড়িতে কাজ করে। একা একা'। দোকান বাজার রান্না বাসনমাজা সে একা করে। দুখোড় মেয়ে। পুলকেশকেও রেয়াৎ করত না। সুধা থাকলে বাড়ি সম্বন্ধে অদিতার কোন ভাবনা নেই। এক পাড়ায় বাসিন্দা। সারাদিনের পর রাতে সে বাড়ি ফিরে যায়।

ঘড়ির দিকে সে তাকিয়েছিল—এগারটা বেজে গেল। এতো সময় কি করে পালিয়ে গিয়েছিল, সে আন্দাজ করতে পারেনি। কোর্ট থেকে বেরিয়ে যে কোথা কোথা গিয়েছিল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। উকিলের হাসি হাসি মুখ মনে পড়েছিল। ভদ্রলোক খুব কর্মিং-কর্মা। দাদা ভূপতি বলেছিল—'এবার বাড়ি চ।' দাদার সংগে বৌদি এক সুতোয় বাঁধা। বৌদির চিপটেন কাটা করা সে জানতে পেরেছিল—এবার ওড়বার সুবিধে হবে। পুলকেশ বৌদির ভূত ভাই। ভূপতিকে সে সরাসরি না করে দিয়েছিল। সংগে মেলিও মত লেগে ছিল সুবীর। সে একটু নিরিবিলি চাইছিল। মনটাকে বাইরে টেনে এনে যোগ বিয়োগের অংক-ফল করতে চাইছিল। কিছুতেই সুবীরের হাত থেকে রেহাই পায়নি। বারবার সে তাকে বলেছিল—আজকের দিনটা তোমার সেলিব্রেট করা উচিত। সুবীর তাকে 'বারে' নিয়ে গিয়েছিল। ড্রিংক সে নিজে করেনি কিন্তু সুবীর সীন ক্রিয়েট করেছিল। কেঁদেছিল ব্যাঙের মত গাল ফুলিয়ে; ফিসফিস দিয়েছিল তার সম্পত্তির সোনার চূড়ো কত উঁচু; বলেছিল, এবার যেন সে একটা চান্স্ পায়।

সুধা বলেছিল—এখন খাবে?

—আমার খাবার চাপা দিয়ে বাড়ি চলে যাও।

দরজা বন্ধ করে সে খাটের উপর শুয়ে পড়েছিল উপুড় হয়ে। পায়ের এক পাটি চটি তখনো ঝুলন্ত পায়ে লেগেছিল। কি ভেবেছিল, মনে পড়ে না। একটা ছুটন্ত গাড়ি হঠাৎ সজোরে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। কি কোথা ছিটকে গেল বোঝবার আগে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বাইরে তখনো লোহের মত হালকা অন্ধকার ছড়িয়ে ছিল। করপোরেশনের আলো জেগে ছিল চুলু চুলু চোখে। পেঁচা শেষবারের মত ডেকে মিলিয়ে গিয়েছিল। চোখ মেলে অসিতা পড়েছিল খানিকক্ষণ। আলো জ্বলছিল ঘরে। গভীর অবসাদ জড়িয়ে ধরেছিল সারা দেহে। উঠে আলোটা নিবিয়ে দেবে তাও ভাল লাগছিল না। বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে আর একবার ঘুমোবার চেষ্টা করেছিল।

শেষে তাকে উঠতে হয়েছিল সুধার ডাকাডাকিতে। দরজা খুলে দিতেই কলকল করে উঠেছিল সুধা। এক রাশ প্রশ্ন একটার পর একটা করে গিয়েছিল না থেমে। ঢেউ এর পর ঢেউ এসে অসিতাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। সে মাটি পায়নি পায়ের তলায়। তারপর একটা বিচিত্র কলরব ফ্ল্যাটটাকে চাঙ্গা করে তুলেছিল। বেসিনের জল, বাটার খস্ খস্, বাসনের কন্ কন্, পেয়ালার টুং টাং—পি. সি. সরকারের যাদু কেতলীর মত সুধার দুটো হাত থেকে বিচিত্র শব্দের জলতরঙ্গ বাজতে লাগল।

—চা টা খেয়ে নাও।

অসিতা চায়ে চুমুক দেয়। মন বেশ ঝিরঝিরে হয়ে আসে। গ্রীষ্মের পর এক পশলা বৃষ্টি। ক-টা চিঠি লিখতে হবে। হোয়াট নট্ থেকে প্যাড ও কলম টেনে নেয়। কলমটা প্যাডের ওপর ছোঁয়াতেই তার নাম লেখা হয়ে যায়। অদ্ভুত ছেলেমানুষীর মত নিজের নামটা লেখে নানাভাবে। নিজের অনেক দিনের পুরোনো নামের মোহ তাকে পেয়ে বসে। অসিতা সরকার। সরকারকে নির্মমভাবে কেটে ফেলে কলমের খোঁচায়। তারপর লেখে কর চৌধুরী। পরম পরিতৃপ্তির দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে প্যাডের দিকে। অপার মমতা নিয়ে নবজাতকের দিকে চেয়ে থাকে নোতুন মা।

দেয়ালের ওপর নজর পড়ে। তার ও পুলকেশের ঘটো। পুলকেশের মুখে হাসির দীপ্তি। চকচকে চোখে আত্মতৃপ্তির ছায়া। শীতের সকালে ছবিটা তুলেছিল পুলকেশের বন্ধু নবনী। অসিতা ছবিটা দেয়াল থেকে নামিয়ে খাটের তলায় রেখে দেয়। দেয়ালের গায়ে ছবির ছাপ ধরে গেছে। কাপড় দিয়ে ঘষে ছাপ তুলতে চেষ্টা করে। একেবারে মিলিয়ে যায় না। দেয়ালের চেয়ে ছবির জায়গাটা অনেক বেশী সাদা। এক নজরে তফাৎ বোঝা যায়। আবার ঘষে কিন্তু একেবারে মুছে ফেলতে পারে না।

পুলকেশের অস্তিত্ব সে সাফ করে ফেলতে চায়। তার জীবনে পুলকেশের অনুপ্রবেশের কোন চিহ্ন সে রাখবে না। ঘটোর এ্যালবাম বার করে। নির্মমভাবে পুলকেশের ছবিগুলো পটপট করে তুলে ফেলে। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে দেয়। ঘরের এদিক ওদিক চায়। কাপড়ের আলনার নীচে একটা টাই উঁকি মারে। একটানে সেটা সে ছুঁড়ে দেয় বাথরুমে।

সুধা আসে। বলে—কি করছ দিদিমনি, আটটা বাজে, অফিস যাবে না?

অসিতা একবার ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নেয়। চোখের সামনে খারিজ করা লোকটার কোন অস্তিত্ব সে সহ্য করতে পারবে না। মনের কোটরে আলার সাপটা সিকলিকে জিব্ বার করে হিসহিস করে। এ ফ্ল্যাটে জেনানা মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। তবু তার চোখ দুটো দেয়ালের চৌকো সাদা জায়গায় লেপটে যায়। খুনের পর খুনী ফুরে ফিরে খুনের জায়গায় ফিরে আসে।

সুধা আবার ডাকে—দিদিমনি!

—চ', যাচ্ছি।

বাথরুমে ঢুকে অসিতা একবার ঘড়ি দেখে। পৌনে ন-টা। আজ আর কেউ কথতে পারবে না। এ কথাটা মনে পড়তেই মনটা খচ খচ করে। সে মারচেন্ট অফিসের টেনো। তার বস তালুকদার ঘড়ির কাঁটাকে ভীষণ মূল্যবান মনে করে। একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেলে লেট-কে বুড়ো আঙুল দেখান যায়। কিন্তু এ সময়ে ট্যাক্সি পাওয়া তখৎ-এ-তাউসের সামিল।

সব ব্লাশ পুলকেশের ওপর পড়ে। সকালটা বেশ সুরু হয়েছিল। মেজাজ ছিল সরিফ। পাতের ওপর মাখনগুলো মনকে আরিয়ে এনেছিল নেশার ঘরে—ভালবাসার নেশা। ফটোটাই সব বিগড়ে দিয়েছে। মন ভেতো হয়ে গেছে চায়ের লিকারের মত। তার ওপর এই সেট।

তার গায়ের কাছে একটা ট্যাক্‌সি থামে। চমকে সে দু পা সরে যায়।

—এাই, উঠে পড়।

—তীরেন্দু।

—চটপট। তীরেন্দু তাড়া দেয়।

অসিতা ট্যাকসির খোপে ঢুকে পড়ে। তারা যখন বাগবাজারে থাকত তখন তীরেন্দুর সঙ্গে সুরু হয়েছিল আলাপচারী। সেই উঠতি বয়েসে তীরেন্দুর দিকে সে দু-এক পা এগিয়েছিল। বাছাই করার মত মানসিক প্রস্তুতি তখনো গড়ে ওঠেনি। লিপস্টিক এবে এসে, বাচ্চাদের নোতুন দাঁত ওঠার মত, নিজের বাজার দর যাচাই করছিল। তীরেন্দু ছিল বোকাসোকা। বুলকো লাগা ছেলের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত।

—কনগ্রাচুলেসন।

—হঠাৎ!

—পুলকেশ তোমাকে মুক্তি দিয়েছে।

—কথাটা ভুল বললে।

—মানে একই, তুমি পুলকেশকে ডিভোর্স করেছ।

—তুমি কোথা থেকে জানলে?

—যাই হোক। পুলকেশ আমার অফিস কলিগ না।

তীরেন্দু হাসে দরাজ গলায়। সিগারেটের টুকরোটা রাস্তায় ফেলে দিয়ে জল জলে চোখে তার দিকে ঘাড় ফেরায়। চোখা মুখ, চোখা চোখ। তীরেন্দু কোনদিন মোটা ছিল না। পুরোপো তামার পয়সার মত গায়ের রঙ। চওড়া হাড়ের ওপর নি-চর্বি মাংসের ছাউনি। বাঁ হাতের কবজির ওপর চওড়া ব্যাণ্ডের ঘড়িটা যানান মাফিক। নিখুঁত পোষাকের নীচে আলেকার বোকামির কবর হয়েছে।

অসিতা বলে—কোথা চলেছ?

—অফিসের কাজে পড়িয়ার যাব। ট্যাক্‌সিটা ধরে নিলুম। কোথা নাববে?

—রাজভবনের সামনে। তুমি এখন বেশ স্মার্ট হয়েছ।

—তার মানে বলছ, আগে ভক্তভরত ছিলুম! সে সব বস্তা-পচা এপিসোড তোমার মনে আছে, দেখছি। বেশ বোধ হয় আদ্ ওয়ার ফুলস্—নয় কি?

অফিসের সামনে অসিতা নেবে যায়। তার ঠিকানা নেয় তীরেন্দু। বলে—আবার দেখা হবে।

অসিতা তার ঘরে যায়। কি রকম চোখে সকলে তাকায় তার দিকে। সে কারো দিকে ঘাড় না ফিরিয়ে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায়। দু-একটা টিকা-টিপ্পনী কানে আসে। ওসব কথায় তার কিছু আসে যায় না। ওদের ব্যাপ বিদ্রূপ মাড়িয়ে চলার মনোবল তার আছে।

সে চিঠিটা তালুকদারের টেবিলে রাখে। চিঠিটা পড়ে তালুকদার মাথা তোলে। তার টাকের ওপর আলো ঝলমল করে। ক-গাছা শাদাটে চুল শীতের রুট পাতার মত বাতাসে কাঁপে। ডাইধার থেকে নীচে ধোঁয়া বের হয়।

অসিতা বলে—সরকার কেটে কয় চৌদুরী করে দেবেন, ওটা আমার বিয়ের আগের পদবী।

তালুকদারের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পরে বাতি ফিউস্ হবার মত আস্তে আস্তে নিবে যায়। ওপর মাড়ির ফলস্ দাঁত ঝুলে পড়ে নীচে। ঠিক করে বসিয়ে নিয়ে তালুকদার বলে—এ্যাড্রেস চেঞ্জ হবে না?

—না।

—কোথা থাকেন?

অসিতা ঠিকানা বাতলায়।

—একা?

—হ্যাঁ।

—যাক, ক-টা ডিকটেশন নিতে হবে, তৈরী হয়ে আসুন।

ছুটির পর সে ফুটপাতের ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। চারধারে লোকের ভীড়। সকলেই ছুটে চলে। সে দেখে। নিরাসক্ত দৃষ্টি। কাকেও বিশেষ করে নজরে পড়ে না।

চোখের সামনে দিয়ে বাস যায়, ট্রাম যায়, মানুষ যায়। একটা চলন্ত গতিশীলতা গড়িয়ে চলে। তার মনে হয়, সে এদের থেকে অনেক দূরের মানুষ! পৃথিবীর এক কোণে সে দাঁড়িয়ে আছে একা। নির্লিপ্ত ভাব তার সারা দেহে মাখান। নীরব দর্শকের ভূমিকা তার।

ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে অচেনা জগতের মাটি মাড়িয়ে সে ময়দানে আসে। ঘাসের ওপর শরীর ছড়িয়ে বসে। কোন একটা বিশেষ চিন্তা তার মাথায় আসে না। এক তাল নানা ভাবনা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে মনের উঠোনে। কাল এ সময়ে সে ঢাকা ছিল উত্তেজনার পুল-ওভারে। একটা দুরন্ত বন্যো হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল মনের আকাশে। চিন্তাগুলো সজীব হয়ে নড়ে বেড়াচ্ছিল খালুই-এর কৈ-এর মত। মনের ওয়েলায় এক ঘুরপাক খাচ্ছিল এলোমেলো বাতাসে। কিন্তু আজ তার বাছিম গতি। এখানে বসে থাকতে ভাল লাগে না। পাতলা অন্ধকারের ওড়না ছড়িয়ে পড়ে ঘাসের ওপর। নানা কথার বেলায় শব্দ হারিয়ে যায়। নীরব প্রতিচ্ছবির মত সে বসে থাকতে চায় না। কোন জায়গায় যেতেও ইচ্ছে করে না। হ্যাটে এতো তাড়াতাড়ি ফেরার কথা ভাবা যায় না। বুলা-সমীরা-বিনাথায় বোর্ডিং হাউসে যাওয়া যায়। কিন্তু ওখানে ভীষণ গোলমাল। মেয়েগুলো এতো চেঁচামেচির মধ্যে কি করে নিশ্চিন্ত আরামে থাকে, সে ভাবতে পারে না। ঝুপড়ির ওখানে যেতে পারে। কিন্তু বৌদির মেয়েলি ঈর্ষা অসহ্য। আচ্ছা, সে ভাবতে চেষ্টা করে, দাদা বৌদির সঙ্গে দিনের পর দিন বাস করে কি করে? বৌদিকে তার ভীষণ খারাপ লাগে। গায়ের চামড়া কটা—এ ছাড়া বৌদির আর কিছু নেই। কালচার তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। চিন্তাধারা দিদিমা-ঠাকুরমার আমল থেকে আমদানি করা।

মাথাটা তার হালকা লাগে। বৌদির চিন্তা তার মনকে লঘু করে। মনের গুমোটভাব কেটে যায়। ঘড়ি দেখে—আটটা বাজে। মাঠ শুয়ে আছে অন্ধকারে। ধারে কাছে ফিস ফাস শব্দ। কালো কালো রহস্যময় ছায়া। ঘুম থেকে জেগে ওঠে কিউরিড।

বাড়িতে ফিরে আসে। সাওয়ারের নীচে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা জলের ধারা ঝরে পড়ে। শরীরের শিথিলতা দূর হয়। মনটা বেশ চাঙ্গা লাগে। সুধার সঙ্গে ছোট ছোট কথা হয়। খুব সাধারণ কথা। এতো চাপা যেন নিজের কানে শোনা যায় না। সুধা চলে যায়। শোবার ঘরের আলো জ্বালে। মেয়ালের চৌকো ফাঁকটা চোখে পড়ে। সকালের রাগ এখন চামড়ার নীচে জ্বালা ধরায় না। হঠাৎ ভীষণ একা লাগে। এ পৃথিবীতে তার কেউ নেই। ঘরের দেয়ালগুলো নিরেট নির্জনতায় ভরা। এতো জমাট বাঁধা নীরবতা যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে।

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ে। পুলকেশের চিন্তা তার চারপাশে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়। ওকে সে কবরের নীচে ঢাকা দিতে চায়, তবু বার বার ও অসিতার মনের পরদায় হালকা হাওয়ার মত নাড়া দিয়ে যায়।

ভাবতে ভালো লাগে না সে পুলকেশকে ভালবাসত। বৌদির ভূত-ভাই পুলকেশ। ওদের ভবানীপুরের বাড়িতে আসত। ওরা দুজনে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করেছিল, ওদের দুটো মন একটা জায়গায় এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তার নাম ভালবাসা।

ঝুপড়ি আপত্তি করেছিল—পুলকের সঙ্গে অসিতার বিয়ে হতে পারে না।

বাসি তাড়ির মত বৌদি ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল—পুলকের খারাপ কিসে?

—ওর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা কানে এসেছে।

—বিয়ের আগে ও রকম কিছু কিছু কথা সব পুরুষের নামে শোনা যায়।

—এ সব জেনেশুনে এ বিয়েতে আমি মত দিতে পারি না।

ঝুপড়ির মতামতের জন্য অসিতা অপেক্ষা করেনি। ভালমন্দ বোঝার বয়েস তার হয়েছিল। তা ছাড়া সে দাদার অধীন নয়। নিজের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা তার ছিল। মার্চেন্ট অফিসের চাকরিটা তার বুকে বল সঞ্চার করেছিল।

বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে পুলকেশের আসল রূপ ধরা

পড়ল। সে জানু নারী দেহের পেছনে ঘুরে বেড়ায়, অসিতা জানত না। রাতের পর রাত বাইরে কাটাত। প্রথম প্রথম কিছু ভয়, কিছু লজ্জা ছিল, পরে একেবারে বেপরোয়া। একদিন একটা মেয়ের হাত ধরে চলে এলো ফ্ল্যাটে। পুলকেশের সাহস দেখে সে অবাক। তিল তিল করে জমে ওঠা ঘৃণাটা ফেটে পড়েছিল বিস্ফোরণের মত। মত্ত পায়ে আরো এগিয়ে এসেছিল পুলকেশ, এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে ঢুকে পড়েছিল ঘরে।

সে রাত কি করে কাটিয়েছিল, সে আজ আর ভাবতে পারে না। পুলকেশ যে ভাবে তার ভালবাসাকে হত্যা করেছিল, তাতে সে বোবা হয়ে গিয়েছিল। গলা দিয়ে একটা স্বরও বার হয়নি, চুপ করে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। রাত কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল।

পুলকেশকে বলেছিল—তুমি আর এখানে আসবে না।

—কারণ?

—তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি ডিভোর্স স্যুট ফাইল করব।

পরে পুলকেশ তার কাছে বার কয় এসেছিল, সে পাত্তা দেয়নি। সে রাতের অপমান একটা জলন্ত ছুরির ফলার মত তার মনে বিঁধে ছিল। সেদে পুলকেশকে একটা ভিখারী মনে হত। যার প্রতি অনুকম্পা দেখান যায়, বিছানায় ভাগীদার করা যায় না। ও রকম করুণ বিষন্ন মূর্তি সে জীবনে দেখেনি। মাঝ দরিয়ায় ডুবো জাহাজের নাবিকের মত দিশেহারা, রিক্ত, নিঃস্ব। ওর মূর্তি হানা দিত তার স্বপ্নে। সে আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত। হাতে যদি তার কেউ বন্দুক তুলে দিত, সে পুলকেশকে গুলি করত হাঁসের কুকুরের মত।

তবু এ রাতে, এ বেয়াল মেয়া ঘরের মধ্যে সে নিজেকে বড় একাকী ভাবতে থাকে। পৃথিবীতে কেউ নেই—এ চিন্তা মনকে ভীষণ দুর্বল করে দেয়। কি রকম একটা ভয় শিরশির করে ছড়িয়ে পড়ে দেহের চারধারে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়।

এভাব সে কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করে। সারাদিন অফিসের কাজে ডুবে থাকে। কোন চিন্তাকে সে ধারে কাছে আসতে দেয় না। ধীরে ধীরে মনের চারপাশে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলে।

মাঝে মাঝে সুবীর আসে। ছুটিছাটার দিনে এদিক ওদিক ঘুরে আসে। সুবীর পাশে পাশে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। আবোল তাবোল কত কি যে বকে যায়।

—তুমি কি এভাবে জীবন কাটিয়ে দেবে?

—মন্দ কি।

—এ রকম একা একা থাকতে ভাল লাগে?

—খারাপ কি।

—এ জীবনের পরিণাম কি ভেবেছ?

—লাভ কি!

—এভাবে সব তাতেই পাশ কাটিয়ে যাবার মানে কি?

—মানে নেই।

—তবে?

—তবে কি?

—শোন, জেগে ঘুমোলে মানুষের ঘুম ভাঙান যায় না। তুমি একজনের ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে নিজের ওপর অত্যাচার করছ।

—ধীরে, সুবীর ধীরে তোমার মনের ভাব বোঝবার মত বুদ্ধিশুদ্ধি আমার আছে। তোমাদের সংঘে ছুদিন ঘোরাফেরা করলেই তোমরা একটা বিশেষ চিন্তা করতে সুরু কর। বলত, মেয়েদের দেহ বাদ দিয়ে ভালবাসার কথা চিন্তা করতে পার?

—রাম বিহীন রামায়ণ হয়? আত্মাবিহীন দেহ? দেহ ছাড়া ভালবাসা হয়? তাছাড়া দেহকে অত বড় করে ভাব কেন? দেহের চাহিদা আছে বলে তোমার পেছনে আমি ঘুরে বেড়াই, না হলে কে এ বেহদ্দ করত? জানতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্যি।

—তোমার ফিলসফি বন্ধ করবে?

—আমার কথাটা একবার ভেবে দেখো।

সুবীরের কথাগুলো মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে। বড় লোকের ছেলে। নিজের সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা করার কিছু নেই। তার চোখ সব সময় অসিতার কাপড়ের নীচের দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে, সে জানে। পুলকেশ তাকে

ঠকিয়েছে আজ তার ভাবতে ঘৃণা হয়, পুলকেশের দেহের স্পর্শ মিশে আছে তার রক্তে। পুরোনো রক্ত বের করে দিয়ে নোতুন রক্ত তার দিলে, তবে তার নিষ্কৃতি পুলকেশের নোংরা স্পর্শ থেকে। সে ভুল সে আর করতে চায় না। যুবতীর ধর্মনি তার অজানা নয়। দেহের চাহিদাকে সে অস্বীকার করে না, জৈবিক প্রয়োজনের মূল্য সে বোঝে, তবু যুবতীকে সে গ্রহণ করতে পারে না। শুধু দেহকে কেন্দ্র করে জীবন গড়ে তোলা যায় না। পুলকেশকে সে তার দেহের সবর অন্দরের দখল দিয়েছিল, তবু সে চলে গেল বাজারের পাইকারী হাটে।

রাতে যখন কোনদিন ঘুম ভেঙে যায়, ঝর ঝর করে জলের ধারা করে পড়ে সার্সির ওপর, বিদ্যুতের আলো ঘরের অন্ধকারকে ফালা ফালা করে, তখন সে অনুভব করে, তার দেহটা সতেজ ফলের মতো উন্মুখ। বিছানায় এপাশ ওপাশ করে; পাশ বালিশটাকে জাপটে ধরে অকারণে; দেহের বালির চড়ায় চকমকা ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়ে। বিছানাকে মনে হয় প্রাণহীন; পাশ বালিশ যেন নড়ার দোসর; ঘরের অন্ধকার যেন বিষমনী পাথর। বিছানা থেকে ওঠে; জন্মদিনের পোষাকে জানলার কাছে দাঁড়ায়; উন্মত্ত হাতে হাসি খোলে। জলের ছাট ইল্‌সে গুঁড়ির ধানা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে তার সর্বাংগে— একটা তৃষ্ণা গাছের মূল আকণ্ঠ জলপান করে।

তালুকদারের খাস কামরায় তাস পড়ে অসিতার। সকলের নজরে পড়ে তালুকদারের ঘন ঘন তলব। অজান্তে প্রত্যেকে কি যেন বলতে চায় চোখের কোণে। হাসি হাসি চোখগুলো বলতে থাকে—আমরা সব বুঝি। অসিতার মাংসের নীচে একটা ভয় একবার উঁকি মেরে মিলিয়ে যায়।

তালুকদার বলে—বসুন, মিস্ কর চৌধুরী!

অসিতা চেয়ার টেনে নিয়ে টেবিলের সামনে বসে। তালুকদার পায়চারি করে। হাতে জলন্ত সিগার আর ঘন ঘন টান দেয়। এটা ওর অভ্যেস, অসিতা জানে। ধীরে ধীরে পা টেনে টেনে চলাফেরা করতে করতে ডিকটেশন দেয়। কখনও ঝুঁকে পড়ে ঘড়ের কাছে। নিঃশ্বাস লাগে ঘাড়ের আধুর অংশে। ঘাড় ফেরালে চোখে পড়ে, বিরাট টাক, তার নীচে মোটা রোমশ ভুরুর তলায় দুটো শান্ত চোখ।

তালুকদার থেমে যায়। বলে—কাজ আর ভালো লাগে না, মিস্ কর চৌধুরী। সারা জীবন কাজ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

—আর কতদিন আছেন?

—লং টাইম ইয়ারস্। ফীল লোনলি, বুঝলেন এক এক সময় ভীষণ একা লাগে। ফ্যামিলি ম্যাটার, তবু আপনার কাছে বলতে হেসিটেট করব না, সংসারে আমি এখন একটা মানি মেকিং মেসিন ছাড়া কিছু নয়।

—এ আপনি কি বলছেন?

—আমার মত বয়েস হলে, বুঝবেন। আপনাদের, আই মীন মেয়েদের, একটা সংসার থাকে কিন্তু আমরা সংসারের বাইরে পড়ে থাকি। মিসেস সংসারের মধ্যে হারিয়ে গেছে। আই হ্যাভ সাম ওয়ান্টস বাট সী ডাজ্ নট বদারস্ হার হেড এবাউট ইট।

অসিতা চুপ করে থাকে। এ পরিস্থিতিতে কি বলা উচিত, তার জানা নেই। তাছাড়া তালুকদার কেন এ সব কথা বলছে, তার পূর্বাপর সূত্র সে খুঁজে পায় না। ঘরে পোড়া চুরুটের গন্ধ থিতিয়ে থাকে। গা কেমন করে।

—ডু য়্যু নট ফীল বোরড্?

আচমকা প্রশ্নে অসিতা বলে—আমি!

—ইয়েস, য়্যু মীন এ লোনলি লাইফ্। য়্যু মাই ফীল বোরড্। ইটস্ ইন এক্সিটেবল। আপনাকে কোন জবাব দিতে হবে না—ইওর ডেরি এ্যাপিয়রেন্স স্পীকস্ আউট অফ ইট্‌স।

হটফট করে অসিতা—এ আপনি কি বলছেন?

—এ সত্য, একান্ত সত্য। বাট ডাজ ইট ফীল আওয়ার সেলভস্?

—কি বলতে চান আপনি?

—হ্যাভ এ প্লেজার ট্রিপ ফার এ্যাওয়ে ফ্রম অফ ডীন এণ্ড সাইল অব অফ সিটি।

অসিতার অনেক দিন আগের একটা ছবি মনে পড়ে। সিনেমার দেখা খানী যুদ্ধের ছবি সরে গেল, বেরিয়ে এল যুবমন পিস্তল হাতে—চোখে হিংসা, মুখে ক্রুরতা, পায়ে বাঘের দৃঢ়তা।

অসিতা যে যুক্তি কামনা করেছিল তা সে পায়নি। যুবীর ও তালুকদার তাকে দু পাশে টেনে নিয়ে যায়। সে একটুও থামার সময় পায় না। যুবীরের সেই এক কথা, সে তাকে বিয়ে করতে চায়। তালুকদারের ইচ্ছে, সে তাকে সংগ দিক। বাড়ীর নিঃসংগতাকে অসিতার সংগ দিয়ে পূরণ করতে চায় লোকটাকে সে রীতিমত ভয় করে। নির্জন রাস্তার পাশে বসে থাকতে থাকতে সে আশংকা করে, হয়ত তালুকদার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এবং সে অনুভব করে, পুলকেশ যতদিন ছিল, এ সবের উৎপাত ছিল না। জীবনের এ দিকটার সংগে তার পরিচয় ছিল না। একক জীবনে যে নানাদিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে, সে ভাবতে পারেনি।

বরাবর সে সুন্দরী। তার দেহের জ্যামিতিক পরিমিতি পুরুষের চোখে আগুন জ্বালে? প্রথম যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। হঠাৎ ভূমিকম্পে তার দেহে যে নারীভূমি উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছিল তা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছিল। সে অসীম আনন্দ পেত; ভালবাসা জাগত নিজের শরীরের ওপর।

আজ সে অস্বীকার করতে পারে না, পুলকেশ তার শরীরটাকে ছোঁবার জন্যে কি রকম ব্যাকুল হয়ে উঠত। নানা অজুহাতে সে চাইত তার শরীরটাকে একবার ছুঁয়ে যাবে। সে পুলকেশকে নিয়ে খেলা করত। তাকে খুব ভালো মনে হত। তাকে খেলিয়ে সে আনন্দ পেত। তার জোড়ায় শরীরটা নেওটি ইঁদুরের মত হয়ে যেত। তার ভাব হয়ে ইচ্ছে মত সে তাকে খেলাতে পারত। তবু পুলকেশ যখন খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়াত, তখন তার দেহ টান্ টান্ হয়ে উঠত ছিলে দেওয়া ধনুকের মত।

তালুকদার কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলে—হাউ বিউটিফুল য়ু আর!

তালুকদারের তার হাত স্টিয়ারিং চেপে ধরে। বাঁ হাত অস্থির হয়ে ওঠে। ছটফট করে। নিরাশ্রয় হাতটা কিছু একটা চেপে ধরবার জন্যে নিস্পিস্ করে। অসিতা দেখে, একটা লোমশ হাত যন্ত্রণায় কাতরায়।

যুবীর বলে—ও লোকটা কে?

—আমার অফিসের বস্।

—কি চায়?

—তুমি যা চাও।

যুবীরের শরীরটা বেড়ালের মত ফুলে ওঠে। বলে—আই হ্যাভ কীল দিম!

অসিতার মনে হয়, সমস্ত পৃথিবী শত্রুতে ভরে গেছে। তাদের লালচে চোখে মাংসের ক্ষুধা ধারাল ঠোঁটে লালসা ঝরে পড়ে। তার সর্বাংগে সে হাজার ঠোঁটের আক্রমণ অনুভব করে। লম্বা লম্বা নির্লোম গলা এগিয়ে আসে তার দিকে। ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে।

তার মাথা ঘুরে যায়। সব সময় যেন ছায়া দেখতে পায় তার পাশে। দুটো বাইসন তার দিকে তেড়ে আসে। রাতে ঘুমের ঘরে ভয় পেয়ে সে উঠে বসে থাকে। মনে হয়, কে কারা যেন ঘরের মেঝেতে চলাফেরা করে। মাথার বালিশটা দু হাতে সামনে তুলে ধরে। যেন কার আঘাতকে প্রতিহত করার চেষ্টা করে।

সুধা বলে—দিদিমনি, তোমার কি হয়েছে?

—কিছু না ত।

—তোমার শরীর যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

—না, না, তা হবে কেন!

এতো বড় পৃথিবীতে কি একটু নিরুপদ্রব আশ্রয় পাওয়া যায় না? যেখানে থাকবে না ভয়, লোভ, দেহের চাহিদা? একার নিরিবিলি জীবন কাটাতে পারবে না? পৃথিবীতে যে এতো বাঘ ছিল, জানা ছিল না তার। সে বাঁচতে চেয়েছিল নোঙর করে।

ঘরে ঢুকে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। তীরেন্দু বসে আছে। আরো একটা শয়তান। তার একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে আরো একটা মাংসলুব্ধ এসেছে তার ঘরে। হঠাৎ একটা ঘামের গরম স্রোত তার চেতনায় ধাক্কা মারে। ভীষণ

ভয়ের কালো ছায়াটা যেন কোথা কোন অন্ধকারে লুকিয়ে পড়ে। দুর্বার সাহসের দুরন্ত শক্তি যেন তার মরা মনকে, নিভন্ত আগুনের মত, ফোকার দিয়ে খুঁচিয়ে তোলে।

তীরেন্দু বলে—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

অসিতা আগুনের গোলার মত ফেটে পড়ে—কি চাই তোমার?

অবাক তীরেন্দু। বলে—কি বলছ!

—আমি কি পাবলিক ওয়ান? তুমি চলে যাও।

—তুমি কি পাগল হলে?

—তোমরা আমাকে পাগল করে তুলেছ। আচ্ছা, আমাকে জবাব দিতে পার, কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে? একা থাকতে চেয়েছি—এই আমার অপরাধ। তোমরা কেন আমার দেহটা নিয়ে ছেঁড়াছেঁড়ি করছ?

—এ সব কি বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলছি। তোমাদের চিনতে আমার বাকী নেই। তোমরা আমাকে নিষ্কৃতি দাও, আমাকে বাঁচতে দাও।

অসিতা আর সামলাতে পারে না। বাকল উত্তেজনায় সে কাঁপতে থাকে। চোখে তার জল এসে যায়। দুচোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে।

তীরেন্দু কি বলবে, কি করবে ভেবে পায় না। অসিতার চোখের জলের কোন কারণ বুঝতে পারে না। তার এরূপ তীরেন্দুর কল্পনার অতীত। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে—আমি যাচ্ছি।

অসিতা তাকায় তার দিকে গালের ওপর জলের দাগ চিক্ চিক্ করে। সে শুধু বলে—না বসো।

সে ভেতরে চলে যায়। মুখ ধোয়। ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা মনের অস্থিরতা মুছে দেয়। বোকা তীরেন্দুকে মনে পড়ে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বুঝতে পারে, তীরেন্দু ভয়ের বস্তু নয়। সে সহজ হয়। স্বাভাবিক ভাবে ঘরে ফিরে আসে।

অসিতা বলে—চা খাবে?

—না। এবার আমি যাব।

—কেন, দেরী হলে বৌ বকবে?

—বিয়ে করিনি।

—তবে বসো। চা না খেয়ে গেলে আমার রাগ করবে।

তীরেন্দু আর কোন আপত্তি করে না। অসিতা উঠে যায়। সে ঘরের চারধারে চোখ বুলিয়ে নেয়। সে চৌকো আয়নাটা চোখে পড়ে। সে বুঝতে পারে, ওখানে কোন ছবি ছিল, সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চা ঢালতে ঢালতে অসিতা বলে—আমাকে বিয়ে করবে?

তীরেন্দু চমকে ওঠে। অসিতার দিকে তাকায়। মাথা হেঁট করে সে চা ঢালে। মুখের সবটা দেখা যায় না। কি বলবে, তীরেন্দু ঠিক করতে পারে না। এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে, সে ভাবতে পারেনি। অসিতার আচরণ অদ্ভুত লাগে।

—চুপ করে আছ যে?

—এ কথা আগে ভাবিনি. কি বলব ভেবে পাচ্ছি না

এরপর আর কোন কথা হয় না। তীরেন্দু চায়ের কাপে চামচে নাড়ে। অসিতা বসে থাকে। ঘরের কথা ঘরে যায়। দুজনের মনে হয়, একটা নির্জন দ্বীপে দুটো মানুষ সামনা সামনি বসে আছে, যারা পরস্পরের কাছে একান্ত অপরিচিত।

তীরেন্দু ওঠে। বলে—কাল সকালে আসব।

অসিতা সারারাত জেগে থাকে। তীরেন্দুকে কেন সে এমন কথা বলল, জানে না। নিজের জীবনকে সে একবার মেলে ধরে। ঘটনাগুলো বার বার ভেবে যায়। মুক্তি সে চেয়েছিল কিন্তু কেন পাচ্ছে না? চার পাশের পরিবেশগুলোর জন্যে সে পেছিয়ে যাবে? এতো বড় পৃথিবীতে নির্ভয়ে থাকতে পারবে না?

সকালে তীরেন্দু আসে। বলে—অসিতা, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি।

—না।

—কিসের না?

—এ বিয়ে হবে না।

—কেন?

—তার পেয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।
—কিন্তু বাঁচতে গেলে বিয়ের প্রয়োজন আছে।
—বাঁচার চেয়ে জীবন বড়।
—এই তোমার শেষ কথা ?
—হ্যাঁ।

ভীষেন্দু তাকিয়ে থাকে অদিতার দিকে। অদিতার মনে হয়, এর আগে সকালের এত আলো তার চোখে পড়েনি রাত্রির কালো অন্ধকার কোথা লুকিয়ে পড়েছে। বেডালের চোখের আয়নাটা মিশে গেছে বেডালের সঙ্গে—আর তা চোখে পড়ে না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই Bergson-এর, একটা গভীর দার্শনিক তথ্য নিয়ে তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন।

তিনি ভাবছেন আজকের মত এ জগৎটা ঠিক এমনিই কি আকাশে হঠাৎ জেগে উঠেছিল ?

·· তাঁর স্ত্রী এলেন কাছে, মিনতি করে বললেন—অনেক রাত্রি হোল, শোবে চল

স্ত্রীর কথাটা যেন নূতন শোনাল Bergson-এর কানে। পঁচিশ বছর আগের সেই তরুণী মেয়েটি কি এখন তার এই স্ত্রী ! এই পরিবর্তন !

—কোটা evolution হয়েছে তা হ'লে। জগতেও তা হবে না কেন ?

তিনি তাঁর দার্শনিক গ্রন্থের এবার নাম দিলেন—Creative evolution এবং এই বইটির জন্যই তিনি ১৯২৭ সালে সাহিত্যে Noble Prize পেলেন। এ কৃতিত্ব তাঁর স্ত্রীর।

অংক

নরেন কুমার রায়

ভোরের আলো না ফুটতেই উঠে পড়ে অজয়। বারান্দায় এসে পায়চারি করতে করতে কি যেন ভাবে। ইদানীং তার মনেরও তেমন ঠিক থাকে না। শরীর অসুস্থ বোধ হয়। হাতে পায়ে জোর কম। একটা বিষয় ভাবতে গেলে আর একটা বিষয় এসে জট পাকায়।

মায়ার যেন কি হয়েছে। সব সময় শুয়ে থাকে। মাসখানেক আগে কি একটা ওষুধ আনতে বলেছিল,—কাগজে লিখে। মনে নেই অজয়ের। না বলতে পারেনি। বলেছিল এনে দেবে। মা চশমা পালটানোর জন্য রোজই অনুযোগ করেন। কান দিয়ে শোনে অজয়। এখন চশমা দেখে ও মনে একটু সোয়াস্তি, সহায়তা, সেবা, ঘর নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। মায়ার বিয়ে দেওয়া যাবে না—চির কথা। হাল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে,—চেষ্টা করে করে। সোমার বয়স কম। কিছুদিন ঘরে রাখা চলবে। অজয় জানে, বোঝে। উপায় খোঁজে। মা আছেন সব কিছু থেকে দূরে, চোখ বোলায় মায় মুখের উপর। ওর মনে হয় মায় মুখটা স্নিগ্ধ এবং করুণাময়।

অজয় পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। সোমা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে একটা খাতা। বুঝতে না পেরে অজয় তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বড় বড় চোখ সোমার। গায়ের রঙ মাজা মাজা ফরসা। মুখের ভেতর চোখ দুটোই সার। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মুখশ্রীতে যাদু আছে, যেন বৃষ্টি ভেজা সবুজ পাতার ওপর একটুখানি জ্যোৎস্না। অজয় একটু রুক্ষ স্বরে বললে,—"কি, সোমা কিছু বলবি?"

সোমা খাতাটা উঁচু করে বললে,—

"আমার এই অংকটা এখুনি মিলিয়ে দিতে হবে।"

ঘুম না হওয়ায় মাথাটা ঝিমঝিম করছে। স্নান কাল তুলে অজয় চেঁচিয়ে উঠল,—

"সাত সকালে আর কাজ পেলি না? অংক নিয়ে এসেছিস? কাল থেকে আর স্কুলে যাবি না। ছেড়ে দিবি। আমার পক্ষে আর টানান সম্ভব নয় ···।"

সোমার চোখে মুখে একটা ত্রিষ্টভাব ফুটে উঠছে। এখনই তার অংকটা উদ্ভাসিত না হলেই হত। সুতরাং অজয় বলল,—"এখন যা, পরে মিলিয়ে দেব!"

সোমা মার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। মা মাথায় হাত রেখে বললেন, 'তাই হবে সোমা, পরে করে নিও। অজয়ের যেন কি হয়েছে।" বিষন্নমুখে সোমা বলল,—"ঠিক বলেছ মা। তা না হলে কবে থেকে একটা অংক বই আনতে বলছি,—মনে থাকে না। লিখে লিখে আর···।',

অজয় আরো বিরক্ত হয়ে গেল। সে এবার কি ভাবল! বারান্দায় শুয়ে কুকুরটা। সেই রোঁয়া ওঠা ঘিয়ে ভাজা ভাজা, শির দাঁড়ায় ধনুকের মত। ল্যাজটা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। সব সময় শুয়ে আছে। মায়ার মত, ঠোঁটে বিষন্ন হাসি। অজয় কুকুরটার দিকে এগিয়ে এল, রক্তের শির ধপধপ করছে, অজয়ের চোখের পাতা কাঁপছিল। গলার সোড়ায় সোমার মত মায়া আটকে আছে, অজয় কাঁদতে চাইছিল। কান্না আসছিল না। কেমন একটা কুঁই কুঁই শব্দ। মার গলা শুনতে পেল অজয়।

"এত সকালে ওঠার কি দরকার ছিল? ঐ দেখ বারান্দায় কুকুরটা আবার শুয়েছে। যা, যা।"

মায়া উঠে পড়েছে। নাকে কান্না।

"মাগো! কুকুরটার গায়ে কি গন্ধ।

সোমা একটা লাঠি নিয়ে এল। কুকুরটার গায়ে এক ঘা পড়তেই ছুটে পালাল। ল্যাজটা গুটিয়ে একবার কেঁউ করে উঠল। সকাল বেলা অজয়ের তেষ্টা পেয়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, হৃদ বন্ধ হয়ে আসছে। তেষ্টায় গলা টাস টাস করছে। নিঃশ্বাসের জন্য বাতাস চাই। বাইরে মা গিয়ে অজয় ঘরে ঢুকল। মায়া লেখা পড়া তেমন জানে না। যেমনটা জানলে একটা চাকরি পায়। অজয় খানিক ঘরে পায়চারি করল। রাগ আর বিরক্তি জমে গিয়ে এখন এক ধরণের বিষণ্ণতা। শূন্যতা। একটা কাজ হয় না? একটা চাকরি? খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মত! মা কতদিন এইভাবে চালাবে? যেদিন মা থাকবে না? দু'চোখ বুজে ফেলে একটা আঃ শব্দ করে অজয়,- ভাববার দরকার নেই। মায়ের মুখটা গম্ভীর, বিষণ্ণ। মাঝে মাঝে কি হয় ওর, কথা বলেনা অজয়ের সঙ্গে। অজয় চিৎকার করে উঠল, "সোমা, চা আন, এতক্ষণ কি হচ্ছে।"

মায়া যেতে যেতে থামল, চাপে বাসন্তি। বোধ হয় সাধারণ থাচ্ছিল। যেরকম বলতে এই ছিল যেরা একটুখানি জায়গা। রান্নার জায়গায় মুখ বাড়িয়ে বলল,—

"সোমা শিগ্‌গির। বাবুর চড়ুয়। চা দিতে দেরী হচ্ছে কেন?" মা বললেন,—

"করে দিচ্ছি, অত তাড়া কেন বাপু! অফিস তো নেই।"

"হবে কিনা বলে দাও।"

"হলেই পাবি।"

"হতে হতে তো সন্ধ্যে গড়িয়ে যাবে।"

মায়া ঠোঁট বাঁকাল,—

"তোর আবার এত নিয়ম? টাইমলি সব? উনিশ বিশ হওয়ার উপায় নেই? ভেঁকির আবার সাধ যায় ইন্দ্রপুর হয়ে শুতে?"

অজয়ের কানে কথা গেল না। সব কিছু শুনেও না শোনার অভ্যাস হয়ে গেছে। কয়েক দিন দাড়ি কামান হয়নি, গালে আস্তে আস্তে হাত বোলায় অজয়। চুল-কোচ্ছে গাল দুটো তাড়া আয়নাটা তুলে মুখ দেখল ও। চোখের কোণে কালি। রোদে পুড়ে গাটা চিমসে, পাংশুটে বর্ণ। মুখের ছবিটা ধারাল বেকারত্বের চিরন্তন মার্কা।

মা সহজে জোরে কথা বলেন না। আজ নিশ্চয় অজয়ের কপাল চাল নেই, দুস্তোর ছাই! কয় ওপর অজয়। গত কালকে নিয়ে বিয়াল্লিশটা এ্যাপ্লিকেশন্ ছেড়েছে. হবে না কিছু। ধামা ধরবার মামা কই? এর চেয়ে গাণ্ডুস মার্কা ছেলে হলেই ভালো হত। ইউনিভার্সিটির ভালো ভালো মার্কগুলো দেওয়ার কি দরকার ছিল—পরীক্ষকদের লোক ঠকান। কুঁজো থেকে নিজেই এক গ্লাস জল ঢেলে খেলো অজয়। মা, মায়া, সোমা সকলে কেমন হয়ে গেছে। অজয় ভাবল।

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলে ফেললেন, "সোনার অংকটা করে দিয়ে বেরিও অজয়—নয়তো ওকে স্কুলে শাস্তি পেতে হবে।"

অজয় হাত বাড়িয়ে চা নিল মায়ের দৃষ্টি স্থির।

"আজ রেশনের টাকা চাই। সপ্তাহের শেষ তারিখ।"

অজয় মুখ তুলল। "মাস শেষ হওয়ার পূর্বেই সমস্ত টিউশনির টাকা নেওয়া হয়ে গেছে। ধার ছুটলে এনে দিচ্ছি, দাঁড়াও।"

মা যেতে যেতে কি ভেবে একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন,

"কাল তোমার দাদার একটা চিঠি এসেছে—।"

"কই দেখি।"

বালিশের তলা থেকে চিঠিটা দিল মা। চিঠির ভাঁজ খুলল অজয়। দাদার কোম্পানীর অবস্থা খারাপ। প্রায় বন্ধ। অজয় যেন কিছু টাকা দিয়ে মাসে মাসে সাহায্য করে। দাদা লিখে দিয়ে লিখেছেন—

"লতা পাতার মত ঘুরে বেড়াও আর সস্তা রাজনীতি কর। সংসারে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মায়ার অসুখটা দিন দিন বাড়ছে—তার কি ব্যবস্থা করেছ? দাদা হয়ে আমি পিতার কাজ করে তোমায় লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ করলাম। তার প্রতিদানে তোমার কাছ থেকে দান হিসাবে কিছু আশা

করতে পারি না? আমরা সাতজন। তোমরা চার। বুঝতেই পারছ, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে তোমাদের চেয়ে কি কষ্টে আমি দিন যাপন করছি, তবুও একটা ভালো সম্বন্ধ এসেছে। কোন রকমে ও বিয়েটা দিতে না পারলে, পরে আমার পক্ষে বিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে। যেমন করে হোক টাকা জোগাড় কর। আমি সোমবার বাড়ি যাচ্ছি।" অজয় কেমন অসহিষ্ণু গলায় না বলে পারল না, মায়ের বিয়ের কোনো চেষ্টা না করে দাদা বেশ নিজের মেয়ের বিয়ের জোগাড় করে ফেলল। বোনটির বেলায় অসুখের অজুহাত দেখিয়ে……।"

শেষে লিখেছেন,—"আজ অনেকদিন হল তোমার বৌদি একটি নবজাতক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন।" রাখতে গিয়ে অজয় হাসল। চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলল,—

"উঃ! বলিহারি দাদার উৎপাদন ক্ষমতা।" মা অসহায়ের মত তাকালেন —

"মানে?"

"মানে আর কি? দাদা ভাবে আমরা রাজা।" একটা সংগোপন আক্রোশ। অজয় ভাবল, কিন্তু না একটা চাকরী কেউ! খুব তো বড় বড় কথা। ও দেখিয়ে দেবে চাকরী করলে কর্তব্য কাকে বলে। সংসার কেমন করে করতে হয় ও তাতে পারে ঘরে থাকতেও রাজী।

মা চলে গেছে। অব্যক্ত রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল অজয়। প্রোড়াক্‌শনের কোনো কমতি নেই দাদার। নবজাতক পুত্রের সংবাদ দিতে এই বাজারে লজ্জাও করেনি। স্বার্থপর। অজয়ের হাসি পাচ্ছিল। ওর মত বিরাশিটা এপ্লিকেশন্ না দিয়েই চাকরীটা পেয়েছিল দাদা। তাই অত কথা। দাদা জুগিয়েছেন ওর পড়ার খরচ! খুব বিক্রী করে, টিউশানি করেও পড়ার খরচ জুগিয়েছে। সংসারের দব দায় যেন ওর। অনিশ্চয়তার অগ্নিসোলকে হাত বাড়িয়ে কিছু পেল না অজয়। জীবনগুলো নিরাপত্তার অভাবে ধুঁকছে। একটা অগ্নি-বলয় অজয়ের চোখের সামনে ঘুরছে। ওটার মধ্যে ঢুকতে পারলেই সে রাজা, অজয় প্রাণপণে চেষ্টা করছে ঢুকতে! কিন্তু তার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী। অজয় চেষ্টা করেও হেরে যাচ্ছে। অগ্নিবৃত্ত ভেদ করতে পারছে না। হাঁপিয়ে উঠেছে।

অজয় ময়লা সার্টটা পরিয়ে নিল। ভাবল সোমার অংকটা কষে দিয়ে বাইরে যাবে। মা এসে আবার দাঁড়ালেন সামনে।

"কটা টাকা না দিয়ে গেলে হাড়ি চড়বে না কিন্তু।" অজয়ের দু'হাত তুলে চিৎকার করতে ইচ্ছা হল। ওকে ওরা কি ভেবেছে। ওকি চাকরী করে। কোথায় পাবে টাকা? চুরি করবে? কোন্তে দুঃখে কথা সরল না অজয়ের। থমকে দাঁড়াল। সোমা এসে দাঁড়িয়েছে। মাথাও। গতি পথ রুদ্ধ। অজয় এবার চেঁচিয়ে উঠল,—

"পথ আটকালে টাকা পাওয়া যায় না।"

"আমরা তোর পথ আটকাচ্ছি?"

'তবে কি মুখ দেখাতে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছ?" মায়া নীচের ঠোঁট কামড়াল।

'তবু যদি মা বোনকে খাওয়াবার মুরদ থাকত। মাতাড় মেজাজ। যেন বাদশা!"

ওরা সাহস পায় কথা বলতে—কেন? অজয় জানে! উত্তর না দিয়ে ও পাশ কাটাবার জন্য দরজার দিকে পা বাড়ায়। ভেতরে ভেতরে বুক কাঁপছিল। মা বললেন, —

"একটু দাঁড়া। দু'টে কটা চিবিয়ে যা। আদবি কেতা সেই কখন তার ঠিক নেই।"

"কি আমার দরদ অবতার!"

অজয় কোন্তে দুঃখে বলে ফেলল। মায়া চলে গেল। সোমা আর একটু এগিয়ে এসে আবদারের সুরে বলে ফেলল, "আমি জানিনা—। অংকটা মিলিয়ে দিয়ে তবে যাও।" অজয় এবার দু'হাত তুলে ছুটে এল। যেন সে সোমাকে তুলে আছাড় দেবে।

"কতবার বলব, এখন নয় এখন নয়। কথা তোমার কানে ঢুকছে না?"

দাদা আজ মারবে। সোমা আহত হরিণীর মত ছুটতে ছুটতে বারান্দায় গেল। অজয় ছুটল। সোমা ছুটল এভাবে দুজনার ছোটাছুটি খেলা। অবশেষে ঘরে

কেলল অভয়। সোমা চন্ট-বাঁউ করে কেঁদে ফেলল অভয় সত্যি যেন দৈত্য হয়ে গেল। সে সোমার চুল ধরে প্রবল জোরে ঝাঁকানি দিয়ে তোলাতে লাগল। নির্মম আঘাতে আঘাতে সোমার গাল, পিঠ জর্জরিত করে তুলল। মা অনেক চেষ্টার পর সোমাকে অভয়ের হাত থেকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে নিয়ে হাপাতে লাগলেন।

"এত বড় অমানুষ হয়েছ অভয়। শেষে এত বড় মেয়েটার গায়ে হাত তুললে?"

মায়া গুলে পীতে পীতে থমল। অভয় সোজা, ঝড়ের মত বেগে রাস্তায় নামল।

চায়ের দোকানের সামনে বেশ আড্ডা দিচ্ছে মলয়, তপন, সুধীর ওরা। অভয় গিয়ে, বিমর্ষ মুখে দাঁড়াল শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকার মিলে মিশে এক হয়ে গেছে: মলয় বলল,—"এই যে শ্রীমান অভয়। প্রায় সাত দিন পর। মুখটা তো আমপি, তা হ'ল কিন্তু?"

"ধুত্তোর! চাকরি নিয়ে কে বসে আছে আমাদের জন্য?"

"তাইতো।" সুধীর বলল।

"কি করা যায় বলতো?" তপন বলল।

"ভেঙে, গুড়িয়ে, তালগোল পাকিয়ে দে সব।" মলয় হাতে তুড়ি দিল,—

"তৈরী হ সব। প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি শ্রদ্ধা সম্মান নামক ভালো ভালো শব্দগুলো একটা পোটলা করে বেঁধে ফেলে রাখ।"

সুধীর "হোপ।" করে একটা আওয়াজ করল। "দূর্। একটা অরাজক আন। লোক ক্ষেপে গিয়ে বিপ্লবের সৃষ্টি করুক। মলয় বলছিল,—বুঝলি, শালা এই মধ্যবিত্ত সমাজটাকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে এমন আয়গায় কোনঠাসা করবি—যেখানে গিয়ে বাজীমাৎ।"

অভয় শুনছিল। মলয় বলল,—

"সেই হবে কাজ। আমরা যখন খুন। যখন আমাদের যখন কিছুই নেই, তখন গোটা পৃথিবীটা জয় করার জন্য হয়েছে। আমরা তখন রাজা।" হাত মুঠো করল মলয়। যেন পৃথিবীটা ওর কাছে আমলকী। সেই সময় নীহার কলেজ যাচ্ছিল। অনেক চোখ ওদের ওপর পড়ল। সুধীর বলল,—"চুপ।" মলয় চুপসান মেরে গেল। অভয় তপনকে বলল, "একটা সিগারেট দে।" তপন সিগারেট দিল। নীহারের পেছন পেছন গোটা দলটা চলে গেল। ওরা চলে যেতেই অভয় ভাবল সে এখন কি করবে। এত সকালে বাড়ি গিয়ে কোন লাভ নেই। গিয়ে তো সেই মা বোনের সামনে পড়তে হবে। জানাতে হবে, কোথাও টাকা জোগাড় করা সম্ভব হবে না। মনে মনে হিসাব করল অভয়। আজ সোমবার। বাবার কথা ভাবে অভয়। নেহাৎ চাকরীটা পেয়ে গিয়েছিল তাই। না হলে কি করত? অভয়ের হাসি পাচ্ছিল। ওর মত বিয়াল্লিশটা এ্যাপ্লিকেশন না দিয়েই চাকরীটা পেয়েছিল দাদা। মনে মনে বাবার সাথে লড়াই করে অনেকটা চাঙ্গাবোধ করল অভয়। সকালের রাগ অবসাদ কমে আসছে অনেকটা। বাড়ি যাওয়ার কথা মনে হতেই কান্না আসছে ওর। ভাবতে ভাবতে ও অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটছিল। রাস্তা মানুষগুলো ওর দু'পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল। ও ধীরে ধীরে হাঁটছিল। দেওয়াল দেখছিল। একটু জায়গাও ফাঁক নেই। পোষ্টার আর লেখা। কে লিখেছে মলয়, সুধীর, তপন? ওদেরই কেউ হবে। সারা দুনিয়াটায় ওরা ছড়িয়ে আছে। সব পলিটিক্স্ হ'চ্ছে! হাত নিসপিস করল অভয়। পকেটে হাত ঢোকাল একটা সিগারেটও নেই। তপনের দেওয়া সিগারেটটা পুরো না খেয়ে আধখানা রেখে দিলেই হত। পকেটে চার আনা পয়সা। দু'টো সিগারেট কিনল। কটা পয়সা পকেটে রাখল। একটা ধরাল। বিরক্ত বোধ করল ও। মেজাজও সোজা করে হাঁটতে হাঁটতে ও বন্ধ দরজায় আলতো করে হাত রাখল। পড়িয়াহাটার দিকে যেন বহুকদিন আসেনি ও। অদিতের ভাই-বোনগুলো এটা ওটা চাইত। ও বিরক্ত হয়ে আসা ছেড়ে দিয়েছে। অদিতের বোন অতসী মনে মনে ওকে কামনা করলেও পেছনে লাগত অভয়কে খুশি করার জন্য। যাবে না যাবে না করেও শেষ অবধি দরজায় শব্দ করল অভয়। অতসীর খল-খলিয়ে হাসা উজ্জ্বলিত মিষ্টি মুখটা দেখতে ইচ্ছা করল।

অভিতের মা দরজা খুলে দিলেন, "বাব্বাঃ! এতদিনে সময় হল?"

অজয় অতসীর মুখটা দেখতে পেল। অভিতের মা বললেন, "কী হয়েছিল তোমার এতদিন, আসোনি? ভালো আছে তো সব?"

অজয় হাসল। অতসী পাশের ঘরে বসে বলল,—

"খুব যা হোক্ কাজের মানুষ। চেহারা যা বাগিয়েছ। দেখবার মত। ময়লা জামা কাপড়। এক মুখ দাড়ি। পেয়েছো কি শরীর নিয়ে? ইয়াকি না?"

অজয় চট করে ভাবল। অতসীর অনুযোগ ওর অন্তর ও বাহির নিয়ে। মনে মনে আনন্দ অনুভব করল। অতসী সেই একই রকম। কিন্তু অজয়ের মনে হল আকাশ ছোঁওয়া। হাত বাড়ালে অনেকটা ব্যবধান। চেয়ার এগিয়ে দিল অতসী। "নাও বস।" খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে অতসী। অভিতের মা বললেন,—

"ভালই হোল না ডাকতে এসে পড়েছ। ভাবছিলাম খবর দেব। আর তো সময় কম। অতসীর বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে।"

অতসী টেবিলের কোণায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। অজয় দেখল। অতসী লজ্জা পায়নি। হাসি হাসি মুখ।

"তুমি আর অভিত তো আমার ভরসা।" এবার অতসী ঝাঁকিয়ে উঠে বলল,—"চুপ করোতো মা। যাও, অজয়দার জন্ত চা নিয়ে এস।" তারপর অজয়ের দিকে ফিরে বলল, "আজ আর শুনছি না। বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।"

অজয় ভয় পেল। কাতর চোখে। "আজ নয়। অন্তদিন।" অভিতের মা বলতে বলতে গেলেন,—

"তুমি আসো না, ওদের বেড়ানোও বন্ধ। দুপুরে এখানে খাওয়া দাওয়া করে বরং ওদের নিয়ে একটু বেড়িয়ে এস।"

অতসী একটু এগিয়ে এল। অজয়ের চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে হাসি মুখে বলল,—

"বুঝেছি। আসলে পকেট গড়ের মাঠ তাই বলো।"

"মোটেও না আজ একটা ইমপর্টাণ্ট কাজ আছে।"

"থাক। ওসব অজুহাতে আর আমি বিশ্বাস করিনা।" আর একটু ঝুঁকে এল অতসী।

"তুমি একটা আস্ত বোকা। আমার বিয়ের ঠিক হয়ে যাচ্ছে তুমি কিছু বলবে না অজয়দা? আমি তোমার জন্ত বসে থাকবো। তুমি শুধু একবারটি মিথ্যা করেও বলো যাকে চাকরী ঠিক হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

ভোঁতা-কাটা ঘুড়ির মত অজয় যেন মুষ্ড়ে উঠে গেল উঠে দাঁড়াল।

"আমার চাকরী হওয়ার কোন আশা নেই অতসী! তুমি আমার জন্ত বসে থেকে ভুল করে জীবন নষ্ট করো না। আমার অনুরোধ।"

ছুটে বেরিয়ে গেল অজয়। অতসী হাত বাড়িয়ে কী বলতে গেল। বাইরে এসে নিঃশ্বাস নিল অজয়। অভিতের কাছে টাকা চাওয়া হল না। অন্তিবলটা আবার দেখতে পেল অজয়।

ভরা দুপুর। ঘটঘটে রুক্ষ রাস্তায় লোক কম। একটা দোকানী আধা আধি ঝাঁপ বন্ধ করে পয়সা গুনছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ভীত চোখে অজয়। না, এদিকে কেউ আসছে না। নীচু মুখে ঝুঁকে দোকানীর সামনে দাঁড়াল। দোকানী ওর দিকে তাকাল। পয়সা গোনা শেষ হয়নি ওর। অজয় ভাবল কেড়ে নিলে কেমন হয়? চোখ জ্বালা করে উঠল। ওর আদর্শটা মনে পড়ল। জুতো কেড়ে নেওয়া ও চুরি করাই পাপ নয়,—মনে মনে কল্পনা করাও পাপ। তার চেয়ে থাক। পা বাড়াল অজয়।

রাত নটায় দরজায় ঘা দিল অজয়। মায়ার ঠোঁটে সেই বিষণ্ণ হাসি। দরজা খুলে দিয়ে আবার বিছানা নিল ও। মা নিশ্চয়ই ঘুমে। ও পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। সোনা মেয়ের ওপর মাদুর বিছিয়ে বসে। ওর বিছানায় নিশ্চয়ই দাদা শুয়ে। আজ সোমবার আসার কথা লিখেছিল। অজয়ের উপস্থিতি বিমল বুঝেছিল। উঠে পড়ে রুক্ষ স্বরে বলল,—"এত রাতে রোজ ফেরাই কি তোমার নিত্য ব্যাপার?"

"তা প্রায় সে রকমই।"

"ভেবেছিস কি ?"

"কি আবার। মহৎ কিছুই নয়।"

রাগে বিজন কাঁপল। "ওসব চলবে না।"

"যতদিন বেকার আছি···"

"তোর ও সমস্ত যুক্তিকি আমি বিশ্বাস করি না—"

"তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তোমার অন্য কোন কথা থাকে বল। আমার দ্বারা এক পয়সাও বেওয়া সম্ভব হবে না।"

"তবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা—"

"না, তাও যাব না।"

চেঁচামেচিতে মা উঠে এলেন। মধ্যস্থতা করে থামাতে চেষ্টা করলেন ওদের। উত্তেজনায় অভয়ের মুখ জল জল করছে।

"তোর অন্যায় সকলে মাথা পেতে নেবে ভেবেছিস ?"

"অন্যায় ? অন্যায় আমার না তোমার ?"

"কী বললি ?"

"ঠিকই বলেছি। তোমার অফিসে আমারই কাজটা হত। কিন্তু তোমারই সুপারিশ মত কাজটা আমার না হয়ে হয়েছে তোমার শালার। মানে বৌদির ভাইয়ের। আর মায়ার বিয়ে না দিয়ে তুমি ধীরার বিয়ের দিদি তোমার করে ফেললে, অসুখের অজুহাত দিয়ে।"

"কি বললি ?" দু'জনায় সোজাসুজি তাকিয়ে আছে দু'জনার দিকে, যেন বিজন এখনই অভয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অভয় তবু চোখ সরাল না। আস্তে আস্তে বলল,—"আমার কাছে অন্যায়।"

"তুই এখনই বেরিয়ে যা। যেখানে গিয়েছিলি সেখানে যা।"

"না যাব না। তোমার মত ভালো মানুষ আমি নই।" অভয় স্থির ভাবে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর সোমার ভয়-কম্পিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে বলল, "মেয়েটা যে সোমা। সোমা গামছা দিল। পেছন পেছন ঝরে বালতি থেকে জল ঢেলে দিল। অভয় গামছা ভিজিয়ে নিজের গা মুছল। ঘরে ঢুকতেই সোমা বলল,—

"খাবে এস।"

"না খাব না। তুই শুয়ে পড়। আমাকে এক গ্লাস জল দে।" সোমা জল দিল। জল খেয়ে অভয় বারান্দায় এসে দাঁড়াল। জ্যোৎস্না ঝরে পড়ছে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র। অভয়ের কি যেন কষ্ট ভেতরে। কণ্ঠনালিটা আটকে আসছে। সোমা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারল অভয়। অংকটা ওর মিলিয়ে দেওয়া হয়নি। অভয়ের তীব্র কান্না পাচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে ও বড় নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর ভাবে অসহায়। মায়ার করুণ মুখ, বিজনের চাহিদা, মায়ের অসহায় ভাবলেশ মূর্তি, সোমার অসহায় করুণ মাখান দু'টো চোখ, অতসীর শেষ ভালবাসায় মাখান আবেগ-পূর্ণ কাতর প্রার্থনা দাবদাহের মত ওকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে সোমাও অতসীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণে ওর ভেতরে ভেতরে জলের স্রোতের মত কান্না বেরিয়ে এল। ও পেছন ফিরে দেখল সোমা ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে অভয় আবেগে কেমন অস্থির হয়ে উঠল। সোমার কাঁধের ওপর হাত রাখল।

"কিছু বলবি

"তুমি খাবে চল।

এতক্ষণের জ্বালা যেন সোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মমতায় জুড়িয়ে এল। বাড়িতে এই একটাই মেয়ে এত স্নিগ্ধ। এত করুণ। কোনো দিন কোন অভিমান করল না। রাগ করল না। এতটুকুও অস্থির হল না। নিজের ছায়ার ভেতরে গুটিয়ে রইল। অভয় শান্ত গলায় বলল,—

"আমার ওপর রাগ করিসনি তো বোন ?"

"না। তুমি খাবে চল।"

অভয় চুপ করে রইল।

জবাব পাচ্ছে না। সোমা ভিজে গলায় ডাকল,—"ছোড়দা।"

"কী ?"

"তুমি চলে যাওয়ার পর,—মানে বিকেল বেলা অতসীদি এসেছিল।" ক্লান্তভাবে হাসল ও। সোমার সামনে সমস্ত মনটা স্নিগ্ধ হয়ে এসেছিল।

"আমার কেন ! আমার জবাব তো দিয়ে দিয়েছি।"

"তুমি অতসীদির কাছে যেও ছোড়দা !"

ইচ্ছে না থাকলেও অজয়কে বলতে হল,—"অতসীদের ইচ্ছায় আমরা বাধ দিতে পারি না রে।" ঠোঁট কাঁপতে লাগল সোমার। অজয়ের একটা হাত ধরে ছাঁড়িয়ে নিল। অজয় একখানা হাত ওর মাথার ওপর রাখল। সোমা মুখ তুলল। দু'চোখে জল ছল ছল করছে।

"সোমা!" অজয়ের এরকম গলা অনেকদিন শোনেনি। সোমার চোখ দিয়ে টপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। "উঁ। বল!"

"তোর কি সুন্দর ঘরে আমি বিয়ে দেব ভেবিস। একটা চাকরী পাই আগে! যে তোকে সুখী করবে। যেখানে তুই পেট ভরে খেতে পাবি। যে সতিকারের তোর দাম দেবে।" এবার কান্নাটা আর বাঁধ মানল না!

"তোমার কাছেই থাকব ছোড়দা! আমার বিয়ের কাজ নেই। কিন্তু তুমি এখন খাবে চল। রাত অনেক হ'ল।"

"হ্যাঁ খাব চল। খাওয়ার পর তোর অংকটাও করে দিয়ে ঘুমাব।" অজয় রান্না ঘরে খেতে বলল। দুপুরের রান্না ভাত বোধহয়। গরমে পচে উঠেছে। গন্ধ বেরিয়েছে। গলায় যেন কিসের কষ। ভাত আটকে যাচ্ছে। ও জল খেল ঢক ঢক করে। ভাত নাড়াচাড়া করে উঠে পড়ল। সোমাকে ডেকে নিয়ে ও অংক দিয়ে বসল। ভেবেছিল পাঁচ মিনিটেই হয়ে যাবে। কিন্তু অংক মেলাতে পারল না অজয়, এক সময় খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে বলল,—"কালকে করে দেব, যা এখন।"

অজয়ের মনে হল অংক ও আর কোনদিনই মেলাতে পারবে না।

•

গঙ্গার ওপর দিয়ে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ দু'জন পণ্ডিত পার হচ্ছেন—চৈতন্যদেব আর রঘুনাথ। রঘুনাথের আজীবন সাধনা, তিনি ন্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করবেন। করেছেনও। কথা প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব বলেন, তিনিও ন্যায়ের একখানি পুঁথি লিখছেন। সেই পুঁথির শ্লোক উল্লেখ করে রঘুনাথকে শোনালেন। শুনে রঘুনাথের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

—নিমাই, তোমার এই পুঁথি ফেলে আমার পুঁথি কেউ পড়বে না। আমার আজীবনের সাধনা আজ ব্যর্থ হলো।

পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নিমাই সেই মুহূর্তে তাঁর বগল থেকে পুঁথি চুরি বেঁধে গঙ্গাজলে বিসর্জন দিলেন। বল্লেন জীবনে আর তিনি কোন পুঁথি রচনা করবেন না···

সে গৌরবের অভিশাপ তিনি বহন করতে চান না।

অলৌকিক

সত্যরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

ভারতের সাধক ও মহাপুরুষদের জীবনকে ঘিরে বহু অলৌকিক কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। অনেকক্ষেত্রে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ বিশ্বস্তসূত্রে শোনা। তাই তাদের অবিশ্বাস করতেও মন চায় না। আবার বিশ্বাস করতেও মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। দিলীপ কুমার রায় 'অঘটন আজো ঘটে' বইটি লিখে আমাদের মনের সেই দ্বিধাকেই যেন দূর করতে চেয়েছেন।

এমনি একটি অঘটনের কথাই বলছি। কাহিনীটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষের মুখে শোনা।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের তিরোধানের কয়েক বছর পরের ঘটনা। ইতিমধ্যে তাঁর ১৪ পরগণার শিকরা কুলীন-গ্রামের বাসস্থানে একটি মঠ স্থাপিত হয়েছিল এবং সেখানে তাঁর জন্মদিনে কয়েকদিন ব্যাপী উৎসব হত। (এখনও হয়)।

সেই উৎসবের সময় কয়েকজন স্বামীজী সেই মঠে আসতেন। বহু লোকজন সমাগম হ'ত, পূজা, কীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, আরও নানা অনুষ্ঠান।

সেই সঙ্গে বাজতো সানাই।

সকালে ও সন্ধ্যায়, তাছাড়া অন্য সময়েও সানাইএর মিঠে সুর শোনা যেতো।

সানাই বাজাতো এক বৃদ্ধ মুসলমান। তার জন্য বাগানের ধারে একটি উঁচু মঞ্চ তৈরী করে দেওয়া হোত। আহারাহারের সময় ছাড়া সে সেই মঞ্চের উপরেই থাকতো আপনিনিজের খেয়াল খুশী মত সকালে দুপুরে সন্ধ্যায় এবং সময় সময় গভীর রাত্রে বা শেষ রাত্রে সানাই-এ তান ধরত।

ওস্তাদ শিল্পী ছিল লোকটি। যেমন মিষ্টি ছিল তার বাজানো তেমনি নিখুঁত ছিল তার সুরসৃষ্টি।

একদিন রাত তখন বোধ করি তিনটে। সানাইওয়ালার কী খেয়াল হল, সে আর না ঘুমিয়ে, উঠে বসে সানাই বাজাতে সুরু করল। ভারী দরদ দিয়ে বাজাতে লাগল। সুরমূর্ছনা ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে বাগানে প্রান্তরে।

বাজাতে বাজাতে হঠাৎ তার নজর পড়ল বাগানের দিকে। দেখল, বাগানের দক্ষিণ ধারে দু'জন স্বামীজী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দু'জনের পরনে আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ী। দু'জনে যেন স্থির নিশ্চল হয়ে তার সানাই শুনছেন।

সানাইওয়ালা অবাক। এঁদের তো এই মঠে সে কোনদিন দেখে নি!

আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার আলো পড়েছে স্বামীজী দু'জনের মুখে। না, এঁদের সে এখানে দেখেনি। এঁরা আবার কবে এ মঠে এলেন! যাই হোক, সানাইওয়ালা তার সুর শেষ করল, বহুক্ষণ ধরে বাজালো সুরটা। তারপর দেখলো, স্বামীজী দু'জন যেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে অন্য ধারে চলে গেলেন।

সানাইওয়ালা তাড়াতাড়ি মঞ্চ থেকে নামল। বাগানটার চারদিক দেখল। কিন্তু তাঁদের দেখা পেল না।

ক্রমে ভোর হল। মঠের অধিবাসীরা ঘুম থেকে উঠল। গাছের মাথায় পাখীদের কল-কাকলী সুরু হল।

আরও কিছুক্ষণ পরে সানাইওয়ালা গেল আশিস

ঘরের দিকে। সেখান থেকে মানুষের কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

সানাইওয়ালা আপিস ঘরের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভিতরে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও একজন বহিরাগত স্বামীজী। সানাইওয়ালা তাঁদের দেখে সেলাম করল।

বীরেনবাবু হেসে বললেন, কি হে, কাল যে তোমার ভাব এসে গিছল। সারারাতই সানাই বাজিয়েছো। শেষ রাতে তোমার সানাই-এর সুর কানে আসছিল। শুনতে ভারী মিষ্টি লাগছিল।

স্বামীজীও ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, ভারী মিষ্টি। আমিও শুনেছি।

সানাইওয়ালা বললে, একটা নিবেদন আছে, হুজুর।

কি নিবেদন, বল।

শেষ রাতে সানাই বাজাবার সময় বাগানের ধারে দু'জন মহারাজকে দেখেছি। তাঁরা কিন্তু এ মঠে থাকেন না। তাঁদের আগে কখনো এখানে দেখিনি।

সে কী! তবে তাঁরা কোথা থেকে এলেন! তুমি বোধ হয় ভুল দেখেছো, সানাইওয়ালা।

না, হুজুর, ভুল দেখবো কি!

এই বলে সানাইওয়ালা যা দেখেছে তা সবিস্তারে বর্ণনা করল।

শুনে বীরেনবাবু আর স্বামীজী দু'জনেই বিস্মিত।

বীরেনবাবু বললেন, তুমি তাঁদের স্পষ্ট দেখেছো?

হ্যাঁ হুজুর। স্পষ্ট। যেমন আপনাদের দেখছি।

তাহলে এখন তাঁদের দেখলে চিনতে পারবে?

নিশ্চয় পারবো হুজুর, সেই দুই মহারাজের মুখ এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে।

আচ্ছা, এসো তো আমাদের সঙ্গে।

এই বলে বীরেনবাবু সানাইওয়ালাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেই ঘরের দেওয়ালে সার সার টাঙানো ছিল স্বর্গত স্বামীজীদের বড় বড় ছবি।

বীরেনবাবু সানাইওয়ালাকে বললেন, এই ছবিগুলি ভাল করে দেখ। দেখে বল, এঁদের মধ্যে কোন দু'জনকে কি চিনতে পারো?

সানাইওয়ালা ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে একটু পরেই উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি হুজুর। এই যে এঁরা দু'জন, এঁরাই। আমি ঠিক চিনতে পারছি, এঁরা দু'জন।

পাশাপাশি দুটি ছবি। একটি স্বামী বিবেকানন্দের, অপরটি স্বামী ব্রহ্মানন্দের। সানাইওয়ালা সেই দুটি ছবির দিকে বারবার তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল।

বীরেনবাবু আবার প্রশ্ন করলেন (তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না), ঠিক দেখেছো? এঁরা দু'জন?

হ্যাঁ, হুজুর, এঁরা দু'জন। একেবারে ঠিক। আমি আল্লার নাম নিয়ে বলছি, এঁরা দুজন।

বীরেনবাবু স্তব্ধ, বিহ্বল। তাঁর সঙ্গীটিও তাই।

কিছুক্ষণ কাটল নিস্তব্ধতার মধ্যে। তারপর বীরেনবাবু বললেন, সানাইওয়ালা, তুমি ধন্য। ধন্য তোমার সানাই-এর সুর। তুমি কাদের দেখেছো, জানো?

এই বলে তিনি সানাইওয়ালাকে বুঝিয়ে দিলেন।

শুনে সেই মুসলমান সুরশিল্পীর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বললে, হুজুর, আরজি আছে।

কি আরজি, বল।

সানাইওয়ালা বললে, যতদিন বেঁচে থাকবো, আমি এ জায়গা ছেড়ে আর কোথাও যাব না, হুজুর, আমি মাইনে চাই না, টাকা চাই না, শুধু দু'বেলা দুটি খেতে দেবেন। আমি ওই মঠের ওপরেই থাকবো। সানাই বাজাবো দিনে রাতে।

তারপর সানাইওয়ালাটি বেঁচেছিল কিছুদিন, আর সুরে সুরে ভরিয়ে রেখেছিল সেই স্থানটিকে। রাতের বেলায় প্রহরে প্রহরে তার সানাই বাজতো মন-গলানো করুণ আকুতির সুরে, সেই সুরের মধ্য দিয়ে সে যেন ভগবানের পায়ে নিজেকে সমর্পণ করত।

বাঙালী মানসে মা কালী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অহোরাত্র জেগে আছেন তিনি হিন্দু-বাঙালীর মনে, বিপদে আপদে সুদিনে সম্ভোগে। যাঁরা বিপন্ন তাঁরা লুটিয়ে পড়ছেন তাঁর মন্দিরদ্বারে, কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন, মা আমায় উদ্ধার কর। যাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, তাঁরা মাকে পরাচ্ছেন সোনার গহনা, আনছেন ভারে ভারে পূজার অর্ঘ্য। মায়ের মন্দিরে দিনরাত ধরে চলেছে মানুষের আনাগোনা। প্রতিদিন এত অসংখ্য মানুষের প্রণাম আর কোন দেবতাই পান না। সর্বস্তরের মানুষ এসে দাঁড়ান মায়ের সামনে—ধনী নির্ধন পাপী পুণ্যবান—স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে। যেন আশ্চর্য আবিষ্ট করে রেখেছেন মা কালী—বাঙালীর মন। অপ্রতিরোধ্য তাঁর আকর্ষণ! তাঁকে স্মরণ না করে যেন উপায় নেই। মাকে জানানো চাই আমার গতিবিধি। মা আমাকে সাফল্য দাও, আমাকে রক্ষা কর।

সকাল বেলা ট্যাকসি নিয়ে বেরুলেন ড্রাইভার। তাঁর সেবার আসনের সামনে মা কালী। প্রণাম করে চাকা ধরলেন। মা, যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন হয়। বাস, লরি, ট্রেম্পো, ট্রেন, সব রকম যানবাহনের চালকের সামনে মা বিরাজ করছেন।

মন্দিরে আছেন তিনি। আছেন পথের পাশে। আদালতের পিছন দিকে রেলিং-এর ধারে। ঘোড়-দৌড়ের মাঠের খানিকটা দূরে গাছের তলায়। বড় বাজারের ঘুপসি গলির মধ্যে একটা ভেকোনা ফাঁকা জায়গায়।

উকিল, মক্কেল, আসামী, ফরিয়াদি, বেহুড়ে, গাঁট কাটা, ফেরেববাজ আর চোরা কারবারী, সাধু সন্ত—সবাই কাজে বেরিয়ে পথ চলতে, মায়ের দর্শন পেলেই থমকে দাঁড়াচ্ছেন, মনে মনে প্রার্থনা জানাচ্ছেন, মা, আজকের মামলায় আমার যেন জিৎ হয়, আজকের ভেরো নম্বর বাজীর শুভ ঘোড়াটা যেন সবার আগে পৌঁছোয়, মা, আজকে দু'পয়সা যেন হাতে আসে, আজকের লেনদেনে যেন মুনাফাটা ভাল হয়—এমনি আরও কত প্রার্থনা। মানুষের চাওয়ার তো শেষ নেই। অতএব, মার কাছে যাওয়া ছাড়া আর পথও নেই!

জীবনচর্চার এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে মা কালী না আছেন। কায়িক, দোকানদার, খেলোয়াড়, অভিনেতা, শিল্পী, সুরসাধক, লেখক, চিত্রকর—সবাইকার প্রেরণার উৎস তিনি।

স্মরণ করুন, ১৯১১ সালের কলকাতার সেই ফুটবল সীজন ফাইনাল। মোহনবাগান বনাম ইষ্ট ইয়র্ক। খেলার দিন মোহনবাগান ক্লাবের সেক্রেটারী শৈলেন বসুর নির্দেশে সমস্ত খেলোয়াড় ভোরবেলা তাঁর বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। সেখান থেকে কালীঘাট মায়ের পূজা দিয়ে তবে খেলোয়াড়রা মুখে চা খাবার তুলবেন। চার পাঁচখানা ফীটন গাড়ি চেপে গেলেন সবাই কালীঘাট। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। চতুর্দিকে খবর ছড়িয়ে গেল। দেখতে দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড় হোয়ে গেল, মন্দির চত্বরে, আকুল প্রার্থনায় ভরে উঠল আকাশ বাতাস, আদি গঙ্গার তরঙ্গের সৃষ্টি হল যেন। এরপর নানা জায়গার মায়ের মন্দিরে মন্দিরে লক্ষ লক্ষ বাঙালী সেদিন পূজা দিয়েছিলেন। এত মানুষের বুকচেরা ঐকান্তিক প্রার্থনা যেন না শুনে আর উপায় ছিল না মায়ের।

ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার সি. কে নাইডু। কলকাতায় এলেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল কালীঘাটে গিয়ে মাকে দর্শন করে আসা, পূজা দেওয়া। তাঁর সঙ্গে থাকতেন, ভাই সি. এস. নাইডু আর শিষ্য

মুস্তাক আলী। ১৯৩৪ সালে ইংলণ্ড দল ভারত সফরে এসেছে। দুর্ধর্ষ অধিনায়ক ডি. আর. জার্ডিনের নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ দল, এম. সি. সি.। বোম্বাইএর প্রথম টেস্ট হয়ে গেছে। ভারতীয় দল হেরেছে। এবার কলকাতায় খেলা। ভারতীয় দলের অধিনায়ক সি. কে. নাইডু। একদিন আগেই কলকাতায় এসেছেন। অত্যন্ত উত্তেজিত ভাব। এই খেলার উপর যেন তাঁর সমস্ত ভবিষ্যত ক্রিকেট-জীবন নির্ভর করছে। এম. সি. সিকে হারানো হয়ত সম্ভব নয় —কিন্তু খেলা সমান সমানও কি করা যাবে না? আগের দিন সন্ধ্যার পর মনিবদত্তরায়কে বললেন, কাল খুব ভোরে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসতে চাই—ভোর রাত্রে। দত্তরায় বললেন, অত ভোরে তো মার দরজা খোলে না! সি. কে. বললেন, যাতে খোলা হয় তার ব্যবস্থা কর। কারণ পুজো দিয়ে হোটেলে ফিরে সেখান থেকে ন'টার মধ্যে মাঠে আসতে হবে তো! তুমি এখনি গিয়ে সেবায়েৎদের সঙ্গে ব্যবস্থা করে এসো। এই নাও একশো টাকা—ম্যানেজ করে এসো।

চলে গেলেন দত্তরায়! ব্যাপার শুনে আর টাকা পেয়ে সেবাইৎ আর পুরোহিত—দু'জনেই বিগলিত! বললেন, ঠিক আছে! আমরা ভোর রাত চারটে থেকে অপেক্ষা করব। তিনি এলে দরজা খুলব।

তখনো আলো ফোটে নি। সি. কে. নাইডু এলেন কালীমন্দিরে। সঙ্গে ভাই আর শিষ্য, দত্তরায় এবং আরও কয়েকজন। মন্দিরের দরজা খোলা হল। সকলে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রইলেন। মরি! মরি! মায়ের এ কী রাজরাণীর বেশ। এ কী রূপ! রাত্রিবেলা মাকে সাজিয়ে রেখেছেন সেবাইৎ, ফুলে ফুলে ভরে গেছে মায়ের দেহ! গন্ধ ধূপে মায়ের ঘর আমোদিত! বহুক্ষণ যেন ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন সি. কে. নাইডু সেই ভুবনমোহিনী মূর্তির সামনে! সেই টেস্ট খেলা অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার স্টার্ক-এর বল লেগে মেলওয়ার হোসেনের মাথা ফেটে গেল। মেজাজ হারালেন সি. কে. নাইডু! বেপরোয়া মেরে খেলতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন! কিন্তু তবুও, অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সেই ম্যাচ তিনি হারলেন না।

সবকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালী ক্রিকেট খেলোয়াড় বিনু মুখোপাধ্যায় ছিলেন মায়ের পরম ভক্ত। যেদিন তাঁর খেলা থাকতো সেদিন ভোরে উঠে তাঁর প্রথম কাজ হত, মায়ের পূজা করা! এক একদিন পুজো করে তাঁর মনে যেন নতুন ভাব আসতো, মাঠে এসে বলতেন, আজ সেঞ্চুরি করব! করতেনও!

বাংলার নাট্য-জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবের কথা তো সর্বজনবিদিত। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ"—এই ছিল বাংলা নাট্যশালার ইষ্ট মন্ত্র! সেই সঙ্গে মায়ের প্রতি ভক্তি, মাকে স্মরণ মনন। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রী ছিলেন রামকৃষ্ণগত প্রাণ, আর মা কালীর সেবক-সেবিকা! নটগুরু গিরিশচন্দ্র থিয়েটারের দিন একটি ঘোড়ার গাড়িতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমে তুলে নিতেন অমৃতলাল বসুকে তাঁর বাড়ি থেকে: তারপর গাড়ি এসে দাঁড়াতো কুমারটুলীর সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সামনে। গাড়ির মধ্যে জুতো রেখে নগ্নপদে গিরিশচন্দ্র মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতেন। দু'হাত জোড় করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অমৃতলাল বসে বসে দেখতেন! ভাবতেন, আজ থিয়েটারে পৌঁছোতে দেরী হবে নির্ঘাৎ! উনি তো আর আসেনই। একদিন বলে ফেললেন, আজ্ঞা গুরু! রোজ রোজ মন্দিরের পাথরে মাথা ঠুকে তো কপালে কড়া পড়িয়ে ফেললে! পেলে কিছু? তার তো কোন লক্ষণ দেখি না। এ দিকে তো ভাঁড়ে মা ভবানী। গিরিশচন্দ্র কিছু বললেন না। আবার আর একদিন সেইভাবে মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হেসে অমৃত লাল বললেন, মাথা ঠোকাই সার হল গুরু! কোন ক্ষমতাই মার কাছ থেকে পেলে না! শুনে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর হোয়ে গেলেন। সেদিন যে নাটক অভিনীত হচ্ছিল, তাতে গিরিশ বা অমৃতলাল দু'জনের কারুরই ভূমিকা ছিল না। কিছুক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্র ডেকে পাঠালেন অমৃতলালকে তাঁর ঘরে। অমৃতলাল এলেন। আষাঢ়ের মেঘের মতো থমথমে

গিরিশের মুখের ভাব! অমৃতলাল বললেন, ব্যাপার কি গুরু! এত গম্ভীর কেন! গিরিশ বললেন, বোসো। মেঝের উপর বোসো!

একটি মাদুর পাতা ছিল। গিরিশচন্দ্র হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন। কিছুটা বিস্মিত ভাব নিয়ে অমৃতলাল বসলেন। গিরিশচন্দ্র বললেন, আমার দিকে পিছন ফিরে বোসো। অমৃতলাল ঘুরে বসলেন। সময় কাটতে লাগল। এক মিনিট। দু' মিনিট! অমৃতলাল ভাবছেন, গিরিশের আবার একী নতুন ঢং। নতুন ভড়ং! ভাবামাত্রই হঠাৎ তাঁর সব শরীর কেঁপে উঠল। স্নায়ু আর শিরা উপশিরার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ বইতে লাগল! পিঠে কার নরম হাতের মৃদু স্পর্শ। দু'চোখে অন্ধকার দেখছেন অমৃতলাল। তারপরেই সেই অন্ধকারের মধ্যে কী আলোর ছটা! অমৃতলাল বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাদুরের উপরেই লুটিয়ে পড়লেন। টেনে তুললেন তাঁকে গিরিশ। বললেন, বিষাদ হল কি! অমৃতলাল যেন বাকশক্তি রহিত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে শুধু ঘাড় নাড়লেন। গিরিশ বললেন, যাও, এবার প্রশ্নটি করগে! অমৃতলাল, হতচকিত অভিভূত অবশদেহ অমৃতলাল, গিরিশকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। একথা কেউ জানতে পারে নি। অনেকদিন পরে অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়কে বলেছিলেন সেই ঘটনা!

এ যুগে দেখেছি অহর গাঙ্গুলীকে—মায়ের মহাভক্ত ছেলে ছিলেন তিনি! দ্বিতীয় ভক্ত-ভৈরবও বলা যায়! বাগবাজারে যখন থাকতেন তখন যৌবনের আবেগ মেহে মনে। প্রকৃতি উদাম, কিছুটা বেপরোয়া! কিন্তু মায়ের সামনে যেন অসহায় শিশু! প্রত্যহ শ্যামবাজারে বাজার করতে আসতেন। বাজারে ঢোকার আগে বাজার সংলগ্ন মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেন অনেকক্ষণ। তাঁর তখনকার সেই নিমীলিত চোখের কোনে অশ্রুধারা, করুণ কোমল মুখের ভাব দেখেছি একাধিকবার, আর মনে মনে বিস্ময় মেনেছি! হৈ হুল্লোড় আর কুস্তিবাজ বেপরোয়া মানুষটির বাইরে আর ভিতরে কত প্রভেদ!

মা আমার নির্বিকার। সাধুর পুজোও গ্রহণ করছেন আবার চোর-ডাকাতের পুজোও নিচ্ছেন! ডাকাতে কালী! সেও মায়ের আর এক রূপ! সাধক-কবি বলেছেন, 'এবার কালী তোমায় খাবো!' খাও! আপত্তি নেই! গানে গান তাঁর স্তবস্তুতি! কত বিভিন্ন ভাবের প্রকাশ সেই সব গানের মধ্যে! বাঙালী সঙ্গীত-প্রিয় জাত! গান শুনি সহজেই তার মন স্পর্শ করে! আর, শ্যামাসঙ্গীত যেমন যুগে যুগে বাঙালীকে মাতিয়েছে তেমন আর কোন সঙ্গীতই পারে নি। হাজার হাজার গান রচিত হয়েছে, গীত হয়েছে, বাংলার শহরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে! সেই গানের মধ্য দিয়েই তা রাম প্রসাদ অমর হোয়ে আছেন রামপ্রসাদ আর কমলাকান্ত! সেই প্রাচীনকাল থেকে শ্যামসঙ্গীতের প্রভাব বাঙালীর মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই সব পূর্বসূরিদের অনুসরণ করে আজকের নবীনতম কবিও শ্যামাসঙ্গীত লিখছেন। এই অবক্ষয়ের যুগে তার পরিচয় পেয়ে আনন্দ লাগে:

"দীনতারিণী মা তোর করুণা
অনন্ত চির-অফুরান—
বঞ্চিত আমি দেখিতে না পাই
সংশয়ে ভরে মন প্রাণ।
ভাবনা ভুলায়ে অমৃত বিলায়ে
শুদ্ধা ভক্তি কর দান।

• • •

বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াই
কালী মায়ের বেটা
ভাঙড়-ভোলা বাবা আমার
নই আমি কেও কেটা।
আমি এই জেনেছি সার
ওই মহামায়া মার
একটি কণা আশিস পেলে যায় চুকে সব লেঠা!

আদি কালের কবি থেকে আধুনিক কবি কেউ বাদ যান নি। রবীন্দ্রনাথও না। মা কালীর নামে অনেক গান রচনা করেছেন তিনি:

ত্রিভুবন মাঝে আমরা সকলে কাহারে না করি ভয়
মাথার উপরে রয়েছেন কালী, সমুখে রয়েছে জয়।

• • •

কালী কালী বলরে আজ
নামের জোরে সাধিব কাজ
বলরে শ্যামা মায়ের জয়।

• •

রাঙাপদ পদ্মযুগে প্রণমি তোর ভবদারা
মণ রঙ্গে মাত মাগো, ঘোরা উন্মাদিনী পারা।

• •

এত রঙ্গ শিখেছো কোথা মুণ্ডমালিনী,
তোমার নৃত্য দেখে চিত্ত কাঁপে, চমকে ধরণী।

• • •

ঝর ঝর রক্ত ঝরে কাটা মুণ্ড বেয়ে
ধরণী রাঙা হল রক্তে নেয়ে।

• •

উন্মাদিনী নাচে রণরঙ্গে, আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
রাঙা রক্ত ধারা ঝরে কালো অঙ্গে ত্রিভুবন কাঁপে
ভ্রূ ভঙ্গে।

গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রথম যুগে ভক্তিমূলক গানেরই প্রাধান্য ছিল। তার দুতায় ছিল শ্যামাসংগীত। সে যুগের বিখ্যাত-গায়ক ছিলেন কে. মল্লিক। পুরো নাম কালের মল্লিক। তাঁর ভরাট গলায় মায়ের বন্দনা আজও যেন কানে বাজে।

রামপ্রসাদের গানের অনভিক্রমনীয় প্রভাব তো প্রবাদে পরিণত! তাঁর গান শুনে মুমূর্ষু মানুষ প্রাণ ফিরে পেয়েছে। আত্মহননোন্মুখ মানুষ নতুন আশায় উদ্দীপিত হয়েছে। তাঁর গান শুনে বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা মোহমুক্ত হয়েছিলেন, নতুন এক চেতনা পেয়েছিলেন। ভুলতে পারেননি সে গান মৃত্যুকাল পর্যন্ত!

মাগো! আমার এই ভাবনা!
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম
কোথায় যাব নাই ঠিকানা।

মহম্মদি বেগের ছুরি যখন বুকে বিঁধেছে, মৃত্যুর আর দেরী নেই, তখন নবাব সিরাজদ্দৌলার কণ্ঠ থেকে বেরিয়েছে সেই গানের লাইন—আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম, কোথায় যাব, নাই ঠিকানা।

রামপ্রসাদের গান বাংলার ঘরে ঘরে। শহরে পল্লীতে, আধুনিক জীবনের স্পর্শবিহীন সুদূর পল্লীগ্রামে। সেখানকার চণ্ডীমণ্ডপে অনক্ষর মানুষগুলি গল্প করছেন, এক পাশে বসে একমনে গাইছেন কোন মানুষ—সে গান রামপ্রসাদের:

মন, তুমি কৃষি কাজ জান না
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।

কোন পল্লীতে পথিক চলেছেন রামপ্রসাদের গান কণ্ঠে নিয়ে:

ডুব দে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।
রামপ্রসাদ বলে সেই জলে
মিলবে রতন ফুলে ফলে।

কত গান। অজস্র অফুরন্ত:—

মন যেতে চাও কেন কাশী
পাবি রে সে ফল ঘরেতে বসি
শ্বাস না ছাড়ে নয়ন মুদে শ্যামাপদে বারাণসী।

• • •

শ্যামা মা কি আমার কালো মেয়ে
লোকে বলে কালো।

• • •

কাজ কি এ সামান্য ধনে
কাঁদছে কে তোর ধন বিহনে।

রামপ্রসাদী গানে ভেসে গেছে বাংলা দেশ। এত প্রাণ, এত আবেদন, এত আকুতি, এত সারল্য, এত মাধুর্য—বাঙালী আর কোন গানে খুঁজে পায় নি।

হিন্দু যুগে বাংলার নৃপতিরা তো প্রায় সবাই ছিলেন শাক্ত! তাই শক্তির উপাসনা আর মায়ের আরাধনা। বাংলার প্রতাপ: তাঁর ইষ্টদেবী ছিলেন, যশোরেশ্বরী।

শুধু বাংলায় কেন ইতিহাসের সুদূর অতীতে বাংলা থেকে বহু দূরে রাজস্থানেও দেখি মায়ের পূজা।

আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে চিতোর ছাড়িয়ে ভারতের তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও বীর রাণা প্রতাপ কমলমীর বনের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। সেখানে আছে মা কালীর মন্দির। সেই মন্দিরের চত্বরে মায়ের মূর্তির সামনে তিনি অনুচরদের শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন—কালীমায়ের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা কর যে যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয় ততদিন সর্বপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধনে আমরা পরাঙ্মুখ হব না।

তারপর যুদ্ধের সময় শুনি রাজপুতবাহিনীর রণসঙ্গীতের মধ্যেও মায়ের নাম :—

"ধাও ধাও সবে সমর ক্ষেত্রে গাহ উচ্চে রণজয় গাথা
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে জন ওই ডাকে ভারতমাতা।
চল সমরে দিব জীবন ডালি
জয় মা ভারত, জয় মা কালী।"

'কালী মায়িকী জয়'—এই ধ্বনি একদিন শোনা গেছে আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করে। সেই ধ্বনিতে মানুষ ভুলেছে মৃত্যুভয়, মানুষের বুকে এসেছে দুর্জয় সাহস, অমিত তেজ, শত্রু দলনের অদম্য আকাঙ্খা।

এই করালরূপিণী মা বাংলার বীর সন্তানদের দীক্ষা দিয়েছেন অগ্নিযুগে। মায়ের সামনে শপথ নিয়ে বেরিয়েছেন কত শহীদ, দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। অগ্নিযুগে মায়ের এই লীলা বাঙালী কোনদিন ভুলবে না, ভুলতে পারে না!

কালী কীর্তন! মায়ের নাম কীর্তন! বাঙালীর সঙ্গীত-জীবনের এক চিরকালীন সম্পদ, চিরকালীন ঐতিহ্য।

সারা বাংলাদেশে একদা এই কালীকীর্তনের প্লাবন বইত। পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে পল্লীগ্রামের দেব-দেউলে বসত সন্ধ্যার পর পাড়ার ছেলেরা। সুরু হত কালীকীর্তন। সে কী উন্মাদনা! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মায়ের নাম!

সেই আসরে এসে বসতেন পল্লীর বয়োজ্যেষ্ঠরা, অন্য পাড়া থেকেও আসতেন গণ্যমান্য মানুষ কালী কীর্তনের আসরে।

এই শহর কলকাতায় পঞ্চাশবছর আগে দেখেছি প্রায় প্রতি পল্লীতেই কালীকীর্তনের দল ছিল। চটুল লালসা-পঙ্কিল আমোদপ্রমোদের চেয়ে এই গানের আসরেই সেদিনকার মানুষ খুঁজে পেতেন মনের আনন্দ, চিত্তের সরসতা, ভাবের উন্মাদনা! বাগবাজারের কালীকীর্তনের প্রসিদ্ধি ছিল সুদূর বিস্তৃত! সেই কীর্তনের আসরে দেখেছি হাইকোর্টের বিচারপতি ধ্যানমিলিত নেত্রে বসে মায়ের নামগান শুনছেন বিভোর হয়ে।

মায়ের কাছে ভেদাভেদ নেই। সকলকার পূজাই তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। আদি কলকাতায় তো একমাত্র জাগ্রত দেবী কালিকা। কালীঘাটের মা কালী! সবাই মানতেন সেই মাকে—হিন্দু মুসলমান ইহুদী পার্শী ক্রিশ্চান! মায়ের পূজার জন্য অর্থ দান করতে কারুর কার্পণ্য ছিল না।

বাংলার বহু পল্লীনগরেই বসে কালীপূজার মেলা! নানা আমোদপ্রমোদ ও গানের আসর বসে কোন কোন নগরে। মহামহোৎসব। সেই মেলায় জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই যোগ দেন, সবাইকার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গান করেন

"ওমা, দীনতারিণী তারা"।

কলকাতার আদি ইতিকথায় পাওয়া যায় যে চার্নক কালীর পূজা দিতেন নিয়মিত। পর্তুগীজরা তো দলে দলে কালীঘাটে যেতো! অষ্টাদশ শ্রেষ্ঠ বঙ্গ-বন্ধু সেকালের উইলিয়ম কেরী হুগলী থেকে বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দিরে আসতেন নিয়মিত! কত ভিন্নধর্মী মানুষ মায়ের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছে তার আর সংখ্যা নেই।

ফিরিঙ্গি এন্টনি কবিয়াল। তিনি তো মায়ের নামে এক মন্দিরই স্থাপনা করলেন—বউবাজারে। সেই মূর্তির প্রচলিত নাম ফিরিঙ্গি কালী!

সবাই তো মায়ের সন্তান! মায়ের সন্তানের আবার ধর্ম কী, শ্রেণী বিচার কী!

মায়ের এই অদ্ভুত আশ্চর্য প্রভাব পড়েছে বাংলার

এক শ্যামাল ছেলের উপর। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম রূপান্তরিত হয়েছেন মাতৃসাধকরূপে, শত শত মাতৃবন্দনা রচনা করেছেন—বাংলা গানের মণিমাণিক্য! বিদ্রোহী কবি নজরুল, যৌবনের কবি নজরুল আর মাতৃপ্রীতিকবি নজরুল—এ এক পরমাশ্চর্য বিবর্তন! যোষকবি মাতৃ-সাধনায় নিময় হয়েই কবি নজরুল আজ চিরদিনের মতো থামলেন, বাক্যরহিত হয়ে মনে মনে যেন তিনি অনুক্ষণ মায়ের নাম গান করেই চলেছেন :

"আমার ভবের অভাব লয় হয়েছে
শ্যামা-ভাব-সমাধিতে
শ্যামারসে যে মন আছে ডুবে
কাজ কিরে তার মদ খাওয়াতে
মধু যে পায় শ্যামা পদে
কাজ কিরে তার বিষয় মদে—
মুক্ত যে-জন যোগনিদ্রাতে
ভাবনা কি তার রোগ ব্যাধিতে।
কাজ কিরে তার লক্ষ টাকায় যোক্ষ-লক্ষ্মী যাহার ঘরে
কত রাজার রাজা প্রসাদ মাগে সেই ভিখারীর
পায়ে ধরে।
ওরা, শান্তিহরা অন্তরে যায়
দুঃখ শোকে ভয় ফিরে তার!
সে সদানন্দ সদাশিব জীবন্মুক্ত ধরণীতে॥

অথবা হয়ত বলছেন মনে মনে :

মোরে আঘাত যত হানবি শ্যামা
ডাকবো তত তোরে।
মায়ের ভয়ে শিশু যেমন
লুকায় মায়ের ক্রোড়ে॥

আমি) ছাড়বো না তোর নামের বেহান বিশ্বভুবন গেলে,
আমায় দুঃখ দিয়ে নাম ভুলাবি নইক তেমন ছেলে।
(আমার) দুঃখ দেওয়ার ছলে
(তুই) স্মরণ করিস পলে পলে
আমি সেই আনন্দে দুঃখের অসীম
সাগর যাব তরে।

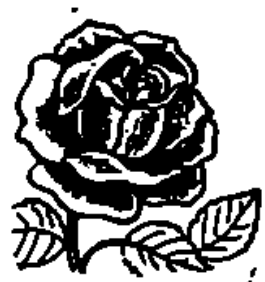

দীপালী
ঘরে ঘরে

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমোঘ "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং "বন্দেমাতরম্" জাতীয় রণধ্বনিরূপে বাংলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইতে থাকে। অল্পকাল মধ্যে "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত এবং "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি বিশেষ সমাদর লাভ করিতে লাগিল বাংলার বাহিরে অপরাপর প্রদেশেও। স্বদেশী আন্দোলনের বেগবান প্রবাহ বর্ষার পার্বত্য নদীর স্রোতের মতো দ্রুতগতিতে সমগ্র বঙ্গ ভূমিকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বরের সরকারী ঘোষণায় বিজ্ঞাপিত হইল যে পরবর্তী মাসের ১৬ই তারিখে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব কার্যকর হইবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি নেতৃবর্গ এক ঘরোয়া বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করিলেন যে, ১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইবে। সেইদিনের কর্মসূচীতে ছিল—সমস্ত দিবস কর্মবিরতি, মধ্যদিন, জনসভায় বিলাতী দ্রব্য-বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং রাখীবন্ধন। ইহাও স্থির হইল যে,—এই দিন কলিকাতায় ফেডারেশন হল বা অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা হইবে এবং জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করা হইবে। স্থিরীকৃত কার্যক্রম অনুসারে সমগ্র বঙ্গ দেশে ১৬ই অক্টোবর জাতীয় শোক-দিবসরূপে পালন করা হইল। কলিকাতার ট্রাম বাহন চলাচল, হাট-বাজার, দোকান-পাট, কল-কারখানা ইত্যাদি সমস্তই বন্ধ ছিল। সহর ও সহরতলীতে কারখানাগুলির কাজ চলে নাই পুলিস-মহলের অনুমতি না পাওয়ায়। অপরাহ্ণ ঘটিকায় "ফেডারেশন হল"-এর ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল, তখন সার্কুলার রোডে ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও মূক-বধির বিদ্যালয় মধ্যবর্তী ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র নরনারীর এক বিরাট সমাবেশ হয়। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন বসু সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি তখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। তাঁহাকে একখানি আরাম-কেদারায় শোয়াইয়া সভাস্থলে বহিয়া আনা হইল। সভাপতি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুঃখের বিষয় যে, অখণ্ড বঙ্গ-ভবনের নির্মাণকার্য পরিকল্পনা অনুসারে যথা সময়ে সম্পন্ন হইতে পারে নাই নানা কারণে বহু বৎসর পর্যন্ত সেই কার্যটি হাতে নিতে পারেন নাই কেডারেশন হল সোসাইটির পরিচালকবর্গ। স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তি বৎসর ১৯৫৫ খ্রীঃ) কেডারেশন হল-এর (২৯৪-২-১ অপার সার্কুলার রোডে) নির্মাণ-কার্য শেষ করাইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করা হইয়াছে।

ভিত্তি-স্থাপন অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরে বিশাল জনতা বাগবাজারে পণ্ডপতি বসুর বাড়ীর দিকে যায়। সেই বাড়ীর সম্মুখস্থ ময়দানে "জাতীয় ধন-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে লক্ষাধিক নরনারী সমবেত হইয়াছিল। মহানগরীর আকাশ-বাতাস মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনিত হইতেছিল সম্মিলিত কণ্ঠের "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে। বিকাল প্রায় পাঁচটা হইতে রাত্রি প্রায় এগারটা পর্যন্ত ধন-ভাণ্ডারের জন্য অর্থ-সংগ্রহের কার্য চলিল। সেই সময়ের মধ্যে সংগৃহীত হইল পঁচিশ হাজার টাকা। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইবে বলিয়া নেতৃবর্গ বুঝিতে পারেন নাই। অর্থ-সংগ্রহের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পঁচিশ হাজার টাকার প্রায় সমস্তই দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দান। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভেই বাংলার জনগণ-চিত্তে স্বদেশ-প্রেমের কি উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়াছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আদি পর্বের কাহিনী এইখানেই সংক্ষেপে শেষ হইল।

সেদিনের দীপালী উৎসব

অনাথ উপাধ্যায়

দীপালী উৎসব। রাজধানীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উৎসবের বাঁশী বাজছে। আবালবৃদ্ধবনিতা নতুন সাজে সেজেছে। প্রতিটি গৃহেই আলোকসজ্জা। রাত্রে দীপান্বিতা।

গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণ সেনের আমলে দীপান্বিতাই ছিল বছরের সবচেয়ে বড় উৎসব।

এই উৎসবের জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। আর সেই সঙ্গে আয়োজন করতেন এক বিরাট সঙ্গীতের আসর। দেশ বিদেশ থেকে বড় বড় গায়করা এসে সেই আসরে যোগ দিতেন।

সে বছর মহারাজ লক্ষ্মণ সেন এক সর্বভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। সঙ্গীত-প্রিয় রাজা ছিলেন লক্ষ্মণ সেন। ছিলেন সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ সমঝদার।

সকাল থেকে সেই প্রতিযোগিতার শুরু। শেষ হবে সন্ধ্যায়।

নানা রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা এসেছেন। রাজদরবারে আসর বসেছে। লোকে লোকারণ্য। রাজসভায় আজ সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার।

প্রাথমিক প্রতিযোগিতার পর দেখা গেল, চূড়ান্ত ও শেষ প্রতিযোগিতার জন্য রইলেন মাত্র তিনজন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়করূপে খ্যাত বিহারের নট গঙ্গো, তাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভা, আর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ [redacted]ডিস্তার বুচন মিশ্র।

শেষ প্রতিযোগিতায় প্রথমে গান ধরলেন বিদ্যুৎপ্রভা। নট গঙ্গো পুত্রবধূকে মনের মতো করে গান শিখিয়েছিলেন। অপূর্ব কণ্ঠস্বর বিদ্যুৎপ্রভার।

বিদ্যুৎপ্রভা যে গান ধরলেন তার সুরের নাম—সুহই রাগ।

গান চলতে লাগল। কখনো দ্রুত কখনো বিলম্বিত লয়ে।

সুরে সুরে সভাগৃহ নিথর নিস্তব্ধ। শ্রোতারা আত্মবিস্মৃত। এ তো গান নয়! এ যেন এক স্বর্গীয় অনুভূতি।

একটি স্ত্রীলোক কলসী করে রাজবাড়ীর বহির্বাগানের পুকুর থেকে জল আনতে এসেছিল। তার কোলে শিশু। দূর থেকে সেই গান শুনে স্ত্রীলোকটি এমনি মুগ্ধ হয়ে গেল যে কলসীর বদলে সে নিজের কোলের ছেলেকেই জলে ফেলতে যাচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝতে পেরে শিউরে উঠল!

এই খবর শুনে লক্ষ্মণ সেন ও শ্রোতারা বিদ্যুৎপ্রভাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

তারপর নট গঙ্গোকে গাইবার জন্য অনুরোধ করা হল। তিনি বললেন—আমি বৃদ্ধ হয়েছি। গলায় আর তেমন জোর নেই। তাই আমার সকল ক্ষমতা পুত্রবধূ বিদ্যুৎপ্রভাকে দিয়েছি। সে-ই আমার প্রতিনিধি। তার জয় পরাজয়ে আমার জয় পরাজয়।

অতঃপর এলো বুচন মিশ্রের পালা।

তিনি গান ধরলেন নটমল্লারী সুরে।

গান তো নয় যেন আগুনের হল্কা।

এ কী আশ্চর্য ব্যাপার!

মহারাজ, তাঁর পাত্রমিত্র আর শ্রোতারা সকলেই আগুনের তাপে ঘেমে উঠলেন। বাইরে এবং ঘরের মধ্যে সাজানো পত্রপুষ্পগুলি ঝরে পড়তে লাগল। আশ্চর্য

অদ্ভুত গান। "সুরের আগুন ছড়িয়ে গেল সকল খানে।"

ধীরে ধীরে গান থামল। প্রকৃতি আবার শীতল হল। শুধু বুচন মিশ্র। চারিদিকে তাঁর জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

মহারাজ তখন তাঁর বিচারকদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঘোষণা করলেন—আজকের এই প্রতিযোগিতায় দু'জনে যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছেন—বিহারের বিদ্যুৎপ্রভা এবং উড়িষ্যার বুচন মিশ্র। তাঁরা দু'জনে আজ জয়পত্র পাবেন।

সভায় সকলেই মহারাজের কথা সানন্দে মেনে নিলেন।

সত্যিই, বাংলাদেশে তাঁদের সমকক্ষ গায়ক গায়িকা নেই। আপশোষের কথা বটে কিন্তু গুণীকে সম্মান দেখাতে বাঙালীরা কোনদিন পরাঙ্মুখ নয়।

এই সময় এক অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী নদীতে স্নান করতে যাচ্ছিলেন। তিনি শুনলেন, দু'জন বিদেশী গায়ক-গায়িকাকে মহারাজ জয়পত্র দেবার সিদ্ধান্ত করেছেন।

স্নানে যাওয়া হল না, যুবতী চললেন রাজদরবারের দিকে।

রাজসভায় ঢুকে তিনি সোজা গিয়ে দাঁড়ালেন মহারাজের সামনে।

তাঁর দেবীর মতো জ্যোতির্ময়ী মূর্তি এবং মহিমান্বিত রূপ দেখে সভা উচ্চকিত! কে এই রমণী? কি চান তিনি?

মহারাজ বললেন—কি প্রার্থনা তোমার! অসংকোচে বল।

যুবতী বললেন—গুণদাম, আজকের আসরে গান গাইবার জন্য মহারাজ দু'জন বিদেশী গুণীকে জয়পত্র দেবেন। তাঁরাই নাকি এদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকা?

—হ্যাঁ, মা। তাই। সকলেই ত স্বীকার করেছেন।

যুবতী বললেন—এমন তো হতে পারে যে এঁদের চেয়ে ভাল সংগীত-শিল্পী আছেন—যাঁরা এ ধরনের প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না।

মহারাজ বললেন—তাঁদের সন্ধান না পেলে আমরা কি করতে পারি বল?

যুবতী বললেন—সন্ধান এখনি পাবেন মহারাজ! আমি বলছি, আমাকে এবং আমার স্বামীকে পরাজিত করতে পারলে, তবেই আপনি এই বিদেশী গুণী দু-জনকে জয়পত্র দেবেন। তার আগে নয়। বাংলাদেশ গানে যে এঁদের কাছে পরাজিত হয়েছে তা এখনো নিঃসংশয়ে বিগীত হয় নি।

যুবতীর তেজোদৃপ্ত অথচ বিনয়মধুর কথা শুনে সভাস্থলে আনন্দ গুঞ্জন উঠল।

মহারাজ পরম সমাদরে যুবতীকে বসবার আসন দিলেন এবং তাঁকে গান শোনাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

যুবতীর নির্দেশ অনুসারে মহারাজের এক পদস্থ কর্মচারী তাঁর স্বামীকে সভায় নিয়ে এলেন।

স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি বসলেন।

যেন সূর্যের ইন্দ্র, আর তাঁর পাশে শচী। সভা হল বিমুগ্ধ।

স্বামীকে সামনে রেখে যুবতী গান ধরলেন। শুরু হল সঙ্গীত জগতের এক মহানাট্য। গানের মধ্য দিয়ে মর্যাদার লড়াই!

যুবতী যে সুর ধরলেন তাঁর নাম 'গান্ধারী'!

তাঁর সেই সুর সভার চতুর্দিকে যেন ফুলের মতো ঝরে পড়তে লাগল।

সুরের রেশ রাজসভা ছাড়িয়ে আকাশে বাতাসে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সুরের এমনি আকর্ষণ যে নদীর অপর পারের নৌকাগুলো এপারে আসতে লাগল। রাজউদ্যানের পশুপাখীরাও যেন স্তব্ধ হোয়ে সেই গান শুনতে লাগল।

সুরের মধ্যে এ কী সম্মোহ, এ কী প্রাণের পরিস্ফুটন!

এক অনির্বচনীয় মায়াজাল সৃষ্টি করে সেই সুর ক্রমে মিলিয়ে গেল।—

গান যখাসময়ে থামল।

শ্রোতারা এক বাক্যে বলে উঠলেন, জয়পত্র এই যুবতীরই প্রাপ্য, কারণ তাঁর গান প্রাণহীন নৌকাকেও

ওপার থেকে এপারে টেনে এনেছে। আমাদের মনে নতুন ভাব এনেছে।

বিদ্যুৎপ্রভা ম্রিয়মান। নট গঙ্গোর দু' চোখে সপ্রশংস দৃষ্টি। কিন্তু বৃদ্ধ মিশ্র বললেন—আমি স্ত্রী-লোকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করি না। বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা হয় নি। আমরা আলাদা আলাদা গান করেছি।

তখন যুবতীর স্বামী বললেন—মহারাজ, বসন্তকালে গাছের পাতা আপনা-আপনি ঝরে। আর ওস্তাদজী যদি গানের দ্বারা সেই গাছের পাতা বা ফুল ঝরিয়ে থাকেন, তাহলে আবার গান গেয়ে সেগুলিকে সঞ্জীবীত করে তুলুন।

বৃদ্ধ মিশ্র বললেন—তা হয় না। সেরকম গান মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

যুবক আর কোন কথা না বলে মৃদু হেসে তানপুরাটি কোলে তুলে নিলেন। পাখোয়াজ নিয়ে তাঁর স্ত্রী বসলেন পাশে।

সুরু হল যুবকের গান। 'বসন্ত রাগ'।

ছোট ছোট ঢেউ-এর মতো সেই সুর যেন খেলা করে বেড়াতে লাগল। তার রেশ ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিগন্তরে। নতুনতর এক উদ্দীপনায় যেন কাঁপতে লাগল নিখিল চরাচর।

মুগ্ধ বিহ্বল শ্রোতারা শিহরিত।

শিহরণ জাগল গাছে গাছে। ডালে ডালে পাতায় পাতায় কুঁড়ি গজাতে লাগল। শুকনো ফুলে জাগল নতুন প্রাণের স্পন্দন। সবাই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল।

এ কী প্রাণ-জাগানো সুর! এ কী নব-জীবনের সূচনা।

মহারাজ, পাত্রমিত্র, শ্রোতারা সকলেই বিহ্বল। কারুর মুখে কথা নেই।

গান শেষ হয়েছে। পাখোয়াজের বোল থেমেছে। কিন্তু শ্রোতাদের মধ্যে তখনো যেন হুঁশ নেই! চারিদিকে সুচীভেদ্য স্তব্ধতা। তারপর সে আর এক নাটক—

উঠে এলেন বৃদ্ধ নট গঙ্গো। যুবককে বুকে চেপে ধরলেন। তাঁর দু' চোখে আবেগাশ্রু।

ছুটে এলেন বৃদ্ধ মিশ্র। যুবকের দু' হাত চেপে ধরে বললেন—সাবাস।

বিদ্যুৎপ্রভা এলেন যুবতীর কাছে। তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন—ধন্য তুমি। ধন্য তোমরা দু'জন।

এতক্ষণে যেন সভার মানুষদের সম্বিৎ ফিরে এলো। চারিদিকে আনন্দ ধ্বনি—জয় বাংলার জয়! জয় বাঙালীর জয়।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন থেকে নেমে এসে যুবক যুবতীর গলায় জয়মালা পরিয়ে দিলেন।

সেদিন গানের দ্বারা সারা ভারতবর্ষকে পরাজিত করে যাঁরা জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের বাঙালী কোনদিন ভুলবে না। ভুলবে না সেই দিনকার সেই বাঙালী উৎসবের স্মৃতি। ভুলবে না তারা সেদিনের সেই বিজয়ী দম্পতীকে—জয়দেব এবং তাঁর স্ত্রী পদ্মাবতীকে। সেদিনকার সেই সঙ্গীত-সভায় যে মহানাটক রচিত হয়েছিল তা বাঙালীর কাছে চিরকাল গর্বের বস্তু।

"গানের সুরে নৌকা ফেরে ধন্য পদ্মাবতী।
গাছে গজায় নতুন পাতা এমন সুরের গতি॥
রাজসভাতে চলল গান শোনেন কত গুণী।
বাংলা দেশের মান বাঁচালো সঙ্গীতেরই ধ্বনি॥
রাজ-হংসের মালা পেলেন বাঙালী দম্পতি।
অমর কবি জয়দেব আর পত্নী পদ্মাবতী॥"

এই রাত দীপালির

গৌরীশঙ্কর দে

কৃষ্ণ প্রস্তরের বুকে সোনার রেখা যেমন ক'রে ফুটে ওঠে এমন বুঝি আর কোথাও নয়। কালো মেয়ের গায়ের তলায় ভালো লাগে আলোর নাচন। বিপরীতের সমন্বয়ে রূপের প্রকাশ মানুষের চোখে ধরা পড়েছিলো সুদূর অতীতে। আদিম মানুষ অবাক হয়ে দেখেছিলো অন্ধকার রাতে দাবানলের ভয়ংকর সুন্দর রূপ। মুগ্ধ হয়েছিলো অলংকৃতা কালো মেয়ের রূপ দেখে। ভারতবর্ষের মানুষের কবি-মন প্রকাশিত হয়েছে কার্তিকের অমাবস্যাকে উৎসবের রাত্রি রূপে নির্বাচনে। এই উৎসব আলোর উৎসব। রাত্রি নিজেই সেদিন মহাকালী, ভয়ংকরী, মর্ত্যের মানুষ তাকে মনোরম্য সাজায় আলোর ভূষণে। নক্ষত্র-খচিত আকাশের প্রতিদ্বন্দ্বী যেন সেই রাতে মানুষের পৃথিবী। এই রাত দীপালির। ঘরে-ঘরে ডাক এসেছে আলো জ্বালাবার, আলো দাঙাবার। কাশ-ঝরা হিমের রাতের আঁধার রাতের ওই ডাক।

দীপালি বা দীপান্বিতা অতি প্রাচীন উৎসব। এর উল্লেখ আছে স্কন্দ, বরাহ এবং ভবিষ্যৎ পুরাণে। হেমাদ্রি, নাগানন্দ এবং বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও। হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সাহিত্যেও দীপালি উৎসবের বর্ণনা পাওয়া যায়। খ্রীঃ ৯৫৯ সালে সোমদেব বিরচিত 'যশস্তিলকচম্পূ' গ্রন্থ অনুসারে দীপালি উপলক্ষ্যে বাড়ি-ঘর রং করা হতো, সাজানো হতো শাদা পতাকা দিয়ে আর সারি-সারি প্রদীপ জ্বালিয়ে। ওই দিন মেয়েরা জুয়া খেলতো রীতিমতো উত্তেজনা নিয়ে, নগর মুখর হতো আমোদ প্রমোদ এবং উল্লাসে। সঙ্গীত লহরীর বিচিত্র কলতানে ভরিয়ে তুলতো সমস্ত আকাশ-সমুদ্র-বনানী ভরু। আলবেরুনী লিখেছেন, 'কার্তিক মাসের প্রথম দিন দিপালি। এই দিন জন-সাধারণ পুণ্যস্নান করে, ভালো জামা-কাপড় পরে, একে অন্যকে পান-সুপারী দিয়ে আপ্যায়িত করে, মন্দিরে অর্ঘ দিয়ে যায় ও দুপুর পর্যন্ত অতিবাহিত করে।

রাত্রিবেলা সর্বত্র অসংখ্য দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয়; তাতে অন্ধকার ব'লে আর কিছু থাকে না। বাসুদেবের স্ত্রী লক্ষ্মী প্রতি বছর এই দিন বিরোচন সুত বলীকে মুক্ত করেন, তাই এই উৎসব। তাই এই উৎসবের আরেক নাম বলিরাজ। বলী পূজা অবশ্য দীপালির রাতেই অনুষ্ঠিত হতো না, হতো অমাবস্যার পর দিন। ভীমূত-বাহন, লক্ষীধর এবং চণ্ডেশ্বর একবাক্যে বলেছেন, 'কার্তিক অমাবস্যার পরের প্রতিপদ তারিখে অনুষ্ঠিত উৎসবের নাম বলীরাজা প্রবর্তিনী। এই দিন সকালে লোকে জুয়া খেলে। এই খেলায় হার 'জিতের উপর সারা বছরের শুভ অশুভ নির্ভর করবে এই সাধারণের বিশ্বাস'। সেই জন্য উৎসবটির আরেক নাম দ্যূত-প্রতিপদ। এই উপলক্ষ্যে কণ্ঠ ও যন্ত্র এই দু-রকম সঙ্গীতেরই আয়োজন করা হয়। লোকে জমকালো পোষাক পরে ও বন্ধু-বান্ধবদের ভোজনে আপ্যায়িত করে। রাত্রিও অতিবাহিত হয় আমোদ-আহ্লাদে! বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং ব্রাহ্মণদের নূতন বস্ত্র ও অন্যান্য জিনিস উপহার দেয়া হয়। স্বামী-স্ত্রী উৎসবের পোশাক, অলংকার এবং পুষ্পমালা ধারণ করে এবং দীপালোকিত, চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যে আমোদিত কক্ষে রাত্রি যাপন করে। দম্পতি পুষ্প-শয্যায় শয়ন করে। এই উৎসব ওই একই দিনে গুজরাট অঞ্চলেও প্রচলিত ছিলো।

লক্ষীধর এবং চণ্ডেশ্বর ব্রহ্মপুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের জানাচ্ছেন যে এই দিন 'সুখ সুপ্তিকা' অনুষ্ঠিত

হতো। ভোজ তাঁর 'রাজমার্তণ্ড' গ্রন্থে এই উৎসবকে বলেছেন 'সুখরাত্রি'। উৎসবের দিন সকালে লোকে উপবাসী থাকতো। গোধূলিবেলায় লক্ষ্মীপূজা হতো; প্রদীপ জ্বালানো হতো গাছের ডালে, মন্দিরে, পথে, শশ্মানে, নদীতীরে, পাহাড়ের চূড়ায় এবং ঘরে। সুধাভুক্ত এবং ব্রাহ্মণকে অন্ন ও উপহার দেয়া হতো। ওই দিন লোকে নতুন পোশাক ও অলংকার পরতো এবং স্ত্রীলোক, পণ্ডিত এবং বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দিতো। কিংবদন্তী অনুসারে এই রাতেই না কি লক্ষ্মী ঘুম থেকে জেগে উঠতেন এবং সেই কারণে ভোজের মতো শ্রীমূতবাহনও একে বলেছেন 'সুখরাত্রি'। উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিলো দীপালোকিত গৃহাবলী আত্মীয়-স্বজনদের সম্মানিত করা হতো পুষ্প উপহার দিয়ে চতুর্ভুজ আরো বলেছেন যে গৌড় ও পূর্ব ভারতের লোকেরা সুখরাত্রির দিন গোধূলি-লগ্নে তুষারের পূজা করে। শ্রীহর্ষের গ্রন্থ থেকেও জানা যাচ্ছে কার্ত্তিকের অমাবস্যার নাম ছিলো 'দীপোৎসব'। হেমচন্দ্র বলেছেন অশ্বিন পূর্ণিমার পরবর্তী অন্ধকারাচ্ছন্ন দীপোৎসব-প্রকাশে অন্তর্হিত ছিলো ভাস্কর অন্য তিনি এই দীপোৎসবকে দীপালিকা নামেও অভিহিত করেছেন। হেমচন্দ্র তাঁর 'দেশী নাম মালা' গ্রন্থে দেখিয়েছেন দীপালি এবং সুখরাত্রি সমার্থক। সুখরাত্রি, সুখ সুপ্তিকা, দীপোৎসব, দীপালিকা এবং যক্ষরাত্রি একই উৎসব রাত্রির বিভিন্ন নাম।

শুরু হয়েছিলো কবে: আজো চ'লে এসেছে সেই উৎসবের ধারা। উৎসবের সন্ধ্যায় আজো ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের ঘরে জ্বলে ওঠে সারি-সারি মাটির প্রদীপ। সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মীর আবাহন ওই দীপের আলোতে। লোকের বিশ্বাস ওই দিন যে বাড়ি অন্ধকার থাকবে সেই বাড়িতে পড়বে না কমলার শুভ দৃষ্টি। ঘরদোর ও ঘরের মেঝেতে মেয়েরা দেয় নিখুঁতলি দিয়ে আলপনা, ঘরের কোনে কোনে হয় কলা বৌ আর ঝিনুক ভাসানো ঘট, দাঁ-কলম আর বাতি পুড়িয়ে আনন্দ করে। এই ভাবে যে ঘর মতো অশুভ শক্তিকে তাড়িয়ে ঘর থেকে আনতে চায় শ্রী-বা লক্ষ্মীকে।

অনেক ব্যবসায়ী মহলে দীপালিই হলো ব্যবসার দিক থেকে বছরের প্রথম দিন অনেক জায়গায় এই উপলক্ষে হালখাতার শুভ মহরৎ করা হয়। ঐতিহ্য আসছে—দীপালি এই বর্ষারম্ভের বাহক ঘরে ঘরে আসছে দান। তাই কৃষকের মনেও আনন্দ

জনশ্রুতি অনুসারে চৌদ্দ বছর বনবাসের পরে বিজয়ী রামচন্দ্র দীপালির দিনই ফিরে এসেছিলেন রাজধানীতে।

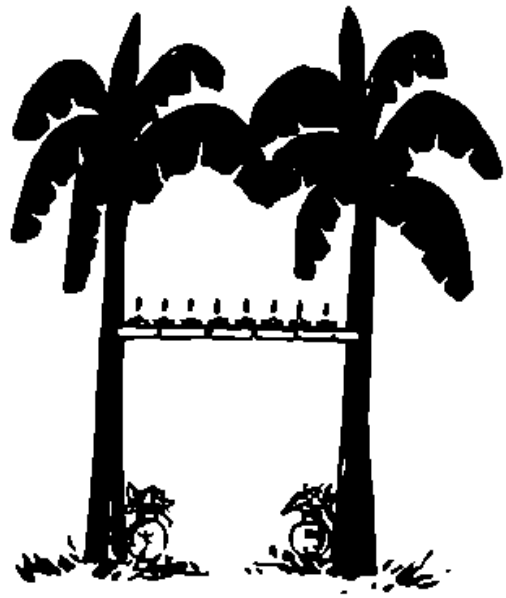

দীপান্বিতা ঃ দীপাবলী ঃ দেওয়ালী

অম্বিতাকুমারী বসু

ভারতের জনসাধারণ নানাবিধ ব্রত পূজাপার্বণ ও উৎসবে সমাজকে প্রাণবন্ত করে রেখেছে। এসব দীর্ঘজীবন উৎসবের সঙ্গে দেবদেবী সংক্রান্ত বহু সুন্দর সুন্দর কাহিনীও জড়িত আছে। ভারতের সর্বপ্রদেশে হিন্দু জনসাধারণ যে সমস্ত উৎসব বিশেষভাবে পালন করে তার মধ্যে দশরা ; দেওয়ালী ও হোলী প্রধান. আবার এ তিনটির মধ্যে বহুস্থানে দেওয়ালী উৎসবই বিশেষ করে জনপ্রিয়। এ উৎসব আবাল বৃদ্ধ বনিতার প্রাণে এক উচ্ছল আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়। হিমাচল থেকে শুরু করে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতবর্ষ আলোমালায় ঝলমল্ করে উঠে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হিন্দু এ উৎসব পরম উৎসাহে পালন করে নিজ নিজ গৃহ প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজায়। রাত্রী পোড়ায়, অমাবস্যার নিবিড় কালো আকাশ লালে লাল হয়ে উঠে।

বাংলাদেশে এই উৎসবকে দীপান্বিতা, দক্ষিণ ভারতে দীপাবলী, এবং সর্ব্বত্র দেওয়ালী বলে। অন্যান্য সব দেশে লক্ষ্মীপূজা হয় বাংলা দেশে হয় শ্যামা পূজা। যারা শাক্ত তারা গভীর রাত্রে শ্যামামায়ের পূজা নিষ্ঠা সহকারে করে। শ্যামা বিষয়ক গান কীর্ত্তনে ভক্তরা বিভোর হয়ে থাকে। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এদিনে পূর্ব্ব পুরুষের উদ্দেশে জলতর্পণ করে, সন্ধ্যায় কলাগাছের বাকলের ঠোঙ্গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে নদীতে বা দিঘীতে ভাসিয়ে দেয়। তাছাড়া রাত্রে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো হয়। কেউ কেউ সারা কার্ত্তিক মাস প্রতি রাত্রে আকাশ প্রদীপ জ্বালায়।

দেওয়ালীতে ঘরে ঘরে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে-উৎসব করার কি মূল কারণ সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত আছে। উত্তর প্রদেশের অধিবাসীরা বলে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে সীতাকে নিয়ে বিজয়া দশমীদিন অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। তার কয়দিন পরই শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। এদিন অযোধ্যানগরীতে আনন্দের স্রোত বইল রাজ্যের লোক প্রতিটি গৃহ প্রদীপমালা জ্বালিয়ে উজ্জ্বল করে তুলল সমস্ত রাজ্য আলোক মালায় উদ্ভাসিত হয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করল, নৃত্যগীতে নগর প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছিল। শ্রীরামচন্দ্রের সেই স্মৃতি রক্ষার্থে সমস্ত উত্তর প্রদেশে দেওয়ালীর দিন লোক প্রতিগৃহে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনন্দ করে

হনুমান ভক্তরা বলে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান সেবকও ভক্ত পবননন্দন হনুমানের জন্মদিন বলে তারা ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনন্দ উৎসব করে।

জৈনেরা ঐ দিনকে মহাবীরের নির্ব্বাণ দিবস বলে বিশেষ আড়ম্বরের সহিত আনন্দ উৎসব করে ও সমস্ত গৃহে প্রদীপ জ্বালিয়ে চারদিক উজ্জ্বল করে তোলে।

কারো কারো মতে গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্য এদিনে রাজ্যারোহন করেন, ও সেদিন থেকে নতুন বৎসর শুরু হয়। তাকে সম্বৎ বলে। এজন্যে সেদিন তারা গৃহে প্রদীপমালা জ্বালিয়ে আনন্দ করে।

গুজরাতে দেওয়ালীর দিন খুব আনন্দ উৎসব হয়। "বাঘবারস" বা দ্বাদশী থেকে দেওয়ালী উৎসব শুরু হয়ে যায়। সেদিন থেকে প্রতি গৃহে নারীরা নানা প্রকার লাড্ডু ও মিষ্ট দ্রব্য তৈরী করতে থাকে দেওয়ালীর জন্য। যতদিন দেওয়ালী উৎসব সম্পূর্ণ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত কেউ ঘোয়ার বা গমের রুটি খায় না, তার পরিবর্তে লুচি বা পরোটা তৈরী হয়।

"ধন তেরস্" হল ত্রয়োদশী ; সেদিন প্রতিগৃহে ধন-

লক্ষ্মীর পূজা হয় সমারোহে ও প্রদীপ জ্বালিয়ে সমস্ত গৃহ ভূলোকোজ্জ্বল করা হয়। এই উৎসবকে ছোট দেওয়ালী বলে।

এর পরদিন হল "কালী চৌদস" বা চতুর্দশী। এই রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ ও নরকাসুরের ভীষণ যুদ্ধের পর রাত্রি তৃতীয় প্রহরে শ্রীকৃষ্ণের হাতে নরকাসুর বধ হয়েছিল।

এজন্য রাত তিনটে চারটের পরই প্রতিগৃহের লোক জেগে উঠে, চারদিকে আনন্দ কলরব শুরু হয়ে যায়। সবাই সর্ব্বাঙ্গে তেল মেখে স্নান পর্ব্ব শেষ করে কাক পক্ষী ডাকবার আগে। শিশুদের গভীর নিদ্রা না ভাঙলে তাদের বলা হয় শিগ্‌গির উঠে স্নান করে নাও নইলে কাক এসে তোমার সমস্ত রূপ নিয়ে যাবে।

সেই শেষ রাত্রে একদল লোক ঘুন নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে চীৎকার করে বলতে থাকে "নরাশলকা দবরস"। প্রতিগৃহ থেকে সেই নুন একটু একটু কিনে নেয়, কেউ মূল্য দেয় একটাকা, কেউবা দেয় আট আনা বা চার আনা। যে যা দেয় সেই মূল্য নিয়েই লোকেরা খুশী মনে চলে যায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে।

আনন্দে উৎসাহে ছেলেমেয়েরা দল স্নান পর্ব্ব শেষ করে নতুন পোষাক পরে পটকাবাজী জ্বালাতে সুরু করে। আর বয়স্করা গৃহে সারি সারি মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। পটকাবাজীর ফট্‌ফট্ আওয়াজে কানে তালা ধরে যায়।

অমাবস্যার দিন হল বড় দেওয়ালী। সেদিন সবাই যে যার বাড়ী যত সুন্দর ভাবে প্রদীপমালা দিয়ে সাজাতে পারে সে চেষ্টা করে। সন্ধ্যে হতে না হতেই সমস্ত গৃহে আলো জ্বলে উঠে। মৃৎ প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোয় সমস্ত শহরগুলি অপূর্ব্ব সুন্দর হয়ে উঠে। কোন কোন ধনী গৃহে সানাই মধুর রাগিনীতে বাজতে থাকে। আর কালো আকাশের বুক চিরে অসংখ্য বাজী জ্বলে জ্বলে চারদিক রাঙ্গা করে তুলে।

অমাবস্যার পরদিন গুজরাতী নববর্ষ সুরু হয়। সবাই নববস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হাসিমুখে নববর্ষকে আহ্বান জানায়। ব্যবসায়ীরা পুরনো হিসাব-খাতা তুলে রেখে নতুন খাতায় হিসাবপত্র লিখে।

পুরাণে নাকি লিখিত আছে যে চারবর্ণের জন্য ভগবান বিষ্ণু চারটি বিশেষ উৎসব নির্দেশ করে দিয়েছিলেন, যথা ব্রাহ্মণের জন্য শ্রাবনী, নতুন উপবীত গ্রহণ ও উপনয়ন) ক্ষত্রিয়ের জন্য দশরা, বৈশ্যর জন্য দেওয়ালী ও শূদ্রের জন্য হোলী। কিন্তু এই বিধি থাকা সত্বেও শ্রাবনী উৎসব ছাড়া বাকী তিনটে উৎসবই সকলে পালন করে। তবে দেওয়ালী উৎসবে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের আড়ম্বরটা সত্যি বেশী থাকে। তারা দেওয়ালীর দিনে লক্ষ্মীদেবীর পূজা বিশেষ জাঁকজমকে করে। লক্ষ্মীর কৃপা পেলে রাতারাতি ভাগ্য ফিরে যায় সে সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনীও প্রচলিত আছে

এ সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী সব সাধারণ অল্প বিস্তর বিশ্বাস করে। তাই কাহিনীর বাচকদলের মত নিজ নিজ ভাগ্য ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করবার জন্য গৃহেগৃহে দেবীলক্ষ্মীকে দেওয়ালীর দিনে অতি নিষ্ঠ সহকারে আরাধনা করে ঐশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মী তাঁর মোহিনমূর্ত্তিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে আছেন হাতে তাঁর পদ্ম কমল। তাঁর মৃণাল-ভুজ উদ্যত হয়ে আছে ঐশ্বর্য্য বিতরণের জন্য। কিন্তু দেবী সহজে মানুষকে ঐশ্বর্য্য বিতরণ করতে চান না বহু সাধ্য সাধনা করলে তবে দেবীর কৃপা পাওয়া যায়

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র দেওয়ালী উপলক্ষ্যে সমস্ত পাকাবাড়ী চুনকাম করা হয়। গৃহের যত আবর্জ্জনা, নোংরা ভাঙ্গা জিনিষ বর্জ্জন করে চারদিক নির্ম্মল শুচি করে তোলে। গৃহবধূরা যে যার গৃহের সামনে আঙ্গিনায় নিপুণ হাতে রাংগোলী দিতে থাকে। রং বেরংএর গুড়ো দিয়ে নানা রকমের নক্সা ও চিত্র করাকে রাংগোলী বলে। এক বাংলা দেশেই শুধু শিটুলীগোলা দিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। তাছাড়া সর্ব্বত্র গুড়ো রং দিয়ে রাংগোলী দেয়। এটি নারীদের একটি সুকুমার বিদ্যা। প্রতিগৃহে লক্ষ্মী মূর্ত্তি বা চিত্রকে ষোড়শোপচারে পূজা করে। লক্ষ্মীর সামনের দেওয়ালীর দিন রূপোর টাকা স্তূপাকারে হলুদ ও সিন্দুর লাগিয়ে রেখে দেয়। যার এত টাকা রাখতে না পারে তারা নিজেদের রূপোর গয়নাই রেখে দেয়।

শরৎকালে আনন্দময়ী মায়ের আগমনে যেমন বাঙালীর

গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে তেমনি মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে উত্তর ভারতে ও অন্যান্য প্রদেশে দেওয়ালী উৎসবে প্রতি-গৃহে আনন্দের হাট বসে যায়। কোথাও তিনদিন, কোথাও বা পাঁচদিন ধরে দেওয়ালীর উৎসব চলে। লোকে সেগুলিকে গ্রেট দেওয়ালী বা বড় দেওয়ালী বলে। এই পাঁচ দিনেরই পাঁচটি কাহিনী আছে। প্রথম দিনকে তারা বলে ত্রয়োদশী বলে। এদিন ব্যবসায়ীদের নতুন বৎসর আরম্ভ হয়। পুরনো হিসাব নিকাশ করে নতুন খাতা সুরু করে।

দ্বিতীয় দিন হল নরক চতুর্দশী। এর কাহিনী হল, নরকাসুর অতি প্রতাপশালী অসুররাজ ছিল। তার অত্যাচারে দেবতারা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তখন দেবতা-দের অনুরোধে ভগবান বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন। মৃত্যুর পূর্বে নরকাসুর তার শেষ প্রার্থনা জানায়। হে ভগবান, বহু পুণ্য ফলে আজ তোমার হাতে আমার মৃত্যু ঘটবে। তুমি আমার একটা প্রার্থনা পূর্ণ কর। তোমার হাতে আমার মৃত্যু এই আনন্দের দিনটা যেন সবাই চিরদিন স্মরণ করে প্রতি গৃহে আলো দেয়। ভগবান বিষ্ণু তথাস্তু বলে নরকাসুরকে বধ করেন। সেই থেকে প্রতিবৎসর লোকে এই দিনে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে নরকাসুর বধ স্মরণ করে আনন্দ করে।

মহীশূর ষ্টেটে সোমনাথপুরের কেশবমন্দিরে বিষ্ণু এবং নরকাসুরের 'যুদ্ধ' প্রস্তর মূর্তিতে খোদিত আছে।

তৃতীয়দিন হল বড় দেওয়ালী। সূর্যোদয়ের পূর্বে পরিবারের সবাই গায়ে ও মাথায় তেল মেখে স্নান করে, তাদের বিশ্বাস এই তেল স্নান গঙ্গাস্নানের সমতুল্য। দেওয়ালী রাতে বহুলোকেই সারা রাত জুয়া খেলে। তারা বিশ্বাস করে দেওয়ালীর দিনে জুয়া খেললে লক্ষ্মীদেবী প্রসন্ন হন। এই জুয়াখেলা নিয়েও একটি কাহিনী রচিত হয়েছে।

—এক বর্ষার দিনে শিবপার্বতী পাশা খেলতে বসলেন বাজী রেখে। ছোটখাট জিনিষ বাজী রেখে খেলতে খেলতে প্রতিবারই শিব হেরে গেলেন। শেষ পর্যন্ত কৈলাস পর্বত বাজী রেখে তাও হারালেন। তখন শিব মহা অসন্তুষ্ট হয়ে গঙ্গা নদীর তীরে তপস্বীর ন্যায় বাস করতে লাগলেন। শিব পার্বতীর দুই পুত্র কার্ত্তিক গণেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কার্ত্তিক পিতার পক্ষ সমর্থন করে পার্বতীর সঙ্গে পাশা খেলতে বসে একে একে শিবের বাজীর জিনিষ পুনরুদ্ধার করলেন। তা দেখে গণেশ মায়ের পক্ষ নিয়ে খেলতে বসলেন এবং আবার সব জিনিস জিতে মায়ের পায়ের নীচে রাখলেন।

তখন দেবতারা দেখলেন এ তো মহা বিপদ। শিব পার্বতীর কলহে সব রসাতলে যাবে। তারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্ণু আবার শিব পার্বতীকে খেলতে বসিয়ে দিলেন আর নিজে গোপনে শিবের পাশায় ঘুঁটি হয়ে শিবকে খেলায় জিতিয়ে দিলেন। এবার পার্বতী গেলেন মহা চটে। তখন নারদমুনি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়ে দেবদম্পতির মধ্যে মিলন ঘটালেন। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে দেওয়ালীতে বাড়ী রেখে জুয়া খেলা অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হয়েছে। অন্যদিনে অবশ্য জুয়া খেলা নিষিদ্ধ।

চতুর্থ দিনে গোবর্দ্ধন পূজা হয়। একবার মথুরার গোপদের উপর দেবরাজ ইন্দ্র কোন কারণে রুষ্ট হয়ে অতিবৃষ্টি দিয়ে তাদের শাস্তি দিলেন। ব্রজবাসীদের দুঃখ ও অসুবিধার সীমা রইল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসীদের রক্ষা করতে ও ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ করতে এক অঙ্গুলী দিয়ে গোবর্দ্ধন পর্বত উত্তোলন করে রাখলেন। গোপালরা বন্যা থেকে রক্ষা পেল। এই জন্যে গোবর্দ্ধনের পূজা হয়। মহীশূর ষ্টেটের এক মন্দিরের দেয়াল গাত্রে শ্রীকৃষ্ণের গিরি-গোবর্দ্ধন উত্তোলনের নানা চিত্র খোদিত আছে।

পঞ্চম দিবসে ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া উৎসব হলে দেওয়ালীর পর্ব্ব সমাপ্ত হয়।

দেওয়ালী উৎসবে আলো জ্বালানই হচ্ছে প্রধান প্রধান আনন্দ, বাড়ী বাড়ী নগরে নগরে আলোকমালা পরানো যেমন বাংলা দেশে তেমনি মহারাষ্ট্রে কোন বৈষম্য নেই! কিন্তু বোম্বাইতে বাজী পোড়ানোর যা হিড়িক দেখেছি এমনটা আর কোথাও দেখতে পাইনে। দেওয়ালীর চার পাঁচদিন আগে থেকেই শেষ রাতে সুখ

নিদ্রা ভেঙ্গে যায় পটকাবাজীর ফট্‌ফট্‌ আওয়াজে। আর পটকাবাজীর সে কান-ঝালাপালা আওয়াজ বন্ধ হয় ভাই ফোঁটার উৎসবের পর। এক বোম্বাইতেই হাজার হাজার পটকাবাজী বিক্রী হয়। আর তা ছাড়া আরো কত বরণের বাজী জলে তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর এক বিশেষত্ব, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের বাড়ী থালাভরা মিষ্টি পাঠানো। কোলাপুর রাজ্যে দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ দেবী মহালক্ষ্মীর মন্দিরে সেদিন ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বহু লোকই "তাট" (থালা) নিয়ে যায়। মন্দিরে প্রথমে দেবীর উদ্দেশে মিষ্টির থালা দেবার পর বাড়ী বাড়ী "তাট" পাঠান হয়। আর প্রত্যেক বাড়ীতে এতো লাড়ু ও মিষ্টি দ্রব্য আসে যে খেয়ে শেষ করা যায় না। দেওয়ালীর দশবারো দিন পূর্ব্ব থেকেই বৌ ঝিরা মণ্ডা মিঠাই তৈরী করতে বসে যায়। আমাদের দেশের বিশেষ সুখাদ্য ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, পানতোয়া, চমচম্ এরা জানে না। কিন্তু তার বদলে এরা তৈরি করে চিওড়া, কাজুলা, কড়বোলে, নেউ, বেসন ও শুজির লাড়ু ইত্যাদি আরো নানা প্রকার মুখরোচক খাদ্য।

কোলহাপুর রাজ্যে দেওয়ালীর জৌলুষটা একটু বেশী। অনেক বৎসর পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ তিনটির যা আলোক সজ্জা দেখেছি তার তুলনা নেই, কোলহাপুরে আর মহীশূরে দেওয়ালীর সময় রাজ প্রাসাদগুলিকে সামান্য অন্তর করে রং-বে-রং-এর বাল্ব লাগিয়ে প্রাসাদের প্রত্যেকটি রেখাকে উজ্জ্বল করে তোলা হয় আর অন্ধকারে সে প্রাসাদগুলি আলোমালায় ঝলমল করে মায়াপুরীর সৃষ্টি করে। অপূর্ব্ব আলোক সজ্জায় সজ্জিত মহীশূরের রাজপ্রাসাদকে "সোল্ডেন প্যালেস" বলে।

দিল্লীতে দেওয়ালীর আলোক সজ্জার বৈশিষ্ট্য নেই, কারণ পরেরই আসছে, ২৬শে জানুয়ারী এবং সময় সময় বিশিষ্ট রাজা ও প্রতিনিধিদের আগমনে প্রেসিডেন্ট ভবন, পার্লামেন্ট হাউস, সেক্রেটারিয়েট ও বহু সরকারী ভবন এবং তৎসংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষগুলি লাল, নীল, সবুজ, হলদে ইত্যাদি নানা রং-এর বাল্ব দ্বারা সজ্জিত হয়ে পরী রাজ্যের সৃষ্টি করে। ইণ্ডিয়া গেটের সুবৃহৎ মেহরাবগুলি নিত্যই রঙ্গীন আলোকমালা পরে মোহিনী মূর্ত্তিতে সকলকে আকৃষ্ট করে। দিল্লীর অধিবাসীদের নয়ন ঝলসানো আলোকমালার অন্তরাল সৃষ্টি দেওয়ালীর মৃৎ প্রদীপের অথবা মোমবাতির স্নিগ্ধ আভার বৈশিষ্ট্য দেখতে পায় না। তবে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ দিল্লীর দেওয়ালী মেলা লোকদের বিশেষ আকৃষ্ট করেছে। লাল কোর্টরা গার্ডেনের আলোক সজ্জা অপূর্ব্ব। বৈদ্যুতিক আলোর সঙ্গে অজস্র প্রদীপের আলোকমালায় স্থানটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। সুউচ্চ ফটকের উপর নহবৎখানা তৈরী করা হয়। সেখানে রাজস্থানী চং-এ জরির পোষাকে সুসজ্জিত বাদকরা মধুর রাগিণীতে সানাই বাজিয়ে সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি করে। মেলায় ছোট ছোট দোকানে অজস্র প্রদীপ জ্বালিয়ে কলেজের ছাত্রীরা ফ্যান্সি ড্রেসে সেজে নানাবিধ কাঁচের চুড়ি, গলার মালা ইত্যাদি চড়া দামে বিক্রী করে। সুন্দরী তরুণী ছাত্রীরা রাজস্থানী নারীর পোষাক ও গয়নায় সজ্জিতা হয়ে আসে। বহু উজ্জ্বল রং-এর ওড়ির ওড়না ঘাঘরা, রঙীন চোলী, ঝিলমিলে রঙীন ওড়না, আর রূপোর গয়নায় সজ্জিত হয়ে তারা যখন পায়ের নূপুর ঝমঝম্ করে বাজিয়ে চলে তখন অধিকাংশ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি সেদিকেই আকৃষ্ট হয়।

পঞ্জাবের অমৃতসরে দেওয়ালীর দিন শিখদের বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দিরে অপূর্ব্ব আলোক সজ্জা হয়। লক্ষ লক্ষ লোক পঞ্জাব ও আশে পাশের স্থান থেকে এসে অমৃতসরে ভিড় করে। ঐদিন শিখদের গুরুগুরু হর গোবিন্দের জন্মদিন তাই শিখরা খুব আড়ম্বরে উৎসব করে। প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ীঘর উজ্জ্বল করে তোলে।

দিল্লীর আশে পাশের মথুরা বৃন্দাবনেও গ্রামগুলিতে অধিবাসীরা পরম উৎসাহে দেওয়ালীর উৎসব করে। তারা তিনদিন ধরে দেওয়ালীর উৎসবে আলো জ্বালায়। প্রথম দিন হল ছোট দেওয়ালী, সেদিন বাড়ী বাড়ী শুধু পাঁচটি প্রদীপ জ্বালায়। দ্বিতীয় দিন হল বড় দেওয়ালী, সেদিন গৃহাঙ্গণে একটি প্রদীপ সারারাত জ্বালিয়ে রাখে পরের দিন সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত। সেদিন যে যার

সামর্থ ও রুচি অনুযায়ী বহুসংখ্যক প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরের শোভা বাড়ায়। বড় দেওয়ালীর গভীর রাত্রে লক্ষ্মী পূজা হয়। লক্ষ্মীর সামনে একশ টাকা থেকে সুরু করে হাজার টাকা পর্য্যন্ত যে যা পারে তত টাকা রেখে হলুদ ও সিঁদুর লাগায়। যাদের এত রূপোর টাকা নেই, তারা নারীদের রূপার অলঙ্কার যথা গলার হাঁসুলী, হার, হাতের কাঁকন ইত্যাদি রেখে ষোড়শোপচারে লক্ষ্মীপূজা করে।

তৃতীয় দিনে গোবর্দ্ধন পূজা হয়। সকাল বেলা পুরুষ লোকেরা গোবর দিয়ে বড় করে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি বানায়। এই পূজা পাড়ার লোকেরা একত্র হয়ে করে। গোবরের কৃষ্ণ-মূর্ত্তির পাশে মাখন তোলবার ঘুটনি, চাল ছোটার মুষল ও গরু তাড়াবার একটি লাঠি রাখে। সন্ধ্যার অন্ধকার গভীর হলে রাত্রে নয় দশটার সময় পুরুষ লোকেরা একত্র হয়ে গোবর্দ্ধন পূজা করে। রুটিতে ঘি ও চিনি মেখে মুঠি পাকিয়ে মূর্ত্তির মুখের উপর রাখে। পাশে মাটির ভাঁড়ে পানীয় জল ও অন্য পাশে ঘি-এর প্রদীপ থাকে। যথারীতি পূজা করে পুরুষরা সবাই মিলে মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান করে। সে সব গীতের নাম হল হিরো।

হিরোরে রে হিরো, অবয়বে এক বোঝারি
জঙ্গল রে এক বোঝারি, ভিস্‌মে ভঁইস পঁচাশ
টিকেওয়ালী হাটলেও, ভিস্‌কা দুধ মিঠসে।

অর্থ হল হিরোরে হিরো, আকাশে এক ঘাসের ঝোপ জঙ্গলেও এক ঘাসের ঝোপ। তাতে পঞ্চাশটি মোষ আছে, তা থেকে একটি মোষ বেছে নাও যার কপালে সাদা চাঁদের টিকা আছে। আর তারই দুধ মিঠে হয়। এভাবে বহু রসের ছাতরস যুক্ত গীত গেয়ে নৃত্য করে পুরুষ লোকেরা সারারাত আমোদ আহ্লাদ করে। ভোরে নারীরা গোবর্দ্ধন মূর্ত্তি ভেঙ্গে গোবর দিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে। এবং যারা যারা রাত্রে পূজো করেছিল তাদের প্রত্যেকের বাড়ীতে এক একটি ঘুঁটে দিয়ে আসে। তারপর ভাইফোঁটা উৎসব করে দেওয়ালী পর্ব্ব সমাপ্ত করে।

দেওয়ালীর অমাবস্যা রাতে লক্ষ্মী পূজার পূর্ব্বে রাত বারোটাতে তারা নিজ নিজ শিশু সন্তানের মঙ্গলার্থে কিছু কিছু তুকতাক করে। একটা বৃংশারে ফুল, সাত রকমের মিঠাই, পুরী, ক্ষীর, হালুয়া বা যা তৈরী হয় তা সাজিয়ে দিয়ে চৌরাস্তায় রেখে আসে। পাশে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। পরদিন ভোরে হয় সে নৈবেদ্য কালো কুকুরে খায়, নয়ত মাদুদায় নিয়ে যায়। এই প্রকরণের নাম "সৈনিক"!

সুদূর নেপালেও দেওয়ালী এবং লক্ষ্মীপূজা বিশেষ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। নেপালীরা পাঁচদিন ধরে এই উৎসব করে ও দেওয়ালীকে পঞ্চক বলে। তবে তাদের পূজার বৈশিষ্ট্য আছে। তারা জীব জন্তুকে দেওয়ালী উৎসবে বিশেষ যত্ন ও আদর দেখায়।

প্রথম দিনে তারা গরু পূজা করে, সবৎসা গাভীর কপালে চওড়া করে সিঁদুর লেপে তাতে আবীর মাখা চাল ও ধান বসিয়ে দেয়। তারপর শাঁখ বাজিয়ে মন্ত্রপাঠ করে যথা বিহিত পূজা দেয় ও ভাল করে খাওয়ায়। সন্ধ্যার ঠোঙাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের পরিবে নদী বাগমতী বা তার শাখা বিষ্ণুমতী নদীতে ভাসিয়ে দেয়। সারি সারি প্রদীপ আলো শিখা নিয়ে ভাসতে ভাসতে চলে যে পর্য্যন্ত না ঢেউ-এর তোলায় জলের নীচে তলিয়ে যায়।

দ্বিতীয় দিনে তারা কাক ভোজন করায়। বাড়ীর গৃহিণীরা সকালে নানারূপ রান্না করে বাড়ীর সামনে অনেকগুলো গাছের পাতা ছিঁড়ে বিছিয়ে দেয় ও তার উপর সে সমস্ত পাকান্ন পরিবেশন করে কাকগুলির জন্য। ঐদিন তারা কাককে কোন উচ্ছিষ্ট খেতে দেয় না। যখা সময়ারোহে কাকের দল ভোজন পর্ব্ব সমাপ্ত করে।

তৃতীয় দিন আসল দেওয়ালী, সেদিন প্রাতে কুকুরকে সমাদর করা হয়। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দেয় ও খুব যত্ন করে ভাল ভাল খাবার খেতে দেয়। সেদিন কুকুরের প্রতি কেউ দুর্ব্যবহার করে না। দেওয়ালীর দিন সারা শহরে আনন্দের বন্যা ছুটে। বিশেষ করে কাঠমাণ্ডু শহরে। এদিন বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করেন। তাতে লোকের যত দুঃখ কষ্ট, অমঙ্গল দূর হয়ে যায়। তাই সবাই আনন্দোৎসব করে। রাত্রে অঁকিজয়কে লক্ষ্মীপূজা হয় এবং বাজী রেখে খুব জুয়া খেলার ধুম পড়ে যায়।

চতুর্থ দিন প্রাতে আবার গরুপূজা হয়। এদিনের

উৎসব বিশেষ করে বলীরাজের জন্যে। মহারাষ্ট্রে এদিন বলীরাজের পূজা হয়। দৈত্যরাজ বলী অতি পরাক্রমশালী ছিলেন। তিনি দেবতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন, তখন দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বামন অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে বামনদেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন। অসুররাজ তথাস্তু বলেন। বামনদেব এক পা স্বর্গে, আর এক পা মর্তে রাখেন। নাভি নির্গত তৃতীয় পা রাখবার জন্যে স্থান চাইলে বলীরাজ নিজের মস্তক অবনত করে দিলেন। তখন বামনদেব বিষ্ণু তৃতীয় পা বলীরাজের মস্তকে রেখে তাকে পাতালে প্রবেশ করিয়ে দেন। এভাবে চাতুরী করে বিষ্ণু বলীকে রাজ্যচ্যুত করলেন।

ধার্মিক বলীরাজ বৎসরে অন্ততঃ একদিনও যেন নিজ রাজ্যে ফিরে আসতে পারেন বিষ্ণুর কাছে এই প্রার্থনা করলে বিষ্ণু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। সেই থেকে প্রতি বৎসর এই দিনটিতে বলীরাজ নিজ রাজ্যে ফিরে আসেন এই ধারণায় বলীভূত হয়ে সকলে আনন্দ উৎসব করে।

মধ্যপ্রদেশে নানাস্থানে আদিবাসীরাও দেওয়ালী উৎসব করে। তারা শস্য ক্ষেতে, মাঠে ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে অপদেবতা তাড়ায়। ওঝা যাদুকর ও ডাইনী তারা নানা-রূপ তুক তাক করে। শ্মশানে ও কবরস্থানে গিয়ে তারা মন্ত্রতন্ত্র আউড়ে ভূত প্রেতকে বশীভূত করে এবং নিজেদের দেবতার পূজো দিয়ে সারারাত নাচগান করে।

দেওয়ালী উপলক্ষ্যে ভারতের নানাস্থানে নৃত্যগীত হয়। উত্তর ভারতে আহীর গোয়ালাদের নৃত্য বড় সুন্দর। তারা পায়ে ঘুঁঘুর বেঁধে হাতে বাঁশী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সাজে এবং সুন্দর নৃত্য করে। রাজস্থানে নারীরা রং বে-রং-এর পোষাকে সজ্জিত হয়ে "ঘুমর" নৃত্য করে। রাজস্থানী পুরুষ ও নারীদের তরবারি নৃত্যও অতি চমৎকার।

প্রদীপ মালায় বাড়ী সাজিয়ে বাজী পুড়িয়ে নানা নৃত্য গীতের ও আনন্দ উচ্ছ্বাসের ভিতর দিয়ে লোকেরা দেওয়ালী উৎসব প্রতি বৎসর মহা সমারোহে সম্পন্ন করে। দেওয়ালীর পর দ্বিতীয়াতে ভাই ফোঁটা বা ভাইদোজ উৎসব হয়। বোনেরা ভাইদের কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দীর্ঘজীবন কামনা করে নববস্ত্র উপহার দেয় সুখাদ্য খাওয়ায়। একটি অতি সুন্দর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়েই হিন্দুদের সার্বজনীন শরৎকালের অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পূর্ব বাংলার সেকালের কালীপূজা

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য

পূর্ব বাংলায় শ্যামাকালী পূজোর যে একটা খুব ঘটা হ'তো তা' নয়। শ্যামা কালীর বারোয়ারী পূজো হতোই না। কেবল মাত্র রক্ষাকালীর কোন কোন সময় বারোয়ারী পূজার আয়োজন করা হ'তো। তা'তে আনুষঙ্গিক উৎসবের মত আড়ম্বর হতো পূজার তত ব্যয় হ'তো না। শ্যামা কালী পূজার সঙ্গেই দীপান্বিতা অনুষ্ঠানের যোগ ছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ছোট বড় নানা সহরে দীপান্বিতা উদ্‌যাপিত হ'লেও গ্রামে তার চিহ্ন মাত্রও দেখা যেত না। দীপান্বিতা অনুষ্ঠানটি একটি নাগরিক অনুষ্ঠান মাত্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে দীপান্বিতা উৎসবটি কালীপূজোর একটি অপরিহার্য অঙ্গও নয়, মনে হয় বাংলা দেশে জৈন ধর্মের প্রভাব বশতঃ কালীপূজোর সঙ্গে এসে তা যুক্ত হয়েছে। দীপান্বিতা মূলতঃ একটি জৈন উৎসব। বৌদ্ধ ধর্মাচারের সঙ্গেও তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এখনও বাঁকুড়া পুরুলিয়া জিলার কোন কোন পণ্ডিতাক্ত বৌদ্ধ কিংবা জৈন মন্দিরে হিন্দু দেব শিবের প্রতিষ্ঠা হ'লেও তা'তে প্রদীপ দানের প্রথা প্রচলিত আছে।

পূর্ব বাংলায় দুর্গাপূজাও একটি ব্যাপক প্রচলিত লৌকিক উৎসব ছিল না। বরং পূর্ব বাংলার মনসা পূজাকে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত লৌকিক উৎসব বলা যেতে পারে, কিন্তু দুর্গা পূজা কিংবা কালী পূজা তা' নয়। পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন কালী মন্দির আছে। কোন কোন মন্দিরে দৈনিক পূজা হ'তো। শ্যামা পূজার দিন বিশেষ পূজোর ব্যবস্থা হ'তো। তা'তে সেদিন প্রদীপ দানেরও ব্যবস্থা থাকত। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের বাস ভবন আলোক মালায় কদাচ সুসজ্জিত হ'তো না। একমাত্র নগর, বন্দরে তার ব্যতিক্রম ছিল।

পূর্ব বাংলার যে সকল বাড়ীতে দুর্গাপূজা হ'তো (বারোয়ারী বা সার্বজনীন পূজার তখনও প্রচলন ছিল না) তা'দের বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা যেমন অবশ্য কর্তব্য ছিল তেমনই শ্যামা কালী পূজোও অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু তা'তে কোন আড়ম্বর হ'তো না। যে গ্রাম্যশিল্পী দুর্গার প্রতিমা গড়তেন, তিনি দুর্গা প্রতিমা গড়া শেষ করে কালীর ছোট একটি প্রতিমা গড়ে রাখ্‌তেন। তাতে রং দেওয়া হ'তো না। তারপর যখন কালী পূজোর দিন আসত, তখন তিনি সেই অসম্পূর্ণ কালী প্রতিমাটিকে সম্পূর্ণ ক'রে দিতেন, সেই রাত্রেই তার পূজো হ'তো। শিল্পী পূজোর পর সেই গৃহে প্রসাদ পেতেন পূজোর শাক্ত কিংবা স্মার্তের গৃহেও বলিদান হ'তো একটি মাত্র পাঁঠা। পূজো শেষ হয়ে গেলে সেই রাত্রেই সেই পাঁঠার রান্না করা মাংস গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণও প্রসাদ পেতেন। প্রসাদী মাংস কখন বাসি করা যেত না।

যদি কারো কোনো মানসিক থাকত তবে অনেক ক্ষেত্রে একাধিক বলিও হ'ত। কিন্তু মানসিক করা সাধারণতঃ রক্ষা কালীর পূজোর বারোয়ারী ক্ষেত্রেই হ'তো শ্যামা কালীর ব্যাপারে বড় একটা হ'তো না। সেই জন্য শ্যামাকালীর পূজো নিতান্ত অনাড়ম্বর ভাবে একটি পাঁঠা বলিদান ক'রেই উদ্‌যাপিত করা হতো। এই সব ক্ষেত্রেও দীপান্বিতার খুব একটা আড়ম্বর দেখা যেত না। পূর্ব বাংলার ধনী লোকের গৃহও প্রায়ই কোঠাবাড়ী ছিল না। সুতরাং ছাদের উপর দীপ-সজ্জার কোন উপায় থাকত না। সাধারণ পূজা-মণ্ডপের বারান্দার উপর কাঁঠাল পাতা দিয়ে তৈরী ভেলাধারে সলতা দিয়ে মাত্র কয়েকটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হতো। কখনও বাড়ির সামনে

কলাগাছ পুঁতে তাতে বাখারির উপর গোবর দিয়ে প্রদীপগুলো বসিয়ে দেওয়া হতো। তাদের আলোকমালার সৌন্দর্য উল্লেখযোগ্য হতো।

পূজোর বসে পুরোহিত একটি মন্ত্র উচ্চারণ করে সেই দীপ শ্যামা কালীর নামে উৎসর্গ করতেন। গ্রামের মধ্যে যে বাড়ীতে কালীপূজো হ'তো না তাতে কোন আলোক-সজ্জা হতো না।

ক্রমে মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের দ্বারা পূব বাংলার বাজার, বন্দর ছোট ছোট ব্যবসা কেন্দ্রগুলো ছেয়ে যেতে লাগল। তারা কার্তিক অমাবস্যা তিথিতে সেই দীপান্বিতা বা দেওয়ালী উৎসব করতে আরম্ভ করল, বাজারের ছোট বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরাও তা অনুকরণ করতে লাগল। এই ভাবেই পূব বাংলার হাটে, গঞ্জে, বন্দরে, বাজারে দীপান্বিতার অনুষ্ঠানটি বিস্তার লাভ করল। ক্রমে গ্রামের ধনী গৃহস্থরাও তা অনুকরণ করতে লাগল। কিন্তু তার আগে এমন অবস্থা ছিল না।

পূব বাংলার নানাস্থানে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 'কালী বাড়ী' ছিল। সেগুলো যে দেশের নর নারীর তীর্থস্থান ছিল। তাদের মধ্যে অধুনা বাংলা দেশের মেহেরের কালীবাড়ী, ঢাকা জিলার ঢিলিয়াসপুরের কালীবাড়ী, ঢাকা শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রমনার কালীবাড়ী (গত বাংলা দেশের যুদ্ধে পাক সৈন্য এটিকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে) খুব প্রসিদ্ধ ছিল। বিশেষ বিশেষ তিথিতে এগুলোতে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে কালীপূজো হ'তো। সর্বত্রই বলিদান হ'তো। বলির সংখ্যা শতাধিক প্রায় সর্বত্রই ছিল। শ্যামাকালী পূজা উপলক্ষেও এ'সব ক্ষেত্রে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা ছিল। ক্রমে দীপান্বিতা অনুষ্ঠানটিও এসে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল।

পূব বাংলার উপর ক্রমে বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল। তখন কালীপূজোর সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের একটি সামঞ্জস্য স্থাপনের প্রয়াস দেখা দিল। কিন্তু এ'দের মধ্যে ব্যবধান এত ব্যাপক যে সামঞ্জস্য স্থাপন যে শেষ পর্যন্ত খুব সার্থক হ'লো তা' নয়। দেখা গেল, এই সকল কালীমন্দিরে জগন্নাথের রথের অনুকরণে ছোট এবং মাঝারি ধরণের রথ তৈরী হল এবং রথযাত্রার তিথিতে কালী মূর্তিকে রথের উপর স্থাপন করা হতো। রমনা কালী বাড়ীতেও অনেকেই এমন একটি রথ দেখে থাকবেন। আমি একবার সেই রথে কালীকে স্থাপন করতে দেখেছি এবং রথে জগন্নাথের মূর্তি তুলবার পর যেমন তা'তে নানা ফল ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তা'তেও তেমনই ফল ছুঁড়ে দিতে দেখেছি।

ভারতবর্ষের পূব উপকূলে যারা ভ্রমণ করেছেন, তারা দেখে থাকবেন যে সেখানে ক্যাথলিক গ্রামগুলোতে গীর্জার পাশেই এক একটি স্তম্ভের চূড়ার মত উঁচু এক একটি রথ রয়েছে। বড় দিন, ইষ্টার এই সকল খৃষ্টান পর্ব উপলক্ষে তা'তে মাতা মেরী সহ যীশুর এক মূর্তি স্থাপন করা হয় এবং যেখানে রথ-ধাবার মত রাস্তা (car road) আছে, সেখানে সেই ভাবে রথকে পথে টেনেও নিয়ে যাওয়া হয়।

রমনার কালী বাড়ীতে যে কাঠের রথটি ছিল তা'তে সময় সময় কালীমূর্তিকে নিয়ে স্থাপন করা হ'লেও সে রথ পথ দিয়ে কোনদিন টেনে নিয়ে যেতে দেখি নি। কিংবা কালীবাড়ীর মন্দিরাভ্যন্তরে পাথরের যে বিশাল কালী মূর্তিটি ছিল, তা'কেও কোনদিন তার আসন থেকে নামিয়ে নিয়ে রথে তুলতে দেখি নি। অন্য একটি কালী মূর্তি এই উপলক্ষে ব্যবহার করতে দেখেছি। এই রকম সমন্বয়ের আর একটি দৃষ্টান্তও আমি লক্ষ্য করেছি। পূব বাংলার প্রত্যেক জেলা এবং মহকুমা সহরে এক একটি করে কালী বাড়ী আছে। তা' প্রকৃতপক্ষে বারোয়ারী কালীবাড়ী। নগরের রক্ষয়িত্রী দেবীরূপেই সাধারণতঃ তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। অর্থাৎ গ্রাম্য জীবনে যেমন গ্রাম-দেবতা গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলে পরিকল্পিত হন, তেমনি নাগরিক জীবনে কালীবাড়ীর কালীও নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে সাধারণতঃ কল্পিত হয়ে থাকেন। নাগরিক জীবনে তিনি কালীরূপে পরিচিত হলেও তাঁর মন্দিরে কালী ভিন্নও নানা দেব দেবীর বিগ্রহ থাকে, উপযুক্ত তিথি অনুযায়ী তাদেরও পূজা হয়। সেই সূত্রে কালীবাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং শালগ্রাম শিলাও রক্ষিত হয়ে থাকে।

বৈষ্ণবদিগের একটি প্রধান উৎসব ঝুলন। তাতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ একটি দোলার উপর স্থাপন করে দোলাটি শূন্যে তুলে ঝুলানো হয়। পূর্ব বাংলার কোন কোন কালীবাড়ীতে (বিশেষ করে ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের কালীবাড়ীর কথা আমি জানি), কালীর বিগ্রহকে দোলনার উপর ঝুলিয়ে তা দোলা শুদ্ধ ঝুলানো হয়। যদিও রাধাকৃষ্ণের ঝুলনেরই প্রসিদ্ধি আছে, তথাপি এখানে কালীরও ঝুলন হচ্ছে। এই সকল কালীবাড়ীর কালী শ্যামাকালী কিংবা রক্ষাকালী বিশেষভাবে কিছুই নন, ও শুধু সাধারণ ভাবে কালী। তাদের নিত্য পূজা যেমন হয়, নিত্য পূজার সঙ্গে সঙ্গে নৈমিত্তিক পূজাও হয়। এই কালীর কোন কোন স্থানে এক একটি বিশেষ নামও শুনা যায়। যেমন দয়াময়ী করুণাময়ী। এই সকল ক্ষেত্রে কালীবাড়ী না ব'লে দয়াময়ীবাড়ী কিংবা করুণাময়ী-বাড়ী ব'লে উল্লেখ করা হয়। শহরের হিন্দু অধিবাসীর তা' একটি সংস্কৃতিক কেন্দ্রও হয়ে দাঁড়ায়। সারা বছর সেখানে কীর্তন, যাত্রা, কথকতা ইত্যাদি সব কিছুরই অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে সেখানে কালীর সামনে বলিদানও বন্ধ হয়ে যায়।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করবার আগে পূর্ব-বাংলায় কালী পূজোর বিশেষ প্রভাব ছিল ব'লে অনুভব করা যায়। কারণ, কামরূপের কামাখ্যা তীর্থের প্রভাব সে অঞ্চলে খুব ব্যাপক ছিল। কিন্তু তা বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল মাত্র। তা' তান্ত্রিক নামে পরিচিত ছিল। তান্ত্রিক সমাজের প্রভাব বিশেষ একটি গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ সমাজের মধ্যে তার প্রভাব সামগ্রিক ভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি। তবে বলির প্রথা তান্ত্রিক সমাজেরই প্রভাবের ফলে যে প্রবর্তিত হয়েছিল, তা অস্বীকার করবার উপায় নাই।

দীপান্বিতায় তৈলাধার হিসাবে কাঁঠাল পাতার খড়কে দিয়ে তৈরী এক রকম পত্রপুট ব্যবহার হ'তে আমি দেখেছি। তারপর কুমোর বাড়ী থেকে কেনা ছোট ছোট মৃন্ময় তৈলাধারও ব্যবহার হ'তে আমরা দেখতে পেতাম। শেষ পর্যন্ত মোমবাতির ব্যবহারও দেখা গেল। কালী পূজোর পুরোহিত মহাশয় বলতেন, মোমবাতি বিশুদ্ধ নয়, দেব-কার্যে তা ব্যবহার করা যেতে পারে না। সাধারণ দোকানে বাজারেই মোমবাতির ব্যবহার হতো। সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে সংসারই মৃৎ নির্মিত প্রদীপ দেওয়ারই রীতি ছিল।

কৃষ্ণনগর এবং কুমারটুলীতে যে সুন্দর শ্যামাকালীর প্রতিমা নির্মাণ করা হয়, তা' পূর্ববঙ্গে কোন দিন দেখা যেত না। এত যত্ন ক'রে শ্যামাকালীর ধ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে এত সুন্দর প্রতিমা এখানে আসবার আগে আমি কোনদিন দেখি নি। সেখানে গায়ের রঙে কিংবা মুখের ভঙ্গিতে কোন বিশেষত্ব দেখা যেত না। রক্ষাকালীর পরিধানে একটা ব্যাঘ্রচর্ম থাকত, শ্যামাকালীর কিছুই থাকত না, তবে পূর্ববঙ্গে সকল কালীরই লেলিহান জিহ্বা থাকত। এখানে যেমন জিহ্বায় লজ্জার ভাব প্রকাশ পায়, সেখানে তা পেত না।

দক্ষিণের দীপাবলী

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

কন্যাকুমারী থেকে ভারতবর্ষকে দেখেছ? আহা, মানচিত্রটাই দেখনা। পূব-পশ্চিমের ভূ-খণ্ড কিভাবে সরু হয়ে নেমে এসে মিশে গেছে ভারত-মহাসাগরে। নতুন বর্ষার মেঘের মতো গাঢ় নীল সমুদ্রের বুক থেকে স্নান করে উঠে আসছে মা—সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ। পাথর নয়, মাটি নয়—মা। গর্ভ-ধারিণী জননী। এই ভারত ভূ-খণ্ডের সর্বজীবের জননী। সদ্যস্নাতা সিক্ত-বসনা, চিকুর সিন্ধু-শিকর-লিপ্ত। মায়ের পায়ের পাতার বুড়ো আঙুলটি এখনও ছুঁয়ে আছে ফেনায় ফেনায় উচ্ছল সমুদ্রের জলকে। অমন ফেনায় ফেঁপে পড়া নীল নীল সমুদ্র দেখলে কার না সাধ যায় জলে একটু পাটা ডুবিয়ে দাঁড়াই। বাঁয়ে বঙ্গোপসাগর, ডাইনে আরবসমুদ্র, আর সামনে ধু-ধু করছে জলের মরুভূমি, ভারত-মহাসাগর। পূব-পশ্চিম-দক্ষিণ যে দিকে তাকাও নীল, সবুজ, ফিকে নীল, গাঢ় নীল এক নীলেরই কতো বিচিত্রবর্ণ। জল, জল, শুধু জল। সে জল-তরঙ্গ সুর বয়ে নিয়ে আসছে পশ্চিম থেকে মধ্য এশিয়ার ইরান-তুরান-আরব-মিশর-গ্রীস-রোম-ফ্রান্স-বৃটেনের। পূব থেকে আসছে দীপময় ভারতের প্রাচীন সুরটি, বালি-জাভা, শ্যাম, মালয়, চীন, জাপানের। দক্ষিণ থেকে আসছে নারিকেল গুচ্ছে ঘেরা প্রবাল দ্বীপপুঞ্জের মর্মর গান।

আর উত্তরে? মায়ের পা থেকে উঠে সটান উত্তরে চলে যাও। মায়ের কোলের ছেলেটি যেমন মায়ের সর্বাঙ্গ চুমে চুমে আদরে আদরে আলপনা করে, তেমনি করে দেখ মায়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। দেখ তামিলনাড়ুকে, কেরল-অন্ধ্র-মহীশূরকে, অন্ধ্র-বঙ্গ-কলিঙ্গকে; দেখ বিন্ধ্যকোটী মধ্য-প্রদেশকে; মায়ের স্তন্য-স্তন থেকে ঝরে পড়া ও জাহ্নবী-যমুনার জলে ধোওয়া যুক্ত প্রদেশকে; পাশে মহারাষ্ট্রকে, গুজরাটকে; সবার ওপর দেখ শুভ্র তুষার কিরীটিনী জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশকে। হিমালয়ে চোখ তুলে যাওয়া অরণ্য পর্বতে মায়ের ছড়িয়ে পড়া চুলের রাশ। স্নান করে উঠে মা রোদে চুল শুকোচ্ছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এক নজরে এরূপ দেখতে চাও তো এসে দাঁড়াও মায়ের পায়ের পাতার বুড়ো আঙুলটির কাছে—এই কন্যাকুমারীতে।

দেখ মায়ের দারু শরীরটাই একটা প্রদীপ। মাটির প্রদীপ। তার বুকে স্নেহের তেল-জলতে শিখা-মুখটি দু'দিকে সরু হয়ে এসেছে যাকে কল্পনায় দেখছি পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা. সেইটাই শিখা মুখ—এই কন্যাকুমারী। এখানে জ্বলছে সেই অনির্বাণ দীপশিখা, দেখ ঐ বিবেকানন্দ পর্বত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে চারদিক। কন্যাকুমারী থেকে দাঁড়িয়ে দেখ সেই এক মহা দীপ কোটী কোটী দীপ হয়ে জ্বলে উঠছে। মা দীপান্বিতা! সন্ধ্যার অন্ধকারে আঁচল আড়াল দিয়ে মা সযত্নে রক্ষা করছেন দীপের শিখাটিকে। ত্রিশূলধারিণী, গৈরিক-বস্ত্রাঙ্কে শোভিতা নয়: খেট-খর্পরধারিণী মুণ্ড-মালাও নয়। স্নেহাৎ মা, নিবিড় সন্তান বাৎসল্যের মা, সন্তানের মঙ্গল কামনায় জ্বালিয়েছেন মঙ্গল দীপটি।

• • •

১৯৪৪ সালে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়েছিলাম কন্যা-কুমারীতে। সে রাত ছিল দীপাবলীর রাত। আমরা ক'টি কলেজেপড়া যুবক সন্ধ্যার আসন্ন অন্ধকারে সমুদ্রের বেলায় বসেছিলাম। এই আসন্ন অন্ধকারে কেমন একটা বিষণ্ণতা আছে। গৃহাগত-প্রাণ বাঙালী নন্দনরা কলকাতার জন্য মন খারাপ করছিলাম। বাড়ী থেকে বেরিয়েছি মাসখানেকের উপর।

হরিশ পার্কের ডুবড়ী কম্পিটিশনটা এবার বৃথাই গেল। নিশ্চয়ই কালীঘাটের ছেলেরা এসে কাপ নিয়ে যাবে। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় এখন এই সন্ধ্যার কী ধুম ধড়াক্কা। উড়ন উড়ছে সোঁ সোঁ করে। ছুঁচো বাজীর চোটে রাস্তার লোকে তো লোক, মোটর বাইক চড়া পুলিশ সার্জেন্ট পর্যন্ত নাস্তানাবুদ। তার মধ্যে প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ-বিদারী হুম্-দাম বোমার আওয়াজ। বাড়ীতে বাড়ীতে প্রদীপের আলো। ছেলেমেয়েদের হুলস্থুরিতে, রং-মশালে আলোর বর্ণা। পাড়ায় পাড়ায় কালী পুজোর ধুম। চাকের বাদ্যিতে আকাশবাতাস মাৎ। নষ্টালজিয়া, দেশের জন্য মন খারাপ। কলকাতার শোকে আকুল। কলকাতার কালীপুজোর মাতামাতির জন্য মন পাগল। আজ কিনা সে সব ছেড়ে বসে আছি কন্যাকুমারীর অন্ধকারে ভরা নিস্তব্ধ, নির্জন সমুদ্রের কূলে। শুধু শুনছি ঢেউ ভাঙার মর্মর এক নাগাড়ে। এমন সময় সমুদ্রের মর্মর ছাপিয়ে কানে এল সানাইয়ের আওয়াজ। বাঁশিকে ডাকলাম। নষ্টালজিয়ায় ভাসতে ভাসতে এতক্ষণ নজর করিনি। দেখলাম আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে বাঁ দিকটা। না বিজলীর আলোর মতো চোখ-ঝলসানো, মন-চমকানো আলো নয়। স্নিগ্ধ শীতল মনোরম আলো। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন আপনা থেকেই প্রসন্ন হয়। এ আলো যেন মিতালী করেছে আঁধারের সঙ্গে। আলো আঁধার যেন দুই সখি, ধূপছায়া, উষার গোধূলির বর্ণাঢ্য। সমুদ্রের দিগন্ত থেকে কি এর মধ্যে আবার একটা সূর্য উঠবে? এইতো একটু আগে ডানদিকে সূর্য পাটে গেল। আমাদের অধ্যাপক, পর্যটনের-অভিজ্ঞাধক মুখার্জি মশাই গম্ভীর গলায় বললেন —ওহে মনে ছিলনা আজ এখানেও কালীপুজো। চল চল চল মা কুমারী-দেবীকে দর্শন করে আসি।

কুমারী মানেই শক্তিমূর্তি। কালী-তারা-মহাবিদ্যা, ষোড়শী-ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী-ছিন্নমস্তাচ বিদ্যা-ধূমাবতী-তথা। বগলা সিদ্ধবিদ্যাচ মাতঙ্গী-কমলাত্মিকা। সেই দশ মহাবিদ্যারই অংশ। আমাদের দেশের কুমারী মেয়েরা ঘিউড়ী মেয়েরা সতীই, গৌরী, উমা। তাই এতো ঘটা করে কুমারী পুজোর প্রথা।

বালুময় বেলা ছেড়ে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। এ কদিন দক্ষিণে নানা জায়গায় ঘুরেছি। বহু বহু মন্দির দেখে বেড়িয়েছি। মন্দিরের সংবৎ শিখে নিয়েছি। গায়ের থেকে জামা সেন্ডি নামিয়ে, পা খালি করে মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়ালাম।

মন্দিরের পা থেকে মাথা অবধি লক্ষ প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে। আজ যে দীপাবলি! মাটির প্রদীপ, তেলের প্রদীপ! সেই লক্ষ প্রদীপের শিখায় যে আলো জ্বলছে তা সমুদ্রের ঝড়ো হাওয়াতেও অচঞ্চল। আসমুদ্র অখণ্ড ভারতের দীপাবলির মুখর উৎসবে আতসবাজি আর আলোর উন্মত্ততাকে পিছনে ফেলে আঁচল আড়াল করে মা দাঁড়িয়েছেন এই শান্ত-নির্জন সাগর গম্ভীর অন্ধকারের প্রচ্ছায়ে তাঁর চির শান্তির দীপটি জ্বালিয়ে নিয়ে। এখানকার অন্ধকারে অমাবস্যার আকাশ, সমুদ্রের অগম্ভীর মর্মর, বয়ে আনা বাতাস, নিরন্ধ্র শুব্ধতার মধ্যে এই এতটুকু ভেদ, এসব কিছু নিয়ে একাকার। এখানে দাঁড়িয়ে যেন সব কিছু ছুঁতে পারছি একসঙ্গে। হয়তো মহাসমুদ্রের গভীরে ডুবে যাওয়ার মতো হারিয়ে যেতাম, যদি না এই লক্ষ দীপের আলো আমার চেতনাকে ধরে রাখত অনুভূতির উপরের স্তরে।

সানাই বাজছিল মন্দির প্রাঙ্গণে। মন্দির, দক্ষিণের যে কোন মন্দিরেরই অনুরূপ। তবে মীনাক্ষী মন্দিরের মতো বিশাল নয়। এখানে দেবী মহিমাকে ছাপিয়ে মন্দির নয়। বস্তু ছাপিয়ে আধার নয়। তেলের প্রদীপের আলোতে রত্ন অলংকারের রাশি ঝলসে উঠছে বটে। মাথা থেকে কপালের ওপর নেমে আসা প্রকাণ্ড পান্নার টিকলীটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বস্তু। কিন্তু সেদিকে আলাদা করে দেখবে কে? সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে ধ্যানী-শিল্পীর হাতে খোদাই করা ঐ অনন্য শ্রীময়ী মুখের হাসিটুকু। এ হাসির ডুড়ি খুঁজেছি বহু জায়গায়, মেলেনি। সে যে কি হাসি কী যে আছে সেই হাসির মধ্যে তা আমি বলতে পারব না। বলতে যদি পারতাম—তবে আমি কালিদাস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক সারে বসবার দাবীকে কায়েম করতে পারতাম।

কুমারী মেয়ের মূর্তি। জননী ভারতবর্ষ কি আজও কুমারী? নয় কেন? অনন্ত বিচিত্র সৌন্দর্যের তাবরূপ ভারতবর্ষ তো চিরকুমারী। উর্বশী-উর্বশীর মতো। পুরুরবা থাকলেও উর্বশী চিরকুমারী স্বর্গাঙ্গনা। তার কুমারীত্ব কেউ হরণ করতে, হনন করতে পারে না। সে যে চির সৌন্দর্যের মূলাধার; কৈবল্যরূপিনী, চিন্ময়ী; ঠিক সেই রকম এই ভারতবর্ষ, চিন্ময়ী ভারতবর্ষ। সুন্দরের রূপকে সে লুকিয়ে রেখেছে আধকোটা কলির মধ্যে। সে কলি কোনদিন ফুটে করে নিঃশেষ হয় না। সে কলি কুমারী-কলি। সৌন্দর্যের এই সত্তা থেকে কোন ফলের প্রত্যাশা নেই।

যাত্রীর সংখ্যা খুবই সামান্য। আনুষ্ঠানিক পূজা সেখানে এহো বাহ্য। পূজা হচ্ছে অন্য ভাবে। সে পূজা সুন্দরের উপাসনা। দেবীর সম্মুখে বসেছে নৃত্যের আসর। দুটি নারী নৃত্যরতা। একটি যুবতী। আর একটি, কি আশ্চর্য ঠিক মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বার হয়ে আসা কুমারী মূর্তি। বয়স হবে দশ বছর বারো।

অধ্যাপক বললেন—দেবদাসীদের নৃত্য হচ্ছে। (তখনও রাজাগোপালাচারীর দুরদৃষ্টাবলেপনে দেবদাসী প্রথা উঠে যায়নি, দক্ষিণের মন্দিরগুলি থেকে)। বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিনে এই নৃত্যানুষ্ঠান মন্দিরের প্রথা। পাঁপাবলিতে তো বটেই।

কিন্তু আমার কি যে হয়েছিল তা জানি না। আমি পিছু পেছে বসে গিয়েছিলাম, সামান্য কয়েকজন দর্শকের মধ্যে। বহু সাধাসাধি ও ডাকাডাকি সত্ত্বেও রাত বারোটার আগে, নাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে উঠিনি।

নৃত্যময়ী নারী দু'জনের অটুট স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাদের চোলি-মেখলার অপূর্ব সুন্দর পোষাক আমাকে মুগ্ধ করেছিল মুগ্ধ করেছিল তাদের অঙ্গের চারু সঞ্চালন, পাখোয়াজ আর সানাই এর বাজনার তালে তালে। সঙ্গীত, সঙ্গত ও নৃত্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আমার পারি-পার্শ্বিক সব কিছু। সেই আমার প্রথম। নৃত্য যে কত অপার্থিব হতে পারে তার আঁচ পেয়েছিলাম বাংলার বাউলের নাচে। সেবার পুরো দেখলাম সেই দুটি নারীর নৃত্য ভঙ্গিমায়। শুধু দেখলাম না, ফিরে এলাম সুন্দরকে দেখবার চোখ নিয়ে। আমি যেন নতুন করে জন্মালাম। সঙ্গীত চলছিল দক্ষিণের নিজস্ব ভাষায় (তখনও জানতাম না তাকে তামিড় বলে)। নারী দুটির অঙ্গ সঞ্চালন ও মুদ্রার প্রকরণ সেদিন আমি কিছুই বুঝিনি। তবু আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। সাপ যেমন বাঁশী শুনে মুগ্ধ হয় তেমনি। সঙ্গীতের ভাষা বুঝিয়ে দেবার লোক ছিল না। তবু নৃত্যের আদল থেকে খানিকটা অনুমান করেছিলাম হর-পার্বতীর মিলনের দৃশ্য অভিনীত হচ্ছে।

† † †

পনেরো বছর পরে চাকা ঘুরল। আমি আবার এলাম তামিড়-নাড়-এ। এবারকার আসা কাঁকি দর্শনের জন্য নয়। বুড়ি ছুঁয়ে কোন রকমে কলকাতায় ফিরতে পারলে বাঁচি—এমন নয়। দক্ষিণের কি কি মন্দির দেখলাম, কি কি কাণ্ডকীর্তি শুনলাম, ভাষা না জানার জন্য কি কি মজার ব্যাপার ঘটল, দাওয়ায় বসে এসব গল্প ভারিয়ে ভারিয়ে বলবার জন্য নয়। এবার আমি এলাম সব ফেলে—একেবারে একলা। উঁহু, তীর্থযাত্রী নয়—মায়ের কোল ফেলে মাতামহীর কোলে। এলাম সুদূর দক্ষিণে খাঁটী এবং নির্ভেজাল তামিড়-সংস্কৃতির গর্ভগৃহে। মাদ্রাজ সহর থেকে পাঁচশো মাইল দূরে।

প্রথম প্রথম নানান অসুবিধে। দিদিমাকে মা বলে জানতে চায়না মন কিছুতেই! ধীরে ধীরে আমি নতুন করে জন্মাতে লাগলাম—তামিড়-নাড়-এ। ভাষা শিখতে লাগলাম। ভুল, বিকৃত, আধো আধো উচ্চারণে বলতে সুরু করলাম তামিড়—পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাদের একটা। কেউ শুনে হেসেছে, কেউ পরিহাস করেছে। আবার অনেকে এগিয়ে এসেছে শিখিয়েছে আসল উচ্চারণ, অর্থ। নবজাতকের ভূমিষ্ঠ হবার পর হাঁটি হাঁটি পা পা তো বরাবরই ব্যাপার। হতাশ হলে চলবে না! ক্রমশঃ চোখ ফুটল, তামিড়-নাড়কে চিনলাম। দেখলাম এ আমার মা বাংলা মায়েরও আদি জননী মাতামহী।

বাংলায় যেমন বারোমাসে তের পার্বণ, তামিড়নাড়ও ঠিক তাই।

দেখতে দেখতে শ্রীজয়ন্তী উৎসব গেল। গোকুলাষ্টমী গেল। গেল বিনায়ক চতুর্থী। এল নবরাত্রি—দুর্গার বা চণ্ডীর উপাসনা দশ দিন ধরে। তাতে পল্লীতে পল্লীতে পুতুল সাজাবার কি ধুম! গল্লু উৎসব। আর পুতুল তো পুতুল এক এক বাড়ী হাজার দু' হাজার পুতুল সাজান হয়েছে। প্রদীপের আলোয় ঘরে ঘরে নৃত্যের, সঙ্গীতের আসর। মহিলাদের রন্ধনশালায় নানা খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুতির পর্ব। অতিথি অভ্যাগত আত্মীয় স্বজনে উৎসব-মুখর দক্ষিণ। বাংলাদেশের মতো প্রতিমা সাজিয়ে পূজো কোথাও নেই, নেই উদ্ভটতা বা অনাচার।—কিন্তু উৎসবের আসল প্রাণটী সর্বত্র বজায় আছে প্রতি সন্ধ্যায় সঙ্গীত ও নৃত্যের আসর জমজমাটী হয়ে বসে। মহাষ্টমীর দিন বাগদেবী সরস্বতীর উপাসনা—এটাই দক্ষিণের সরস্বতী পূজা। মহানবমীতে আয়ুধ পূজা—দক্ষিণের বিশ্বকর্মা পূজা। কলকারখানা—যন্ত্রপাতি সবকিছুরই পূজা। আয়ুধকে পূজা করে জাগিয়ে রামচন্দ্র সেই আয়ুধে বধ করলেন রাবণকে—দশমীর দিন। সেদিন দশেরা।

মহাপূজার এই দশটা দিনই—উদর, শ্রবণ ও মন ভরে উঠত। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে দক্ষিণে দেখেছি—সব দ্রব্যই তৈরী হয় বাড়ীতে। গৃহস্থ নারীদের প্রসন্ন হাতের স্পর্শ থাকে তাতে। উপকরণ চালের গুঁড়ি, তিল, যব, গম, নারকেল আর গুড়। চালগুঁড়ির চাকতি ঘুরি-ভাজা মুরুক্কু, নারকেল-চাল-গুড়-তিলের আনন্দ লাড়ু, কাবু বাদামের হালুয়া, ক্ষীরের লাড়ু, শুধু নারকেলের লাড়ু, চিঁড়ের ভক্তি, চালভাজা গুঁড়িয়ে গুড় দিয়ে ভোজ্য—যা আদিকাল থেকে আসল বাঙালীর ঘরোয়া জলখাবার বলে চলে এসেছিল, যার কিছু কিছু নিদর্শন আজও পাওয়া যায় পল্লী বাংলায় সেই সবই অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার উপকরণ।

জলখাবার ছাড়াও ভোজনপর্ব আছে। তাতে আছে আতপ চালের অন্ন (ব্রাহ্মণ বাড়ীর) ধপ্‌ধপে মল্লিকা ফুলের রাশির মতো কলাপাতাতে ঢেলে দেওয়া। তার ওপর গব্য ঘৃত। তারপরই অড়হর ডালের সাম্বার। সঙ্গে থাকবে আপড়ম্ (পাঁপড়) আলু কড়কড়ে করে ভাজা, কাঁচকলা ভাজা। নারকেল আর সবজি মিশিয়ে পাচ্চাড়ি। নারকেলের দুধ দিয়ে সবজি দিয়ে প্রলাও অতি সুস্বাদু আওয়াল। তারপরই রসম্। তেঁতুলের পাতলা জল হিং জিরের সম্বরা দেওয়া। অতি উপাদেয় অভিনব ব্যঞ্জন। শেষের পাতে ভাতের—দধি। বাঙালীরা ছাড়া আর কোন জাত মিষ্টি দই খায় না, সুতরাং সে সম্বন্ধে প্রশ্নও ওঠে না। দৈ-ভাত বা তাইর স্বাদম্ তামিড়দের অতি প্রিয় ও সার্বজনীন খাদ্য। ঘাটে-মাঠে-পথে-ট্রেনে সব জায়গাতেই আর কিছু না মিলুক কলাপাতার প্যাকেটে তাইর স্বাদম্ মিলবেই। সব শেষে আচমনের আগে অঞ্জলী ভরে ঘোল। কলাপাতার ওপর ভাতের সঙ্গে মেখে সাপ্‌টে খাওয়ার বিধি দক্ষিণের সর্বত্র। অন্নাহারী ব্যক্তিরা আঙুলের ডগায় ছুঁয়ে কটী ছিঁড়ে খাবার মতো স্পর্শাহার করে না! তারা চেটো থেকে আঙুল সব কিছু কাজে লাগিয়ে সাপ্‌টে খায়—হপহাপ করে বড় বড় গরাসে। তাই এর নাম সাপ্পাড়—অর্থে বৃহৎ ভোজন। স্বল্প ভোজন বা জলাহারম্‌ও (আমাদের দেশে জলার অর্থে) ইড্‌লী দোসে চলে। তবে ইড্‌লি-দোসের প্রধান সময় হল সকালের প্রাতরাশ। এসব দৈনন্দিন। কিন্তু চাল-গম-যব তিল-গুড়ের বিভিন্ন মিষ্টি ও নোনতা খাবার তৈরী করা হল উৎসবের একটা অবশ্য-অঙ্গ।

শ্রীনিবাস রাঘবন পরিহাস করে বলতেন—আমাদের এই দেশে তামিড়নাড়ের সর্বদক্ষিণে শুধু তিন প্রকার—Hot, Hotter, Hottest। এদেশে শীতেও গরম জামার দরকার হয় না। তবে শীত পড়লে একটু আধটু গা শির শির করে ভোর বেলায়।

অগ্রহায়ণের গোড়ায় থেকে এমন মোলায়েম ঠাণ্ডাটা পড়তে সুরু করে। ভোরের দিকে গায়ের চাদরটা আরও করে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমটা দুধ থেকে ক্ষীরে এসে গিয়েছিল। হঠাৎ দমাদম পটকা ফাটার আওয়াজে চমকে তাকিয়ে দেখি তখনও অন্ধকার বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। উঠে

বাইরে এলাম ব্যাপার দেখবার জন্য। চারপাশের বাড়ীর থেকে দলে দলে ছেলে মেয়েরা রাস্তার ওপর জড়ো হয়ে বাজী পোড়াচ্ছে। রাস্তা আলোয় আলো।

আমাকে বারান্দায় দেখেই পাশের বাড়ীর রামমূর্ত্তি মশাই এগিয়ে এলেন।—কি, আপনি পটকা ফোটাবেন না?—কেন?—আরে আজ যে দীপাবলী।—তা এই এতো ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দীপাবলীর কি হচ্ছে? দীপাবলী তো রাত্রে।—না মশাই না। এ আপনার উত্তর ভারত নয়, এ দক্ষিণ। দক্ষিণের কি সব উল্টো? উত্তর পায়ে হাঁটে, দক্ষিণ কি মাথায় হাঁটে

হেসে ফেললেন রামমূর্ত্তি মশাই। বহু বছর দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েটে কাজ করার পর অবসর নিয়ে দেশে এসে বাস করছেন। বললেন—উত্তরে অবশ্যই দীপাবলীর উৎসব হয় রাতে। সন্ধ্যায় তার সুরু, চলে সারা রাত। আমাদের দক্ষিণে এ উৎসব হল অন্য অর্থে।—অর্থটা কি জানতে পারি?—নিশ্চয়। কাহিনী—কৃষ্ণ, নরকাসুরকে বধ করেছিলেন চতুর্দশীর সারারাত লড়াই করার পর চতুর্থ প্রহরে। এটা উত্তর ভারতের লোকেরা জানে না।

বললাম, উত্তর ভারত না জানুক, জানে বাঙালীরা। অবশ্য একটু ভিন্ন রকমে। তারা ভূত-চতুর্দশীতে ভূত তাড়াবার জন্য বনে-জংগলে সেঁতের বাতি জালিয়ে দিয়ে আসে। মাঝরাতে কোন বিশেষ ভূতের, হয়তো নরকাসুরেরই কুশপুত্তলিকা দাহ করে। তবে তারা জানে না এটা নরকাসুর বধের কারবার।

—আমরা এই চতুর্দশীকে বলি নরক চতুর্দশী। নরক আর ভূত তফাৎ কি? যেখানে ভূত সেখানেই তো নরক। রামমূর্ত্তি মশাই বিশ্রী হাসি হাসলেন।

রাস্তায় তখনকণে ঘুম জমজমাট। দশ থেকে উর্দ্ধে ছেলেরা আজ আর কেউ প্যান্ট পরে নি। সবার পরনেই নতুন কোরা ধুতি (একেবারে ধুচ্ছি ধুতি)। কিশোরী বিউড়ী মেয়েদের পরনে নতুন ঘাগরা, নতুন জামা। বয়স্ক পুরুষদের সবারই নতুন কোরা ধুতি আর নতুন অঙ্গবস্ত্রম্ (চাদর)। বয়স্কা মেয়েদের সামর্থ অনুযায়ী নতুন নতুন শাড়ীর বাহার। কাঞ্জিভরম্, কোইম্বাটুর, মাদুরাই, মহীশূরের বিখ্যাত বিখ্যাত শাড়ী।

আমার বাঁ দিকে থাকেন নারায়ণ শাস্ত্রী। সংস্কৃত আর জ্যোতিষের পণ্ডিত। ইতিমধ্যে তিনি স্নানাদি সেরে কপালে বিভূতির রেখা চড়িয়ে যাগ ঘরে এলেন। মুখে উচ্চৈস্বরে ললিতাসহস্র নামম্ আউড়ে যাচ্ছেন। তারই মধ্যে আমার দিকে ফিরে বললেন—যান স্নান সারুন।

—সেকি এই ভোরবেলা, এখনও অন্ধকার কাটেনি এর মধ্যে স্নান?

—আরে আজ দীপাবলী ফেষ্টিভ্যাল অব্ অল ফেষ্টিভ্যালস্। আজ ভোরে স্নান করলে নরকের পাপ দূর হয়। দেখুন না আমাদের একমাসের শিশু থেকে একশো বছরের বুড়ো অবধি পয়লাডম্ পর্যন্ত স্নান করে নিয়েছেন। অয়েল বাথ

এই অয়েল বাথ বা তৈল স্নানের ব্যাপারটা তামিলনাড়-এ একটী বিশেষ ব্যাপার। তামিল মেয়ে-পুরুষ প্রত্যহ অল্প অবগাহন করে কিন্তু মাথা ভেজায় না। সপ্তাহে একদিন কি দু' সপ্তাহে একদিন সারা দেহে অন্ততঃ আড়াই শো তিনশো গ্রাম তেল ঢালে। তেল মানে এখানে তিলের তেল। তারপর নদীতে কিম্বা জলাশয়ে, অবস্থা ভেদে ঘরের বাথরুমে ফারম্ (অর্থাৎ সাবান কি সাজিমাটী) মেখে সেই তেল তুলে ফেলে স্নান করে আপাদমস্তক। এর নাম অয়েলবাথ। মাথার চুল শেষায় শাম্পু করার মতো। অয়েল বাথ আর নতুন-কাপড়—উৎসবের চিহ্ন।

শাস্ত্রী বড় কঞ্জুষ। চুকচুক করে মুখে শব্দ করে বললেন—আরে আজ দশ কেজি তেল খরচা হল। নতুন কাপড় চোপড়ের খরচা তো আছেই।

রামমূর্ত্তি মশাই আমাকে বুঝিয়ে দিলেন—উত্তরে আজ দোকানে দোকানে হালখাতা। নতুন বছরের সুরু। আপনারা বাঙালীরা নতুন কাপড় পরেন—নবরাত্রি দুর্গা-পূজায়। আমরা নতুন কাপড় পরি এই দীপাবলীতে। শাস্ত্রীর খুব খরচের ধাক্কা। গত মাসে ছোট মেয়ে লক্ষ্মীর জামাই এসেছে। নতুন বিয়ের পর এই দীপাবলীতে জামাইকে আনতেই হয়। তত্ত্ব করতেই হয়

মেয়ের দামী সিল্কের শাড়ী, জামাইএর—তা আবার যে সে জামাই নয় ছুড ডিপার্টএর হেড ক্লার্ক, দামী স্যুট না হলেই নয়। ও ছাড়াও মেয়াই-বেয়ানের কাপড় চোপড় পর্যন্ত পাঠাতে হয়েছে। কাজেই শাস্ত্রী মশাই বেশ খানিকটা কাবু। নাকি শাস্ত্রী মশাই ?

শাস্ত্রী বললেন—ঠিক ঠিক। আপাততঃ চোখে যে রকম মশাল জলার পরে যে রকম অন্ধকার অন্ধকার ঠেকে সেই রকম লাগছে। আপনাদের বাংলাদেশে তত্ত্ব নেই ?

—নেই আবার। পাতার মতো জাকিয়ে বসে আছে। তবে সে দীপাবলীতে নয়, দুর্গা পুজোতে, জামাইষষ্ঠীতে। এদেশে দেখছি জামাইষষ্ঠী হল দীপাবলী।

শাস্ত্রী গৃহিণী ঘরের বার হয়ে এলেন। বয়স হয়েছে, কিন্তু এখনও লক্ষ্মীশ্রীসম্পন্না সুন্দরী মহিলা। পরনে যেমন তেমন একটা শাড়ী, কিন্তু নতুন আনকোরা। তাতেই তাঁকে চমৎকার দেখাচ্ছে। ঘরের বাইরে ছাই দিয়ে কোলম্ (আলপনা) দিতে লাগলেন। দেখলাম, রোজ যে কোলম্ পড়ে তার থেকে আজকের ডিজাইন সম্পূর্ণ পৃথক, সম্পূর্ণ নতুন। প্রায় পনের মিনিট ধরে চিত্র বিচিত্র চিত্রলেখার কাজ করলেন শাস্ত্রী গৃহিণী সাদা ছাইয়ের গুঁড়ো দিয়ে। তাতে কতো লতাপাতা, কতো ময়ূর পাখা, কতো পাখী, মাছ। অপূর্ব চারুকলা।

ইতিমধ্যে অন্ধকার কেটে গিয়ে আলো বার হচ্ছে। একটী জানাশোনা যুবক বলে গেল—তৈরী থাকুন, আমরা দেখা শোনা করতে আসছি। গ্রামের সবাই আসবে মন্দির প্রদক্ষিণ করে। পল্লীভারতের উৎসব—আনন্দটুকু সবাই ভাগাভাগি করে ভোগ না করলে উৎসবই হয় না। বন্ধু রঙ্গাচারী এসে হাজির হলেন। রঙ্গাচারী বিলেত ফেরৎ কেমিষ্ট। সর্বদাই ট্রাউজার আর সার্ট পরে থাকেন। এমন কি বাড়ীতেও। আজ দেখি পরনে কোরা ধুতি, তার ওপরে সার্ট। কপালে বাসম্।

—আসুন চারি সাহেব বসুন।—মা মা, বসবার সময় নেই। সিরী পাঠালেন আজ চটপট চলে আসুন আমার বাড়ীতে। সেখানে সকালের ফলাহারম্ কাফি, দুপুরের সদ্যাড়ু ! সন্ধ্যায় ভোজন। তারপর সঙ্গীত সমাজে শ্রীমতী ডি, কে, পট্টাম্মালের সঙ্গীত।

—বাড়ীতে কয়েকজন আসবেন। দেখা সাক্ষাৎ সেরে নিশ্চয়ই যাব। আপনার গৃহিণী তো দ্রৌপদী।

—বলবেন না, বলবেন না। শুনতে পেলে আপনার মাথা ভাঙবে। বলবে—আমি কি পাঁচ স্বামী নিয়ে ঘর করি ?

হাসির হুল্লোড় তুলে চারী সাহেব চলে গেলেন।

বিকেলের আলো নিভতে না নিভতে জ্বলে উঠল হাজার হাজার মাটীর প্রদীপ সারা গ্রাম জুড়ে। গ্রামটাকে আর চেনা যাচ্ছে না। স্বপ্নপুরী বলে মনে হচ্ছে।

দুপুরের খাওয়াটা খুব বেশী হয়ে গিয়েছিল। ছবার কথাই। চারীগৃহিণী একাই একশো হয়ে নানান পদ রান্না করেছেন। রসম্-সাম্বারে লেগেছে অমৃতের স্বাদ। কর্পূর-বাসিত পায়সম্-এর তুলনা হয় না। চারীরা বৈষ্ণব আয়েঙ্গার—একটু বেশী মিষ্টির ভক্ত। ইনিপ্পু (মিষ্টি খাবারের) চার পাঁচটা পদ। তার সঙ্গে বিশেষ অভ্যাগত হিসাবে দোকান থেকে কিনে আনা (আমাদের সম্মানীয় অতিথি এলে যেমন সন্দেশ রসগোল্লা আনা হয়) মাইসোর পাক। বিকেলের দিকে পেটের ভার হাল্কা করবার জন্য বড় বড় দু' কাপ কফি খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে এলাম গ্রামের মন্দিরে। দক্ষিণের সমস্ত গ্রামেই মন্দিরটী থাকে ঠিক মাঝখানে। সামনে টেপাকুলম্—দেবমন্দিরের পুষ্করিণী। সারা মন্দির প্রদীপের আলোয় ঝলমল করছে। বাঁধান চত্বর প্রাঙ্গণ, সেখানে জড়ো হয়েছে গ্রামের সঙ্গীতরসিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা।

দক্ষিণের ব্রাহ্মণ পরিবারে শিশুকাল থেকেই চলে সঙ্গীত শিক্ষা, বিশেষ করে মেয়েদের। বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর রূপ তারা চিনে নেয় শিশুকাল থেকেই। সঙ্গীতের আসর বসলে তাই মেয়েদের মহলে বিশেষ করে সাড়া পড়ে যায়।

আজকের সন্ধ্যার আসরে বসেছেন, দক্ষিণের কর্ণাটক সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অন্যতম ডি, কে, পট্টাম্মাল।

হংসধ্বনি রাগে গণপতি বন্দনা করলেন শ্রীমতী পট্টাম্মাল। যেমন তাঁর সুরেলা কণ্ঠ, তেমনি অপূর্ব সঙ্গীতের ঝঙ্কার। একের পর এক গাইলেন শহনবরাড়ী, বেলাহারী, আরবি, তোড়ী, কল্যাণী, খরহরপ্রিয়া। গাইলেন সন্ত ত্যাগরাজ এর কৃতি, গাইলেন সঙ্গীত সম্রাট মুত্তুস্বামী দীক্ষিতের কৃতি, গাইলেন স্বাতি থিরুণালের পদ। শেষে যখন তাঁর কণ্ঠে দীক্ষিতের বৃন্দাবনী সারং রাগে বেজে উঠল 'শ্রীরঙ্গপুর বিহার অর কোদণ্ড রামা-মাভার'—তখন মনে হল এ যেন সঙ্গীত নয় এ যেন জলন্ত অগ্নিশিখা। সেই গলা আলোর স্রোতে শ্রোতাদের অবস্থা তখন ডুবু ডুবু। রাত তখন দশটা।

দীপাবলীর দিনটী কেটে গেল উৎসবের আনন্দে।

দেখলাম উত্তর থেকে দক্ষিণে দীপাবলীর দীপশিখাটী চিরায়ত হয়ে জ্বলছে।

তীর্থময় ভারত! তার সুদীর্ঘ জীবনে, তার সুবিশাল বিস্তারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে তার বিভিন্ন তীর্থ-স্থান। যতই বিচ্ছিন্ন হোক্, তার প্রত্যেক তীর্থ-মন্দিরে জেগে আছে একই দেবতা বিভিন্ন রূপে। কাশ্মীরে, পাঞ্জাবে, রাজপুতানায়, মহারাষ্ট্রে, উৎকলে, বঙ্গে, বিহারে, দাক্ষিণাত্যে, বিভিন্ন প্রদেশে এক-এক যুগে তীর্থ দেবতা জেগে উঠেছেন এক এক রূপে! এই মহাদেশের এক-একটি অঞ্চলকে আশ্রয় করে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা প্রাণের এক একটি লীলাকে অভিব্যক্ত করে গিয়েছেন। কোন যুগে হয়তো বাংলাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে মন ও মস্তিষ্কের সাধনার পরিপূর্ণ রূপ। কোন যুগে হয়তো রাজ-পুতনাকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে শৌর্য, বীর্য, ত্যাগ ও সৌরুষের চরম বিকাশ। কোন যুগে হয়তো দাক্ষিণাত্যকে কেন্দ্র করে জেগে উঠেছে সমগ্র ভারত-চিত্তের রূপ-সৃষ্টির সুগভীর তৃষ্ণা। মহাসমুদ্রে পরস্পর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে ভারত-সাধনার এইসব বিভিন্ন অভিব্যক্তির মূর্তি। আজ সময় হয়েছে এই সব বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তিকে একত্র করে ভারত-চেতনার গেঁথে তুলবার।

দেওয়ালী পরব—বিহারে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

বিহারে লক্ষ্মী পূজার নাম দেওয়ালী উৎসব। তবে উত্তর বিহারের উৎসবের সঙ্গে বাংলাদেশের সংলগ্ন নিম্ন বিহারের উৎসবের পার্থক্য আছে।

এই দিনটিতে আবার কোন কোন অঞ্চলে নববর্ষ উৎসব পালিত হয়। নতুন খাতা মহরৎ ইত্যাদি হয়ে থাকে এই শুভদিনটিতে। ব্যবসায়ী মহলে দেওয়ালীর আকর্ষণ প্রচণ্ড।

এই দেশে অতি প্রত্যূষে তৈলাক্ত হয়ে স্নান করার রীতি আছে। স্নান সমাপন করে নব বস্ত্র পরিধান করে নানাবিধ ভোজ্য বস্তুতে আহার সমাধা করে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ি বেড়িয়ে আসেন অনেকে। এই দিনটিতে আবার অনেকে পিতৃ-পুরুষের শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকেন।

লক্ষ্মীপূজা বিষয়ে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এক উদ্ধত প্রকৃতির রাজা চতুর্থ কন্যার প্রতি বিশেষ বিরূপ হলেন। এই বিরূপতার কারণ মেয়েটি বলেছিল সে ঈশ্বরের করুণায় জীবন ধারণ করছে, তার সমস্ত ঐশ্বর্য ঈশ্বরের দান। রাজামশাই ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। কোনরূপ ভিক্ততার ভাব মনে না নিয়ে রাজ-কন্যা ও তার দরিদ্র স্বামী চলে গেলেন অরণ্যে সাধারণ-ভাবে জীবন যাপন করতে। ভিক্ষাবৃত্তি তাঁদের জীবনের অবলম্বন হল। একদিন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা পেলেন না, স্ত্রীর নির্দেশ ছিল শূন্য হাতে ফেরা চলবেনা, তাই তিনি পথ থেকে একটি মৃত সর্প কুড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন। সাপটির দ্বারা কোনো কিছু অভাব মিটবে না তাই সেই মৃত সর্পটি ঘরের বাইরে ফেলে দিলেন রাজকন্যা। ইতি-মধ্যে সেই দেশের রাজা স্নানকালে তাঁর স্বর্ণহার গলা থেকে খুলে নদী তীরে রেখেছিলেন, একটি বিরাট চিল সেই হার ছোঁ মেরে নিয়ে গেল—চিলটি একটু ঘুরে যেতেই সেই মরা সাপটি দেখে হার ফেলে দিয়ে সেটি নিয়ে গেল। রাজকন্যার নজরে সেই হার পড়লো তিনি সেটি তুলে নিয়ে স্বামীকে দিলেন। এদিকে রাজা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর হারান হারটির জন্য। ব্রাহ্মণ সেই হার নিয়ে রাজপুরীতে গেলেন! রাজা জানতে চাইলেন ব্রাহ্মণ কি চায়। ব্রাহ্মণ বললেন কিছু নয়, অমাবস্যার দিন যেন কোনো বাড়িতে আলো না জ্বলে। শুধু তাঁর পর্ণকুটিরে আলো জ্বলবে। এই সামান্য অনুরোধ তৎক্ষণাৎ রাজা মেনে নিলেন। বুঝলেন লোকটি উন্মাদ।

এদিকে লক্ষ্মীদেবী যথা সময়ে বাহন পেঁচাটির কাঁধে চড়ে এসে হাজির হয়ে দেখলেন চারদিকে অন্ধকার খালি একটি কুঁড়ে ঘরে আলো জ্বলছে। সেই বাড়িতে প্রবেশ করলেন লক্ষ্মীদেবী। পূজা গ্রহণ করলেন। তারপর দরিদ্র দম্পতির ভক্তির পরিচয় পেয়ে তাদের অতুল ঐশ্বর্য দান করলেন। তারা রাতারাতি রাজার ঐশ্বর্য লাভ করল।

কাহিনীতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা প্রধান বলে লক্ষ্মী পূজার নেতৃত্ব মেয়েদেরই হাতে। নিম্ন বিহারে এই দিন সারারাত ধরে একটি ধ্বনি শোনা যায়—

"ঘর ঘর বাহার, লছমী অন্দর।"

অর্থাৎ দারিদ্র বাইরে যাও লক্ষ্মী ঘরে এসো আমা-দের বাংলাদেশেও বলে—যা লক্ষ্মী ঘরে এসো অ-লক্ষ্মী দূর হও।

স্ত্রীলোকদের এই উৎসবে নেতৃত্বের অধিকার দানের

আরেকটি কারণ থাকা সম্ভব—শ্রীকৃষ্ণের মহিষী সত্যভামা নাকি নরকাসুর বধের ব্যাপারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্য করেছিলেন। সত্যভামা দেবীর জন্য মহিলারা তাঁদের যোগ্য স্থান অধিকার করতে পেরেছেন।

বঙ্গদেশে দেওয়ালির যেমন দুই রূপ—যথা কালীপূজা এবং সেই সঙ্গে গৃহস্থবাড়িতে লক্ষ্মীপূজাও হয়ে থাকে। দীপান্বিতা কালীপূজার আরেক অঙ্গ লক্ষ্মীপূজা। মিথিলায় ইদানীং ভারত মাতার মত চতুর্ভুজ মূর্তির পূজা প্রচলিত হয়েছে। সেখানেও দিবারাত্র মাইকের অত্যাচার ফুল এবং আলোকমালায় সজ্জিত প্যাণ্ডেল ইত্যাদির দেওয়াজ চালু হয়েছে। বিসর্জনের দিন বিকেল বা সন্ধ্যেতে দেবীমূর্তি বসিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। পথ ঘাট বন্ধ হয়ে যায়।

এ ছাড়া নিম্ন বিহারে প্রতিবেশীদের প্রতি অশোভন অত্যাচার করাটাও উৎসবের অঙ্গ। গাছ থেকে ফল, ফুল চুরি করাটা প্রায় স্বাভাবিক; এর সঙ্গে প্রতিবেশীদের দরজায় নোংরা বস্তু ফেলে বা আবর্জনা জড়ো করে রেখে অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়। আজকাল চাঁদার উৎপাতও সুরু হয়েছে।

এই দিনটিতে উত্তর বিহার এবং নিম্ন বিহারে নববর্ষ হিসাবে পালিত হয় অনেক জায়গায় এবং ১লা বৈশাখের মত খাতা মহরৎ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

ব্যবসায়ীরা নতুন লেন-দেনের চুক্তি এই শুভ দিনে সম্পন্ন করেন। বিহারে মিঠাই তেমন উত্তম না হলেও এখানে শুখ্‌নো গজা, পেঁড়া, বেঁউড়ি, বালুসাই, হালুয়া, পুরি, বুঁদিয়া, জিলাবী প্রভৃতি নানাবিধ মিষ্টান্ন দোকানে দোকানে সাজানো থাকে। নতুন বস্ত্র পরিধান করার রীতি এদেশেও আছে, তবে ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

জুয়াড়িদের এই দিন ভারী আনন্দ। দেওয়ালীর রাত্রে জুয়া খেলার ব্যাপার একটা ধর্মীয় আশীর্বাদ নিয়ে আসে, তার জন্য সকলেই প্রকাশ্যে ও পরমানন্দে জুয়া খেলে থাকে। জুয়া খেলা নাকি লক্ষ্মীদেবীর প্রিয়। এই দিন কেউ কাউকে ধার দেয় না আর কেউ ধারে কিছু গ্রহণ করে না, কারণ তাহলে জুয়ায় হারবার ভয়।

এই উৎসবের প্রথম দিনটি ত্রয়োদশী। সেই দিন ব্যবসায়ীগণ তাঁদের খাতার হিসাব নিকাশ শেষ করেন। হিসাবের খাতা এবং রূপার টাকায় সিঁদুর মাখিয়ে রাখা হয়। খাতা এবং টাকার পূজা হয়।

দ্বিতীয় দিন নরক চতুর্দশী। বাংলা দেশে এর নাম কৃত চতুর্দশী। নরকাসুরের মৃত্যু তিথি এই দিনটি। তৃতীয় দিন অমাবস্যা। সেই দিন দেওয়ালীর মূল উৎসব। ঘরে ঘরে মাটির চেরাগ জলে ওঠে। বাজী ফোড়ার হৈ চৈ এই দেশেও কিছু কম নয়। চতুর্থ দিনে রাজা মহাবলীর সিংহাসন ত্যাগের দিন। মহাবলী একজন সজ্জন অসুর রাজ ছিলেন—তিনি তিন ভুবনের মালিক। এই ত্রিভুবনপতির বিরুদ্ধে দেবগণ ভগবান বিষ্ণুর কাছে আবেদন করলেন—এই মহাবলী বা বলিরাজের কাছে ভগবান বিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হয়ে বলিরাজের সম্পত্তি কৌশলে হরণ করলেন।

কিন্তু ভগবান বিষ্ণু বলীকে একটি বর দিলেন বৎসরে মাত্র এই দিনটিতে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর রাজ্য দর্শন করতে পারেন। সুতরাং এই দিনে সকলে উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করে বলীরাজকে অভ্যর্থনা করে।

মহারাষ্ট্রে মহিলারা মহাবলীর প্রতিরূপ গোবর বা মহুয়ায় প্রস্তুত করে পূজা করেন। বঙ্গদেশেও কলার বাকলার উপর গোবরের মূর্তি করা হয়, কিন্তু তার নাম অলক্ষ্মী।

আশ্চর্য কেরলের ওনাম উৎসবের সঙ্গেও এমনই এক কাহিনী বিজড়িত তবে সে উৎসব ভাদ্র আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

অনেক দেশে এই উৎসবের নাম গোবর্ধন উৎসব এবং এই দিনটিতে গো সেবা ইত্যাদি করা হয়।

দেওয়ালীর সমাপ্তি দিবসটি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা "ভৌবিজা হ্যাভিয়া" ভায়ের কপালে ফোঁটা দেওয়ার রীতি সর্বত্র না হলেও কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

দেওয়ালী উপলক্ষে "রঙ্গোলী" বা আলপনা দেওয়ার

রীতি ভারতের অন্য প্রদেশের মত বিহারেও প্রচলিত আছে। বিচিত্র ধরণের আলপনা এই সময় ঘরে ঘরে দেখা যায়। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য রীতি অন্যরূপ সেখানে আলপনায় তান্ত্রিক স্পর্শ আছে।

বিহারে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে দেওয়ালীর দিন শ্রীরামচন্দ্রের অভিষেক হয়েছিল, তাই এত আলো এত উল্লাস। দেওয়ালীর কালটিতে সূর্যের উত্তরায়ন শেষ হয় এবং দক্ষিণায়ন সুরু হয়।

ওই সাম্রাজ্যের সম্রাট বিক্রমাদিত্যের অভিষেক হয়েছিল দেওয়ালী দিবসে, বিক্রমাদিত্যের সংবৎ-গণনা সূত্রপাত এই দিনে।

বিহার অঞ্চলে আগের দিনে এই দিনটির মধ্যে যে পবিত্র ভাব ছিল তা ক্রমশঃই অন্তর্হিত হচ্ছে। বাহ্যিক সভ্যতার স্পর্শে উৎসবের দিব্য অভিব্যক্তি লোপ পেতে বসেছে।

* * *

"রাজনীতিক সমস্যা-সমাধানের তপস্যায় নিরত হওয়ার যখন আমাদের বন্ধনের ছেদন না হইয়া ক্রমশই নূতন নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, বন্ধনে বন্ধনে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া বিশেষ বিশেষ গণ্ডীর প্রাচীর তুলিয়া দিয়া আমাদের দেশ যখন মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিবার শক্তিপর্যন্তও হারাইতেছিল, বিশ্বের জন্য ভারতের যে ভারতীয়—যে বাণী একদিন অমৃত বর্ষণ করিয়াছিল, নিজের বলিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ অভিমান থাকিলেও রাগ দ্বেষ ও মোহে জর্জরিত হৃদয় লইয়া দেশের যখন তাহার দিকে কর্ণপাতও করিবার অবসর হইতেছিল না, সেই দুর্দিনে এই শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বভারতীর ভাবমূর্তি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। ভারতের পূর্বঋষিরা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে তাহাই ক্রমে ক্রমে আসিয়া উটিল—"যত্র বিশ্বভবত্যেকনীড়ম্"। আত্মীয়তার এমন একটি নির্মল আসন পাতিতে হইবে যাহাতে সমগ্র বিশ্ব একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করিবে। মানুষ যেখানে মানুষের সহিত অবাধে আনন্দে মিলিতে মিশিতে পারিবে, যেখানে মিলনের মধ্যে দেশ কাল রাষ্ট্র ধর্ম মত বিশ্বাস সম্প্রদায় প্রভৃতির উপাধিগুলি কোনোরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি করিবে না, যেখানে বিশ্বের দান বলিয়া দিবার ও লইবার উভয়েরই পথ সুগম হইবে, যেখানে চিত্ত বিশ্বের সহিত ভারতের যোগেই, বিয়োগে নহে, কার্য যেখানে বিশ্বকে গ্রহণ, বর্জন নহে এবং যেখানকার কল্যাণ বিশ্বের কল্যাণ, মৈত্রী বিশ্বমৈত্রী ও শান্তি বিশ্বের শান্তি।"

উত্তর ভারতে দেওয়ালী

অভয়ঙ্কর

মাসে মাসে ছেলে পাবেন। ভারতবর্ষ একদা অতিশয় সমৃদ্ধ দেশ ছিল তাই উৎসব আর আনন্দের সমারোহ ছিল সারা বছর ধরে। শারদোৎসব সারা ভারতে বিভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হয় আর তার ঠিক কিছুকাল পরেই দীপাবলী বা দেওয়ালী উৎসব সুরু হয় সারা ভারত জুড়ে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে এর বিভিন্ন আকৃতি। বাংলাদেশে দেওয়ালী উৎসব শক্তি পূজার উৎসব। মহামায়া জগদম্বার আরাধনা করে থাকেন ভক্তি পরায়ণ বাঙালী হিন্দু। অন্যত্র কিন্তু এই দিনটিতে লক্ষ্মীদেবীর পূজা হয়। অবশ্য তিনি মহাকালী তিনিই মহালক্ষ্মী। তাই বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধারা।

ওনাম এবং বিষু—উৎসব শুধু কেরালার মালয়ালীরা পালন করে থাকেন। হোলি উত্তর ভারতের উৎসব, বিন্ধ্য পাহাড়ের পর প্রায় অজ্ঞাত, পূর্বভারতে যা পূজা পার্বণ আছে তার আকার বিভিন্ন। কিন্তু দীপাবলী উৎসব সকলের।

অনেক গ্রন্থ আছে, 'জ্ঞানোপদেশ' যার প্রধান বক্তব্য কিন্তু ভগবদ্গীতার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সাধারণভাবে এই গ্রন্থ মহাভারতের একটি অংশ বিশেষ, রামায়ণ, ভাগবত বা মহাভারতের মতই এর গুরুত্ব হওয়া উচিত।

স্মৃতি কিন্তু পুরাণের চেয়ে উঁচুমানের, বেদ আবার স্মৃতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভগবদ্গীতার প্রাধান্য তার নিজস্ব। ভগবদ্গীতার যে প্রসিদ্ধি, উপনিষদেরও সেই প্রসিদ্ধি নেই। অন্য অনেক ধর্মগ্রন্থের চেয়ে গীতার প্রাধান্য অনেক বেশী। তেমনই দীপাবলীর বিষয় এমনই [illegible] যেতে পারে যে সব উৎসবের চেয়ে দেওয়ালী সেরা কেন?

এই প্রশ্নের জবাব এই উৎসবটির উদ্ভবের কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যাবে। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে নরকাসুর শ্রীকৃষ্ণের হাতে নিহত হন। এই নিধন কর্মের হেতু হল যে নরকাসুর প্রচণ্ড শক্তি ও বিক্রমের অধিকারী হয়েছিল এবং সেই শক্তিবলে মত্ত হয়ে সে প্রচুর অন্যায় ও গর্হিত কাজ করেছিল। নরক ছিল প্রাগ্ জ্যোতিষপুর (বর্তমান আসাম) অঞ্চলের কামরূপের রাজা।

এমন এক মোক্ষাবহ কাণ্ডের পর নরকাসুরের মার পক্ষে তার সন্তানের মৃত্যুতে বিলাপ করা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দান করাই স্বাভাবিক। পুত্রশোকের চেয়ে পৃথিবীতে নিদারুণ ব্যাপার আর কি আছে!

কিন্তু নরকের জননী কি করলেন? তিনি মোটেই শোকস্বর হলেন না। স্বয়ং ভগবানের হাতে যে তাঁর পুত্র নিহত হয়েছে এর জন্য তিনি বিশেষ আনন্দলাভ করলেন। আর তাঁর পরম সৌভাগ্য যা মহাযোগীদের ভাগ্যেও ঘটে না তাই হল। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন ঘটল পুত্রের মৃত্যুর মুহূর্তে।

সেই শোকের লগ্নে নরকাসুরের জননী বলে উঠলেন, প্রতি বৎসর এই দিনটিকে সারা সংসার যেন পরমানন্দে পালন করে। সকলে মনের আনন্দে সূর্যোদয়ের পূর্বে তৈল সংযোগে যেন স্নান করে, নতুন বস্ত্র পরিধান করে। তাদের বাসভবন যেন আলোর মালা দিয়ে সাজায়। (দীপাবলি) আর সেই দিনটি আনন্দভোজ এবং নানাবিধ প্রমোদ মধ্যে পালন করে।"

মৃত্যুর মুহূর্তে নরকাসুর দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিল। তার অন্তর্গত কর্মধারার অন্ধকার মলিন দিকটি সহসা আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং নরকাসুর ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেন। সেই-মৃত্যুর লগ্নে নরকাসুর আত্মজ্ঞান লাভ করলেন।

দেওয়ালীর দিনটিতে তৈল সংযোগে স্নান করার একটি সামাজিক দিক আছে। অন্য দিনে নিষিদ্ধ হলেও সূর্যোদয়ের পূর্বে এই দিনে তৈল স্নান করার মধ্যে নাকি নরকাসুরের প্রতি-সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপার আছে। তৈল সংযোগে স্নান করার মধ্যে একটা শুভ দিক আছে এবং তার উপকারিতাও আছে। দীপাবলী প্রসঙ্গে তুলা পুরাণে অনেক উক্তি আছে। কার্তিক মাসটির পবিত্রতা বিষয়ে তুলা পুরাণে উল্লেখ আছে এছাড়া কাবেরী মহিমা' নামক শ্লোকে আছে "তৈলে লক্ষ্মী, জলে গঙ্গা" সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, তার সঙ্গে তৈল কথাটি যুক্ত এবং উৎসবাদিতে স্নানকালে যে জল ব্যবহার করা হয় তাকে গঙ্গার জল বলা হয়। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে তৈল স্নান দীপাবলী দিবসে করার মধ্যে একটা পবিত্রতা আছে, এর ফলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়, চিত্তে আনন্দ সঞ্চারিত হয় এবং গঙ্গাস্নানের ফলে সকল পাপ ক্ষালিত হয় এবং স্বর্গীয় আনন্দলাভ হয়। লক্ষ্মীর প্রসাদ ও গঙ্গাস্নানের পুণ্য দুই-ই এই দিনে যাঁরা স্নান করেন তাঁরা লাভ করেন।

নরকাসুরের কাহিনী এবং তাঁর জননী যে বর প্রার্থনা করেছিলেন আমাদের কাছে তার একটি বিশেষ শিক্ষা আছে।

দুঃখ ও দুর্দশা সকল মানুষের কাছেই সমভাবে আসে। এই যন্ত্রণার হাত থেকে কারও পরিত্রাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে যাঁরা মহান্ তাঁদের দুর্দশাও তত বেশী। নরকাসুরের এই ঘটনার মধ্যে একটি মহৎ শিক্ষা এই যে নরকাসুরের বা তার জননীর বেদনাকে ভুলে গিয়ে বিশ্বের মানুষ আনন্দ করুক। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি কিছু নয়। সর্বে জনা সুখিনো ভবন্তু।

উত্তর ভারতে এই দীপাবলী দিবস মহাসমারোহে সর্বত্র প্রতিপালিত হয়। এমন কি পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও এই উৎসব পরম পবিত্রভাবে পালন করেন। জৈনদের কাছেও এই দিনটি পবিত্র, এই দিনটিকে মহাবীরের নির্বাণ দিবস হিসাবে পালন করা হয়।

নরকাসুরের কাহিনী এই অঞ্চলে প্রচলিত। প্রতিটি উৎসবের পিছনে এক একটি নিজস্ব কাহিনী আছে। দীপাবলী প্রসঙ্গে তাই অনেক ধর্মীয় এবং সামাজিক কাহিনীর প্রচলন আছে।

ভগবান বিষ্ণু নাকি বর্ণাশ্রমে চার প্রকার উৎসব নির্দিষ্ট করেছিলেন। ব্রাহ্মণদের জন্য শ্রাবনী, ক্ষত্রিয়দের জন্য দশেরা, বৈশ্যদের জন্য দীপাবলী এবং শূদ্রদের জন্য হোলি।

উত্তর ভারতের জনগণ বৈশ্য রীতিতেই দীপাবলী উৎসব পালন করে থাকেন। এই দিনটিতে লক্ষ্মীদেবীর পূজা ও আরাধনার মধ্যেই অতিবাহিত করা হয়।

অনেকদিন পূর্বে এক দেশীয় মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম এই দেওয়ালীর সময়। মহারাজ বয়সে তরুণ এবং বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তাঁর বিধবা জননী পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন। মহারাজ লাজুক প্রকৃতির তরুণ। আতিথ্য শুদ্ধ এবং তাঁর আচরণ প্রশংসনীয়। মহারাজ তাঁদের পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরে গিয়ে পূজা অর্চনা করতেন। অন্ততঃ উৎসবের দিনটিতে সেই রকম নিয়ম। আমি এই রাজ্যে আসার সময় একজন সাহেবী ভাবাপন্ন সরকারি কর্মচারী আমাকে চুপি চুপি বলেছিলেন—মহারাজটি একেবারে চরম গেঁইয়া, বিলেতে লেখাপড়া করলে কি হবে, এখনও ভোরবেলা স্নান করে খালি গায়ে খালি পায়ে মন্দিরে পূজো করেন।

এই কথা শুনে আমি বলেছিলাম, "হাঁ, ভারী অন্যায়। এর চেয়ে ক্যানের সমুদ্র উপকূলে গোটাকয়েক হাফ-নগ্ন বিদেশিনীর সঙ্গে মহারাজ যদি নগ্নগাত্রে বালুকা শয্যায় শুয়ে সমুদ্রের হাওয়া উপভোগ করতেন তাহলে মানাত বেশী।"

মহারাজ সেদিন কুল-দেবতার পূজা সহস্তে করে সারা দিন নানাবিধ ছোটখাটো অনুষ্ঠান পালন করে সন্ধ্যার পর দীপাবলী উৎসবে স্বয়ং মেতে উঠেছিলেন।

ধনী ও দরিদ্র এই দিনটির আনন্দ সকলের। ওঁদের কাছে এই দিনটি আবার নববর্ষের শুভ সূচনা।

উত্তর ভারতের দেওয়ালির দিনটি মুখ্যতঃ লক্ষ্মী পূজার দিন। বাংলাদেশে যেমন দুর্গাপূজা বড় উৎসব, উত্তর

ভারতে দেওয়ালী সেই রকম উৎসব আত্মীয় কুটুম্বকে নতুন পোষাক-পরিচ্ছদ বস্ত্রাদি এই সময় দেওয়া হয়।

পথ চলতে দেখা যাবে সারি সারি মিষ্টির দোকান বসেছে, খাবারের পাহাড়। কত বিচিত্র রঙ। তবে রসের কারবার নয়, সব শুখনো মিষ্টি। কতকগুলি খাবারের নাম—হালওয়া, মোহন হালওয়া, পিস্তা হালওয়া, করাকী হালওয়া, কাজু হালওয়া, জীলাবি, মালাই লাড্ডু, পিস্তা বরফি, চকোলেট বরফি, আইসক্রিম বরফি, লাহোরী বরফি (স্পেশাল), মেওয়া লাড্ডু, কাজু পেড়া, বাংলা মেঠাই, ডালমুট, কালাকন্দ, ঐকন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের যেমন বিজয়া দশমীর দিনে কোলাকুলি করার রীতি আছে তেমনই এদেশের এই দিনটিতে কোলা-কুলি করার রীতি আছে

প্রতি বাড়িতে আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। অনেক জায়গায় আবার পুরাতন বস্ত্রাদি এক জায়গায় জড়ো করে পুড়িয়ে বহ্নুৎসব করা হয়। আকাশে আতুষ ওড়ে, আর বাজী ফাটে।

আর সব চাইতে হুল্লোড় হল জুয়া খেলায় বৈঠকে। নাচ গান হল্লার সঙ্গে ইদানীং সুরাপানের রেওয়াজ চালু হয়েছে ঘরে ঘরে উত্তর ভারতে এই একটিমাত্র উৎসব যার প্রতীক্ষায় সকল শ্রেণির মানুষ উৎকণ্ঠ আগ্রহে অপেক্ষা করে

মহারাষ্ট্রের দিওয়ালি

কমলা ভাগবৎ (মরাঠী মহিলা)

দিওয়ালী কিংবা দীপাওলি, মানেই আলোর সারি। এটা আলোর উৎসব।

অত্যাচারী মহিষাসুরকে বধ করে যেমন মা দুর্গা পাপের কালি দূর করে সুখের আলো ফিরিয়ে এনেছিলেন এই ভুবনে, তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর নামের একটি বলিষ্ঠ অসুরকে হত্যা করে পৃথিবীকে পাপীর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। অসুর বধে দূর হয়েছিল সকলের মনের আশংকার কাল আঁধার। তারই উপলক্ষে করা হয় এই উৎসব। তাই এত প্রদীপ সাজান হয়—এত আলোর বাহার ও নানান রকম বাজির ধুমধাম।

মরাঠীদের মাস চন্দ্রকলাকে অনুসরণ করে। শুক্লা প্রতিপদাতে মাসের আরম্ভ হয় ও আমাবস্যা তিথিতে মাস শেষ হয়। দিওয়ালি আসে আশ্বিন ও কার্তিক দুই মাসের সন্ধিকালে। আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের শেষ দুই তিথি—চতুর্দশী ও অমাবস্যা, আর কার্তিক মাসের প্রথম দুই তিথি প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া এই চারদিন দিওয়ালির উৎসব হয়।

আসলে আশ্বিন-এর দ্বাদশী থেকেই দিওয়ালি উৎসবের নৌবত শোনা যায়। এই দ্বাদশীকে মরাঠীতে বলা হয় 'বসু-বারস'। এ দিনে সবৎস ধেনুর পূজা করে। গ্রামের চাষীরা বলদদের সাজায়। সেদিনে তাদের আর ধানের ক্ষেতে খাটান হয় না। সোনালী রাঙতা জড়ান শিং নেড়ে বলদগুলি যখন হাঁটে তখন তাদের গলায় পরানো ফুলের ও মণির মালার মাঝখানে ঝুলান ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি 'টুন্ টুন্' করে মিষ্টি সুরে বেজে ওঠে।

বর্ষার শেষে হেমন্তের বাঁশী বাজে। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার হরিত সাজে নয়ন জুড়ায়। তখন সে আনন্দ প্রকাশ করার জন্য ভারতের সকল অঞ্চলে উৎসবের ঢাক ঢোল বাজতে থাকে। বঙ্গদেশের দুর্গা পূজা, মাদ্রাজে পোঙ্গল, ও মহারাষ্ট্রের দিওয়ালী—এই সব উৎসব, ফসল ফলার আনন্দেরই অভিব্যক্তি।

বাদশীর পরের দিন ত্রয়োদশী—তাকে বলা হয় ধন ত্রয়োদশী। চাষীদের ঘরে ঘরে শস্যের রাশি—মানেই ধনের রাশি—তাই এই তিথির নাম ধন ত্রয়োদশী। এই দিনে বিবাহিতা কন্যাদের আদর করে পিত্রালয়ে ডেকে আনে, তাদের খাওয়ায়···সাড়ী কিংবা এমনই কোন একটি উপহার দেয়। বাড়ীর সকল মেয়েরা সেদিন সকালে সুগন্ধী তেল ও গরম জল দিয়ে মঙ্গল স্নান করে। হাত মেহেন্দীতে সাজায়···সোনার চুড়ীর সাথে নূতন কাচের চুড়ীও হাতে দেওয়া হয়, খোঁপায় ফুলের মালা জড়ায়।

ধন ত্রয়োদশীর সন্ধ্যা থেকেই বাড়ী বাড়ীর বারান্দা—হাত প্রদীপের আলোতে উজ্জ্বল হয়। এত প্রদীপে অনেকটি বাতি লাগে, তাই আগে থেকে পুরান ধুতি কিংবা সাদা সাড়ী ছিঁড়ে সলতে তৈরী করে রাখা হয়। এই মাটির প্রদীপকে মরাঠী ভাষায় বলে 'পণতী'···আজকাল তেলের দাম প্রচুর বেড়ে গেছে—তাছাড়া এত সলতে তৈরী করা, রোজ সে প্রদীপে তেল দেওয়া, বাতাসে প্রদীপ নিভে গেলে দেশলা রেখে সেটা আবার জ্বালিয়ে দেওয়া এত সব ঝঞ্ঝাটের চেয়ে বিদ্যুৎ দীপের রং বেরংয়ের ঝলকই অনেকে পছন্দ করে। শুধু গোটা কয়েক প্রদীপ আঙিনায় জ্বালিয়ে রাখে, কেবল শাস্ত্রে লেখা আছে বলে।

তা ছাড়া দেওয়ালীতে বাড়ী বাড়ীর সামনের বারান্দায় বা ছাতে একটি বাঁশ উঁচু করে বেঁধে তার উপর ঝুলিয়ে দেওয়া হয় আকাশপ্রদীপ। সেটা ঘুড়ির কাগজের তৈরী বাহারি জিনিস, প্রায় চিনা লণ্ঠনের মতন। অমাবস্যার আঁধার রাতে নক্ষত্রের জানালা দিয়ে যদি ঠাকুর দেবতারা পৃথিবীর এই উৎসব দেখতে থাকেন—তাঁরা এই আকাশ- প্রদীপ দেখে তুষ্ট হন।

দিওয়ালি উৎসবের প্রথম দিন—নরক চতুর্দশী। এই দিনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুর বধ করেছিলেন। সে অশৌচ কাটার জন্যেই সেদিনে খুব ভোরে উঠে সূর্য উদয়ের

পূর্বে স্নান করে শুচী হতে হয়। না হলে মরণের পর নরকবাস—তাই সেদিনে সকলে ভোরেই স্নান করে।

এই নরকাসুর বধ উপলক্ষে একটি কথা আছে—তাতে শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশত আট স্ত্রী কেন—তা বলা আছে। অত্যাচারী, উন্মত্ত নরকাসুর, দেবলোক গান্ধর্বলোক, যক্ষলোক ও মনুষ্যলোক থেকে জোর করে ষোলো হাজার একশত সুন্দরী যুবতীদের বন্দিনী করে নিজের অন্তঃপুরে তুলেছিল এই সকল অভাগিনীদের শ্রীকৃষ্ণই উদ্ধার করেছিলেন, সে পাপীকে হত্যা করে। কিন্তু অসুরের অন্তঃপুরে থাকার দোষে সেই যুবতীদের বাড়ীর লোকেরা গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না তাই তারা শ্রীকৃষ্ণকে করুণায় সুরে বলল, "আমাদের পাপী অসুরের হাত থেকে তো বাচালে, কিন্তু এই পরিত্যক্ত অবহেলার জীবন থেকে তো মরণ ভাল····প্রভু আমাদেরও বধ কর—তোমার হাতে মরণ মানেই তো স্বর্গলাভ—"

তখন এই দুঃখিনী নারীদলকে আশ্বাস দিয়ে তাদের অবহেলা দূর করলেন শ্রীকৃষ্ণ—তিনি বললেন, আজ থেকে আমি তোমাদের স্বামী—পালনকর্তা····

অতি আনন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার কোটি কোটি প্রদীপ জ্বালিয়ে বরণ করেছিল তাদের এই আশ্রয়দাতা স্বামীকে—তাই পৃথিবীতে প্রতিবৎসরে এই দিনের উপলক্ষে জ্বালায় বহু অগণিত প্রদীপ।

নারীর মান রক্ষা করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—তাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্নান করে অসংখ্য নারীরা এই দিনে খুব ভোরে স্নান করে নদীর ধারে গিয়ে নদীর স্রোতে দীপদান করে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতায় আছে—'কেয়া পাতায় নৌকা করে সাজিয়ে দেব ফুলে, তাল দীঘিতে ভাসিয়ে দিব চলবে দুলে দুলে।' তারি মতন পাতার নৌকায় সাজান এই প্রদীপগুলি জলের স্রোতে ঢেলে দুলে ভাসতে থাকে। কলাগাছের মোচার কাছে লাল নৌকার মতন যে পাতা থাকে, তাতে আটা দিয়ে ছোট ছোট প্রদীপ তৈরী করে বসান হয় ও জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বহুদের মহিলারা এই দীপদান করতে পারে না, কিন্তু গ্রামের মেয়েরা এই নিয়ম পালন করে গ্রামে আঁকাবাঁকা নদীর কূলে, শেষ নিশীথ নিঝুম বেলায় দাঁড়ালে, কুয়াশা ঢাকা আঁধার ফুঁড়ে এই দোলায়মান প্রদীপ-নৌকাগুলির মিটমিটে আলো চোখে পড়ে সেটা তো নাকি মতই খুব চমৎকার লাগে।

আশ্বিন অমাবস্যার দিনে হয় লক্ষ্মীপূজা····প্রতিমায় নয় —বাড়ীর যে আসল লক্ষ্মী—টাকা পয়সা গয়না ইত্যাদির পূজা হয়। দোকানদারেরা তাদের হিসেবের খাতারও পূজা করে। দিওয়ালির আগেই ঘর-বাড়ী, দোকান-পাট, নূতন রং করা হয়, তা না সম্ভব হলে, অন্ততঃ ঝুলকালি ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে ঘর ও দোকান সাজান হয় ফুলচন্দন দিয়ে এই লক্ষ্মীপূজা করে ধূপ-দীপ জ্বালান হয়—খই-বাতাসার প্রসাদ বিলিয়ে দেওয়া হয় কোন কোন দোকানদার তাদের গ্রাহকদের নিমন্ত্রণ করে জলখাবারের আয়োজন করে।

দিওয়ালির তৃতীয় দিন—কার্তিক প্রতিপদ এই প্রতিপদাকে বলে বলি প্রতিপদ মহাই চলতি ভাষায় বলে 'পাড়ওয়া' বামন অবতারে শ্রীনারায়ণ বটুর রূপে বলি রাজাকে পাতালে পাঠিয়েছিলেন অনেক দেবতা বলির বন্দীশালায় বন্দী ছিলেন বলির পাতাল পতনের পরে দেবতারা উদ্ধার পেলেন, মুক্ত হয়ে গেল তাঁদের কেড়ে নেওয়া ধন সম্পদ সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী তো লক্ষ্মী —নারায়ণের অর্ধাঙ্গিনী স্বামীর হারের গৌরব করে সে দিনে লক্ষ্মী প্রদীপ দিয়ে বরণ করেছিলেন তাঁর স্বামীকে তাই সে দিনে স্বামীর মঙ্গলের কামনা করে বাড়ী-বাড়ীর নারীরা স্বামীকে প্রদীপ হাতে নিয়ে বরণ করে। স্বামীও স্ত্রীকে উপহার দেয় সাড়ী গয়না কিংবা এরকমই কোন জিনিস।

দিওয়ালীর শেষ দিন—কার্তিক দ্বিতীয়া····যমদ্বিতীয়া। মরাঠীতে বলা হয় ভাউবীজ। বঙ্গদেশের ভাইফোঁটাও এই দিনেই হয়। মরণপুরীর অধিপতি যমরাজা। কৃতান্ত কাল যাকে বলা হয় সে যমেরও একটি আদরের ছোট্ট বোন ছিল, তার নাম যমী। কাজে ব্যস্ত থাকায় অনেক দিন সে বোনের কাছে যেতে পারে নি, তাই সে অভিমান করেছিল, দুঃখ করেছিল তখন যম তাহাকে কথা দিয়েছিল, প্রতি বৎসরে এই দ্বিতীয়া তিথিতে, নিজের

কালের ভার অনুজদের উপর দিয়ে, সে বোনের কাছে ছুটে আসবেই। তাই পৃথিবীর সকল ভাই বোনেদের কাছে ছুটে আসে। বোন ভাইকে আদর করে খাওয়ায় ও প্রদীপ দিয়ে ভাইকে বরণ করে। ভাই বোনকে উপহার দেয়।

যাদের ভাই থাকে না তারা দ্বিতীয়ার কোটি চাঁদ পশ্চিম সীমান্তে অস্ত যাবার পূর্বে তাকে ভাই বলে বরণ করে। তাই যে বাচ্চাদের মামা নেই তারা চন্দ্রকে চাঁদমামা বলে। এখন এই বিজ্ঞানের যুগে রকেট চড়ে মামা বাড়ীর যাওয়ার সাধ আমাদের বাচ্চারা হয়তো মিটাতে পারবে।

মহারাষ্ট্রের, দেওয়ালীর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের দেওয়ার জন্য যে মিষ্টি ও নিমকির আয়োজন হয়, সে খাবার বাড়ীর মেয়েরা নিজে তৈরী করে। দেওয়ালীর আগে দু'তিন দিন তার নিজের রন্ধন নৈপুণ্য দ্বারা তৈরী করে এই সব খাবার। খাবার খুব ভাল হয়েছে—এই শুনলেই তার সার্থকতা লাভ করে—তাদের কষ্ট তারা ভুলে যায়

আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—দিওয়ালির কেল্লা। মহারাষ্ট্রের পার্বত্য অঞ্চলে, কত পাহাড়ের চূড়ায় এখনও দেখা যায় স্বাধীনতা প্রেমী শিবাজী রাজার সকল কেল্লার ভগ্নাংশ। সেই শিবাজী রাজাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ও ইংরাজের আমলে স্বাধীনতার সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত যুবকদের মনে জাগ্রত উৎসাহ করার জন্য এই কেল্লা তৈরী করার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল। তা ছাড়া দিওয়ালীর সময় স্কুল-কলেজে দিওয়ালির ছুটি থাকে। ছুটির দিনে ছেলেদের কোন একটা কাজে ব্যস্ত না রাখলে, তারা জ্বালাতন করে—ও বাড়ীর মহিলারা খাবার তৈরী করা, বাড়ী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা এই সকল কাজে নির্ভাবনায় মন দিতে পারে না, তাই ছোট ছেলে মেয়েদের এই কেল্লা তৈরী কাজে—আকাশ-প্রদীপ তৈরী করার কাজে লাগান হয়। এই কেল্লা বাড়ীর বাইরের আঙ্গিনায় বা বারান্দায় করা হয়। ছোট পাথরের নুড়ী, ইট পাটকেলের গুঁড়ো করে, সেটা মাটি দিয়ে ঢাকা হয়। সে মাটির উপরে গম, যব, ইত্যাদি ছড়ান হয় ও অল্প অল্প জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। দু'তিন দিনেই সেখানে দেখা যায় ছোট চারা গাছ দূরে থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ গাছ-গাছালিতে ঢাকা ছোট খাট একটি পাহাড়। এই পাহাড়ের চূড়ায় তৈরী করা হয় মাটির কেল্লা—কিংবা বাজার থেকে কিনে কাঠের কেল্লা এনে এই পাহাড়ে বসান হয়। কেল্লায় থাকে শিবাজীর ছোট মাটির প্রতিমা। পাহাড়ের রাস্তায় রাখা হয় শিবাজীর মাওলার দল। নিচে থাকে গ্রামের দৃশ্য।

এখন কিন্তু ও কেল্লার রূপ বদলে গেছে। শহরের অনেক ক্লাবের লোকদের মধ্যে কেল্লা তৈরীর প্রতিযোগিতা হয়। তাই ছোটদের সরিয়ে দিয়ে এখন বড়রাই নেমেছে এই কেল্লার কারু-কার্যের বাহার প্রকাশ করে প্রাইজ পাওয়ার লোভে। এখন জিনিস পত্রের দামের জন্য বাড়ী বাড়ী কেল্লা করা হয়ে উঠে না। পাড়ার সকলেরা মিলে কেল্লা তৈরী করে....কেল্লার প্রচলিত পদ্ধতির রক্ষার জন্য এক পাশে পাহাড় তৈরী করে শিবাজী রাজার স্থাপনা করা হয় কিন্তু পাহাড়ের তলায় থাকে আধুনিক শহর...পিসবোর্ডের তৈরী মডার্ন বাড়ী....একপাশে এয়ারপোর্ট....একপাশে রেলগাড়ীর স্টেশন, রাস্তায় থাকে মোটর গাড়ী, ট্রাক.... ব্যাটারী কিংবা বিদ্যুতের আলোতে ঝলমল করে এই কেল্লা নূতন পুরাতনের মিলনের এই দৃশ্য কেমন একটা মজার ব্যাপার।

আরও একটা দিওয়ালীর ছুটির আনন্দ মেওয়ার জিনিস হচ্ছে অনেক পত্রিকার স্পেশাল দিওয়ালি সংখ্যা। এতে মরাঠীতে বলে 'দিওয়ালি অঙ্ক' উপন্যাস, রহস্য কথা, কবিতা, প্রবন্ধ, ঘরোয়ার নূতন খাদ্যাদির, হাতের কাজের, উলের বুনার নমুনা, আরও। ডিজাইন—শিশুদের জন্য মন ভোলান রূপকথা—যতদূর সম্ভব সব কিছু। মিষ্টান্ন ভোজনের পরে, বিছানায় আরামে শুয়ে শুয়ে এই সকল সাহিত্যে রস চাখতে চাখতে যখন একটু তন্দ্রা আসে....মনে হয় এর চেয়ে বেশী সুখ আর নেই।

দিওয়ালীর এই চারদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই সুরু হয় বাজির ধুম ধাম। উড়ন্ তুবড়ি, পটকা ও অগ্নিবাণের জ্বালায় রাস্তায় হাঁটাচলা মুস্কিল হয়ে যায়। ফুলঝড়ি, চক্র ও আনার এই হচ্ছে নিরাপদ বাজারি আতস বাজি—সেটা বাড়ীর মেয়েরা পোড়ায়, কিন্তু ছেলেদের ভাল লাগে পটকা ....তুবড়ি। কানী পটকার শব্দে ছোট কচী শিশুদের ঘুম ভেঙ্গে তারা ভয়েতে কেঁদেই ফেলে। এই বাজির আগুনে কত দুর্ঘটনা ঘটে—কত ঘর পুড়ে ছারখার হয়—কিন্তু বাজি পোড়ার নেশাটা কেউ ছাড়ে না।

দীপালী ও ভাইফোঁটা

অতুল সাহেব

দীপাবলী সংখ্যা, ১৩৭৯

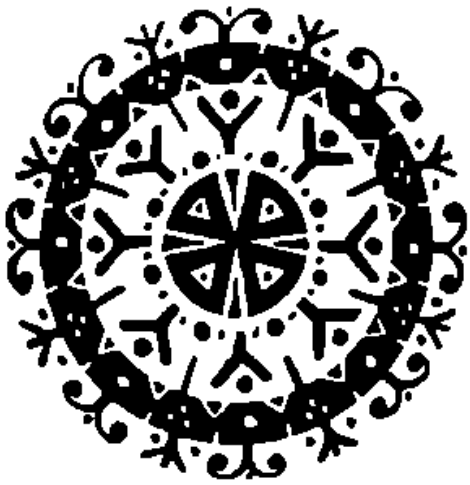

২৭৯এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-৩২৯৪

শাড়ী নয় সুতার কবিতা
শাড়ী শিল্পের চরম উৎকর্ষ অতি সুস্পষ্ট প্রতিটি শাড়ীতে
অতি আধুনিক * অভি নব * অভিজাত

দেওয়ালী উৎসবের খাবার

শকুন্তলা

দেওয়ালী উৎসবটি যেমন সর্বজনবিদিত তেমনি আবার এই তিথিটিতে আত্মীয় পরিজন সকলকে নানা রকমের খাবার খাওয়ানোর রীতিও প্রচলিত আছে। তবে বাংলা দেশ ছাড়াও উত্তর ভারতে এই দীপান্বিতা উৎসবে রং বেরংয়ের খাবার প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া চিনির মঠ, বাতাসা, চিনির মুড়কী ইত্যাদি ঐ সব দেশে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বাংলা দেশে ঘরোয়াভাবে নিজ নিজের নানারকম খাবার যেমন নলেন, জিলিপী, মুড়িভাজা, গজা, কচুরী, নিমকি এইগুলিই সকলে ঘরে তৈরী করেন অথবা দোকান থেকে কিনে থাকেন।

আগেকার [illegible] সকলেই নিজ নিজ বাড়ীতে তৈরী করতেন, কিন্তু এখন [illegible] অনুষ্ঠানে তাঁরা অতিথি অভ্যাগতদের [illegible]। আজকের দিনে অর্থনৈতিক সমস্যার চাপে পড়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে গেছে আত্মীয় স্বজনকে [illegible]

কালীপূজার [illegible] যেমন পাঁঠাবলি হয়ে থাকে। এই বলির [illegible] হলে সবাই খান এবং মায়ের প্রসাদ বলে সবাইকে বিলি করা হয়। আজকাল অবশ্য পাঁঠা বলি প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়।

দেওয়ালী ও ভ্রাতৃদ্বিতীয়া পর পর হওয়ায় জন্য আগে থেকে কলকাতার খাবারের দোকানগুলি কত বাহারী করেই না সাজানো হত। তাছাড়া রং বেরংয়ের কাগজের ফুল, ছেকল, লতাপাতা তৈরী করে দোকানগুলি মনোরম করে তোলা হত। অবশ্য আজকাল নানা কারণে ঠিক আগের

মতো করে উৎসবের [illegible] সেরকম [illegible] তবে দেওয়ালীর [illegible] আগের মতো [illegible] কারুর বিশেষ ভেট করতে চান না। তবুও পূজোপার্বণের দিনগুলোতে আমরা ভেট করতে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকে নতুন নতুন খাবার খাইয়ে তৃপ্তিলাভ করতে।

দীপাবলীর আলোক সজ্জা

বাণী ঠাকুরতা

আমাদের দেশ বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ—তাই একটির পর একটি পূজা ও অনুষ্ঠান আছেই। দুর্গাপূজার পর আসে কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা তার পরেই দীপাবলী বা দেওয়ালী উৎসব। এটি অবশ্য সর্বভারতীয় উৎসব। আশ্বিনী অমাবস্যার গভীর রাতে কালীমায়ের পূজা হয়। এই উপলক্ষে সন্ধ্যা থেকেই ঘরে প্রদীপের মালা জ্বালিয়ে দীপান্বিতা সজ্জা করা হয়। [illegible] দিয়েই এ উৎসব পালন করেন। বাড়ির প্রদীপ ছাড়া গাছের পরীস্থানের মতো [illegible] করা হয়।

অমাবস্যার আলোর [illegible] এই তিন রাতটি [illegible] অন্ধকার [illegible] চৌষট্টি প্রদীপ জ্বালানোর রীতি [illegible] সকলময়ী ও প্রচণ্ড। [illegible] দেবী কালিকা সদয়া হন।

এমন কি মহালয়ার সাইরেন এই হিন্দুর চিরন্তনী পুরুষীর ও অবশ্য পালনীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উজ্জ্বল করে রাখবার জন্যেই দীপালিতা বা দীপালী বা দেওয়ালী উৎসবের অবতারণা।

কথিত আছে শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বছর বনবাসের পর লঙ্কা রাবণকে বধ করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তারপরই এই তিথিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। সেই উপলক্ষে প্রজাদের নানাবিধ অনুষ্ঠানাদি ও রাত্রিতে তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি হিসেবে রাজ্যের প্রতিটি গৃহ আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়েছিল। সেই থেকেই ভারতবর্ষে দেওয়ালী অনুষ্ঠানের সূচনা। এই দীপ জ্বালানোর উৎসব সেই অতীত ঐতিহ্যের স্মৃতিপূজা। আবার দক্ষিণাত্যে দীপান্বিতার আগের দিনকে নরক চতুর্দশী বলা হয় কারণ সেদিন নাকি ভগবান বিষ্ণু নরকাসুরকে বধ করে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। সেই বিজয়ী বিষ্ণুর সম্বর্ধনায় জনাই ঘরে ঘরে আলোক সজ্জা ও বাজী পোড়ানো হয়েছিল এই দিনে। আরো ভারতীয়

শাস্ত্রকারেরা এই তিনটিতে দীপদানের আরো একটি কারণ নির্দেশ করে গেছেন। সে কারণটি কোনো বিজয়ী বীরের জয়ের উৎসব নয়, ভারতীয় হিন্দুদের ধারণাপ্রসূত তাঁদের যে সব পিতৃপুরুষ কর্মফলের জন্য যমলোকে থাকতে বাধ্য হয়েছেন, এই অমাবস্যায় দীপ জ্বালালে ও বাজি পোড়ালে সেই আলোতে তাঁদের বিষ্ণুলোক যাত্রা সুগম হয়। কাজেই দেখা যায় যে এর মধ্যে যে কোনো কারণেই হোক না কেন, দেওয়ালী উৎসব ভারতের সকল প্রদেশেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সবশেষে একটি ছোট্ট কথার উল্লেখ করি আশ্বিন কার্তিক মাসে একরকম পোকার উদ্ভব হয় যাকে আমরা বলি আমাপোকা এরা যে কোনো ধরনের আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে

থাকে। [illegible] থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের মেয়েরা এই দিনে লক্ষ্মীরূপে বরেণ্য। প্রদীপের মালা সাজিয়ে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে হয়। ব্যবসায়ীরা অনেকেই এই দিনটিতে নতুন বছর হিসেবে খাতা পূজো করে থাকেন। এবং সকলকে মিষ্টিমুখও করানো [illegible] এই মহতকর্মটির সার্থকতা [illegible] থাকে। [illegible] এই উৎসবের মূল অঙ্গ হৈচৈহল্লা ও বাজি পোড়ানো সকল প্রদেশেই এটি অত্যন্ত অবহেলিত হচ্ছে। মজিদের [illegible] এই দিনে সকলের মনের অন্ধকার দূর করাতেই এর সার্থকতা।

বাংলার উৎসব দেওয়ালী

শুক্লা বসু

যুগে যুগে প্রাচীন উৎসবের সঙ্গে নতুন উৎসব এসে মিশেছে। প্রাচীন উপাদানের সঙ্গে নতুন উপাদান মিলিত হয়ে অনেক উৎসব নতুন রূপ ধারণ করেছে। তাই বাংলার অনেকগুলি উৎসবে বৈদেশিক ও প্রাদেশিক প্রভাব সুপরিস্ফুট। এতে মনে হয় সকল দেশের সর্বজনের সঙ্গে আপন প্রাণের জন্য এই জাতটি ছুটে উঠেছে।

বাংলাদেশে প্রচলিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক উৎসবকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়। বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব। শাক্তদের দিকে একটু বেশি পরিচিতা দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীকে বিভিন্ন বিভিন্নভাবে তাদের নিয়ম অনুসারে পূজা করে থাকেন। শাক্ত উৎসব সম্পর্কে আমরা এইসব দেশের [illegible] আলোচনা করে থাকি। বাংলা [illegible] এই মনে হয় উৎসবের তুলনায় শাক্ত [illegible] সাধারণে এখানে দেখি। গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত ঋতুর তিনটি নির্দিষ্ট দিনে কালীর বিশেষ পূজা প্রচলন বহুস্থানে দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মে জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তারাদিবী কালীপূজা, হেমন্তে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় দীপান্বিতা কালীপূজা এবং শীতে মাঘের কৃষ্ণ চতুর্দশীতে রটন্তী কালীপূজা।

তবে দীপান্বিতা কালীপূজাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কিন্তু এই পূজার খুব প্রাচীন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিভিন্নজনের নিজ সাধনায় রচিত হয় দেবীর প্রতিমা, প্রসাদ নিতে মিলিত হয় পাড়া-প্রতিবেশী সবাই। অবশ্য কালের বিবর্তনে বাংলাদেশে সকল অনুষ্ঠানেরই রূপান্তর ঘটেছে। তবুও বাঙালীর শেষন প্রকৃতি তার সকল অনুষ্ঠানেই একটি মধুময় পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে। এ মাধুর্য অবশ্য বাঙালীর একার সম্পদ নয়, এ ভারত ভূখণ্ডের সনাতন মধুর স্রোত। মানুষের একদিকে ভীষণ অন্তর্দিকে চণ্ডী, একদিকে সৃষ্টি অন্যদিকে সংহারের লীলা চলেছে। সবকিছুর যে শক্তিরূপ চেতনা রয়েছে তার উপলব্ধির মাধ্যমেই মহাকালীর পূজা। এই আত্মশক্তির আমরা খণ্ডিতভাবে অনুভব করি বিদ্যারূপে, বিত্তরূপে, শক্তিরূপে এবং বিভিন্নরূপে বিভিন্ন প্রকারে আমাদের ঘোর অন্ধকারে চলে মনশ্চক্ষুর্দিনী শক্তির উদ্বোধন। সহস্র দীপাবলীর আলোয় আমরা যেন অন্ধকারকে অপসারিত করে দিয়ে জ্ঞানালোকের আবাহন করতে পারি এই হোক আমাদের মিলিত প্রার্থনা।

"হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
কেতকিকা কহলো গোপন
কাঁচল ঘিরে—
ঘরে ঘরে লোক পাঠালো
দীপালিকার জ্বালাও আলো
আপন আলোর জন্য ওরে ঐ তারারে।"

রবীন্দ্রনাথ

লক্ষ্মীব্রতের আলপনা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

পল্লীবাংলার একখানি মাটির ঘর। গোবর দিয়ে নিকোনো পরিষ্কার মেঝে। সেই মেঝেতে লক্ষ্মী পূজা হবে।

মেয়েরা নিজেরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন [illegible] শুরু করলেন। কি অপূর্ব সে আলপনা [illegible]

[illegible] চালগুঁড়ো, নিরুপায়ের ঘর, [illegible] সন্ধ্যেয় একখণ্ড তুলো দিয়ে আলপনা

লক্ষ্মীপূজার আলপনায় বিভিন্ন পদ্ম, [illegible] লক্ষ্মীপেঁচা এবং ধানছড়া এই তিন আলপনার প্রধান অঙ্গ। এছাড়া আলপনায় নানারকম অলঙ্কারে এবং চৌকিতে লক্ষ্মীর সম্পূর্ণ মূর্তি না এঁকে কেবল মুখ আর দুখানি পা শিষ্ট পায়ের উপরে পা এমনি নানা রকম চিত্র আঁকা হয়।

চৌকিতে লক্ষ্মী পাতা হয় সেই চৌকির মূর্তির গায়ে লক্ষ্মীর [illegible] আর লক্ষ্মীপেঁচা বা পদ্ম, ধানছড়া, ঝাঁপিলতা, লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকা হয়।

কোনো কোনো জায়গায় লক্ষ্মীর ঘরা ও ব্যবহার হয়। পূর্ববঙ্গে এর প্রচলন বেশী দেখা যায়। সরায় গিয়ে লাল নীল সবুজ হলদে কালো এই কয়টি রং দিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ লক্ষ্মীপেঁচা ইত্যাদির আলপনা থাকে। লক্ষ্মীর কাপড়ে সবুজ রং, গায়ে হলুদ রং, অধর ও পায়ের এবং করতলের জন্য লাল রং—নীলবর্ণ পটভূমিকায় কারুকার্যে দেওয়া হয়। লক্ষ্মীসরার উপরের দিকে আধখানা নারকেলের মালাই। মেয়েরা এই মালাইকে কুবেরের মাথা বা খুলি বলে।

[illegible] আঁচলে সরার পশ্চাতে একটি শৈব সমেত মাথা [illegible] সেটিকে ঘোমটা দিয়ে, গয়না ইত্যাদি দিয়ে অনেকটা একটি ছোট মেয়ের মতো সাজানো হয়। এছাড়া কলার খোলা দিয়ে ধানের গোলার মতো কতকগুলো ডোলা সাজিয়ে

নারকেলের মাথা ভরে ঘরে একটি কাঠের পেন্সার নৈবেদ্যর প্রত্যেক পদার্থ যেমন, চিনি, মুন, মুসুরী, মটর ইত্যাদি দিয়ে লক্ষ্মীর চৌকির সামনে [illegible] পূজা শেষ হওয়া পর্যন্ত ব্রতিনীর উপবাস [illegible] কোনো কোনো ঘরে লক্ষ্মী, নারায়ণ [illegible] একটিকে তিন রাত্রের পিটুলির পুতুলের আকারে গড়ে

[illegible] আলপনা [illegible]। তবে [illegible] মতোন উপলক্ষে

মেয়েরা মাঙ্গলিক হিসাবেই পুকুর বেদী, সুহাসন, ঘরের প্রবেশ পথ প্রভৃতি আলপনা দিয়ে চিত্রিত করে থাকেন। অনেকে শুকনো আলপনা দিয়ে মেঝে প্রভৃতি অঙ্কিত করেন যেমন শুকনো চালের গুঁড়ো ছড়িয়ে লতাপাতা আঁকা হয়। তবে আমাদের দেশে পূজাপার্বণে পিটুলির আলপনাই প্রশস্ত। দেখতে গেলে আলপনা কিছুটা গতানুগতিকভাবে লোক পরম্পরায় চলে আসছে। এবং বিভিন্ন পূজাপার্বণে, মেয়েদের ব্রতানুষ্ঠান থেকেই এই আলপনার সৃষ্টি।

সবচেয়ে গর্বের কথা আগেকার দিনের মেয়েরা যাঁরা এইভাবে আলপনা দিতেন তাঁরা কারুর কাছে আজকের দিনের মতো শিল্পশিক্ষা করেন নি। তাই মনে হয় অন্ততঃ একশ

একটু আগেকার বোলার দুটির প্রান্তে যদি আমাদের মনের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তা হলে সেখানে দেখবো সুন্দর সরলা পূর্ণপ্রাণা মা বোনেরা ছোট ছোট শান্তির নীড়-গুলিকে কেমন লক্ষ্মীশ্রীতে ভরিয়ে তুলেছেন। সুখই ছিল তাঁদের ধ্রুব, তাই সেই সুখকে তাঁরা সাজিয়ে রাখতেন নানারকম শিল্পের মাধ্যমে। আমরা লক্ষ্মীর ব্রতকথায় পড়েছিলাম পল্লীগ্রামের বধূটি তার মাটির ঘরখানিকে গুছিয়ে পরিষ্কার করে আলপনা চিহ্নিত করে সারারাত ব্যাপী যেটুকু লক্ষ্মীর আরাধনা করেছিলেন। তাঁর ঘরে লক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছিল নিশ্চয়ই কারণ পরিচ্ছন্নতার অপর নাম শ্রী ও সৌন্দর্যই লক্ষ্মী—আমরা যেন যুগে যুগে সেই লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা করতে পারি।

লক্ষ্মী অলক্ষ্মীর ব্রতের কাহিনী

অনীতা গঙ্গোপাধ্যায়

সেকালে উজ্জয়িনীতে এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি এত সুশাসনে রাজত্ব করতেন যে প্রজারা নিরন্তর তাঁর গুণগান করতো। এই রাজার রাজত্বের নিয়ম ছিল যে হাটে বাজারে যে সব জিনিস কেউ কিনতে না তিনি সেই জিনিস কিনতেন। একদিন রাজা খবর পেলেন সেদিনের বাজারে একটি কামার এক লোহার মূর্তি নিয়ে বসে আছে কেউ সে মূর্তি কিনছে না। রাজা তখনই সেই মূর্তিটি কিনে আনালেন। এবং মন্দিরে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন।

রাতে রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল শুনতে পেলেন এক নারী কণ্ঠের কান্না। তিনি ধড়ফড় করে উঠে গেলেন দেউড়ীতে—গিয়ে দেখলেন একটি সুন্দরী যুবতী একলা দাঁড়িয়ে কাঁদছে। রাজা জিজ্ঞেস করলেন কে মা তুমি এই নিশুতি রাতে একলা আমার দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কাঁদছ। সেই নারীমূর্তি বললেন—আমি আপনার রাজলক্ষ্মী—আমি চললাম এবং এই সঙ্গে সঙ্গে আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাব। রাজা বললেন, আমার কি অপরাধ? রাজলক্ষ্মী বললেন—আপনি রত্নপুরীতে যে লোহার মূর্তিটি কিনেছেন তিনি অলক্ষ্মী—সুতরাং আমার আর থাকা চলে না। রাজা বললেন—যতদিন আমার ধর্মে মতি থাকবে, ততদিন আমি অলক্ষ্মী ত্যাগ করতে পারব না। রাজলক্ষ্মী বিদায় হলেন। পরদিন আবার কান্নার শব্দ—রাজা খবর নিয়ে জানলেন তিনি ভাগ্যলক্ষ্মী—তিনিও চলে গেলেন। তার পরদিন এমনি করে যশোলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মীও চলে গেলেন। রাজ্যে হাহাকার পড়ে গেল।

এদিকে অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে রাজকোষ শূন্য হয়ে যেতে লাগল। রাজা হলেন ফকীর। একদিন তিনি ধর্মকে নিজের কথা জানিয়ে বললেন যে ধর্ম! এতো দুঃখ অপনি সবাই ছেড়ে চলে গেল আপনি আর এ দুঃখে আমার কাছে কেন থাকবেন আপনিও চলে যান। ধর্ম বললেন সবাই তোমায় ছেড়ে চলে গেলেও আমি যাব না। তোমার সুখের দিন আবার আসবে।

অলক্ষ্মীর পূর্বদৃষ্টি পড়লো রাজার উপর। রাজারানী বনের মধ্যে পাতার কুটির বাস করতে লাগলেন। একদিন রাজা খেতে বসেছেন রাণী ভাত বেড়ে দিয়েছেন, বাতাস করছেন। পাতের পাশে অসংখ্য পিঁপড়ের সৃষ্টি হয়েছে রাজা তাঁদের কণা খুঁজতে দেখেছেন পিঁপড়েরা বলছে, 'দেখ, দেখ রাজার এমন ভাগ্য পাতে একটি পিঁপড়ে ঢুকছে না।' রাজা খিল্ খিল্ করে উঠলেন জিজ্ঞেস করলেন হাসছ কেন আমায় বলতে হবে—রাণী বললেন যদি বলি কেন হাসছি তাহলে কিন্তু আমার মৃত্যু হবে। রাণী তবুও শুনতে চাইলেন—তখন রাজা একটা ছেলে এক গ্লাস জলে দাঁড়িয়ে বললেন—এখনো বল শুনতে চাও কি কথা রাণী জিদ ধরে বললেন হাঁ। এমন সময় এক পেয়ারী সেখানে এসে থেকে উঠল—তাই দিয়ে একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে দেখে পেয়ারী পেয়ারীকে বললে 'ওগো, ঐ দেখ, একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে, ওটাকে এনে খাও খাই।' পেয়ারী বললো, 'পাগল নাকি, অগাধ জলে মড়া ভেসে যাচ্ছে, আনতে গিয়ে প্রাণটা যাক আর কি? আমি তো আর এ রাজার মতো মূর্খ নই যে রাণীর কথায় নিজের প্রাণ দেবো।' রাজা শুনে ভাবলেন—বনের জন্তুও আমায় মূর্খ বলল। তক্ষুনি জল থেকে উঠে রাণীকে রাগ করে গভীর বনে রেখে এলেন।

বেচারী রাণী কি করে। গভীর জঙ্গলে থাকতে থাকতে রাত হয়ে গেল—এমন সময় দেখতে পেলো গাছের ফাঁকে যেন আলো জ্বলছে—তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে দেখলেন সেখানে পেত্নীরা ঘিরে বসে আছে ও কুয়াশের মুক্তি করে অঙ্ক করছে।

কলে তক্ষুনি তাঁদের সঙ্গে পূজা করতে লেগেন। ওদিকে রাজবাড়ীর অলক্ষ্মীও বিদায় হয়ে গেলেন। রাজ্যে শ্রী ফিরে এলো। ধর্মের কৃপায় সেই বনের কাছে একটি গ্রামে রাজা রাণীর সঙ্গে দেখা হল। ধর্ম রাজাকে বললেন মহারাজ! মহারাণীর

জন্যেই আপনি সব ফিরে পেলেন। আপনি অলক্ষ্মী কিনে এনেছিলেন—তাই আপনার দুঃখ কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীছাড়া করে আপনার হারানো রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। তারপর একে একে রাজলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী, ধনলক্ষ্মী ও কুললক্ষ্মী এসে রাজাকে স্বাগত জানালেন। রাজাও ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। একমাত্র ধর্মের কৃপায় রাজা সব ফিরে পেলেন। কারণ রাজা সবকিছুকে ত্যাগ করলেও ধর্মকে ত্যাগ করেন নি—তাই ধর্মেরই জয় হল। অবশ্য কালীপূজা বা দীপান্বিতা উৎসবের রাত্রে আরো কয়েকটি লক্ষ্মীব্রত কাহিনী শোনা যায়। যেমন লক্ষ্মীপূজা করার আগে, কলার পেটোয় গোবরের লক্ষ্মী গড়ে, তার সঙ্গে ছেঁড়া চুল, ভাঙা কুলো আর ভাঙা পাখার বাতাস করতে করতে তাকে রাস্তায় বার করে দিয়ে বলতে হয়—'অলক্ষ্মী বিদায় হও ঘরের লক্ষ্মী ঘরে এসো। এরপর লক্ষ্মী নারায়ণ ও তুলসীর মূর্তি গড়ে খুব ঘটা করে পূজো করা হয়।

"লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত করেছে যারা
এই ব্রত করিবে পাবে ভবের ঈশ্বর।"

"মানুষকে হতশ্রদ্ধা করা ভীষণ খারাপ! কার মধ্যে কি আছে কে জানে? কে ভালো কে মন্দ দেখলেই বোঝা যায়। দোষ-গুণ নিয়েই মানুষ। দুর ছাই করলেই কি কাউকে ভালো করা যায়? ভালবেসে তার ভুল বুঝিয়ে দিতে হয়। নিজের ভুল বুঝতে পারলেই সকলে ভাল হতে চেষ্টা করে।"

—শ্রীমা সারদা দেবীর কথা

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা

বেলা দে

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন—

"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ
ওগো তোমার চরণ দুটী
বক্ষে আমার ধরি
এই দেশেতে জন্ম আমার
যেন এই দেশেতেই মরি।"

সত্যি বাংলা দেশ ছাড়া এত অকৃত্রিমতা আর কোনো দেশে নেই। ভাই ফোঁটার দিনটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী উৎসব প্রিয় জাতি। অতীতের ধনধান্য ফলপুষ্পশোভিতা বঙ্গজননীর স্থান আজ ভগ্নসর্বস্ব—তথাপি পরস্পরের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধ ও ঐকান্তিকতা আজো এই সর্বহারা জাতির মূলোৎপাটন করতে পারেনি। বাঙ্গালীর কল্যাণশ্রী মণ্ডিত সমস্ত চেতনা অতীতের আনন্দ-দীপ্ত দিনগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করবার প্রত্যাশায় সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলিকে প্রাণপণে ধরে আছে। তারা জানে এগুলি তাদের জাতীয় সংস্কৃতির প্রতীক—প্রাণধারার প্রকাশ। এরা আমাদের দৈনন্দিন সংঘাতপূর্ণ জীবনের সকল গ্লানিমা ধুয়ে মুছে অন্তরকে প্রাণরসে অভিসিঞ্চিত করে।

পারস্পরিক প্রীতির বন্ধনকে নিবিড়তর করবার উদ্দেশে প্রবর্তিত পাঁচালী ব্রতকথা প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ারও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ভাই-বোনের সুমধুর সম্পর্ককে সুদৃঢ় করাই এই শুভ ব্রত পালনের উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। ভাইয়ের সকল অকল্যাণকে দূরীভূত করে তার জীবনকে নিষ্কণ্টক, আনন্দময় করে তোলার ঐকান্তিক কামনাই বোনেদের এই ব্রত উদ্‌যাপনে প্রেরণা দান করে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার প্রথম উৎপত্তি কাহিনী পদ্মপুরাণের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে:—সূর্যের পত্নী সংজ্ঞা পতির প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে না পেরে সূর্যের উত্তরমাত্র স্বীয় যমজ সন্তান যম ও যমুনাকে নিজ প্রতিবিম্ব ছায়িনী স্বপত্নীর নিকট রেখে পিতা বিশ্বকর্মার কাছে চলে যান এই বিমাতার দুর্ব্যবহারে

ভগ্নচিত্ত যম বিমাতাকে বধের অভিপ্রায়ে একটি পদাঘাত করেন। তাঁর চরণস্পর্শে ভীতা মায়ের শুভ্র চিত্তোদ্যানে কি ঘটবে বলাবাহুল্য নিমন্ত্রণ করে অন্তর্ভোজন করান। সেই থেকে এই ভ্রাতৃপূজা, ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা নামে মরজগতে প্রচলিত হয়।

ভ্রাতৃপূজার এই সুন্দর প্রথা আজো বাংলা দেশে প্রতিবছর ভগ্নীগণ কর্তৃক নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়।

আবার ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে লেখা আছে যে নরকী ঐ তিথিতে তাম্রলিপি দ্বারা ভাইয়ের পূজা করেন। এই পূজার ফলে তাঁকে কখনো বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। এই শুভ বিধিপালনে ভাইয়ের কখনো আয়ুক্ষয় হয় না।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনটিতে যমের বোন যমুনা চিত্রগুপ্ত ও ভ্রাতা যমকে নিজের বাড়ীতে পূজা করে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন বলে শাস্ত্রে এই দ্বিতীয়াকে যমদ্বিতীয়া বলে। ভাইফোঁটার দিনটি যেন ভাইবোনের প্রীতি মিলনের উৎসব। গার্হস্থ্য জীবনে এ এক পবিত্র উৎসব। কার্তিকী দ্বিতীয়ার প্রত্যূষে গ্রামের পথে পথে মেয়েরা গাছের পাতায় পড়া নক্ষত্রাভ শিশিরবিন্দু তুলে আনেন। তাই দিয়ে চূড়া চন্দন মিশিয়ে ভাইদের নতুন কাপড় পরিয়ে নিজেরা উপবাসী থেকে ভাইদের আসনে বসিয়ে প্রথমে ললাটে নীহার

ও করে খুব ভক্তি সহকারে করে থাকে ভগিনীগণ। তার চন্দন তিলক দিয়ে মঙ্গল কামনা করে থাকে—

"শুভিক্ষে
ভিক্ষে
করে ভাই
ভিক্ষে করিতে যাব।

ভাই
ধনে পুত্রে
এ যেন ভাই থাকে।"

অথবা—"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা
যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।
অমি দি ভাইকে ফোঁটা
যমুনা দেয় ভাইকে ফোঁটা।
ভাইয়ের কপালে ফোঁটা মাতে
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে॥"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যে একমাত্র বাঙালীর উৎসব তা নয়, সকল স্তরের মানুষের নিকট এর পরিচয় খুব নিকট ও গভীর। অন্যান্য প্রদেশে থালাভর্তি নানা রকমের রং-বেরংয়ের ক্ষীরে খাবার ও টাকা সাজিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু বাংলা দেশে এই দিনটিতে ভাইরা যা যা খেতে ভালবাসেন বোনেরা নিজের হাতে সেই সব খাবার তৈরী

ভাইদের [illegible]। অবশ্য ভাইরাও সাধ্যমত বোনেদের নতুন কাপড় দেন। এমনি করে ভাইবোনের প্রাণভরা ভালবাসা ও আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসবটি পালন করা হয়।

আজকের নারীসমাজ যদিও শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছেন কিন্তু আপনজনদের মঙ্গল-কামনায় ব্রত অনুষ্ঠানে ছেদ পড়ে নি। তার আচরণে অমঙ্গলকে কতখানি প্রতিহত করা যায় জানিনা কিন্তু আজও কল্যাণকামিনী ভগ্নির শুচিশুভ্র ব্রতচারিনী রূপটির কাব্য সৌন্দর্য্য আজও ম্লান আছে।

[illegible]

"শুরাও মনস্কাম জগৎ তারানাম,
তারা তব নাম কলাকের সার।
কাল গেল, কালী হল না সাধন,
প্রসাদ বলে গেল বিফলে জীবন।
এ অভাজন কর বিমোচন,
[illegible]

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

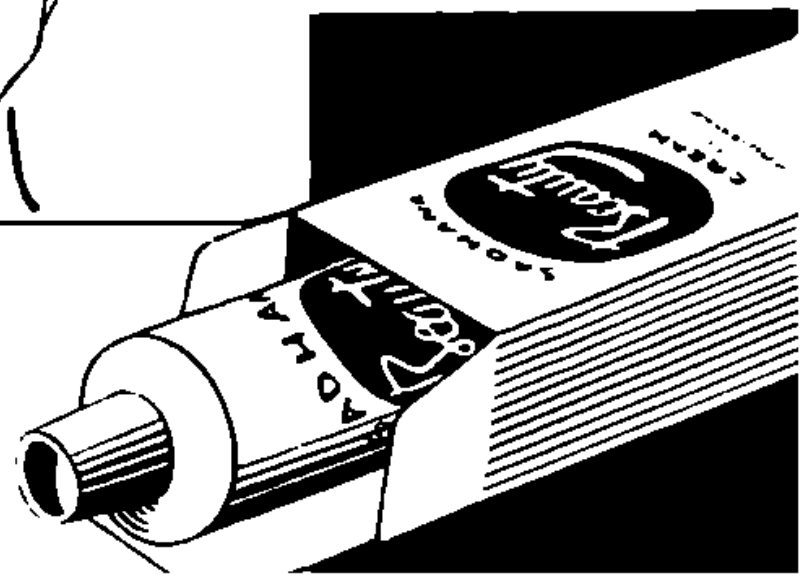

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

সারা ভারতের সর্বত্র

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও প্রীতিকর করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

প্রবাসী

অষ্টবিংশতি বর্ষ
অগ্রহায়ণ ১৩৭৯

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
মাসিক পত্রিকা

কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি
স্বদেশবরেণ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে. সি. দাশের

রসগোল্লা

শুধু রসনার তৃপ্তি সাধনেই নয়
দেহের পুষ্টি সাধনেও অদ্বিতীয়।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিঃ

আবিষ্কারক : রসোমালাই

কলিকাতা—ব্যাঙ্গালোর

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

10.6/70

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৮৮

স্বনামধন্য ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন) এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

ভারতের প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করুন

সেই সঙ্গে আয় করুন ৭½% সুদ

৩ বছরের
ডাকঘর নির্দিষ্টকালীন জমার ওপর

৫ বছরের জমায় ৭%

১ বছরের জমায় ৬%

এই সঙ্গে জনানা করমুক্ত সিকিউরিটি ও ডিপজিটের ওপর প্রাপ্য সুদ মিলে বছরে মোট ৩০০০ টাকা পর্যন্ত সুদের ওপর আয়কর প্রদেয় না।

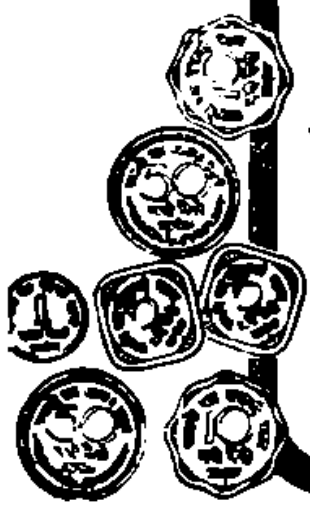

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা

আপনার ভবিষ্যৎ নিয়ে আপনার ভেবার জাতীয় সঞ্চয় সংস্থার জেলা অফিসের সঙ্গে যোগ করুন।

৪৮৭ ১৮ ৩১২

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

অগ্রহায়ণ
১৩৭৯
অষ্টবিংশতি-বর্ষ

DECEMBER 1972

মূল্য : এক টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)
বার্ষিক পূজা সংখ্যা সহ—কুড়ি টাকা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীদোলবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রা: লি:
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

এই মরশুমে বাটার ক্যানভাস জুতোর বিপুল সমারোহ

ক্যানভাস জুতো যে কত রকমের, বাটার জুতো না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। এত নতুন নকশা, রকমারি রঙ, ক্যানভাসের জুতোয় এর আগে আর দেখা যায়নি। সব নকশাই এমনভাবে তৈরি, পরামাত্রেই পায়ের আরাম ষোল আনা। হাঁটাচলা অবাধ সহজ। আজই একজোড়া পরে দেখুন।

Bata

সুনীতা সুখী কিন্তু
মালতী চিন্তায় জর্জরিত

বারবার গর্ভ ধারণের ফলে মালতীর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। এত যন্ত্রণা ভোগ ক'রে হয়েছে তো কতকগুলি রুগ্ন সন্তান।

সুনীতার দূরদৃষ্টি ছিল; তিনি পরিবার পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকায় সুনীতা ও তাঁর পরিবারের সুখের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে গেছে।

ছোট পরিবার
সুস্থ পরিবার

davp 72/228

খাটে খাই-
ষোল-আনা
তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট– **নিম।**

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

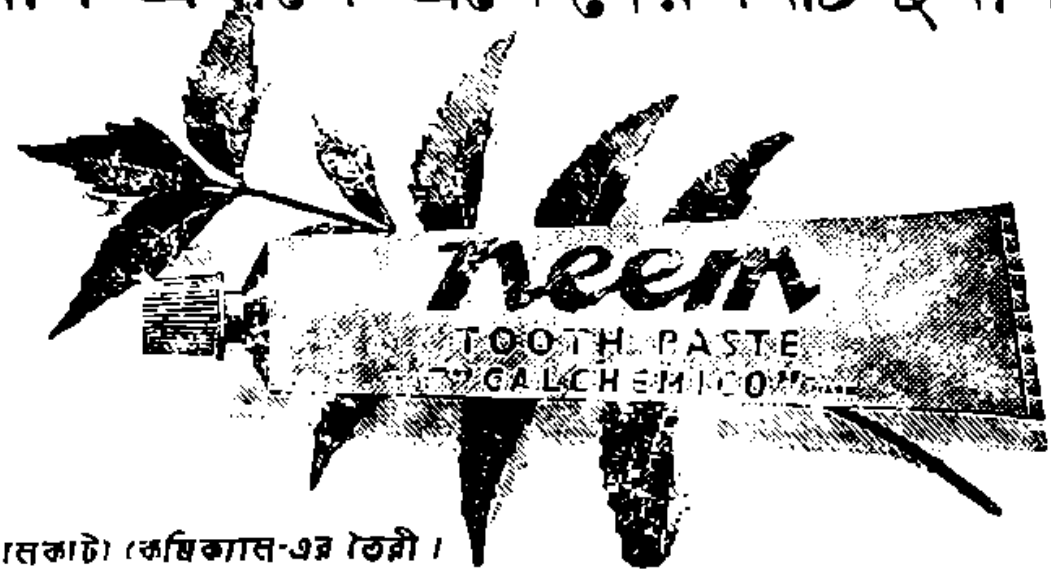

ক্যালকাটা কেমিক্যাস-এর তৈরী।

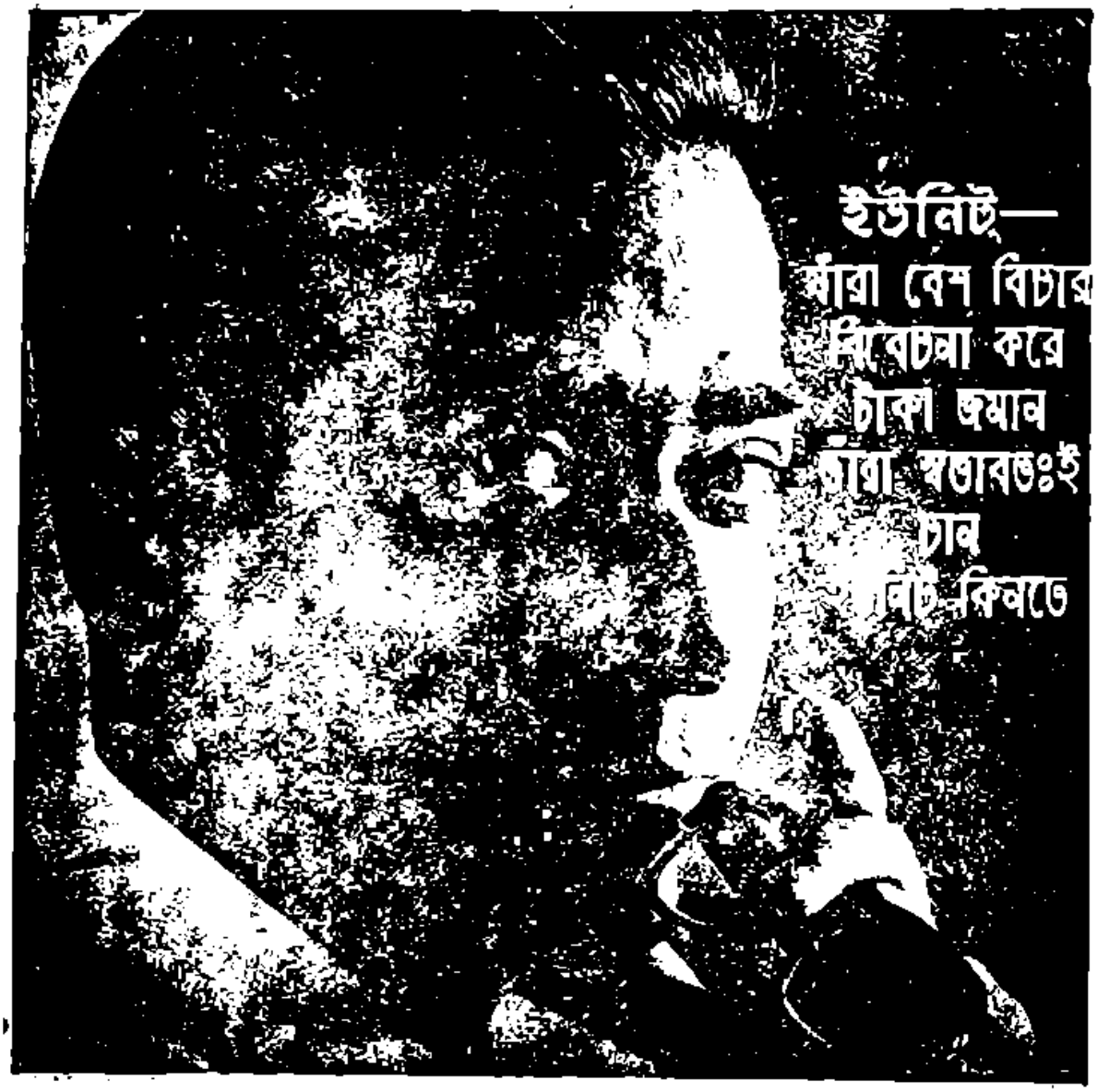

যাঁরা ভেবে চিন্তে
টাকা খাটাতে চান
তাঁরা চান মূলধনের নিরাপত্তা,
ও সুদের উচ্চহার এবং
সহজে ভাঙানোর সুবিধা।

UNIT TRUST OF INDIA
সুবিনিয়োগায় সমৃদ্ধয়ে

আপনি জানেন
ইউনিট-এ সবের সঙ্গে
কর এও রেহাই দেওয়া হয়।
বছরের যে কোনও সময়ে
ইউনিট কেনা ভালো।

ইউনিট ট্রাস্ট অফ্ ইণ্ডিয়া

davp 72/438

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

সুলেখা
এক্‌জিকিউটিভ

পার্মানেন্ট। ব্লু-ব্ল্যাক • নেভি ব্লু • সুপার ব্ল্যাক • ডার্ক ব্রাউন।

ওয়াশেবল। রয়েল ব্লু • এমারেল্ড গ্রীন • ডারলেট রেড • ক্রি-স্ট্যাল ভায়লেট।

সুলেখা
স্পেশ্যাল

পার্মানেন্ট। ব্লু-ব্ল্যাক ★ রয়েল ব্লু ★ ব্ল্যাক।
ওয়াশেবল। রয়েল ব্লু ★ রেড ★ গ্রীন।

সুলেখা
জেনারেল

পার্মানেন্ট। ব্লু-ব্ল্যাক।
ওয়াশেবল। রয়েল ব্লু • রেড • ব্ল্যাক

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

SW-4/73

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়		১৩৯
কংগ্রেসের কথা—মহাভারতের কথা		
অম্বিকা কালনায় কালীবাড়ী	প্রশান্ত রায়	১৪২
কংগ্রেসের আদিগুরু—উমেশচন্দ্র	সদানন্দ	১৫
কংগ্রেসের কথা—	সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার	
জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র—		

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন : ৩৫ ১৪৫০

৫, ৬ ক্লেয়ার স্ট্রীট.

ফোন : ২৩-১৮৯৯

শাখা

২৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা খাঁটি ঘি।

—শিশিরকুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত, ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ঘ্রাণ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক :

ছড়া	শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী	১
সামাজিক মনস্তত্ত্ব (নকশা)	শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া	৫
সেকালের বনভোজন	শ্রীগিরিবালা দেবী	১০
মুস্কিল আসান (গল্প)	শ্রীসীতা দেবী	১৮
আধুনিকা (গল্প)	শ্রীশান্তা দেবী	২৮
বিপ্লব বহ্নি	দীপঙ্কর	১৪৩
আবার সেই ছেলে	দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	১৫২

এই সংখ্যায়

নাটমঞ্চ	রত্নাকর	১৫৯
খেলাধূলা	জ্যোতির্ময়	১৬৫
ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)	প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	১৬৮
আর এক অলৌকিক	অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১৭০
পুণ্যতীর্থ প্রভাস	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৮
তীর্থ-বিচিত্রা	গৌরীশংকর দে	১৮০
স্মৃতি-ভালোবাসা-মৃত্যু (গল্প)	কাশীনাথ দাস	১৮২

বেঙ্গল বাঁধনে বন্যা ছিল কি বাঁধা ?

নিতাই রমণীর কেশ হবে রমণীর সেরা
বেঙ্গল কেমিক্যালের **ক্যাক্টারাইডিন**
কেশ তৈল কেশরাশিকে এক অনুপম রূপলাবণ্য
ফিরিয়ে দিতে পারে।
ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্যাক্টারাইডিন কেশ তৈল
দুধের নিয়মিত খাদ্য যুগিয়ে কেশরাশিকে পরম
রমণীয় করে তোলে ও আনন্দময় সম্পদ তুলে
ধরের বস্তু।

কসমেটিকস্ ডিভিশন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর
দিল্লী ○ মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ লক্ষ্ণৌ

এই সংখ্যায়

মেয়ে মজলিস :

বিভিন্ন কাছে মেয়েরা	তহিনা মুখোপাধ্যায়	১৮৫
চিঠির উত্তর	রাজলক্ষ্মী	১৮৭
পোষাক ও রূপ রুচির স্থান কাল	হেনা চৌধুরী	১৮৮
কেরেলা প্রণালীতে মাংস রান্না		১৯০

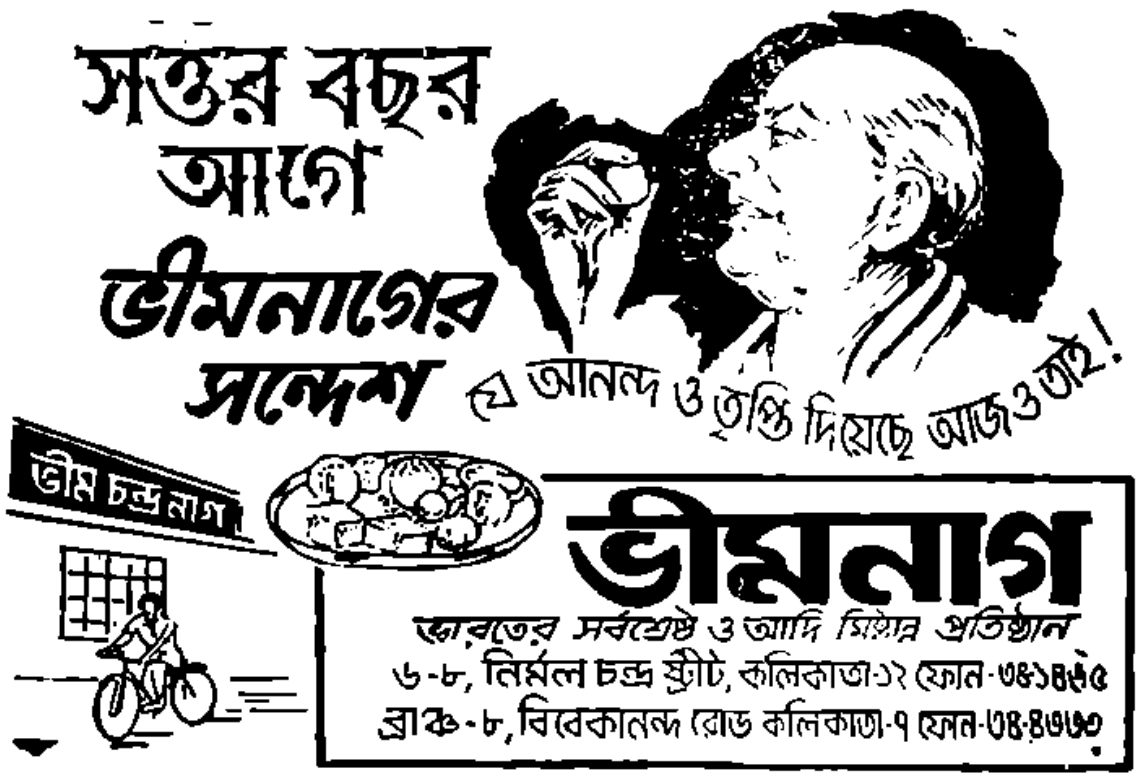

একথা বলা কি ঠিক যে বেশি সন্তান হলে ভবিষ্যতে প্রায় অনেক হবে ?

একথা প্রায়ই শোনা যায়-খেটে খাবার জন্যে প্রত্যেক শিশুই দুটি হাত নিয়ে জন্মায়।

কিন্তু মনে রাখা দরকার যে একটি মানুষ সারা জীবন ধরে খায় বটে কিন্তু কাজ করে, প্রায় করে কয়েকটা বছর আগে।

আধুনিক পদ্ধা পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সত্যি। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজন শিক্ষা ও কুশলতা।

একজন শিক্ষিত ব্যক্তি অনেক ভালো ভাবে জীবন কাটান। অনেকগুলি সন্তান হলে তাদের শিক্ষা দীক্ষার এমন কি তাদের ভালোভাবে খাওয়াবার ব্যবস্থা করাও আপনার পক্ষে কঠিন হবে।

অনেকগুলি অশিক্ষিত ও স্বাস্থ্যহীন সন্তানের তুলনায় সীমিত সংখ্যক স্বাস্থ্যবান ও শিক্ষিত সন্তান অনেক বেশি উপার্জন করতে পারে।

২৭৯এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-৩২৯৪

শাড়ী নয় সুতার কবিতা
শাড়ী শিল্পের চরম উৎকর্ষ অতি সুক্ষ্ম প্রতিটি শাড়ীতে
অতি আধুনিক * অভি নব * অভিজাত

সম্পাদকীয়

আজ মানুষ কোথায় ?

দেশের দুর্দশা ও দুর্গতির কথা ভেবে আজ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই অত্যন্ত ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বুঝতে পারছেন যে সত্যিকারের মানুষের অভাবেই দেশের এই দুরবস্থা এবং দেশে আজ সত্যিকারের শিক্ষা নেই বলেই মানুষও নেই।

শিক্ষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা, গবেষণা, তর্ক-বিতর্ক স্বাধীন ভারতে হয়েছে ও হবে। কিন্তু সবচেয়ে গোড়ার কথা, আসল কথা হল তা হচ্ছে—আমাদের দেশের 'প্রকৃত শিক্ষার রূপ ও প্রণালী কি হবে', তাই সর্বপ্রথম নির্ধারণ করা এবং সযত্নে ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাকে পরিচালিত করে তোলা। এক কথায়, যে-শিক্ষা আমাদের দেশের লোককে মানুষ করবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখাবে এবং চরিত্র গঠনের দৃঢ় ভিত্তির ওপর তুলবে সেই-শিক্ষাই হবে আমাদের দেশের প্রকৃত শিক্ষা। স্বাধীনতা পাবার পর দুদীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাল কেটে গেল, অথচ এই-অতি-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে কোনও পরিকল্পনা আজও পর্যন্ত গ্রহণ করা হলো না। এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কি হতে পারে। পূর্বে আমরা বহুবার বলেছি, আবারও বলছি এর প্রয়োজন হলে আরো অনেকবার বলবো যে, সকল পরিকল্পনার আগে 'মানুষ তৈরীর পরিকল্পনা'।

দেশের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণকারী সরকার ও জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় এ-পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করতে হবে। তা না হলে অন্য সকল পরিকল্পনাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, সত্যিকারের মানুষ না থাকলে পরিকল্পনা রূপায়ণ করবে কে ?

আজ মনে পড়ে নব-ভারতের-স্রষ্টা-সন্ন্যাসী-বীর স্বামী বিবেকানন্দের কথা। সারা পৃথিবী ভ্রমণ করে দেশে ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন "পৃথিবীর অনেক দেশ ঘুরে এলুম। ঐ সব দেশের লোকদের সঙ্গে আমাদের দেশের লোকদের অবস্থা তুলনা করে দেখলুম। মনে প্রশ্ন জাগলো, কিসে এরকম ব্যাপারে ঐ সব দেশের লোকদের অত উন্নতি হলো ? তার উত্তর এলো—শিক্ষা ! শিক্ষা ! শিক্ষা ! এই-শিক্ষা অর্থাৎ আসল-শিক্ষা আমাদের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অবাধে বিস্তার করতে হবে, তবেই আমরা মানুষ হতে পারবো এবং মানুষের মত কাজ করে দেশের অজ্ঞানতা, জড়চিন্ততা, অসমতা, আত্মকলহ, দ্বেষাদ্বেষ প্রভৃতি ব্যাধি দূর করে দেশের সবদিকে উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হব।" সেই সঙ্গে আজ আরো মনে পড়ে স্বামীজীর উদ্দীপ্ত-বাণী—"Man making is my Mission"

শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জীবনের মিশন

[ছাত্রজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীহেমন্ত কুমার সরকারকে নেতাজীর ৩১শে আগষ্ট, ১৯১৫ সালে, লিখিত পত্র হইতে গৃহীত।]

"……আমি দিন দিন এটা বেশ বুঝিতেছি যে আমার জীবনের একটা Definite mission আছে, তারই জন্য আমার শরীর ধারণ and I am not to drift in the current of popular opinion. লোকে ভালমন্দ বলিবে জগতের এটা রীতি, but my sublime self-consciousness consists in this that I am not influenced by them. যদি জগতের ব্যবহারে আমার attitude এর পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ দুঃখ, নৈরাশ্য আনে, তাহা হইলে বুঝিব যে আমার দুর্ব্বলতা। কিন্তু আকাশের দিকে যার লক্ষ্য, সম্মুখে পর্ব্বত আসছে কি কূপ আসছে তার যেমন জ্ঞান থাকে না—সেই রকম যার একমাত্র লক্ষ্য mission-এর দিকে—তার ওসব দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ নাই। I must move about with the proud self-consciousness of one imbued with an idea.

যাক্, আমি এখন বুঝিতেছি যে মানুষ হইতে গেলে তিনটি জিনিস চাই :—

1) Embodiment of the past
2) Product of the present
3) Prophet of the future.

1. I must assimilate the past history, in fact all the past civilisation of the world.
2. I must study myself—study the world around me—both India and abroad, for this, foreign travels are necessary.
3. I must be the prophet of the future. I must discover the laws of progress—the tendency of both the civilisation and therefrom to settle the future goal and progress of mankind. The Philosophy of life will alone help me in this.
4. This ideal must be realised through a nation—begin with India. Is not this a grand idea ?

The more we lift our eyes Heavenwards the more shall we forget all that was bitter in the past, the future will dawn upon us in all its glory."

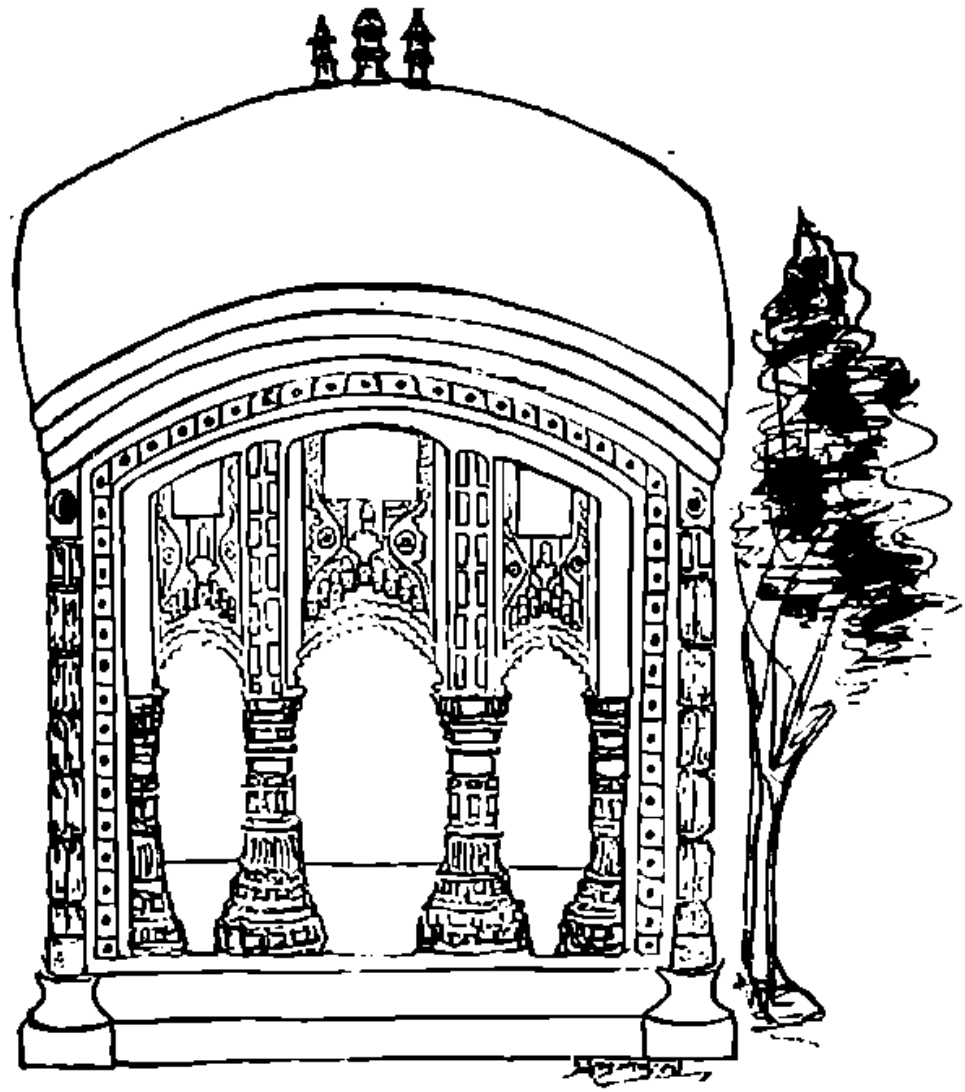

অম্বিকা কালনায় দেবী অম্বিকা

প্রশান্ত রায়

গঙ্গার এপারে অম্বিকা কালনা আর ওপারে শান্তিপুর। বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় যখন শান্তিপুর ডুবু ডুবু তখন গঙ্গার এপারে অম্বিকা কালনার অবস্থা কেমন ছিল?

বৃন্দাবন দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ করেছেন:

"আর জয় অবধূত চন্দ্র মহাশয়।
যাঁহার কৃপায় হেন সব রস হয়।
এইমতে সপ্তগ্রামে অবধূত সঙ্গে।
বিহরেন নিত্যানন্দ স্বরূপ কৌতুকে॥"

সে আজ প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগেকার কথা। কিন্তু এখানে কতগুলি প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে, যেমন, অম্বিকা কালনার প্রথম অম্বিকাটি কে? দেবী অম্বিকার নামানুসারেই কী কালনার নাম করণ হয়েছে অম্বিকা কালনা? আর সর্বোপরি, দেবী অম্বিকার প্রতিষ্ঠাই বা কবে হয়েছে? তার অখণ্ড ইতিহাসই বা কী?

অম্বিকা-কালনা নামের ইতিহাস, দেবী অম্বিকার ইতিহাস প্রভৃতি জানতে হলে, আসতে হবে কালনায়,

দেবী অম্বিকার মন্দিরে দর্শন পেতে হবে তাঁর, মন্দিরের চৌত্তারায় বসে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের এক আশ্চর্যতম নিদর্শন পোড়ামাটির কাজ দেখে হতবাক হয়ে যেতে হবে আর মন্দির গাত্রে খোদিত দুএকটি ছত্রের পাঠোদ্ধারেই ইতিহাসের কিছু হদিশ মিলবে। তবে তা কেবল সংকেত মাত্র, লুপ্ত ইতিহাসের তথ্য ও প্রমাণ অনুসন্ধানের অনেক বাতির মধ্যে একটি মাত্র বাতি। যতই টিমটিমে হোক না কেন তা তো আর উপেক্ষণীয় নয়।

সে দিনের সেই ঐতিহাসিক মন তাই, ছুটে গিয়েছিল দেবী অম্বিকার দর্শন পেতে, বাংলা দেশের জোড় বাংলার মন্দিরের পোড়ামাটির কাজ দেখতে, কালনা, নবদ্বীপ, অম্বরাগড় প্রভৃতি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলির রহস্য উদ্ঘাটন করতে, এ যেন ঠিক ঘোরলাগা রাত প্রাসাদের অন্দর মহলে নাচের আসরের দূর দুন্দুভির আওয়াজ। গভীর রাতে কান পাতলে খোস মেজাজের আসরের হৈ হল্লার শোনা যায়। অন্তরীক্ষ আত্মারা যেন ঘোরা ফেরা করে আপন আপন পরিচয় দেবার আশায়।

অম্বিকা কালনার দেবী অম্বিকা হলেন ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্তি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা চিত্র সেন কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরের শিলা লিপিতে লেখা আছে —"শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৯১।১২।২৬ ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবী শ্রীযুক্ত মহারাজা চিত্রসেন রায়স্য মিস্ত্রি শ্রীরামচন্দ্র"—পূর্বেই উল্লেখ করেছি মন্দিরটির গড়ন, জোড় বাংলার মতন, অর্থাৎ একজোড়া দোচালা বাংলা ঘরের মতন।

কাঞ্চন নগরে ঠিক অনুরূপ একটি দোতলা জোড়-বাংলা মন্দির জীর্ণাবস্থায় পড়ে আছে। আকারে গড়নে এবং পোড়ামাটির কারুকার্যের সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, একই মিস্ত্রির হাতে তৈরী। সিদ্ধেশ্বরী বাড়িতে যে কয়েকটি শিব মন্দির আছে তার মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠা করেন তিলকচন্দ্রের মাতা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, আর একটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্ধমান রাজবাড়ির অমাত্য রামদেব নাগ। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র 'নাগাষ্টক' রচনা করে বর্ধমান রাজবাড়ির অমাত্য এই রামদেব নাগকে অমর করে রেখেছেন। বর্তমান সেবায়েত জানালেন, যে বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরের সেবায়েতের কার্যের ভার তারা পালন করে আসছেন। পিতা ৺তারপ্রসন্ন অধিকারী, প্রপিতামহ ৺কালীপ্রসন্ন ইত্যাদি।

এবার দেবীমূর্তি দর্শনের পালা। দেবী অম্বিকা সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্তি ভীষণা, মোহবর্ণকারী দেবীমূর্তি। দারুময়ী। দেবী মূর্তির সামনেই পঞ্চমুণ্ডির আসন। প্রাচীনত্বের সাক্ষি বহন করছে ঐ পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর একটি পাথরের নির্মিত ঘট। এর জন্য আজও রহস্যাবৃত।

৺সিদ্ধেশ্বরীর ইতিহাস সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে।—

বর্তমান মন্দিরটি যেখানে আড়াইশো বছর পূর্বে তার অল্প দূরেই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে ছিল একটা পুকুর। সেই-পুকুরের পাড়ে দেবীর মূর্তিটি পাওয়া যায়। দারুময়ী মূর্তি। ভীষণমূর্তি। এই মূর্তি পূজা করেন অম্বু নামে এক ঋষি।

এই অম্বু ঋষির নাম থেকেই দেবীর নাম হয় অম্বিকা।

আর এই অম্বিকার পবিত্র স্মৃতিজড়িত দেশ বলেই কালনার নাম অম্বিকা কালনা।

সব আলোচনার শেষে এক কঠিন সত্যের সম্মুখীন হতে হয় এই দেবী অম্বিকাকে নিয়ে। আমাদের কাছে দেবী অম্বিকা হলেন দুর্গা। দেবদেবীরও ধর্মান্তরের ইতিহাস আছে আসলে অম্বিকা হলেন জৈনধর্মাবলম্বীদের বিখ্যাত উপাস্য দেবী। পরে বাংলার পলিমাটিতে দুর্গায় পরিণত হয়েছেন। ঐতিহাসিক ষ্টুব, পি দাস তার "Econography of the Jain Goddess Ambika সম্বন্ধে Journal of the university of Bombay তে মন্তব্য করেছেন যে জৈনদেবী অম্বিকার উপাসনা শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশেষ প্রচলিত ছিল। পরে জৈন দেবদেবী বৌদ্ধ ও হিন্দু তান্ত্রিক দেবদেবীর অধিকারী হয়ে উঠেছেন। দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা এমনকি বিংশতিভুজা অম্বিকা পর্যন্ত। বোঝা যায় জৈন দেবী অম্বিকা খুব সহজেই বাংলার দুর্গার ধ্যানমূর্তির মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে অম্বিকা কালনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন ৺সিদ্ধেশ্বরী কালী। দুর্গা নন। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? যিনি দুর্গা তিনিই কালী এবং যিনি অম্বিকা তিনিই দুর্গা আবার তিনিই কালী।

কংগ্রেসের কথা
-মহাভারতের কথা

কংগ্রেসের আদিগুরু : উমেশচন্দ্র

সদানন্দ

১৮৮৫ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বোম্বাই শহরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। ১৯৭৭ সালে তার ৭৯তম অধিবেশন কলকাতায়। এই দীর্ঘ সাতাশি বছর ধরে কংগ্রেসের উপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেছে, কত তার উত্থান পতন পরিবর্তন দীর্ঘদিনের ইতিহাস। ঐতিহ্যময় গৌরবোজ্জ্বল সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটি নাম সোনার অক্ষরে লেখা আছে সে-নাম, ডবলু, সি, বনার্জি —কংগ্রেসের প্রথম-সভাপতি। বাঙালীদের পক্ষে গৌরবের কথা বৈকি। কিন্তু আজ যখন আমাদের গর্ব করবার মতো আর কিছু নেই, তখন সেই কংগ্রেসের আদিগুরু প্রথম প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করে খানিকটা প্রেরণা পেতে পারি তাই তাঁকে আজ স্মরণ করা, তাঁর সুমহান কর্মময় জীবনের ও ব্যক্তিগত মহানুভবতার কিছু তথ্য পরিবেশন করা। আজ আমরা শুধু তাঁর নামটাই জানি। কিন্তু কেমন মানুষ ছিলেন তিনি, কোন গুণে ১৮৮৫ সালে সারা ভারতের মধ্যে তিনিই হলেন একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পৌরোহিত্য করবার ভার যাঁর উপর দেওয়া হল? সেদিন বোম্বাই শহরে রীতিমতো সাড়া পড়ে গেছে। বালগঙ্গাধর তিলক, মহাত্মা গোখেল প্রমুখ দলনায়কেরা পরামর্শ করছেন। কে সভাপতি হবেন? এমন একজনকে তো চাই যাকে সারা ভারতের লোক শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, এমন একজনকে চাই যিনি মানুষের মত মানুষ অনেক আলোচনার পর বোম্বাই-এর সংগঠন সমিতির ঘোষণা করলেন, আমরা সর্ববাদীসম্মতভাবে জানাচ্ছি যে ওই পদের জন্য আমরা ডবলু, সি. বানার্জীকে সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করি।

এই প্রসঙ্গে আমার একটি ইতিহাস হিউম-এর নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনিই বলতে গেলে ভারতের এই জাতীয় মহাসভার সৃষ্টিকার্যের প্রধান হোতা।

কংগ্রেসের সেই প্রথম অধিবেশনে বাংলা থেকে প্রতিনিধি গিয়েছিলেন, ইনডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, নববিভাকর পত্রিকার সম্পাদক গিরিজা ভূষণ মজুমদার, উমেশ চন্দ্র এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে জানকী নাথ ঘোষাল।

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্বন্ধে উমেশচন্দ্র পরবর্তীকালে লিখেছিলেন—"অনেকে অবগত নহেন যে লর্ড ডাফরিন যখন ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন তাঁহারই পরিকল্পনায় কংগ্রেস গঠিত হয় ১৮৮৫ সালে মিঃ হিউমের মনে হয় যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে।"

কিন্তু সভাপতির আসন থেকে তিনি যে অভিভাষণ দিলেন তা শুনে ইংরেজদের মনে হল, এ তো সামাজিক কথা নয়, ইনি যে ভারতের জাতীয়তার কথা, রাজনৈতিক চেতনার কথা বলছেন!

ভারতীয় অ-ভারতীয় সকলে তাঁর সেই ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বিস্মিত! এ কী সাহস, একী বিশ্লেষণ, চিন্তের এ কী প্রসারতা, এ কী জাতীয়তা বোধ! আজ বোধকরি আমাদের মধ্যে সে সাহস, সে মনের প্রসারতা, সে দূরদর্শিতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কংগ্রেস সম্পর্কে ইংরেজদের বিরূপ মনোভাব উমেশচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। অভিভাষণের শুরুতেই তিনি বলবার বলেন—"কেউ কেউ বলেন, সমাজ সংস্কার না করলে আমরা রাজনৈতিক অধিকার পাবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো না। যে কথা কি। এ ভুবের

মধ্যে সম্বন্ধ কোথায়? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলুন, কংগ্রেস বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক করবার জন্য আবেদন জানাচ্ছে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের কি সম্পর্ক? আমাদের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না, আমাদের কন্যারা অন্য দেশের মেয়েদের চেয়ে কম বয়সে বিবাহিতা হয়, আমাদের স্ত্রীকন্যারা আমাদের সঙ্গে বন্ধুদের বাড়ী বা পার্টিতে যায় না, তাই বলে কি আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভের অযোগ্য?"

মনে রাখতে হবে সাতাশি বছর আগেকার সমাজ ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই কথা বলেছিলেন ভারতীয়দের সম্বন্ধে ইংরেজদের তাচ্ছিল্যের মনোভাবকে টুকে।

অসাধারণ চরিত্রের মানুষ ছিলেন তিনি একদিকে যেমন পাকা সাহেব, অন্যদিকে তেমনি খাঁটি হিন্দু। ভিতরে বাইরে কোথাও ফেঁক ছিল না। তিনি ছিলেন নিখাদ সোনা।

বিচিত্র জীবন। ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় তেমন মন ছিল না। যাত্রা থিয়েটার নিয়েই মেতে থাকতেন। বড় বংশে জন্ম। পিতামহ পিতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খিদিরপুরের বাগান বাড়ীতে ১৮৪৪ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। বাপের চেষ্টায় তিনি ইংরাজী শিখলেন, তারপর বিখ্যাত সাংবাদিক ও ইংরেজী-নবিশ গিরিশচন্দ্র ঘোষের কাছে সাকরেদি করলেন কিছুকাল। ফলে ইংরাজীতে অসামান্য দখল জন্মালো তাঁর।

১৮৬৩ সালে বোম্বাই-এর প্রসিদ্ধ কোটিপতি রুস্তমজী জামশেদজী জিজিভাই, ইংলণ্ডে গিয়ে আইন শিখতে ইচ্ছুক ভারতীয় ছাত্রদের জন্য পাঁচটি বৃত্তির ব্যবস্থা করে ভারত সরকারকে তিনলক্ষ টাকা দেন। শর্ত ছিল, পাঁচটির মধ্যে তিনটি বৃত্তি পাবে বোম্বাই-এর অধিবাসী, একটি বাঙালী ও একটি মাদ্রাজী। বাংলা থেকে উমেশ চন্দ্র সেই বৃত্তি পেলেন এবং ঐ বছরই ১৬ই অক্টোবর ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। এই বিলাত যাত্রাই তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইংলণ্ডে থাকাকালেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা, দেশপ্রেম, কর্মশক্তি এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ

বিলাতে শুধু আইন অধ্যয়ন করেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন না। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হোয়ে সেখানে 'লণ্ডন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করে বন্ধুদের সহযোগে ভারতের কথা প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৬৭ সালে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে পর বৎসর দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিপুল প্রসার ও প্রতিপত্তি অর্জন করে সকলকে চমৎকৃত করে দিলেন। ১৮৮১ থেকে ১৮৮৭-এর মধ্যে তিনি চার বার ষ্ট্যাণ্ডিং কৌঁসুলীর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর আগে ঐ পদ আর কোন বাঙালী পাননি। তিনবার তাঁকে বিচারপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়, কিন্তু তিনি সম্মত হন নি, কারণ, বছর পাঁচেকের মধ্যেই তাঁর আয় দাঁড়িয়েছিল মাসিক দশ হাজার টাকার উপর, বলেছিলেন, "আমার তো পৈতৃক বিষয় আশয় তেমন নেই, তাই মাসে মাত্র চার হাজার টাকা বেতন নিয়ে আমি সংসার চালাবো কেমন করে—I am too poor to accept a puisne judgeship."

তারপর বহু সংস্থার সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হয়েছেন, কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি ১৮৮৫ সালে। ১৮৯৯ সালে লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে দ্বিতীয়বার সভাপতি

১৯০২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে তিনি বিলাতে গিয়ে প্রিভি কাউন্সিলে প্র্যাকটিস সুরু করলেন এবং অচিরেই বিপুল যশ অর্জন করলেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড অ্যাসকুইথ, লর্ড হিলডেন এবং আরও অনেক বাঘা বাঘা ইংরেজদের তর্ক যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনি ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বিলাতে তাঁর ঠাপট ছিল দুর্দান্ত। সাহেবী আনায় সাহেবদেরকেও টেক্কা দিতেন তিনি। আবার এদিকে খাঁটি ভারতীয়, খাঁটি দেশ প্রেমিক। ১৯০৬ সালে ক্রয়ডনে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে উমেশচন্দ্র দেহ রক্ষা করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে তাঁর শব দাহ করা হয় এবং চিতাভস্ম একটি পাত্রে রক্ষিত করে ঐ বাড়ির এক কোনে প্রোথিত হয়। তার উপর যে বৃত্তি গুলক রচিত হয় তাতে

তাঁর পরিচয়ে লেখা হয়—হিন্দু ব্রাহ্মণ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি সুযোগ পেলেই ইংরাজদের আচার আচরণ আর ভারত বিরুদ্ধ মনোভাব নিয়ে তাদের কঠিন ভর্ৎসনা করতেন। সাহস, তেজস্বিতা, বাগ্মিতা আর স্বাধীনচিত্ততায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়, অপরাজেয়।

আর শুধুই কি সাহস আর তেজস্বিতা! অন্য দিকে তেমনি ছিলেন কোমল-প্রাণ, দয়ালু, সহানুভূতি-সম্পন্ন মানুষ! তিনি মনে করতেন পরোপকারই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম! নিঃস্বার্থ ছিল তাঁর উপার্জনকীর্তি। চাকর-বাকরদের প্রতিও তাঁর অনুকম্পার শেষ ছিল না, বলতেন, "আমার সেবা যে করছে তার কোন কষ্ট আমার সহ্য হবে না।" বিপন্ন আত্মীয় বন্ধুদের জন্য তাঁর দরজা সব সময় উন্মুক্ত থাকতো, মাইকেল মধুসূদনকে তিনি বিলাতের অকাতরে অর্থ সাহায্য করেছেন। কলকাতার বার লাইব্রেরীর দেশী বা বিদেশী কোন ব্যবহারজীবী মারাই কেউ তাঁকে অর্থের জন্যে অনুরোধ করেছেন তাদের কাউকে না করে তিনি দিয়েছেন আর বলেছেন, "pull on able" পাছে সাহায্যগ্রহীতার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে তাই বলতেন—"এই সামান্য কটি টাকা আপনার দরকারে যে দিলাম সে আমার কর্ম সার্থকতা নয়, যখন ইচ্ছে হয় দেবেন, ফেরৎ দেবার জন্যে মনে কোন দুশ্চিন্তা পোষণ করবেন না।"

বহু দান ছিল তাঁর কিন্তু ডান হাতে দিতেন, বাঁ হাত তা টের পেতো না। বউবাজারের এক গৃহস্থ ভদ্রলোক একবার ধারে পড়ে তাঁর ভদ্রাসন উমেশচন্দ্রের কাছে বাঁধা রেখে দশ হাজার টাকা ধার নেন। ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেলে তাঁর বিধবা স্ত্রী উমেশচন্দ্রের কাছে এলেন। উমেশচন্দ্র বললেন, "মা, তোমাদের এখন কী হবে?" বিধবা বললেন, "তাতো জানি না বাবা! বাড়ি তো বাঁধা। শোধ দেবার কোন উপায় নেই, ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে শেষ পর্যন্ত পথে দাঁড়াতে হবে বাবা।" তিনি জানতেন না যে বাড়ি বাঁধা আছে উমেশচন্দ্রের কাছেই। তাঁর কথা শুনে উমেশচন্দ্র বললেন, "মা, তুমি বাড়ি যাও। তোমায় পথে দাঁড়াতে হবে না।" মহিলাটি চলে গেলেন। উমেশচন্দ্র সেই দিনই তাঁর সমস্ত কাজ কর্ম ফেলে রেখে সেই বন্ধকী সম্পত্তির মুক্তিপত্র রেজিষ্টারি করে দিলেন।

পরীক্ষার ফী দিতে পারছে না বলে যে ছাত্র তাঁর কাছে এসে দাঁড়াতো তার ফীর দশ টাকাটাই দিয়ে দিতেন, বলতেন, "আর কারুর কাছে যাবার দরকার নেই, আমিই সবটা দিচ্ছি। কিন্তু একটি সর্তে বাপু। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে কার কাছ থেকে পেলে, খবরদার, আমার নাম করবে না।"

ক্রয়ডনে ১৯০৬ সালের ২১শে জুলাই উমেশচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত ছিলেন, দাদাভাই নৌরজী, মহামতি গোখেল এবং আরও অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি, তাঁর মৃত্যুর পর বিলাতে যে স্মৃতিসভা হয়েছিল তাতে দাদাভাই নৌরজী বলেছিলেন—"উমেশচন্দ্র কখনো অযথা গর্ব বা উল্লাস দেখাতেন না। তিনি ছিলেন এক বিরাট কর্মী। কংগ্রেসের জন্য তিনি আমৃত্যু প্রাণপণ পরিশ্রম করে গেছেন। ব্যবসায়ে অতুলনীয় সাফল্যের চেয়ে তাঁর নির্ভীকতা আর স্বদেশ প্রেম তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। তাঁর মত একজন একনিষ্ঠ কর্মী পাওয়া দুর্লভ। তাঁর দেশবাসী তাঁকে কোনো দিন ভুলবে না।"

গোখেল বলেছিলেন—"ব্যবহারজীবী হিসাবে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন, তার চেয়ে বড় ছিলেন তিনি একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক, দূরদর্শী নেতা এবং অবিশ্রান্ত কর্মীরূপে। স্বাধীন দেশ হলে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ পেতেন নিশ্চয়। কংগ্রেসের জন্য তিনি অকাতরে তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন এবং কত যে অর্থ দান করেছেন তার হিসাব জনসাধারণ জানেন না। তাঁর বাগ্মিতা শ্রোতাদের রোমাঞ্চিত করত, চালনা করত, যেন দৈববলে উজ্জীবিত করত। একদিকে যেমন ছিল তাঁর দুর্জয় সাহস। অন্য দিকে তিনি ছিলেন তেমনি সংযমের শান্ত মূর্তি। তিনি যখন কোন একটা কাজের ভার নিতেন তখন আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হতাম এই ভেবে যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সে কাজে কখনো নিষ্ফল হবেন না। তিনি ছিলেন মানব কেশরী।"

কিন্তু এই মানব কেশরীকে আজ আমরা কতটুকু মনে রেখেছি! যে কংগ্রেসের জন্যে তিনি আজীবন আপ্রাণ পরিশ্রম করেছেন, বলতে গেলে, একার চেষ্টায় কংগ্রেসকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন সেই কংগ্রেসের বর্তমান নেতারাই বা তাঁর প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধাশীল, তাঁর অপরিশোধ্য ঋণ স্বীকার করে তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দেবার জন্যে কতটুকুই বা আগ্রহ তাঁদের!

আজ এই সর্বব্যাপী অবক্ষয়ের দিনে দেশকে বাঁচাতে জাতিকে বাঁচাতে তাঁর মতো মানুষেরই প্রয়োজন।

বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি গৌরবোজ্জ্বল নাম। তাঁর সম্পাদনায় আনন্দবাজার পত্রিকা যে ঐতিহ্য, যে প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল, তা আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সেই অতুলনীয় ভাষার ঝঙ্কার, সেই ভাবের গভীরতা, সেই জাতীয়তা-বোধের চেতনা আজ আর শোনা যায়না কোন সংবাদ পত্রের কোন সম্পাদকীয়তে। তাঁর এক একটি সম্পাদকীয় সারা দেশে যেন আগুন ছুটিয়ে দিয়েছে, পুলিশ কর্তৃক সেই সংখ্যার প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছে। বিশেষ করে মনে পড়ছে, এক বছর কালী পূজার দিনে তাঁর লেখা "মৃত্যুরূপা মা" সম্পাদকীয় রচনাটির কথা, যার জন্যে তাঁকে গ্রেপ্তার বরণ করতে হয়েছিল। এমনি বহু উদ্দীপনাময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন যার আর তুলনা নেই। আমাদের আনন্দের কথা যে সত্যেন্দ্রনাথের অমৃত কুড়িটি রচনা আমরা প্রকাশ করেছি। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর হাসপাতালে রোগশয্যায় রচিত শেষ-লেখা আমাদের পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়।

কংগ্রেসের বর্তমান অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর একটি লেখা 'কংগ্রেসের কথা' পাঠকদের আমরা উপহার দিলেম।

কংগ্রেসের কথা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ভারতে আত্মকর্তৃত্ব লাভের আশায় রাজনৈতিক আন্দোলনের গোড়ার কথা বলবার পূর্বে, অতীত থেকে বর্তমান যুগে আমার ইতিহাস স্মরণ করা দরকার।

ভারতে ইংরাজের আগমন আর রাজ্য-বিস্তার ইতিহাসে এক বিচিত্র ব্যাপার। বিদেশী ও বিধর্মী রাজশক্তি ভারতে কিছু নতুন ব্যাপার নয়। বাইরে থেকে এসে মুসলমান রাজশক্তি ভারতে জুড়ে বসলো। তার প্রবল স্বেচ্ছাচারী বাহুবলের ধাক্কাটা খুব জোরেই লাগলো—কিন্তু তার মধ্যে অন্তঃকরণের সৃজনীশক্তি জাগ্রত করবার মত কোন বুদ্ধির দীপ্তি ছিল না বলে ভারত বাইরের আঘাতে সঙ্কুচিত হ'য়ে তার অতীতের জড় প্রথার মধ্যে রইল আত্মগোপন করে। মুসলমান রাজশক্তির দশাও তাই। সেও তার অতি নির্দিষ্ট চিরপ্রথার সংস্কার-জড়িমাজালে আচ্ছন্ন। তাই বহির্বিশ্ব থেকে এই দুই উদ্ধত সভ্যতা পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে ভারতের দিগন্ত জুড়ে ছিল—দেশের চিত্তলোকে কোন নব সৃষ্টির আবেগ জাগাতে পারেনি। বিরুদ্ধ মতের সংঘাতে ধর্মান্দোলন হয়েছে, এক এক ঘন ধর্মপ্রচারককে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু চির প্রথায় বেড়া দেওয়া সমাজের বাইরের ও মনের কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

এমন সময়ে এলো ইংরাজ, কেবল বণিক বা রাজারূপে নয়—এক নবীন সভ্যতার চিত্তদূত রূপে। রাজশক্তি এবং রাজ্যপরিচালনার কেন্দ্র রইল সাতসমুদ্র তেরনদীর পারে। এদেশেও বৃটিশ শাসক ও বণিক সামাজিক জীবনে মুসলমান অপেক্ষাও দূরে সরে রইল। কিন্তু ইয়োরোপের নবীন সভ্যতা সংস্কৃতি কয়েক বুরুকুরু বিশুদ্ধ জ্ঞানের সাধনা এমন ব্যাপক ও গভীর ভাবে আমাদের চিন্তা চরিত্র বুদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করলো, যা এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। মুসলিম আধিপত্যের বিলোপ এবং বৃটিশ রাজশক্তির অভ্যুদয় সম্বন্ধে আমাদের সেদিনের মনোভাবে কিছুটা সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিলো, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসের অভিনব ভাবরস আস্বাদনে আমাদের মনে কোন কুণ্ঠা ছিল না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সামাজিক সুবিচার, মানুষ মানুষ বলেই অপক্ষ-পাত ভাবে তার ব্যবহার পাবার অধিকারী—এসব কথা

আমাদের দেশে নতুন। অন্যায় করবার অবাধ অধিকারই প্রতাপের লক্ষণ—ধর্মের বিধিবিধান মেনে চলবে সাধারণ লোক, কিন্তু সেই সব নিয়ম মানবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই অভিজাত এবং রাজকুলসম্ভূত অসাধারণদের এই তো জানা ছিল চিরকাল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ভারতের শিক্ষিতশ্রেণীর মনে এটা কত বড় বিপ্লব সে কথা আজ বিস্তার করে বলবার প্রয়োজন নেই।

ইংরাজ রাজত্ব দানা বেঁধে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এই বিপ্লবের পূর্বেই সমাজ বিপ্লব সুরু হয়েছিল। জমির উপর প্রজার অধিকার বিলুপ্ত হল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সূত্রে জমির মালিক হয়ে বসলো জমিদার শ্রেণী, কৃষককুলের হ'ল সর্বনাশ।

অন্যদিকে বৃটিশ বণিকের সর্বগ্রাসী লোভে কুটির শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। এই অর্থনৈতিক বিপ্লব এবং বহুর সর্বনাশে সমাজের উচ্চবর্গ বিশেষ বিচলিত হয় নি। বরং তারা ব্যবসায়ী নায়েব, গোমস্তা ও কুঠিয়ালের দালাল উকীল সরকারী চাকুরিয়া হয়ে স্বচ্ছন্দতার সুখ দেখলো। ইংরাজী শিক্ষার ফলে ইংরাজ সমাজে আদর এবং দেশী সমাজে সম্ভ্রম পেয়ে বৃহৎ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভদ্রশ্রেণীতে পরিণত হ'ল।

ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা—ভদ্রশ্রেণীর নব-নাগরিক সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার আর ইংরেজের অনুকরণের মাতামাতির মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিস্বশালী মানুষের আবির্ভাব হ'ল। প্রাচীন জ্ঞান বিস্তার আবিষ্কার ও অনুশীলন চললো। বিগত শতাব্দীর এই সব আন্দোলনের আমি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হব। কেননা আমি রাষ্ট্র-নীতিক আন্দোলনের কথাই মুখ্যভাবে বলতে বসেছি।

শিক্ষিত সমাজে বিগত শতাব্দীর গোড়া থেকেই সাহিত্য ও সংবাদ পত্রের রাজনীতিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। ইংরাজের যুক্তিতে তার ইতিহাস ও রাষ্ট্র নীতির নজীর দেখিয়ে দেশ শাসনের কিছুটা অধিকার হওয়ার আবেদন নিবেদনের মধ্যে অবশ্যই দেশাত্মবোধের বালাই ছিল না। এই সব নির্দোষ ও নিরীহ আলোচনায় ইংরাজেরা বিরক্ত হতেন না, কৌতুক অনুভব করতেন। ১৮৫৭ এর সিপাহী বিদ্রোহের পর, ভারতবাসী কি চিন্তা করে তা জানবার একটা কৌতূহল রাজপুরুষদের মনের মধ্যে ছিল। ক্রমে শতাব্দীর সপ্তম দশকে এসে বর্ষান্দোলন মন্দীভূত হ'ল। কলকাতায় রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন, "স্বর্গদাত চাকরী" খ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং সুর বক্তা ও চড়া। কেশব চন্দ্রের "ইংরংবেঙ্গল" সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হ'ল। বৃটিশ উদারনৈতিক রাজনীতি স্কুলের পাশ করা ছাত্র সুরেন্দ্রনাথের মুখে ইতালীর স্বাধীনতা আন্দোলন, ম্যাৎসিনী গ্যারিবল্ডীর স্বদেশ প্রেমের বাণী শুনে শিক্ষিত যুবজনচিত্ত মোহিত হ'ল। হ'ল রাজনীতি চর্চার সূত্রপাত।

এই আন্দোলনকে ভারতব্যাপী আন্দোলনে পরিণত করায় অগ্রণী হলেন সুরেন্দ্রনাথ। আনন্দ মোহন বসু ও অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থাপন করলেন 'ভারত সভা'। এই 'ভারত সভাই' জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত। ১৮৭২-১৮৮৫ এই কয় বৎসরের প্রস্তুতির ইতিহাসের নায়ক বাঙালীর প্রতিভা এবং বাগ্মীতা। পরবর্তীকালে আবেদন ও নিবেদনের তুচ্ছ গর্ভ বাগবিভূতি নিয়ে অনেকে হাসাহাসি করছে, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে এর মূল্যও স্বীকার করতে হবে। সুরেন্দ্রনাথের ভারত-ব্যাপী একটা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়বার সঙ্কল্পে ইংরাজদের টনক নড়লো। এই আন্দোলন যাতে বিপথ-গামী না হয়, ওঁরা সতর্ক হলেন। ইংরাজদের তদ্বির ও সুপরামর্শেই জাতীয় কংগ্রেসের গোড়াপত্তন হ'ল। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, লাহোর, লাক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা থেকে সাড়া এলো; কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি হলেন, বাঙালী ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী। কিন্তু কার্য্যতঃ ১৮৮৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন কংগ্রেসের প্রধান নেতা ও পরিচালক। এই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনদিন বক্তৃতা দিয়েই অনেকে 'নেতা' হয়ে গেলেন!

কংগ্রেসের প্রথম অধ্যায়ের দীর্ঘ বৎসরগুলি একঘেঁয়ে

দাবির পুনরুক্তি মাত্র। এর লক্ষ্য শাসনব্যাপারে অধিক সংখ্যায় উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ, অস্ত্র আইনের কঠোরতা হ্রাস, লবণ শুল্ক প্রত্যাহার এবং মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালনায় শাসক শ্রেণীর কর্তৃত্বমুক্ত স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন। জমিদার ব্যবসায়ী চাকুরিজীবী শ্রেণী রাজরোষের ভয়ে কংগ্রেসের ত্রিসীমানায় যেতেন না; স্বাধীন বৃত্তিজীবী আইনব্যবসায়ীরাই ছিলেন কংগ্রেসের মেরুদণ্ড। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও এই ধারা অক্ষুণ্ণ রয়েছে। ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন আইনজীবীরা। স্বাধীন ভারতের কর্তৃত্বাধিকারও তাঁদেরই হাতে। সেকালে শিক্ষিতবর্গের মধ্যে এঁদের উপার্জন ছিল সর্বাধিক এবং তা শাসক শ্রেণীর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কাজেই এঁরা আইন বাঁচিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারতেন, যা অপরের পক্ষে নানা কারণে সম্ভব ছিলনা।

ইতিহাস সোজা পথে চলে না, মাঝে মাঝে চৌমাথার মোড়ে এসে স্বতন্ত্র পথ নেয়। হঠাৎ বাংলা দেখে তাই ঘটলো। লর্ড কার্জন বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করলেন। এক প্রচণ্ড বেদনা পেয়ে বাঙালীর স্বদেশপ্রেম রামমোহনের দুর্দম বন্যার মত কূল ছাপিয়ে ফুলে উঠলো—সমস্ত শিক্ষিত সমাজটা দোল খেয়ে নড়ে উঠলো। বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদে, স্বদেশী ও বয়কটকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় আন্দোলন, যা পরবর্তীকালে ইতিহাসে স্বদেশী আন্দোলনরূপে পরিচিত হয়েছে, সেটা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন হলেও, কংগ্রেসের আন্দোলন নয়। আন্দোলনের গোড়ার দিকে যদিও কংগ্রেসের জনক সুরেন্দ্রনাথ উৎসাহী সমর্থক ছিলেন, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন ও সরকারী দমননীতি এ দুইএর অনিবার্য সংঘর্ষ দেখে তিনি পিছিয়ে গেলেন। বাঙ্গালীর এক জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচারে এগিয়ে এলেন, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব। এ আন্দোলনের বাণী হ'ল আত্মনির্ভরতা এবং আত্মশক্তির সন্ধান। কংগ্রেসের সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত অংশ "পিটিশান অার প্রটেষ্টের" সীমার বাহিরে এগুতে চাহিলেন না। কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি পৃথক চিন্তা ও কর্মধারা স্বাভাবিকভাবেই দেখা গেল,—মডারেট বা নরম পন্থী, জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থী।

বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন ও নবজাতীয়তাবাদ বাঙ্গলার সীমান্তেই আবদ্ধ রহিল না। লোকমান্য তিলকের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র এবং লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে পাঞ্জাব সুর মেলালো। এই প্রবল নবীন জাতীয় আন্দোলন, কংগ্রেসের প্রবেশাধিকার চাইলো, মডারেট নেতারা বাধা দিলেন। সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিদাদাভাই নৌরজী ঘোষণা করলেন, স্বরাজ লাভই কংগ্রেসের লক্ষ্য। রাজনৈতিক পরিচালনায় স্বরাজ শব্দটির সংজ্ঞা অস্পষ্ট হলেও, এতে সেদিনের প্রগতিশীল চিন্তাধারা বহুলাংশে তৃপ্ত হয়েছিল। অবশ্য "স্বরাজ"-লাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য সুস্পষ্ট ভাবে গৃহীত হয়েছিল, বহু পরে, ১৯২১ সালে। কিন্তু দাদাভাই নৌরজী দুইকূল সামাল দিতে পারলেন না। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে মডারেটদের সংখ্যাধিক্যে বয়কট প্রস্তাব পরিত্যক্ত হওয়ায়, তিলক ও বিপিনচন্দ্রের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিরা কংগ্রেস মণ্ডপ থেকে বেরিয়ে আসেন। বেরিয়ে এলেন বটে, সে কেবল সংখ্যাগুরু হয়ে প্রবেশ করবার সঙ্কল্প নিয়ে।

জাতীয়দল শক্তি সঞ্চয় করতে লাগলেন, ১৯০৭ এর সুরাট কংগ্রেসে বলাবলের পরীক্ষা। মডারেট দল মনোনীত সভাপতি নির্বাচন নিয়ে ভোটের দাবী করা হল। মডারেটরা প্রমাদ গণলেন। কংগ্রেসের অধিবেশন পণ্ড হল। মডারেট ও জাতীয় দলের বিরোধ তীব্র, সে সুযোগ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করলেন। লালা লাজপৎ রায়, অজিত সিংহ নির্বাসিত হলেন, রাজদ্রোহের অপরাধে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত তিলক মান্দালয় জেলে হলেন বন্দী। এই সময় গোপনে বিপ্লব-আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছিল, ১৯০৮ এ আলিপুর বোমাঘটিত ষড়যন্ত্র মামলায় তা উদ্‌ঘাটিত হল। রাজশক্তি সুযোগ বুঝে দমন-নীতি দুর্বিসহ করে তুললো। সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা হরণ, সভাসমিতি বন্ধ, রাজ-অত্যাচারের নির্মম

অভিযানের সম্মুখে নেতাহীন ভারতীয় দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। অন্যদিকে মডারেট ও মুসলমানদের বিরোধীতায় স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ ম্রিয়মান হওয়ার ফলে আদর্শবাদী যুবশক্তি কতক বিপ্লবের গুপ্ত পন্থা, কতক বিবেকানন্দের সেবাধর্মের মধ্যে স্বদেশের অভ্যুদয়ের সাধনা গ্রহণ করলো। ১৯১১ সালে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ভারতে এসে বঙ্গভঙ্গ রহিত করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাঙ্গালা জোড়া লাগলো, কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র হ'ল। বাঙ্গালী আবার কার্জনী শাসননীতির ওপর জয়গর্বে আত্মহারা হ'লো। মডারেটরা এটাকে তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জয় বলে স্বাধীনতার ঘোষণা করলেন।

রাজ অত্যাচারে ভারতীয়দল ছত্রভঙ্গ, নেতারা কেউ মৃত, কেউ নির্বাসিত, কেউ বা চাকা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় ভারতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন একটা প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্র। লোকে ভারতীয় কংগ্রেস বলতো না, ওর নাম দিয়েছিল "মেট মজলিস"। এই মডারেট কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষাও বোম্বাইএর ফিরোজসা মেটার প্রভাব ছিল বেশী। এই সময় ১৯১৪ সালে ইয়োরোপের মহাসমর, জার্মানীর আক্রমণে ইংলণ্ডে ত্রাহি ত্রাহি রব। ভারত রক্ষা আইনের নামে বাঙ্গালার শত শত যুবক বন্দী ও অন্তরীণ হল। একদিকে দমন নীতি অন্যদিকে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিশ্রুতি বৃটেনের দুমুখো নীতিতে মডারেটরা ভবিষ্যতের আশায় পুলকিত হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গালার ভারতীয়দল, বিপ্লবী দলগুলির সঙ্গে একায় হয়ে গিয়েছিল। এদের নেতারা অধিকাংশই বন্দী, বাইরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন। বৃটেনের স্বায়ত্ত শাসন দেবার প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে মিসেস্ বেসান্ত 'হোমরুল' আন্দোলন আরম্ভ করলেন। আইরিশ ভারতীয় দলের দাবীর এই প্রতিধ্বনি শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। সদ্য কারামুক্ত তিলক এই আন্দোলনকে সমর্থন করলেন, ফলে বাঙ্গালার ভারতীয়দলের নেতারাও অনুগামী হলেন।

১৯১৬ সালের লাক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ অনুগামী অধিবেশন মনুমেন্টের তলায়। দীর্ঘকাল পর ভারতীয়তাবাদী ও মডারেটদল পুনরায় কংগ্রেসী ক্যাম্পে সমবেত হলেন। অন্যদিকে মিঃ জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ ও লক্ষ্ণৌএ এসে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেন।

স্বায়ত্ত শাসনের সম্মিলিত দাবীর একটা সর্বদলীয়মত প্রস্তাব গৃহীত হ'ল এবং যথারীতি বৃটিশ দরবারে পেশ করা গেল। ওদিকে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের মোড় ঘুরেছে, আমেরিকা নতুন শক্তি নিয়ে আক্রমণ করায় জার্মানী নাজেহাল। রাশিয়ার জার সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর বলশেভিক দল বিজয় পতাকা প্রোথিত করেছে। বৃটেনের সুর ঘুরলো। তাঁরা ১৯১৭ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দাবীর জবাবে বললেন—ধাপে ধাপে স্বায়ত্ত শাসন দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ভারতীয়তাবাদীরা নিরাশ হলেন, মডারেটরা আনন্দে উদ্বাহু হয়ে পশ্চিম দিগন্তে নিবদ্ধ করলেন সতৃষ্ণ দৃষ্টি।

ইতিমধ্যে বাঙ্গলার ভারতীয়তাবাদ আর তার বৃটিশ শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা নবা ভারতের চিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। রাজনীতি-ক্ষেত্রে যা বাঙ্গালার ধ্বনি, ভারতের তা প্রতিধ্বনি, কিন্তু পথ কি? মডারেটদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, আবেদন নিবেদন ব্যর্থ, আবার গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনও প্রায় নিষ্ফল। মহাযুদ্ধ বিজয়ী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তার বিরাট রূপ ভারতের ললাটের সম্মুখে তুলে ধরেছে। এমন সময় ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর অভ্যুদয়। এ এক অভাবনীয় আবির্ভাব, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন নয়, নয় হিংসামূলক গোপন পথে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির চরম আত্মোৎসর্গ। ভারতের সমষ্টি মানবের অহিংস নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। কিরূপে সম্ভব? বহু শতাব্দী ধরে যে লোকসাধারণ ঘুমের ঘোরে অচেতন, তাদের জাগরণ কি সম্ভব? লোকসাধারণ বা 'পীপল' কথাটি আমরা ইয়োরোপের ইতিহাস থেকে ধার করে ব্যবহার করতাম, এতকাল আমাদের আন্দোলনের মধ্যে তাদের অস্তিত্বও ছিল না। বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশের একদল দুঃসাহসী-যুবক স্বদেশী যুগ থেকে এইটিই ভেবেছিলেন, সমস্ত দেশের হয়ে তারা মুষ্টিমেয় হলেও চরম আত্মোৎসর্গ

যারা আনবেন বিপ্লব। এর ফলে তাঁরা প্রলয়ের বহ্নিশিখায় নিজেদের আহুতি দিয়েছিলেন, জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়ে ছিলেন, বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ মোচন করে ছিলেন। তাঁদের নিষ্ফলতা আরার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। কিন্তু এত বড় দুঃসাধ্য সাধনের দ্বারাও রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি সত্যকার দরদ দেখা দেয়নি! দেবতা এবং অপ-দেবতাদের যেমন আমরা ভক্তিতে নয় ভয়ে নমস্কার করি, বিপ্লবীদের প্রতি দেশের মনোভাব ছিল অনেকটা ঐরকমের।

এমন সময় মহাত্মা এলেন, যেন সিংহ দুয়ারের দ্বারা বাতায়ন খুলে গেল। কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের এক আশ্চর্য উদ্ঘাটন ঘটলো আমাদের চোখের সামনে। ১৯১৮র কলকাতার বেলান্ত কংগ্রেসে গান্ধীজী নীরব দর্শক রূপে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসে জাতীয় দলের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে মডারেটরা কংগ্রেসের বাইরে চলে গেলেন। বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বাঙ্গলার শক্তিশালী জাতীয় দল সগৌরবে জাতীয় আন্দোলনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করলেন মহাযুদ্ধের অবসানে বাঙ্গলার বন্দী বিপ্লবী দল কারাগার অন্তরীণ থেকে বেরিয়ে এলেন। স্বদেশী আন্দোলনের পর বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আর একটা অভ্যুদয় ঘটলো।

ইতিমধ্যে ইতিহাস চললো এগিয়ে, রাউলাট আইন তার প্রতিবাদে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ, জালিয়ানালা-বাগের হত্যাকাণ্ড, খিলাফৎ নিয়ে হিন্দুমুসলমানের বিক্ষোভ, ঘটনার পর ঘটনায় জনসাধারণের বিক্ষোভ ফেটে পড়তে লাগলো দুর্জয় ক্রোধে। ভারতের সম্মিলিত জাতীয় দলের নেতারা, গান্ধীজীর নেতৃত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হ'লেন। অহিংস অসহযোগ নীতিতে তাঁদের আপত্তি ছিল না, কিন্তু আইন সভা বর্জন করা সমীচীন মনে হ'ল না। বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে জাতীয়দল কলিকাতা কংগ্রেসে (১৯২০) গান্ধীজীর প্রস্তাবের উপর এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে বললেন, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মনীতি আপাততঃ মুলতুবি রেখে দেশকে অহিংস সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা হোক। ভোটে গান্ধীজীর জয় হ'ল, চিত্তরঞ্জন বহু মত মেনে নিয়ে গান্ধীজীর অনুগামী হলেন। নাগপুর কংগ্রেসে চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেল, দেশের কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আইন ব্যবসায় ত্যাগ করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধ সঙ্ঘবদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পেল, কিন্তু আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে এই ভাবাবেগ সব সময় অনুকূল নয়। রাজ অত্যাচার আছে, উত্থানদাতা স্লোগানের স্থানে স্থানে আন্দোলনকে বিপথগামী করবার চেষ্টা আছে। ফলে সারাক্ষণের নেতৃত্ব ও সংগঠনের প্রয়োজন হল। কংগ্রেস আর বার্ষিক বিতর্ক সভা রহিল না, পল্লীনগরে শাখা প্রশাখা সমন্বিত এক বিশাল রাষ্ট্রনৈতিক সঙ্ঘরূপে সারা ভারতের চালক বিধায়ক হয়ে উঠলো। জেলা, মহকুমা ও পল্লীর শাখা সমিতি বহুর প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গঠনে বাঙ্গলার কর্মীদের সংগঠনী প্রতিভা সারা ভারতের শ্রদ্ধা অর্জন করলো। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে এক বৎসরের জন্য উকীল ওকালতী ছেড়ে, ছাত্র স্কুল কলেজ ছেড়ে কংগ্রেস ক্ষেত্রে সমবেত হ'ল। বাঙ্গলার এই বিপ্লবীদলের শ্রেষ্ঠ কর্মীরাও গান্ধীজীর কর্মসূচী মেনে নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনা ও চরম সংঘর্ষের জন্য জনগণকে প্রস্তুত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ উপায়ে স্বরাজ লাভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য—এই ঘোষণা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বাঙ্গালী ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত হল। ১৯২১ সাল শেষ হবার পূর্বেই গভর্ণমেণ্ট রুদ্রমূর্তি ধারণ করলো। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাশক্তির সংঘর্ষে বাঙ্গালীই সারা ভারতে সর্বাগ্রে দাঁড়ালো। সত্যাগ্রহ ও অসহযোগ, আইন অমান্য ও কারাবরণ, তবু শেষ রক্ষা হ'ল না, শয়তানী সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করবার দুর্জয় সঙ্কল্প ঘোষণা করেও গান্ধীজী শেষমন্ত্রে চৌরীচোরায় হিংসা উপলক্ষ্য করে আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। ষাট হাজার কারারুদ্ধ অনুচর নিয়ে দেশবন্ধু ক্ষুব্ধ হলেন। সুযোগ বুঝে রাজদ্রোহের অপরাধে গান্ধীজীকে গভর্ণমেণ্ট কারাগারে নিক্ষেপ করলো। অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে

গেল। তাতার মুখে দেখা গেল, মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, বিপ্লবীরাও গান্ধীপন্থার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। দেশবন্ধু কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসের কর্মনীতিতে পরিবর্তন চাইলেন, বললেন জাতীয় সংগ্রামকে আইনসভার ভেতরে নিয়ে যেতে হবে। গান্ধীজীর নৈষ্ঠিক অনুগামীদের সঙ্গে বিরোধ ঘটলো, তিনি স্বরাজ্য দল গঠন করলেন, অধিকাংশের সমর্থন লাভ করলেন, আইন সভার নির্বাচনে মাদ্রাজেই দল পরাজিত হল, বারবার মন্ত্রিসভার পতনেও দ্বৈতশাসন প্রণালী ধ্বংস করা গেল না। এক বাংলা ও মধ্যপ্রদেশ ছাড়া কোথাও কংগ্রেস সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু বারবার এই ধ্বংসমূলক কার্যক্রমের প্রাথমিক উত্তেজনা নিস্তেজ হয়ে গেল। বাংলা সরকার হিংসাত্মক গুপ্ত আন্দোলনের অজুহাতে সুভাষচন্দ্র সহ বহু কর্মীকে বিনা বিচারে আটক করলেন। দেশবন্ধু জনসাধারণ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করে চির-নিদ্রায় অভিভূত হলেন। স্বরাজ্যদলের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রাম, আর গান্ধীজীর গঠনমূলক কার্য দেশে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারলো না। বৃটিশ রাজশক্তির প্রশ্রয়ে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা উগ্র ও প্রবল হয়ে হিন্দু মুসলমান ঐক্যের সমাধি রচনা করলো। তবুও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে বাঙালীর জাতীয় দল কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক আদর্শের পতাকা বহু বিরুদ্ধতার মধ্যেও অবনমিত হতে দেয় নি।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি প্রাপ্ত সুভাষচন্দ্রের অভ্যুদয়, তিনি কংগ্রেসকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠানরূপে সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার জন্য বাঙালার তরুণদের ডাক দিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পর নব্য বাঙলা সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হ'ল। আইন সভার মধ্যে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের উৎসাহ ও উত্তেজনা মন্দীভূত অথচ সমগ্র দেশ নূতন কর্ম পদ্ধতির জন্য উদ্‌গ্রীব। সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যুব-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী নিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রস্তুতি চললো। ১৯২৮-এর ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেস এক সুপরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনকরে সুভাষচন্দ্র তার সংগঠনী প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এই কংগ্রেসের অধিবেশনে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী চিন্তাধারার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সুভাষচন্দ্র দাবী করলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ লক্ষ্য ঘোষণা করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হোক। মহাত্মাজীর প্রভাবে স্থির হ'ল, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দেবার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে এক বৎসর সময় দেওয়া হোক। বলা বাহুল্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

এরপর ইতিহাস-স্মরণীয় লাহোর কংগ্রেস। বাঙালার জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক দলের নেতারূপে সুভাষচন্দ্র, তাঁরা সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে গান্ধীজীর তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হওয়ায়, উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান হ'ল—সম্মুখে সংগ্রাম, বাচালতার সময় নাই। গান্ধীজী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। সমগ্রদেশ আগ্রহে অধীর। কংগ্রেসের মধ্যে দল উপদল চিরদিনই ছিল, প্রতিষ্ঠানের ওপর কর্তৃত্ব নিয়ে অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু পরশাসনের বন্ধন ছিন্ন করা নিয়ে কোন দ্বিমত ছিল না। কংগ্রেসের সভা মঞ্চ থেকে ঘোষিত হ'ল ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস। ভারতের নানা প্রান্তে এবং বাঙলা দেশেও সেদিন জাতীয় পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার সঙ্কল্প বাক্য লক্ষ লক্ষ নরনারী উচ্চারণ করলো।

"যে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতকে সর্বদিক দিয়ে রিক্ত ও দুর্বল করেছে, তার নৈতিক মেরুদণ্ড দিয়েছে ভেঙে তার অধীনে আর এক মুহূর্ত ও থাকা আমরা পাপ বলে মনে করি, আমাদের জন্মগত অধিকার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় কংগ্রেসের নির্দেশে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।" এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণের পর আদর্শ ও লক্ষ্য সুস্পষ্ট হয়ে গেল। বাঙালীর দুঃখব্রতী যুবশক্তি দুর্গম পথের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আদেশের প্রতীক্ষায় অধীর।

মহাত্মাগান্ধী লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন, সারা ভারতে আইন অমান্য আন্দোলন বন্যার মত উদ্বেল হয়ে উঠলো।

গভর্ণমেণ্ট প্রথমেই কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করে নেতাদের গ্রেপ্তার করলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বাঙ্গলা পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো। দলে দলে নর নারী কারাগারে চললো। দমননীতির রক্ত চক্ষু বিস্ফারিত—লাঠি, গুলি, বেত, জরিমানা, বাজেয়াপ্তির অমানবিক নিষ্ঠুরতায় বাঙ্গালী নিঃশঙ্ক। মেদিনীপুরে কাঁথির সমুদ্রতট, মহিষ বাথানের সবণ হ্রদের তীর দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামীদের রুধিরে রঞ্জিত হ'ল।

গভর্ণমেণ্টের উলঙ্গ বর্বরতায় স্বাধীনতা সংগ্রাম তীব্র হয়ে উঠ্‌লো। দমননীতির পাশাপাশি তাঁরা ভেদনীতি প্রয়োগ করলেন; শাসন-সংস্কারের লোভ দেখিয়ে কংগ্রেসকে শান্ত করার চেষ্টা করলো ভালে ভলে। এক শ্রেণীর রাজনীতিক গোল টেবিল বৈঠক গ্রহণ করলেন এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম নেতারা জাতীয় দাবীর বিরোধিতা করতে লাগলেন। এইসব প্রতিক্রিয়ার বিশেষ ভাবে মড়ারেট দলের মধ্যস্থতায় গান্ধীজী আন্দোলন স্থগিত রেখে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধি করলেন। কিন্তু গান্ধী-আরুইন প্যাক্টে কংগ্রেসী মহলে কিছুটা বিক্ষোভ দেখা গেল। বাঙ্গালার পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি। করাচী কংগ্রেসেও তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে গান্ধীজীর গোল-বৈঠকে যোগদান করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পরবর্ত্তি ঘটনায় সুভাষ চন্দ্রের অনুমান সত্যে পরিণত হয়েছিল।

গান্ধী-আরুইন চুক্তি একটি বড় রকম ভুল এই আনন্দে কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে শিথিলতা দেখাদিল। আপোষের পথেই কংগ্রেসের অভিপ্রায়মত শাসনতন্ত্র রচিত হবে এই মিথ্যা ভরসায় কংগ্রেস-পন্থীরা যখন উন্মনা, তখন প্রতিহিংসা পরায়ণ বৃটিশ আমলাতন্ত্র ভারতবাসীকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার আগ্রহে দমননীতির ছুরিতে ধার দিতে লাগলেন। এবং নানা অছিলায় চুক্তির সর্ত্তভঙ্গ করে, কংগ্রেসের অপবাদ রটনা করতে লাগলেন। বৃটিশ [redacted] ও মুসলমান নেতাদের মিলিত চক্রান্তে গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়ে গেল। গান্ধীজী শূন্য হাতে দেশে ফিরলেন। গভর্ণমেণ্ট মুহূর্ত মাত্র সময় না দিয়ে কংগ্রেসকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন, গান্ধীজী এবং অন্যান্য নেতারা যথা নিয়মে বন্দী হলেন। এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে অপ্রস্তুত কংগ্রেস ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আইন অমান্য আন্দোলনের সাময়িক পরিসমাপ্তি ঘটলো।

দেশবন্ধুর যতীন্দ্র মোহন মৃত, নেতাজী সুভাষচন্দ্র নির্বাসনে-তবুও নতুন শাসনতন্ত্রের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় ক্ষীণ প্রতিবাদ হ'ল। বাঙ্গলার জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করবার জন্য সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারায় পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির ভিত্তিতে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক আসন দেওয়া হ'ল এবং তপশীলী হিন্দুদের স্বতন্ত্র করে দেওয়া হল। বাঙ্গলার কংগ্রেস পন্থীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বোম্বাই কংগ্রেসে বাটোয়ারা সম্পর্কে না-গ্রহণ না-বর্জন নীতি গৃহীত হল। এই সোজামিল দিয়ে কংগ্রেস নূতন শাসনতন্ত্র গ্রহণ এবং পরে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিল।

সুভাষচন্দ্র নির্বাসন থেকে ফিরে এসে বাঙ্গলার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কংগ্রেসের দুঃসময় নেতৃত্ব তাঁর প্রভাবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতিরূপে তিনি সংগ্রামশীল গণ-আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। ইংরেজ বেকায়দায় পড়বে, এই সুযোগ স্বাধীনতাকামী ভারত ছাড়ব গ্রহণ করা উচিত। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে চরম পত্র দেওয়া হোক। গান্ধী-অনুগামী নেতারা সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন এবং তার আপোষ বিরোধী অদমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হলেন। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর দু'বৎসর আপোষ রক্ষার জন্য কালহরণ করে অবশেষে ১৯৪২-এর আগষ্টে কংগ্রেস নেতারা আন্দোলন আরম্ভ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। আবার নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার এবং কংগ্রেস বে-আইনী হ'ল। বাংলার কংগ্রেস-পন্থীরা অতীতের মান-অভিমান ভুলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মেদিনীপুরের কৃষক শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা নূতন ইতিহাস রচনা করলো। আর একবার প্রমাণিত হ'ল, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার মত ও পথ নিয়ে দল-উপদলে যতই ভেদ-বিবাদ থাকুক না কেন, স্বাধীনতা

সংগ্রামে বাঙ্গালী বাহুতে বাহু রেখে মাথা উঁচু করে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাঙ্গালীর স্বদেশ-প্রেম এবং আত্মোৎসর্গের এই বিচিত্র ইতিহাস এখনও লেখা হয়নি।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পৃথিবী ব্যাপী ধ্বংসলীলার প্রচণ্ড আবর্তে ভারত ও টলমল করে উঠ্‌লো। পশ্চিমে বলদর্পিত জার্মানী আর পূর্বদেশে সাম্রাজ্যলোভী জাপানের দিগ্বিজয়ীবাহিনীর পদতলে ইয়োরোপ ও এশিয়ার রাজ্যগুলি লুটিয়ে পড়লো। সাম্রাজ্যলোভীর সঙ্গে সাম্রাজ্যভোগীর সেই যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত-প্রায়। এমন সময় ফ্যাসিস্ত জার্মানী আক্রমণ করে বসলো—সোভিয়েৎ রাশিয়া। স্তালিনের নেতৃত্বে দুর্ভেদ্য গিরিশ্রেণীর মত লালপল্টন, স্বদেশ রক্ষার জন্য অটলোদ্যত মহিমায় দাঁড়ালো। পূর্ব প্রান্তে মার্কিন আমেরিকা জানান—আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপুল সামরিক বলপ্রয়োগ করলো। জার্মানী ও জাপানের সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর দেখা গেল, পুরাতন সাম্রাজ্যবাদও মহাযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্তস্রোতে মুমূর্ষু!

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ রইল না, সমগ্র এশিয়ার সর্বজাতির অভ্যুত্থানে এশিয়ার মুক্তি-আন্দোলন এক দুর্জয়রূপে প্রকাশ পেল। আন্তর্জাতিক ঘটনার চাপে ভারতে ইংরাজ তার শাসন মুষ্টি শিথিল করতে বাধ্য হ'ল। কংগ্রেসের নেতারা কারাগারের বাহিরে এসে দেখলেন, মুসলীম লীগ বৈরী, তারা ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা চায়। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলীম-লীগকে সামনে রেখে ইংরাজ সাম্রাজ্য বজায় রাখার ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে এমন সময় মহাযুদ্ধের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার দেখা গেল পূর্ব এশিয়ায় নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করেছেন এবং তাঁর বিস্ময়কর কীর্তি কলাপ। বর্মায় বৃত আজাদ হিন্দ ফৌজের নায়কদের লালকেল্লায় বিচারের উপলক্ষ্যে সব কাহিনী প্রকাশ পেল। ছড়িয়ে পড়লো ভারতীয় সৈন্যদলে অসন্তোষ, সমগ্র দেশ নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো।

এর পরবর্তী ইতিহাস সেদিনের ঘটনা। ইংরাজের তাগিদে আর ভিন্নাজী-চালিত মুসলিম লীগের জিদে দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করা ছাড়া আর পথ রহিল না। হয়তো ছিল, গান্ধীজী তীব্র আপত্তি করেছিলেন, পাঞ্জাবও বাঙ্গলা বলি দিতে। কিন্তু তাঁর সে আপত্তি টিকলোনা। জাতীয়-স্বাধীনতার বেদীমূলে বাঙ্গালী চরম বলি দিয়েই দ্বিধা বিভক্ত হল। যদিও উভয় পক্ষের স্বীকৃতিতেই রাজনীতিক স্বাতন্ত্র ঘটলো, তবু আত্মঘাতী বীভৎস হিংসা ও হত্যা ঠেকান গেল না। স্বাধীন ভারতে স্বাধীন পশ্চিম বাঙ্গালায়, ঘরছাড়া উদাস্ত বাঙ্গালী আজো পথে-প্রান্তরে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে। তবু বৃটিশ শাসনের শৃঙ্খল খুলে গেছে, হাতে এসেছে বহু-প্রার্থিত আত্মকর্তৃত্বের অধিকার। প্রচণ্ড মার খেয়েও বাঙ্গালী বৃহৎ বঞ্চনায় ভোগে, নিখিল ভারতীয় বৃহৎ দায়িত্ব ভোলেনি। দুঃখ দুর্দশায় দুঃস্বপ্নের স্মৃতি-মণ্ডিত এক একটি বৎসর অতিক্রম করে সে চলেছে, নব অভ্যুদয়ের অরুণোদয় লক্ষ্য করে। ভারতের স্বাধীনতার বেদীর ভিত্তিমূল দৃঢ় করার বাঙ্গালীর রক্তের প্রয়োজন ছিল, অকৃপণ হয়ে অকাতরে বাঙ্গালী প্রয়োজনের অধিক রক্ত দিয়েছে। ভাবীযুগের মহিমার ওপর ধ্রুবদৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, বাঙ্গালী আজকার দুর্গতি ধৈর্যের সঙ্গে বহন করে চলেছে, মহৎ মনুষ্যত্বের অমৃতলোকের পথে। সে যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে মৃত্যুঞ্জয়ী!

জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র···

চিকাগো থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দও বলেছিলেন, ওঠো, নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করো, নিজেকে ঘোষণা করো। কেউ দুর্বল নও—আত্মা অনন্ত, সর্বশক্তিমান সর্বত্র।

তিনি এসেছিলেন সংস্কারের মন্ত্র নিয়ে—একটু আধটু সংস্কার নয়, একেবারে ভেঙে চুরে আমূল সংস্কার করতে তিনি চেয়েছিলেন। তিনি নিজের মুক্তি চান নি, চেয়েছিলেন সকলের মুক্তি। ভারতের এই একমাত্র সাধক—যিনি নিজের মোক্ষের জন্যে সাধনা করেননি, তাঁর সাধনা ছিলো দেশের মুক্তি, দেশের কোটি কোটি লোকের ঠিক মুক্তির জন্যে করেছিলেন তিনি তপস্যা।

অধ্যাত্ম তত্ত্ব নয়, মুক্তির কথাও নয়—সন্ন্যাসীর মুখে সম্পূর্ণ এক নতুন কথা জগৎ শুনলো।

সেকথা শুনে মৃত ভারতবর্ষ নড়ে উঠলো।

দেশবাসী তখন অন্ধ অনুকরণে মত্ত। তিনি বললেন, পরানুবাদ পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা এই মাত্র সম্বল ক'রে, উত্তরাধিকার লাভ করা যায় না। দীর্ঘভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করতে হলে চাই মহাবলি, জীবন বলি, যাদের জন্যে ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হোন, যাদের তিনি সর্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন-দরিদ্র, উৎপীড়িতদের জন্যে তোমরা সারাজীবন এই ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ করো।

ব্রত তারা গ্রহণ করেছিলো।

তিনি বললেন, সকলের সম্মুখে একটি মাত্র দেবতা আছে, ভারতবর্ষ তার নাম—একটিমাত্র ধর্ম আছে, সে ধর্ম হলো, ভারতবর্ষকে আবার মহীয়ান ক'রে তোলা। এই দুর্বল, অশিক্ষিত, উপবাসক্লিষ্ট কোটি কোটি মানুষ—যারা আজ ভেঙে চুরে পড়েছে, তাদের আবার সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে, তাদের জানাতে হবে, ভারতবর্ষ মরেনি—মরতে পারে না। ভারতবর্ষের যদি মৃত্যু হয়, সজ্জতার হবে মৃত্যু। সেই তোমাদের অবিনশ্বর মৃত্যুঞ্জয় ভারতকে আবার জগতের সম্মুখে তুলে ধরতে হবে।

বললেন, আমরা কখনো যেন কোনোদিন অবহেলা না করি। মুক্তির জন্যে তপস্যা? কার কাছ থেকে মুক্তি? মানুষ যদি তার ভাই-এর মুক্তির চেষ্টা না করে, তবে সে কখনোই মুক্ত হতে পারে না।

তাঁর সে আহ্বান ব্যর্থ হয়নি। জগতে কোনো আহ্বানই কোনোদিন বৃথা যায় না। মহাপুরুষরা এমনি ক'রেই তাঁদের আদর্শ রেখে যান।

সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সুভাষচন্দ্র হলেন নেতাজী। বাংলার ইতিহাসের এক মহা-সন্ধিক্ষণে দেখা গেল এই অসাধারণ মানুষটিকে।

সুভাষচন্দ্র সেদিন অসাধ্য সাধন করেছিলেন। ভোজবাজী নয়, অলৌকিকও নয়—মানুষ যেসব দেখেও দেখেনা স্বপ্ন কি ক'রে সত্য হয়।

এ-তপস্যা—তাঁর কর্মে নিষ্ঠা, সত্যে বিশ্বাস। সবচেয়ে বড় তাঁর অসাধারণ সাধনা, আত্ম-প্রত্যয়। তাঁর ছিলো নিরহঙ্কার-বর্তিতা, নীরব ধৈর্য—যা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অভিজাতার ধর্মস্বরূপ ছিলো। বিংশ শতাব্দীর একদিন যখন তিনি সহসা শান্ত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বপদ থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জগতের শ্রেষ্ঠ রণপণ্ডিতরূপে দেখা দিলেন তখন জগৎ বিস্ময়ে তাঁর দিকে ফিরে চাইলো! কিন্তু আমরা জানি, সে বিস্ময়ের বীজ তাঁর সেই উন্মুখ-যৌবনে শান্ত জীবনের মধ্যেই সমাহিত ছিলো।

ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসের প্রত্যেক সন্ধিক্ষণে আমরা দেখেছি, এই বিচিত্র দেশের ও সভ্যতার আন্তরীন প্রয়োজনের তাগিদেই এক শ্রেণীর অপরূপ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে—যাঁরা ভারতবর্ষের আত্মার অংশরূপেই আবির্ভূত হয়েছেন, এবং একই আত্মার প্রকাশ ব'লে তাঁদের প্রত্যেকের চরিত্র ও বাণীর মধ্যে এক ধারাবাহিকতা প্রবহমান হয়ে আসছে।

ভারতের বৈশিষ্ট্যও এইখানেই।

এতবড় মহান আদর্শ ছেড়ে কোথায় খুঁজি আমরা পথের সন্ধান। এ-আদর্শ কোথাও নেই, এতবড় চরিত্র কোনও জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়নি।

এই আদর্শের দিকে চেয়ে আছে আজকের জগৎ—বিশ্ব-মৈত্রীর বিস্তৃত মহা-অঙ্গনে যে করবে একদিন নেতৃত্ব।

উনিশ শ' পাঁচ বাংলার যৌবনকে যে কাজরীর্ষের মন্ত্রে দীক্ষিত করেছিল, কংগ্রেসের অহিংসাবাদে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

সুভাষচন্দ্র জীবনের প্রথম চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সেই নব-সন্ধান-ধর্মে নিজেকে দীক্ষিত করেন তাঁর দীক্ষাগুরু বিবেকানন্দ আর শ্রীঅরবিন্দ তাঁর শিক্ষাগুরু দেশবন্ধু... তিনি ছিলেন তাঁদের মানসসন্তান উত্তরাধিকারী। এবং উপযুক্ত সন্তান ও শিষ্যের মতন, তিনি একান্ত নিষ্ঠাসহকারে জীবনের পবিত্রতম ধর্মের মতন গুরুদের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন...নীরবে সেই আদর্শের অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে ছিল একটা বিরাট নিশ্চল প্রস্তুতি।

বিবেকানন্দ তাঁকে দিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের, তাঁর চরিত্রের ভিত্তি, ব্রহ্মচর্য...যে সুকঠিন ব্রহ্মচর্য এনে দেয় দুর্বার প্রাণশক্তি, অগ্নিতেজ, অখণ্ড বীর্য; দিয়েছিলেন তাঁকে জীবন-বোধ, এ-জীবন মায়ের চরণে বলি-প্রদত্ত। শ্রীঅরবিন্দ দিয়েছিলেন তাঁকে স্বাধীনতার আদর্শ, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ, ভারতীয়ত্ব, অসংখ্য শক্তির মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে রক্ষা করার বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্র। দেশবন্ধু দিয়ে গিয়েছিলেন, বাঙালীর প্রাণের বৈশিষ্ট্য, অনির্বাণ প্রাণ-বহ্নির আশীর্বাদ।

বাংলার এই তিন জন মহাপুরুষের দান লোকচক্ষুর অন্তরালে ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে থাকে। বিলুপ্ত-স্রোতা বাংলার জীবন-জাহ্নবী আবার নতুন করে যেন তাঁর বুক ভেদ করে প্রবাহিত হলো। সুভাষচন্দ্র হয়ে উঠলো বাংলা। বাংলা বেঁচে উঠলো সুভাষচন্দ্রে।

নতুন যাত্রাপথে প্রথম নজর পড়লো, কলকাতার প্রকাশ্য রাজপথে বিজয়ী ইংরেজের রক্ত-প্রতীক হলওয়েল মনুমেন্টের ওপর। বাংলার পরাজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। বিলুপ্ত করে দিতে হবে সাম্রাজ্যবাদী রক্তের এই প্রকাশ্য-লাঞ্ছনা।

বাংলার ছেলেমেয়েদের চোখ নিলেন শহরের বুক থেকে এই লাঞ্ছনার স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলতে। বিদেশী সরকার তা সহ্য করলো না। আবার সেই ভারতরক্ষা আইন...আবার অনির্দিষ্ট কারাবাস...

কংগ্রেস দিল নির্বাসন, ইংরেজ দিল, অনির্দিষ্ট কারাবাস। এই নিয়ে এগারো বার।

কারাবাস...জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি গিয়েছে যেখানকার পাথরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে। কেড়ে নিয়েছে অক্ষিপক্ষ থেকে রস। দিয়েছে রক্তের মধ্যে ব্যাধির কণিকা। একমাত্র আত্মসাধনার যোগ-ধর্মে, নিশ্ছিদ্র ব্রহ্মচর্যে, নিজেকে রাখতে হয়েছে অটুট, সবল করতে হয়েছে বীর্য।

সুভাষচন্দ্র কারারুদ্ধ হলেন বটে কিন্তু হলওয়েল মনুমেন্টকে ভাঙবার আন্দোলন তাঁরতরে হয়ে উঠতে লাগলো। অবশেষে সরকারের সুবুদ্ধি হলো, বুঝলো, এইধরণের জেদে বিপক্ষের শক্তিই বৃদ্ধি হয়। তাই রাতারাতি একদিন সরকারই সে মনুমেন্টকে সরিয়ে দিল। যে-কথা বলার জন্য সুভাষচন্দ্রকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হলো, সরকার নিজেই তা কাজে পরিণত করলো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাতে মুক্তি পেলো না!

বারবার কারাগারে যাওয়া-আসায় কারাগারের বিভীষিকা আর কিছু ছিল না। কিন্তু মনের ভেতর তখন জেগে উঠেছে বিশ্ব-প্লাবন এক দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা...অন্তরের অন্তরতম স্থলে তিনি শুনেছেন এক মহা-আহ্বান, পার্থ-সারথীর আহ্বান। থাকুক কংগ্রেস তার অহিংসা আর আপোষনীতি নিয়ে—তিনি একা বেরিয়ে পড়বেন বাহির বিশ্বে, সেখান থেকে তিনি শক্তি আর অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারত আক্রমণ করবেন বিজয়ী বীরের মতন, মাটিতে প্রোথিত করবেন স্বাধীনতার পতাকা। কি করে, কেমন ভাবে তা সম্ভব হবে, আজ তা নিয়ে বিচার করতে বসে কোন লাভ নেই, অন্তরে যখন জেগেছে সেই দুরন্ত দুরাকাঙ্ক্ষা তখন নিশ্চয়ই অন্তরের ভেতর থেকে খুঁজে পাবেন পথ ...তার জন্যে আগে চাই, এই কারাগার থেকে মুক্তি।

কারাগারের প্রতিটি মুহূর্ত জলন্ত লোহার মতন তাঁকে বিঁধতে থাকে। কারাগারের প্রতিটি মুহূর্ত হলো অপচয়, ক্ষতি প্রতিটি দিন যেন মৃত্যুর প্রহরী, অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অমূল্য সময়কে...যেমন করে হোক, এ অপচয় নিবারণ করতে হবে ...কারাগার থেকে বেরোতেই হবে....অন্তরে জেগেছে যে

দুর্বার বাসনা, তাকে দিতে হবে সার্থক মুক্তি। বন্দী মহাপুরুষের মাথাখান বেয়ে উঠছে রক্তের তরঙ্গ···কারাগারের প্রস্তর-প্রাচীরের আড়ালে কি করে স্থাণু হয়ে বসে থাকতে পারেন তিনি?

কিন্তু নির্মম কারাগারের লৌহদ্বার···নিষ্করুণ সশস্ত্রিত শাসকের অন্তর। কিন্তু মৃত্যু-ভয় যে উত্তীর্ণ হয়েছে, কে পারে তাকে কারাগারে রুদ্ধ করে রাখতে? জরাগ্রস্ত রোগীর মতন অসহায় অপেক্ষায় তিল তিল ক'রে মৃত্যুর কাছে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে, তিনি স্থির করলেন, বীরের মতন এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেই আনবেন। গ্রহণ করলেন, অভ্যাগ্রহী বীরের শেষ-অস্ত্র, চূড়ান্ত-সংকল্প। যদি অবিচারের শাস্তিদাতা স্বেচ্ছায় নিজের অন্যায় স্বীকার করে তাঁকে মুক্তি না দেয়, তাহলে নিজের মুক্তি তিনি নিজেই অর্জন করবেন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে। অবশ্যম্ভাবী। কেউ দিতে পারে না কেড়ে।

এই সংকল্প স্থির করে তিনি শাস্তিদাতা শাসকদের পত্র লিখে জানালেন···ঐতিহাসিক পত্র···সে পত্রের কালি কখনো শুকিয়ে যাবে না···কারণ যে-কালি দিয়ে এই জাতীয় চিঠি লেখা হয়, সে-কালি তৈরী হয় বীরের বক্ষের চেনা রক্তে। সে রক্তের দাগ থেকে যায় অবিস্মরণীয় চিহ্নরূপে···প্রত্যেক বীরের আত্মাহুতিতে তার শুকনো দাগ আবার ওঠে রক্তে-রাঙা তাজা হয়ে···

"...এভাবে শুধু বেঁচে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অবিচার আর অন্যায়ের সঙ্গে বারবার আপোষ ক'রে নিজের অস্তিত্বের অপমানের মূল্যে কিনে বেঁচে থাকা আমার আদর্শের বিপরীত ধর্ম। তাই স্থির করেছি, এই অপমানের মূল্য দিয়ে নিজের বেঁচে থাকাকে আর কিনতে চাই না। তাই স্বেচ্ছায় এই জীবন বিসর্জন দিতে সংকল্প গ্রহণ করেছি। সরকার আমাকে অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ ক'রে কারাগারে বন্দী করে রাখতে চান, তার প্রতিবাদে আমি জানাচ্ছি, হয় আমাকে মুক্তি দাও নতুবা আমার মুক্তি আমি নিজেই অর্জন করবো...আমি বেঁচে থাকবো কি থাকবো না, তার দায়িত্ব একান্ত আমার নিজের···

"আমি জানি, এই পৃথিবীতে যা কিছু বস্তু, তার সবারই আছে মৃত্যু; জানি, মৃত্যু নেই স্বপ্নের, মৃত্যু নেই আদর্শের, মৃত্যু নেই মানুষের মনের। আমি হয়ত আমার স্বপ্নের জন্যে মরে যেতে পারি কিন্তু জানি আমার মৃত্যুর পরেও আমার সেই স্বপ্ন বেঁচে থাকবে। একদিন না একদিন তা সত্য হয়ে উঠবে শত সহস্র মানুষের জীবনে। এই বিশ্বাসের চেয়ে বড় আনন্দ আর কি আছে? এই আনন্দের চেয়ে মানুষের কাম্য আর কি আছে? আমার আত্মা একদিন অক্ষয়রূপ শত শত আত্মায় ভবিষ্যৎ হয়ে উঠবে, অসমাপ্ত কর্মকে সার্থক সম্পূর্ণ করে তুলবে, এর চেয়ে বড় অভিজ্ঞান আর কি দিয়ে যেতে পারি?

"• • • ঠিক এই জন্যেই বিধ-বিধাতা এই নশ্বর মানব-দেহে আত্মার সংস্থান করেছেন • • আমার মৃত্যু দিয়ে আমার জাতি বেঁচে উঠবে, সেই জীবন্ত জাতির মধ্যে আমিই বেঁচে থাকবো..."

জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র···

মহাবলোল জাগে তরুণ বিপ্লবীর মনে·····জগতের বৃহৎ পটভূমিকায় আজ দেখতে হবে নিজের দেশকে ···আমার দেশ আজ আর তার নিজস্ব সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ নয়—তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ, ধর্ম-অধর্ম, ঐশ্বর্য আর দারিদ্র্য, একান্ত বাস্তবভাবে, বিশ্ব-বীণার তারে ঝঙ্কৃত হচ্ছে দেশ-প্রেমের সংজ্ঞাই আজ তাই গিয়েছে বদলিয়ে···জগতের বৃহৎ জীবন-ধারার সঙ্গে তার হয়ে গিয়েছে আত্মিক যোগ—আজ তাই তার সমস্যার মীমাংসার সমাধান নির্ভর করবে বাইরের সেই বৃহৎ জীবন ধারার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বজায় রেখে···

কংগ্রেসের রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে জওহরলাল জাগিয়ে তোলেন, এই বিশ্ব-সম্পর্কের নূতন চেতনা ভারতবর্ষকে দেখতে হবে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে

·· চরম দুর্ভাগ্য নিয়ে এল সেই দুর্যোগ···বহুদিন থেকে প্রিয়তমা পত্নী রোগে ভুগছিলেন ···তাঁকে ছেড়ে তাঁকে যেতে হয় হাসপাতালে- মাসের পর মাস তাঁকে কাটাতে হয় সেখানে···

সেবকালে ডাক্তাররা বলেন, এভাবে রোগিণীকে হাসপাতালে রাখা আর চলতে পারে না··· তাঁকে নিয়ে যেতে হবে, এমন কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায়, যেখানে প্রকৃতি, তার স্বল্প-ছাওয়া আর আকাশের মধ্যে আজও রেখেছে বাঁচিয়ে সঞ্জীবন-সুধা···

সুইজারল্যাণ্ড আল্পসের শুভ্র-তুষার-স্বচ্ছ আকাশে বাতাসে যেখানে পাইনের প্রাণদায়ী সুবাসে ভরপুর.....

কমলা এবং প্রিয় দুহিতা ইন্দিরাকে নিয়ে বহুদিন পর আবার জওহরলাল যাত্রা করলেন য়ুরোপের দিকে···

ভারতের রাজনৈতিক আবর্ত থেকে ক্ষণকালের জন্য নিজেকে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারায়, তাঁর অন্তরের সংগোপনলোকে লুকিয়ে আছে নির্জনতা-লোভী যে আর একটি মানুষ, সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো.. এতদিন পরে মন পেলো ছুটি.....

ভারতবর্ষ থেকে দূরে গিয়ে, নূতন করে তিনি দেখতে পেলেন ভারতবর্ষকে.....

কংগ্রেসের ভারতবর্ষ নয়, লীগের ভারতবর্ষ নয়, হিন্দু মহাসভার ভারতবর্ষ নয়

দেখলেন, বিশ্বের মানচিত্রে, অনাগত দিনের ভারতবর্ষকে ·····নতুন আদর্শের প্রেরণায় সবুজ হয়ে উঠলো আবার কাশ্মিরী যৌবন·····

তেরো বছর পরে ফিরে গিয়ে দেখলেন, আর এক নতুন য়ুরোপ ..বিপ্লবের বহ্নিজ্বালায় প্রবমান প্রাণ-ধারা ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে অট্টালিকা, রাজপ্রসাদ, স্বর্ণ-সিংহাসন····· বাইরের এই ভেঙে চুরমার সঙ্গে ভেঙ্গে পড়েছে মনের সব বেড়া····· ইতিহাসের পুরনো অভ্যাস, যাকে ভেবেছিল মানুষ তার অপরিবর্তনীয় স্বধর্ম, নিমেষে নিঃশেষে, কোথায় গেল হারিয়ে, নিশ্চিহ্ন হয়ে চলন-বঙ্কি-শিখায়.....যাকে মনে হয়েছিল, সুদূর অতীত, কিন্তু সহজ খুসিতে সে নিয়েছে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে...

আজ সেবা কর, যদি তার বাহন..... দিকে দিকে ওঠে তার পাবক-শিখা...

এক বৎসর নয় মাস জওহরলাল ঘুরলেন য়ুরোপের এক দেশ থেকে আর এক দেশ ..দেখলেন, জেনেভায় লীগ অফ্ নেশন্স্-এর ঐতিহাসিক গ্যালারীতে বসে বসে শক্তিমানের সাম্রাজ্য-বণ্টন খেলা....

বার্লিনে শুনলেন বলদৃপ্ত, নব্য-জার্মানীর জাতীয়তার নব-দর্শন, ইতালিতে দেখলেন তার দেশব্যাপী ধর্মঘটের মধ্যে তার মুক্তিমন্ত্রের অসারতা...

মস্কোতে গিয়ে দেখলেন সোভিয়েটের দশম বার্ষিক উৎসব....বৈজ্ঞানিক গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক সম্পূর্ণ নতুন জাতি, বিংশ-শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক পরীক্ষার জীবন্ত ল্যাবরেটারী...

ব্রুসেল্স্-এ গিয়ে যোগদান করলেন জগতের নিপীড়িত জাতির কংগ্রেসে—নিপীড়িত ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপ.....

পরিচিত হলেন, জাভা, ইন্দোচীন, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর, আরব, নিগ্রো আর চীন প্রতিনিধিদের সঙ্গে, সকলেই আজ পণবদ্ধ, উচ্ছেদ করতে সাম্রাজ্যবাদ

দেখলেন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগে ইংরাজ শ্রমিক-নেতা জর্জ ল্যান্‌সবারীর অপূর্ব প্রহসন....আন্তর্জাতিক উন্মাদের বশে জর্জ ল্যান্‌সবারী এই সাম্রাজ্যবাদ নিধন যজ্ঞের প্রধান পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁর স্বদেশ থেকে সংবাদ এলো যে, তাঁর দল অর্থাৎ ইংলাণ্ডের লেবার পার্টি,—তাঁরা চলেছেন ইংলাণ্ডের শাসন ভার গ্রহণ করতে, এখন সেই দলের একজন নেতার আর চলে না আন্তর্জাতিক মুক্তির দম্ভ ভুলে গিয়ে ইংলিশ-চ্যানেলের লোকের সঙ্গে মিশে মাতামাতি করা। সুতরাং লীগের অধিবেশনের মুখেই হঠাৎ শোনা গেল, সভাপতি জর্জ ল্যান্‌সবারী শারীরিক অসুস্থতার দরুণ অতি দুঃখিত অন্তরে এই সভাপতিত্ব গ্রহণে অসম্মতি জানাতে বাধ্য হচ্ছেন

ভিলেনুভের বিখ্যাত ভিলা ওলগায় অতিথি হলেন জগৎ-বরেণ্য রঁমা রোঁলাঁ....সেখানে পরিচিত হলেন জগৎ-খ্যাত তরুণ জার্মাণ কবি আর্নেষ্ট টোলারের সঙ্গে...

সৌভাগ্যবশতঃ দেখা পেলেন প্রবাসী বন্ধুবান্ধব ধনগোপালের—ক্ষণিকের পরিচয় পরিণত হয় বন্ধুত্বে.....

সেই সঙ্গে তাঁদের খুঁজে বার করে দেখা করলেন একদিন যারা ভারতবর্ষকে ভালবেসে আর ভারতবর্ষের বাইরে পলাতক জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন, ইংলাণ্ডের প্রবীণের মত যারা নীরবে নিঃশেষে যাচ্ছেন মিলিয়ে

শ্যামাজী কৃষ্ণ বর্মা.....বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আজও নতুন লোক দেখলে, প্রথমেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন, তাঁর ধারণা, নতুন লোক মাত্রেই বুঝি গুপ্তচরের পাঁই....বৃহৎ কোটের পকেট থেকে মলিন জীর্ণ ভাঁজ ভাঁজ কাগজ বার করেন, বারো বৎসর আগে যে কাগজ তিনি সম্পাদনা করতেন Indian Sociologist... তার জীর্ণ মলিন পাতা উল্টিয়ে জওহরলালকে পড়িয়ে শোনান, বারো বৎসর আগে তিনি কি লিখেছিলেন—আধ-অন্ধকার বন্ধ ঘরের এক কোণে এক মলিন শয্যায় শুয়ে এক রুগ্ন বৃদ্ধা গুজরাটী নারী...শ্যামাজীর স্ত্রী ...প্রবাসী পলাতক স্বামীর সঙ্গে দুঃখমুখে যে নারী সহেছে সব যন্ত্রণা, সবলাঞ্ছনা, অর্থহীনতা, পুত্র-কন্যাহীন দূর বিদেশে...

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ—দেখা হল মনফ্রুর পথে. অদ্ভুত বেশ-ভূষা' অর্ধেক সামরিক....পায়ে ভারী রাশিয়ান বুট... বৃহৎ এক ওভার কোট ..তাতে কত যে পকেট তার নেই ঠিক-ঠিকানা....আর সব পকেটগুলোই নানা জাতীয় কাগজে ফুলে ফেঁপে আছে...না আছে এমন জিনিস নেই সেই সব পকেটে-একদিন তিনি সারা জগৎ বেড়িয়েছেন ঘুরে, তার নানা নিদর্শন সব রয়েছে পকেটে-পকেটে—কাইজারের নিজের স্বাক্ষরযুক্ত ফটো, জার্মাণ চ্যান্সেলারের চিঠি, তিব্বতের লামাই লামার কাছ থেকে পাওয়া একটা তুলোট-কাগজের বাণ্ডিল ...নকল পাসপোর্ট....পুরোনো খবরের কাগজ ..কত কি সব...

বিস্মিত হয়ে জওহরলাল জিজ্ঞাসা করেন এত সব কাগজ সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন কেন?

হেসে বলে ওঠেন, তা কখনো বলি? তখন চীনে ছিলাম...রেঙ্গুনে বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে ছিল এক বাক্স সরকারী কাগজ-পত্র ও দলিল ...কি করে হারিয়ে গেল বাক্সটা ..সেই সঙ্গে চিরকালের মত গেল সেই সব দামী দলিল-পত্র ..সেই থেকে সাবধান হয়ে গিয়েছি...সরকারী কাগজ-পত্র যা কিছু সব সঙ্গে সঙ্গেই রাখি ..সেই জন্যই তো অর্ডার দিয়ে জামার এতগুলো পকেট করিয়েছি।

আজও তাঁর মাথায় ঘুরছে তাঁর নিজস্ব সব রাজনৈতিক মতলব এবং সেগুলো যে সব অভ্রান্ত তা তিনি একান্তভাবে বিশ্বাস করেন

মৌলবী ওবায়দুল্লাহ্...ইতালীতে দেখা তাঁর সঙ্গে। বহুদিনের চেষ্টায় তিনি একটা স্কীম তৈরী করেছেন কি করে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলন হতে পারে—জওহরলালকে পড়িয়ে শোনান। স্কীমের নাম United Republics of India—গল্প করেন, ইস্তাম্বুলে বসে বসে তিনি কি করে চেষ্টা করেছিলেন ভারতবর্ষকে সাহায্য করতে...

চম্পকরমণ পিল্লাই...দেখা হয় বার্লিনে, যুদ্ধের সময় ইংলাণ্ড থেকে পালিয়ে জার্মানীতে চলে যান...এবং সেইখানেই বসবাস করছেন জার্মান জাতীয়-আন্দোলনের

মনে নিজেকে দিয়েছেন মিশিয়ে তাই নাৎসীমহলে তাঁর আছে কিছু প্রতিপত্তি ..

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—এঁর সঙ্গেও বার্লিনে দেখা—স্বনামধন্য অঘোর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র···সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা· বার্লিনের এক হোটেলে পড়ে আছেন—জামা কাপড় ময়লা, ছেঁড়া···কোনদিন দুবেলা আহার জোটে···কোনদিন এক বেলা কিন্তু হাসি লেগে আছে মুখে···মাঝে মাঝে মন কেঁদে ওঠে ফিরে যেতে ভারতবর্ষে... কিন্তু তার পরেই মনে হয় সে যেন বহু দূরে...যেন ছিন্ন হয়ে গিয়েছে তার মাতৃ-আকর্ষণ...কিন্তু তবু অন্তর থেকে বারনি হাহাকার।

···য়ুরোপের আন্তর্জাতিক তপ্ত হাওয়ায় জওহরলাল যেন নতুন জীবনের মেজাজ নিয়ে ফিরলেন ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষে ফিরে এসেই তিনি ঠিক করলেন, কংগ্রেসের মূল আদর্শের প্রস্তাবকে আর কথার গোলক-ধাঁধার মধ্যে না রেখে, স্পষ্ট সহজ মূর্তি দিতে হবে। সহজ ভাষায় বলতে হবে কংগ্রেসের আদর্শ হলো, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা···

ইংল্যাণ্ড তখন পাঠিয়েছে সাইমন কমিশনকে, উত্তেজিত ভারতকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে

কমিশন যেখানেই যান, কৃষ্ণ-পতাকা করে তাকে অভিনন্দন...পাঞ্জাবে লাল লাজপৎ রায় সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বার করলেন . শান্ত নিরুপদ্রব জনতা... পুলিশ উদ্যত বেয়নেট নিয়ে করলে আক্রমণ লালাজির বুকে সোজা করলো বেয়নেটের আঘাত একজন তরুণ ইংরেজ অফিসার সে আঘাত বুকে নিয়ে লালাজি পৃথিবী থেকে নিলেন বিদায়...

কানপুরে বেরুলো শোভাযাত্রা তার সামনে জওহরলাল .. আর গোবিন্দবল্লভ পন্থ ···সেখানেও পুলিশ দেখালো তাদের বিক্রম সেই পুলিশের লাঠির সঙ্গে জওহরলালের প্রথম পরিচয়।

দল বেঁধে রাস্তা দিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে...এমন সময় দেখেন, শোভাযাত্রাকে দুভাগে ভাগ করে দিয়ে, ভিন্ন দল অশ্বারোহী পুলিশ ছুটে আসছে...দেখতে দেখতে নিরীহ জনতাকে মাড়িয়ে চলে যায় অশ্বারোহীর দল

জওহরলাল দেখেন, রাস্তায় যাকখানে তিনি দাঁড়িয়েএকা ···আশে-পাশে পুলিশের লোক নির্বিচারে তখন প্রহার করছে স্বেচ্ছাসেবকদের ···

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো . আত্মরক্ষার কথা···পর মুহূর্তে দেখেন, তাঁর দুপাশে দুজন অশ্বারোহী তাঁর দিকে বাটন তুলে তাঁকে শাসাচ্ছে ··

তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলেন কি করবেন ..গম্ভীরভাবে তাদের সম্বোধন করে বললেন, Go ahead ! উত্তরে তাঁর মাথায় আর পিঠে সজোরে এসে পড়ল আঘাত ··

সমস্ত দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ে যাবার মতো হলো...কিন্তু তবু তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন ..দেখলেন, কয়েক মুহূর্ত মাত্র ·· আর নাই সে-চেতনা···কিন্তু আসল অভিনয় ছিল পরের দিন .. কারণ সেই দিনই সাইমন কমিশনের আসবার কথা... শোভাযাত্রা ষ্টেশনের পথ ধরেই শুরু হলো আক্রমণ ··একদিকে অশ্বারোহী ইংরেজ পুলিশ বাটন নিয়ে—আর একদিকে পদাতিক সেই পুলিশ লাঠি নিয়ে—

প্রহারে প্রহারে জওহরলাল ভূপতিত হয়ে পড়লেন, সারা অঙ্গ দিয়ে রক্ত ঝড়ে পড়ছে – শুধু একমাত্র চিন্তা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে - মৃত্যু ছাড়া সেখান থেকে কেউ পারবে না সরাতে

অবিরাম চলে লাঠি আর বাটন—একবার মনে করলেন এই মুহূর্তে, ভুলে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর আদেশ, কংগ্রেসকীর্তি, লাফিয়ে পড়ি খোড়সওয়ারের ওপর, ছিনিয়ে নিই তার কাছ থেকে ঘোড়া—তারপর—

কিন্তু পর-মুহূর্তে মনে হলো, এই ক্ষণিক রাগেরও ওপরে উঠতে হবে—দেহের আঘাত কেন উত্তেজিত করবে মনকে— সত্যাগ্রহী, তুমি যে সর্ব-আঘাত সহ !

ক্ষত-বিক্ষত-দেহে সেদিন রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে জওহরলাল ভাবেন, কিন্তু তত: কিম ? এতেই বা কি হবে ?

বাংলা সাহিত্যে
মহিলা সাহিত্যিক

বাংলা সাহিত্যে

মহিলা সাহিত্যিক

বাংলা সাহিত্যের বিচার বিশ্লেষণ এবং সাহিত্য স্রষ্টাদের মূল্যায়ন যখন আমরা করি, তখন প্রায়ই কোন মহিলা-সাহিত্যিকের নাম শোনা যায় না। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করতে জাতীয় মনে নতুনতর আনন্দ ও মূল্য-বোধ সঞ্চার করতে বাংলা সাহিত্যের লেখিকাদের অবদানও যে কম নয়, একথাটি আমরা অনেক সময়ে ভুলে যাই। দেখে আনন্দ হল, যে সম্প্রতি বাংলার ছ'জন বরিষসী মহিলা-সাহিত্যিক সম্বর্ধিত সম্বর্ধিত হলেন। পুণ্যলতা চক্রবর্তী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, গিরিবালা দেবী, সীতা দেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবী,—এই ছ'জন মহিলা সাহিত্যিককেই সেদিন সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। গল্পভারতীও এই সম্বর্ধনাকে তার আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছে এবং একটি বিশেষ কারণে পরম গৌরব ও আনন্দ বোধ করেছে। সে কারণ হল, এই ছ' জন সাহিত্যিকের মধ্যে চারজনকে গল্পভারতী বহু পূর্বেই শ্রদ্ধা জানিয়েছে এবং তাঁদের বহু গল্প ও রচনা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। শৈলবালা ঘোষ জায়া ও পুণ্যলতা দেবীর কোন লেখা গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে কি না তা এখুনি আমরা মনে করতে পারছি না। হয়ত হয়েছে। কেননা, সে-যুগের এমন কোন প্রখ্যাতা লেখিকা ছিলেন না যিনি গল্প-ভারতীতে লেখেন নি। অবশ্য গল্পভারতীর আটাশ বছর পরপরিচালনার পূর্বে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যথা স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, সরলা দেবী প্রভৃতি—তাঁদের রচনা প্রকাশ করবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। অনুরূপা দেবীর বহু গল্প ও প্রবন্ধ গল্পভারতীতে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের অবদানও যে অমূল্য এ-কথা গল্পভারতী বরাবরই স্বীকার করেছে। আমরা এই সূত্রে সম্বর্ধিতা চারজন লেখিকার গল্পভারতীতে প্রকাশিত গল্প ও রচনা পুনর্মুদ্রিত করে তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির কারুকর্ম ও লিখনশৈলীকে আজকের পাঠক পাঠিকার কাছে উপস্থিত করে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানালাম। এই সঙ্গে সংযোজিত হল, একজন প্রখ্যাতা লেখিকা শৈলবালা ঘোষজায়ার একটি অপ্রকাশিত রচনা।

ছড়া

জ্যোতির্ময়ী দেবী

মানুষের ইতিহাসের যেমন আদি পাওয়া যায় না, ছড়ার, গানের, সুরের ইতিহাসও বোধ হয় তেমনি অনাদি কালের। মানুষ যতকালের ভাষাও ততদিনেরই পুরাতন।

আমরা মনে করে নিতে পারি নিশ্চয় করেই আদি জননী ইভ আর আমাদের সুরাসুর জননী দিতি অদিতিও আমাদের চিরকালের জননীদের মতই ছেলের খাবার সময় ঘুমের সহজ সুরে, গানে, ছড়ায় ছেলে দুলিয়েছিলেন, ঘুম-পাড়ানি গান রচনা করেছিলেন। সেদিনের তাঁদের কি ভাষার সে ছড়া ছিল জানিনা তবে ছড়াগান ছিল যে সে বিষয়ে সন্দেহ করা যাবে না। আজকাল আমাদের এই অর্থহীন অর্থময় খানিকটা আজগুবী শিশুর কলকাকলীর মত সে ছড়াও নিশ্চয় ছিল। যার মাথা থেকে আলপাশ থেকে তার মানেটুকু অর্থটুকু যেন উঁকি মেরে যায়। তেমনি কি সকল কালেই সব জননী নিজের ভাষায় বলেন নি ছড়া গান? কিন্তু ছড়া রচনা করেছিলেন কারা, কেউ জানেনা সে কথা।

ত্রেতাযুগের আদি কবি বলে বাল্মিকীকে জানা যায়। দ্বাপরের কবি বেদব্যাসকেও কবি আদ্যকার বলে জানা আছে সকলের। আরো কত অমর কবি কত কাব্যের রচয়িতা পৃথিবী ভরে দেশ বিদেশ ভরে আছেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই নাম পাওয়া যাবে, মহাকালের খাতার চিরকালের পাতায় সে নামও আছে। কিন্তু শিশু ভোলানো ছড়া কাব্য রচয়িত্রী আদি জননী কে ছিলেন-কারা ছিলেন—কতকালের—এই মধুর সঙ্গীতময় সুর, কথার আনন্দময় অসংলগ্ন ছড়ার কাব্য—তাঁদের নাম কেউ জানে না। কেউ কোথাও লিখে রাখেনি, বড় কেউ ভাবেওনি— লেখার কথা মনে রাখার কথা, তাঁদের নাম মনে রাখার কথা। যাঁরা এই হাজার হাজার বছর ধরে যুগ যুগান্তর ধরে শুধু গুণ গুণ করে গেয়ে গেছেন, ঘুমপাড়ানি গান, মাসী-পিসীকে ডেকে, আপনার মত করে, গান দিয়ে আদর করে।

ঘুম পাড়ানি মাসী পিসী আমার বাড়ী যেও।
বাটা ভরে পান দোব গালপুরে খেও।
কখনো গেয়েছেন—অভিমান ক্ষোভের সুরে—
মাসী-পিসী বনবাসী—
বনের মাঝে ঘর।
কখনো মাসী বলেন নাতো
খই মোয়াটা বর।
কিসের মাসী কিসের পিসী কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম—না বড় ধন

দুরন্ত দামাল শিশুর জননী কেউ কখনও গেয়েছেন—

আয় ঘুম আয়—বাগদী পাড়া দিয়ে।
বাগদীদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে।
হাটের ঘুম বাটের ঘুম পথে পথে ফেরে
চার কড়া দিয়ে কিনলাম—ঘুম মনির চোখে আয়রে?

তাঁর ছেলের চোখে ঘুম নেই, অথচ বাগদীদের শিশুটি বিছানা বালিশ নয় শুধু জাল মুড়ি দিয়েই কেমন ঘুমচ্ছে। হাটে বাটে সর্বত্রই 'ঘুম' পথে পথে ফিরছে, শুধু তাঁর ছেলের চোখেই ঘুম নেই। তাই চার কড়াকড়ি খরচ করে ঘুম কিনছেন 'মনির চোখের' জন্য।

আবার মনে ভাবি গান তো ঘুমপাড়ানি সুরের আবোল তাবোল সকল জননীই গেয়ে থাকেন, লিখেও কেউ রাখেনি। তবে এই সব ছড়া কেমন করে মনে রইল? ভুলে গেল না লোকে? হারিয়ে গেল না পথের ধূলায়? এতো রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলন অভিসারের কথা নয়, রামসীতার পরম আদর্শ পরম সুখের ইতিহাস নয় কাহিনী নয়, সতীর অভিমানে দেহ ত্যাগের কথা নয়, শিবের উন্মত্ত প্রেমের কাহিনী নয়, কিছুই নয়, শুধু

এলো-মেলো সুরের এলোমেলো গান, কে মনে রাখল একে ?

আর যদি মনেই রাখল তবে তার রচয়িত্রী কবির নামটা কেন মনে রাখল না ? কে সেই জ্ঞানী—যিনি বা যাঁরা এই অসংলগ্ন কবিতার মধ্যে কত আনন্দের কথা, দুঃখের কথা এমন কি শাশুড়ী ননদের কালো বৌকে লাঞ্ছনার, অপছন্দর কথাও বলেছেন। বলেছেন,

শাশুড়ী ননদ বলছে দেখে বৌ হয়েছে কালো
শ্বশুর ভাসুর বলবে দেখে ঘর করেছে আলো।

কালো মেয়ের চিরকালের দুঃখের কথা। তখনো কি এই কালো সুন্দর বাছাই করা ছিল ? এ কবেকার কথা ? আবার কোন জননী বলেছেন,—

তালগাছ কাটুম বোসের বাটুম—
গৌরী হেন ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর তা
আমি করব কি ?
তক্তা ভেঙে জল দিলাম—
কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখতে পেলাম
বুড়োর চাঁদ দাড়ি।.....

হিমালয় দুহিতা গৌরীর মত রূপবতী অভিমানিনী মেয়ে বলছেন উত্তরে—

চোখ খাও গো বাপ মা
চোখ খাও গো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিলে
তামাক খেগো বুড়ো।...

এই গুলোতে দেশ কালাতীত কিছুটা ইতিহাস পাওয়া যায় চিরন্তনী মেয়ের দুঃখের। সেখানে 'খুড়ো দেয় বুড়ো বর, তাই হুড়কো ঠেঙ্গা দেয় চল শ্বশুরবাড়ী চল' বলে। মা-বাপ সৎপাত্র উপযুক্ত পাত্র খোঁজে না। এবার শুনুন, খোকাবাবুদের মাছ ধরবার অভিনয়ের কথা। তাঁদের খোকাবাবুরা মাছ ধরতে যায় ক্ষীরনদীর কূলে, সে সাধারণ নদীতে নয়, জননী বলেন, খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।

(আর) মাছ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে
ছিপ নিয়ে যায় চিলে।
(আমর) খোকা বলে, পাখীটি কোন বিলে চরে,
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এখানে বোঝা যাচ্ছে না পাখীটি অর্থে খোকা না চিলটা। খোকা বলে, মানে কি খোকা জিজ্ঞাসা করে ? না, মা বলছেন তাঁর—

খোকা বলে পাখীটি কোন বিলে চরে ?
খোকা বলে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

এও হতে পারে মায়ের মুখে খোকা জবাব দিল, 'ডাক দিলেই উড়ে এসে পড়ে।' ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে কিম্বা ভাত খাওয়াতে খাওয়াতে রচনা করেছিলেন জননী তাই ভালো করে মানে বুঝিয়ে দেবার জন্য মাথা ঘামান নি। খোকার ভাত বা দুধ খাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য, আগে দরকার। তার জন্যই খোকাকে মাছ ধরতে পাঠাতে হবে। জলের নদীর কূলে নয় (দুধের ক্ষীরের নদীর কূলেই। তারপর খোকার কয়েক ঝিনুক দুধ খাওয়া বোধ হয় হ'ল, তখন মা বলেন 'মাছ নিয়ে গেল কোলাব্যাঙে, ছিপ নিয়ে গেল চিলে। তারপর আবার নতুন ছড়া, এবার বলেন—

আয় রে আয় টিয়ে, নারে ভরা দিয়ে
বা নিয়ে গেল বোয়াল মাছে তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা খোকার নাচন দেখে যা।

এবার খোকাও নাচছে। অর্থাৎ দুধ খাওয়া হয়ে গেছে। ক্ষীর নদীর জলের মাছ খাবার জন্য যে ভোঁদড় থাকে তাকেও পাওয়া গেল। নৌকাটা বোয়াল মাছে নিয়ে যাওয়াতে খুব কৌতুক বা মজা সে অনুভব করছে। সেও নৃত্য করছে। এখন মায় খোকাকে দুধ খাওয়ানো হয়ে গেছে এবং খোকা ভরা পেটে লালাসিক্ত মুখে জননীর কোলে নাচতে আরম্ভ করেছে।

আর মনে করে নিতে পারি, মায় কল্পনা ও ছন্দ রচনাও এখানে শেষ হ'ল। সংসারের কাজ আছে, আছে হয়ত ছেলে মেয়ে আছে, স্বজন পরিজন ভরা সংসার।

কবি কল্পনায় অথবা গান বা ছড়া শেষ করার ভাবনায় সময়ও নেই, প্রয়োজনই বা কি ? মার তখন মনে এলো ঘুম পাড়াতে হবে। তৃপ্ত আনন্দে জননী শিশুকে কোলে নিয়ে ভাবলেন,

ধন, ধন, ধন, বাড়ীতে ফুলের বন,
এ ধন যার ঘরে নেই তার বৃথাই জীবন।
কিম্বা ধনকে নিয়ে বনকে যাব সেখানে খাব কি ?
বিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।

কিন্তু আবার তখন চাঁদ দেখবে খোকা, ঘুন্সিল কম নয়। বায়না ধরেছে। চাঁদকে ডাকতে হ'লো,

আয়, আয় চাঁদা মামা টি দিয়ে যা
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

চাঁদ শুধু শুধু না আসতেও পারেন। তখন বলতে হলো। 'মাছ কুটলে মুড়ো দোব।' বেশ ভাল কথা। কিন্তু তারপরেই মিল চাই আতিথ্য বা অর্থ চাই। তাই, 'ধান ভানলে কুঁড়ো দোব।' মিলের খাতিরে কুঁড়ো দিয়েই কিন্তু আবার বল্লেন—

কালো গরুর দুধ দোব,
সোনার থালে ভাত দোব,
রাজার মেয়ে বিয়ে দোব,

(তুমি চাঁদ এসে) (আবার) চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা এবারে খোকা নিশ্চয় ঘুমলো মনে করে নিতে পারি আমরা। মার আর কি দরকার, ছড়া শেষ করার কথা ভাববার বা মনে রাখবার কিম্বা কবি খ্যাতি লাভের। ছড়ার রাজ্য আর মার এবং শিশুর রাজ্যে ঐ তিনটি অসাধারণ মানবিক দরকারী বিষয়ের কোন প্রয়োজনই কেউ মনে করে নি। মা তো নয়ই, ভেবে নিতে পারি জননী কক্ষান্তরে চলে গেছেন।

তারপরে কি আমার কথাটী ফুরোলো ? না ফুরোলো না। ছড়ার রাজ্যে জননী রাজমাতা ও শিশুরা রাজা চিরকালের। কুঁড়ে ঘর থেকে রাজপ্রাসাদ অবধি সব জননীই এক্ষেত্রে একই রাজ্যে বাস করেন।

তাই আবার পাবেন অন্য রকম ছড়া। এবার খোকা একটু বড় হয়েছে বোধ হয়। বিয়ের উৎসব বুঝতে পেরেছে রাঙা টুক্‌টুকে কনেও দেখেছে বাড়ীতে।

জননী গাইলেন এবার "খোকাবাবুর বিয়ে হবে হট্টমালার দেশে।" তারপর সঙ্গতিহীন ভাবে বলেন—

তারা গাই বলদে চষে
তারা হীরের দাঁত ঘষে।
রূপোর খাটে পা দিয়ে
তারা সোনার খাটে বসে।

আর কই মাছ পটলের (সের) ভারে ভারে আসে। নামটীতে হট্টমালা, মোটেই ভৌগোলিক নাম নয়, আবার গাই বলদে চাষ করা দেশও দেখা যায় না। (অবশ্য এখন শুনেছি কোথায় কোথায় যেন গরু দিয়ে চাষ হয়)। এবং তাঁরা খুবই ধনী, হীরের দাঁত ঘষে (হীরের মত ঝকঝকে কি দাঁত তাদের তাই বলা হয়েছে) সোনা রূপার খাট এবং উৎকৃষ্ট মাছ ও তরকারীর অভাবও তাদের নেই। মোটা-মুটি খোকার শ্বশুর বাড়ীটা ভালই হ'ল যার বর্ণনানুসারে মনে হচ্ছে। কিন্তু এই সব অসংখ্য ছড়ার মাঝে আমরা রচনাগুলি কবেকার তাও সাল বা কালের কোনই হদিস পাই না মাত্র দু'একটি ছাড়া। সেটা হচ্ছে,

খোকা ঘুমুলো পাড়া জুড়োলো, বর্গী এলো দেশে।

এইটীতে বুঝতে পারি বর্গী আমলের কোনো জননীর রচনা। ক্ষেতের ধান বুলবুলিতে খেয়েছে, ধান পান সব ফুরোলো, কোন উপায়ই পাওয়া যাচ্ছে না খাজনা দেবার, তখন মা বল্লেন—আর কটা দিন সবুর কর—রসুন বুনেছি। রসুন থেকে খাজনা দেবেন।

ধান পানের বিক্রীর অর্থের খাজনা দেবার মানে হয়, কিন্তু রসুন ? হয় কিনা সেই জননীই জানেন। সব ছড়ার মতই এলোমেলো রচনা যাই হোক শুধু এই বর্গীর উপদ্রবের সময়ের রচনা এইটুকু বোঝা যায়।

খোকনকে খোঁড়ার বা নজর দেবার ভয়ের ছড়াও আছে। দু' একটি রচনা একেবারে অর্থভরা ও সুসম্পূর্ণ যেমন—

তাঁতির বাড়ী ব্যাঙের বাসা কোলা ব্যাঙের ছা,
খায় দায় গান গায় তাইরে নাইরে না।

পুবুদ্ধি তাঁতির ছেলে কুবুদ্ধি গয়লারো।
তাঁকড়া বাড়ী দিয়ে তাঁতি ব্যাঙের ছা মারিল।
একটা ছিল কোলা ব্যাঙ বড়ই সেয়ানা
সেখান পাঠায়ে দিল পরগণা পরগণা।
আজিভাঙ্গা, কাজিভাঙ্গা মধ্যে বনে খালি।
সেখান থেকে ব্যাঙ এলো চোদ্দ হাজার চালী।

শেষ অবধি তাঁতি গাছে উঠল। সেখানে একটা ছিল গেছো ব্যাঙ, ধামড় দিল গালে। সে ভয়ে সুতো নাতা নিয়ে ভুঁয়ে নামল। 'একটা ছিল কট কটে ব্যাঙ লাথি মারল মুখে (মুখে)।'

অবশেষে চোদ্দ হাজার ব্যাঙ উঠিল পিঠের পরে চড়ি।
পায়ের চাপে বোকা তাঁতি করে হাই ফাঁই
না মারো না ধরো মোরে তাঁতিরে গোসাই।

কাজী-ভাঙ্গা নামে এও বুঝি মোগল আমলের রচনা। আর পশ্চিমবঙ্গের জননীর রচনা বুঝি প্রসিদ্ধ ধনেখালির নামে। আজো ধনেখালির তাঁতের শাড়ী-বুতি বলতে অত্যুৎকৃষ্ট তাঁতের শাড়ী বুতি বোঝায়। অবশ্য তাঁতি বুদ্ধিকে কবি বেশ একটু ইঙ্গিত করেছেন।

এইবার ছড়ার কথা শেষ করি। যদিও বলা যায় ছড়ার কি শেষ আছে, না জননী ও শিশুর অকারণ আনন্দময় অবাধ অসীম রাজ্যের সীমানা আছে!

কিন্তু একটা প্রশ্ন মনে ওঠে, আর তো নতুন ছড়া দেখি না! জননী ও শিশুর রাজ্যে কি আর ছড়ার আদর নেই? না একালের শিক্ষিতা নারীরা জননীরা বুক্তি বুদ্ধি বিদ্যা মিশিয়ে খাসা কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন? তাই একালের আনন্দের অসংলগ্ন সঙ্গতিহীন ছড়ার যুগ শেষ হয়ে গেছে। হাসির যেমন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, ছেলে ভোলানো ছড়ায় জননীর ছেলে ভোলানোরও তেমন মানে হয় না। মনে জিজ্ঞাসা জাগে আমাদের কি বুদ্ধির বিবেচনার মাপ কাঠিই প্রধান হয়ে উঠেছে এখন?

এক সময়ে শাস্ত্রকাররা বলেছিলেন 'পুত্র শিশু প্রয়োজনম্'। কিন্তু অশিক্ষিত জননী বলেছিলেন, ধন, ধন, ধন, বাড়ীতে ফুলের বন, এ সব যার ঘরে নাই তার বৃথাই জীবন। জীবীত কালে অন্ন ও মৃত্যুর পর পিণ্ডদাতা পুত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা ছড়ায় কবি জননীর মনে উঠেছিল কিনা কে জানে? আমরা কিন্তু দেখি তিনি তাঁর খোকার সঙ্গে ফুল ছাড়া আর কোন বস্তুরই উপমা পান নি। এক মুঠা ফুল বা ফুলের বন বা মোটেই কাজের জিনিষ নয়, দরকারী বস্তু নয়। শুধু আনন্দের ধন।

সামাজিক মনস্তত্ত্ব

[অকস্মা]

শ্রীশৈলবালা ঘোষ জায়া

সরস্বতী, সাহিত্য ভারতী, রত্নপ্রভা

একে দীর্ঘকালের ব্লাড প্রেসার রোগ। তার অর্থাভাবে উপযুক্ত চিকিৎসা নাই। ঔষধ পথ্য নাম মাত্র। তার উপর উগ্র দুর্দান্ত জ্ঞাতিদের উৎপীড়ন, পতি পুত্রহীনা প্রৌঢ়া হিরন্ময়ী দেবীর জীবন দুঃসহ করেছে।

পতি পুত্রহীনা বিধবাদের হিন্দু আইনের ধমক দিয়ে, ঠকিয়ে খাওয়াই 'শ্রেষ্ঠ পৌরুষ, পল্লী পুরুষ প্রতিবেশীরা এটাই জানেন'।

তাঁদের কাছে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা শুনে শুনে গ্রামের ছেলে, মালী, তেলি, কলু, বাগ্‌দী, ডুলে, মায় বাক্‌ই জীবীরা পর্যন্ত হিন্দু আইন আয়ত্ত করেছিল সুচারু রূপে। হিরন্ময়ী দেবী, কথায় কথায় এদের কাছে হিন্দু আইন শিখতেন। আর পদে পদে প্রবঞ্চিত হতেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবতেন এঁরা সবাই অসাধারণ দৈবশক্তি সম্পন্ন প্রতিভাবান।

জমিদারীর এজমালি সম্পত্তি ছিল। অকালে স্বামীর মৃত্যুর পর তার অংশ পেয়েছিলেন কিছু। তার বারো-আনা আয় শরিকগণ পৌরুষ মর্যাদার জন্য, দানবীর দম্ভে গ্রাস করতেন। খাজনা ট্যাক্স মেটাবার দায় পড়ত তাঁর ঘাড়ে। শুনতে হোত সে সব দায়, ঋণ করে। শুনতে হোত বছর বছর প্রচুর ঋণের সুদ।

অবস্থা শোচনীয়। আলাদা চাকর দরোয়ান রাখার আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। এজমালি আমের চাকর দরোয়ানদের উপর কর্তাদের নিষেধ ছিল, যেন কেউ তাঁর কাজ না করে। তবু তারা ভয় ভয় লুকিয়ে একটু আধটু কাজ করে দিত। ধরা পড়লে কর্তাদের কাছে বেচারারা লাঞ্ছিত হোত। কাজেই নিজের কাজ হিরন্ময়ী দেবী নিজেই করে নিতেন। মায় পোষ্টাফিসের কাজ পর্যন্ত।

এ বাড়ীতে মেয়েদের লেখা পড়ার চর্চা নিষিদ্ধ ছিল। তিনি ছোট বয়সে বাপের বাড়ীতে কিছু শিখেছিলেন। তারপর বাড়ীতে বসে বসে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় জ্ঞানান্বেষণে আর নিরোগ করেন। শিখেছিলেন কিছু। মাসিক পত্রিকায় গল্প উপন্যাস দিয়ে মাসে মাসে পেতেন কিছু কিছু। তাতেই কষ্টে সৃষ্টে নিজের আলো চাল, কাঁচাকলা, যোগাড় করতেন।

মণি অর্ডারে তাঁর লেখার দরুণ মাসে মাসে কিছু আসত। টাকা আসছে দেখলেই পোষ্টমাষ্টার জ্ঞাতিদের চোখ টাটিয়ে উঠত। নানারূপ টিটকারি, ব্যঙ্গ বিদ্রূপের বিষাক্ত ধ্বনি উঠত চারিদিকে সবাই বলত "বিধবা মানুষ ও জ্ঞাতিদের দোরে দোরে ঘুরে যিনি মাইনের ঝি রাঁধুনী খাটে চিরকাল। এখন কালে কালে এ সব কি অনাছিষ্টি হচ্ছে।"

অনাসৃষ্টি যতই হোক, বিদ্বেষ-লোভী, দুশ্চরিত্র, জ্ঞাতিদের তিনি চিনেছিলেন। কারুর দোরে যেতেন না। ভিক্ষার জন্য কারুর কাছে হাত পাততেন না। নিজের প্রমার্জিত অন্নে,—হোক সে অর্ধাহার, আসুক তাতে দুর্বলতা,—তবু তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন।

রোগে চিকিৎসা খরচ, ঔষধ পত্রের দাম জুটত না, মুখ বুজে সহ্য করতেন। তবু কারুর অনুগ্রহ ভিক্ষা করতেন না।

কলিকাতার মাসিক পত্রিকাগুলি তাঁর লেখা নিত। কিছু কিঞ্চিৎ দক্ষিণা মাঝে মাঝে দিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দক্ষিণা দেব বলে লেখা নিয়ে, দক্ষিণা দিতে ভুলে যেত। ভুলে যাওয়াই না কি মাসিক পত্রিকার স্বভাব।

আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-সম্পন্ন পত্রিকাগুলি, এ নিয়মের ব্যতিক্রম। তাঁরা কথার খেলাপ করেন না। প্রাপ্য টাকা মণিঅর্ডার যোগে ঘরে পৌঁছে দেন।

সেদিন এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা লেখা চেয়ে অত্রির ১০০ টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠিয়েছেন। পিওনের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ২০ টাকা নিজের বর্তমান খরচের জন্য রেখে বাকী ৮০ টাকা হিরণ্ময়ী দেবী পোষ্টঅফিসে জমা দিতে গেলেন। কেন না ও বাড়ীতে, তাঁর ঘরে টাকা রাখার উপায় নাই। পর চাবি দিয়ে ঘর খুলে, বাক্স খুলে, এক জ্ঞাতি-পুত্র এবং তাঁর স্ত্রী কন্যারা বীরদর্পে সব চুরি করে নেয়। হুঙ্কার করে বলে "বেশ করেছি চুরি করেচি। তুইত আমাদের বিষয়ের আর চুরি করচিস্। বেঁচে আছিস কেন? মর শীগগির।"

অর্থাৎ বিধবা হবার পর স্বামীর ভিটায় বাস করা, মৃত স্বামীর সম্পত্তির আয় গ্রহণ এবং মৃতের ঋণ শোধ করা, নির্ঘাৎ চৌর্যাপরাধ! এই ত হিন্দু সমাজের সামাজিক মনস্তত্ত্ব! বিশেষতঃ পল্লী অঞ্চলে। শহর অঞ্চলেও এ প্রথার কিছু কিছু প্রচলন আছে কোন কোন ছদ্ম-বেশী ভদ্র ব্যক্তিও পরম পুলকিত চিত্তে এ প্রথা পালন করেন।

পতি পুত্রহীনা অসহায় বিধবাদের অর্থ সম্পদ চুরি করা, কৌশলে ঠকিয়ে নেওয়া অনেকে "হিন্দুর-গৌরব" তথা "হিন্দু-ধর্ম" বলে মনে করেন।

পল্লী অঞ্চলে সমাজ সম্মত প্রথাকে সম্মান করে চলতে হয়। সকল জ্ঞাতির এই সব চুরি জুয়াচুরিতে সমর্থন আছে। কেউ দুষ্কৃতিকারীকে বাধা দেয় না। দৈবাৎ কেউ দুঃসাহস বশে সে কাজ করলে, তার লাঞ্ছনা ও বিপদের সীমা থাকে না। তার মাথার থান ইঁট পড়ে! মাথা কাটে। আরও কত কি দুর্ভোগ ঘটে।

বাড়ীর কাছে পোষ্টাফিস। অলি-গলি পেরিয়ে, অন্য জ্ঞাতিদের উঠান অতিক্রম করে, সহজেই সেখানে যাওয়া যায়। পোষ্ট মাষ্টার ও কেরাণীরা হিরণ্ময়ী দেবীকে চেনেন। কেউ কেউ শ্রদ্ধা সম্মান করেন। সসম্মানে অফিসের মধ্যে ডেকে বসতে চেয়ার দেন।

অন্য জ্ঞাতিদের ভাগ্যে এ সম্মান জোটে না, বলে তাঁরা হিংসায় জর্জরিত হন। আড়ালে কটূক্তি ও মন্তব্য করেন। মন্তব্যের বিষ চারিদিক বিষাক্ত করে। হিরণ্ময়ী দেবীর সম্বন্ধে অনেকের মনে বিরুদ্ধ ধারণা গড়ে ওঠে। রাগে পেলে তাঁরা কটূভাষী জ্ঞাতিদের মতামত উল্লেখ করে কেউ কেউ বিদ্রূপ করেন। অসহায় দরিদ্র বিধবাদের সব সহ্য করতে হয়। তিনিও সহ্য করেন।

আর এক দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি পুত্রের স্কুলের সহপাঠী তখন পোষ্টাফিসে টেলিগ্রাফ বাবু।

প্রথম পরিচয়ের সময় তিনি খুব সম্ভ্রম করে চলতেন। হিরণ্ময়ী দেবী পোষ্টাফিসে এলেই সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে বসাতেন। উপযাচক হয়ে, তাঁর খুটিনাটি কাজে সাহায্য করতেন।

তারপর?

সহপাঠী পরিবারের সঙ্গ-বাহাদুরে দরিদ্র বিধবাকে সম্মান করা উচিত নয় বুঝলেন আরও বুঝলেন পতি পুত্রহীনা বিধবাদের শাসন করবার আছে তাঁর বিধি দত্ত অধিকার!

যেহেতু তিনি ভাগুর পুত্রের সহপাঠী! ভাগুর পুত্রের যখন বিধবা খুড়ী জ্যাঠাইকে নির্যাতন করার অধিকার আছে, তখন তাঁরও থাকা কর্তব্য।

হিরণ্ময়ী দেবী পোষ্ট মাষ্টারের টেবিলে পাশবুক ও টাকাগুলি রাখবা মাত্র ভাগুর-পুত্র-বন্ধু শ্রীমান টেলিগ্রাফ বাবু ঘর ছেড়ে তেড়ে উঠে এলেন। বিনা ভূমিকায় আচমকা ধমক দিয়ে বললেন "আপনি মেয়ে মানুষ। টাকা নিয়ে কি করবেন? দিয়ে দিন টাকাগুলো আমাদের।"

পরিহাস না কি? থতমত খেয়ে টেলিগ্রাফ বাবুর মুখের দিকে চাইলেন। হিরণ্ময়ী দেখলেন—প্রচণ্ড ঈর্ষা ও দারুণ বিরক্তিতে সে মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন!

পরিহাস নয়। স্পষ্ট ক্রোধ।

মনে হোল নিজের প্রমার্জিত অর্থ, নিজের পাশ বুকে জমা রাখার কোন অধিকার হিরণ্ময়ী দেবীর নাই। যে-হেতু তিনি অমানুষ জ্ঞাতিদের দ্বারা লাঞ্ছিতা, দরিদ্র বিধবা! গর্হিত দুষ্কার্যের আসামী তিনি। হতভম্ব হলেন।

তৎক্ষণে পুনশ্চ ধমক—"দিন টাকাগুলো আমাকে।"

টাকা তখন পোষ্ট মাষ্টার বাবুর ড্রয়ারে গেছে।

হিরণ্ময়ী দেবীর স্মরণ হোল টেলিগ্রাফ বাবু বাক্সই-জীবী সম্প্রদায়ের ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। ভাবলেন সেখানে হয়ত ঐ আইনই বলবৎ। ভদ্রলোক তাই ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন!

হোক কুমারী, হোক বৃদ্ধা, হোক ভদ্র মহিলা, হোক বৃদ্ধা; স্ত্রীলোক মাত্রকেই ধমক দিয়ে কথা বলতে হবে। নইলে পুরুষদের পৌরুষ মর্যাদা উৎসন্নে যাবে, পাড়াগাঁয়ের শিক্ষিত অশিক্ষিত অনেকের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল। শহরের মার্জিত রুচির ভদ্রলোক সম্প্রদায় ছাড়া আরও অনেকের মধ্যে এ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

হিরণ্ময়ী দেবী হতভম্ব!

সঙ্গে সঙ্গে আবার ধমক! "দিয়ে দিন টাকাগুলো আমাকে।"

আত্মসম্বরণ করে হিরণ্ময়ী দেবী শান্ত কণ্ঠে বললেন "তারপর? আমার খরচ চলবে কিসে? খাব কি?"

সদর্পে উত্তর এল "বিধবার আবার খরচ কি? খাওয়া পরা কিসের। মাঠে যাবেন, পুকুর থেকে এক ডগা কলমী শাক তুলে আনবেন। দুটি চাল ফোটাবেন, তাতেই খাওয়া চলবে।"

"বাপজী ভুলের ঘরে জন্মাইনি। মাঠে যাওয়া, পরের পুকুরে নেবে কলমী শাক চুরি করার শিক্ষা বাপ মা আমার দেন নি। শাক কিনে খাই। তার দাম কে দেবে?"

"কে আবার দেবে? খাবেন না।"

"রোগে ভুগচি। ওষুধ পথ্যের দাম পাব কোথা?"

"বিধবার আবার রোগ কি? ওষুধ পথ্য কিসের? বিধবাদের ওষুধ খেতে নেই।"

"ওগো সধবাদের রোগ হতে আছে? ওষুধ খেতে আছে?"

"হাঁ। তাদের মূল্যবান প্রাণ।"

"একশো বার। স্বামী পুত্র আছে, সেবা যত্ন করার লোক আছে। স্বামী পুত্রের রোজগার আছে। ভাবনা নাই। কিন্তু গরীব বিধবাদের কেউ নাই। রোগে ভুগে বিনা চিকিৎসায় অকর্মণ্য হয়ে পড়ে থাকলে তাদের মুখে জল দেবে কে? তাই ওষুধ খেয়ে মাথা তুলি।"

"তার দরকার কি? বিধবাদের মরাই ত ভাল, দেন টাকাগুলো।"

"দানছত্র করার ক্ষমতা নাই। ত্রিকুলে কেউ নেই। নিজে খেটে খুটে অন্ন বস্ত্র ওষুধ পথ্য যোগাড় করি। অসীম নির্যাতন ভোগ করে হিংস্র নিষ্ঠুর জ্ঞাতিদের মধ্যে বাস করি। কেন না, নিরাপদ স্থানে গিয়ে বাস করার পয়সা নাই। আমাকে রক্ষা করেন কেউ? দিয়ে রেখেছেন টাকা?"

"কেন দেব? গরীব বিধবাদের টাকা, পুরুষরা চিরদিনই কেড়ে নেয়। এবার এলে কেড়ে নেব। হাঁ কেড়েই নেব।"

বৃদ্ধ পোষ্ট মাষ্টার মশাই ঘাড় হেঁট করে এতক্ষণ পাশ বুকে লেখালেখি করছিলেন। বিরক্তি গম্ভীর মুখে পাশ বুকটা হিরণ্ময়ী দেবীর হাতে দিয়ে বললেন "নিয়ে যান মা: এবার থেকে আপনার সঙ্গে দু-একজন রক্ষক সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যা দেখচি, হিন্দুস্তাই রাহাজানির রাজত্ব চলচে দেশে। আপনাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে, অনেক দুর্বৃত্ত বিপদে ফেলতে চায়। সাবধান হোন।"

টেলিগ্রাফ বাবু স্তব্ধ।

হিরণ্ময়ী দেবী বললেন "দুর্বৃত্তদের মাঝে আপনাদের মত সদ্বৃত্তিশালী মানুষ আছেন, এই আমাদের ভরসা। যান মিঃ টেলিগ্রাফ, নিজের টেবিলে গিয়ে বসুন। পাব্লিকের সার্ভেন্ট আপনারা। পাব্লিকের কাজে ফাঁকি দেবেন না। নমস্কার মাষ্টার মশাই।"

মাষ্টার মশাই প্রতিনমস্কার করলেন।

হিরণ্ময়ী দেবী চলে এলেন।

অনেক পরে।—

আর একদিন।

তখন নেহেরু গবর্ণমেণ্টের রাজত্ব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায়। সদ্য নূতন সংবিধান রচিত ও প্রচলিত হবার তোড়জোড় চলছে।

অসহায় দরিদ্র বিধবাদের বঞ্চনা করে, তাদের যথাসর্বস্ব লুট পাট করে খাওয়ার আইন-সম্মত অধিকারে বঞ্চিত

হবার আশঙ্কায় বৃদ্ধ বক্তাদলের অনেকেই রাগে ফুঁসছেন। আড়ালে কটূক্তি করছেন। পুরুষ সমাজের সর্বগ্রাসী অধিকার কেড়ে নেওয়ার নূতন সংবিধান প্রণয়িতাদের এবং অহিংসা মন্ত্রের উপাসক মহাত্মা গান্ধীজীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছেন। গান্ধীজীর অহিংসা, শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, সমান অধিকারের আদর্শ যে দেশের সর্বনাশ করবে, সে বিষয়ে গরম গরম মন্তব্য প্রচারিত হচ্ছে। চর্ব্য-চোষ্য খেয়ে বিছানায় শুয়ে অলস আরামে গুড়গুড়ি টানা আর চলবে না। খেটে খেতে হবে এবার। সরোষে সবাই গর্জন করেছেন "হিন্দুর বৌধ পরিবার প্রথা এবার ভেঙে গেল। হিন্দু সমাজের সর্বনাশ হোল।"

যাঁরা লেখা পড়া শিখে সদুপায়ে উপার্জন করে খাচ্ছেন তাঁরা এই আক্ষেপ শুনে মুচকে হাসছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী ক্ষুব্ধ প্রেস্ ... এড়িয়ে চলেন। যে যা বলছেন, নির্বিবাদে শুনে যাচ্ছেন।

এল ভোট যুদ্ধের পালা।

ভোট যুদ্ধ হোল।

ভোটের লিষ্টে নাম আছে। ভোট দিয়ে এসে হিরণ্ময়ী দেবী খাম পোষ্ট কার্ড কিনতে পোষ্টাফিসে ঢুকলেন আত্মীয়দের চিঠি লিখবেন।

শ্রীমান টেলিগ্রাফ ছুটে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন। উদ্ধত ভাবে ধমক দিয়ে বললেন "কাকে ভোট দিয়ে এলেন?"

অকারণ ঔদ্ধত্য দেখে বিস্মিত হলেন। স্মরণ হোল বয়স্কা হলেও তিনি একজন অর্থ সম্পদ হীনা স্ত্রীলোক মাত্র। তার সর্ব অপরাধিনী—হিন্দু বিধবা। তাঁর বয়সের সম্মান রাখা শ্রীমান টেলিগ্রাফের মত মহা প্রতাপশালী ব্যক্তিদের পক্ষে অনুচিত। বিশেষতঃ তিনি ভাসুর পুত্রের বন্ধু। শাসন কর্তা।

সংক্ষেপে বললেন "বলব না। সরুন। ভিতরে যাই।"

আরও পথরোধ করে দাঁড়িয়ে শ্রীমান সক্রোধে বললেন "তাহলে গোরুকে ভোট দিয়েছেন?"

গোরু অর্থাৎ—কংগ্রেস।

"আপত্তি নেই।"

পুনশ্চ ধমক! "গোরুকে ভোট দিলেন। গোরু করেছে কি?"

'গাধা যা করে নি, ছাগল ভেড়া যা পারে নি—। —গোরু তাই করেছে। অন্ততঃ এখন পর্যন্ত।'

আগুনে ঘি পড়ল! জ্বলে উঠে অধিকতর উদ্ধত কণ্ঠে শ্রীমান টেলিগ্রাফ বললেন "কি করেছে গোরু? কেন দিলেন গোরুকে ভোট?"

অর্থাৎ ভোট দেওয়ার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দরিদ্র বিধবার থাকা অসম্ভব! অন্যায়! তিনি যখন পুরুষ-শাসিত সমাজের পুরুষ, তখন সে ব্যাপারে তিনিই গরীব বিধবার সামাজিক শাসক। ভরণপোষণের কর্তা। অভিভাবক।

ঔদ্ধত্য দেখে রাগ হোল। উচ্চ কণ্ঠে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন "গোরু আমার মাথা কিনেছেন। চেয়ে দেখুন পল্লী অঞ্চলের ওই হেলথ্ সেণ্টার গুলোর দিকে; কোনও গাধা ওগুলো করেছিল কি এতদিন? পল্লী অঞ্চলের হাজার হাজার লোককে সারা জীবন ধরে বিনা চিকিৎসায় আছড়ে মারতে দেখেছি পটিয়ে পটিয়ে মারতে দেখেছি। গাধা, ছাগল, ভেড়া, তাদের ওষুধ পথ্য দেয় নি। এখন রোগীরা ওষুধ পথ্য পাচ্ছে। সেবা যত্ন পেয়ে কৃতার্থ হচ্ছে। বেঁচে উঠছে। নরক আরামে মরছে।"

তাইত! জলজ্যান্ত হেলথ্ সেণ্টার-গুলো ত উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রীমানের মুখ ম্লান হোল। ঘুরে গিয়ে বললেন "আর কি করেছে গোরু?"

"বলব? সহ্য করতে পারবেন?"

"পারব। বলুন।"

"অন্ধ ঘরের পতিপুত্রহীনা হিন্দু বিধবাদের, সমাজের শিয়াল শকুনিরা ছিঁড়ে খাচ্ছিল, হিন্দু আইনের ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে। সে ব্রহ্মাস্ত্র চূর্ণ করে, অসহায় বিধবাদের বাঁচিয়েছে। দিচ্ছে বাঁচার পথ —ঐ গোরু! হিন্দু বিধবার উত্তরাধিকার আইন! নামটা শুনেছেন কি।"

ক্ষীণ কণ্ঠে শ্রীমান বললেন "তাতে পুরুষ সমাজের ক্ষতি হোল। লাভটা হোল কি?"

"আমরা বাঁচবার পথ পেলাম—বিশেষতঃ, আমি।

এখন এ্যাবসলিউট রাইট নিজের স্ত্রীর বিষয় বিক্রী করে দেনা শুধব। নিজের দারিদ্র্যকে কথব। ওষুধ কেনার পয়সা জুটবে। রোগকে রুখিয়ে রাখব। উপযুক্ত পথ্য পেয়ে অক্লেশে হেঁটে খেটে বেড়াব। কোনও সাধ্য এতদিন আমাদের এ দুঃখ ঘুচিয়েছিল? দিয়েছিল এ সুযোগ?"

"গাধারা হাতে ক্ষমতা পেলে—"

বাধা দিয়ে হিরণ্ময়ী দেবী বললেন, "রক্ষে করুন। বিধবার লোভে চিরদিন যারা হিন্দু বিধবাদের জাত পুড়িয়ে মেরেছে, হাতে আবার ক্ষমতা পেলে তারা মাথায় রাখত? আপনিই আমাকে এতগুণ লেখাপড়া শেখে এখানেই অগ্নি সংকার করতেন। নইলে আপনাদের ফেরেববাজির হিন্দু ধর্ম রসাতলে যেত যে।"

"হিন্দু ধর্ম, ফেরেববাজি?"

"বেদ বেদান্ত গীতা উপনিষদের সঙ্গে মিলিয়ে ইতর, তস্কর, বিধবা-বঞ্চনাকারীদের 'হিন্দু ধর্মকে' তুলনা-মূলক বিচার করুন। দেখবেন কত রং' বেরং এর প্রবঞ্চনা ঢুকিয়েছেন আপনাদের "মন-গড়া হিন্দু ধর্মের" মধ্যে।"

"তা যাই বলুন। বিধবা মেরে না খেলে হিন্দু সমাজের মতে বাবুরা খাবে কি? বংশধরদের থাকবে কি? খাবে কি?"

"সভর খাটিয়ে। মনুপাশে খেটে—খুটে।"

"ওটি আমরা পারব না। 'কোকটে' মেরে নেবার তালে কর্তারা চিরদিন ঘুরেছেন। পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে চিরদিন খেয়েছেন। আজ সাধু সাজা অসহ্য। ওঁরা ক্ষেপে উঠেছেন। আমরাও।"

"যাদব বোয়ালদের করাল গ্রাস থেকে, চুণো পুঁটি বিধবাগুলো কমকে গেল। ক্ষেপে ওঠার কথাই ত। কোন কালে বিবেক বলে, ন্যায় নিষ্ঠা বলে কিছু যাঁদের ছিল, তাঁদের প্রণাম করি। কিন্তু এঁরা? কোন কালে সুস্থ মস্তিষ্ক ছিলেন যে আজ নতুন করে ক্ষেপলেন? সরুন, খান পোষ্টকার্ড কিনে নিই।"

"আমাকে টাকা দেন। কিনে দিচ্ছি।"

"উহুঁ গরীব বিধবার দুঃখ কাকে সাহায্য করলে, আপনাদের "বিধবা-রক্ষক হিন্দু ধর্ম" তখন হবে ধর্ম বাঁচান বাবা আমি কিনে নিচ্ছি।"

সেকালের বনভোজন

শ্রীগিরিবালা দেবী

অনেক দিনের পুরাতন কথা—অনেক যুগের। বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে তুলিয়া আনিলাম তোমাদের হাতে। তোমরা নাগরিক, জীবনে আনন্দ তোমাদের প্রচুর। সুদূর পল্লীগ্রামে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে পল্লী কন্যাদের আনন্দ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির নিঃসন্দেহে। সে পল্লী আর নাই। শুধু আমরা আছি এখনও! নগরের বদ্ধ প্রাচীরে আমরা সুদূরের স্বপ্ন এখনও সঞ্চিত রাখিয়াছি—মনের কোণে কোণে। হারানো দিনের বিলাপ নীরব হইয়া গিয়াছে বহুদিন। কিন্তু স্মৃতি আজও পাহারা দেয়। সেই বিগত দিনের একখানি পাতা তোমাদের দিলাম।

পদ্মাতীরের সুখ্যাত একটি গ্রামে এক রৌদ্রপ্রদীপ্ত দিনে পট উত্তোলন করিলাম। তুচ্ছ ঘটনা সংঘাত, তুচ্ছ খুনসুটী হাসি কান্নার মধ্যে বিগত যুগের একটী দিন।

রাত্রি শেষের স্বপ্ন তন্দ্রিমা তখনো আমার চক্ষু হইতে বিদায় নেয় নাই। কিন্তু ঘুম নিদ্রা ক্ষিকা হইয়া আসিয়াছে। দিদিমা সন্তর্পণে আমার পাশ হইতে উঠিয়া ঘরের দরজা ভেজাইয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কর্মব্যস্ত কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে দূরে পবনে ভাসিয়া আসিতেছে, ক্রমে ভোরের আবছা অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিল। জানালার পাশের বেলালী গাছটী আলোর স্পর্শে পুষ্পাভরণ উন্মোচন করিতে লাগিল। এমন সময় জগা বৈরাগী পাড়া প্রদক্ষিণ করিয়া উঠানে পা দিয়া একতারায় ঘা দিল—

গা তোল, গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল,
ঐ এল পাষাণী, তোর ঈশানী।

আমার মনের মধ্যে কোন ভাব ছিল না, ভাবের উপযুক্ত বয়সে তখনো উন্নীত হইতে পারি নাই। এগার বছরকে ঠেলিয়া দিয়া কেবল বারোর কোঠায় পা দিয়াছি। তবু আগমনীর করুণ সুর আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে লাগিল।

আমি বাতায়ন পথে তাকাইয়া রহিলাম। শরতের সোনার আলোকে ভুবন ভরিয়া গিয়াছে। বৃন্তচ্যুত শেফালীর সঙ্গে বর্ষণসিক্ত আর্দ্র মৃত্তিকায় টুপটুপ করিয়া শিশির আসিয়া পড়িতেছে। আকাশে শুভ্র মেঘ ও রৌদ্র খেলা করিতেছে। কখন কখন মেঘ ডাকিতেছে।

জগা বৈরাগীর গানে ও মেঘের গর্জ্জনে আমার হৃদয় তন্ত্রীতে কি জানি এক অজানা ব্যথা বাজিতে লাগিল। মনে পড়িল আমার গোনা তিন দিনের আজ শেষ। আবার আমাকে ফিরিতে হইবে সেই চিরন্তন স্নেহের কারাগারে। যেখানে স্নেহে বিহ্বল ঠাকুরদাদা ঠাকুমা পথ চাহিয়া আছেন। মা আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন! অবুঝ ছোট ভাইটী খেলাঘরে দিদিকে খুঁজিয়া সারা হইতেছে। এই তিন দিনেই 'মেউড়ি' দাদারা আমাদের প্রতিমা 'মোমাটিয়া'-করিতে আসিয়াছে। আমার জন্য উপহার আনিয়াছে একটি ছোট খাটো টুক-টুকে শতদলবাসিনী লক্ষ্মী প্রতিমা। সেখানে আমার কত প্রলোভন, কত আকর্ষণ। তবুও আমার এই জন্মনীড় ছাড়িয়া, দাদা মহাশয় ও দিদিমাকে ছাড়িয়া অগণিত খেলার সাথীদের ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় না।

"আপুছি আপুছি ঘুমায় ঘুমায়।
মধুপুরের বাঘ ডাকে দারুণ সময়।"

কানের কাছে তীক্ষ্ণস্বরে আমি সচমকে বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। নিঃশব্দে ভেজানো কবাট ঠেলিয়া তালুকদারের ছোট মেয়ে বাতাসী আমার ঘুম ভাঙ্গাইতে আসিয়াছে। আমি চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করলাম, তোর ফুল তোলা হয়নি, বাতাসী!

হয়নি আবার। কোন দাস সকালে পুজোর ফুল তুলতে তুলে রেখে, তবে না এলাম কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাতে। দুই সোনা, বড্ড ঘুম কাতুরে! ভগাদাদার গানেও ঘুম ভাঙেনি।

ভাঙেনি আবার? আমি তো জেগে শুয়েছিলাম। উঠতে ভাল লাগছিল না।

দিদিমা ঘরে ঢুকিয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, ভাল লাগছিল না, কেন সোনা? শরীর তো খারাপ হয়নি? নতুন জায়গায় এসে নতুন জলে চান করেছিস, অসুখ বিসুখ না হলেই বাঁচি। দেখতো মা বাতাসি, সোনার পায়ে হাত দিয়ে। আমি চাদর কাপড়ে এখন বিছানা ছোঁব না।

বাতাসী আমার সর্দ্দাস কোমল হস্ত বুলাইয়া মাথা নাড়িল—গা বেশ ঠাণ্ডা আছে রাঙা মা, তপ্ত হয়নি। ও এখানে থাকতে খুব ভালবাসে কাল যেতে হবে বলে বুঝি ভাল লাগছে না। তোমরা তাদের বলে করে সোনাকে এখানে রাখনা কেন? ছেলে মানুষের যেখানে থাকতে ভাল লাগে সেখানেই রাখতে হয়। দিদিমা ক্ষোভের হাসি হাসিলেন—পাগলী বলে কিরে? সোনাকে কাছে রাখতে আমার কি সাধ? আমার এক মাত্তর মেয়ে, তাকে দিয়েছি এক মাত্তর ছেলের ঘরে। তাদের পুরী অন্ধকার করে তারা থেকে কেন, আমার আঁধার ঘরে প্রদীপ জ্বালতে? পুজোর কাপড়চোপড় মিষ্টি মাছ নিয়ে ওকে দেখতে তোর জেঠা গিয়েছিলেন সাধুগঞ্জে। সোনা এখানে আসবার জন্য কান্নাকাটি করায়, তবে না তিনদিনের কড়ারে ওর ঠাকুরদা ঠাকুমা ছেড়ে দিয়েছেন। সে বাড়ীতেও ধুমধাম করে দুর্গা পূজা হয়। আমার বুড়েতেও মা আসেন। একবার না হয় ও আমার পুজো দেখলো কিন্তু তা হবার জো নেই।

জো নেই কেন রাঙা মা? সোনার ভাইটাকে নিয়ে তারা থাকুক, আমরা থাকি সোনাকে নিয়ে। ভাগ করে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

বাংলা দেশের মেয়ের বাপ মায়ের ভাগাভাগির জোর নেই। জোরের ভাগ্য থাকলে এক মায়ের সন্তানের মা হতামনা। দিদিমার দীর্ঘ গণ্ডে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আমার চোখও জলে ভরিয়া গেল, আমি ধরা পড়িবার ভয়ে বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইলাম। বাহিরে শরতের কত শোভা, কত না সমারোহ। পায়ের বুঁ কিয়া মল বাজাইয়া কয়েকটী ছোট মেয়ে সেফালীতলায় ফুল কুড়াইতেছে। এ পূজার ফুল নয়, শাড়ী রাঙানোর বোটা সংগ্রহ।

এখানেও আজ প্রতিমা একমাটিয়া হইতেছে। দাদা-মশায় পট্টবস্ত্র পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় গুদ্ধাচারে চণ্ডী পাঠ করিতেছেন। গৌরবর্ণে ও পট্টবাসে তাঁহার সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি পূজারীর মহিমায় প্রদীপ্ত। বাতাসীর বড় দিদি কাদম্বিনী টিনের চালায় এক সোনা, দুধের ক্ষীর তৈরী করিতেছেন বালকে বাছুরের জন্য ভোরেই দুইটী গাই দোহন হইয়াছিল। তালুকদার বাড়ী এ বাড়ীর সংলগ্ন, গায়ে গায়ে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শৈশবে মাতৃহারা তালুকদার বাড়ীর বাতাসীরা তিন বোন আমার দিদিমার কাছে লালিত পালিত হইয়াছে। শুধু পালিত নয়, একেবারে এ বাড়ীর মেয়ে হইয়া গিয়াছে। বাতাসীর দিদির বয়স বছর আঠারো, গ্রামেই বিবাহ হইয়াছে। এপাড়া-ওপাড়ার ব্যবধান মাত্র। দিদিমা সংসারে একাকিনী, তাঁহাদের বারো মাসের তের পাল-পার্ব্বণে বাতাসীর দিদি নইলে চলে না।

মেজ ভাবভেষরী, তাতুদি শনেরো বছরের, এখনও বিবাহ হয় নাই। তাহারা বৈকল্য কুলীন, পালটি ঘরের অভাবে কন্যা চিরকুমারী থাকিলেও নিন্দা নাই। ছোট বাতাসী আমারই বয়সী, কেবল ইহারাই নহে, এ গ্রামের ধনী দরিদ্র ভদ্র ইতর সকলেই যেন এক সূত্রে গাঁথা এক-গাছি মালা, পরস্পর পরস্পরের সহিত সুখে দুঃখে সংযুক্ত।

আমার পিতৃপুরুষের গ্রামখানি কেমন যেন সহর ঘেঁষা, সকলেরই ভাব ছাড়াছাড়া। এমন নিবিড়তা সেখানে নাই।

(২)

রন্ধন শালায় পশ্চাতের ডোবা হইতে আমি হাত মুখ ধুইয়া ফেরা মাত্র দিদিমা সস্নেহে কহিলেন "সোনা এদিকে

আর, ক্ষীর হয়ে গেছে, এইবার তোরা জল খেয়ে নে. গাছের সব্‌রি কলা পেকেছে, নতুন ধানের চিঁড়ে কুটে রেখেছি। ক্ষীর দিয়ে কলা মেখে খা-সবাই।'

বাতাসী ক্ষীর চালিবার পাথরের খোড়া ভাল জলে আর একবার ধুইয়া উনুনের পাশে আগাইয়া দিতেছিল, সে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ রাঙামা, আজ ক্যানা ভাত রাঁধবেনা ? আমরা কি এখন কলার করব ?"

"তাই কর মা, আজ যে তোদের বনভোজন, সোনা একবার ভাত খেলে দুপুরে কিছু মুখে দিতে পারবেনা, বলে ক্যানা ভাত করলাম না। বাছা আমার এত কম খায়, খাইয়ে কোন সুখ পাই না।"

দিদি হাতা বাটিয়া খোড়ায় ক্ষীর ভাগ করিতেছিলেন, ঘাড় ফিরাইয়া সায় দিলেন,"সত্যি রাঙামা, সোনা একেবারে খেতে পারে না অত খাবেনা খাবেনা করলে কি শরীর সারে? তাইত অমনি রোগা লিকলিকে চেহারা। ও সেদিন এসেই বাতাসীকে জিজ্ঞাসা করছিল চড়িভাতির কথা। ওর জন্যেই আজকে আমাদের চড়িভাতি, রাত করলা হতে না হতেই ভাতু গেছে পাড়ার মেয়েদের কাছে সিধে আনতে। সে ফিরে এলেই আমি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নেব।"

ভাতুদির নাম করতে করতেই সে প্রকাণ্ড এক থামা কাঁখে লইয়া ব্যস্ত সমস্তভাবে উপস্থিত হইল। দিদিমার পদতলে থামা নামাইয়া দিয়া সে কলকল খলখল করিতে লাগিল, "দিদি এই তোমার বেসাতি বুঝে নাও বাপু। পাড়ার তেরটী মেয়ে চড়ি ভাতিতে যাবে সিধে দিয়েছে। আর কে যাবে না যাবে তুমি বোঝগে।" আমি সবিস্ময়ে থামার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বনভোজনের নিয়ম প্রতি সভ্যার থাপা সিধে একসঙ্গে দেওয়া। বাটিতে বাটিতে তৈল, ঘি, চাল, ডাল, তরিতরকারীতে থামা ভরিয়া গিয়াছে। দিদিমা বলিলেন, "কাতু তোরা আগে খেয়ে নে মা। খেয়ে দেয়ে আর যা জিনিষপত্র লাগবে ভাঁড়ার থেকে বের করে নে। বাসেদের বাগানে কি তোদের রান্না খাওয়া হবে! তোদের মাছ আমিই দেব। বহিরকে বাজারে পাঠিয়েছি দুই হালি ইলিশ মাছের জন্য।

"ও রাঙামা, বাসেদের পোড়া ভিটেই ভাল হবে। পুকুর রয়েছে পুকুরের পাড়েই বস্ত কাঁঠালতলা। আমি ভোরেই হরির মাকে পাঠিয়েছি কাঁঠালতলা লেপে পুঁছে রাখতে। পুকুরের সানের চাতাল ধুয়ে রাখতে। হরিকেও বলেছি। ছেলেমানুষ আমাদের কাঠ কুটো কুড়িয়ে দেবে, প্রসাদ পাবে।"

ভাতুদি হাসিল, "প্রসাদ পাবে কিন্তু কি প্রসাদ তোমাদের হবে তা বলবেনা কেন? যাই হোক রান্না করবো কিন্তু আমি, তোমরা সবাই দিও যোগাড়। বাসেদের বাগানে কাঁচকলা পেকেছে থোকা থোকা। গুড় নিও বাবু যেন করে, আমি কাঁচকলার অম্বল রাঁধবো। ইলিশ মাছের সঙ্গে বাটা আর কি হবে বলনাগো।"

বাতাসী কহিল "ছেলে পাড়ার ন্যাপাদা আমাদের এক সেরার চিংড়ি মাছ দেবে" "বেশতো শুনে সন্তুষ্ট হলাম আমাদের গেরো ইচেকে চিড়িং বলে রুষ্ট হচ্ছিস কেন লো? কেবল চিংড়ি দিলেই কি হবে? লাউ কুমড়ো লাগবে না?"

"বাপ মা খুড়ো, কোন বিলে মরিলে মাছ শুধু ইচেরগুলো
খাবনা ছোঁবনা মুঁটকি করে ঘোষ
লাউ-কুমড়ো লাগলে পরে, ইঁচে দিয়ে খাব।"

বলিতে বলিতে ভাতুদি খিল খিল শব্দে হাসিতে লাগিল। তাহার সব গুণের মধ্যে এক মস্ত দোষ সবাই হাসমুখী। কেহ গালি দিলেও হাসিবে, ঝগড়া বাধাইলেও হাসিবে, হাসির যেন এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। হাসির শিশুরা ভাতুদির ওষ্ঠে বুঝি দিন-ভোর কেবলি খেলা করিয়া বেড়ায়। রাত্রে তাহারা ঘুমায় কিনা জানিনা।

দিদি হাসি চাপিয়া কৃত্রিম রোষে ভাতুকে ধমক দিলেন, "এখন কাইনাই রেখে আগে খেয়ে নে। খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর করে লাউ কুমড়োর খোঁজে কেন পাড়ায় চৌ চৌ করতে যাস।

"শোন রাঙামা, পাঁচ ঘর থেকে যে পাঁচমিশেলী ভাল এসেছে আমি বলি কি তা দিয়ে খিচুড়ী হোক। সে পটলভাজা, ইলিশ মাছের ঝাল অম্বল আর লাউ চিংড়ির ঘন্ট।"

দিদিমা কহিলেন, "ওইতেই হবে মা, আর বাঁড়ি বাঁড়ি রান্না বাড়াসনে তাহলে বেলা গড়িয়ে যাবে। আমি গয়লা পাড়া থেকে বাঁড়ি দুই দুর্গাদই তোদের আনিয়ে দেব।"

"দুর্গা দই দিলে বাঁকা খানেক বায়কোলের মালা কিন্তু তোমাকে পাঠাতে হবে রাঙা মা, নইলে চুমুক দিয়ে খাব কিসে? এতই যখন দিচ্ছ তখন হাঁড়ি কতক খাসা দই দিলে পাত চেটে তোমার হাত চেটে দিতাম।"

দিদি আবার জোড়া ভুরু বাঁকাইয়া ভাতুদির প্রতি জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বাঙালী কটকট করিয়া বলিয়া উঠিল, "আরে, আগে তরমাস না দিলে কি এসময় খাসাদই পাওয়া যায়? জাক, যেন জানেন না কিছু।"

দিদিমা সহাস্যে উত্তর দিলেন "সইয়ের কথা আগে আমার মনে ছিল না, মা আজ পুজো বেরিয়ে যাক, কালী পুজো হোক, তখন আমার হেমকে একবার আনবো সে গেলে তাকে নিয়ে তোরা আবার বনভোজন করিস। কত খাসাদই, ক্ষীর চমচম, রাঘব সই খেতে পারিস তখন দেখে নেব।"

৩

হাঁড়ি, বেড়ি, খুন্তী, হাতা, বাসন প্রয়োজনীয় যাহা কিছু হাতে বহিয়া লইয়া আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম দাস বাগানে। দাসেরা বছর দুই পূর্বে মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া ভিটার টিনের ঘরগুলি বেচিয়া দিয়া পশ্চাপারে চলিয়া গিয়াছে। শূন্য ভিটা খাঁ খাঁ করিতেছে। সাধের ফলফুলের বাগান আগাছায় ভরিয়া গেছে। পুকুরে স্নান বাঁধানো ঘাটে সোনা ধরিয়াছে। পুকুরের চারিপাশে অযত্নে ফলমী, সাঁপলী, গাওলা কারেবী আসম রচনা করিয়াছে, এই নির্জন নিভৃত জলাশয় হইয়াছে পাড়ার হাঁসের পালের বিচরণ ক্ষেত্র, বকের বাঁকের নিরালা ঠোর।

ঢালার জল গাছগুলিতে সুপক্ক ফল ঝুলিতেছে থোকা থোকা বাতাবী লেবু ফল ভারে হেলিয়া পড়িয়াছে, সোনা রংয়ের কাম ছাড়ায় বনের ধারায় খুলিয়াছে, ছাড়া কয়েকটায় গাছ আলো হইয়াছে। এমন সুখরোচক জিনিস এগ্রামে দুর্লভ নয়, পথে ঘাটে, উঠানে, বাগিচায় ইহার ছড়াছড়ি। সেই কারণে কেহ বিশেষ এখানে আসেনা। বিজন বনের বনফুল নীরবে ফুটিয়া নীরবে ঝড়িয়া যায়। পাকা ফল মাটিতে পড়িয়া মাটিতে মাটি হয়।

আমাদের অভ্যর্থনার সভার সভানেত্রী হইয়াছেন দিদি। সহ সভানেত্রী বুলু মাসী। ইহারা দুই জনাই দলের বয়োজ্যেষ্ঠা; আর সকলে কিশোরী ও বালিকা, কিশোরীদের কয়েক জন বিবাহিতা আর কয়েকটির বিবাহের ফুল ফুটি-ফুটি করিয়াও ফুটিতেছেনা। বাকী কয়েকটী আমারই মত আধো জাগা, আধ ঘুমন্ত হরির মা কাঁঠালতলা লেপিয়া উনুন কাটিয়া রাখিয়াছিল। সাত আট বছরের ছবি শুকনো পাতা কুড়াইয়া দিল। দিদি কিশোরীদের হুকুম দিলেন কটি কাটিতে, ছোটদের হুকুম দিলেন পান সাজিতে। কিন্তু তাঁহার কথা কে শোনে? একদল ঢালির পেয়ারা গাছের ডালে, অন্য দল ছুটিল কয়রচার বনে। অবশেষে বুলু মাসী গাছের একটি ডাল ভাঙিয়া লইয়া সকলকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিলেন। ভাতুদি রান্না চড়াইয়া দিলে কয়েকজন বসিল তরকারী কুটিতে। কয়েকজন বসিল মাছ লইয়া। বাড়ী হইতে একতাল বাটনা বাটিয়া আনা হইয়াছিল সেইজন্য মিল মোড়ার কষ্ট স্বীকার করিতে হইল না। কাঁঠালতলার খানিকটা দূরে কলতলায় বাঙালীকে লইয়া আমি পান সাজিতে বসিয়া খুশির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। একে আমি কুনো মুখচোরা, কাহারো সহিত মিশিতে পারি না, কথা বলিতে জানি না, তাহাতে এই মেয়েদের উত্তাল তরঙ্গ। তবে কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবু হাসিতরা, সোনার স্বপ্নে মাখা দিনটী আমার হৃদয়ে অনির্বচনীয় মাধুর্য বহিয়া আনিতেছিল, ঘণ্টা খানেক পরে প্রথানাদের হাঁকডাক সুরু হইল—"ওরে তোরা সব জলখাবার খেতে আয়রে, জল খেয়ে চান সেরে নে।"

কাঁঠালতলায় নিষ্ঠীবন করিলাম জলযোগের আয়োজন। বুড়ি খানেক বাতাবী লেবু পাড়িয়া আনা হইয়াছে। বুলুমাসী কলম-দাদু পরে সুগঠিত বাঁচ

দোলাইয়া লোহার হাতায় পটি দিয়া লেবুগুলি ছেঁদা করিয়া দিতেছে। দিদি খোসা ছাড়াইয়া টুকরা কলার পাতায় সাজাইয়া রাখিতেছেন। শুধু লেবু নয়, খণ্ড খণ্ড আক, তিলের নাড়ু, ক্ষীরভক্তি।

সকলের জলযোগ হইয়া গেলে দিদি বাতাসীকে ডাকিলেন "শোন বাতাসি, ওই বেতের বাঁপির ভেতরে নারকেল তেলের বোতল, চিরুণী, সিন্দুরের কৌটা রয়েছে, এখানে নিয়ে আয়, সবাইকে তেল মাখিয়ে দেই।"

বুলু মাসী বলিল, "কলার পাতা মাটির গেলাস এখনো ধোওয়া হয়নি! কতক তেল মাখতে যোস, কতক ওগুলো ধুয়ে রাখ। তাতু যে ঘরকন্নী, তার রাঁধতে আর কতক্ষণ।"

দিদি এক একটিকে ধরিয়া তেল মাখাইয়া দিয়া বলিলেন তোরা চান করে এসে খাবার জায়গা করতে লেগে যা। মেয়েদের স্নান তো নয়স্নান প্রথমে জলে নামিয়াই পিঠালী জল দিয়া একচোট বাঁপুরী খেলা হইল। তাহার পরে ডুব সাঁতার চলিল পুকুরের এপার হইতে ওপার অবধি। চাঁদের পাল জল ছাড়িয়া তীরে পলাইতে লাগিল। পাড়ার পাতিহাঁসের সহিত জমিদারবাড়ীর কয়েকজোড়া রাজহাঁসও নিভৃতে চরিতে আসিয়াছিল। মেয়েদের উন্মাদনায় তারা ভীত হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। বকের ঝাঁক উড়িয়া গেল। গতিক দেখিয়া দিদি ও বুলু মাসীর উচ্চ চীৎকারে জলস্থল মুখরিত হইল—"ও কথা, আবার পাড়ি ধরেছিস? কুসী, উঠে আয় আয় ডুব দিস না। বুড়ি তুলে আন ওদের। ভরত, তোর না সর্দি হয়েছে। অত ডুবছিস কেন? ক্ষীরোদা তোর আর নাল তুলে ধরবার দরকার নেই। শিগগীর চলে আয় বাতাসি, তোকে নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া ধরবে। বর্ষা এখনো কাটেনি, বাবের জলে বেশীক্ষণ থাকলে জ্বর আসবে। সোনা, লক্ষ্মী মেয়ে আর নয় এক্ষুণি চলে এস।"

স্নানপর্ব্বের পরে আহার পর্ব্বের সোরগোল পড়িয়া গেল। চুল্লির চার পাশ ঘিরিয়া আমরা খাইতে লাগিলাম পরিবেশনের ভার লইলেন দুই প্রধানা।

শরতের উদার মধ্যাহ্নকাল, প্রাচীন বৃক্ষের বনপল্লব ভেদ করিয়া প্রখর রৌদ্ররশ্মি বিচ্ছিন্ন হইয়া শ্যামল বনতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে। ফল ফুলের মিশ্রিত সুবাসে বাতাস ভারাক্রান্ত। বন-বনান্তরে ঝরা পাতার নিশ্বাস কান্নাকাটি চলিতেছে, কোথাও ঘুঘু ডাকিতেছে। দোয়েল ডাকিতেছে। সুউচ্চ ছাতিম ডালে লুকাইয়া বৌ কথা কও মিনতি করিতেছে। কিন্তু কই সেই সকরুণ বিলাপে কোন অভিমানী বধূর তো মান ভাঙিতেছে না। দিদি পরিবেশন করিতেছিলেন, আমার পাতের দিকে তাকাইয়া কহিলেন "হাঁরে সোনা তুই যে একেবারেই খাচ্ছিস না? ঝাল লেগেছে?"

"না দিদি ঝাল লাগেনি।"

"তবে কি রান্না খারাপ হয়েছে?"

"না ভালো হয়েছে।" তাতুদি আমার পাশে খাইতে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করিয়া বাঁ হাতে আমার গাল টিপিয়া দিয়া উচ্ছ্বসিত হইল "রান্না ভাল হয়েছে, তাকি ওমনি করে বলতে হয়, সোনা? তোর বুনো না কুণো স্বভাব এখনো গেল না। নিজে রেঁধে নিজের সুখ্যাতি করতে নেই নইলে শিখিয়ে দিতাম কেমন করে প্রশংসা করতে হয়।"

বাগদিদের কুসুম হোড়ন দিল, "শেখানোটা তাতু, সেটা বাকী রাখছিস কেন? ভাল রাঁধুনী বলে দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না।"

"যেমন তোর, ভাল সেলাই জানিস বলে। আমি তো যা জানি লোককে শেখাই, তুই আবার নিজের বিদ্যে পরকে দিতে ভয়ে সারা হয়ে যাস।"

"দেখ তাতু মিছে কথা বলিস নে। যে আমার কাছে সেলাই শিখতে যায়, আমি তাকে কবে না শিখিয়ে দিই?"

বুড়ি খনখনে গলায় টিপিয়া টিপিয়া কহিল, "সত্যি কথা বলতে কি? আমি তোর কাছে সুতোর পাখা বুনতে গিয়ে সাত দিন ঘুরিনি, কুসী?"

অম্বিকা সায় দিল "তুই মোটে সাতদিন। আমি কাঁথার পাড়ের নক্সা নিয়ে ঘুরেছি দশ বারো দিন। গেলেই বলবে আজ না কাল, এখন নয় তখন।"

কুসী রাগিয়া কাঁদিয়া ভাত ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল।

দিদি তাহাকে বুকে চাপিয়া মিষ্ট বাক্যে শান্ত করিতে লাগিলেন।

তাতুদিকেও দিদির নিকট হইতে মৃদু মৃদু তিরস্কার কম শুনিতে হইল না। অনেক সাধ্য সাধনায় কুমী ফের খাইতে বসিল, কণা তাতুদির কাণে চুপিচুপি কহিল "ওই তো গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে তোকে গাল খাওয়ালে। ওর মেজাজ ভাল নেই। তাই ছলছুতো করে কান্না হচ্ছে, আমি যেন জানিনে।"

"ওর কি হয়েছে রে কণা? আমায় বলবিনে?"

"হবে আবার কি ছাই। সেই যে পোরজনা থেকে ওর এক বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল না? কাল তারা দেখেশুনে ওকে না পছন্দ করে গেছে সেই রাগে এত ঝাল।"

তাতুদি কৌতুকের হাসি হাসিতে হাসিতে মাটিতে প্রায় গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম করিল। চাপাস্বরে বার্তা প্রচার হইলেও কুমীর কান তাহা এড়াইতে পারে নাই একে অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবান্তর ঘটনা তাহার পর তাতুদির বিদ্রূপের হাসি কুমী সহিতে পারিল না, দুই চোখে কলহের আগুন জ্বালাইয়া গর্জিতে লাগিল, "অত হাসি মরণ কিসের লো? আমাকে তো তবু দেখতে এসেছিল, তোর যে সে ভাড়ে বালি। নিজে থুবড়ো হয়ে অন্যের সমালোচনায় পঞ্চমুখ।"

তাতুদি তেমনি হাসিমুখেই জবাব দিল "কুলীন কুমারীরা থুবড়ো হয়েই থাকে কুমী, তাতে লজ্জা নেই। আমি তোদের মত বিয়ে-ছাংলা নই। খাই দাই হাসি খেলি, এতেই আমার আনন্দ। বিয়ের দড়ি গলায় পরে ঘাট দরিয়ায় ডুবে মরবার আমার সাধ নেই।"

দিদি চোখ রাঙাইলেন—"নির্লজ্জ কোথাকার, আর বেহায়াপনা কর্তে হবে না। চুপ করে থাক।"

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। খাওয়া দাওয়া হইয়া গেলে ইসেরের খাইতে দিয়া বাকী যাহা ছিল হরি ও ঝিয়ের মাকে বরিয়া দেওয়া হইল।

৪

ফুয়ারা কিছু কবি ভাবাপন্না। সে অনেকগুলি সপুষ্প নাল তুলিয়া প্রত্যেকের জন্য এক একটা নালের ডাঁটার মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছিল

গুরুভোজনের পরে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া কেহ নবীন দুর্বার গালিচায় গড়াইয়া শুইয়া পড়িল কেহ পুকুরের চাতালে, কেহ বা মোটা গাছের কাণ্ডে হেলিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে লাগিল। ফুয়ারা সকলের গলায় মালা পরাইয়া দিতেছিল। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড উত্তাপে শাপলার সুশীতল মালা কণ্ঠে দোলাইয়া আমার শরীর যেন জুড়াইয়া গেল। আমাদের দলের নবীনা সৌখীন বুলু মাসী কেবল মালা গলায় না পরিয়া হাতের সোনার সলাকাটি ও বাজুপোকার গায়ে জড়াইতে জড়াইতে কহিলেন "হাতের কাছে নাল পেয়ে খুব যে মালিনী মাসি হলি ফুয়ারি। মালা দেবার এতই যদি সখ হে না ভাই, একগাছা পদ্মের মালা গেঁথে।"

বুলু মাসীর সাধে তখনই অনেকের সাধ হইল পদ্ম ফুলের। দিদি আপত্তি করিলেন, "জল কাদার ভেতরে ধানের ক্ষেত, পার হতে পার হয়ে এখন দরকার নেই পদ্মফুলের। দুপুর গড়ায় গেছে তাণ্ডবনাচন শেষ করে চল এখন বাড়ী যাই বাবাকে না জানি সোনার জন্য কত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাতুদি বলিল "তুমি সঙ্গে থাকতে রাঙামা ব্যস্ত হবেন না, বেলা গড়িয়ে গেছে না কত? রোদ কী কী করছে বিকেল হবার আগে সান্ত-বার পদ্মবিলে যাওয়া আসা করা যায়। এখুনি তুমি বাড়ী ফিরে করবে কি, দিদি? জামাইবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে ত সেই রাতের আঁধারে।" মুখরা বোনের ইঙ্গিতে দিদির মুখ লাল হইয়া গেল, তিনি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। কুমী তাতুদির হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, "চল তাতু, তোতে আমাতে চোখের পলকে পদ্ম এনে এদের দেখিয়ে দেই। অন্য কারোকে আমরা সঙ্গে নেবো না।"

ভোজনে বসিয়া যাহাদের কলহ হইয়াছিল আচমনের সময় তাহা মিটিয়া গিয়াছে। ইহাদের রাগ অভিমান শরতের মেঘের মত। চকিতে দেখা দিয়া চকিতে মিলাইয়া যায়। বুলু মাসী পদ্মের প্রসঙ্গ তুলিয়া বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া-ছিলেন। এখন তাঁহার উচিত হইল সকলকে নিরস্ত করা

বুলু মাসী বলিতে লাগিলেন "থাক, পদ্ম এনে আজ দরকার নেই, পরে একদিন আনলেই হবে। মুদুকের পাট কেটে জলে জাগ দিয়ে রেখেছে। পচা জলের দুর্গন্ধের ভেতরে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে গিয়ে কাজ নেই।"

কোন কিছুতে বাধা পড়িলে ভাদুদির রোখ আরও প্রবলবেগে বাড়িয়া যায়। সে রহিয়া রহিয়া বলিল, "পাট-পচা জল তো খেতে যাচ্ছি না, তার দুর্গন্ধ কিসের? ওই যে পরাণ মাঝির ডিঙ্গিখানা জোলার ঘাটে বাঁধা রয়েছে, ওটায় গেলে জল কাদা মাড়াতে হবে না, পাট ক্ষেতের ওপর দিয়ে ধানের আল ঘেঁসে সোঁ করে ফুল নিয়ে আসছি।"

বুলু মাসী বলিলেন "তা বেশ হোল, কিন্তু নৌকা বাইবে কে?"

"কেন আমরা বাইব। বিল তো নদী নয়, যেতে হবে মাত্র এক হাঁটু জলের তোলা দিয়ে, লগি ঠেলে বৈঠে নেয়ে। তা আবার পারে না কে?"

দিদি বলিলেন, "পার ভাল। যা ছিপ্পিনা করতে ইচ্ছে চটপট সেরে নাও, কিন্তু অতটুকু ডিঙ্গিতে এ বাহিনী চাপলে ডুবে যাবে না

সকলে সমস্বরে ডিঙ্গির তুলিল "ডুববে কেন? আর জলে কি নৌকা ডোবে? আমরা মাঝখানে চেপে বসবো, ডিঙ্গি নড়বেও না চড়বেও না তরতর করে ছুটে যাবে।"

ধানের বাগান হইতে বিল দূর নয়। কয়েকখানা ক্ষেত অতিক্রম করলেই বিলে পৌছান যায়। তখন চাষী-দের পাটকাটা প্রায় শেষ হইয়াছে। বৈশাখি ধানকাটা আরম্ভ হয় নাই। চারিদিকে হরিৎবর্ণের পাকা ধান, থরে থরে ঢেউয়ের মত নাচাউঠা করিতেছে। বিলের স্বল্পপরিসর মুখ প্রায়ের নদীর সহিত সংযুক্ত। দুই পারে শস্যক্ষেত্র। মাঝখানে অতল জলরাশি নদীর তরঙ্গাঘাতে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। বিলের শেষ সীমায় পদ্মবন। লগির ঠেলায় বৈঠার ধাক্কায় বিলে আসিতে আমাদের দেরী হইল না। উৎসাহে আনন্দে কয়েকটী কিশোরী পদ্মবনে লাফাইয়া পড়িল। আমি মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখিতে লাগিলাম। একি পদ্মবন না নন্দন কানন? ক্ষেতের পারে আলপথে বিলের শেষ অংশ ঢাকিয়া রাশি রাশি রাঙ্গা পদ্ম ফুটিয়াছে। জল দেখা যায় না, মাটি চোখে পড়ে না, শুধু সবুজ পাতা আর লাল পদ্ম। ফুলের উপরে মৌমাছিরা গুণগুণ করিয়া গুঞ্জন তুলিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িতেছে। পদ্ম গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। বিলের বাঁকের গা ঘেঁষিয়া সীতিমুখরা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা। বর্ষার প্রলয়নৃত্য এখনো তাহার ধারে নাই। ঢেউয়ের তালে, দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ করিয়া বড় বড় মহাজনী নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে। নদীর পরপারে অস্পষ্ট গ্রামরেখা। কান্তবর্ষণ আকাশ নত হইয়া নীল রেখায় সমুদ্রে মিশিয়াছে। একটু পরেই তীর হইতে দিদি পদ্মসংগ্রহ-কারিণীদিগকে প্রবলবেগে তাড়না করিতে আরম্ভ করিলেন, "ওরে তোরা উঠে আয়, বেলা যে গেল। ঢের ফুল তোলা হয়েছে, আর না। ওদিকে ধানের কুমী, গর্ত আছে। পদ্মবনে গোখরো সাপের আস্তানা, আর থাকিসনে ওখানে, নৌকায় উঠে আয়।"

বুলু মাসী চীৎকার করিতে লাগিলেন "পাপমুখে এক কথা বের করে আমার হেল পক্ক জ্বালা। এখন তালের তালের পরের মেয়েদের ঘরে ঘরে ফেরৎ দিতে পারলে রক্ষে পাই।"

দুই প্রধানার অনুতাপ আক্ষেপে পুষ্প সংগ্রহ-কারিনীরা বিব্রত হইয়া একে একে নৌকায় আসিয়া আশ্রয় লইল। পদ্মপাতা, পদ্মের চাক দিদি ভাগ বন্টন করিতে লাগিলেন যে পথে আসিয়াছিলাম, নৌকা চলিল সেই পথে। প্রত্যেক এখন দিনের আলো নিভিয়া আসিতেছে। সূর্য ডুবুডুবু। রৌদ্রে ও মেঘে আকাশের পট ভূমিকার রং এর লেখন লিখিতেছে। নৌকার পেছনে গলুইতে বসিয়া ভাদুদি হাঁড় টানিতেছিল, তাহার কোল ঘেঁষিয়া বসিয়াছিল ভরদি। ভরদি যেমন সরল, তেমন শান্ত। বাপ নাই, বড় ভাই নাই। গরীব মা এখনো বিবাহ দিতে পারে নাই। সঙ্কোচে ভরদি কাহারো সহিত সহজে মেশামেশি করে না। দিদি তাহাকে বড় ভালবাসেন। তিনিই আমাদের উৎসবে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন।

লোকে বলে "মরা গাঙে বান ডাকে।" তরঙ্গদিদিরও তাহাই হইল। সে হঠাৎ তাতুদির দিকে শান্ত দৃষ্টি মেলিয়া অনুরোধ করিল, "তাতু একটা গান গা-না, বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে।"

তাতুদির গানের গলা ছিল অপূর্ব। কাহারো গান শোনামাত্র সে তাহা সুর লয়তানে আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিত। সেকালে পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের গানের চলন ছিল না। যাত্রাকণ্ঠের সঙ্গীতে নিশ্চয় কালীতে গ্রাম কালো হইয়া যাইত। তবু যাত্রাদের গাহিতে সাধ তাহারা সম্পূর্ণ নীরব থাকিত না। মেয়ে মহলে, সখীমহলে সুর সরস্বতী বীণা হস্তে সময় সময় আবির্ভূতা হইতেন। তাতুদি গান গাহিতে খুব ভালবাসিত। কেহ গাহিতে বলিলে তাহার আনন্দের সীমা থাকিত না। একবারের বেশী দুইবার বলিতেও হইত না। এক্ষেত্রেও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে হইল না। সে হাতখানা ক্ষীরোদার দিকে ঠেলিয়া দিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে গাহিতে লাগিল—

"সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে ?
কে আছ কাণ্ডারী হেন, কে যাইবে সঙ্গে !"

তরঙ্গদি সহসা আরক্ত হইয়া তাতুদির দুই হাত মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল, "না, না-তাতু ও গান গাস্ নে। আমার নামের গান শুনলে লোকে মন্দ ভাববে। ছি, ছি, কি লজ্জা !"

তাতুদি থামিয়া অবাক হইয়া কহিল, "এমন কথাতো জন্মে শুনিনি, তরঙ্গদি, গানের কথার সঙ্গে নামের কি সম্পর্ক ? তুমি এত বোকা কেন ?"

দিদি বলিলেন, "যদি শুনতে না চায়, তাহলে তুই কি জোর করে ওই গান ওকে শুনাবি ? সবাই বোকা, উনি যত চালাক হয়েছেন ? সবতাতেই ফোড়ন দেওয়া।" দিদির তিরস্কারে গানের বাধায় তাতুদি অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া নির্বাক হইয়া রহিল।

কুনী সরিয়া তাতুদির গায়ে একটা চিমটী কাটিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, "তাতু লক্ষ্মীটী, রাগ করিসনে। যার খুসী শুনবে, যার খুসী না হয় সে কানে আঙ্গুল পুরে থাকুক। তুই আমায় একবার সেই গানটা শুনিয়ে দে রে। সেই যে, আমার যেটা ভালবাসায়।"

তাতুদি মুহূর্তে অভিমান তুলিয়া কলকণ্ঠে ঝঙ্কার দিল—

"যমুনা পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী,
বিনে সেই রাকা শশী রাকা ফুলমণিনি—
শুকাল কমল মালা, ঝরিল বিরহ মালা
কাঁদে যত ব্রজবালা-বিনে-শ্যাম-গুণমনি।"

স্থলে জলে অন্তরীক্ষে পরমুহূর্তে মাখিয়া সেই সুরসুধা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমাদের ডিঙ্গি-খানা আসিয়া ভিড়িল পরাণ মাঝির ঘাটে।

হাসিমাখা, পুলকমাখা বনভোজনের দিনটীর উপর অস্তসূর্য্য প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বিদায় মুহূর্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিল, স্তিমিত রশ্মির অস্তরাগের মহিমায়। সূর্য্য ডুবিলেন।

মুস্কিল আসান

শ্রীসীতা দেবী।

সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল, "ঠক্, ঠক্, ঠক্," অথচ গৃহিনী সুরবালার দুই হাত জোড়া, কালকের সিদ্ধ-করা কাপড়গুলি তখন তিনি কাচিতে ব্যস্ত। দেরী করিলে কলের জল চলিয়া যাইবে। তখন কাচিতে হইলে চৌবাচ্চার জলে টান পড়িবে। বাঙালী হিন্দুর সংসার, মানুষ অনেকগুলি, তার ভিতর ছোট ছেলেপিলে আছে, ঐ এক চৌবাচ্চা জল তো সম্বল, বিকাল চারটে পর্য্যন্ত। কাজেই কাপড় কাচা ছাড়িয়া উঠিতে সুরবালার ভরসা হইল না, তিনি চিৎকার করিয়া ডাকিলেন, "টুকি, ওটুকি, ওরে টোকন।"

কড়াটা আরো অসহিষ্ণুভাবে শব্দ করিল, "ঠক্, ঠক্, ঠক্।" টোকন, টুকি বা শোভাবতী ঘরের ভিতর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, "খুকির কাপড় ছাড়াচ্ছি, যাব কি করে?"

কড়াটা এবার এমন প্রচণ্ড আস্ফালন করিল যে জলের ভাবনা ভুলিয়া, ভিজা হাতে মাথার কাপড় টানিতে টানিতে গৃহিণী গিয়া হড়াৎ করিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বাজারের থলি হাতে ভিতরে ঢুকিতে ঢুকিতে কর্ত্তা রামসদন বলিলেন, "বাড়ীশুদ্ধ সব ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি? কড়া নাড়ছি ত নাড়ছিই আর একটু হলে পুলিশ ডাকতে হত।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "হাঁ, তা আর ঘুমব না? কত আরামের ব্যবস্থা, দাসদাসীতে ঘর ভর্ত্তি! নাও, থলেটা নামাও ওখানে। উনুন ত কতক্ষণ থেকে জ্বলে যাচ্ছে, চাল ডাল সেদ্ধ করে নামিয়ে বসে আছি।"

কর্ত্তা বাজারের থলি উপুড় করিয়া বারান্দায় ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, "এই নাও, এর নাম এক টাকার বাজার।" তখন ঝগড়া করিবার সময় নাই, অপিসের বেলা হইয়া যাইবে, কাজেই রামসদন তাড়াতাড়ি শুইবার ঘরের দিকে প্রস্থান করিলেন। এমন সময় খুকীকে কোলে করিয়া টোকন বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বছর চোদ্দ পনেরো বয়স, তবে মেয়েটি বড় রোগা, ছোট-খাটো দেখিতে। বারো বৎসরের বলিয়া স্বচ্ছন্দে চালাইয়া দেওয়া যায়। খুকীরও বয়স বছর দেড় হইবে, কিন্তু রুগ্ন চেহারা, চোখের দৃষ্টি কাতর, হাত পা সরু সরু, হাঁটিতে পারে না এখনও। টোকন বলিল, "ওর জন্যে কি এনে দেব, ঐ গুলোর সঙ্গে কেচে দেবে?"

গৃহিণীর সকালে মেজাজ কোন দিনই ভাল থাকে না, এক রবিবার ছাড়া। বলিলেন, "হাঁ, এখন আরও কাপড় চেঁচাতে বসি, তাহলে তুপুর পিণ্ডি রাঁধবে কে? তুই বসিয়ে দে দিদি ওকে এখানে, দিয়ে তরকারিগুলো কোট। মাছ আনেনি ত আজকেও? তা আপদ গেছে, তুটো সেদ্ধ পোড়া করে দিয়ে নিশ্চিন্দি। মা, মা, মা, কি আগুনই লেগেছে বাজারে, তুটো মাছ ভাত গিল্‌ছিলাম, তাও পোড়া বিধাতার সইল না।" তাড়াতাড়ি কাপড় কয়খানা নিঙড়াইয়া, উঠানের দড়িতে মেলিয়া দিয়া তিনি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। শোভা খুকীকে পাশে বসাইয়া তরকারি কুটিতে লাগিল, মাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আলু পটোল, কুমড়ো আর মোচা এনেছেন, কোনটা এবেলা হবে?"

মা রান্না ঘর হইতে বলিলেন, "কুমড়ো ভাজা আর আলু পটলের ডালনা কোট্। মোচা কোটবার সময় কোথায় এখন? ওবেলা হবে এখন সে সব। কালকের বেগুন ছিল, পুড়িয়ে রেখেছি, এবেলা এতেই হয়ে যাবে।"

খুকী একটা পটোল হাতে করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল, হঠাৎ সেটা চুসিকাঠির মত মুখে দিয়া চুসিতে আরম্ভ করিল। শোভার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই,

সে আপন মনে তরকারি কুটিতেছিল। মাও রান্না ঘরে, বাবা যে কোথায় তাহার ঠিকানা নাই।

হঠাৎ পটোলের ছিবড়া, গলায় আটকাইয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিল। শোভা ফিরিয়া দেখিল, খুকীর দুই চোখ প্রায় কপালে উঠিয়াছে, সে বমি করিবার চেষ্টা করিতেছে। শোভা ভয় পাইয়া চিৎকার করিয়া ডাকিল, "ওমা, দেখ শীগ্‌গির খুকীর কি হোল।"

ঘরবালা খুন্তি হাতে করিয়াই ছুটিয়া আসিলেন আর সেই সময়ই ঠিক সদর দরজা ঠেলিয়া একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের যুবক ভিতরে প্রবেশ করিল। গৃহিনী খুকীর মুখের দিক চাহিয়াই ব্যাপার কি তাহা আন্দাজ করিয়া লইলেন, বলিলেন, "কি মুখে দিয়েছে বুঝি, তোদের চোখ থাকে কোন চুলোয়?" বলিয়া মেয়ের মুখে আঙুল ঢুকাইয়া তিনি অর্দ্ধচর্ব্বিত পটোলের টুকরাগুলি বাহির করিয়া ফেলিলেন, খুকী বার কয়েক ঢোক গিলিয়া চীৎকার করিয়া সামলাইয়া গেল।

শোভা কাঁদ কাঁদ মুখে বলিল, "আমি কি করব? বটির দিকে না তাকিয়ে তো তরকারি কুটতে পারিনা?"

যুবকটি তাহাদের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার দেখে জগৎ শুদ্ধ অবাক হয়ে যায়, আমি কিন্তু ভাবি একটা শিশুও এদেশে বাঁচে কি করে? বাজারের আনা, না ধোওয়া ঐ পটলটিতে অন্ততঃ ছত্রিশ রকমের রোগের বীজাণু আছেই। মেয়ে দিব্যি সেটা খেয়ে বসে রইল, তোমরাও পরম নিশ্চিন্ত।"

তাহার মা ঝঙ্কার দিয়ে বলিলেন, "পরম নিশ্চিন্ত না হয়ে কি করব শুনি? বাপ বেটার কত রোজগার করে আনছ, যে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের পিছনে একটা করে আয়া রাখব? এক হাতে হাঁবব, বাসন মাজব, কাপড় ঠেঙাব, আবার ছেলে মেয়েও কাঁখে করে বসে থাকব? আমি কি দশভূজা?"

ছেলে সতীশ বলিল, "অন্য দেশের মা-রা পারে কি করে? তারা সবাই তো লাখপতি নয়! আচ্ছা, খুকী কি তেরু নিয়েছে? এটা ও কি পরেছে, ফকিরের আলখাল্লা?"

মা বললেন, "শাটিন, কিংখাব পাব কোথায়, যে পরাব? আমা তো তিনটের ঠেকেছে, দুটো সকালের মধ্যে ভিজিয়েছে, একটা কাল সেদ্ধ করতে দিয়েছিলাম, ঐ পড়িতে ঝুলছে। টোকন তবু তিনটে ছিটের টুকরো আর কাপড়ের পাড় জুড়ে ঐ জামাটা করেছিল, তাই গায়ে একটা কিছু আছে, নইলে ছোটলোকের ছেলেপিলের মত উদোম হয়েই থাকতে হোত। খুকী ত খুকী, আমরাই যে আর দুচার মাস পরে ঘরের বাইরে আসতে পারব না। এবছর একখানা কাপড় যে কিনতে পারব তার তো লক্ষণ দেখিনা।"

সতীশ তাকাইয়া দেখিল, মা শাড়ী যা একখানা পরিয়াছেন, তাহা নামেই শাড়ী টোকনের যে সম্পত্তি তাও বোধ হয়, বর্ত্তমানের নয়, অতীতের। ব্যবহার করিয়া প্রায় রাধিশোভার গামছার আকার ধারণ করিয়াছে মায়ের দিকে তাকাইতেও তাহার কষ্ট বোধ হইতে লাগিল, বলিল, "তোমার কি আর কাপড় নেই? আগে আগে তো পূজোর সময় এক একখানা কাপড় কিনতে, সব কি ছিঁড়ে গেছে!"

কর্ত্তা ভিতর হইতে হাঁকিলেন, "ভাত বাড় গো, ওসব কাপড়ের গল্প এখন থাক।"

গৃহিনী টোকনের কোটা আলু পটলের কাঁশি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "রোস রোস, আর পাঁচটা মিনিট সবুর কর, ডালনাটা করে দিই, নইলে খাবে কি ঘোড়ার ডিম? গল্পই করছি বটে, যা গল্পের দিন পড়েছে—" বলিয়া ছেলের কথার উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

টোকন তরকারির খোসা কুড়াইতে কুড়াইতে বলিল, "মায়ের আবার তোলা কাপড় কোথায়? গেল বছর সেপ্টেম্বর মাসে যে কাপড় কিনেছিলেন, সে ত পূজোর তত্ত্বে দিদিকে দিয়ে দিলেন, বাবা যে আর কাপড় কিনতে পারলেন না। তার আগের বছরেরটা আর ঐ লাল পেড়ে শাড়ী যেটা শুখোচ্ছে, ঐ তো মায়ের কাপড়। আমার তবু চারখানা শাড়ী আছে বলে ঐ পুরনোটা মাকে দিয়েছি, রান্না ঘরের সব কাজ ঐটে পরেই করেন।

সতীশ একটু যেন ভীত ভাবেই বলিল, "বাবারও আর কাপড় নেই নাকি? তাই ত।"

টোকন বলিল, "সেই দিদিমার কন্যা পাড়ের গয়দের শাড়ীটা আছে, সেই বেটা পরে সেবার স্নানদান করে এলেন। আগে শুধু বাবার ধুতি মাঝখানে ছিঁড়ে গেলে মা তা দিয়ে, ছেঁড়া শাড়ীর পাড় বসিয়ে পরতেন। এখন বাবা ধুতি দিতেই চান্না, বলেন, "রিপু করে দাও, আমি পরব, আপিসে ত আর তেলচিটকুট একখানা ধুতি পরে বারবাস যেতে পারি না?"

এমন সময় রামসদন স্নান সারিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ানোতে ছেলেমেয়েদের কথা থামিয়া গেল। টোকন মাকে ডাকিয়া বলিল, "মা, বাবার চান হয়ে গেছে, ভাত দাও।" বলিয়া সে বড় একখানা পিঁড়া আনিয়া পাতিয়া দিল, জলও এক গেলাস গড়াইয়া আনিল। সুরবালা কাঁসার থালায় ভাত তরকারি, ডাল ও বেগুন পোড়া আনিয়া নামাইয়া দিলেন, রান্নাঘরে ফিরিয়া গিয়া একবাটি ডাল আনিয়া রাখিলেন।

রামসদন বেগুন পোড়া দিয়া ভাত মাখিতে মাখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেগুন আবার কোথা থেকে এল? বেগুন ত আজ আনিনি।"

গৃহিণী বলিলেন, "কালকের ছিল একটা, তাছাড়া চৌবাচ্চার পিছনে যে গাছ করেছি, তাতেও একটা ফলেছিল যে।"

কর্ত্তা বলিলেন তা সবটাই আমাকে দিয়ে দিয়েছ নাকি? ছেলে, মেয়ে, তুমি, তোমরা খাবে কি দিয়ে?"

গৃহিণী ভাজিলা ভরে মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "খাবে এখন যা দিয়ে পারে! একটু মাছ নেই, দুধ নেই, তরকারিও যদি দুটো পাতে না পড়ে, তবে কি খেয়ে সারাদিন এত খাটুনি খাটবে? বয়স ত বাড়ছে বই কমছে না?"

কর্ত্তা আর কথা আর বাড়াইলেন না, কথাটা নিতান্ত বলিতে হয় তাই বলিয়াছিলেন। খাওয়া দাওয়া বিষয়ে গৃহিণী চিরকালই তাঁহার দিকে পক্ষপাতিত্ব করেন, ইহা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, এবং মনে মনে তাহাতে তাঁহার আপত্তি কিছুই ছিলনা। জুটিলে সকলেই ভাল খাক্ ও পরুক ইহা তিনি অবশ্যই চাহিতেন, কিন্তু না জুটিলে যে পরটা দুঃখ দেয়, তাহাকে অন্ততঃ ঘাস জলটা যেমন করিয়া হউক একটু ভাল দিতে হইবে বই কি?

গৃহিণী একটুক্‌রা পাতিলেবু হাতে করিয়া আবার রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। টোকনকে তাড়া দিয়া বলিলেন, "খুকীর জামাটা তুলে পেছনে একটা সেলাই দিয়ে দিস্‌নি কেন? এমনি ওটাও ছিঁড়বে ত? বেটা না নিজে দেখব সেখানেই আমার হেরাদ্দ হবে।"

খুকীকে কোলে তুলিয়া টোকন তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। টোকনের উপর তাহার মায়ের কেমন যেন অহৈতুক বিরাগ আছে, তাহাকে সামনে দেখিলে তিনি না বকিয়া থাকিতে পারেন না। অথচ মেয়েটি শান্ত এবং কর্ম্মপটু, সারাদিনই সবকাজে মাকে সাহায্য করিতেছে।

বাড়ীতে থাকিবার ঘর তিনটি, আড়াইটিও বলা চলে। বাহিরে রাস্তার উপর যে ঘরখানি, তাহা বৈঠকখানা ও সতীশের শয়নকক্ষ রূপে ব্যবহৃত হয়। ভিতরের দিকের বড় ঘরখানিতে গৃহিণী থাকেন কন্যাদ্বয় ও স্বামীসহ। আর একখানি যে ছোট ঘুপলির মত ঘর আছে, তাহাকে ঠাকুর ঘর ও পূজোর ঘর এই উভয় ভাবেই ব্যবহার করা হয়।

টোকন বাহিরের ঘরে গিয়া দেখিল দাদা তাহার কাপড়ের বাক্স তক্তপোষের উপর উপুড় করিয়া ঢালিয়া ফেলিয়া কি যেন খুঁজিতেছে। টোকন বলিল, "কি খুঁজছ দাদা? বাক্স গোছাচ্ছ নাকি? কোথাও যাবে বুঝি?"

সতীশ আই, এ, পাশ করিয়া আর পড়িবার সুবিধা করিতে পারে নাই। বাপ সামান্য মাহিনায় কাজ করেন, আজকালকার দোরস্ত মাগ্যিগণ্ডার দিনে সংসার একটা চালান তাঁহার ক্ষমতায় কুলায় না। তাহার উপর বড় মেয়ে বিভার বিবাহে কিছু দেনা করিয়াছেন, এবং বছর তিন আগে কনিষ্ঠ পুত্রটি মারা যাওয়ায় সময় খরচের মাত্রা আরও একটু বাড়িয়াছে। কাজেই সতীশ এখন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া জীবন বীমার দালালি করে ও সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পড়ায় বা পড়ানোর ভান করে। তাহার যা বিদ্যা

তাহাতে কেরাণীগিরি করিলে মাসে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ টাকার বেশী ঘরে আসিত না, এতে শুধু শ'খানেক টাকা সে উপার্জন করে। কোন ক্রমে কায়ক্লেশে সংসার চলে, তবে বিপদে আপদে পড়িলে আর উপায় থাকে না। গৃহিণীর গায়ে যা দু-চার খানা গহনা ছিল, তাহার কিছু গিয়াছে বড় মেয়ের বিবাহের সময়, বাকী গিয়াছে ১৩৭৫ এর মহা মন্বন্তরের কল্যাণে। এখন তিনি শাঁখা পরিয়া থাকেন এবং টোকন দুগাছি ব্রোঞ্জের চুড়ি পরে! এতদিনে তাহার বিবাহের কথা নিশ্চয়ই উত্থিত, তবে অভাব এখন তাহাদের বক্ষে এমন ভাবে পাষাণ ভার চাপাইয়া দিয়াছে যে মেয়ের বিবাহের কথা মুখে আনিতে মা বা বাবা কেহই আর ভরসা করেন না। সম্প্রতি এই কাপড়ের দুর্ভিক্ষ তাহাদের অত্যন্তই ভাবিত করিয়া তুলিয়াছে। বাবু এবং বড় ছেলে ইহারা বাহিরে কাজে যায়, মানমর্যাদা রক্ষা করিয়া তাহাদের চলিতে হয়, হাজার হউক তাহারা ভদ্রলোকের ছেলে। মেয়েরা বাড়ীতে থাকে, কিন্তু বস্ত্রের প্রয়োজন তাহাদের পুরুষের চেয়ে বেশী বই কম নয়। হাজার সংক্ষিপ্ত করিলেও শাড়ী ও সেমিজ না হইলে চলে না। রামদহন চোখ বুজিয়া থাকেন, গৃহিণী বেশী বাকাব্যয় প্রয়োগ করিলে কানও দেন। গৃহিণীর উপায় নাই, তিনি অক্ষম স্বামীকেই ধোঁচান, কর্তারও উপায় নাই কারণ বাজারে কাপড় নাই, এবং চোরাবাজারে কিনিবার মত টাকা তাঁহার নাই, কাজেই চুপ করিয়া শুনিয়া যান এবং স্ত্রী কন্যার দিকে তাকান না। সতীশের এতদিন ধারনা ছিল যে যত ভাবনা তাহার এবং তাহার বাবার। স্ত্রীলোক মাত্রেরই বাক্স বোঝাই পোষাকী শাড়ী ও জামা থাকে। সুতরাং মা, খুকী ও টোকন ইহাদেরও নিশ্চয়ই আছে। আজ কিন্তু প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সে বড়ই ভড়কাইয়া গিয়াছে। ইহাদের গতি হইবে কি? অন্ততপক্ষে সে এবং তাহার বাবা পাজামা, হাফপ্যান্ট প্রভৃতি পরিয়া লজ্জা নিবারণ করিতে পারে, কাজেও বাহির হইতে পারে, তাহার কিছু কিছু ব্যবস্থাও সে করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মেয়েদের কি উপায়? কাপড় যে এবৎসর জুটিবে তাহার কোন লক্ষণ ত সে দেখিতেছেনা।

বোনের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল, "আমার ছুটো উর্দ্দি ছিল তাই খুঁজছি। আজকাল উর্দ্দি তো বেশী কেউ গায় দেয় না, তোদের কোন কাজে লাগে ত নিয়ে নে।"

টোকন বলিল, "কই দেখি, সেই কটকের একটা ত ছিল, আর একটা আবার কি রকম?"

উর্দ্দি বাহির হইল, একটি উড়িষ্যার জিনিষ, সরু সুগার পাড় দেওয়া একটি শান্তিপুরের, তাহারও সুগার বন্যা কাটা পাড়।

টোকন বলিল, "কটকের চাদরটায় আমার আর রায়ের ব্লাউজ হতে পারে। খুকীরও সেমী হতে পারে, বেশ মোটা খোল। শান্তিপুরেরটা যা ক্যারকেরে, ও আমাদের কোন কাজেই লাগবে না।"

সতীশ বলিল, "তবে তাইতেই নিয়ে যা, এটা থাক এখন। তোর চরকা টরকা ধর বাপু, দেশের লোকের যদি সুবুদ্ধি থাকত ত অনেক আগেই মহাত্মাজীর কথা শুনে চলত তা'হলে কি আর এত লোক না খেয়ে মরে না কাপড়ের অভাবে মানুষকে গলায় দড়ি দিতে হয়? দেখ সুতো কাটতে পারিস যদি ত চরকা একটা যোগাড় করি।"

টোকন বলিল, "কেউ কি বসে দিলেই পারি। সারা দুপুর ত বসেই থাকি, ইস্কুলও যাইনা, কিছুই না।"

মা বাহির হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "তোরা চান করে নে দেখি বাপু, আমার রান্নাবান্না হয়ে গেছে। তোদের খাওয়া হলে তবে আমি নিশ্বেস নেবার ফুরসৎ পাই। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সব জড় করে রেখেছি, আবার সেদ্ধ করে কাচতে হবে।"

সতীশ বাক্স বন্ধ করিতে করিতে বলিল, "দু-একখানাও কি যোগার বাড়ীতে দেওয়া যায় না? এ রকম করলে তুমি টিঁকবে কদ্দিন?"

মা বলিলেন, "পুরোনো জিনিষ সব, ঝাঁঝরো হয়ে রয়েছে। ও মুখপোড়াদের হাতে দিলে এমন পিটি চটকে দেবে যে তার আর কিছু থাকবে না। ও নিজে কাচাই ভাল।"

সতীশ বলিল, "আচ্ছা, সেদ্ধ করে রাখ, ওবেলা আমি

যখন ফিরব, স্নান করবার আগে কেচে দেব।" সুরবালা বলিলেন, "হাঁ তা আর কাচবে না? সারাদিন রোদে রোদে টো টো করবে, সকাল সন্ধ্যা ছেলে পড়াবে, তার ওপর আবার কাপড় কাচবে, রান্না করবে, বাসন মাজবে। রক্ষে কর বাপু, আমি এখনও এমন শহুরে বিবি হইনি যে স্বোয়ামী পুত্তর কাপড় কাচবে, রাঁধবে আর আমি পায়ের ওপর পা দিয়ে পটের বিবি হয়ে বসে থাকব।"

সতীশ বলিল, "পটের বিবি হতে যাবে কেন, হবার অবসরই বা কোথায়? কাজ বেশী বেড়ে গেলে, সবাই ভাগাভাগি করে করবে এতে লজ্জার কি আছে? এত সব দেশেই করে। বাংলা দেশেও মেয়েরা কত জায়গায় রোজগার করে পয়সা আনছে তবে সংসার চলছে, এত দেখতেই পাচ্ছি।"

তাহার মা বলিলেন, "তা করছে ত করছে। আমি আগে শামলা মাথায় দিয়ে আদালতে বেরই, তারপর তুমি যেমেলের কাজ করতে বোসো, এখন খেয়ে নাও দেখি।"

সতীশ স্নান করিতে গেল। মা টোকনের হাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোর হাতে ওটা কিরে? সতের উড়ুনিটা?"

টোকন বলিল, "দাদা বের করে দিল যে। বল্লে, সে পরে না, আমরা কেটে যেন জামা তৈরী করে নিই।"

মা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, "তোমার আর খুকীর জামা সেলাই কর বাছা, আমার অত জামা জোড়া পরবার অবসর কোথা? বলে শাড়ীই জোটে না।"

সতীশ খানিক পরে স্নানাহার করিয়া বাহির হইয়া গেল। পাড়ারই কিছু দূরে একটা কেস আছে, আজ দুপুরে সে ভদ্রলোক বাড়ী থাকিবে বলিয়াছে, এই সময় গিয়া দেখা করা দরকার। হাজার পাঁচেক টাকার একটা কেস দিতে পারিলে, কয়েকটা টাকা অন্ততঃ হাতে আসে। শোনা যাইতেছে অনেকে পূজা হইতে সস্তা দরে ভাল ভাল কাপড় কিনিয়া আনিতেছে। তাহার একজন পরিচিত ভদ্রলোক সপরিবারে পূজা গিয়াছেন, তাহাকে গোটা কতক টাকা পাঠাইয়া দিলে হয়তো তিনি একজোড়া শাড়ী কিনিয়া আনিতে পারেন।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া সে সদর দরজার কড়াটা প্রথম মৃদুভাবে নাড়িল। কেহ সাড়া দিল না। সতীশ আরো জোরে শব্দ করিল। এই সময়টা সকলে স্নানাহারে ব্যস্ত থাকে, ঠিক দেখা করিতে আসিবার উপযুক্ত সময় নয়, অথচ ভদ্রলোক এই সময়েই আসিতে বলিয়া দিয়াছে, অন্য কোন সময় তাহাকে বাড়ী পাওয়াই যায় না। কাজকর্ম আছে, তাহা ছাড়া পাড়ার তাস খেলার আড্ডার সে একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। একটু ফাঁক পাইলেই সেখানে গিয়া হাজির হয়।

হড়াৎ করিয়া দরজাটা খুলিয়া গেল। সতীশ তাকাইয়া দেখিল একটি পনেরো ষোলো বৎসরের মেয়ে দাঁড়াইয়া আছে। তরুণ যুবকের চোখ, সর্ব্বাগ্রেই দেখিয়া লইল যে মেয়েটির চেহারাখানি বেশ। রং ফরসা নয় বটে, তবে বেশ সুশ্রিষ্ঠ শ্যাম। বেশ পুরন্ত গঠন, চোখ দুটি ভারি সুন্দর। অন্যদিন হইলে এই পর্য্যন্ত দেখিয়াই সে ক্ষান্ত হইত, আজ কিন্তু বস্ত্র সমস্যাটা সকালেই তাহার চোখে বড় উৎকট হইয়া দেখা দিয়াছিল তাই সে আরো তাকাইয়া দেখিল যে মেয়েটি একখানি মযূরকণ্ঠী রঙের নূতন শাড়ী পরিয়াছে, গায়ের জামাটাও মনে হইল নূতন। তাই ত, নূতন শাড়ী জামা পরিয়া এমন মানুষও তাহা হইলে এখনও কলিকাতার মধ্যবিত্ত ঘরে আছে?

মেয়েটি বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া, সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "ভানু বাবু বাড়ী আছেন?"

মেয়েটি বলিল, "এই খেতে বসেছেন, আপনি বসুন, তিনি আসবেন এখুনি।" বলিয়া বসিবার ঘরের দরজা খুলিয়া তাহাকে বসাইয়া, সে আবার ভিতর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। সতীশ বসিয়া বসিয়া কি যে ভাবিতে লাগিল তাহা সেই জানে। মিনিট পাঁচ সাত পরে আর একটি যুবক ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গেল, সবে খেতে বসেছিলাম, কাজেই মা ত উঠতে দিলেন না।"

সতীশ বলিল, "খেতে বসে উঠতে যাবেন কোন দুঃখে ? আমার এত কিই বা তাড়া ? কেন এসেছি তাও জানেনই, আমার "ক্ষীর-টা" কেমন লাগল ?"

যুবক মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "লাগল ত ভালই, কিন্তু জানেন তো আজকাল স্পেয়ার করবার মত টাকা ক'টা মানুষের বা আছে ? একদল ফুলে উঠছে দেশের লোকের রক্ত শুষে, আর একদলের কণ্ঠাগত প্রাণ উপস্থিত হয়েছে। যাও বা একরকম করে চলে যাচ্ছিল তা এক খুড়তুতো বোনের বিয়ের তাড়া লেগেছে, কোথা দিয়ে যে কি হবে তা বুঝতেই পারছি না।"

সতীশ বলিল, "এমন দিনে বিয়ে ? টাকার কথা ছেড়েই দিন, এখন ত টাকা খরচ করলেও জিনিষ পাবেন না, খাবারও না, কাপড়ও নয়

ভানু বলিল, "চন্দ, মৃদুং, বিবাহ, এত আমাদের ঠেকাবার সাধ্যি নেই, এ হবেই। টাকা থাকলে আবার কোন কাজ কি আটকায় মশায় ? যেমন না টাকা, তেমনি খাবার চান এনে দিচ্ছি, কাপড়ে আপনার ঘর মুড়ে দিতে পারি, এখানে না পাই অন্য Province থেকে নিয়ে আসব।'

সতীশ বলিল, তা বটে, টাকার অসাধ্য কোন জিনিষই নেই, এক মানুষের পরমায়ু টাকায় কেনা যায়না, আর বোধহয় সবই যায়। তা আমাকে কি একেবারেই নিরাশ করবেন ?"

যুবক বলিল, "না, না, তা কর্‌ব না, কতদিন ছোল কথা এক রকম দিয়েই রেখেছি, আপনিও ঘোরাঘুরি কম করলেন না। নিজে খেটে খাই মশায়, খাটুনির মূল্য বুঝি। তবে পাঁচ হাজারের এখন হবেনা, দু হাজারের এখন করছি, তিন হাজারের আসছে বৈশাখ মাসে করব, তখন একটা increment পাবারও আশা আছে, এবং এসব বিয়ের উৎপাত ও নিশ্চয়ই ততদিনের মধ্যে চুকে যাবে।"

সতীশ বলিল, "বিয়ের কি ঠিক হয়ে গ্যাছে ? কোন কালে হবে ?" ভানু হাত উল্টাইয়া বলিল, "ঠিক আবার কোথায় ? ওরা ত এসেই পৌঁছল সবে কাল। এখানে ত থাকেনা, থাকে সম্বলপুরে। ওর মায়ের বড় ব্যারাম খারাপ, তিনি মহা কান্নাকাটি লাগিয়েছেন যে যেমন করেই হোক্ তিন-চার মাসের মধ্যে মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে, তা না হলে তাঁর দেখে যাওয়া হবেনা। এখন "যাও" বললেই ত আমাদের মেয়ে বিয়ে দেওয়া যায়না ? তাও যদি টাকার জোর থাকত, কি মেয়ে যেন কয়লা-টয়লা হত, তা না হয় কথা ছিল। কিন্তু কাকা ত আর পয়সা রাখেন নি কোনদিন, আর মুরুব্বী ধরেছেন আমাকে, যেন "বারো উপোসীর ঘরে তের উপোসীর নেমতন্ন।" অবশ্য আমাকেও ছেলেবেলা উনি খুবসাহায্য করেছেন, নইলে আমি পড়াশুনো করতেই পারতাম না। সাহায্য করতে পারলে ত খুশী হয়েই করি, কিন্তু অবস্থা কই ? ধারটার করতে হবে দেখছি শেষ পর্যন্ত "

খুড়তুতো বোনের সম্বন্ধে ভানুর সহিত আর একটু আলোচনা করিবার ইচ্ছা সতীশের ছিল। কিন্তু সে অনাত্মীয় মানুষ, ভানু কিছু মনে করিতে পারে। কাজেই সে কাজের কথা পাড়িল, বলিল, "তা form-টা আজ fillup করে দেবেন নাকি ?"

"হ্যাঁ দিচ্ছি, কলমটা আনি।" বলিয়া সে চট্ করিয়া একবার ভিতরের ঘর হইতে ঘুরিয়া আসিল। লিখিতে লিখিতে বলিল, 'ইনসিওরেন্সের দালালীর সঙ্গে সঙ্গে ঘটকালির ব্যবসা যদি খোলেন ত এক ঢিলে দুই পাখী মারা হয়ে যায়। ঘোরাঘুরি ত সারাক্ষণই করছেন। বিয়ের যোগ্য পাত্র কোথায় আছে, কেমন চেহারা, কেমন স্বাস্থ্য, কত রোজগার করে সব আপনাদের নখদর্পণে, সহজেই আপনারা করতে পারেন, পাত্রীপক্ষ কমিশন দিতেও ত্রুটী করবে না।"

সতীশ বলিল, "কি রকম পাত্র চান আপনি ? দু'একটা সন্ধান হয়ত দিলেও দিতে পারি।"

ভানু বলিল, "কি রকম আর, রাজপুত্তুর চাইনা নিশ্চয়ই। নিজেদের দিকটাও ভুলে গেলেত চলবে না ? মেয়ে শ্যামবর্ণ, তবে কুৎসিত নয়, আমার চোখে ত তার চেহারাটা ভালই লাগে। আপনি ত তাকে দেখলেন একটু আগে, ঐ যে মেয়েটি আপনাকে দরজা খুলে দিয়ে গেল। পড়াশুনা খুব বেশী দূর করেনি, সেকেণ্ড ক্লাস

অবধি স্কুলে পড়ে এখন বাড়ীতেই বসে আছে। অসুখ বর কাজেই কাজকর্ম খানিক খানিক শিখেছে। গান করতে পারে, গলাটী বেশ মিষ্টি আছে।"

সতীশ বলিল, "পাত্র কি রকম চান তাত কৈ কিছু বললেন না।"

ভানু বলিল, "ওই খেতে পরতে দিতে পারে আর দুশ্চরিত্র মাতাল না হয় তা হলেই চলবে। মেয়ের বয়স অল্প, সুতরাং পাত্রের বয়সটাও ত্রিশের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

সতীশ উঠিয়া পড়িল, বলিল, "দেখা যাক্, বর পাওয়া অসম্ভব হবেনা। ছেলের বিদ্যাবুদ্ধি কতদূর হওয়া দরকার?"

ভানু বলিল, "আরে মশায় রাখুন আপনার বিদ্যে। কত এম, এ, পাশ ছোকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, মাসান্তে একটী পয়সা আনিতে পারেনা। যে ছেলে রোজগার করে খাওয়াতে পারবে তারই বিদ্যে বুদ্ধি আছে বলে ধরে নিতে হবে। মেয়ে ত আর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার নয়, যে মহাপণ্ডিত বর না হলে ঠেকিয়ে যাবে?"

সতীশ বলিল, "বেশ, কাল না হয় পরশু আবার আসব আপনার কাছে।"

ভানু বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, যখনই দরকার হবে, আসবেন। ছেলে আছে বাকি কেউ আপনার হাতে? আর দেখুন ঐ কেসেও যে কমিশনের কথা বলছি সেটা সবটাই ঠাট্টা নয়। কমিশন্ নিশ্চয়ই পাবেন, সোজাসুজি না হোক ঘোরানো পথে।"

সতীশ বলিল, "কয়েকটি ছেলের নাম মনে পড়ছে, ভাল করে একটু খোঁজ খবর নিয়ে তবে আপনাকে বলব।"

সতীশ ভানুকে নমস্কার করিয়া বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল, সর্বপ্রথম যে ছেলের নাম তাহার মনে জাগিতেছে সে ত সে স্বয়ং। তাহাদের অবস্থা ভাল নয়, কষ্টেই সংসার চলে, এক্ষেত্রে তাহার কি বিবাহ করা উচিত? কিন্তু এখন সে যতটা খাটে, তাহার চেয়ে অনেক বেশী খাটিবার ক্ষমতা তাহার আছে। ঐ লক্ষ্মীর মত মেয়েটি যদি আসিয়া ঘর আলো করে তাহা হইলে মনের আনন্দে সে খাটিতে পারে। ভানুরও ত বিবাহ হয় নাই, টোকন মেয়ে ত মন্দ নয়, একটু রোগা বটে, কিন্তু দেখিতে খারাপ তাহাকে কেহই বলিবে না। ভানু যদি কোন দাবি দাওয়া না করিয়া টোকনকে বিবাহ করে, তাহা হইলে সে মেয়েটিকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। কি নাম মেয়েটির কে জানে? কিন্তু ভানুরাও যদিও বড়লোক কিছুই নয়, তবু সতীশদের চেয়ে তাহাদের অবস্থা কিছু ভাল বলিয়া মনে হয়। সতীশকে তাহারা যোগ্য পাত্র মনে করিবে কি?

সতীশ এক এক করিয়া নিজের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যতগুলি যুক্তি আছে সব মনে মনে আবৃত্তি করিয়া গেল। স্বপক্ষে তাহার অনেক কিছু বলিবার আছে। সে ভদ্রবংশের ছেলে, সচ্চরিত্র এবং বাঙালী ছেলের পক্ষে সুস্থ ও সবল। পড়াশুনা সে বেশীদূর করে নাই বটে কিন্তু সে কাহারও গলগ্রহ নহে, স্বাধীন ভাবে উপার্জ্জন করে এবং আয় ক্রমশই বাড়িতেছে। তাহার পিতা বিশেষ বৃদ্ধ নন, তাঁহার বয়স আট চল্লিশ বৎসর মাত্র, তাও অপিসে লেখান আছে পঞ্চান্নিশ, সুতরাং এখনও অন্তত দশ বৎসর কাজ করিতে পারিবেন বাঁচিয়া থাকিলে। তাহাদের পরিবার বড় নয়, টোকনের যদি বিবাহ হইয়া যায় তাহা হইলে বাকি থাকিবে খালি খুকী। সুতরাং সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে এমনই কি সে মন্দ ছেলে? মেয়েটিও ত কিছু লাখপতির মেয়ে নয়? ভানুর কথায় ত মনে হইল না যে মেয়ের বাবার আধপয়সাও আছে।

বিপক্ষে অবশ্য তাহাদেরও বলিবার যে কিছুই নাই এমন নহে। সে বাড়ীর একমাত্র ছেলে, বোন তিনটী, তাহার একটীর মাত্র বিবাহ হইয়াছে। সে বিবাহেরও এখনও বারশোধ হয় নাই। তাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল নয়, ঘরে যে মেয়ে আসিবে, তাহাকে চিরকালই খাটিয়া খাইতে হইবে, পায়ের উপর পা দিয়া আরাম করিতে কোন দিনই হয়ত পাইবে না।

তাহাদের বাপ বেটার চাকরী মাত্র সম্বল, বাড়ীঘর জমিজমা কোথাও কিছু নাই। বিদ্যার দৌড় তাহারও বেশীদূর নয়।

সতীশ বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, দরজায় ধাক্কা দিতে

টোকন আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বলিল, "দাদা, তুমি এখন বাড়ী থাকবে না বেরিয়ে যাবে?"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন রে?"

"তা হলে আমি সুবালাদির কাছ থেকে একটা ব্লাউজ আর একটা ফ্রক কাটিয়ে নিয়ে আসতাম। মা এখন ঘুমচ্ছেন, খুকীকে তুমি যদি একটু দেখ।"

সতীশ বলিল, "আমি চারটের পর বেরব, তুই এখন যেতে পারিস।" সে গিয়া নিজের ঘরে তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল। মিনিট দশেক পরে নিদ্রিতা খুকীকে তাহার পাশে শোয়াইয়া দিয়া টোকন কাপড় ও কাঁচি হাতে পাশের বাড়ী যাত্রা করিল। সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া সতীশ আবার খুকীর পাশে আসিয়া শুইয়া পড়িল। কত রকম ভাবনা যে তাহার মাথায় তাল পাকাইতে লাগিল তাহার ঠিকানা নাই। আর কেহজন মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করিলে মন্দ হইত না, কিন্তু কাহাকেই বা এ কথা বলা যায়। বোনদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে বড় তাহাকে বলা যাইতে পারে, তাহার এসব বুঝিবার মত বয়স হইয়াছে বটে, কিন্তু সে ত থাকে বহুদূরদেশে। গরীব কুটুম্ব, তত্ত্ব-তালাস খুব বিধিমত করিতে পারেন না বলিয়া সতীশদের সেখানে তত আদর নাই। সুতরাং পারতপক্ষে সতীশ কখনও আভার শ্বশুর বাড়ী যায় না। ভগীপতিটি অবশ্য বেশ ভদ্র ছেলে, তাহার সহিত সতীশের ভালই বনে। তাহাকে কাছে পাইলে একটু আলোচনা করা যাইত। বিকালে বাহির হইয়া তাহার একটু খোঁজ করিতে হইবে।

বিকাল হইতেই একটু চা খাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। ভগীপতির আপিসে গিয়া সোজা উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া পাড়ারই একটা চায়ের দোকানে গিয়া বসিল। দুজনের মত জলখাবার ও চা ফরমাশ করিয়া বলিল, "দেখ হে, বিশেষ একটা প্রয়োজনে তোমার সঙ্গে আজকেই আমার পরামর্শ করা প্রয়োজন। আটকে রাখলাম তোমাকে, আড্ডা একটু চটবে, আশা করি তুমিও চটছ না?"

ভগীপতি নিখিল তাহার চেয়ে বয়সে বড়, তারপর সে বিবাহ করিয়াছে চার বৎসর আগে। অতএব একটু মুরুব্বীআনা চালেই বলিল, "বিশেষ দরকার? প্রেমে পড়েছ বুঝি?"

সতীশ বলিল, "পড়িনি এখনও, তবে পড়তে আপত্তি নেই।"

নিখিল বলিল, "একটু খুলে বলতে হচ্ছে।"

সতীশ খুলিয়াই বলিল। সব শুনিয়া নিখিল বলিল, "এ ত ছেলেমানুষি কাণ্ড। তোমার মা বাবাকে না জানিয়ে সোজাসুজি ছেলে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব করা ত ভাল দেখাবে না।"

সতীশ বলিল, "তাদের বলতে বারণ করছে কে? মোটামুটী স্কীম'টা তোমার কেমন লাগছে, তাই বল না।"

নিখিল বলিল, "স্কীম ত ভাল, এখন তাঁদের কাছে ভাল লাগলেই হয়। তাদের কাছে কথাটা আমিই পাড়ব, আমি ছোকরাকে চিনি, তার মার কাছে কথাটা আভাকে দিয়ে বলালেই ভাল।"

সতীশ বলিল, "তা কাল বিকালে গিয়ে আমি আভাকে নিয়ে আসতে পারি। তুমি যদি আগে ভাগে সব ব্যবস্থা করে রাখ।"

নিখিল তাহাদের বৌ বাপের বাড়ী যাইবার নাম করিলেই তাহার মা চটিয়া যাইবেন। সে একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "থাক তুমি আর কষ্ট করবে কেন? কাল বিকালে আমাদের বেরবার কথাই আছে, সিনেমার বাবু বলে ধরেছিল, মাও তাই জানেন। তা সিনেমা আর একদিন হবে এখন, কাল তোমাদের ওখানেই যাওয়া যাবে।"

আরও দুই চার কথার পর নিখিল বাড়ী চলিয়া গেল, সতীশও অন্যদিকে চলিল, দুইচারজনের সঙ্গে তাহার আরো দেখা করা দরকার ছিল। হাঁটিতে হাঁটিতে ভাবিতে লাগিল, নিজের বিবাহের ব্যবস্থা এভাবে করায় মা বাবা কিছু মনে করিবেন কিনা। কিন্তু শুধু ত তাহার নিজের বিবাহ নয়, টোকনের বিবাহের ব্যবস্থা সে করিতেছে, এবং মনে মনে যে রকম সে প্ল্যান্ করিয়াছে, তাহা কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, মা বাবার খুশী

হওয়াই উচিত। তাঁহাদের অসুবিধা কিছুই হইবে না, সুবিধা হওয়ারই কথা।

• •

পরদিন বিকালে হঠাৎ মেয়ে ও জামাইকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সুরবালা অবাক হইয়া গেলেন। বলিলেন, "এস বাবা এস, কই আগে ত আসবার কথা কিছু শুনিনি?"

আভা হাসিয়া বলিল, "কেন খবর না দিয়ে আসতে নেই বুঝি? আমি ত আর কুটুম না।"

এ বিষয়ে সুরবালার অনেক বক্তব্য ছিল, কিন্তু জামাই সামনে দাঁড়াইয়া থাকাতে, কিছু বলিতে পারিলেন না। তাহাদের আদর করিয়া বসাইলেন, এবং তাড়াতাড়ি চা খাওয়াইবার যোগাড় করিতে লাগিলেন।

চা খাইয়া সতীশ ও নিখিল কোথায় যেন বাহির হইয়া গেল, রান্নাঘরে মায়ের কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া আভা তখন মুখ ছুটাইয়া দিল

সুরবালা সব শুনিয়া বলিলেন, "তা আমার আর কি আপত্তি বাছা? টোকনের বিয়ের ভাবনা কি আমায় কম মনে করিস? মুখে কিছু বলিনা বটে, বলে করব কি? জানি তো উপায় নেই। কিন্তু ভাবনায় আমার রাত্তিরে ঘুম হয় না! আর সতে বিয়ে করলে ত ভালই, আমি ত আর একলা হাতে এত খাটতে পারিনা। গেরস্ত ঘরের মেয়ে, কাজকর্ম জানে এমন হলেই আমাদের গরীবের ঘরে মানায়। তা মেয়ে দেখতে কেমন?"

আভা বলিল, "দাদা ত বলে বেশ সুন্দর।"

সুরবালা ঠোঁট দুটা একটু কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হ্যাঃ তোমার দাদা ত কত জানে। আমি মুড়ীওয়ালীটাকে পাঠাব দেখতে, ওপাড়ার সব বাড়ীতেই যায়।"

ভানুর কাছেও কথাটা উঠিল! সতীশকে তাহার পাত্র হিসাবে খুব লোভনীয় মনে না হইলেও একেবারে অযোগ্য মনে হইল না। পণ চাহনা, এবং গহনা গাঁটী লইয়া ঘর করিবেনা ইহা একটা মস্ত কথা। আর মেয়ে কাছেই থাকিবে, ইচ্ছা মত তাহাকে দেখাশুনা যাইবে। যতদূর সে জানে, সতীশ ছেলে ভাল এবং রোজগার বয়স ও শিক্ষার পক্ষে মন্দ করে না। বিবাহ করিলে আরো চাড় হইবে। তবে নিজের বোনটিকেও এই ফাঁকে উদ্ধার করিয়া লইতে চায় এই যা। তা মেয়ে ভাল হইলে—আচ্ছা, দেখাই যাক।

টোকনকে একদিন ভানু ও তাহার বন্ধু আসিয়া দেখিয়া গেল। অপছন্দ হইল না। ভানুর বোন লীলাকেও নিখিল আসিয়া দেখিয়া গেল। সুরবালা অবশ্য মুড়ীওয়ালীর রিপোর্টকেই বেশী মূল্য দিলেন। সে বলিয়াছে, "মেয়ে সোন্দর নয় বটে মা, কিন্তু আলগাছিরি খুব আছে, বাপু, বেশ সাজন্ত হবে।"

মধ্যে একদিন ভানুতে ও সতীশে বসিয়া অনেক পরামর্শ হইল। ভানু ত নিজেই কর্ত্তা, আর সতীশের বাবা থাকিলেও সেই সব ব্যবস্থা করিতেছে, অতএব কথাবার্ত্তা তাহার সঙ্গে কিছু হয়, রামসদন এদিকে ভত্ত ভেড়েন না।

ভানু বলিল, "তবে ত ঠিক রইল। তুমি ত আগে পার হয়ে যাও, তারপর সামনের বৈশাখে আমার পালা। ছোট ভগ্নীপতী হবে কাজেই তুমি বল্‌লাম।"

সতীশ বলিল, "টোকনও ত আমার দিদি নয়, সুতরাং অধিকারটা আমারও রইল।"

• • •

দুই বাড়ীতে আয়োজন কিছু কিছু হইতে লাগিল। যদিও কোন পক্ষই বিশেষ কিছুই দাবিদাওয়া করে নাই, তবু বিনা আয়োজনে ত বিবাহ হয় না? সুরবালা মেয়েকে ভাল জিনিষ কিছু হয়ত দিতে পারিবেন না বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ছেলে নিজেই কর্ত্তা সাজিয়া বিবাহ করিতেছে, কিছু বলিবার জো নাই, না হইলে কিছু পণ তিনি আদায় করিতেনই, তাহাতে মেয়ের খান দুই গহনা হয়ত হইত। কিন্তু ভানু কিছুই চাহে নাই সেটাও দেখিতে হইবে।

সতীশের বিবাহ হইয়া গেল। ঘটা করিবার দিন নয়, কাজেই ঘটা হইল না। আত্মীয় কুটুম্ব ছাড়া নিমন্ত্রণও বিশেষ কাহারও হইল না। কিন্তু সতীশের কাছে সব ত্রুটী পূরণ হইয়া গেল লীলার সুন্দর মুখের গুণে।

সুরবালা বৌ দেখিয়া খুশীই হইলেন। চেহারা ভাল—প্রথম পটের বিবি নয়, সুস্থ সবল মেয়ে, ঘরের কাজকর্ম করিতে পারিবে। যা হোক হাতের চুড়ী, গলায় কণ্ঠী ও কানের দুল ত দিয়াছে দেখি। তিনি যে কি করিবেন কে জানে? গহনা ত চুলায় যাক্, এক বস্ত্রে না মেয়ে পাঠাইয়া দিতে হয় তাহা হইলেই ঢের।

বৌ আসার দিনটা দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। পরদিন যাহোক একটু নমোনমো করিয়া বৌভাতের যোগাড়। আত্মীয় স্বজন ও নতুন কুটুম্ব বাদে ইহারাও কাহাকেও ডাকিতে পারিলেন না। ফুলশয্যার তত্ত্ব লইয়া লোক আসিবে ভানু আগেই বলিয়া পাঠাইয়াছিল।

সন্ধ্যার আলো জ্বালিবার সঙ্গে সঙ্গেই দশ বারোজন ঝি চাকর টে, কাঠের বারকোষ প্রভৃতি মাথায় লইয়া আসিয়া ঢুকিল। শাঁখের ধ্বনি থামিতে না থামিতে আভা মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "ওমা, কাণ্ড দেখ এসে! ওমা কোথায় যাব।"

সুরবালা ভাঁড়ারের হাঁড়িকুড়ি এককোণে ঠাসিয়া তত্ত্ব নামাইবার জায়গা করিতেছিলেন, অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেনরে কি হয়েছে।"

মেয়ের হাতে মস্ত ফর্দ, বলিল, "দেখ না এসে, কত কাপড় পাঠিয়েছে।"

সুরবালা বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওগো বাছারা, এই যে এধরে এসে তত্ত্ব নামাও।"

ঝি চাকরের দল অগ্রসর হইয়া আসিল। মিষ্টি, দৈ, ফুলের গহনা, বাসন প্রভৃতি নিয়ম মত আসিয়াছে।

বাদ বাকী সব কাপড়। কনের ও বরের কাপড় চোপড় বাদে সুরবালার জন্ম ছয়খানি প্রণামী শাড়ী, সেমিজ ও ব্লাউজ, পেটিকোট, টোকনের আটখানি রঙিন শাড়ী, তাহারই সঙ্গে মিলাইয়া ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি। খুকীরও ঠিক ও আনুষঙ্গিক পরিচ্ছদ, আভারও অনেকগুলি শাড়ী। সবই ভাল জিনিষ, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যা হইতে আনীত।

ঝি চাকরেরা বাহিরে যাইতেই সুরবালা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা একি কাণ্ড গা?"

আভা কোথা হইতে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "মা, দাদা বলছে আগের থেকে এই রকমই কথা ছিল, তোমাকে সে সব বুঝিয়ে বলবে। টোকনের বিয়েতেও নাকি এই রকম নতুন ধরনের তত্ত্ব যাবে।"

আধুনিকা

শ্রীশান্তা দেবী

মস্ত বড় বাড়ী, কিন্তু সেকালের ধরণের। সদর অন্দর নানা দিকে দরজা, দুটো তিনটে সিঁড়ি। মোটা দুই তিন ফোট ছোট ছোটো উঠোন. তার মধ্যে কল চৌবাচ্চা। ঘরগুলো আজকালকার মত ১০০ ফোরার ফুট নয়, প্রায় ৪০০ ফোরার ফুট। রান্নাঘর স্নান নিবারিব আলাদা। ঠাকুর ঘর. ছোট ভাঁড়ার. বড় ভাঁড়ার, বাসন-মাজা কল, চানের কল, বাসন রাখা ঘর. কত কি, যেন একটা গোলক-ধাঁধাঁ। বাড়ী বড় হ'লে কি হয়, কোথাও এক চিলতে জমি পড়ে নেই। ছোট ছোট অন্ধকার উঠোনে কিম্বা পাঁচিলের ধারে কয়েকটা করে পুরানো টব বসানো, তার কোন যত্ন নেই। তবে নিজে থেকেই গুটুস্তে গুটুস্তে দুই এক রকমের ফুল হঠাৎ ফুটে ওঠে। সেই ফুলেই গৃহ দেবতার পূজা হয় বাইরে থেকে ফুল আসে না। কোন কোন উঠানে সকালের রোদ একটু পড়ে কিন্তু তাতে কলের ধারের স্যাওলা মরে না। ঘন সবুজ মখমলের মত দেওয়ালের গায়ে ক্রমেই আরো পুরু হতে থাকে।

বাড়ীর আয়ু কতদিন ঠিক বলা যায় না। যত্ন থাকলে যে রকম চেহারা হয় মোটেই সে রকম নয়। বহুকাল ধরে মানুষের পদক্ষেপ বুকে ধরে ধরে সিঁড়ির মাঝখানগুলো গামলার মত গর্ত হয়ে এসেছে। দেওয়ালের চুণ-বালি নানা জায়গায় খসে পড়েছে। ভাঙা শার্সির ফাঁক কোথাও কাগজ দিয়ে আটকান, কোথাও খোলা পড়ে আছে। হুড়কো কোথাও আছে কোথাও আলগা, স্নানের ঘরের দরজার তালাগুলো জল লেগে একহাত করে ক্ষয়ে পড়ে গিয়েছে। দরজা জানালার রং বহু বর্ষার ধুয়ে সাদা হয়ে এসেছে; তার উপরে পাড়ার ছেলেরা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে নিজের ও পরের নাম লিখেছে, দুই একটা গালা-গালিও লিখতে ছাড়েনি। কোন চিত্রশিল্পী ছুরি বা কালি দিয়ে ফুল ও মানুষের মুখ এঁকে রেখেছে।

গৃহিণী শুচিবায়ুগ্রস্তা, সকলের হাতে খান না। নিজেই রান্না করেন। উঠে মি বাসন মেজে দিয়ে গেলে তার উপরে জল ঢেলে তবে ঘরে তোলেন। ঐ ঝিটা ছাড়া চাকর বা দারোয়ান বলতে একটা মাত্র পুরুষ মানুষ এ বাড়ীতে কাজ করে। সে এই বাড়ীতেই ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। বেশী টাকার খাঁই নেই, বাড়ীর বাবুদের পুরানো জামা কাপড়েই পোষাকের কাজ চালায়, খায়ও মারাত্মক নয়। এদিকে ভূতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবই করে। একেবারে বামুনের গরু।

বাড়ীতে বাঙালীর সনাতন সমস্যা। গৃহিণী ছেলের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু বড় কড়া পছন্দ। কিছুতেই মনের মত মেয়ে পান না। আরো মুস্কিল এই জন্যে যে আজকালকার ছেলে মায়ের কথায় ত ওঠে বসে না। মাকে মেয়ে দেখবার ভার দিয়েছে বটে, তবে মতামত গুলো বেশীর ভাগই ছেলের, তার কথামত কাজ হবে।

ঘটক ঘটকী দুই আনাগোনা করে। তবে গৃহিণী নিজে কথা বলেন বলে স্ত্রীলোকই পছন্দ করেন বেশী। অন্দরের দরজা দিয়ে ঘটকী আনাগোনা করে। গৃহিণী দোতলায় তাঁর শোবার ঘরেই মস্ত বড় উঁচু খাটের উপরে বসেন। খাট থেকে বড় নামেন না। রান্না খাওয়া সেরে সেই যে খাটে এসে বসেন সন্ধ্যার আগে নামেন না। ওইখান থেকেই উঁচু গলায় পঞ্চাননকে ডেকে ডেকে সব কাজের তদারক করেন। যদি কখন পঞ্চানন বাইরে যায় ত গৃহিণী প্রেমাস্পিনীই তার কাজ আংশিক করেন গলার জোরে। কেউ কড়া নাড়লে উপর থেকে হাঁক দেন, "কে রা" বলে। যদি নিতান্তই দরজা খুলে দিতে হয় ত খাট থেকে নেমে সরু বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেখানে অন্দরের হুড়কোর সঙ্গে একটা দড়ি বাঁধা থাকে, সেই বারান্দা থেকে

ঘড়িতে টান দিলেই হুড়কো খুলে যায়। আগন্তুক বাড়ীতে ঢুকে আবার হুড়কো এঁটে দিতে পারে।

দুপুর বেলা ঘটকীর আসবার সময়। হেমাঙ্গিনী একমুখ পান দোক্তা নিয়ে ঘটকীকেও একটা পান এগিয়ে দেন। শিল্পীর লোক ভোলানো সাজগোজ খুব নেই। চল্লিশ বৎসর বিয়ে হয়েছে। মোটা ও এতদিনে কম হননি। সেই বিয়ের সময়ের গলার হার বসে সমান হয়ে গিয়েছে। হাতের চুড়ি হাতে লাগতোনা বলে বছর ত্রিশ আগে একবার ভেঙে গড়ানো হয়েছিল। তাও এখন হাতে একেবারে বসে গিয়েছে। পরণে লাল পাড় ধারণ শাড়ী। শোবার ঘরে সেমিজ-টেমিজের বালাই নেই।

হাসিতে মুখ আলো করে ঘটকী এসে বললে, "আজ মা খাসা মেয়ের সম্বন্ধ এনেছি। এমন হয় না। রং নয়তো চাঁদের আলো, মুখ নয়ত দুগ্‌গা পিতিমে, চলন যেন হাথিকার মত। খবরের কাগজে ও অনেক গৌর বরণ সুন্দরী মেয়ের কথা পড়, এ তেমন মেয়ে নয়। গালে টোকা দিলে রক্ত ফেটে পড়বে গোলাপের মত। পাড়ার লোক বলে ইহুদীর মেয়ে নাকি।"

ব্যগ্র ভাবে হেমাঙ্গিনী বললেন, "তা আজকাল ত লুকিয়ে-চুরিয়ে কত রকমই বিয়ে হচ্ছে, হয়ত বা ইহুদী কি খিরিস্টিই হবে। বাড়ীর লোক বলতে চায় না। এমন আমি দু'একটা বাড়ীর কথা জানি। একজন বর্মার মেয়ে বিয়ে করে এনেছিল। দেখে আসবার পর বৌকে কারুর কাছে যায় করত না! এমন কি মেয়ের বিয়ের সময়ও মা দাঁড়াল না, ঠাকুমা দাঁড়াল। আর একজন করে ছিল ইংরেজ মেয়ে বিয়ে। সে মেয়েও চিরজীবন অন্দর মহলে কাটিয়ে গেল। মেয়ের মেয়েকে লুকিয়ে বাঙালী ঘরে বিয়ে দিলে।

মাকে সামনে বার করল না, কাকীকে মা সাজাল। ও রকম বাপু আমরা চাই না। তাই বা-বাপ বোন সব দেখে শুনে নেব।"

ঘটকী বললে, "আপনি মেয়েটিকে দেখুনই না। যদি পছন্দ না করেন চুকে গেল, আর যদি পছন্দ করেন ত সব দেখে শুনে নেব।"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "সে হবে না বাছা। মেয়ে পছন্দ করে তারপর বলতে পারব না যে তোমার মাকে দেখাও, পছন্দ হয় কিনা দেখি।"

ঘটকী বললে, "আচ্ছা তবে ও-খবর নিয়ে আসব। আর অন্য মেয়েরও সন্ধান দেব। সবার সেরা মনে করেই আমি তাড়াতাড়ি এসেছিলাম।"

হেমাঙ্গিনী বললেন 'তা বেশ করেছ বাছা। একটা কথা বলতে গিয়ে আমি আবার পাঁচটা কথা বলে যাই। ভাগ্যে মনে পড়লো তাই বলি। তা হ্যাঁ গা, মেয়ের বয়স কত? বাপেরই বা কাজকর্ম কি?"

ঘটকী বললে "সে সব আমি ঠিকঠাক জেনে এসেছি। আজ কালকার মত বেড়ে মেয়ে নয়। এমন পাবে না। সবে চোদ্দর পা দিয়েছে। বাপ ওকালতি করে। অভাব নেই সংসারে। মেয়ের গা সাজিয়ে দিতে পারবে।

হেমাঙ্গিনী বললেন "তবেই খেয়েছে। আমার ছেলে বিয়ে করবে অতটুকু মেয়েকে? কুড়ি বছরের মেয়ে চাই তার। বয়স ত খানিকটা ছেলের হয়েছে। আর দেখ বাপু মুখপুড়ী মেয়ে যেন না হয়। পড়িয়ে ছেলে পড়াশুনা পছন্দ করে।"

ঘটকী বললে 'কুড়ি বছরের মেয়ের আবার ভাবনা। আজকাল ত ঘরে ঘরে পঁচিশ তিরিশ বছরের মেয়ে রয়েছে। বাপ মা বিয়ে দিতে পারছে? টাকা চাই, নাচ চাই, গান চাই, তবে না মেয়ে বেচে লোকে।"

হেমাঙ্গিনী মুখরোচক গল্প পেয়ে বললেন, 'সে কথা আর বলতে? এই ত আমাদের বাড়ীর দু পাশে দুটি আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে তিরিশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। লেখাপড়াও যে করেনি তা নয়। বাপ মা নেই, কে বা বিয়ে দিচ্ছে। আমি বললেই এক কথায় বিয়ে হয়ে যেত। কিন্তু সে আমার ছেলের পছন্দ নয়। একে কুচ্ছিৎ কালো, তাও আবার পাড়ার মেয়ে। বড় বেশী জানা। তবে একটি মেয়ে আছে বটে ভাল। যেমন চেহারা তেমন পড়াশুনা। কিন্তু তাদের আবার নজর উঁচু। আমার হীরের টুকরো ছেলেও তাদের মন ওঠেনা, বিলেত ফেরত চাই। বোকা বুদ্ধিত। বিলেত ফেরতের তলায়

তলায় কত যে মেম-সাহেবের ফেল্‌না থাকে তা ভুলে যায়।"

ঘটকী বললে 'তা এক কাজ কর না বাপু। ছেলেকে বল না ভাল ভাল মেয়ের সঙ্গে ভাব-সাব করে নিতে। তারপর নিজেই যাছাই করবে। আজ কাল ত আকছার ঐ হচ্ছে। এর সঙ্গে ট্রামে ভাব, তার সঙ্গে দোকানে ভাব, কারুর বা অপিসে ভাব ; বাস হয়ে গেল বিয়ে দুমাস চারমাস পরে। আইকুল কিছু দেখার ঝামেলা নেই।"

গিন্নি নাক সিঁটকে বললেন "সে হয়না বাছা। একে আমাদের বড় ঘর, তায় আবার ছেলেটা হাঁদা। ও-সব মেয়ে ত মেয়ে নয় যেন যক্ষিনী মায়াবিনী। বড় ঘরের মেয়ে ত আর আপিসে ট্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে না। যাদের বাপের এক পয়সার মুরোদ নেই তারাই আপিসে যায়। বর দেখা কলা বেচা দুই হয়। চাকরীকে চাকরী, আবার টোপ ফেলে ভদ্দরলোকের ছেলে গেঁথে তোলা। শেষে কোন বিধবা মাগী ঘাড়ে এসে গেঁথে বসবে কে জানে। আজকাল ত চেনবার জো নেই। সবাই বিলুনী দুলিয়ে পেটকাটা জামা পরে আপিস করে বেড়াচ্ছেন। তাদের ত লাভই হবে। আমাদের ত কুলও যাবে, ঘরে একটা পয়সাও আসবে না।"

ঘটকী বললে "আচ্ছা মা, উঠি তা হলে। এবার অবর খবর আনব দেখে নিও।"

গিন্নী বললেন "গোটাকতক এক সঙ্গে যোগাড় করে এনো। মেয়েদের নামের একটা ফর্দ করব। ছেলে বলেছে মাথা পিছু নম্বর দেবে। তারপর বাছাইয়ের সময় যে মেয়ে সবচেয়ে বেশী নম্বর পাবে তাকেই নেওয়া হবে।

ঘটকী "যা বলেচ মা"—বলে উঠে চলে গেল।

গৃহিণীর ঘুম এসে গিয়েছিল। হাই তুলতে তুলতে তুড়ি দিয়ে বালিশটা টেনে নিয়ে চুল এলিয়ে শুতে যাবেন এমন সময় পুত্ররত্নের আবির্ভাব! মা ছেলেকে দেখে বললেন, "পারিনে বাপু, তোর বন্ধুকভাঙ্গা পণ নিয়ে। তুই কি পুরুষ ছেলেকে বিয়ে করবি যে অত এম, এ ; বি,এ, খোঁজ করছিস।

ছেলে বলল "কি করব বল! যখনকার যেমন। তোমার মেয়েদের মত মহাকালী পাঠশালায় পড়া আধুনিক কালে চলে না। এখন যে বরবার সব সামলাতে পারে তারই দাম বেশী।"

মা কিছু না বলে পিছন ফিরে শুয়ে পড়লেন।

* * *

দিন কয়েক পরে আবার ঘটকীর আবির্ভাব। এসেই বল্লে "এবার মা আমাকে ফেরাতে পারবেন না। বলতে পারবেন না যে এইটা হোল না কি দুইটা হোল না। ব্রহ্মাণ্ডে যত রকম আছে সব সন্ধান নিয়েছি। তবে শেষবারে সেই সুন্দরী মেয়ের কথা বলি। তার বাপু মা বেঁচে নেই। তবে মামা বাড়ী আছে, খোঁজ সবই নিতে পারবে।"

গিন্নী বললেন "মামা একটা খাড়া করতে কতক্ষণ লাগে? ওসবে কাজ নেই মা, তুমি নতুনগুলোর কথা বল। তবে ও নামটাও কর্দে লিখে রাখছি ছেলেকে দেখাব।"

ঘটকী বললে "শ্যামবাজারে একটা মেয়ে আছে। বি, এ, পাস করেছে : বিলিতী নাচ জানে আবার শান্তিনিকেতনীও জানে। বাপের টাকাকড়ি বেশ আছে। বড় ব্যবসাদার।"

গৃহিণী বললেন, "খরচ পত্র কি রকম করবে? নগদই বা কত আর গয়না গাঁটিই বা কত?"

ঘটকী বললে "গয়না অঢেল দেবে। আর নগদ মানে ছেলেকে ফরেনে পাঠাবে। এখানের পাশে মন ওঠে না।"

গিন্নি বললেন, "ওরে বাবা, তার মানে ছেলেটাকে একেবারে পর করে দেবে। আমার বাপু ইচ্ছে নয়, তবে ওকে বলতে হবেই একবার। বৌ যেই যেই করে নাচলে আর ছেলে মনের পিদেয় ডুবে থাকলে সাহেবী ধরণ বটে, কিন্তু সংসার ত ছারখার হয়ে যাবে।"

ঘটকী বললে, "তোমার বাপু সব তাতেই খুঁৎ খুঁৎ। তবে বালিগঞ্জেরটি কর। ওরা ফরেন-টরেন চায় না। মেয়ের বাইশ বছর বয়স। গাড়ীর সখ আছে তাই বাবা নগদ দেবে না, গাড়ী দেবে। এও খুব পাস করা মেয়ে।"

গিন্নি বললেন, "তার মানে বৌএর পেছনে মাসে দুশ

আর গাড়ীর পেছনে দুশ। মাসে অন্তত শ'চারেক খরচ বেড়ে যাবে। কপালে কি আছে জানিনা। সবই ছেলেকে বলে দেখতে হবে।"

ঘটকী বললে, "তাছাড়া কনে পক্ষের আবার যাই আছে। নিজবাটি না হলে ওরা মেয়ে দেবে না।"

গিন্নি ঠোঁট উল্টিয়ে বললেন, "বাড়ী? কত বড় বাড়ী চাই? আট কাঠার উপর বাড়ী, পাবে কলকাতা সহরে?"

ঘটকী বললে, "সে কথা সত্যি মা। কিন্তু পেয়ার বাড়ী হলেই ত হল না। একটু সারিয়ে-সুরিয়ে না দিলে চোখে ধরবে কেন মানুষের?"

হেমাঙ্গিনী বললেন, "এত বড় বাড়ী সারানো ত কম কথা নয়। এই বিয়ের হাঙ্গামে বাড়ী সারাতেই যদি আট দশ হাজার খরচ হয়ে যায় ত আর খরচ কিসে হবে? কনের বাপ দেবেই বা কত? ধরের কড়ি দিয়ে ত আর করতে পারব না।"

• •

যাই হোক, অবশেষে হেমাঙ্গিনীর পুত্র ভবদেবের বিবাহ স্থির হল। মা ছেলের দুজনের মনেই একটু অস্বস্তি রইল। মেয়ের বাপ নগদ পাঁচ হাজার মাত্র দেবেন, গহনা-কাপড়ও আছে। খাওয়া দাওয়া ত আছেই।

সুতরাং তাদের দশ থেকে বার হাজার নিশ্চয় খরচ হবে। ছেলেত চাকরে নয়, কারবার করেন কিন্তু এম এ, পাস। তাই পাঁচ হাজারের উপর নগদ উঠল না। মেয়েটি আহা মরি না হলেও দেখতে শুনতে ভালই। পরের ঘরের মেয়ের বয়স কে জানে? বলে তেইশ বছর তবে ছাব্বিশ সাতাশ হবে মনে হয়।

গিন্নি বললেন, 'একটা খুঁৎ আছে, মেয়ে আপিস যায়।' আচ্ছা, হোক্ বিয়ে তারপর হেমাঙ্গিনী ও-সব পাট চুকিয়ে দেবেন। ছেলে বলে,—"অত চট করে কাজ ছাড়া যায় না, এখন দুই এক মাসের ছুটি নিক বলে করে। তারপর আস্তে আস্তে ছাড়বে। তোমার ত আর মেয়েদের বিয়ে বাকি নেই যে অত ভাবছ। কেউ এক ঘরে করবে না।"

বাড়ী মেরামত হল না। পাঁচ হাজার ত মাত্র নগদ। তার মধ্যে যতই নম নম করে কাজ সারা যাক বৌএর মুখ দেখা, আত্মীয়-কুটুম্বকে খাওয়ানো, শোবার ঘরগুলোর কলি ফেরানো এসবে অন্তত দেড়হাজার ত বেরিয়েই যাবে। তাহলে থাকবে কি? কারবারী ছেলে নগদ অন্তত কিছু হাতে রাখতে চায়।

কর্ত্তার বয়স হয়েছে, শরীর একেবারেই ভাল নয়। নিজে একটা আলাদা ঘর নিয়ে থাকেন, গিন্নি কি ছেলে কারুর সঙ্গেই তাঁর বনে না। কাজেই ছেলের বিয়ের কথায় তাঁর মত কেউ জিজ্ঞাসা করে না। যা ব্যবস্থা মায়ে-পোয়েই করেন। আয়ও তাঁদের, ব্যয়ও তাঁদেরই।

• • •

মেয়ের বাড়ীতেও হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে, পাত্র এম, এ, পাস, মস্ত বাড়ী আছে। সংসারও বড় নয়, এ ত খুবই আনন্দের বিষয়। কিন্তু বিয়েত আর মুখের কথা নয়। খরচ আছে খুবই, অথচ কর্ত্তার সম্বল ত ঐ চাকরীটুকু, তাও আর ২।৩ বছরের মধ্যেই পেনসন হয়ে যাবে। যাই হোক্, ভাগ্যে মেয়ের বিয়েত আপিস যায় মেয়ে। নগদ পাঁচ হাজার আর বিয়ের ছত্রিশ রকম খরচের ওতে স্থির, কর্ত্তাকে এই মোট আট হাজার যোগাড় করতেই হবে। তার মধ্যে দুয় হাজারই যায়। তবু ভাগ্যিস্ মেয়ে চাকরী করে, তাই নিজের গয়না কাপড় নিজেই করেছে। কিন্তু সেই বা কি সোজা কাজ। সোনার ভরি একশ তিরিশ টাকা করে, মজুরিও ভরি পিছু ১৫।১৬ টাকা, যার যেমন নাম ডাক। ঘড়ির ত দুর্ভিক্ষ বাজারে, তবু চোরাই মাল হলেও আনা চাই একটা। কাঠ বলে কিছু আছে কিনা বলা যায় না; অথচ একটা খাট আর একটা আলমারী ত দিতেই হবে। সস্তায় জিনিষ কেনবার জন্যে মেয়ে বাসন্তী নিজেই দোকানে দোকানে ঘোরে; অথচ বরের বাড়ী থেকে বলে পাঠিয়েছে আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে আর দোকানে বাজারে ঘোরা চলবে না। দোকানে বাজারে না ঘুরলে বাজার সরকার রাখতে হয়; সে ত আবার আর একটা বাড়তি খরচ। অনেক লুকোচুরি করেই কাজ এগোতে হচ্ছে। যেটুকু গহনা

না দিলে বরের বাড়ীতে মুখরক্ষা হয় না তাতেও হাজার তিনেক টাকা পড়ে যাবে। আজকালকার মেয়ে আবার গহনার চেয়ে কাপড়ের ভক্তই বেশী, কথায় বলে 'কাপুড়ে বিবি'। কাজেই মেয়ের জামা-কাপড়ে হাজার খানেক টাকা না চাললে লোকের সামনে সে বেরোতেই পারবে না। বেনারসী, ব্যাঙ্গালোর, জর্জেট, শান্তিপুরী, কাঞ্জিভরম সবই একখানা করে চোঁয়াতে হয়েছে।

মেয়ের বাড়ীতে খুব একটা ঘটা হল না। বরযাত্রীদের খাওয়াতেই হবে। কনে-যাত্রী বলতে একেবারে নিকট আত্মীয় স্বজন। কনেটিও খুবই বুদ্ধিমতী হিসেবী।

পিঁড়িতে বসবার আগে নিজের জিনিষপত্র বাক্সে বন্ধ করে চাবি নিজের কাছে রেখেছিল। লোক দেখাবার জন্যে হাট করে কিছু সাজিয়ে রাখেনি। কেবল বিয়ের মধ্যে যা এসে পড়ছে সেটা বাইরে রাখতে হচ্ছে।

যা না দিলেই নয় সেই মত করে সব দেওয়া হল। কনের গায়ের গয়না কাপড় ছাড়া প্রত্যেকটি জিনিষে দোকানের টিকিটে দাম লেখা। মেয়ে পাঠান তত্ত্ব পাঠান পর্য্যন্ত সে সব টিকিট খোলা হল না। কন্যাপক্ষ কত টাকার জিনিষ দিয়েছে বুঝতে যাতে বরপক্ষের একটুও ভুল না হয়।

বিয়ের দিন থেকে পুরা একমাসের ছুটি—অনেক কষ্টে মঞ্জুর করে বাসন্তী শ্বশুর বাড়ী এল। এসময় বাড়ীতে তার কয়েক আত্মীয়-স্বজন ত থাকবেনই, তাদের চোখের উপর দিয়ে নূতন বৌ কিন্তু আপিস যেতে পারবে না। এ-কথাটা লোক-সমক্ষে হেমাঙ্গিনী একেবারে অস্বীকার করতে চান। সবাইকে বলেন কলেজের পড়া সেরেই বিয়ে হ'য়ে গেল।

অন্তরালে জয়দেব কিন্তু অন্যরকমই বলে, "আজকাল বড় বড় আই. এ. এসের বৌরাও চাকরী করে। তুমি চাকরী আর ছাড়ি কি? এখন কিছুদিন করে চল। সময়মত পরে ছাড়লে হবে।"

বাসন্তী বলে, "আমারও এখনি কাজ ছাড়বার ইচ্ছা নেই। কি হবে ঘরে হাত পা মেলে বসে থেকে? তুমি ত সারাদিন কারবার সামলাবে। এত বড় ভাঙা বাড়ীটা তত্ত্বক্ষণ আগলে রাখুক আর কি? ক'দিনের মধ্যেই ত দিদিরা আসিয়া সবাই যে যার বাড়ী চলে যাবে। ঠাকুর পো কলেজ করবে। থাকবার মধ্যে ত দু ঘর দুই কোনে বাবা আর মা। এতবড় হাঙ্গুলে বাড়ীটা তোমরা বিক্রি করে ফেল না কেন? কোন কাজে লাগছে?"

জয়দেব বললে, "হ্যাঁ, বিক্রি করা গেলে ত ভালই হত। কিন্তু বাবা যে অনেক আগেই ওটা বন্ধক রেখে টাকা নিয়েছেন! সে টাকা আর শোধ হয় নি।"

বাসন্তী বিস্মিত হয়ে বললে "ওমা তাই নাকি? আগেত ঘুনাক্ষরেও শুনিনি। তাহলেত চাকরী ছাড়া আমার মাথায় থাকবে।"

জয়দেব চুপ করে রইল। মনমরা ভাবেই বাসন্তীর ছুটির একটা দিন কেটে গেল। স্বামী চাকরে নয় বলে মনে তার দুঃখ ছিল, এখন আবার বাড়ীও বাঁধা শুনে তার কপাল চাপড়াতে ইচ্ছা করছিল।

আপিস যাবার দিন বাসন্তী আর লুকোচুরি করে আপিস গেল না, সদম্ভেই গেল। যার বাড়ী নেই ঘর নেই, তার আবার চাকরী করার লজ্জা কি?

আপিসে এসেই শুনল বড় সাহেব ডেকেছেন। ঠিক দিনেই ত কাজে জয়েন করেছে, তবে আবার বড় সাহেবের ডাক কেন?

সাহেবের ঘরে যেতেই তিনি বললেন, "দেখ মিস মিত্র, তোমার নূতন নামটা মনে থাকে না। এই কাগজের নামটা ঠাই হবে বোধ হয়। এই দেখ।"

বাসন্তী গম্ভীর মুখ করে বলল, "হ্যাঁ"।

সাহেব বললেন, "তোমার স্বামীর ত অনেক ধার দেখছি পাওনাদাররা তোমার বেতন থেকে মাসে ১০০ টাকা কাটতে চায়। আমি কি বলব বল্।"

বাসন্তী মনে মনে প্রমাদ গণল, বললে, "সাহেব আমার নিজেরও যে কয়েক হাজার ধার হয়েছে বিয়ের ব্যাপারে। আমি মাসে মাসে শোধ দেব ১৫০ টাকা করে কথা আছে। তার উপর আরও কাটা গেলে থাকবে কি?"

সাহেব বললেন, "তুমিত তিন শ টাকা বেতন পাও। আড়াই শ' দিলে পঞ্চাশ থাকবে। তোমার খাওয়া পরার জন্য ত তোমার স্বামীকে টাকা দিতে হবে না।"

লেবং ঘোড় দৌড়ের মাঠে

১৯০৬ সাল। যতদূর মনে পড়ে, জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাস। আমি তখন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী। ১৯০১ সালে রাজবন্দী হয়ে তিনের পর দিন নয়, বৎসরের পর বৎসর কাটাচ্ছিলাম, আমার মত 'ঝড়াটে রাজবন্দীকে' নিয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সোয়াস্তি ছিল না, সেখানেই আমাকে রাখা হয়েছে, কি বক্সা শিবির, কি জেল, কি গ্রাম্য থানার অন্তরীনে, কি নিজেদের দেশের গৃহে অন্তরীনে, সর্বত্রই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার ঠোকাঠুকি লাগত, তাই বার বার আমায় এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল, এমন সময় বেশ গুছিয়ে-গাছিয়ে ভাল করে আঁটঘাট বেঁধে ঢাকায় আই বি পুলিশ সুরু করল বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা, গুনাবী সুরু হল মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিম বি, সি, রায়ের আদালতে, ওঁকে দেয়া হয়েছে বিশেষ ক্ষমতা, যার ফলে তিনি সাত বৎসর পর্য্যন্ত দণ্ডদান করতে পারবেন, আসামী আমরা পাঁচ জন, জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, খগেন ব্যানার্জ্জী, বিপদভঞ্জন চাটার্জ্জী, আমার ছোট ভাই রঙ্গলাল ও আমি। আমাদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ, আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত হিজ মেজেষ্টির গভর্ণমেণ্টকে বোমা ও রিভলবার দিয়ে উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্র করেছি এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য আমরা সায়ুধ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাতি করেছি।

বি, সি, রায় অর্থাৎ ভবেশচন্দ্র রায় স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট-রূপে ওঁর স্পেশাল পাওয়ার পুরোপুরি প্রয়োগ করেছেন শুধু আমারই বেলায়, তাই আমার সাত বৎসর দণ্ড, জগন্নাথ, খগেন ও রঙ্গলালের পাঁচ বৎসর আর বিপদভঞ্জনের তিন বৎসর। আমি তখন ছিলাম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ী থানার অন্তরীন, সেখান থেকে এনে আমায় সাজা দেয়া হয়েছে।

আমরা সবাই বি, ভি, নামীয় বিপ্লবী দলের কর্ম্মী, যার সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতৃস্থানীয় সত্য গুপ্ত, যে দলের সহীদদের তালিকা দীর্ঘ, বিনয় বসু, সুধীর (ওরফে বাদল) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য, নির্ম্মল ঘোষ, ব্রজ চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, মতিলাল মল্লিক এবং ভবানী ভট্টাচার্য্য ও আরও কতজন

দীপঙ্কর)

ঢাকা জেলের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ড একটি বিরাট লম্বা দোতলা বিল্ডিং, তার নীচের তলায় এক প্রান্তের একটি ছোট ঘরে এক দল সাধারণ কয়েদীর সঙ্গে রাখা হয়েছিল আমাকে আর বরিশালের শান্তি মুখার্জ্জীকে। তার কাছে নাকি একটি রিভলভার পাওয়া গিয়েছিল, তাই অস্ত্র আইনে তার সাজা হয়েছে পাঁচ বৎসর। আমার সহ-আসামীরাও ছিল বিভিন্ন ইয়ার্ডে! তাদের কাউকেই আমার সঙ্গে রাখা হয়নি, কারণ, পুলিশের মতে, আমি ছিলাম 'ঝড়াটে রাজবন্দী', এখন আমি 'ডেঞ্জারাস প্রিজনার।'

তখন সুপারিনটেনডেণ্ট ছিলেন মিঃ এ লিওনার্ড আর জেলার ছিলেন সুধীর মুখার্জ্জী। শান্তি ও আমাকে রোজ ঘাঁতা ঘুরিয়ে আধ মণ গোটা ধনের বা মুগরি ডাল ভেঙ্গে ভাল করে ঝেড়ে দিতে হত।

সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে থাকতে ভাল লাগছিল না আমাদের। অনেকগুলো ওয়ার্ডেই শুধু রাজনৈতিক বন্দী আছে, বিশেষ করে চল্লিশ ডিগ্রি, বিশ ডিগ্রি ও ছয় ডিগ্রিতে সবাই। শুধু আমরা দুজন এমন কি ডেঞ্জারাস হয়ে পড়েছি যে, আমাদের সেই সব ওয়ার্ডে থাকতে না দিয়ে সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে? স্থির করলাম, আমরা সুপারের কাছে নালিশ করব।

পরের সপ্তাহে লিওনার্ড সদলবলে যখন সাপ্তাহিক রাউণ্ডে এলেন, আমরা নালিশ করলাম। বললাম, যেসব ওয়ার্ডে পলিটিক্যাল প্রিজনার আছে, আমাদের তার যে কোনটিতে ট্রান্সফার করা হোক।

লিওনার্ড ব্যক্তিত্বহীন গোছের সরল প্রকৃতির মানুষ আর সুধীর মুখার্জী এক নম্বর ধূর্ত ও কৌশলী। হুকুম লিওনার্ডের প্রতি গভর্নমেণ্টের অলিখিত নির্দেশ ছিল, জেলারের অনুমোদন ছাড়া কিছু করো না, বিশেষ করে, পলিটিক্যাল্ প্রিজনারদের বেলায়।

তাই লিওনার্ড প্রথমটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন, তাইত, অর্ডিনারীদের সঙ্গে এদের রাখবার ত কোনও কারণ নেই। কোনো পলিটিক্যাল প্রিজনারকে রাখা হয়েছে বলে ত মনে পড়ছে না। সুতরাং লিওনার্ড প্রায় হুকুম দিয়েই ফেলেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়ল সুধীর মুখার্জীর চোখের প্রতি। ক্ষুদে চোখ, কথা বলতে গেলে যেন আরও ক্ষুদে হয়ে যায়! লিওনার্ড থেমে গেলেন, কথা ঘুরিয়ে নিলেন, বললেন, অল রাইট, আই উইল সি হোয়াট ক্যান বি ডান।

ভাবলাম, কিছুই হল না! চাণক্য সুধীর মুখার্জী ঐ ভ্যাবাগঙ্গারামকে ঠিক বুঝিয়ে দেবেন যে, আমরা দুটো মোষ টাইপ ছেলে, পলিটিক্যাল ওয়ার্ডে রাখলে আমরা সবাইকে উত্তেজিত করে তুলব, এমন কি, রিউটিনি ঘটাতে পারি। আমরা স্থির করলাম, সোজা আঙুলে ঘি উঠবেই না, তখন কড়া দাওয়াই কিছু দিতে হবে! কি সে দাওয়াই, কিভাবে তা প্রয়োগ করব, আমরা দুজনে প্ল্যান আঁটতে লাগলাম।

চারদিন কেটে গেল।

পরদিন সকালবেলা আমাদের বিস্মিত করে দিয়ে জেলার অনুমোদিত সুপারের হুকুম এসে গেল। শান্তিকে কোন্ ইয়ার্ডে নিয়ে গিয়েছিল, আজ আর মনে নেই, আমায় নিয়ে গেল চল্লিশ ডিগ্রিতে, ইা একেবারে চল্লিশ ডিগ্রিতে, যেখানে চল্লিশ জনের মধ্যে অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ জনই ছিল রাজনৈতিক বন্দী।

চার দিন ধরে অনেক চিন্তাভাবনার পর কূটকৌশলী জেলার সুধীর মুখার্জী যে কি ভীষণ ভুল করেছিলেন, তা বুঝতে পেরেছিলেন কয়েকদিন পরে।

চল্লিশ ডিগ্রিতেই দেখলাম সুশীল চক্রবর্তীকে। বি ডি-র অন্যতম কর্মী সুশীল। দার্জিলিং-এর সেবং ষোড়শ কেসের মধ্যে বাকীর গভর্নর হত্যার জন অ্যাণ্ডারসনের উপর গুলী চালনা মামলায় দীর্ঘ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। একই দলের কর্মী হলেও এর আগে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ন হলেও শুরুভাইকে চিনে নিতে এবং তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে শুরুভাইয়ের দেরী হবে কেন?

সেবং-এর ঘটনাবলী যতখানি সে জানে, বলল আমাকে। মনে আছে অনেকগুলো প্রশ্ন করেছিলাম তাকে। তার মধ্যে প্রধান প্রশ্ন ছিল, গভর্ণরের ওপর গুলী চালিয়েছিল ভবানী ভট্টাচার্য আর রবী ব্যানার্জী, দুজনেই আহত হয়ে তখনই ধরা পড়ে যায়, ধারে কাছে সহকর্মীদের কেউ ছিল না, তাহলে ওরা ধরা পড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে কি করে পুলিশ গ্রেপ্তার করল এই এ্যাকশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রায় সবাইকেই? কি করে পুলিশ জানতে পারল যে, মধুসূদন ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, উজ্জ্বলা মজুমদার, সুকুমার ঘোষ আর তুমি এই এ্যাকশনের সঙ্গে যুক্ত? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, ফাঁসীর হুকুম শেষ পর্যন্ত টিকেছিল দুজনের প্রতি, ভবানী ও রবী, অথচ ভবানীর ফাঁসী হয়ে গেল, রবীর হয়নি, কেন? পাদ্রী নর্টন সাহেবের অনুরোধে গভর্ণর নাকি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তার ফাঁসী রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড করে দিয়েছেন, কেন?

সুশীল জবাবে বলেছিল, আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তর দ্বিতীয় প্রশ্নেই নিহিত রয়েছে। রবী পুলিশের অত্যাচারে কনফেশন করেছিল। ভবদেবপুর ডাওরাল ষ্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর যোগেন ব্যানার্জীর ছেলে রবী, গভর্ণমেণ্টের কাছে বাপের এত প্রতাপ, তার নিজের চেহারাটিও রাজপুত্রের মত, বাবাই নটনকে বলিয়েছে যে, রবীর ফাঁসীটা যদি রদ করিয়ে দিতে পার আর গভর্ণমেণ্ট অনুমতি দেয়, তাহলে রবীকে আমি বিলেতে পাঠিয়ে দোব পড়তে, অন্ততঃ অনেক বছর সে আর এদেশে ফিরবে না, যেসব বন্ধু ওকে বিপথে চালিত করেছিল, তাদের আওতার অনেক বাইরে থাকবে সে, ইতিমধ্যে সে গেল ভেসে হয়ে যাবে আশা করা যায়। নটন তাই তৎপর হয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে।

বলেছিলাম, কনফেশনের পুরস্কার স্বরূপ তাই বুঝি রবী ডিভিশন টু প্রিজনার হয়ে হুধ ডিমে রাঙার হাতে খাচ্ছে-দাচ্ছে আর কড়ি-খুঁটী খাটে মেটের মজুরীর নীচে ঘুমুচ্ছে, বিলেতের স্বপ্ন দেখছে আর তেমন সবাই ফুর্ত্তি-ফার্ত্তিয়া পরা অবস্থায় আদালতী তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী হয়ে রয়েছে?

সুশীল এ প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় নি

কি আর জবাব দেবে?

সে যুগে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনীত অসংখ্য রাজনৈতিক মামলার পুলিশী সাফল্যের পশ্চাৎপটে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সেই চমকপ্রদ বিজয়োদ্ভিত সাফল্যের অনেকখানিই নির্ভরশীল ছিল কোনো সহকর্মী, বন্ধু, আত্মীয় বা কোন পরিজনের স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি অথবা সংবাদ সরবরাহের ওপর। সেই বিবৃতি বা সংবাদকে পাথেয় করেই পুলিশ মামলার তদন্ত সুরু করত এবং তার ফলেই এ্যাকশনের সঙ্গে পরোক্ষভাবে সামান্য যুক্ত ব্যক্তিও ধরা পড়ে যেত।

রবী ছিল ভবানীর সহপাঠি, অন্তরঙ্গ বন্ধু। রবী কোন বিবৃতি না দিলেও বন্ধুকে অবশ্য রক্ষা করতে পারত না, কিন্তু তাহলে আর কেউ গ্রেপ্তার হত না, মামলা দার্জিলিং-এই থেকে যেত, বেঁচে যেত কয়েকটি ছেলে ও একটি মেয়ে।

পুলিশ গ্রেপ্তার করলে, বিশেষ করে হাতেনাতে ধরে ফেললে যে কখনও জামাই আদরে রাখবে না, সে ত জানা কথা। সে সব ভাল করে জেনেই ত রবী বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল, এ্যাডায়সনকে হত্যা করবার এ্যাকশনে সহপাঠি বন্ধুকে যেতে দেখে অনেকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগ দেবার ভেক দেখিয়েছিল।

সে ভেক দেখিয়েছিল বলেই যে তাকেই নিতে হবে, বিপ্লবী দলে এমন কোনো নিয়ম নেই। বরং অহেতুক অতি উৎসাহ দেখতে পেলেই অভিজ্ঞ ষড়যন্ত্রকারী বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন। ভেতর সত্য গুপ্ত ও তাঁর সহকর্ম্মিদের সামরিক ধাঁচে সংগঠন এবং অনুশীলনের ফলে বি ভি দলে যে বড় রকম একটি সুইসাইড স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই, এ্যাকশনের শেষে আত্মবলিদানে যে স্কোয়াডের ছেলেরা ছিল এক কথায় রাজী, কিন্তু তবু চূড়ান্তভাবে নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে আরও অনেক বেশী সাবধানতা অবলম্বনের অবকাশ ছিল না কি?

আমার মনে আছে, ১৯৩৪ সালে আমি যখন আমাদের গ্রামের বাড়ীতে অন্তরীন ছিলাম, তখন ভাজপুর গ্রামের ইন্দু সরকার আমায় বলেছিল, এমন দুটি ছেলে দিতে পারেন, যারা এ্যাকশনের শেষে আর ফিরে আসবে না বা ধরা দেবে না?

আমার সংগঠনে তখন বিভিন্ন গ্রামের অনেক ছেলে ছিল, যাদের মধ্যে সুইসাইড স্কোয়াডে যোগ দেবার মত সাহসী ছেলের অভাব ছিল না। কিন্তু অনেক ভেবে চিন্তে এবং মনে মনে অনেক রকম বাচাই করে আমি ইন্দুকে বলেছিলাম, দুটি পারব না, একজনকে দিতে পারি।

তারপর অবশ্য ইন্দু আর একদিন জানিয়ে গেল, দরকার নেই, পাওয়া গেছে।

আমার ধারণা, রবীর স্বীকৃতিমূলক বিবৃতির জন্য তার দুর্ব্বলতা যতখানি দায়ী, ওকে যিনি নির্ব্বাচন করেছিলেন, তাঁর নির্ব্বাচনের ত্রুটিও ততখানি দায়ী। অবস্থার চাপে পড়ে রবী বাধ্য হয়ে বিবৃতি দিয়েছিল বলে প্রচার করে

তার অন্যায় কাজকে হোলাইট ওয়াশ করবার যেমন কোন কারণ নেই, তেমনি বৈপ্লবিক কর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বি ভি-র একটানা অন্যের মধ্যে কোনও ত্রুটির ফলে যদি কখনও পরাজয় ঘটে থাকে, তাহলে সেই পরাজয়কেও যেন রেগুলার সৈনিকের মতই নৈতিক সাহস দেখিয়ে মেনে নিতে পারি। সত্য গুপ্ত কি সেই শিক্ষাই দেননি?

চল্লিশ ডিগ্রিতে কখনো ফুটপাথের সেলে, কখনো আমার সেলে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনে এই সব আলোচনা করতাম।

কিন্তু মাত্র পনেরো দিন, তারপরই এসে গেল যেন কর্তৃপক্ষের নয়া ফরমান, আমাকে হয় ডিগ্রিতে স্থানান্তরিত করা হল।

আমরা দুজন কিন্তু উল্লসিত হয়ে উঠলাম, কারণ ওখানেই আছে রবী বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার মুখোমুখি রবীর কৈফিয়ৎ শুনতে পাবার সুযোগ হল। ভেলায় সুধীর মুখার্জী একটা ভুল স্বীকারোক্তি দিয়ে আবারও যে কি ভুল করছে, বুঝি তা বুঝতেও পারল না।

ধলা বাড়ি তখন নিয়ে হয় ডিগ্রিতে গিয়ে দেখলাম, এক নম্বর সেলে আছে রবী। ভাবলাম, তাড়াহুড়া কিসের, থাকতেই ত এসেছি, দু একদিন যাক, তারপর ওকে ধরা যাবে। দেখলাম, সত্যিই রাজপুত্রের মত চেহারা, খুব ফিটফাট থাকে, ঘাট বিহীনা টেবিল চেয়ার চমৎকার করে সাজানো।

কিন্তু হায়, সুধীর মুখার্জী চালাক হয়ে গেছে, যে করেই হোক, জেনে ফেলেছে যে, আমি বি ভি দলের সদস্য, দলের কমকেমর, যার মারাত্মক বিচ্যুতির ফলে কয়েকটি ছেলে ও একটি মেয়ের সাজা হয়ে গেছে, তাকে হয়ত আমি ভাল চোখে দেখব না, ক্ষমা করব না, বাগে পেলে ছেড়ে দোব না।

তাই আমি পৌঁছবার আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে গেল জেলারের পরবর্তী হুকুম। রবীকে স্থানান্তরিত করা হল চল্লিশ ডিগ্রিতে, আমার নাগালের বাইরে।

না, রবীর সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

রবীর স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে আলোচনা হল, এবার সেই দুঃসাহসিক অভিযানের কথা বলি।

দুঃসাহসিক অভিযান বি ভি বিপ্লবী দলের পক্ষে তখন আর নতুন কিছু নয়। পুলিশের বড় কর্তা লোম্যানকে খতম করেছে তারা, শেষ করে দিয়েছে তারা মেদিনীপুরের বড় কর্তা সিম্পসনকে, ঘমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে তিন বছরে মেদিনীপুরের তিন-তিনটে মেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে—পেডি, ডগলাস ও বার্জ, ঢাকার পুলিশ সুপার হডসনকে তারা পঙ্গু করে দিয়েছে চিরদিনের মত, তাছাড়া অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি করে তারা সাংগঠনিক দক্ষতা, নির্ভুল পরিকল্পনা ও অতুলনীয় সাহসের স্বাক্ষর রেখেছে।

তাই ১৯৩৪ সালের ২২ এপ্রিল ঢাকা শহরে একটি গুপ্ত সভায় যখন প্রস্তাব উঠল যে, এবার খতম করতে হবে গভর্নর এ্যাণ্ডারসনকে, সবাই এক বাক্যে তা সমর্থন করল। বিপ্লবী বীণা দাসের রিভলভারের গুলী আগেকার গভর্নর জ্যাকসনের গায়ে লাগেনি বটে, কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে সে বিলেতে চলে গেছে। এ্যাণ্ডারসন হচ্ছেন অবরদস্ত প্রশাসক। এই অবরদস্ত বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এজেণ্টটি যেন কোনক্রমেই খসকে না যায়। তাই একজন নয়, যাবে দুজন, একই সঙ্গে চালাবে রিভলভার, ওকে শেষ করে রিভলভার নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিজেরাও শেষ হয়ে যাবে, পুলিশ যেন আর ঘটা করে মামলা সাজিয়ে বিচারের একটা প্রহসন করে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে বাহোবা না নিতে পারে।

এ্যাণ্ডারসন তখন সত্যিই অবরদস্ত গভর্ণর।

আয়ারল্যাণ্ডের গণচেতনা ও বৈপ্লবিক বিস্ফোরণ দমন করবার জন্য একদা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এ্যাণ্ডারসনকে পাঠিয়েছিল সেখানে, এ্যাণ্ডারসন চালিয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার, কথায় কথায় ঘোড়সওয়ারের আক্রমণ, কথায় কথায় গুলীবর্ষণ ও বেয়নেট চার্জ, নারী ও শিশুনির্বিশেষে বেওনেটের নিষ্ঠুর চালনা, গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসে বুটের লাথি, নির্জন দ্বীপে নিক্ষেপ করে খাদ্য ও পানীয় থেকে বঞ্চিত রাখা, এ্যাণ্ডারসন আয়ারল্যাণ্ডে এমন অপ্রতুপূর্ব বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল—যার প্রবর্তিত পদ্ধতিকে বলা

হত "ব্ল্যাক এ্যাণ্ড টান নীতি"—যা কলঙ্কিত করে তুলেছিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের আয়রল্যাণ্ড শাসনের ইতিহাস।

ব্ল্যাক এ্যাণ্ড টান নীতির প্রবর্ত্তনকারী সেই ঐতিহাসিক জহলাদকেই আবার পাঠানো হয়েছে ভারতবর্ষের বাছাই করা প্রদেশ বাংলায় এখানকার বৈপ্লবিক আগুন গুঁড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যে। রিভলভার তুলে নেয়া হল ভবানী ভট্টাচার্য্য ও রবী ব্যানার্জ্জীর হাতে।

রবীকে নির্বাচনের বেলায় দ্বিধা ছিল। বড়লোকের ছেলে, বিলাসে ব্যসনে বড় হয়ে উঠেছে, তার হাতের অগ্নিশলিকা ঠিক সময়ে ঠিকভাবে আগুন উদ্গীরণ করবে কিনা, প্রাণ নিয়ে খেলায় সে প্রাণ দেবার অটল সাহস শেষ পর্য্যন্ত দেখাতে পারবে কি না—কিন্তু রবীর উৎসাহ প্রচণ্ড. ভবানী তার প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠি, কোনো কাজেই একে অন্যকে ছাড়েনি, আজ প্রাণ দেবার আহ্বান আসতেই কি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে—রবীর ভাবাবেগকে শেষ পর্য্যন্ত আর উপেক্ষা করা গেল না।

ওরা দুজন চলে এল কলকাতায়. নেতা জ্যোতিষ গুহের সঙ্গে গোপনে মিলিত হল. জ্যোতিষ গুহ প্ল্যান বললেন, কলকাতায় এ্যাণ্ডারসনকে বাগে পাওয়া যাবে না, যেতে হবে দার্জ্জিলিং-এ, ট্রেণের সময় ও যায় সেখানে, সেখানে ওর সিকিউরিটির ব্যবস্থায় খানিকটা শিথিলতা থাকতে পারে।

জ্যোতিষ গুহের প্ল্যান নিয়ে ভবানী ও রবী ফিরে এল জয়দেবপুরে।

সেখানে এরা যে আবার গুপ্ত বৈঠক বসল।

এ্যাণ্ডারসন তখন রাষ্ট্রমুখী হয়ে উঠেছে। অভিজ্ঞাদের পর অভিজ্ঞাদ জারী করে দলে দলে গ্রেপ্তার করে জেল ও বন্দীশিবির ভরে ফেলেছে, বড় লাটের কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে তার সুপারিশক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জো-হুকুম মার্কা সদস্যদের সমর্থনে সংশোধিত করে নিয়েছে অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ভারতীয় দণ্ডবিধি এবং আরও কয়েকটি সর্ব্বনাশকর আইন, যাতে খুনীকে যখন তখন বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করা যায়, বিনা বিচারে যতদিন খুশী আটক রাখা যায়, বাংলার রাজবন্দীদের প্রয়োজন-বোধে গুজরাটে, পাঞ্জাবে, মাদ্রাজে, এমন কি, সুদূর বর্ম্মাতেও আটক রাখা যায় এবং কোন কোন আইন ভঙ্গের অপরাধে যাতে দীর্ঘতরো মেয়াদী দণ্ডে দণ্ডিত করা যায়।

কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা যে কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত, এমন কি জীবন বিসর্জ্জনেও যারা পশ্চাদপদ নয়, এ্যাণ্ডারসনের ব্ল্যাক ও টান নীতিকে তারা কেন কেয়ার করবে?

তাই জ্যোতিষ গুহের প্ল্যান জয়দেবপুরের বৈঠকে পুরোপুরি অনুমোদিত হল

ভবানী ও রবী ট্রেনে দার্জ্জিলিং রওনা হল।

পৌঁছল সেখানে ৮ঠা মে

উঠল তারা দুইজন দুইটি হোটেলে

দার্জ্জিলিং-এ বেড়াতে কত লোকই ত আসে সারা বছর ধরে।

সুতরাং কে তাদের সন্দেহ করবে?

প্ল্যানমত কলকাতা থেকে রওনা হল মনোরঞ্জন ব্যানার্জ্জী আর উজ্জ্বলা মজুমদার

ওরা গিয়ে উঠল গো ভিউ হোটেলে।

ওদেরই বা কে সন্দেহ করবে? উজ্জ্বল চেহারার কিশোর ও কিশোরী, এমনি জোড়ায় জোড়ায় হামেসাই আসে দার্জ্জিলিং-এ বেড়ানোর ট্রিপে। ওদের সঙ্গে আবার একটা বায়বয় হারমোনিয়াম। সুতরাং—

যে দেখল ওদের, সে-ই হয়ত অর্থবোধক মুচকি হাসল মাত্র।

কিন্তু উজ্জ্বলার ঐ নিরীহ বাদ্যযন্ত্রের খোলের মধ্যে যে একটি মারাত্মক যন্ত্র—একটি ভারী রিভলভার আত্মগোপন করে রয়েছে, তা কেউ জানতে পারল না।

লাট সাহেব শীতের দেশের মানুষ, বাংলা দেশের গরম সইতে পারেন না। তাই গ্রীষ্মের কটা মাস তিনি দার্জ্জিলিং-এ থাকেন ম্যালের কাছে পাহাড়ের ওপর

বিরাট অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, গভর্নর হাউস। কিন্তু কলকাতা থেকে তিনি একা চলে এলে ত চলবে না, নিরীহ গোবেচারা বাংলার অধিবাসী ভারতীয় প্রজাদের শান্তি, নিরাপত্তা ও সুখের ভার যাঁর স্কন্ধের ওপর ন্যস্ত, ব্ল্যাক এ্যাণ্ড ট্যান নীতির মুষল চালিয়ে বাংলার বিপ্লবীদের মাথাগুলি দু ফাঁক করে ফেলবার পবিত্র দায়িত্ব পালনের শপথ নিয়ে যিনি সেই সাত সমুদ্রের ওপার থেকে বহু যেরনত করে বাংলায় শুভাগমন করেছেন, তাঁর পক্ষে কি আর, গ্রীষ্মের মাত্র কটি মাস কেন, একটি দিনও একা একা দার্জিলিং-এ অবসর যাপন করা সম্ভব? তাই এ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে সঙ্গে দার্জিলিং-এ এসেছে তার সেক্রেটারীর দল, আমলা কর্মচারীরা, পাইক বরকন্দাজ, বহু বাবুর্চি আর রাশি রাশি হাইল। সঙ্গে, বলা বাহুল্য, পুলিসের বড় কর্তা থেকে সুরু করে মেজ, সেজ, ন, এমন কি, ছোট কর্তাও সদলবলে সশস্ত্র হাজির হয়েছেন দার্জিলিং শহরে।

গ্রীষ্মের কটি মাসের জন্য গোটা বাংলার প্রশাসন যেন দার্জিলিং-এ স্থানান্তরিত হয়েছে।

আবার রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্য দেশের রাজা মহারাজা নবাব বাদসা রায় বাহাদুর রায় সাহেবরাও দার্জিলিং-এ এসে গভর্নরের আশে পাশে ঘুর ঘুর করে ঘুরছেন হুজুরের কৃপা দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য।

অবশ্য সে যুগে, এ্যাণ্ডারসনের আর দোষ কি, গোটা ভারতবর্ষের রাজধানীই গ্রীষ্মকালে উত্তপ্ত শহর দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত হত মনোরম শীতের শহর সিমলায়।

লাট সাহেব দার্জিলিং-এ এলেই সেখানে নানারকম ফাংশনের আয়োজন হত। ককটেল পার্টি, ডিনার ও বল্-ড্যান্স, ফুলের প্রদর্শনী এবং ঘোড়দৌড়। দার্জিলিং-এর মত পার্বত্য শহরে শুধু লাট সাহেবদের আনন্দদানের জন্যই তৈরী হয়েছিল বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র রেস কোর্স লেবং-এর পাহাড় কেটে, খাদ ও গহ্বর ভরাট করে।

খবর পাওয়া গেল, একটি ফুলের প্রদর্শনীতে গভর্নর আসবেন।

ভবানী ও রবি হাজির হল সেখানে ইয়োরোপীয়ান পোষাকে।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে, প্রদর্শনীর অভ্যন্তরে ঢুকতে পারল না তারা।

তারপর এল সেই স্মরণীয় দিবস, ১৯৩৮ সালের ৮ মে।

লেবং-এ আজ ঘোড়দৌড় হবে। গভর্নরের কাপের প্রতিযোগিতা হবে। অবশ্যই এ্যাণ্ডারসন সেখানে যাবে জন সাধারণের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়।

সুতরাং এই হচ্ছে সুযোগ, সুবর্ণ সুযোগ!

সকাল হতেই মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে গেল। মনোরঞ্জন রিভলভার দুটো ভাল করে পরিষ্কার করল। উজ্জ্বলা হিটারের সামনে ধরে ধরে গুলিগুলো গরম করে তুলল। নাঃ, ঠিকই আছে পাওপত অস্ত্র দুটি, বুলেটের ম্যাগাজিন ঠিকমতই রিভলভ করছে।

অপরাহ্ণ হতেই ভবানী ও রবী পরল ইয়োরোপীয় পোষাক। ভবানী নিল পাঁচ ঘরা রিভলভার আর রবী সাতঘরা। প্রতিটি চেম্বারেই গুলী ভরা। সঙ্গে কিছু অতিরিক্ত বুলেট। বলা যায় না, ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর ঘোড়সাওয়ার ইংরেজ সরকারের সঙ্গে বিনয়, বাদল ও দীনেশের যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়ে গেছে, দার্জিলিং-এর লেবং রেসের দৌড়ের মাঠে হয়ত তারই পুনরাবৃত্তি হবে, তাই অতিরিক্ত বুলেট। নইলে জল্লাদ এ্যাণ্ডারসনকে খতম করার জন্য দুই বন্ধুর দুটো বুলেটই যথেষ্ট।

একখানা ট্যাকসিতে ওরা দুজন রওনা হল, ওদের অনুসরণ করল আরেকখানা। তাতে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা।

টিকিট কিনে ওরা দুজন মাঠে ঢোকবার সময় মনোরঞ্জন ইসারায় এ্যাণ্ডারসনকে চিনিয়ে দিল।

তারপর সহকর্মিদের সাফল্য কামনা করে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনোরঞ্জন ও উজ্জ্বলা ট্যাকসি ঘুরিয়ে সোজা রওনা হল পঞ্চাশ মাইল দূরে শিলিগুড়ী অভিমুখে। সেখানে গিয়ে গুড্ বয় ও গুড্ গার্লের মত

ওরা কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে নিরীহ যাত্রী ও যাত্রিণীর মত বসে রইল।

বিষের ক্ষুদ্রতম ঘোড় দৌড়ের মাঠ দেখে না থাকলে ঠিক বোঝানো যাবে না। দার্জিলিং শহর থেকে বেশ দূরে, শহরের অনেক নীচে, পাহাড়, পর্বত, জঙ্গল কেটে তৈরী করা হয়েছে। গোলাকার বটে, কিন্তু দর্শকদের বসবার জন্ম নেই তেমন কোন ভাল গ্যালারির ব্যবস্থা। দর্শকদের ভিড় ঠেকাবার জন্ম অস্থায়ী ভাবে কাঠের রেলিং খাড়া করা হয়েছে। শুধু একদিকে লম্বা শেড, তার নীচে উচ্চতর শ্রেণীর দর্শকেরা বসেন রেস দেখবার জন্ম কোনো বাইনোকুলারের প্রয়োজন হয় না।

সেই শেডের নীচেই গভর্নরের গ্র্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড পাথরে বাঁধানো কয়েকটি ধাপের সিঁড়ি, ওপরে পাথর-বাঁধানো প্ল্যাটফরম। সিঁড়ির দুধারে পাথর-বাঁধানো রেলিং-রেলিং, প্ল্যাটফরমের তিনদিকে কোমর-সমান উঁচু রেলিং। গ্র্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডটি ঘিরেও তাই।

শহর থেকে দূরে হলে কি হবে, দর্শকের ভিড়। আজকের ভিড় আরও বেশী, কারণ গভর্নরের কাপ খেলা হবে আর গভর্নর স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিজেতার হাতে কাপটি তুলে দেবেন। রাজা, মহারাজা, শহরের গণ্যমান্য বিলাসী জনগণ, সরকারী অফিসারেরা সবাই এসেছেন। তাঁদের মধ্যে গ্র্যাণ্ডষ্ট্যাণ্ড আলোকিত করে বসে আছেন বাংলার অবসরপ্রাপ্ত গভর্নর স্যার জন এ্যাণ্ডারসন। পাশে মধ্যবর্তী এভিকং, ষ্ট্যাণ্ডের অদূরে পুলিশের কর্তারা ও সশস্ত্র পুলিশ, ধৃত দর্শকদের ভিড়ের মধ্যেও মিশে রয়েছে সাদা-পোষাক সশস্ত্র আই বি-র লোক।

রেস খেলা ও দেখার নেশায় মশগুল ওরা কেউ দেখেও দেখল না যে, গ্র্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে গভর্নরের দুপাশে ইয়োরোপীয় পোষাকে দুটি কিশোর এসে দর্শকদের মধ্যে ভাল মানুষের মত আসন গ্রহণ করল।

রেস চলছে। রেস চলছে। রেস চলছে।

দর্শকদের হল্লাও চলছে।

কোন ঘোড়া জিতছে, কোন ঘোড়া হারছে।

জয়ী ঘোড়ার ওপর যারা বাজী রেখেছে, তারা উল্লাসে চীৎকার করে উঠছে। বাজীতে হারছে যারা, তাদের মুখ বেজার

এমন সময় ঘোষিত হল, দিনের সর্বাপেক্ষা বড় আকর্ষণ, এবার গভর্নরের কাপ খেলা হবে।

ঘোড়াগুলো সার বেঁধে দাড়াল, ষ্টার্টার সঙ্কেত করল, ঘোড়াগুলো বায়ু বেগে ছুটল। নেক টু নেক ছুটছে, কোনটা এগিয়ে যাচ্ছে দু ইঞ্চি, পেছনেরটা আবার নেক খাপ করে হাঁটু এগিয়ে দিচ্ছে, জকিরা ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে পায়ে পড়ছে, প্রাণপণে চাবুক চালাচ্ছে, দর্শকদের উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে যাচ্ছে, হল্লা ও চীৎকারে পাহাড়-পর্বত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে, রেস চলছে, রেস চলছে।

রেস এবার শেষ হল

দ্বিতীয়স্থানে এ্যাণ্ডারসন উঠে দাড়াল

এমন সময় অকস্মাৎ বিভ্রাটের শুরু, হ্রাম!

ভবানী পাথর-বাঁধানো রেলিংয়ের ওপর ডান হাত রেখে মাত্র আট নয় ফুট দূরত্বে থেকে গুলী চালিয়েছে

এ্যাণ্ডারসনের গায়ে গুলী লাগেনি

আবার গুলী চালাল ভবানী

গুলী ছুটল না।

এ্যাণ্ডারসনের এডিকং তৎক্ষণে পাল্টা গুলী চালাল, পর পর চার বার।

আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ল ভবানী। একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর।

রবী এবার উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল গ্র্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের সামনে, সিড়ি বেয়ে উঠল দুটো ধাপ, তারপর গুলী করল মাত্র পাঁচ ফুট দূর থেকে। এ গুলীও লাগল না এ্যাণ্ডারসনের গায়ে, চকিতে সে সরে গেছে, গুলী লাগল তার ট্রেনো বিস বটনের পায়ে।

আবার একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল রবীর ওপর। একজন সার্জেন্টের গুলী এসে লাগল। রবীও ধরা পড়ে গেল।

কুখ্যাত গভর্নর এ্যাণ্ডারসন বেঁচে গেল।

তার পরের কাহিনী সহজ সরল।

১৯৩৪ সালের ১৪ আগষ্ট গঠিত হল স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল, প্রেসিডেন্ট জে ইউনি, সদস্য আর এইচ পার্কার এবং এম. এইচ. এস. কাকজি।

ভবানী তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। কারণ, ইংরেজের মতে, হিজ মেজেষ্টিজ গভর্ণমেন্টের পক্ষে আইনানুগ ভারতীয় প্রজাবর্গের জীবন, সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব যে স্বার্থত্যাগী রাজকর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত আছে, মৃগয়ার মত তাদের হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত, সেই ঘুনীদের যত শীঘ্র সম্ভব সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা দরকার!

তাই পর পর শুনানী চলতে লাগল দার্জিলিং-এ।

১৭ সেপ্টেম্বর রায় দিলেন স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যাল—প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল ভবানী ভট্টাচার্য, রবী ব্যানার্জী; অমিয়া ওয়কে উজ্জলা মজুমদারের প্রতি দুটি দণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও চোদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড, তবে দুটি দণ্ড এক সঙ্গে চলবে, সুকুমার ঘোষ ও মধুসূদন ব্যানার্জী দণ্ডিত হল চোদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে আর সুশীল চক্রবর্ত্তীর হল বারো বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

যথারীতি আপীল হাইের করা হল হাই কোর্টে।

মনোরঞ্জনের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আর উজ্জলার চোদ্দ বৎসর। বাকি সবারই আপীল ডিসমিস হয়ে গেল।

ভবানী ও রবীকে খুব করে তুলে খবর আদায়ের জন্য পুলিশ যখন হাজারো প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে কিছুই করতে না পেরে অবশেষে অমানুষিক নির্য্যাতন চালিয়েছিল, রবী তখন সইতে না পেরে স্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দিয়েছিল আর ভবানী বলেছিল নির্ভীক নিঃশঙ্ক কণ্ঠে, হ্যাঁ, আমি এ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করতে এসেছিলাম, চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, গুলী তার গায়ে লাগেনি। আমি কোনো অন্যায় করিনি। এ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করতে পারলে আমি অত্যন্ত খুশী হতাম।

১৯৩৪ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে ভবানীর ফাঁসী হয়ে গেল।

বি ভি বিপ্লবী দলের শহীদ তালিকায় আর একটি নাম সংযোজিত হল।

ভবানী ভট্টাচার্য্য বাংলার গভর্ণর জন এ্যাণ্ডারসনকে সেবং ফোড় দৌড়ের মাঠে সেদিন হত্যা করতে পারেনি সত্য, কিন্তু শহীদের অবিস্মরণীয় অপরিম্লান স্মৃতি ব্ল্যাক এ্যাণ্ড টান নীতি প্রবর্ত্তকের কলঙ্কময় ইতিহাসকে ধ্বংস করেছে!

আলীপুরের 'এ্যাণ্ডারসন হাউস' নামীয় সেই বিশাল অট্টালিকাটি আজ রক্তাক্ত তিলক ধারণ করে ধন্য হয়েছে —'ভবানী ভবন।'

আক্রান্তের সমাধির ওপর আততায়ীর বিজয় বৈজয়ন্তী!

ফরাসী বিপ্লব মানুষের মনে এনে দিল এক অপরূপ আশার আলো—সে তার নিজের ওপরে বিশ্বাস।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর, প্যারিসের নোতারদাম গির্জায় এক বিচিত্র উৎসবের আয়োজন হোল—যুক্তি ও যুক্তির উৎসব। যুক্তিদেবীরূপে সাজিয়ে বসানো হোল এক সুন্দরী মহিলাকে। সত্যের মন্দিরে চলল যুক্তির পূজা।

আদর্শবাদীর স্বপ্ন, মানুষের চিরকালের স্বাধীনতা পিপাসা ঐ একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠল আর তারপরেই নেমে এল অন্ধকার, এই আন্দোলনের নেতাদের হত্যা করা হোল গিলোটিনে।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

(ত্রিশ

সি সি আর নামে একটি অভিনব বস্তু আছে, প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীকেই প্রতিবছরই যার সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

সি সি আর-এর পুরো নাম, কনফিডেনশিয়াল ক্যারেকটার রোল। প্রতি আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ ১ এপ্রিল থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত যে বারোটি মাস কেটে গেল, আপনি যদি অফিসের কর্তা হন, তাহলে সেই গত বারো মাসে অধীনস্থ কর্মচারীদের, নৈতিক চরিত্র নয়, চাকরিগত চরিত্র সম্বন্ধে যা যা আপনি লক্ষ্য করেছেন, তার বিবরণ একটি নির্দিষ্ট ফরম-এ পূরণ করে গোপনভাবে আপনাকে পাঠাতে হবে আপনার ওপরওয়ালার কাছে। আপনার নিজের সি সি আর আপনার ওপরওয়ালা পাঠান তাঁর ওপরওয়ালার কাছে। এমনি করে ওপরে যেতে যেতে বোধ হয় গভর্নরের কাছে গিয়ে ওটা থেকে যায়, কারণ গভর্নরের সি সি আর কে পাঠাবেন ? প্রদেশে কে তাঁর ওপরওয়ালা ?

হয়ত আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কারুর কারুর সঙ্গে আপনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই, যোগাযোগ থাকবার কোন কারণ নেই, রাখবার কোন উপায় নেই, হয়ত তিনি টাইপিষ্ট বা চিঠিপত্র প্রাপ্তি ও প্রেরণের বিবরণ রাখার কেরাণী, কালেভদ্রে আপনার চেম্বারে তাঁর আসবার প্রয়োজন হতে পারে, তথাপি সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী আপনাকে তাঁর চাকরিগত ক্যারেকটারের প্রতি সজাগ দৃষ্টি প্রসারিত রাখতে হবে। কি করে তা সম্ভব ? তা কে জানে ? সরকারী নির্দেশ অলঙ্ঘ্য !

রোল লেখার পর ডেকে পাঠাতে হবে ডেসপ্যাচ কেরাণীকে। তাঁর কাছ থেকে ডেসপ্যাচের পরবর্তী ক্রমিক নম্বরটি জেনে নিয়ে ফরোয়ার্ডিং চিঠিতে স্বহস্তে সেই নম্বরটি বসাতে হবে। কেরাণী তাঁর ডেসপ্যাচ রেজিষ্টারে নম্বরটি লিখে বিবরণের কলমে লিখে রাখবেন, a confidential memo by Superintendent অথবা Director বা Inspector General বা যাই হোক।

তারপর স্বহস্তে খামের ওপর ওপরওয়ালার নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে, স্বহস্তে তার মধ্যে ভরে ফেলতে হবে সেই সি সি আর, তারপর কেরাণী আপনার চোখের সামনে খামখানা ষ্টীমরোলার করে ওপরে লাল কালিতে লিখে দেবেন, Confidential আস্তে না, এখনও কাজ শেষ

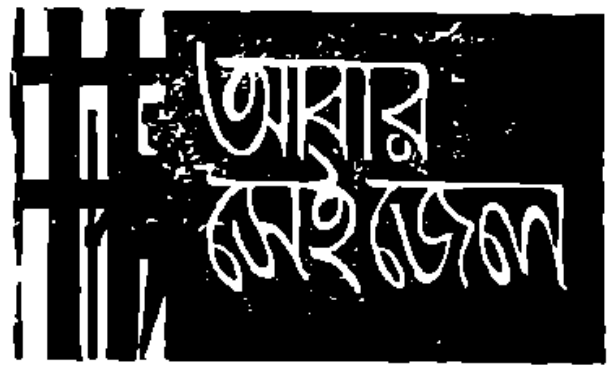

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

হয় নি ! ঐ ষ্টীমরোলার করা খামখানা আরেকখানা খামের মধ্যে ভরতে হবে স্বহস্তে, কেরাণী তার ওপর ওপরওয়ালার শুধু পদবি ও ঠিকানা ও ক্রমিক নম্বর লিখে দেবেন। বড় খামের ওপর কিন্তু Confidential কথাটা লেখা থাকবে না।

যেখানে যাবে ঐ গোপনীয় চিঠিখানা, সেখানকার স্পেসিফিক কেরাণী বাইরের খামের ওপরে লেখা মেমো নম্বর রেজিষ্টারে লিখে খামখানা ছিঁড়ে ফেলবেন। ভেতরের ষ্টীমরোলার করা খামের ওপর Confidential শব্দটি দেখে এবং প্রেরক ও প্রাপকের নাম দেখে তাঁর রেজিষ্টারের

বিবরণের কলমে লিখবেন, a sealed confidential memo from Director অথবা Superintendent of অমুক ডিপার্টমেন্ট বা জেল, যাই হোক।

এসব ব্যবস্থাই গোপনীয়তা অটুট রাখবার জন্য।

কিন্তু আমাদের আই জি গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারে এর পরেও আর এক কাঠি ছিলেন। তাঁর অফিসের কাউকেই বিশ্বাস করতেন না তিনি। হেড এ্যাসিস্টেন্টকে না, ইন্টারন্যাল অডিটরকে না, সাধারণ কেরাণীদেরও একেবারেই না, এমন কি, তাঁর নিজের পি এ অথবা টেনো কাউকেই না। ঐ যে রিপিট কেরাণী, হেড এ্যাসিস্টেন্ট ও পি এ-র হাত ঘুরে কনফিডেনশিয়াল চিঠি তাঁর হাতে আসবে, আই জির আশঙ্কা ছিল, ওরা কেউ সি সি আর এর খামখানা মেরে দিতে পারে। সুতরাং তাঁর নির্দেশ ছিল, ওসব দুখানা থ্রি-টাইম নয়, একখানা স্টলমোহর করা খামই তাঁর নামে রেজেস্ট্রী ডাকে পাঠাতে হবে, যাতে করে পিয়ন সোজা এসে তাঁর হাতে ডেলিভারি দিয়ে যায়, পরে শুধু খামখানা তিনি রিসিট-কেরাণীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন মেমো নম্বরটা নোট করবার জন্য।

আই জি যতই সাবধানতা অবলম্বন করুন না কেন, জেল কোড বলে এমন একটি ধারা আছে, যার ফলে সি সি আর এর গোপনীয়তা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। তাতে আছে, সি সি আর-এ যদি কারুর সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকে, তাহলে ওপরওয়ালার কাছে পাঠাবার আগে তাকে সেটা দেখাতে হবে এবং seen and noted লিখিয়ে নিতে হবে। উদ্দেশ্য অবশ্য সাধু, দেখিয়ে যেন অনুচ্চারিত ভাষায় বলা হল, ওহে তোমার চাকরিগত ক্যারেকটার নির্মল নয়, মরলাগুলো তোমায় দেখিয়ে দিলাম, যাতে তুমি ওদিক সংশোধন করতে পার, যাতে আগামী বছর তোমার সি সি আর-এ এই বিরূপ মন্তব্যটি আমায় আবার না লিখতে হয়।

কিন্তু কার্যতঃ তা হয় কি! বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে জানবার ফলে বরং বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। আমার নামে কর্তার কাছে লাগাচ্ছ, যাতে আমার প্রমোশনটা বিলম্বিত হয়ে যায়? আচ্ছা, আমিও দেখে নোব তোমাকে। ফলে গোপন ষড়যন্ত্র সুরু হয়ে যায়, দল পাকানো চলে, চলে রেষারেষি, তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

ঠিক এই seen and noted করাবার পদ্ধতিটি নিয়েই আই জি-কে আমি পর পর কয়েকখানা চিঠি লিখেছিলাম। শেষ চিঠিতে লিখেছিলাম, জেল কোডের এই অভিনব ফলটি যদি অনিবার্যভাবে আমায় মেনে চলতে বলেন, ওটা অন্ততঃ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার নির্দেশ না দেন, তাহলে সি সি আর পাঠিয়ে আমি আমার অফিস-খরচ বৃদ্ধি করতে রাজী নই। আমার জলপাইগুড়ী জেলে একজন মাত্র ডেপুটি জেলার আর মাত্র দুজন কেরাণী, তাদের কারুর সম্বন্ধে অথবা জেলারের সম্বন্ধে কোন বিরূপ মন্তব্য তাদের দেখালে পরিণামে পাবলিক সার্ভিসই ক্ষুণ্ণ হবে। সেটা নিশ্চয়ই গভর্নমেন্টের কাম্য নয়।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মাস দুয়েক পত্রযুদ্ধ করবার ফলে আমাদের আই জি, যিনি জীবনে অযাচিত কোন কর্মচারীর কোন প্রস্তাব বা পরামর্শই গ্রহণ করেন নি, তিনিও আমার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করলেন এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঐ seen and noted করাবার অদ্ভুত নিয়মটি স্থগিত রাখলেন সাময়িকভাবে।

আমি আসবার আগে ডিস্ট্রীক্ট মেডিক্যাল অফিসার এক্স-অফিসিও সুপারিনটেনডেন্ট থাকাকালে জলপাইগুড়ী জেল গভর্নমেন্টকে অনেক দাগা দিয়েছিল। ডাক্তারের সঙ্গে অফিস ষ্টাফের বনিবনা ছিল না, আবার অফিস ষ্টাফ, যাঁদের সংখ্যা মাত্র তিন জন, তাঁদের মধ্যেও যেন রেষারেষি ছিল। ডাক্তারের গায়ে বর্ষীয়া তিন তিনবার মরলারেশানো জল ছুঁড়ে মেরেছিল আর ষ্টাফ তিনজনের সবাই সবার নামে আই জি-র কাছে এক কাহন করে নালিশ জানাত। গভর্নমেন্ট কোন সুরাহা করতে না পেরে অবশেষে এক্স-অফিসিও সুপারের স্থলে ডিপার্টমেন্টাল সুপার হিসেবে আমায় পাঠিয়েছেন জলপাইগুড়ী জেলের অশান্তি দূর করবার জন্য। অশান্তি যে অনেকটা দূরীভূত হয়েছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাকিটা দূর করবার জন্য আই জি-র সঙ্গে কনফিডেনশিয়াল

পত্রালাপের মাধ্যমে যে অনেক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম, সি সি আর পাঠাবার ই অদ্ভুত নিয়মটা সেই কাজে যে বাধার সৃষ্টি করত, সে বিষয়ে আদৌ সন্দেহ নেই। তাই আই জি বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমার পাবলিক সার্ভিসে যে সাহায্য করেছিলেন, তার সঙ্গে তা স্বীকার করি!

সেপ্টেম্বর মাস। ১৯৬১ সাল।

রবীনবাবু চতুর্গুণ উৎসাহে আমার কোয়ার্টার্স তৈরীর কাজে লেগে গেছেন। কোয়ার্টার্সের প্ল্যান সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি। সরকারী অফিসারদের কোয়ার্টার্স সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্ধারিত প্ল্যান তৈরী করা আছে। পদমর্য্যাদার তারতম্যে বিভিন্ন অফিসার বি ডি ও ইত্যাদি মার্কা কোয়ার্টার্স পাবার অধিকারী ডিসট্রিক্ট ম্যাপে পেতে পারেন এক টাইপ প্ল্যানের বাড়ী কোন্ উর্দ্ধর্তন ইঞ্জিনীয়ার আমার বাড়ীর প্ল্যান তৈরী করেছিলেন জানি না, অন্যান্য ত্রুটির কথা বাদ দিলেও এর প্রধান একটা ত্রুটি ছিল যে, পায়খানা পরিষ্কার করবার জন্য সুইপারকে আড়ু ও বালতি নিয়ে যেতে হবে ড্রয়িং রুম, ডাইনিং রুম ও শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে আমি আপত্তি জানালাম, বললাম, পায়খানার বড় জানালাটাকে উইদাউট ফেল ডোর করা হোক।

রবীনবাবু আমার যুক্তি অনুধাবন করে নিয়ে গেলেন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, যতদূর মনে পড়ে, ডি মুখার্জ্জীর কাছে। মুখার্জ্জীও আমার সমর্থন করলেন এবং প্ল্যান পরিবর্ত্তনে সম্মতি দিলেন।

সেই প্ল্যানেই বাড়ী তৈরী হচ্ছে। দেওয়ালগুলো এরই মধ্যে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে। এখন ছাদ ঢালাই হবে। তারপরেও অনেক কাজ বাকি আছে। জানালা দরজা, ঘরের মোজাইক মেঝে, প্লাম্বিং, গ্যারেজে কোলাপসিবল গেট, ইলেকট্রিক ওয়ারিং, হোয়াইট ওয়াস, সামনের রাস্তা, গেট ইত্যাদি। কিন্তু রবীনবাবুকে দেখে মনে হচ্ছে, যেভাবে আদাজুন খেয়ে লেগে গেছেন, বাজীতে জিতবেনই এবং আমার এই নতুন কোয়ার্টার্সের ডাইনিং স্পেসে উজ্জ্বল আলোর নীচে বসে দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর রাত্রে খাবেনই পোলাউ আর মাংস।

একদিন বেলা সাড়ে বারোটায় বাড়ীতে ফেরার সময় রবীনবাবুর কাজ দেখতে গেলাম।

বললাম, রেডি হন মিঃ গাঙ্গুলী মহাষ্টমীর রাত্রের জন্য।

হেসে বললাম, এখন অবশ্য আর সাত বাঁও জলের নীচে পড়ে আছেন বলা যাচ্ছে না, তবুও এখনও কয়েক বাঁও ত বটেই। আপনার হলেই ত শেষ হবে না। এর পর পলাই লস্করি চালে আসবেন ইলেকট্রিকেল ডিভিশন, তারপর প্লাম্বার মহাশয় আর আপনারও ত হাত বাকি রয়েছে এখনও—

ও ত একদিনের কাজ তারপরই হেসে ফেললেন, আমরা একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে মোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছি আপনার সঙ্গে বাজীর কথা। উনিও আপনার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছেন এবং পি ডবলিউ ডি-র ইতিহাসে যা কোনদিন করা হয় নি, তাই করা হয়েছে, প্লাম্বিং-এর কনট্রাক্টর এর মধ্যেই এ্যাপয়েন্ট করা হয়ে গেছে, ইলেকট্রিক্যাল ডিভিশনকেও বলা হয়েছে, তারাও মাপজোক করে গেছে।

উদাসকণ্ঠে বললাম, তথাপি কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না, there is many a slip between the cup and the lip, সুতরাং নবমীর রাত্রের জন্য আপনিও একেবারে আনরেডি থাকবেন না যেন।

রবীনবাবু হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, হলদিবাড়ী বেড়াতে যাবেন বলেছিলেন না, কাল চলুন।

কখন?

বেলা দুটোর সময়। আপনি রেডি থাকবেন, আমি তুলে নিয়ে যাব।

ফিরব কখন?

সন্ধ্যে হয়ে যাবে, রবীনবাবু বললেন, হলদিবাড়ীর হাট। দেখবেন, ওখানে কি বড় বড় কৈ মাছ পাওয়া যায় আর কি সস্তা।

মুহূর্তে রাজী হলাম, বেশ যাব এবং থলি নিয়ে যাব।

পরদিন সকালে অফিসে আসতেই জেলার রিপোর্ট করলেন যে, নতুন তৈরী সেলের মধ্যে যে দুটো খালি আছে, তার একটির মধ্যে দুখানা নতুন কম্বল পাওয়া গেছে। তালাবন্ধ সেলে ষ্টোর থেকে আনইস্যুড দুটো কম্বল কি করে গেল, বোঝা যাচ্ছে না। ভোর পাঁচটায় ডিউটি সিপাই এসে ওদুটো দেখতে পেয়ে ষ্টোরের সিপাই বাবুরাম সিংকে খবর দেয়। বাবুরাম আর ষ্টোর ক্লার্ক অজিতবাবু তৎক্ষণাৎ ষ্টক মিলিয়ে দেখতে পান, সত্যিই দুটো কম্বল বেশী আছে। ষ্টোরের চাবি অজিতবাবুর কাছে থাকে, কখনও প্রয়োজন বোধে একমাত্র বাবুরাম ছাড়া আর কারুর হাতেই চাবি দেন না তিনি। জেলার বললেন, বাবুরাম স্যার, খুব সৎ ও বিশ্বাসী—

তাহলে ষ্টোরের কম্বল কি করে বেরিয়ে এল আর কি করেই বা তালাবন্ধ সেলের কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল?

জেলারকে বললাম, ষ্টকে দুখানা কম্বল বেশী পাওয়া গেছে, এজন্য সবার আগে দায়ী করব ষ্টোরকিপারকে। তাই দায়িত্ব হবে নিজের নির্দোষীতা প্রমাণ করা। আপনি এক কাজ করুন, অজিতবাবুকে আমার এই মন্তব্যের কথা বলুন আর সঙ্গে সঙ্গে আপনিও এনকোয়ারি সুরু করুন। আজ দুপুরে অফিসের পর হলদি বাড়ী যাচ্ছি রবীনবাবুর সঙ্গে, বিকেলে আর অফিসে আসছি না। আপনি অজিতবাবুকে কাল আমার সঙ্গে দেখা করতে বলবেন।

হলদিবাড়ীতে পি ডবলিউ ডি-র একটা ইনসপেকশন বাংলো আছে। পাশেই বিরাট এরিয়া ঘিরে ওদের ষ্টোর। একজন সাব এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়ার কি সব কাইল ও কাগজপত্র নিয়ে এলেন। রবীনবাবু আধ ঘন্টার মধ্যেই সে সব কাজ শেষ করে ফেললেন, তারপর তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন মিনিট দশেক। তারপর ওকে বিদায় দিয়ে বললেন, চলুন মিঃ গাঙ্গুলী, এবার হাটে, হাট থেকে সোজা বাড়ী চলে যাব।

আমাদের জীপ হাটে এসে থামল।

বিশাল হাট। অসংখ্য স্থায়ী দোকান। মাড়োয়ারীর অনেকগুলো গদি। অনেকগুলোরই শান-বাঁধানো মেঝে, ওপরে হয় ছাদ, না হয় টিন করেকখানা দু তিনতলা বাড়ীও আছে। সারি সারি অসংখ্য চালা ঘর, অনেক অলিগলি। কোন দিকে নানা রকম শাক সবজি, কোথাও ফলফলারি, কোথাও সারি সারি মুদির দোকান, টেমনারী দোকানগুলিও বেশ বড়। এখানে ওখানে খোলা ময়দানে কত গরু মহিষের গাড়ী। গরু মহিষ খড় খাচ্ছে। দূর দূরান্ত গ্রাম থেকে ওতে করে এসেছে বিক্রেতা বা ক্রেতা। যেখানে সেখানে, হয়ত খোলা আকাশের নীচেই চায়ের দোকান, বেঞ্চিতে হেঁড় করে বসে বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অনেকে এই কাঠ ফাটা গরমেও দিব্যি চা খাচ্ছে। একটা বটগাছের নীচে আবার কয়েকটা সরবতের দোকান দেখলাম। চাকা লাগানো বাক্সের পাশে টেবিলের ওপর সাজানো নানা রং-এর জলভরা বোতল। বাক্সের মধ্যে কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ঢাকা বরফ আছে। চায়ের দোকানের মত সরবতের দোকানেও ভিড়।

সর্বত্র লোক গিজগিজ করছে!

বলে উঠলাম, বাঃ, এ যে দেখছি গ্রাম্য সুপার মার্কেট রবীনবাবু।

রবীনবাবু মৃদু হেসে বললেন, আগে এটা ছিল ছোট গ্রাম্য বন্দরের মত, কোনো কোঠা বাড়ী ছিল না। দু চারখানা মাড়োয়ারীদের টিনের চালা ছাড়া সারি সারি খালি খাপরা ছিল। তারপর যেই পাটিশন হল, এই হল বাড়ীই হয়ে পড়ল এদিক থেকে পশ্চিম বঙ্গের শেষ রেল-ওয়ে ষ্টেশন, ব্যস, অমনি হলদিবাড়ীর গুরুত্ব দেখতে দেখতে বেড়ে গেছে। ওপারের সঙ্গে এ পারের বে-আইনী ব্যবসা হরদম চলছে। দেখছেন না আশেপাশে কত লরী দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলা এদের কোন কাজ নেই, এমনি পড়ে থাকবে। রাত যত গভীর হবে, তত্তই বাড়বে এদের কর্মব্যস্ততা। টুপে-টুপে ওপারে চালান যাবে এপারের সস্তা জিনিষ আর নিয়ে আসবে ওখানে যা সস্তা। ওদিক থেকে এমনিভাবে এসে অনেক জিনিষ জলপাইগুড়ী পর্য্যন্ত চলে যায়। বড়লোকের সহর তাল দামে বিকিয়ে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, কেন, এখানে বর্ডার গার্ড দেবার জন্য পুলিশ আছে না?

রবীনবাবু শব্দ করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, চলুন, মাছের বাজারে যাই।

ভিড় ঠেলে রবীনবাবুকে অনুসরণ করে পশ্চিম প্রান্তে মাছের বাজারে এলাম। এবং হ্যাঁ, কৈ মাছের দর্শন মিলল। সেই কৈ মাছ, বহু বিভাগের পূর্বে যার অভিজাত নাম ছিল, বগুরেকৈ, এরা অবশ্য অসংখ্য উদ্বাস্তুর মত ওপারের যশোহর থেকে আসেনি, শুধু রূপে ও স্বাদে। অবিকল সেই রকম, দৈর্ঘ্যে—তা টেকি আটেক হতে পারে, গায়ের রং চিকন শ্যাম আর বুক লালচে হলুদ। ডালার ওপরে কিছুতেই তারা শান্ত হয়ে থাকতে চাইছে না, কাৎ দিয়ে মোৎ মেরে মেরে চলে যাবার চেষ্টা করছে বার বার ডালা পেরিয়ে পড়তে চাইছে, তাদের দামলে রাখতে হিমসিম খাচ্ছে দোকানী। সের দরে নয়, সংখ্যার বিক্রি, 'বাইশ' হিসেবে, বাইশ, মানে বাইশটা নয়, বত্রিশটা।

আমরা বেছে বেছে দুই বাইশ কিনে ফেললাম

বাড়ী ফিরতে রাত আটটা হয়ে গেল

আত্রেয়ী বলে উঠল, তা হবে না রবীনবাবু, আমি এখনই কৈ-তেলা রান্না করছি, আপনি এখানে খাবেন। আপনি বরং মাছগুলো বাড়ীতে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে আসুন।

রবীনবাবু আহার্য ও আহার সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতা করতেন, শুনে মনে হত ভদ্রলোক না জানি কত খাইয়ে, কিন্তু কার্য ক্ষেত্রে দেখা গেল উনি শুধু বক্তৃতার জাহাজ। বাটি থেকে খুব সাবধানে আলগোছে শুধু মাছটি তুলে নিলেন।

বুবুল বলে উঠল, ও কি মামা, কৈ-তেলার রসটাই যদি না পান, তাহলে মাকে বললেই পারতেন, আপনার মাছটা না হয় ভাজাই করে দিত।

জবাব দিলেন রবীনবাবু, হ্যাঁ—ঐ তেলগুলো খাই আর সারা রাত বাথরুমে দৌড়োদৌড়ি করি আর কি! তোর বাবার আর কি, স্বদেশী বলে যোগ দিয়ে স্বাস্থ্যখানা তৈরী করে রেখেছেন, ওসব তেল ঘাস নিমেষে জল হয়ে যাবে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আইসীর রাতে পোলাও কালিয়া খাবেন কি করে?

গম্ভীরভাবেই জবাব দিলেন, নবমী থেকে সাত দিন ওরে থাকব।

বুবু বলে উঠল, তবুও খাবেন?

হাসলেন রবীনবাবু, বুঝতে পারছিস না, বাজাল যে! সে লিভ্ টু ইট

সেদিনই রাত বারোটায় অকস্মাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুললাম, হালো!

ওধার থেকে জেলার বললেন, আমি জেলার বলছি স্যার। দুটো কয়েদী মারামারি করতে গিয়ে একজন আরেকজনের পেটে এমন জোরে লাথি মেরেছে যে, লোকটা মরে গেছে—

মরে গেছে?

হ্যাঁ স্যার, জেলার বললেন, আপনি একবার এলে ভাল হয় স্যার

এখখুনি আসছি

পশ্চিমের ঘরে আমার অডারলি হলধর ঘাটে ঘুমুচ্ছিল, তাকে ডেকে তুললাম, এবং দুজনে হন্ত দন্ত হয়ে জেল অভিমুখে রওনা হলাম

গিয়ে দেখি, হাসপাতালের বারান্দায় শায়িত একটি মৃত কয়েদী। চারিদিকে ডাক্তার, জেলার, ডেপুটি জেলার ও অনেকগুলি সিপাই। কয়েদীটির নাম? রসুল শেখ। মেরেছে কে? আসরফ মিঞা। এ্যাসোসিয়েশন ওয়ার্ডে জন ত্রিশেক কয়েদী থাকে। শোবার জায়গা নিয়ে রাত্রি ওদের দুজনের ঝগড়া হয়। তারপর যখন গালাগালি থেকে হাতাহাতি সুরু হয়ে গেল, অন্য কয়েদীরা তখন ওদের বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করে। টানাটানির মধ্যেই আসরফ রসুলের পেটে এক প্রচণ্ড লাথি মেরে বসে, রসুল পেট দুহাতে চেপে ধরে বসে পড়ে।

ওয়ার্ডের বাইরে যে সিপাই গার্ড দিচ্ছিল, সে যখন দেখল রসুল পেট চেপে ধরে বসে আছে, হাত ধরে টানা-টানিতেও আর উঠছে না, তখন তার টনক নড়ল। সে

জমাদারকে ডেকে আনল গেট থেকে। তালা খুলে জমাদার ও সিপাই ওয়ার্ডে ঢুকল। বহুলকে অবিলম্বে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। হাসপাতাল মাত্র চল্লিশ গজ দূরে হলেও কি হবে, ওর একা একা হেঁটে যাবার শক্তি নেই, তাই জমাদার দুজন কয়েদীকে দিয়ে বহুলকে হাসপাতালের বারান্দায় নিয়ে তুলতেই হঠাৎ সে হাত পা ছেড়ে দিয়ে নেতিয়ে পড়ল।

তৎক্ষণাৎ জেলারবাবু ও ডাক্তারবাবুকে খবর দেয়া হল।

ডাক্তার চক্রবর্তী পরীক্ষা করে বললেন, লোকটা মারা গেছে।

তৎক্ষণাৎ, মানে, রাত তখন প্রায় একটা, ডি. সি-কে আমি ফোন করলাম।

কে. জি. বোস শুনে বললেন, আচ্ছা আমি এস ডি ও-কে ফোন করে দিচ্ছি।

মিনিট কুড়ি পর এস ডি ও মিঃ সি কে চক্রবর্তী ফোন করলেন। বললাম সব বললেন, আচ্ছা, আমি কোতোয়ালী থানার ও সি-কে নিয়ে যাচ্ছি।

অর্থাৎ উনি এখন আটনাপুঘাটী ইনকোয়েষ্ট করবেন মোটামুটি যদি মনে হয় যে, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়, তাহলে কেসটা পুলিশের হাতে তুলে দেবার সুপারিশ করবেন। আমাদের জেল কোড আইনেও নির্দেশ আছে যে, যদি কোন কয়েদী এমনি ধরণের অপরাধ করেছে বলে মনে হয়, তাহলে সে কেস পুলিশকে দিয়ে দিতে হবে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য।

ও সি-কে নিয়ে চক্রবর্তী এলেন রাত আড়াইটেতে, ইনকোয়েষ্ট শেষ করে রিপোর্ট লিখে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন চলে গেলেন, তখন সাড়ে তিনটে বেজে গেছে।

এবারে আমার কাজ। এস ডি ও ইনকোয়েষ্টের কপি দিয়ে গেছেন, তাতে কেসটা পুলিশকে দেবার সুপারিশ করেছেন বটে, কিন্তু ফাইনাল ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট ব্যতীত অর্থাৎ কোন নালিশ ব্যতীত জেলের অভ্যন্তরে ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী সংঘটিত কোন অপরাধ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ পুলিশ করতে পারে না। সরকারীভাবে সেই নালিশ আমায় জানাতে হবে। সুতরাং পুরো ঘটনা, যতটুকু জানা গেছে, তা আমার মিনিট বুকে লিপিবদ্ধ করলাম, তারই এক কপি পাঠিয়ে দিলাম কোতোয়ালী থানার অফিসার-ইন-চার্জকে, সঙ্গে লিখে দিলাম সরকারী চিঠিতে যেমনটি ব্যবহার্য সেই জগৎ মত সহজ গৎটি, for information and necessary action! ব্যস, আমার কাজ শেষ।

বাড়ীতে যখন ফিরে এলাম বহুলকে নিয়ে, পূর্বাকাশ তখন ফর্সা হয়ে উঠেছে।

একেই বলে এসেনসিয়েল পাবলিক সার্ভিস!

পরদিন যথারীতি সকাল সাড়ে সাতটায় এলাম অফিসে।

একটু পরই এল ষ্টোর সিপাই বাবুরাম সিং।

বাবুরাম বলল যে, পরশু সন্ধ্যার পর কোর্ট থেকে একবারে পনেরো জন আসামী এসেছিল। বাবুরাম তখন রুটি তৈরী করে অফিসে আসতেই অফিসবাবু ষ্টোরের চাবিটা দিয়ে ওদের সবাইকে কম্বল বার করে দিতে বললেন। ষ্টোর জেলের ভেতরে। বাবুরাম যখন ষ্টোর খোলে, তখন সেখানে 'জমাদার সাব' ছিলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ জমাদার?

চন্দ্রনাথ দুবে।

বেশ, তারপর?

তারপর হুজোর, বাবুরাম বলতে লাগল, আমার একটু ভুল হইয়ে গেল। রোটি হইয়ে, লেকেন তরকারি ত হয় নাই, ওদিকে উনান পুড়িয়া যাইছে, তাই হামি জমাদার সাবকে বললাম, আপ কম্বল গুনিয়া লিন, হামি তুরন্ত উনানমে জল চাপাইয়া আসছি। যাইতে আসতে দশ মিনিটসে জাস্তি লাগেনি হুজোর। আসিয়ে দেখলাম, জমাদার সাব আসামী লোগকো কম্বল বাটকে নম্বরসে পাঠাইয়ে দিছেন আর চাবি লিয়ে ঠাঁরিয়ে আছেন।

চন্দ্রনাথ দুবে জমাদারকে আমি ভাল করেই চিনি। কিচেন থেকে বড় এক বোতল সরষের তেল সরিয়ে সে

তার ওয়টিতে পুরোনো পরিত্যক্ত হিসট্রি টিকেটের আড়ালে একবার লুকিয়ে রেখেছিল, আমি সার্চ করে বার করে নিয়েছিলাম। জেলার সিনিয়রিসির অনুরোধ করাতে সেবার ওকে মাত্র দশ টাকা জরিমানা করেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। আবারও দেখছি সেই চন্দ্রনাথ দুবে।

জিজ্ঞেস করলাম, চন্দ্রনাথকে তোমার সন্দেহ হয়?

তা কি করিয়ে বলি, হুজৌর, বাবুরাম আমতা আমতা করতে লাগল, হাবি সিপাই আর উনি হইতেছেন জমাদার। তবে অজিতবাবু জমাদার সাবকে অফিসমে ডাকাইছেন।

আচ্ছা, যাও।

কয়েক মিনিট পর জেলার এলেন বললেন, পরপর সব প্রিজনার শর্ট টার্মার, একটিরও সাজা তিন মাসের বেশী নয়। শর্ট টার্মারদের সব সময় পুরোনো কম্বল দেয়া হয় চন্দ্রনাথ বলছে যে, আসামীদের নম্বরে নিয়ে যাবার পর একজন আসামী দেখায় যে, তার দুটো কম্বলই ছেঁড়া। চন্দ্রনাথ তাই গুদাম আবার খুলে দুখানা নতুন কম্বল বেছে বার করে এনেছে, অমনি আসামীদের নম্বরে দেয়া শোনা যায়, সে তাড়াতাড়ি কম্বল দুখানা কাছেই খালি সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে গুদাম বন্ধ করে সে দিকে দৌড়ে যায়। বন্দুক থামিয়ে দিয়ে তার আর কম্বল দু খানার কথা মনে ছিল না।

বললাম, সব মিথ্যে কথা। বানানো গল্প। চুরি করবার উদ্দেশ্যেই চন্দ্রনাথ কম্বল দুখানা সরিয়ে রেখেছিল, ভেবেছিল, ভোরবেলা বার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু দৌভাগ্যক্রমে ভোরে যে দুজন সিপাই ছোট পাহারায় ছিল, তারা জানেই, তাই কম্বল ঐ সেলেই পড়ে রয়েছে। বললাম, আপনি ভাল করে এনকোয়ারি করুন, সত্য বেরিয়ে পড়বে।

যা ভেবেছিলাম, তাই হল। বেলা প্রায় বারোটায় জেলার আবার এলেন, বললেন, দেখলাম স্যার, এনকোয়ারী করে। আপনার কথাই ঠিক। আসামীরা কেউ ছেঁড়া কম্বল পায়নি, তাই নালিশও জানায়নি কেউ চন্দ্রনাথের কাছে। আর কোনও গন্ডগোল হয়নি ওয়ার্ডে। চন্দ্রনাথ ওদের পৌঁছে দিয়েই চলে এসেছে, আর যায়নি, যাবার দরকার হয়নি।

জিজ্ঞেস করলাম, চন্দ্রনাথ এবার কি বলছে?

ও স্যার, সব দোষ স্বীকার করছে। জেলার কর্মী ঘোষালের এবার বৈষ্ণবজনোচিত সুর শুনতে পেলাম, ও স্যার মাপ চাইবার জন্য এসেছে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ডাকব স্যার?

কঠিন স্বরেই বললাম, না, এখন আর আমার কাছে নয়। হাটওয়ার্ডস ওকে সাসপেন্ড করে দিন, তারপর প্রসিডিং শুরু করুন।

বৈষ্ণব জেলার তবু বলতে লাগলেন, আমি বলছিলাম কি স্যার, ও যখন অপরাধ স্বীকার করছে, এবারটা যদি স্যার—

জেলারবাবু, বাধা দিয়ে বললাম, অপরাধীর জন্য ডিউ করবেন না ওর সার্ভিস বুক খুলে দেখুন, অনেক পানিশমেন্ট আছে সেবার জেল চুরির কেসে আপনারই অনুরোধে ওকে শুধু ফাইন করেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এবার আর অনুরোধ শুনব না যা বললাম, তাই করুন। চার্জশীট পেয়ে ও পারে তা নিজেকে ডিফেন্ড করুক।

জেলার স্যালুট করে বললেন, অল রাইট স্যার।

সাড়ে বারোটায় বাড়ীতে ফেরবার তোড়জোড় করছি, হঠাৎ রবীন বাবুর প্রবেশ।

বললেন, আজ ছাদ চলাই হবে।

বললাম, তথাপি সময় মাত্র এক মাস, দু তিন দিন কমই হবে, সেটা মনে রাখবেন।

হেসে বললেন, মনে আছে। তারপরই বললেন, কাল রবিবার, চলুন এক জায়গায় দু বাড়ীর সবাই মিলে পিক নিক করে আসি।

পিকনিক। কোথায়?

বজ্রমালির চরে—

চরে পিকনিক। বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলাম, চারিদিকে জল, ধু ধু করা বালি, গাছপালা দূরের কথা, একটি ঘাসও নেই—বাঃ, আপনার পিকনিকের স্পটটির চমৎকার—

না, না, বাধা দিয়ে বলতে লাগলেন উনি, চর এখন শুধু নামেই। আগে চর ছিল, গাছপালা নেই, শুধু বালি আর বালি। এখন রেওলার গ্রাম। গভর্ণমেণ্টের এগরিকালচারাল ডিপার্টমেণ্টের পক্ষ সেখানে এখন ধান, পাট, আখ ও নানারকম রবিশস্যের চাষবাস হয় তাই দেখে, চাষীদের ইমপ্রুভড প্রথায় চাষ করা শিক্ষা দেওয়া হয়। সকালে যাব, সারা দিন থাকব, সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসব।

সারাটা দিন সেই অচেনা চরে?

চরের মালিক, রবীনবাবু বলতে লাগলেন, অর্থাৎ যেই এগরিকালচারাল অফিসারটি আমার ডিসটাণ্ট রিলেটিভ। অনেকবার যেতে বলেছেন—

ও—তাই বলুন, আমি বললাম, মানে, বল পেয়ে তাঁর ওপর অত্যাচার করতে চাইবেন।

মোটেই না, বাধা দিলেন উনি, অফিসারটি ভালো শিকার বাঙ্গাল সেই বিশাল চরে ছোট বড় কয়েকটা ডোবা আছে, তাতে প্রচুর নানারকম ছোট-বড় মাছ পাওয়া যায়। তাই শহরে এলেই আমার বাড়ীতে একবার আসবেনই, এসেই নানারকম মাছের লোভ দেখান আর বলেন, আরে মশয়, সকলেরে লইয়া আসো না একদিন দেখুন অনে কত মাছ খাইতে পারেন।

লোভ আমারও হল। কারণ আমিও জাতে চাকার বাঙ্গাল। অলপাইগুড়ীর মত বড়লোকের শহরে আমরা চাকুরেরা মাছ কিনে খাব কি করে, মাছের গন্ধ শুঁকেই দিন কাটাচ্ছি বলা যায়। তার মধ্যে অকস্মাৎ 'কত মাছ খাইতে পারেন' বলে নিমন্ত্রণ, উপেক্ষা করি সাধ্য কি!

তবুও বললাম, রবিবার সবার ছুটি হলেও জেলের চাকরিতে কোন রবিবার নেই। অফিসে আসি না বটে, কিন্তু কলকাতার বাড়ী থেকেই হয়ত আমার আই জি সাহেব বাড়ীতে ফোন করে বসবেন।

রবীনবাবু বললেন, জেলার বাবুকে বলে রেখে চলুন, যাওয়া যাক।

দেখলাম, উনি নাছোড় বান্দা

অগত্যা রাজী হতেই হল

স্থির হল, সকাল সাতটায় ওরা সব রেডি হয়ে আমাদের বাড়ীতে আসবেন, আমরা আগেই রেডি হয়ে থাকব, তারপর আমাদের জীপ ছুটবে চার মাইল দূরে রঙ্গমালীর দিকে। (ক্রমশঃ

স্তব্ধ রাত। রণক্ষেত্র। মেঘের ফাঁকে চাঁদের ম্লান আলো। ব্যাসানের রণক্ষেত্রে বিজয়ী নেপোলিয়ন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চতুর্দিকে মৃত ও আহত সৈনিকদের রক্তাক্ত দেহ

মধ্যরাত্রি। রণক্ষেত্রে সমস্ত স্তব্ধ। হঠাৎ একটি মৃতসৈনিকের পাশ থেকে একটা কুকুর ছুটে এলো নেপোলিয়নের দিকে। আবার ছুটে গেল তার রক্তাপ্লুত প্রভুর কাছে, করুণ সুরে কি যেন নিবেদন করতে চাইল সে।

খুবই বিচলিত দেখাল নেপোলিয়নকে, বিশ্বাসী কুকুরটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তিনি পার্শ্বচরদের বলে উঠলেন, ওর কাছে, আমাদের মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

মিনার্ভা থিয়েটার—১৮৯৩

বিগত যুগের যেসব নাট্যশালার ইতিবৃত্ত আমরা প্রত্যক্ষ লিপিবদ্ধ করে পরবর্তীকালের পাঠকদের উপহার দিয়েছি তার মধ্যে এই সংখ্যায় আলোচিত মিনার্ভা থিয়েটারই বর্তমানে সবচেয়ে প্রাচীন। ৬নং বিডন ষ্ট্রীটে ১৮৭৩ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার যে পাকা মঞ্চ নির্মাণ করে ১৮৮৬ সালে সেই বাড়ি দুলিসাৎ হয়। ১৮৯৪ সালে প্রধানত গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় সেই স্থানে সেই বিধ্বস্ত নাট্যশালার উপর গড়ে উঠল মিনার্ভা থিয়েটার। এই প্রচেষ্টার পিছনে ছিলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। দানীবাবু, চুনীবাবু, রামতারণ প্রভৃতিরা নতুন থিয়েটারে যোগ দেন। শেষ পর্যন্ত অর্ধেন্দু শেখরও আসেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ি অভিনয় হচ্ছে বিবাহ বিভ্রাট। গিরিশচন্দ্র সেই আসরে উপস্থিত। সেই নাটকে ঝিয়ের ভূমিকায় অভিনয় করছে এক নতুন অভিনেত্রী, তাঁর নাম তিনকড়ি দাসী। অপূর্ব অভিনয়। গিরিশচন্দ্র সেই অভিনয় দেখে বুঝলেন, এই অভিনেত্রীর মধ্যে বিরাট ক্ষমতা লুকিয়ে আছে। তিনি তাঁকে মিনার্ভায় নিয়ে এলেন। তিনকড়ির 'জনা' আজো অতুলনীয়।

মিনার্ভার জন্য গিরিশচন্দ্র ম্যাকবেথ নাটক অনুবাদ করলেন। ১৮৯৩ সালের ২৮শে জানুয়ারী ম্যাকবেথ নাটক নিয়ে মিনার্ভা দর্শকদের অভিবাদন জানালো। এই নাটকের চরিত্রগুলিকে যথোচিত রূপসজ্জায় সজ্জিত করবার জন্য গিরিশচন্দ্র আনলেন ইংরাজীপাড়ার সবচেয়ে বিখ্যাত রূপসজ্জাকরকে—তার নাম পিম্ সাহেব। অভিনয়ে ছিলেন—ম্যাকবেথ—গিরিশ। ডানকান—হরিভূষণ ভট্টাচার্য। ম্যালম—দানীবাবু। ম্যাকডাফ—অঘোর পাঠক। ডাকিনী, দ্বারপাল, দূত, সৈন্যাধ্যক্ষ এবং এক পথিক—এই পাঁচ ভূমিকায়—অর্ধেন্দুশেখর। লেডী ম্যাকবেথ—তিনকড়ি। ফ্লিয়েন্স—কুসুমকুমারী। লেডী ম্যাকডাফ—প্রবা। সঙ্গীত শিক্ষক—দেবকণ্ঠ বাগচী।

তারপর একদ নাটকের পর নাটক—মুকুল মুঞ্জরা, আবু হোসেন, জনা, বড়দিনের বকশিস, করমেতি বাঈ, প্রফুল্ল, পাঁচকনে প্রভৃতি। থিয়েটারের মালিক নগেন

রত্নাকর

মুখোপাধ্যায় ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী মানুষ। সেজন্য গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র ১৮৯৬ সালে মিনার্ভা পরিত্যাগ করেন।

তাঁর জায়গায় চুনীলাল দেব মিনার্ভার পরিচালক নিযুক্ত হলেন। দুর্গাদাস দে তাঁর সহকারী। গিরিশ-চন্দ্রের সম্পর্কিত ভাই দেবেন্দ্রনাথ বসু—সহকারী ম্যানেজার হন।

কিন্তু বেশীদিন চলল না। গিরিশচন্দ্র কতকটা অনন্যোপায় হোয়ে ক্লাসিক-এ যোগ দিলেন। ১৯০০ সালে অনেক ভাড়া বাকি পড়ায় জমির মালিক মহেন্দ্র দাস মিনার্ভার লেসীদের বিরুদ্ধে মামলা করলেন এবং ডিক্রী পেলেন। শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্র সরকার ছিলেন অন্যতম লেসী। বন্ধুদের পরামর্শে নরেন্দ্র সরকার তাঁর জমিদারী বাঁধা দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে নিলামে ওঠা থিয়েটারকে সম্পূর্ণ কিনে নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তাঁকে সাহায্য করলেন, মহেন্দ্র মিত্র ও বেনী রায়। নরেন্দ্র সরকার তখনো নাবালক। তাই মহেন্দ্র মিত্রের নামে থিয়েটার কেনা হল। মিনার্ভার মালিক হলেন নরেন্দ্র সরকার। গিরিশচন্দ্র আবার এলেন। ধার্য হল তিনি বোনাস স্বরূপ পাবেন এক হাজার টাকা আর মাস মাইনে আড়াই শো টাকা।

গিরিশচন্দ্র অমর দত্তের নাম বেআইনীভাবে ছেড়ে এসেছেন এই অভিযোগে অমর দত্ত তাঁর নামে নালিশ করলেন। কিন্তু মামলা টিকলো না। তখন অমর দত্ত প্রহসনের মধ্য দিয়ে এবং হাওবিল বিলি করে গিরিশচন্দ্র আর মিনার্ভার বিরুদ্ধে নানা ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

বঙ্গ বিজেতা, সাধের বাসর, বেল্লিক রায়, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনয়ের পর আবার মিনার্ভার পরিচালনায় অরাজকতা দেখা দিল। ১৯০২ সালে নরেন্দ্রনাথ সরকার দেউলিয়া খাতায় নাম লেখালেন।

নানান মামলা মোকর্দমা। শেষ পর্যন্ত ১৯০৩ সালে অমরেন্দ্র নাথ দত্ত বয়ালটি দশ হাজার টাকা আর মাসিক ভাড়া সাতশো টাকা—এই বন্দোবস্তে মিনার্ভা লীজ নিলেন।

৭ই নভেম্বর মঞ্চস্থ হল রঘুবীর। ১৫ই নভেম্বর আনন্দ মঠ। দুটো থিয়েটার ক্লাসিক ও মিনার্ভা এক সঙ্গে চালাতে গিয়ে অমর দত্ত ঋণ গ্রস্ত হলেন এবং ক্লাসিকের লীজ তাঁর অন্যতম পাওনাদার মনোমোহন পাঁড়েকে বিক্রি করে দিলেন।

মিনার্ভার ইতিহাস যেন ভাঙাগড়ার এক অদ্ভুত বিবর্তন। মিনার্ভার লীজও মনোমোহন পাঁড়েকে ছেড়ে দিলেন অমর দত্ত। চুনীবাবু হলেন ম্যানেজার। তিনিও কিছুদিন পরে মিনার্ভার সঙ্গে তাঁর সংস্রব ত্যাগ করলেন।

১৯০৬ সালে মনোমোহন পাণ্ডে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী। অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—ম্যানেজার। অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী—নাট্যশিক্ষক। গিরিশচন্দ্র নাট্যকার।

১৯০৬ সালের ৬ঠা মার্চ হরগৌরী, ৮ই এপ্রিল বলিদান, ২৯শে জুলাই রাণা প্রতাপ, ৭ই সেপ্টেম্বর সিরাজদ্দৌলা, ১৭ই ডিসেম্বর জাগরণ, ২৫শে ডিসেম্বর বাসর।

পাঠকবর্গ লক্ষ্য করবেন তখনকার দিনে কত ঘন ঘন নতুন নাটক মঞ্চস্থ করতে হত।

কয়েক বছর ধরে মিনার্ভা ভালই চলল। তখনকার দিনের অনেক শ্রেষ্ঠ নাটক সেখানে মঞ্চস্থ হল। অমর দত্ত মিনার্ভার যোগ দিলেন। গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা ছেড়ে কোহিনূরে চলে গিয়েছিলেন আবার এসে মিনার্ভায় যোগ দিলেন। মহেন্দ্র মিত্র কিছুদিন মিনার্ভা চালালেন। মনোমোহনবাবু কাশী চলে গেলেন। শেষ পর্যন্ত মহেন্দ্র মিত্রের পরলোকগমনের পর ১৯১১ সালে মনোমোহন বাবু ফিরে এসে মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী হলেন।

১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী গিরিশচন্দ্র ইহলোক থেকে বিদায় নিলেন। বাংলা রঙ্গ জগতের শোকের ছায়া নামল। অনেকগুলি শোক সভা হল। ৬ই সেপ্টেম্বর টাউনহলে বর্ধমানের রাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতাবের সভাপতিত্বে যে সভা হয় সেটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

কোহিনূর মঞ্চে—গিরিশ স্মৃতি রক্ষা কল্পে এক অভিনয় অনুষ্ঠিত হ'ল। দুটি নাটক অভিনীত হল—বলিদান ও পাণ্ডব গৌরব। তিন হাজার দু'শো টাকার টিকিট বিক্রি হয়। তখনকার দিনে এই বিক্রি কম কথা নয়।

ইতিমধ্যে মহেন্দ্র মিত্র মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে এক চুক্তি অনুসারে দশ বছরের জন্য মিনার্ভার লেসী হয়েছিলেন। ১৯১৩ সালে মহেন্দ্র বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই উপেন্দ্র কুমার মিত্র মহেন্দ্রবাবুর নাবালক পুত্র শিশির কুমার মিত্রের অভিভাবকরূপে মিনার্ভা চালাতে থাকেন।

কিন্তু মনোমোহনবাবু তাতে রাজী হলেন না। চুক্তি ছিল যতেন্দ্র বাবুর মৃত্যু ঘটলে মনোমোহন বাবুই সেই লীজের অধিকারী হবেন।

মামলা বাধলো। একটা আপোস রফা হল বটে কিন্তু ১৯১৫ সালে মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে উপেন্দ্র মিত্রের বিরোধ বাধলো। এবং মনোমোহন বাবু কোহিনুর থিয়েটারের মালিক রূপে তার নাম বদলে মনোমোহন থিয়েটারের পত্তন করলেন। উপেন্দ্র মিত্র মিনার্ভার লেসী হলেন।

দক্ষতার সঙ্গে উপেনবাবু মিনার্ভা চালাতে লাগলেন। পর পর মঞ্চস্থ হল, সিংহল বিজয়, শুভদৃষ্টি, হাতের পাঁচ, রামানুজ, মণিকাঞ্চন, আকেল সেলামী, কল্পতরু, রাতকানা (১৯১৭ জুন), চন্দ্রশেখর, বঙ্গে রাঠোর, চিতরোদ্ধার, কিন্নরী (১৯১৮ আগষ্ট), বঙ্গীকরণ, লক্ষ্মণ সেন, মিশর-কুমারী (১৯১৯ জুলাই), রেশমী রুমাল, কেলোর কীর্তি (১৯২১ মে), নাদিরশা (১৯১৯ ডিসেম্বর), চন্দ্রগুপ্ত, পেলারামের স্বদেশিকতা (১৯২২ জুন! অভিনয় সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়)।

১৯২২ সালে মিনার্ভায় আগুন লাগল। বাড়িটা ভস্মীভূত হল। কিন্তু উপেনবাবু দমলেন না। ১৯২৪ সালে নূতন বাড়ি হল এবং আত্মদর্শন মঞ্চস্থ হল (৮ই আগষ্ট)। তারপর সত্যভামা, ব্যাপিকা বিদায়, নর্তকী, দেশের ডাক, চন্দ্রনাথ, শক্তির যজ্ঞ, বামনাবতার, গয়াতীর্থ প্রভৃতি বহু নাটকের অভিনয়ের পর উপেনবাবু মিনার্ভা ছেড়ে হাতিবাগানের স্টারে এলেন! ১৯৩৮ সালে মিনার্ভার লেসী হলেন হেমেন মজুমদার। ১৯৩৯ সালে লেসীরূপে মিনার্ভায় দেখা দিলেন হেলওয়ার হোসেন ও চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়। মিনার্ভার অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হোয়ে উঠতে লাগল! জে. সি. গুপ্তের ভাই এন. সি. গুপ্ত এই সময় মিনার্ভায় যোগ দিয়ে একটি লিমিটেড কোম্পানী করলেন। এন. সি. গুপ্ত চেয়ারম্যান, হেলওয়ার হোসেন, চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায় ও ধীরেন মুখোপাধ্যায় পরিচালক।

নাটক মঞ্চস্থ হোতে লাগল, অন্নপূর্ণার মন্দির (১৯৪০), বন্দিনী, কালিদাস, সুপ্রিয়ার কীর্তি কাঁটা ও কমল (দুর্গাদাসের শেষ অভিনয়। দুই পুরুষ (১৯৪৫), শাস্ত্রী পান্না প্রভৃতি। তারপর বহু দল মিনার্ভায় অভিনয় করেন। হেলওয়ার হোসেন মারা যাবার পর রাসবিহারী সরকার কিছুদিন মিনার্ভা পরিচালনা করেন। তাঁর সময়ে ঝিলের বন্দী নাটকটি অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৪৯ উৎপল দত্তের নেতৃত্বে লিটল থিয়েটার গ্রুপ মিনার্ভার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পর পর নাটক মঞ্চস্থ করেন, নীচের মহল, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, অংগার, ফেরারী ফৌজ, কল্লোল প্রভৃতি। বর্তমানে মিনার্ভার কর্মীদের দ্বারা থিয়েটারটি পরিচালিত হচ্ছে এবং নিয়মিত অভিনয় চলেছে।

১৮৯৯ সালে ৬নং বিডন ষ্ট্রীটে সর্বপ্রথম যে নাট্যগৃহ নির্মিত হয় আজো সেই দালানটা দাঁড়িয়ে আছে বাংলার প্রাচীনতম নাট্যশালা—মিনার্ভা থিয়েটার।

সেকালের বাংলা থিয়েটার

ভিতর বাইরে কত তার রঙ, কত ঢঙ, কত তার বিচিত্র আয়োজন। কত তথ্য কত কাহিনী। সেই সব তথ্য আর কাহিনীর কিছু সেদিন শোনালেন অধ্যাপক সুশীল মুখোপাধ্যায় তাঁর স্মৃতিচারণের মাধ্যমে, আনন্দ মন্দির আয়োজিত এক বৈঠকে। সে আসরে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নট সন্তোষ সিংহ, নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত, সাংবাদিক কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক, নাট্য সমালোচক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু নাট্যানুরাগী ও সুধী এবং তাঁরা সকলেই শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কথকতা শুনে প্রচুর আনন্দ পেয়েছিলেন। প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁদের দেখা থিয়েটারের স্মৃতিকথা বললেন। শ্রী মুখোপাধ্যায় থিয়েটার দেখছেন কম দিন না—সেই ১৯২২-২৩ থেকে। নিজে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার, অভিনয়ও ভাল করেন। পুরানো তথ্যও সংগ্রহ করেছেন অনেক।

যেমন ধরুন তখনকার দিনের হ্যাণ্ডবিল। রীতিমতো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার কত রকমের রং বেরঙের হ্যাণ্ডবিল

তার মধ্যে আবার ছড়া—কবিতা—রঙবেরঙ। অমর দত্তর আমলে এই হ্যাণ্ডবিল প্রভূত উৎকর্ষ লাভ করে। অমর দত্ত খরচে মানুষ ছিলেন। থিয়েটারের ফেস লিফটিং-এর জন্য তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। সিন সিনারী, পোষাক পরিচ্ছদ, আসনের সংস্কার—অনেক কিছু করেছিলেন তিনি। তিনি হ্যাণ্ডবিল ছাপাতেন সব চেয়ে দামী কাগজে—রূপালী কাগজে সোনার জলে ছাপা। তারপর পোষ্টার। তখন তো খবরের কাগজে এত বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। বা করে পোষ্টার প্লাকার্ড! মস্ত বড় বড়। তার মধ্যে সকল অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম ও চরিত্র। অভিকায় দেওয়াল পত্রগুলিকে বলা হত 'ইইমার প্লাকার্ড'।

আর বেরুত ছোট ছোট পোষ্টার অমুক অভিনেতা বা অভিনেত্রী অমুক থিয়েটারে স্থায়ীভাবে যোগদান করিলেন। স্থায়ীভাবে কথাটা লক্ষণীয় মনে আছে স্টার থিয়েটারের সেই ১৫ হাত লম্বা ১ হাত চওড়া প্লাকার্ড ১ হাত লম্বা পোষ্টারে—স্টারে শ্রীমতী কঙ্কাবতী শাহ্ বি. এ.

তারপর আসনের ব্যবস্থা নীচে পাঁচ শ্রেণীর আসন—গ্যালারি (চাষা পাইতন সিট তুলে অয়েল ক্লথ মোড়া সরু সরু বেঞ্চি) স্টল। চেয়ার ছোট ছোট চেয়ার) অর্কেষ্ট্রা এবং ড্রেস সার্কল। দোতলায় বক্স অনেক বক্স গদি আঁটা, বাবুরা তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে দেখতেন। মাঝে রয়েল বক্স—রাজা রাজড়া আর মহা গণ্যমান্যরা তাতে বসতেন। মেয়েরা বক্সে বসলে সেই বক্স মশারীর মত নেটের জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। তেতলায় জালের আড়ালে মেয়েদের আসন। তাদের দেখাশোনা করবার জন্য ঝি-এর ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যে থেকে রাত বেড়টা দুটো পর্যন্ত—খিদে তেষ্টা স্বাভাবিক। অঙ্কের মাঝখানে বিরতির সময়ে মেয়েদের বাড়ীর বাবুরা খাবার নিয়ে উপরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াতেন আর ঝি-এরা তাঁর কাছ থেকে জেনে নিয়ে হাঁক দিত, ওগো ওমুক পাড়ার ওমুক বাবুর বাড়ীর মেয়েরা।

তখন অভিনয়ের আগে কনসার্ট বাজত। অভিনয় শুরু হবার কথা দশটায়। কিন্তু সময় মত কোনো দিনই তা আরম্ভ হত না। দর্শকরাও জানতেন তাই তাঁরা কিছু বলতেন না। ছুট লাইটের আলো দপ্‌দপ্‌ করে নিবিয়ে জেলে কনসার্টকে ইঙ্গিত দেওয়া হত—ভিতরে যেরী আছে, তোমরা টেনে বাজাও। তখন কী প্রচণ্ড জোরেই না সেই কনসার্ট বাজত—ক্ল্যারিওনেট, কর্ণেট, পিকলু, ঢোল, কর্তাল, আর বড় ভেঁপু।

ষ্টেজের ঠিক উপরে দোতলায় বসত সেই কনসার্ট-এর দল—লোকে বলত "কণ্ঠমাস"। সময় মত আবার আলো জ্বলত, সঙ্কেত, এবার থামাও।

কনসার্ট থামত। ভিতরে ঢং করে ঘণ্টা বাজত। ড্রপ্ উঠত! সে সময় দুটো ড্রপ। সামনের ড্রপে দেখা যেত হরেক রকমের বিজ্ঞাপন—খাসারি অবলাবল, চ্যবনপ্রাস, মহাশক্তি রসায়ন, তারঘন্টিন প্রভৃতি। সেই ড্রপকে টেনে তোলার পর দেখা যেত আর একটি সুদৃশ্য যবনিকা—দুর্গম গিরিপথে অশ্বপৃষ্ঠে শিবাজী।

তখন অবশ্যই সিট রিজার্ভ-এর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। পাসের ব্যবস্থা ছিল চালোয়া। পাস মানে একখানা, দুখানা নয়—একগাড়ী পাস—অর্থাৎ বাড়ীর সকলে এবং সেই সঙ্গে ছেলে মেয়েরা একটা ঠিকা গাড়ীতে, যত আঁটে। দেখা গেছে একটি গাড়ীর কোচমানের পাশে বসেছেন কর্তা। পিছনে রেলিং ঘেরা জায়গায় দু-তিনজন, ভিতরে পাঁচ ছজন মহিলা সমেত আট দশটি ছোট ছোট শিশু। গাড়ীর যখন দরজা খুলে দেওয়া হত তখন হয়ত দু চারটি বাচ্চা ছিটকে এসে রাস্তায় পড়ল। পুরুষরা নীচে আর মেয়েরা বাচ্চাদের নিয়ে তেতলায়। নীচে পুরুষদের বসবার আসন নিয়ে বিশেষ কোনো গোলমাল হত না, কিন্তু তেতলায় প্রায়শই বসা নিয়ে কলহ বেধে যেত। আর মেয়েদের ঝগড়া তো, সে মহা ধুন্ধুমার ব্যাপার। এমন হয়েছে সেই ঝগড়া না থামা পর্যন্ত অভিনয় বন্ধ রাখতে হয়েছে। তখন তো বাসও ছিল না, ট্যাক্সিও ছিল না, ট্রাম চলত রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। তারপর যা করে ঠিকে ঘোড়ার গাড়ী—সারবন্দী তারা দাঁড়িয়ে যেত থিয়েটারের দরজায়—কেউ চলল বেলেঘাটা সোয়ারী নিয়ে,

কেউ কালীঘাট। কেউ বা বরানগর, এডেন সাহেব সুবোও আসত প্রায়ই! সে সময়কার বাংলার লাট লর্ড কারমাইকেল একাধিকবার বাংলা থিয়েটার দেখতে এসেছেন। তিনি বা তাঁর তুল্য মাননীয় কোন সাহেব বা রাজ পুরুষ দেখতে এলে, নাটক যাই হোক, কয়েকটি সখীর নাচ ঢুকিয়ে দেওয়া হত। তার মধ্যে একটি ছিল অবশ্য—"আজি এসেছি বঁধু হে, নিয়ে এই হাসি রূপ যান।" সব মিলিয়ে সে সময়কার থিয়েটার ছিল মহা তামাসার ব্যাপার—সারাবাত ধরে।

পুরীধামে বিজয়া সম্মেলন

পুরী হোটেলের সাম্বৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিজয়া সম্মেলন আয়োজিত হয় বাইশে অক্টোবর। হোটেলের স্বত্বাধিকারী মাখন লাল হালদার ও রাণী হালদারের ব্যবস্থাপনায় হোটেলের নিজস্ব মঞ্চে যে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তাতে বহু বিশিষ্ট স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পী ও গুণীজন যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয় একটি আলেখ্য ও একটি নৃত্যনাট্য। এই দুটিকে যাঁরা দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, সংগীতে মাখনলাল হালদার, ভরত মুখোপাধ্যায়, গীতা মহান্তি, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, রানী মল্লিক, বাসন্তী ভট্টাচার্য ও মধু আচার্য; নৃত্যে বন্দনা ভট্টাচার্য, কৃষ্ণা সাহা ও মিনতি বকসী; রূপসজ্জায় হরিহর সামন্ত রায়; নৃত্য পরিচালনায় বীণা মুখোপাধ্যায়; যন্ত্রসংগীতে—রাজ হালদার; সংগতে পূর্ণচন্দ্র পট্টনায়ক, কৃষ্ণ গুরু, ও চন্দ্র কান্ত ঘোষ; আলোক সম্পাতে—ভ্রমর জেনা। গ্রন্থনায়—সুধাংশু দাস। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন সংস্কৃতি-সেবী সংগীত-বিশারদ মাখন লাল হালদার।

কলকাতা পৌর সংস্থার কলেকশন বিভাগ

এই সংস্থার শিল্পীরা কয়েকদিন আগে হাঁর মঞ্চে অভিনয় করেন কবি চণ্ডীদাস। পুরানো ধাঁচের নাটক। পুরানো সুর। কিন্তু তা দর্শকদের কাছে আবেদন পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। প্রবীন অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন নাটকের নির্দেশনায়। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন, হরিধন মুখোপাধ্যায় সৌরেন বিশ্বাস, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, দীপিকা দাস, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সমগ্র অভিনয় সুষ্ঠু ও শিল্পসম্মত।

নেতাজী অবসারিকা

'ওদের শিল্পীরা বহুরূপে মঞ্চে বীরু মুখোপাধ্যায়ের সংক্রান্তি নামক নাটকটি অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। গৌরব বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা মুখোপাধ্যায়, টাবু মিত্র, দিলীপ ঘোষ, রত্না ভট্টাচার্য, মাঃ সুব্রজিৎ প্রমুখ শিল্পীরা সকলেই সু-অভিনয় করেন

গ্রীণ অ্যামেচার

বিনোদ মোল্লাঘাটের হিন্দি নাটক নয়া হাত। গ্রীণ অ্যামেচারের প্রযোজনায় নাটকটি সম্প্রতি মহাজাতি সদনে অভিনীত হল। বীণা রায়ের পরিচালনা বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারে। কয়েকটি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন বাদল মুখোপাধ্যায়, কালী রায়, শংকর, অরুণকুমার, পুষ্প কাপুর ও বীণা রায়। সুবারোশ—বাপ্পী চট্টোপাধ্যায়।

সেটরুম

মিনার্ভা মঞ্চে সেটরুমের শিল্পীরা অভিনয় করলেন ক্ষীরোদ প্রসাদের প্রভাপাদিত্য। নাটকটির সম্পাদনায় ও নির্দেশনায় অনিল রায়ের কৃতিত্ব সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শীতশ্রী দেবীর বিজয়া এক কথায় চমৎকার। রাজকুমার বসুর প্রতাপ দর্শকমনে ছাপ রাখতে সমর্থ হয়। অমর বসু মল্লিক (শংকর), গণেশ দাস (গোবিন্দ দাস), নমিতা মণ্ডল (কল্যাণী), সতী দে (বসন্ত রায়), বিনয় বন্দ্যো-

পাধ্যায় (রঙা), গোপাল চট্টোপাধ্যায় (ভবানন্দ) এবং অন্যান্য ছোট ছোট ভূমিকায় সকল শিল্পীই নিষ্ঠা ও দক্ষতার পরিচয় দেন।

নটনৃত্যম

নকগোপাল রায় চৌধুরী রচিত সাধক রামপ্রসাদ নাটকটি এঁরা সম্প্রতি তাঁর ঘরে পরিবেশন করলেন। নাট্য নির্দেশনা ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন, ভোলানাথ বন্দ্যো (রামপ্রসাদ), ও অমূল্য মুখোপাধ্যায়, সুধীর রায়, আবুসিদ্দিকী, জলি দাস, বাণী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

কথামঞ্চ

দুটি একাঙ্ক নাটক, অভিনয় ও চরিত্র বিশ্লেষণ পালা সার্থকতার সঙ্গে পরিবেশিত হল উক্ত সংস্থার শিল্পীদের দ্বারা সম্প্রতি বিশ্বেটার সেন্টারে। বলাবাহুল্য অভিনয় উচ্চমানের। দুই নাটকের অভিনয়াংশে ছিলেন, তপন দাস, চরণ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী, তুষার দেব, মৃত্যুঞ্জয় মজুমদার, তপন রায় ও অশোক গুহ।

নটনাট্যম

হাওড়ার এই প্রগতিধর্মী নাট্য সংস্থা সম্প্রতি ভুলছি বা ভুলব না নামে আধুনিক জীবনের আশাহত বেদনা ও পুঞ্জীভূত অনাচারের চাপে দুর্গত মধ্যবিত্ত সমাজের দর্পন স্বরূপ নাটকটি অভিনয় করে দর্শকদের প্রশংসা ও অভিনন্দন লাভ করেন। অভিনয়ে তরুণ বিদ্যার্থী প্রদীপ রায়, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায়, রুনু রায় প্রভৃতি শিল্পীরা বিস্ময়কর নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই নাটকটি সাম্প্রতিক বাংলার রক্তঝরা জীবনের এক অধ্যায়—যাকে সহজে ভোলা যায় না।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় গ্রামের পথে একসঙ্গে বেড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখা গেলো ক'য়েকজন লোক একটি শব কাঁধে নিয়ে সেদিকে আসছে। দামোদর নদের ধারে যে শ্মশান, তারা যাবে সেই দিকে। বঙ্কিমচন্দ্র একটু হেসে শবটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন : "বুঝলে দামোদর, দামোদর মুখো"। বঙ্কিমচন্দ্রের রসিকতার উত্তরে দামোদর মুখোপাধ্যায় সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারলেন না। আপাতত চুপ ক'রেই থাকতে হলো। আরো খানিকটা পথ হেঁটে যাবার পর দেখা গেলো পথের ধারে একপাটি চটিজুতো প'ড়ে আছে। জলে ভিজে, রোদে পুড়ে সেটার একেবারে অষ্টাবক্র অবস্থা! ওটা দেখে দামোদর মুখোপাধ্যায়ের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। চটিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে হেসে বললেন : "বুঝলে বঙ্কিম, বঙ্কিম চট্টো"। এবার বঙ্কিমচন্দ্রের নিরুত্তর হওয়ার পালা।

এ বছরের শেষে এবং আগামী বছরের শুরুতে ক্রীড়া-জগতের বড় খবর হল—ইংলণ্ড ক্রিকেটদলের ভারত সফর!

চারিদিকে ইতিমধ্যেই হৈ চৈ পড়ে গেছে!

স্মরণ থাকতে পারে গত টেস্ট সিরিজে ইংলণ্ডের মাটিতে ভারত ইংলণ্ডকে হারিয়ে বাবার জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

তাই এবার যখন ইংলণ্ডের ভারত সফরে এসে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার স্বাভাবিক চেষ্টার কথা সকলের মনেই উদয় হয়েছিল তখন ইংলণ্ড-এর নির্বাচক-মণ্ডলী ভারত সফরের জন্য যে দলের নাম ঘোষণা করলেন তা দেখে সকলেই বিস্ময়ে হতবাক, ভারতের অনেক ক্রীড়া-মোদীর কণ্ঠেই শোনা গেল ইংলণ্ডের খ্যাতনামা ক্রিকেট সমালোচক এডমণ্ড হোয়াইট এবং বিখ্যাত খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটনও সমালোচনায় মুখর।

এ কী রকম দল নামকরা কেউ তো নেই! এই দল ভারতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে? রে ইলিংওয়ার্থ, জন এডরিচ, জন কে, কি. ফ্রেজার, ডি মরিওয়া প্রমুখ সেরা খেলোয়াররা সকলে আসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। অথচ তাঁরাই হলেন ইংলণ্ডের কজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়।

আমাদের দেশের অনেক ক্রিকেট-বিশারদ তো বলছেন—এ সফর বাতিল করে দাও। এ রকম "বি" টীম পাঠিয়ে আমাদের অপমান করা। অনেকে অবশ্য বলছেন (যথা মার্চেন্ট) এ টীম খুব দুর্বল নয়—হেলাফেলার নয়। ভাল উঠতি খেলোয়াড় আছে দলে যারা নাম করবে।

আসলে ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তাদের মতলব হল, ভারত সফর থেকে ভবিষ্যতের জন্য ভাল খেলোয়াড় খুঁজে নেওয়া!

একটা কথা অবশ্যই আছে। উঠতি খেলোয়াড়ের অভাব নেই ইংলণ্ড দলে। এবং তাঁরা সকলেই আপ্রাণ চেষ্টা করবেন নিজেদের নাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যে। সুতরাং তাদের সেই নিছা অধ্যবসায় ও দৃঢ়চিত্ততা যে বিস্ময়কর ফল দর্শাবে না তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না।

আমরা নীচে ইংলণ্ড দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিলাম

টোনি লুইস, অধিনায়ক বয়স ত্রিশবর্ষীয় কাউন্টিতে কার্ডিফের ক্যাপ্টেন ক্যারিয়ার ব্যাট করেন। তাঁর অধীনেই বলতে গেলে যাকে তাঁর দল কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেছে

জো ইন্ডর্স্ট

মাইকেল ডেনেস (কেন্ট)। বয়স ৩১। সহ-অধিনায়ক। কেন্ট-এর অধিনায়ক। ভাল ব্যাটসম্যান। ১৯৬৯ সালে নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট খেলে ২ ও ৫৫ (নট আউট) রান করেন। চমৎকার ফিল্ডার।

অ্যালান নট (কেন্ট)। বয়স ২৬। দক্ষ উইকেট কীপার। অনেকবার টেস্ট খেলেছেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন এবং সাতটি ক্যাচ ধরেন।

রবার্ট টেলর (ডারবি শায়ার)। বয়স ৩১। দ্বিতীয় উইকেট রক্ষক। একটি মাত্র টেস্ট নিউজীল্যাণ্ডের

বিরুদ্ধে ১৯১১ সালে। যে বিশ্ব একাদশ অসট্রেলিয়া সফরে গিয়েছিল গত শীতে, টেলর সেই দলে ছিলেন।

ব্যারি উড (ল্যাংকাসায়ার)। বয়স ২৯। গোড়া-পত্তনকারী ব্যাটসম্যান। ১৯৭০ সালেই তিনি সব চেয়ে ভাল খেলা দেখান। ১৪৫৭ রান করেন এবং একত্রিশটি উইকেট দখল করেন। ওভ্যাল টেষ্ট-এ অসট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে তিনি যে ভাবে পিটিয়ে খেলে-ছিলেন তা দেখে সমালোচকরা প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন।

কীথ ফ্লেচার (সাসেকস বয়স ২৮ মধ্য জায়গায় ব্যাটস ম্যান। ১৯৬৮ সালে তিনি অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলেন এবং সেই মরশুমে ১৮১০ রান করেন। তিনি একবার ভারতে এসে বোম্বাই-এর ব্রাবোর্ন ষ্টেডিয়ামে খেলে শতরান করেছিলেন।

ডেনিস আমিস ওয়ার্ক উইক শায়ার)। বয়স ২৯। নিজের কাউনটি দলের হয়ে অনেক রান করলেও কোন টেষ্ট-এই সুবিধা করতে পারেন নি। ভারতের বিরুদ্ধে একটি খেলায় তিনি দু'ইনিংস-এ মাত্র ৯ রান করেন এবং পত্রপাঠ দল থেকে বাদ পড়েন। ১৯৬৮ সালে একটি আন্তর্জাতিক দলের তরফে তিনি বোম্বাই-এ ১০২ রান করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

টোনি গ্রিগ (সাসেকস বয়স ২৫। ১৯৬৬ থেকে সাসেকস-এর তরফে খেলছেন। অল-রাউনডার। অস্-ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ভাল ব্যাট করেন।

গ্রাহাম রুথ (সারে)। বয়স ২৬। ১৯৬৪ থেকে খেলছেন। ভাল ব্যাট করেন। মিডিয়ম পেস বোলার এবং প্রথম শ্রেণীর গ্রিল ফিলডার।

জ্যাক বারকেনশ (লিটারশায়ার)। বয়স ৩১। ছাটা ব্যাটসম্যান ও অফ-স্পিন বোলার। তিনি ভারতে এসে বোম্বাই ও মাদ্রাজে খেলেছেন। চৌকস খেলোয়াড় রূপেই তিনি নির্বাচিত হয়েছেন।

বরম্যান শিফকোর্ড (ওয়ারউইক শায়ার) বয়স ৩২। কাউনটির অধিনায়ক। ১৯৬৪ সালে অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলেন। বাঁ হাতে বল করেন।

ডেরেক আনডারউড (কেন্ট)। বয়স ২৭। ছাটা বোলার। ১৯৬৩ সালে তাঁর প্রথম খেলাতেই শতাধিক উইকেট পান। ১৯৬৬ সালে প্রথম টেষ্ট খেলেন। সে বছর তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ বোলার—১৫৭ উইকেট, গড় ১৩'৪০ প্রতি উইকেট। সময় সময় খাঁড়া লাফানো উইকেট দুর্লান্ত বল করেন।

প্যাট্রিক পোকক (সারে)। বয়স ২৫। অফস্পিনার। ১৯৬৪ থেকে খেলছেন। ১৯৬৮ এ প্রথম টেষ্টে অসট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চমৎকার বল করেন।

ডিওক আরনলড (সারে)। বয়স ২৭। পেস বোলার। মন্দ ব্যাটিং করেন না। সুইং বোলার রূপে তাঁকে অনেকেই উঁচু স্থান দেন।

রবার্ট কোট্টাস নর্থাম্পটন)। বয়স ২৭। মিডিয়ম —পেস বোলার। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুটি টেষ্ট খেলেছেন। ১৯৬৮ তাঁর সব চেয়ে সফল মরশুম—সে বছর ১৬০টি উইকেট লাভ করেন

ক্রিস ওলড (ইয়র্ক শায়ার)। বয়স ২৩। সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। উঠতি বোলার। ১৯৭০ সালে বিশ্ব একাদশের বিরুদ্ধে খেলেন।

ডোনালড কার। ম্যানেজার। বয়স ৪৫। ১৯৪১-৪২ সালে ভারতের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের অধিনায়ক ছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। সমালোচনার পরোয়া করেন না। ম্যানেজার হিসাবে অভিজ্ঞতাও আছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে সাউথ আফ্রিকা সফরে ইংলণ্ডের ম্যানেজার ছিলেন।

এই দলের খেলোয়াড়দের টেষ্ট খেলার পরিসংখ্যান থেকে তাঁদের মান নির্ণয় করা কতকটা সম্ভব হবে :—

ব্যাটিং

	টেষ্ট সংখ্যা	ইনিংস	নট আউট	মোট রান	সর্বোচ্চ রান	গড়
ডি অ্যামিস	৯	১৫	১	২৫৮	৫৬	১৯'৮৪
জি আরনল্ড	৬	৪	১	১০১	৫৯	১৭'০০
বি কোট্‌টাস	১		১	৮	৪	৮'০০
এম ডেনেস			১	৫৭	৫৫	৫৭'০০
কে ফ্লেচার	১৫	২৫		৪৩৩	৮৩	২১'৬৩
এন গিলফোর্ড	৯	১৩	৫	৯৭	১৬	১১'৭৫
টি গ্রীগ	৫	৯		১৮৮	৬১	৩৩'০০
এ নট	৩৬	৫৪		১৬৭৪	১১৬	৩৬'৬১
পি পোকক	৪			৪৮	১৯	৯'৬৫
বি টেলর			৬	৪	৪	৪'০০
ডি আনডারউড		৩৪	১৭	১৫০	৪৫	১৪'৩৬
বি উড				১১৬	৯০	৫৮'০০

বোলিং

	ওভার	রান	উইকেট	গড় (প্রতি উইকেট)
আরনল্ড	১১৪১	৪৫৬	২১	২১'৭১ রানে
কোটাস	৫৭৪	১৮০	৯	২০'০০
ফ্লেচার	২২৬	১৪৬		১৪৬'০০
গিলফোর্ড	১৪৯৫	৫৯৭	১০	৫৫'৯৯
গ্রীগ	৪৩০	৩৯৮	১০	৩৯'৮০
পোকক	১০৪৪	৪৭২	১৪	৩৩'৭৩
আনডার উড	৭৫৮	২৩৪২	১২০	১০'৫১

'সে বছরে ফাঁকা পেমু কিছু টাকা'—

—অবশ্য দালালি করে নয়। দালালি শব্দটা আজকাল ওনছি বেশি করে পুলিশের দালাল, কংগ্রেসের দালাল, কম্যুনিষ্টদের দালাল। এখন নাকি কলিকাতায় বাড়িভাড়া পেতে হলেও দালালের শরণাপন্ন হতে হয়—তাঁকে মোটা দক্ষিণা না দিলে বাড়ির ঠিকানা মিলবে না! তাহলে প্রশ্ন ফাঁকা টাকা কেমন ভাবে পেলে? করো তো মাষ্টারি! আর যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করো সেখানকার বেতনের বহর সবজন বিদিত তাহলে? "নোট্ বই" লিখেছ, পাঠ্য বই? না নোট বই লিখতে পারলে বহু হাজার 'নোট' বাংলাকে অমরত্ব দান করিনি। আর ছাত্রদের মাথা চরন করার [illegible]

প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

টেক্সট বুক কমিটির সদস্যদের বাড়ি এতলা ও ইত্যাদি দিই নি। তবে লটারিতে ফাঁকা টাকা পেলে? না জীবনে কখনো ও পাপকর্ম করিনি—লটারির টিকিট কিনিনি। Lot এর কাছে মাথা খুঁড়িনি। Luck-এ বিশ্বাস নেই। কারণ Pluck-ই জানি! লক্ষ লোকের আশা স্বপ্ন ভেঙ্গে কয়েকজনকে হঠাৎ ধনী করে দিলেন মালক্ষ্মী। প্রকাশ্য জুয়াখেলা ভদ্র-নামে চালু হয়েছে। রামরাজ্যের উত্তরাধিকার সরকার তার বেসাতি খুলেছেন। তবে? আর সবার বড় বিস্তারণে [illegible] না ওটা করতে যে সাহস দরকার তা ছিল না। তবে? সেই কথাটাই বলি তাহলে। কিন্তু সে জন্য একটু ভূমিকা করতে হবে—কিছুটা পুরানো কথা এসে যাবে।

১৯২১ সালের শেষদিকে শান্তিনিকেতনে এলেন ফ্রান্স থেকে পণ্ডিত সিলভ্যালেভি। গত বছর কবির সঙ্গে য়ুরোপে তাঁর পরিচয় হয়—তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর ভারত প্রীতি কবিকে মুগ্ধ করে। কবি তাঁকে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করে আসেন। অবশ্য তিনি যখন আসেন তখনো বিশ্বভারতী পাবলিকের হাতে সমর্পিত হয় নি ১৯২১-২২ এর শীত মাসের ৮ই তারিখে। অধ্যাপক তার পূর্বেই এসেছেন এবং অধ্যাপনা শুরু করেছেন

অধ্যাপক লেভি আমাদের কাছে বৃহত্তর ভারতের রূপ রেখা প্রথম তুলে ধরলেন বৈজ্ঞানিকভাবে ইতিহাসের তথ্য উপপত্তির কথা বলেন। মনে পড়ছে কোনো এক ফরাসী লেখক বোধহয় লেভূরনে—এক বইতে কোনো তথ্য সম্বন্ধে গ্রন্থের গোড়ার দিকে বলেন Probably মাঝখানে লেখেন Might have been শেষের স্বীকৃতি গ্রন্থ শেষে বিষয়টি একটি তথ্যরূপে বিবৃত হলো মনে পড়ছে আমার একটি লেখা ভোলেকে তুচ্ছি দেখে দিচ্ছেন অশ্বঘোষের নামে একটি চীনা বই আছে—যার মূল অনুমান করা হয়েছে 'প্রজ্ঞোৎপাদ-শাস্ত্র'। গ্রন্থের লেখক কে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আমি অশ্ব ঘোষের নামে চালিয়ে দিয়েছিলাম—তুচ্ছি প্রবন্ধটি দেখতে দেখতে লিখে ছিলেন Alleged to have been writer. আমাকে বললেন 'We are not sure about it.' এই যে তথ্যানুসন্ধান বিষয় নিষ্ঠা সততা আমার কাছে আদর্শ হয়ে আছে আজ পর্যন্ত।

লেভি সাহেবের ভাষণ থেকে জানলাম যে ভারতীয় ধর্মসাহিত্য—বিশেষ করে বৌদ্ধ শাস্ত্রের বহু সহস্র লুপ্ত গ্রন্থ চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়ে চীনে ও তিব্বতে

আছে। তিনি বলতেন এই সব লুপ্ত গ্রন্থ উদ্ধার করতে হলে এই দুটি ভাষা ভাল করে শিখতে হবে। তাই তিনি আমাদের ঐ দুই ভাষা যুগপৎ শেখাতে আরম্ভ করলেন। যুষ্টিমেয় কয়জন আমরা তাঁর ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য পাশ করা প্রবোধচন্দ্র বাগচি এলেন বাইরের থেকে—তিনি কলকাতাতেই চীনাভাষা কিছুটা শিখে এসেছিলেন। তাই তিনি লেভি সাহেবের কাছে পৃথকভাবে পাঠ করতেন। আমরা কয়জন লেভির কাছে পড়ি—চীনা তিব্বতী। এই সব শিক্ষার্থিদের মধ্যে একজনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। ইনি হচ্ছেন বিহারবাসীর তরুণ অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু। সদ্য এম-এ পাশ করে এসেছেন। অশেষ উৎসাহ নিয়ে ইনি স্কুলে কলেজে ইতিহাস পড়ান। চীনা-তিব্বতী কিছুটা শেখেন আমাদের সাথে। শিল্প শাস্ত্র সম্বন্ধে একটা বই তিব্বতীর সঙ্গে মিলিয়ে সম্পাদন করে যশস্বী হন। এ ছাড়া নালন্দা বিক্রমশিলা সম্বন্ধে গবেষণার বই Indian Pandits in Tibet লেখেন। অদ্ভুত কর্মশক্তি ছিল কোনো কাজে 'না' করতেন না। আহ্বান এলো 'ভূমিলক্ষ্মী' নামে মাসিক পত্র শ্রীনিকেতন থেকে বের হবে। সম্পাদনার কাজ পড়লো ফণীন্দ্রনাথের উপর। কেরালার ছাত্র অনুষ্ঠান আচার তার কাছে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পড়াশুনা করতেন। দেশে ফিরে গেলে প্রত্ন তত্ত্ববিভাগে কাজ পান ঐ বিভাগের প্রধানের পদে উন্নীত হন। ফণীন্দ্রনাথের এতগুণ থাকা সত্ত্বেও তার একটা দোষ ছিল—সেটি হচ্ছে তাঁর brain-এর অভাব। নিজেকে জাহির করতে পারতেন না। অন্নভাবী ছিলেন। কলম যতটা চলতো, মুখটা ছিল ততটাই মূক। মনে পড়ছে এখানে চাকরীর পূর্বে বিবাহ করেন। একটি কন্যা নিয়ে একজীর্ণ কুটিরে থাকতেন। কিন্তু এত সুখ সইলো না। ভাগ্য দোষে তাঁকে কাজ ছাড়তে হলো স্থানিক চক্রান্তের ফলে—অর্থাভাবের দোহাই তুলে। এখানকার কাজ ছাড়িয়ে বিহারে গেলেন। নালন্দায় নূতন কলেজে কাজ পেলেন। সেখানেই অল্পবয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। অকাল মৃত্যু না হলে নাম রেখে যেতে পারতেন আজ তিনি বিস্মৃত—তাই আজ এই রচনার মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করছি।

লেভি-সাহেবের পড়ানো পদ্ধতি ছিল অদ্ভুত। একেবারে একটা চীনা বই ও তিব্বতী বই আরম্ভ করে দিলেন। চীনা বই নিলেন 'সুখাবতী ব্যূহ' আর তিব্বতী বই কো-রব-দস্তবু পড়ানো হবে। কিন্তু কলকাতা থেকে কো-রব-দস্তবু বই এসে পড়বার পূর্বেই তিনি আরম্ভ করে দিলেন ফরাসী Journal Asiatique (1912) এ প্রকাশিত প্রবন্ধের তিব্বতী। নিয়ে। প্রবন্ধটি ছিল tokharian B ও কুচার ভাষায় অনূদিত ধর্মপদ-উদান বর্গের একটা বর্গের তুলনা মূলক আলোচনা, তিব্বতী অনুবাদটাও ছিল সাথে সাথে। সেই তিব্বতী অনুবাদ দিয়ে তিব্বতী শেখানো শুরু হলো। তিব্বতী লিপি শিখতে কষ্ট হলো না। কারণ সেটা ব্রাহ্মী লিপির সপ্তম শতকের অনুকৃতি।

কো-রব-দস্তবু-গ্রন্থে একটি সুসংস্কৃত গদ্য সংস্কৃত এ ধরণের বহু বই আছে। তিব্বতী বইটা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাপটিষ্টমিশন প্রেসে মুদ্রিত হয়েছিল। তিব্বতী শ্লোকগুলি সবই সংস্কৃত থেকে অনূদিত। এর মূল খুঁজে বের করতেন বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায় এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী থেকে আনিত জার্মান ভাষায় সম্পাদিত ও রোমান হরফে মুদ্রিত সুভাষিত সংগ্রহ Bruckstuche die Indisch spracha তার সাহায্যে অধিকাংশ তিব্বতী শ্লোকের মূল আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। আমার কো-রব-দস্তবু বইটিতে সংস্কৃত শ্লোকে কণ্টকিত। বইখানা সেদিন হঠাৎ চোখে পড়লো। সব ভুলে গেছি। কেবল মনে-পড়ছে লিপিটা।

সুখবতী ব্যূহ সম্বন্ধে তত্ত্বকথা বলতে হলো অনেক শিবের গাজন গাইতে হবে—পাঠকদের ধৈর্য থাকবে না। তবে সম্পাদক মশায় যদি ভরসা দেন তবে বারান্তরে 'সুখবতী' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে।

চীনা-তিব্বতী বিদ্যা নিয়ে শুরু করলাম কাজ। ততদিন বুঝতে পেরেছি পালি গ্রন্থ চারুচন্দ্রবাবু সেটি

বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালীদের কাছে সুপরিচিত কিন্তু এখন পড়াশুনা করতে করতে জানতে পারছি যে সংস্কৃতে এর একটা সংস্করণ চালু ছিল—উদান বর্গ নামে-পালি থেকে তার বর্গ সংখ্যা বেশী, শ্লোক সংখ্যাও বেশী বহু তথ্য জানলাম যথা এশিয়ার আবিষ্কৃত উদানবর্গের পুথির ছিন্ন পাতার ভার্সান থেকে। ডাঃ সুভার্স এসে-ছিলেন শান্তিনিকেতনে। একবার তাঁর কাছে শুনি উদানবর্গের পুঁথিটা বার্লিনে আছে। যাই হোক আমি এই উদানবর্গের চারটা চীনা ভর্জমা নিয়ে তুলনামূলক তথ্য সংগ্রহ করলাম সে সব জঞ্জাল এখনো খুঁজলে আমার গ্রন্থাগারে পাওয়া যেতে পারে যাই হোক আমি প্রথম বর্গ অনিত্যবর্গ নিয়ে বিচিত্র পাঠ দিয়ে তিব্বতী সংস্কৃত, পালি প্রাকৃত প্রভৃতি নিয়ে একটা থিসিস করলাম ছাপা হলো ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহার Indian Historical Journal-এ। তারপর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্বর্ধনা গ্রন্থে বাংলায় বহুবিস্তারে অনিত্যবর্গ সম্প্রসারিত হয়। এখন দেখলে তাকে চিনতে পারিনে কত বই পড়েছিলাম কত রেফারেন্স দিয়েছি সে কি আমার লেখা ?

যাই হোক এই বিদ্যাপুঁজি নিয়ে স্থির করলাম বৃহত্তর ভারতে যে হিন্দু বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র একদিন ছড়িয়ে পড়েছিল—তার ইতিহাস লিখবো। বলা বাহুল্য তথ্যাদির উৎস ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী জর্ণাল ও গ্রন্থ। এই স্বল্প বিদ্যা নিয়েই দেশবাসীর সামনে অতীত ভারতের ধর্মবিষয় কাহিনী বলবো এই ছিল দুরাকাঙ্খা। লিখতে শুরু করলাম, চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলিয়া তিব্বতী ও অন্য এশিয়ার গুপ্ত ভাষায় অনূদিত ও রচিত গ্রন্থের কথা লিখে চললাম। তারপর সেখানেই থামলাম না—ব্রহ্ম, শিয়াম, কম্বোজ, জাভার কথাও লিখলাম। সে সব জঞ্জাল এখনো হয়তো পড়ে আছে।

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে পণ্ডিতদের দৃষ্টি গিয়েছে কিছুকাল থেকে। এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তখন অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখুজ্জে—তাঁর Indian Shipping বই লিখে ভারতীয়দের সমুদ্র যাত্রার কাহিনী ১৯১০ সালে বেরুবার তারপর বহু বছর কেটে গেছে ওদিকে আর কারও দৃষ্টি পড়েনি। ১৯২৬ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন সফরে যান। সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু এলমহার্ষ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কালিদাস নাগ সফর শেষে কলকাতা এসে কালিদাস নাগ Greater India Society স্থাপন করেন। যার প্রথম সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। কবিই এর নাম করণ করেন বৃহত্তর ভারত। রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে জানবার কুতূহলের ইতিহাস বহু-কালের। ১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জাপানি ছাত্র হোরিসান আসেন সংস্কৃত পড়তে তখন থেকে কবি ও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের মনে হয় ভারতের বাইরে যে সব সংস্কৃত গ্রন্থ আছে তার তল্লাসে পাঠাবেন কয়েকজন সুধীকে সেটা আকাশ কুসুম কল্পনাতে বিলীন হয়ে যায় বহু বছর পর ১৯২৬ সালে চীন সফর কালের পর বৃহত্তর ভারত সমিতি স্থাপিত হলে তার রূপদান করতে ব্রতী হন

আমি প্রবন্ধ লিখলাম ইংরেজীতে। ভাবলাম লেখা-গুলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যায় না! কী দুরাশা? যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তুমি বিশ বছর পূর্বে "গোলামখানা" বলে ত্যাগ করেছিলে সেখানে তুমি বক্তৃতা করবে? পত্রের উত্তর পেলাম। বিচক্ষণ কমিটির সভ্যরা পেলেই সিদ্ধান্ত জানাবেন। পরে শুনেছিলাম ইংরেজি বিভাগের জন্য গোপাল ব্যানার্জী বাংলা বিভাগের হীরেন্দ্র চন্দ্র সেন ছিলেন কমিটিতে। তৃতীয় ব্যক্তির নাম মনেই নেই। তখন ভাইস-চ্যান্সেলর যদুনাথ সরকার। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। আমার প্রথম বই 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' যা ঢাকা থেকে ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় —তার বাঙ্গিনীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন তিনি। যাই হোক তিনটি বক্তৃতা করবার জন্য আহ্বান পেলাম। অবশ্য অবৈতনিক। অর্থ দিয়ে আমার বক্তৃতা শুনবে কে? পরে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চারবার বৈতানিক বক্তৃতা দেবার আহ্বান পেয়েছি জীবনে চারবার আহ্বান পাবার গৌরব লাভ করেছি সেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে

[illegible]কে ত্যাগ করেছিলাম একদিন অকেথোর উত্তেজনায়। যাক্ প্রথম দিনের বক্তৃতার স্যার যদুনাথ সভাপতিত্ব করেন। বোধ হয় আমার প্রতি স্নেহবশতই ভাষাগুলি ইংরেজিতেই ছিল। প্রসঙ্গতঃ বলি সমস্ত বইটিই ইংরেজিতে লিখিত হয়। সে পাণ্ডুলিপি এখনো আছে—পরে Indian Literature in China ছাপান হয়েছে। Greater India Society গ্রন্থরূপে। ডক্টর কালিদাস নাগ এই বইয়ের ভূমিকা লেখেন। এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ৫০০ টাকা দেন ঘনশ্যাম বিড়লা। পদ্মরাজ জৈন সেকালের হিন্দু মহাসভার একজন নায়কের পাত্তা। তিনিই আমাকে নিয়ে যান বালিগঞ্জের বাড়িতে। ঘনশ্যাম তখন যুবক-শান্ত মানুষটি। সব শুনে টাকাটা দিবেন বলেন। প্রসঙ্গত বলি এই বিরাট অট্টালিকাটি ছিল দক্ষিণারঞ্জনাথ ঠাকুরের। এখন সেটি বিড়লা মিউজিয়াম।

তিব্বতীভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে বিরাট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলাম বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়কে। তিনি সেটি সম্পাদন করে প্রকাশ করবেন বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর সেই পাণ্ডুলিপির সন্ধান আর মিলেনি। তিনি যে গোদরেজ আলমারিতে কাগজপত্র রাখতেন সেখানে খুঁজে বললেন সহকারীরা। তারপর গেল কোথায়? বলা বাহুল্য সে কাগজের স্তূপ যোগা হতে নিশ্চয়ই গিয়েছিল!

যাক্ ফিরে আসা যাক কাহিনীর মধ্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিয়ে উৎসাহিত হয়ে ভাবলাম জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বক্তৃতাগুলি দেওয়া যায় না? জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কথা আজ বড় কেউ জানে না—আজ তাঁরা জানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে। শুনেছিলাম সেখানে হেমচন্দ্র বসু মল্লিক অধ্যাপক পদ খালি হচ্ছে। আশুতোষ-প্রসঙ্গ দাশগুপ্ত বহুকাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বয়স হয়েছে—নূতন লোক চাই। ভয়ে ভয়ে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সেক্রেটারী হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পত্র দিলাম। তাতে বক্তৃতার বিষয় সম্বন্ধে একটা রূপরেখা ছকে দিই। হীরেন্দ্রনাথের পত্র পেলাম—দেখা করবার জন্য নির্দেশ। কলিকাতায় গেলাম। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের সে অঞ্চলে কখনো যাই নি। যাই হোক ট্রামে চেপে কাছাকাছি জায়গায় নেমে বাড়িটা খুঁজছি। একজন পথচারিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'অমরদত্তর ভাইতো-ঐ বাড়ী'। অমরদত্ত ছিলেন হীরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর তিনি নাটা জগতে খ্যাত পুরুষ। এ মহলের লোক তাকেই চেনে। আর হীরেন্দ্র দত্তকে চেনে হাইকোর্ট পাড়ার লোকে সলিসিটার H. N. Datta & Co এর মালিক বলে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আইনজ্ঞ রূপে। আর বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত মহলে তাঁকে জানতেন থিওসফিষ্ট ব্রহ্মবাদী রূপে আজ তাঁর পরিচয় কবি সুধীন্দ্রদত্তের পিতা বলে। কিন্তু আমরা জানতাম তাঁকে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ বা ন্যাশান্যাল কাউন্সিল আর এডুকেশনের প্রাণ স্বরূপ সেক্রেটারী রূপে।

বাড়িতে ঢুকে ডান দিকের একটা বৈঠকখানা ঘরে বসলাম। কয়েকখানা চেয়ার, একটা সোফা সেট, দেওয়াল আলমারিতে কাচের পাল্লা। কিছুক্ষণ পরেই হীরেন্দ্রবাবু এলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ, অতি সাধারণ বাঙালি বেশ। আমি আমার দুহস্তর ভারত সম্বন্ধে রচনাগুলি দেখালাম অত্যন্ত বাসভারি লোক। কাগজগুলি উলটে পালটে দেখলেন। তারপর 'আচ্ছা' বলে বিদায় দিলেন। পথে বের হয়ে ভাবলাম 'আচ্ছা' শব্দ তো 'হাঁ' ও হতে পারে—'না' ও হতে পারে—বাধা নেই। যাই হোক কয়দিন পরে পত্র পেলাম কাউন্সিল থেকে সেখানকার Extension Lecture দেবার জন্য আহ্বান। দশটি ভাষণ-আড়াই শত টাকা দক্ষিণা। অভাবনীয় ব্যাপার। বিশ্বভারতীতে পাইতো পঁচানব্বই টাকা। সুতরাং আমি তো রাজা। তাই প্রবন্ধের পত্তন করি 'সে বছরে ফাঁকা সেতু কিছু টাকা' দিয়ে।

বক্তৃতা দিয়ে আড়াইশো টাকা পাবার সম্ভাবনা কথাটা গৃহিণীকে জানালাম। গ্রীষ্মের ছুটিতে সবাই মিলে শিলং গেলে কেমন হয়। জল্পনা-কল্পনার কী সুখ। সত্য ভ্রমণ থেকে টাইমটেবল দেখে এই মানস ভ্রমণ কম আনন্দের নয় অবশেষে শিলঙ যাবার স্থির হলো। সেখানে

গৃহিণীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছেন। তাদের নিজেদের বাড়ী আছে লাবানে।

এক্সটেনশন বক্তৃতার ব্যবস্থা হলো। বক্তৃতার স্থান বিশ্বজনিষ্ট হলে কলেজ স্কোয়ারে। সদর রাস্তার ধারে পাবলিকের সামনে ভাষণ দান এই বোধ হয় প্রথম। তবে ভাষণটা লিখিত থাকতো। গৃহিণী ইংরেজি থেকে বাংলা করে দিতেন, সেটাই আমি পড়তাম। একদিন বক্তৃতা করছি হঠাৎ দেখি হীরেন্দ্রনাথ ও সত্যানন্দ রায় সভাগৃহে ঢুকে শ্রোতাদের মধ্যে বসলেন। ভাষণ শুনে মনস্তত্ত্বের মধ্যে মিশে চলে গেলেন। কী ভাব নিয়ে ফিরলেন বুঝতে পারলাম না। পরে শরৎযোগে খবর এলো আমাকে তাঁর তিন বৎসরের জন্য (১৯২৭ জুলাই-১৯৩০ জুন) 'রেমচন্দ্র বসুমল্লিক' পদে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছেন। মাসিক দক্ষিণা ষোড়শো টাকা। আবার অভাবনীয় ব্যাপার ঘটলো। জীবনে এরূপ বহু অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে। লিখতে বসার পূর্বেই খবরটা পেলাম।

যাই হোক বিদ্যালয় বন্ধ হবার পূর্বে ছমাসে দশটি বক্তৃতা দিলাম। তাছাড়া 'ক' টাকা পেলাম। তাই 'দশম পেনু কিছু টাকা' ভাবিলাম মনে শ্রীশৈলবিকেতনে থাকে আসিব ফিরি তবে একা নয় সপরিবারে।

• • •

সেবার একটি সুন্দরী মেয়ের বিয়ে হবেছে মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের পরিচিত। একদিন সে বরকে নিয়ে এলো রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাকে কেমন খাতির করেন তা বরকে দেখাবার জন্য মেয়েটি যে বিশেষ ব্যস্ত তা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ালো না। নিজের নাম বারাবার করে কেউ তাঁকে ব্যবহার করছে, এ ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ কখনো বরদাস্ত করতেন না। মেয়েটি আর তার বর রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না। এমন ভাব করলেন যেন তিনি মেয়েটিকে আদৌ চেনেন না। মেয়েটির তো তখন চোখে জল এসে গেছে আর কি! কোন রকমে গলার স্বর টেনে বললো: "আপনি আমাদের আশীর্বাদ করলেন না?" তখন রবীন্দ্রনাথ তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: "তুমি! এই বুঝি তোমার বর? তা বেশ, কিন্তু আমি তো তোমার সঙ্গে কথা বলবো না।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বললো, "বিয়েতে নিজে এসে নিয়ে যেতে পারিনি ব'লে রাগ করেছেন? বিশ্বাস করুন, সত্যি আমি সময় করে উঠতে পারিনি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সে কথা আসছে না।"

"তা হলে" মেয়েটি আরো উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো।

রবীন্দ্রনাথ ধরা গলায় বললেন-: "এর মধ্যেই ভুলে গেলে? তুমি না বলতে আমার গলাই তুমি মালা দেবে?"

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ষাট। তাঁর রসিকতায় উপস্থিত সবাই হাসিতে ফেটে পড়লো। বর-বধূকে রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ তো করলেনই, বনমালীকে ডেকে চা-খাবার দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। ওদের উপহারও দিলেন

আর এক অলৌকিক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এক

আমার এক বন্ধুর মুখে শোনা সত্য ঘটনা। বন্ধুর জবানিতেই বলছি।

কয়েকবছর আগে কলকাতায় জমি কেনার খুব ধুম পড়ে গিয়েছিল। যে যেখানে পারছে চড়া দামে জমি কিনছে পারারও ইচ্ছে ছিল, জমি কেনেন দর ক্রমেই বাড়ছে। সন্ধান করে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে তাঁরা একটা জমির খোঁজ পেয়ে উৎসাহিত হলেন এবং জমিটা কিনে ফেললেন প্রায় পাঁচ কাঠা। সামনে পিছনে নতুন রাস্তা। সব দিক দিয়েই ভাল। আমাদের খুব পছন্দ এবং আরও হল।

দাদা আমার সব কাজই চটপট করতে ভালবাসেন সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির প্ল্যান তৈরী কনট্রাকটরের সঙ্গে চুক্তি। প্ল্যান মঞ্জুর হলেই বাড়ি তৈরীর কাজ শুরু

সেদিন সন্ধ্যার পর আমাদের বাসায় দাদা বৌদি আর আমি বৈঠকখানায় বসে নতুন বাড়ি সম্বন্ধে আলোচনা করছি, এমন সময় হঠাৎ দেখি কখন এক ভদ্রলোক ঘরে এসে ঢুকেছেন। তাঁর মুখে সাদা দাড়ি পরনে পাৎলুন আর লম্বা সাদা কোট! তাঁকে দেখে বৌদি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেলেন! আমরা সবিস্ময়ে আগন্তুকের দিকে চেয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম ফোরেস্ক। আমি থাকে ইহুদি, বেকবাগানে থাকি। আপনারা কি পার্ক সার্কাসের নতুন রাস্তার মোড়ের জমিটা কিনে ফেলেছেন?

দাদা বললেন, হ্যাঁ, কিনেছি, কেন বলুন তো?

বৃদ্ধ অদূরে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললেন, কিনেছেন নি। পারেন তো এখনি বেচে ফেলুন!

দাদা বললেন, বেচবার জন্যে তো কিনি নি। বাস করব বলেই কিনেছি।

ঠ চোখ বড় করে ইহুদি ভদ্রলোকটি বলে উঠলেন, বাস করবেন? অমন কাজ করবেন না। যা বলছি শুনুন। ও জমি বেচে ফেলুন।

দাদা একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আগন্তুকের দিকে ফিরে বললেন, আপনার কথা বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা কি ভেঙেই বলুন না

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, ভেঙে আর কি বলব। তবে জেনে রাখুন, ওই জমিতে কোন মানুষ বাস করতে পারবে না

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি দাদা জমিটা যার কাছ থেকে কিনেছিলেন তাঁর নাম হরিশংকর রায়। জমির পাশেই থাকেন তিনি প্রথমেই দাদাকে বলেছিলেন, একটা কথা বলে রাখি মশায়, ও পাওয়ার আমার অনুরোধ আছে এই জমি যাতে বেচতে না পারে তার জন্যে তার নানা রকম ভাবে চেষ্টা দেয়, নানা কথা রটায়, খদ্দেরদের ভয় দেখায়। সেজন্যে অনেকে বায়না করেও টাকা দেবার নিয়ে গেছে আর সেজন্যেই জমিটা এত কম দরে বেচে ফেলছি। লোকের কথা শুনে আপনি যেন আমায় কিছু বলতে আসবেন না।

দাদা হেসে বলেছিলেন, লোকের কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে কোন কথা বলতে আসবো না!

দাদা চিরকালই একটু একরোখা জেদী। তাই বৃদ্ধ ইহুদির কথা শুনে একটু জোরের সঙ্গেই বললেন, আমরা বাস করব। আমরা কাউকে ভয় করি না। কোন শোনা কথাকে বিশ্বাসও করি না।

ভয় করেন না! বিশ্বাস করেন না? আচ্ছা দেখবেন বাড়ি করার পর!

আমি তো হতভম্ব। বৃদ্ধ বলে কি! দাদা এবার

চটলেন। বললেন আপনি অনর্থক এসেছেন। অন্য কথা না থাকে তো বাড়ি যান।

বৃদ্ধও যেন চটে উঠলেন, অদ্ভুত কাঁপা গলায় বললেন, আমি আবার বলছি, ও সংকল্প ত্যাগ কর! তোমাদের ভালর জন্যেই বলছি!

বলতে বলতে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন! কী দীর্ঘ দেহ আর কী লম্বা, লোকটির মাথা যেন কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকছে। হঠাৎ বৃদ্ধ হেসে উঠলেন। অস্বাভাবিক তীব্র হাসি। আমি মনে মনে চমকে দাদার পানে তাকালাম। দাদাও আমার দিকে তাকালেন। তার পরেই মুখ ফিরিয়ে দেখি, বৃদ্ধ নেই। চোখের পলকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন!

একটু পরেই বৌদি পাশের ঘর থেকে এঘরে এলেন তাঁর চোখে মুখে বিহ্বলতা। দাদা উত্তেজিত স্বরে বললেন, দেখলে, লোকটার আস্পর্ধা বাড়ি চড়াও হোয়ে ভয় দেখাতে চায়।

বৌদি বললেন, মাগো! কি বিশ্রী চেহারা! কি লিকলিকে আর লম্বা! দেখলে ভয় করে।

বললাম, মিছে বলনি বৌদি! লোকটাকে দেখে আমারও যেন কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

দাদা বললেন, আরে, লোকটা তো ভয় দেখাতেই এসেছিল। তোরা অমনি ভয় পেয়ে গেলি! কিন্তু আমাকে ভয় দেখানো অত সহজ নয়। লোকটা ঘুঘু! ওর মতলব কি জানিস? যাতে কেউ জমিটা না কেনে আর তা হলে শেষ পর্যন্ত ও জলের দরে জমিটা হাতাতে পারে। ওসব চালাকি আমার কাছে চলবে না।

এমন সময় হঠাৎ বাইরে একটা বিকট অট্টহাস্য! আমরা তিনজনেই চমকে উঠলাম। দাদা ভীষণ রেগে উঠে বললেন, দেখেছো লোকটার বজ্জাতি! বাইরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছে। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

বলতে বলতে তিনি সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও ছুটলাম তাঁর পিছনে। বারান্দায় পা দিতেই মনে হল যেন কে একজন আবছা অন্ধকারে ঝড়ের হাওয়ার মতো আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

দাদা বলে উঠলেন, পালালো!

আমরা দু'জনে বারান্দা থেকে রাস্তায় নামলাম। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। ফিরে এলাম বৈঠকখানায়, দেখলাম, বৌদি ভয় ভয় চোখে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। দাদা বললেন, বেটা পালিয়ে গেল। ধরতে পারলে এমন শিক্ষা দিতাম যে আর তাকে এ মুখো হোতে হত না।

আমার বুকের ভিতরটা তখনো যেন একটু একটু কাঁপছিল। এ কী ব্যাপার রে বাবা! বললাম, লোকটা কে একবার খোঁজ নেওয়া দরকার দাদা।

হ্যাঁ। কালই খোঁজ নেব। পুলিশেও ডায়েরী করিয়ে রাখবো।

ইচ্ছে ছিল দাদাকে বলি যে এই জমিতে বাড়ি না করাই ভাল। কেনা হয়ে থাকে হয়েছে। পরে বেচে ফেললেই হবে। কিন্তু বললাম না। জানি, দাদা অত্যন্ত একজেদী মানুষ। বললে কোন ফল হবে না!

॥ দুই ॥

পরদিন সকালে দাদা এবং আমি হরিশংকর বাবুর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম একথা সেকথার পর দাদা বললেন, আচ্ছা, বলতে পারেন, এ পাড়ায় কোন ইহুদি থাকে কি? খুব রোগা আর লম্বা, বুড়ো, মুখে দাড়ি। নাম জোসেফ।

দাদার কথা শুনে হরিশংকরবাবু যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুকাল চুপ করে থেকে বললেন, না আমার যতদূর জানা আছে এরকম কোন লোক এ পাড়ায় থাকে না। তবে আপনি যে রকম বর্ণনা দিলেন ওই রকমই একটা লোক আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে, যে জমিটা কিনতে আসে তাকেই ভাংচি দেয়, ভয় দেখায়। আপনার কাছেও গিয়েছিল নাকি?

দাদা হেসে বললেন, গিয়েছিল! তবে আমি ভয় পাবার লোক নই। আমি ঠিক করে ফেলেছি, দু' মাসের মধ্যে বাড়িটা তুলে ফেলব। একটু বেশী খরচ হবে। তা হোক। কিন্তু তার আগে এই বুড়োটা কে তা জানতে চাই সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা।

হরিশংকরবাবু বললেন, লোকটা যে কে তা আমি আজ পর্যন্ত জানতে পারি নি। আমি তাকে কোন দিন দেখিনি। লোকের মুখে শুনেছি ওই রকম একটা লোক মাঝে মাঝে জমি কিনতে আসে তাদের নানা কথা বলে ভয় দেখায়। দেখুন, আপনার কাছে গোপন করব না। আমার এক কাকা এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকেন। তিনি নাকি ওই রকম চেহারার একটা লোককে দু'তিন রাত দেখেছেন, জমিটার ওপর ঘুরে বেড়াতে।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, কাকা আরও কি বলেন জানেন। বলেন, সে মানুষ নয়।

দাদা হেসে উঠলেন, মানুষ নয়? তবে কি ভূত?

হরিশংকর বাবুও হাসলেন, কাকার তাই ধারণা। লেকেলে লোক কি না। ভূত প্রেত বিশ্বাস করেন! বলেন, ওখানে হয়ত কারুর কবর ছিল! তারই প্রেতাত্মা অমন করে, রাতের বেলায় ঘুরে বেড়ায়।

হরিশংকর বাবুর কথা শুনে আমার মনে কী রকম যেন আতংক জাগল। দাদা কিন্তু হো হো করে হেসে উঠে বললেন, তাহলে প্রেতাত্মাটি বেশ রসিক। বাড়ি গিয়ে আমার সঙ্গে রসিকতা করে এসেছেন। যাক, আজ চলুলাম। আপনি দয়া করে লোকটার একটু সন্ধান করবেন, আর কোন খবর পেলেই আমায় জানাবেন, লোকটাকে ধরতে হবে।

পথে বেরিয়ে আমি সংকোচের সঙ্গে বললাম, কবরের ওপর বাড়ি করবে দাদা?

দাদা সকৌতুকে বললেন, কিরে! তোকেও ভূতে পেল নাকি?

বললাম, না, দাদা। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। তবে একটা সংস্কার। কবরের ওপর বাড়ি তোলা—

দাদা আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, ওটা কুসংস্কার! জমির ওপর বাড়ি হবে, তার তলায় কি আছে তা জানার দরকার কি! তাছাড়া ওখানে যে কবর ছিল তাও তো নিশ্চয় করে বলা যায় না। ওটা তো হরিকাকার কল্পনা। তাহলে আমাদের কি মানতে হবে যে ওই জলজ্যান্ত বুড়ো ইহুদিটা সেই প্রেতাত্মা?

আমি চুপ করে রইলাম। সত্যিই, লোকটাকে তো সামনা সামনি ঘরের মধ্যে দেখেছি। তাকে ভূত বলি কি করে? তাছাড়া ভূত প্রেত, ওসব শোনা কথা। দাদার মতো আমিও বিশ্বাস করি না। তবে কেন জানি না, মনের মধ্যে তবুও একটা খটকা লেগে রইল।

কিছুক্ষণ পরে দাদা বললেন, আর, তোর বৌদিকে এসব কথা বলবার দরকার নেই। মেয়ে মানুষ তো, ভয় তার ভর করে যাবে।

বললাম, না। ওঁকে বলার কি দরকার।

বাড়ি ফিরে এলাম। নিজের ঘরে গিয়ে শুলাম। মনটা যেন কিছু বিক্ষিপ্ত। বুড়ো ইহুদিটাকে বারবার মনে পড়তে লাগল। ক্লান্ত লাগছিল চোখ বুজে আছি, হঠাৎ মনে হল যেন সেই বুড়ো আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে চোখ মেলে তাকালাম। কোথায় কে! বুঝলাম, এ আমার উত্তেজিত মনেরই প্রতিক্রিয়া।

॥ তিন ॥

দেখতে দেখতে বাড়ী তৈরী হয়ে গেল। খুব দ্রুত কাজ হল। ঠিকাদারকে অনেক বেশী টাকা দিয়ে দাদা ছ'মাসের কাজ আড়াই মাসে শেষ করলেন। তাঁর যেন তেজ চেপে গিয়েছিল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন বাড়ীতে গিয়ে বসবাস শুরু করবেন।

শুভদিন দেখে গৃহ প্রবেশ হল। আত্মীয় স্বজন পাড়া-পড়শীদের নেমন্তন্ন করা হল। গৃহ প্রবেশের দিন রাত্রে ভারাভোজ খেতে এলেন। বাড়ী দেখে সবাই প্রশংসা করলেন—চমৎকার প্ল্যান, সুন্দর বাড়ী।

আমি পরিবেশনের দিকে রইলাম, দাদা আর বৌদি অতিথি আপ্যায়নে। মেয়েদের নিয়ে গিয়ে বৌদি দোতলার ঘরে বসাচ্ছেন, পুরুষরা বসেছেন নীচে। ছাদে মেহগ্নি টেবিল সাজানো। প্রথম ব্যাচ বসবে এখনি।

লুচি তরকারি পাতে দেওয়ার পর অতিথিদের আহ্বান করা হল। মেয়েদের আহারের জায়গা দোতলায়।

সবাই খেতে বসলেন খাওয়া সবে শুরু হয়েছে এমন সময় হঠাৎ এক বিপর্যয়। বাড়ীর সব আলো নিভে গেল! ইলেকট্রিক ফিউজ। মিস্ত্রীকে দাদা প্রস্তুত রেখেছিলেন। সে কাজে লেগে গেল। এদিকে অন্ধকারের মধ্যে মহা-কলরব। দোতলার মেয়েরা তো রীতি মতো কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। যাই হোক, মিনিট দুই তিনের মধ্যেই আলো জ্বলে উঠল। আবার ভোজপর্ব শুরু হল।

কিন্তু দু'তিন মিনিট পরেই আবার আলো নিবল। আবার চীৎকার, হট্টগোল। এ কী কাণ্ড। মাথা যেন গুলিয়ে গেল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আবার ফিউজ লাগালো! আলো জ্বলল। কিন্তু আবার। আবার দু' মিনিট পরেই আলো নিবে গেল। যেন ভোজবাজী।

কোলাহলের মাত্রা বেড়ে উঠল। নানা টিকা টিপ্পনি মন্তব্য। দাদা মিস্ত্রিকে ধমকাতে লাগলেন। এ কী কাণ্ড হচ্ছে। বারে বারে আলো নিভছে কেন? কিন্তু সে বেচারা আর কি করবে? বারে বারেই ফিউজ লাগাচ্ছে। আলো জ্বলছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিবে যাচ্ছে। কী করা যায়। দাদা আবার তিন চার জনকে গ্যাস আলো আনতে পাঠালেন। এদিকে নিমন্ত্রিতদের অনেকেই উচ্চকণ্ঠে যা তা বলতে লাগলেন—এ কী রকম ব্যবস্থা? আলোর বন্দোবস্ত ঠিকমত না করে তাঁদের এভাবে হয়রান করায়, অপমান করার, এ ভাবে এঁটো হাতে বসে থাকা যায় না! চলুন, চলুন, ফের নেমন্তন্ন খাওয়া হয়েছে। লোকজন উঠে পড়ে আর কি! অনেক অনুনয় করে তাঁদের বসালাম। গ্যাস-বাতি এসে পড়ল। আলো হল। বাঁচা গেল। পরিবেশন চলতে লাগল।

মিনিট পনেরো পরেই ছাদের এক প্রান্তে সহসা মহা হৈ হৈ রব। সেদিকে চাইতেই দেখলাম, কয়েকজন অতিথি আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন গর্জে উঠে বললেন, এ কী কাণ্ড। আমাদের জাত মারবার চেষ্টা? ক্রিশ্চান, না, মুসলমান, তাকে এনে আমাদের পাশে বসানো হয়েছে। বড়লোকী ফলানো হচ্ছে। উঠে এসো সবাই

হতবুদ্ধি আমি ব্যাপারটা কি, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ দেখি সেই বুড়ো ইহুদি। ওধার থেকে ঝুনী ঝড়ের মতো ধেয়ে এসে আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল আর সঙ্গে গ্যাসের আলোগুলোও নিবে গেল—ছাদে, দোতলায়, একতলায়—সব আলো। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে দোতলার মেয়েদের আর্তনাদ আর কান্নাকাটি—ওমা, সাহেব, সাহেব! সাহেব ছুটছে। ছুটোছুটি হুড়োহুড়ি ধাক্কা ধাক্কি! যেন মহা প্রলয়। আমি ধাক্কা খেতে খেতে দোতলায়, তারপর নীচে! লোকজন এ ওকে ধাক্কা মেরে নীচে নামছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। চেঁচামেচি শুনে বাড়ির সামনে লোক জড় হোয়ে গেছে। লোকের ঠেলা খেতে খেতে একেবারে সদর দরজায় এসে পড়লাম এবং সেই খানেই হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আর যেন অবিশ্বাস করতে পারছিলাম না। প্রেতযোনীর কবলে পড়েছি। বুঝি এযাত্রা আমাদের আর নিস্তার নেই।

দেখতে দেখতে বাড়ী ফাঁকা। কেবল দাদার শ্বশুর বাড়ির সকলে রইলেন। আবার আলোর ফিউজ লাগানো হল। আবার আলো জ্বলল এবং এবার আর দু'মিনিট বাদেই নিভে গেল না। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিও চলে গেল।

কম্পিত বক্ষে ভিতরে ঢুকে দেখলাম, দাদা তাঁর শাশুড়ী ঠাকরুণ, বৌদির দুই বোন আর দাদার শ্যালক দু'জন সবাই নীচে নেমে পিছনকার বারান্দায় বসে আছেন। দাদা মাথায় হাত দিয়ে গুম হয়ে বসে। তাঁর এক পাশে অদূরে কে যেন জড়াজড়ি করে বসে আছে। দাদার শ্যালক দু'জন এদিক ওদিক পায়চারি করছে। দারওয়ান হরি সিং সদর দরজায় দাঁড়িয়ে।

আমাকে দেখে বৌদি ভয় কণ্ঠে বললেন, কি হল ঠাকুর পো?

কাঁপা গলায় বললাম, যা হল তা বলার নয়। কিন্তু আর এক দণ্ড এখানে থাকা চলবে না বৌদি। যদি বাঁচতে চাও দাদাকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে পালাও।

দাদা মুখ তুলে হঠাৎ অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন, কি বললি তুই, ভাড়াটে লোকের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবো?

বললাম, এ জাতি অক্রূরের কাজ নয় দাদা। এ সেই বুড়ো ইহুদি ভূতের কাজ।

দাদা গর্জন করে উঠলেন, তুই আমার ভূতের ভয় দেখাচ্ছিস। তারপর একটু থেমে আপন মনে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ সেই বুড়ো ইহুদিটার কাজ। সে-ই শত্রুতা করছে। তাকে ধরতেই হবে।

হঠাৎ স্পষ্ট শুনতে পেলাম অদূরে দাঁড়িয়ে কে যেন বলে উঠল, আমাকে ধরবেন। তারপরই সে কী খলখলে হাসি। মেয়েরা ভয়ে কাতরে উঠল

এ কী! দাদার সামনে দাঁড়িয়ে সেই বুড়ো ইহুদি। কোথা থেকে এলো। কী ভয়ানক ব্যাপার। তার মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল। শুনলাম, সেই বুড়ো বলছে, বাবু সাহেব, মানা করেছিলাম, এখানে বাড়ি করবেন না। শুনলে না তো আমার কথা। এখন ফল ভোগ কর। কেমন লোকজন খাওয়ালে?

দাদা চীৎকার করে উঠলেন, হরি সিং, হরি সিং।

হুজুর, বলে পালোয়ান হরি সিং ছুটে এলো।

দাদা উন্মত্তের মতো বললেন, পাকড়ো উসকো! পাকড়ো শয়তান কো

সঙ্গে সঙ্গে ভয়াবহ বিকৃত বিকট হাস্য ধ্বনি। নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখলাম, সেই বৃদ্ধ ইহুদির দেহটা দৈর্ঘ্যে বাড়তে লাগল এবং ক্রমে তার মাথাটা বারান্দার কড়ি কাঠে গিয়ে ঠেকল। সেই দৃশ্য দেখে কুস্তিগীর হরি সিং রাম নাম উচ্চারণ করতে করতে সেখান থেকে ছুটে পালালো।

আমরা সবাই নিষ্পন্দ, স্তম্ভিত, যেন বাহ্যজ্ঞান রহিত। অকস্মাৎ চড় চড় করে একটা শব্দ হল এবং আমাদের চোখের সামনে সেই বৃদ্ধ ইহুদি বারান্দার মেঝের তলায় অদৃশ্য হোয়ে গেল, সভীর আতংকে দেখলাম, বারান্দার মেঝের সেই জায়গাটা ফেটে চৌচির। কাঁপতে কাঁপতে দাদার কাছে গিয়ে বললাম, আর অবিশ্বাস কোরো না দাদা। চোখের সামনে তো দেখলে। আর দেরী করলে ক্রাউকে বাঁচাতে পারবে না। এখনি এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ফাটা মেঝের নীচে থেকে আবার ঘড়, ঘড় কড়ঘর ভেসে এলো, কি, এখনো অবিশ্বাস? বাঁচতে চাও তো পালাও। নইলে কারুর রক্ষা নেই।

দাদার মুখ চোখের অবস্থা দেখে আমার আত্মারাম কেঁপে উঠল। এ তো সহজ মানুষের দৃষ্টি নয়! এ যে উন্মাদের দৃষ্টি! শেষ কালে দাদা কি পাগল হোয়ে যাবেন? আমি তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে দাদার কানকাছে ডাকতে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, বড় জানলা দুটিতে দাঁড়িয়ে মেঝের খড়ে। ছোট সেখানে নেই। বৌদিদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কী সর্বনাশ। তাঁরা সবাই মেঝের ওপর পড়ে গোঙাচ্ছেন। আমি বুঝলাম, আর রক্ষা নেই। এবার একে একে সবাই মরবে আমরা, আমরা দুজন। আর যে সহ্য করতে পারছি না আমার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এলো। তারপর কী হল তা আর আমার মনে নেই

যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন চোখ মেলে দেখলাম আমি একটা ঘরে শুয়ে আছি। দিনের আলোয় ঘর ভরে গেছে। উঠে বসলাম। আমায় উঠতে দেখেই ওধার থেকে এক অপরিচিত তরুণ আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ব্যগ্র কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার দাদা, বৌদিদি?

যুবকটি বললে, আপনি ব্যস্ত হবেন না। তাঁরা সবাই ভাল আছেন।

তেমনি ব্যাকুল কণ্ঠে বললাম, এখনি আমাদের এ বাড়ী থেকে নিয়ে চলুন। নইলে আমরা সবাই খুন হব।

যুবকটি বললে, কোন ভয় নেই আপনাদের। এখনি আপনাদের এখান থেকে নিয়ে যাব। তার ব্যবস্থা হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। তাড়া বাড়িতে নোটিশ দিয়ে চলে এসেছি। সেখানে যাওয়া গেল না। অগত্যা বালিগঞ্জে বৌদির পিত্রালয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। পরে শুনলাম, দাদার ছোট জানলা ব্যাপার দেখে ছুটে গিয়ে তার কলেজের নিকটস্থ হোটেল থেকে তার কয়েকজন বন্ধুকে ডেকে আনে এবং তারাই আমাদের শুশ্রূষার ভার নেয় আর আমাদের সে বাড়ি থেকে চলে আসার সব বন্দোবস্ত করে দেয়।

পুণ্যতীর্থ প্রভাস

সুবোল বন্দ্যোপাধ্যায়

পুণ্যভূমি আমাদের ভারতবর্ষ। উত্তরে দেবতাত্মা হিমালয় থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা, আর পূর্বে কামাখ্যা থেকে পশ্চিমে প্রভাস পর্যন্ত ভারতের নানা জনপদে কত তীর্থক্ষেত্র, কত দেব দেউল, কত পীঠস্থান বিরাজমান।

পশ্চিম ভারতের পুণ্য তীর্থের মধ্যে প্রভাস অন্যতম প্রধান। এই প্রভাস তীর্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন। ভাগবতে আছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু পরে দেখলেন, জগতে সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হয় নি। তাই তিনি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, নারদ প্রমুখ মুনিদের দ্বারকার কাছে পিণ্ডারিক তীর্থে যেতে আদেশ করলেন। একদিন যদু বংশের কুমারেরা ছলনা করে শাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজিয়ে মুনীদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে মহর্ষিগণ, ইনি পুত্র বা কন্যা কি প্রসব করবেন?'

মুনিরা এই চক্রান্তে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'তোমাদের কুলনাশক মুষল প্রসব করবেন।'

মুনিদের অভিশাপে শাম্বের উদরে লৌহময় মুষল দেখে কুমারেরা অত্যন্ত ভীত হলেন। এরপর যদুরাজ আহুক ঐ মুষলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন। ঐ মুষলাংশ এক মাছ গিলে ফেললো। বাকি চূর্ণগুলি সমুদ্র তীরে শরবনরূপে পরিণত হলো। এদিকে ধীবরেরা ঐ মাছটিকে ধরে তার উদরে লোহার খণ্ড পায়। জরা নামে একজন ব্যাধ ঐ লোহার খণ্ড দিয়ে বাণ তৈরি করলো।

এদিকে দ্বারকায় অমঙ্গল সূচক নানা ঘটনা ঘটতে দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে যাদবগণ, আর মুহূর্ত কালও আমাদের এখানে অবস্থান করা উচিত নয়। চল, আমরা প্রভাস তীর্থে গিয়ে দেবতাদের পূজার্চনা করে মঙ্গল কামনা করি।' যাদবেরা প্রভাস তীর্থে এসে মৈরেয়ক মদ পান করে মত্ত হলো এবং পরস্পরের সঙ্গে গোহত্যা কলহ আরম্ভ করে শরবন দিয়ে প্রহার করতে লাগলো। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে শত্রু ভেবে তাঁদের বধ করতে উদ্যত হলো। তাঁরাও শরগুচ্ছ দিয়ে আক্রমণ কারীদের হত্যা করলেন। বলরাম যোগবলে সমুদ্রতীরে মহা সমাধি লাভ করেন। তা দেখে শ্রীকৃষ্ণ হিরণ্যা নদীতটে অশ্বত্থ গাছের পাদদেশে উপবেশন করলেন। ইতিমধ্যে জরা ব্যাধ মৃগ ভেবে ভগবানের রক্তাক্ত পায়েপরে বাণ নিক্ষেপ করলো। পরে শ্রীভগবানকে দর্শন করে অপরাধে সংকুচিত হয়ে কর যোড়ে বললো, 'হে প্রভু, তোকে স্মরণ করলে অজ্ঞানান্ধকার দূর হয়, আমি সেই নারায়ণের প্রতি অমঙ্গলাচরণ করেছি। আমি মূর্খ, অজ্ঞান, আমায় ক্ষমা করুন।'

তার কাতরোক্তি শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'হে জরে, তুমি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করেছ। তোমার ভয় নেই, তুমি স্বর্গে গমন কর।' এই বলে ভগবান বৈকুণ্ঠধামে গমন করলেন। ব্যাধও স্বর্গলাভ করলো।

গুজরাট রাজ্যের ভেরাবল রেল-স্টেশন থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে প্রভাসতীর্থ অবস্থিত। প্রভাস গ্রামটি স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে দেওপত্তন, প্রভাস পত্তন বা পত্তন সোমনাথ নামে পরিচিত। গ্রামটি দুর্গের মতো আরব সাগরের তীরে অবস্থিত, চারিদিকেই উচ্চ প্রাচীর। গ্রামের মধ্যস্থলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির অবস্থিত।

কথিত আছে, ভগবান সোমনাথ অর্থাৎ দেবাদিদেব শিব নিজে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখনকার দিব্য লিঙ্গ দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। এ কারণে হিন্দুদের কাছে সোমনাথের মন্দির অতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এক

সময় এই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ১০ হাজার গ্রামের রাজস্ব ব্যয়িত হত এবং ২ হাজার ব্রাহ্মণ এই মন্দিরে পূজার্চনা করতেন।

পঞ্চম ও অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে বল্লভী নৃপতিরা সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির নির্মাণ করেন বলে অনুমান। ১০২৫-২৬ সালে গজনীর সুলতান মামুদ তাঁর ষোড়শ অভিযানে সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন করেন। গুজরাটের রাজা ভীম, বহু সংখ্যক রাজপুত সৈনিক ও রাজা এবং অসংখ্য ব্রাহ্মণ সোমনাথের মন্দির রক্ষার জন্যে সমবেত হলেন। কিন্তু সুলতান মামুদের দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না। সুলতান মামুদ মন্দিরের অভ্যন্তরে রক্ষিত ৫ কোটি মুদ্রা লুণ্ঠন ও মন্দিরটি ধ্বংস করে চলে গেলেন।

এই ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন ইন্দোরের রানী অহল্যাবাই ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ১৯৫৭ সালে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করার সময় অহল্যাবাই প্রতিষ্ঠিত এই সোমনাথ মন্দির দেখার সুযোগ হয়েছিল।

মন্দিরটি বিশেষ বড় নয়। সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা। পূর্ব ও উত্তর দিকে দুটি প্রবেশদ্বার। মন্দিরের আশে পাশে আরও অনেক ঘর আছে। মন্দিরের আরাধ্য বিগ্রহ শিবলিঙ্গ নিচের তলায় বিরাজমান। মুসলমান আক্রমণের কবল থেকে রক্ষার জন্যে অহল্যাবাই এই জ্যোতির্লিঙ্গটি নিচের তলায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবলিঙ্গের ডানদিকে পার্বতীর মূর্তি। শিবলিঙ্গ প্রায় আড়াই ফুট ও পার্বতীর মূর্তি তিন ফুট উঁচু। দুটিই কষ্টি পাথরের তৈরী।

আরব সাগরের তীরে ওর সোমনাথের আদি মন্দিরটিও তখন দেখেছিলুম। অবশ্য তখন ওর মন্দিরের সংস্কার করে নতুন মন্দির নির্মাণের কাজ চলছিল। ১৯৫১ সালের ১১মে প্রজাতন্ত্রী ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ এই নতুন মন্দিরের জ্যোতির্লিঙ্গ স্থাপন করেন। আদি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখেই উপলব্ধি করা যায়, এই মন্দিরটি বেশ বড় ছিল। এই সেই মন্দির যা সুলতান মামুদ সতের বার আক্রমণ করেছিলেন। ধনরত্ন লুণ্ঠন করে বিগ্রহ ও মন্দিরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু মানুষের প্রাণের ঠাকুরকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। তাই আজও দূর দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থী মানুষ এইখানে ছুটে আসে।

সোমনাথের মন্দির থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে প্রভাস তীর্থ। এখানে কপিলা, হিরণ্যা ও সরস্বতী এই তিনটি নদী একত্রিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়েছে। পুণ্যার্থীরা এই ত্রিবেণী সঙ্গমে পূর্ব পুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডাদি দান করে থাকেন। ত্রিবেণীর মন্দিরে আছে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর তিন মূর্তি। পাশেই সূর্য মন্দির।

ত্রিবেণী মন্দিরের পিছনে একটি পুকুর আছে। পুকুরের ধারে আছে একটি শিব মন্দির। মন্দিরের পাশে নদীতীরে একটি বটগাছ আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বলেন, এই বটগাছের পাদদেশেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেছিলেন। এই পাদদেশ বাঁধানো। সূর্য মন্দিরের পাশে শঙ্কর মঠ ও পাণ্ডব গুহা। শঙ্কর মঠে আচার্য শঙ্করের একটি বড় তৈলচিত্র আছে। পাণ্ডব গুহা সম্পর্কে প্রবাদ এই যে, পঞ্চ পাণ্ডব এই সব গুহায় তপস্যা করেছিলেন।

পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত প্রভাস তীর্থে এলে মন তাই এক অলৌকিক পুলকে ভরে ওঠে—এখনই এখানকার স্থান মাহাত্ম্য।

তীর্থ-বিচিত্রা

গৌরীশংকর দে

পবিত্র স্থান বা তীর্থ স্থান পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই আছে : কিন্তু ভারতের মতো বহু সংখ্যক তীর্থ বোধ হয় আর কোথাও নেই। এই সব তীর্থ সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের প্রকৃত প্রাণ বলি, ধর্মের গতিকেন্দ্র। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের এক একটি ধর্মস্থান বা তীর্থ ভারতের এক একটি রাজধানী, সেখানকার প্রাসাদ মঠ ও আশ্রম : সেখানকার রাজা সাধুসন্ন্যাসীগণ। ভারতের রাজধানী দিল্লী নয়, প্রকৃত রাজধানী কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা ও হরিদ্বার। এই সব তীর্থ কেবলমাত্র পুণ্যার্থীদের স্বর্গ নয় কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র যে মহামানবের সাগরতীর। তাই, সেকালে যখন যানবাহনের অভাব ছিলো, পথ-ঘাট ছিলো রীতিমতো দুর্গম, দস্যুভয় প্রবল, তখনো অসংখ্য নরনারী একাকী বা দলবদ্ধভাবে তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছে। আদান প্রদান যেমন ব্যবসায়ের ভিত্তিমূলে সত্য তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়াও, অর্থনৈতিক জীবন হয়েছে পরিপুষ্ট। তীর্থস্থানে যোকানী সাজিয়ে বসেছে তার পসরা, সেই পসরা ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের দূরতম প্রান্তের বিভিন্নতম গ্রামে। আসলে ভারতবর্ষ নিজেই এক পবিত্র তীর্থ তাই হাজার হাজার কোশ ব্যাপী পাহাড়-পর্বত ও মরু-ভূমির দুরন্ত অতিক্রম ও দুর্গমতাকে বেঙ্কায় বরণ ও জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করে একদিন বুদ্ধের জন্মভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ফা-হিয়েন এবং হিউয়েন সাং। সমন্বয়ের দেশ ভারত। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান সকলেরি অসংখ্য তীর্থে পরিবেষ্টিত এই দেশ। এর মৃত্তিকা, এর ধূলি সকলের কাছেই পবিত্র। ভারতের তীর্থ সম্পর্কে অবহিত থাকা তাই দেশপ্রেমেরই নামান্তর। ভারতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মত্যাগ। তীর্থ-স্থানের নির্বাচনেও এই আত্মত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য-স্থানগুলিকে এ-দেশের মানুষ স্বার্থপরের মতো নিজের ব্যক্তিগত বাসস্থান বা ভোগে ব্যবহার করে নি, মনোরম পর্বত-শিখর, নদীতীর কিংবা অরণ্য উৎসর্গ করেছে দেবতার নামে। সেই সব স্থান মহিমামণ্ডিত করে তুলেছেন কবি তাঁর কল্পনায়। ভাস্কর তাঁর ভাস্কর্যে, দার্শনিক তার দর্শনে। এই কারণে ভারতের এক-একটি তীর্থ ইতিহাস, দর্শন, কাব্য ও শিল্পের মোহানা।

তীর্থ তো নয়, যেন মানুষের কাছে মানুষের আমন্ত্রণ : পুঁথি প'ড়ে নয়, চোখে দেখে দেশকে জানার, প্রতিটি অঞ্চলের মানুষ, তার আচার-ব্যবহার, ভাববারা, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরস্পরের পরিচিত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্ত-প্রদেশ, পঞ্জাব, রাজপুতানা, কাশ্মীর, দক্ষিণ ভারত, মধ্যভারত—কোথায় তীর্থ নেই ?

বাংলার সুপরিচিত তীর্থ গঙ্গাসাগর। সর্ব-ভারতীয় তীর্থ। আধুনিক কালে দক্ষিণেশ্বর। বৈষ্ণব তীর্থ নবদ্বীপ। পূর্ববঙ্গে চন্দ্রনাথ, লাউলবঙ্গ আসামে কামরূপ কামাখ্যা।

বিহারের বিখ্যাত তীর্থ বৈদ্যনাথ ধাম বা দেওঘর। বৈদ্যনাথ মূর্তি দ্বাদশ মহালিঙ্গের অন্যতম। এখানকার—জয়দুর্গার মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিহারের অন্যান্য তীর্থস্থান—রংসি, ছিন্নমস্তা, ভদ্র, [illegible], করণগড় ও গয়াশীর্ষ আশ্রম।

উড়িষ্যার প্রধান প্রধান তীর্থ—ভুবনেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, যাজপুর, পুরী ও সাক্ষীগোপাল ভুবনেশ্বরের অসংখ্য মন্দিরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও কারুকার্যখচিত ভুবনেশ্বরের মন্দির ও ভগবতীর মন্দির। বিন্দুসাগর, দেবীপাদহর, পাপনাশিনী, কেদারগৌরী, ব্রহ্মকুণ্ড, এবং কপিল হ্রদ এখানকার কয়েকটি বিখ্যাত সরোবর।

বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না অন্যান্য মন্দিরের

যেতে উল্লেখযোগ্য মার্কণ্ডেশ্বর, লোকনাথ ও নীলকণ্ঠেশ্বর। উড়িষ্যার নদী বৈতরণী হিন্দুদের পুণ্যতীর্থ

যুক্ত প্রদেশে তীর্থের সংখ্যা অসংখ্য। সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা পুণ্যতীর্থ মানসিংহের মন্দির ও হনুমানগড় এখানকার প্রধান আকর্ষণ।

এলাহাবাদ বা প্রাচীন প্রয়াগে প্রতি বারো বছর পর পর কুম্ভমেলা অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে এখানে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম ছিলো ও রামচন্দ্র এই আশ্রম পরিদর্শন করেছিলেন।

প্রীনগর থেকে ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে বদ্রীনাথ অলকানন্দা নদীর মোহানার কাছে নর নারায়ণের মন্দির। প্রবাদ, অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। কুম্ভমেলা উপলক্ষে এইখানে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হয়

হিন্দুদের মহাতীর্থ বারাণসী। বরুণা ও অসী এই দুটী নদীর মিলন-স্থলে অবস্থিত ব'লে এর নাম বারাণসী এর আরেক নাম কাশী এখানকার বিশ্বনাথের মূর্তি বৈষ্ণবদের প্রধান আকর্ষণ। ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। ঘাটের জন্য কাশী বিখ্যাত দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্র, মণিকর্ণিকা ইত্যাদি সব থেকে বিখ্যাত ঘাট।

গঙ্গার তীরে অবস্থিত বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির ও কিছুদূরে অষ্টভুজা মহামায়ার মন্দির। কানপুর থেকে ১৬ মাইল দূরে বিঠুর এখানেই নানা সাহেবের আশ্রম ছিলো।

যুক্তপ্রদেশের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থ বৃন্দাবন। যমুনা নদীর তীরে। এখানকার দুটি বিখ্যাত মন্দির গোপালদেবের মন্দির, গোবিন্দজীর মন্দির ও গোপীনাথজীর মন্দির। বৃন্দাবনের কয়েকটি বিখ্যাত ঘাট—কেশীঘাট, রাজঘাট, বরাহঘাট, আদিত্যঘাট, যুগলঘাট এবং গঙ্গার ঘাট-ঘাট। আর কয়েকটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড ও কূপ—রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, ললিত কূপ, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, মধুবন, তালবন ও কুমুদবন।

গঙ্গা, মন্দির ও স্নানঘাটের জন্য গড়মুক্তেশ্বর বিখ্যাত। কার্তিক মাসের শেষ দিকে সেখানে একটি বড়ো মেলা বসে

গোকুল যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত গোকুলনাথজীর মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য মথুরা থেকে আট মাইল দূরে গোবর্ধনগিরি। এখানে আছে হরিদেব, চন্দ্রেশ্বর ও মহাদেবের মন্দির

হরিদ্বার গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত মহাভারতে এর নাম গঙ্গাদ্বার এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে মায়াপুরী। হরিদ্বার থেকে ১৫ মাইল দূরে হৃষীকেশ ও ২ মাইল পশ্চিমে কনখল হৃষীকেশের কাছে লছমনঝোলা।

তীর্থ-বহুল যুক্তপ্রদেশের আর দুটি বিখ্যাত নাম নৈমিষারণ্য ও মথুরা কেশবদেবের মন্দির, কৃষ্ণ মন্দির ও কালভৈরবের মন্দির প্রাচীন শহর মথুরার কয়েকটি প্রধান আকর্ষণ

পঞ্জাবের কয়েকটি তীর্থ—হৃষীকেশ বা হৃষীকপুর, ধরমশালা বা ধর্মশালা, শিখদের স্বর্ণমন্দির ও সরোবরের জন্য বিখ্যাত অমৃতসর, লক্ষতীর্থ আলাপুরী, মন্দিরময় কালাটিস, জটাস, মুক্তসর বা মুক্তেশ্বর, বিরমাল, পহোয়া, সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত থানেশ্বর

রাজপুতানার কয়েকটি বিশিষ্ট তীর্থ অজমীর, চিতোরগড়, ভীমমল, কৈলোয়ারিয়া, কুণ্ডিয়ান, নাথদ্বার, পুরনগর এবং পুষ্কর পুষ্কর হ্রদের কাছে পরম পবিত্র উত্তর-পশ্চিম ভারত ও কাশ্মীরের কয়েকটি তীর্থ মারতাণ্ড, পায়েচ, অমরনাথ ও সরলা

মধ্যভারতের দর্শনীয় তীর্থ—গজরগড়, কুমরকটক, বাঘ, বারো, বারওয়ানি, ভোজপুর, চান্দেরি, দতিয়া, ধমনার, খাজুরার, রাণু, সাঁচী, সোনাগিরি, উদয়গিরি, উদয়পুর এবং উজ্জয়িনী।

দক্ষিণ ভারতের কতিপয় প্রসিদ্ধ তীর্থ—অনন্তপুর, কাঞ্চীপুরম, চিদাম্বরম, জম্বুকেশ্বর, কুম্ভকোনম, মাদুরা, মহাবলিপুরম, পক্ষীতীর্থ, রামেশ্বরম, শ্রীরঙ্গম, শ্রীপুরম, শ্রীশৈলম, তাঞ্জোর ও তিরুপতি। প্রত্যেকটি তীর্থই মন্দিরময় ও দক্ষিণ ভারতের রাজাদের অকৃপণ দাক্ষিণ্যের পরিচয়। এই সব তীর্থ দক্ষিণী সংস্কৃতির কেন্দ্র।

ভারত যে তীর্থের দেশ কেবলমাত্র নামের তালিকা থেকেই তা স্পষ্ট প্রত্যেকটি তীর্থ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল এবং স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে

স্মৃতি—ভালোবাসা—মৃত্যু

কাশীনাথ দাস

মাঠে নিস্তেজ রোদ যেন আস্তে আস্তে বাবলা বনের ভিতর গিয়ে হারিয়ে গেল। শস্য পাড়াগাঁয়ের মেঠো পথে চাঁদের আলো নেমেছে। দিনের আলো মিশে গেছে। আকাশে অনেক তারা। আহ্লাদের অবসাদে ভরে আছে শরীর। বেশ কিছুক্ষণ আগে চোখের উপর দিয়ে অসীম আকাশের দিকে উড়ে চলল কয়েকটা বাদুড়। অরুণদের বাগানে একটা জলপাই গাছ ছিল। হরিহরের সাথে একদিন সকালে গিয়েছিল। ফ্যাল ফ্যাল করে গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—তুই কিছুই চিনিস না। বোকা। জলপাই গাছ।

তার বোকামি লুকিয়ে রাখার জন্য তাড়াতাড়ি বলল,

—হ্যাঁ। চিনি।

জলপাই মুখে দিয়ে কয়েকবার থুথু ফেলল। বড্ড কষা। যে অপার বিস্ময় নিয়ে একদা কিশোর চোখ বেতফলের মোম আকন্দফুল আর বাবলা গাছের শুষ্ক হৃদয় ভরিয়ে তুলেছিল আজ তা নেই। সব কিছুর রূপ বদলেছে। আর বদলেছে মন। একদিন যা ছিল আজ তা স্মৃতি। যা আছে তা বর্তমান। সবটা মিলিয়ে স্মৃতির ভাঙাবাড়ি! সোনাপাড়া পেরিয়ে কায়েত পাড়ার মুখে পুকুর। বাঁ পাশে বাঁশের ঝোপ। ঐ পুকুরে ছিপ হাতে গাঁয়ের লোক মাছ ধরে। নাকে ঝাঁঝালো গন্ধ লাগে আরও খানিক পেরিয়ে ডানপাশে কণিমনসার গাছে লাল লাল ফল। রঙীন পাখীর ডাক। লাল লাল খোঁপা মাথায় বুলবুলি উড়ে আসে। বাবলাগাছের মাথায় নীলকণ্ঠ পাখি এসে বসে। মাঠের ছোট ছোট ফুল গায়ে ফুল নেই।

গাঁয়ের মেয়ে ধু ধু মাঠ। ছাড়া মাঠ শূন্য হৃদয় আর বিষাদ নিয়ে শুয়ে আছে সোনালী ধান কাটা শেষ।

আলের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তার কষ্ট হল। দু একটা মেঠো ইঁদুর দেখে হাসল। একটা খরগোস পাতাহীন ন্যাড়া তেঁতুল গাছের কাছে গিয়ে কান খাড়া করে ওকে দেখল। সুধাংশু একদিন এইখানে গাব পাড়তে মগ ডালে উঠে বুকের ছালা নামিয়ে এনেছিল। এখন সব বদলে গেছে। অথচ মনের মধ্যে হারানো কৈশোর দুরন্ত বেদনার মতো আঙুর করে রেখেছে তাকে। গাছ ফড়িংয়ের মতো অতি সন্তর্পণে সমুদ্র অতীতে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারলে অন্তত শান্তি পাওয়া যেত। আজকের জীবনের সমস্তরহীন অভিজ্ঞতা তার সোনালী দিনগুলো খসিয়ে নিচ্ছে। গলা উঁচু করে ঘাড় বাঁধা হলেও শঙ্খচিলের দেখা মেলে না। চিলের কান্নার শব্দ ও কানে আসে না। শুধু মানুষের চীৎকার। স্বার্থপর লোভী মানুষের। বড় ব্যস্ত সবাই। জীবনের মস্ত ভাল অবসর কুড়িয়ে প্রকৃতির স্বাদ গ্রহণ করার উৎসাহ নেই কারো। চৌধুরীদের বাড়ীর আঙিনায় যাত্রার আসর বসে না। গোলাপট্টি পাড়ায় থিয়েটার ঘর তৈরী হয়েছে। সনাতন বৈষ্ণব মারা গিয়েছে। তার আখড়ায় বাউলের আড্ডা আর বসে না। দুই ছেলে এখন শহরে ঠেঙে গান করে!

বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সব। চোখে মুখে কারো যেন আনন্দ নেই। জমাট বেদনার মূর্তি যেন। স্মৃতির পাতায় খণ্ড খণ্ড অধ্যায়!

জনার্দন হাজরার মেয়ের সাথে অনিল হালদারের ছেলে ভালোবাসা স্বাদ গ্রহণ করার জন্য এই গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিল। জনার্দন দিনের পর দিন চণ্ডীমণ্ডপে গাঁয়ের লোকের লাঞ্ছনা সহ্য করে অপেক্ষা করেছিল। ওর মনে যদি যদি বিশ্বাস ছিল ওরা ফিরে আসবে। চণ্ডীমণ্ডপের দুই রশি দূর দিয়ে বিহারী কোম্পানীর যাত্রাভক্তি

মোটর গাড়ী রায়পুর হাটের দিকে চলে যায়। সাবিত্রী আর আসে না!

—উঃ! কি যন্ত্রণা!

চোখের সামনে ভাসছে সেই নিদারুন স্মৃতি! নিজের বুঁকে ওরেই কাঁস লাগিয়ে ঝুলছে জনার্দন। ইংরেজবাজার থানা থেকে বড়বাবু এল। লাশ কাটা ঘরে ডোমরা তার দেহ নেষপর্য্যন্ত নিয়ে গেল!

অপরিচিত রহস্যে ঘেরা অতীতের লাশকাটা ঘর এক-একদিন তার স্মৃতিতে ফুটে উঠবে সে ভাবতে পারে নি।

—খোকা ওখানে যাস নে। ওদব জীবের মুক্তি হয় না।

মা বলতেন।

আগাছায় ভর্ত্তি জনার্দনের ভিটে একদিন মেশিনের আওয়াজে গর্জে উঠল। বিজলি বাতি জ্বলল। পিচের রাস্তা তৈরী হল। নতুন নতুন গাড়ী এল। ট্রাক্ ট্যাক্সি, বাস। সতীশ মালি হারিয়ে গেল! সে নৌকো করে মহেশপুরের বালুচরে তরমুজ, ফুটি, লালমী চুরি করে নদীর ঢালু পাড়ে গড়িয়ে দিত। সেখে তাড়াতাড়ি নৌকোয় তুলে ছুট লাগাতো। মেতে মালী চীৎকার করত—ধর···ধর···ব্যাটাকে! নৌকো কলঘাট পেরিয়ে যেত। তার আনন্দ উত্তেজনা আর কাঁচা পাকা তরমুজের স্বাদ এখনো জিভে লেগে রয়েছে। লঙ্কা লবণ আর কাঁচা আমের গন্ধ, সমল অর্জুন আর রসিকের সঙ্গে লিমাই গরাই এর ভাঙা মিনারের কাছে বেড়াতে যাওয়া এখনও স্পষ্ট অনুভব করে সে। হুসেন শাহর আমলের ঐ মিনার দেখে তার ইতিহাস পড়তে বড় সাধ হতো!

ফাইমুদ্দীন দরবারের প্রহরীর মতো শসার ঝাড়া পাহারা দিত। রোগাশরীর কব্জি হাতে। নীল রঙের কতুয়া। খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তৃতীয় পক্ষের ছেলে মুলতানের গামছায় শসা বেঁধে তাকে পাঠিয়ে দিত নবাবগঞ্জের হাটে কচি শসার গন্ধটুকুই মুলতানের বরাতে ছিল। আর কিছু মেত না। তামিজাকে চারবিঘা পাট মেত রেজেষ্টারি করে নিকে করেছিলো। তখন মুলতান ছ বছরের। তাকে সঙ্গেই এনেছিল তামিজা। সেখে চার বছর পর কি জানি কেন মারা গেল তামিজা। মুলতান আমবাগানে আর মায়ের কবর খুঁজে পায় না।

নবাবগঞ্জের হাট থেকে মহানন্দার জলে বাঁশ ভাসিয়ে নিয়ে এক সময় লোকেরা চলত ভোলা হাটের দিকে। রায়পুরের পর ভোলাহাট। জমকালো গ্রাম রায়পুরে তখন জুনিয়র হাই স্কুল, ডাক্তারখানা, হৃষিকেশ কাবারের বড় বাড়ী! ধরণী ডাক্তার গাঁয়ের লোকের কাছে দেবতা!

এখন ওখানে যেতে পাসপোর্ট লাগে! ধরণী ডাক্তারেরও!

এইখানে একটা বিরাট বটগাছ ছিল! গফুরের সাথে এখানে কতদিন বসে থেকেছে সে। মেতের আখ চুরি করে রস খেয়েছে। স্বপ্ন দেখেছে। প্রজাপতির মতো সেগুলো ছোটাছুটি করত চোখের সামনে। প্রথম প্রথম গফুর চিঠি দিত! ঢাকায় এখন কোথায় থাকে সে কে জানে!

বটগাছটা একদিন কাটা হলো। গৃহহীন কাক আর অসংখ্য পাখির যন্ত্রণা কেমন বিহ্বল করে দিয়েছিলো তাকে। অথচ কিছুই করার সামর্থ্য ছিল না। সিভিল সার্জেনের কোয়ার্টার হলো ওখানে। পিচের রাস্তা হল। জীপ এল। অনেক রাত অব্দি আলো জ্বালিয়ে উৎসব হলো। নতুন বাড়ীর উদ্বোধন হলো। এখন বাদুড়ের কালো পাখার সঙ্গে আকাশের বুকে সন্ধ্যা নামছে। জতুদের চালের মিলের বিরাট উঁচু চিমনি দিয়ে গল গল করে বেরুচ্ছে কালো ধোঁয়া।

স্মৃতির বুদবুদগুলো যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এক পা এক পা করে কেন সে অতীতের সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলেছে। বিশরীরদের মতো যেন কফিনের ঢাকনা খুলে অবাক বিস্ময়ে দেখছে পুরনো সামগ্রী! যত্নের অভাবে সব কেমন ম্লান হয়ে আসছে! একদিন সবই হারিয়ে যাবে! তখন ঘুঘুর কান্নায় অলস দুপুরে স্মৃতির ঢাকনা খুলে কিছুই পাওয়া যাবে না।

এই পিটালু গাছের তলায় দাঁড়িয়ে বাটুল হাতে কত

দিন বন শালিখ মেরেছে অন্তু। সেগুলো হাতে ঝুলিয়ে আদিম যুগের শিকারীর মতো পাড়ায় ঢুকত তারা! একদিন আগুন জ্বেলে বাঁশের কাঠিতে ঝলসা ঘুঘু খেয়ে তাকে পুড়িয়ে খেয়েছিল অন্তু!

—কি ঘেন্না!

অন্তুকে মনে হয়েছিল রাক্ষসের বাচ্চা! কিন্তু কাঁদতে কাঁদতে অন্তু বলেছিল,

—আমার মা সৎ মা। আস্ত ডাইনি মাগী। গাধার মতো খাটায়। কিছু খেতে দেয় না। একদিন ঘরে বন্ধ করে এমনি করে আগুন জ্বালিয়ে মেরে ফেলব।

ডাস্টের খালায় বসে বারবার সেদিন অন্তুর কথা বলে হচ্ছিল। একদিন অন্তু পুকুরে সাঁতার কাটতে গিয়ে ঝড়াসের শীতে ডুবে মরল। জাল নিয়ে মালোরা নামল পুকুরে। কিন্তু সব বার্থ হলো। বিকেলে ফুলে ওঠা অন্তুর দেহ ভেসে উঠল। তখন আর রাক্ষসের বাচ্চা মনে মনে হয়নি। ডুবিলী রোড দিয়ে তাকে নিয়ে গেল শ্মশানের দিকে! অন্তু পুকুরে নেমেছিলো কেন কে জানে!

সংসা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। কাঁদতে হয়

অন্তু একদিন বলেছিল.

—লাশপুর যাবি!

—কেন? অনেক দূর যে!

—দূর বোকা! পায়ে হেঁটে তাড়াতাড়ি চলে আসব।

—না রে আমার স্কুল আছে। তুই একা যা অন্তু।

—আরে চল না, ওখানে সাদা সাদা খরগোস ধরব। বড় বড় কাছিম কাঁকড়ার ডিম নেবো।

সে যায় নি।

পরে একদিন পলাশপুরের জঙ্গল থেকে অন্তু একটা সাদা খরগোস ধরে এনেছিল।

—বাঁচবে তো রে?

—বাঁচবে। খুব লাজুক কিন্তু। কি নরম। সাঁওতাল সালারা মেরে পুড়িয়ে খায়। আমার কষ্ট হয়!

অন্তুই বলেছিল।

—আচ্ছা অন্তু, একদিন এই জঙ্গল থাকবে না, আমরা বড় হবো, তখন তুই কি করবি?

—ধ্যাৎ এই বন যাবে কোথায়? এ সবই থাকবে। থাকবেই

সিভিল সার্জেনের বাড়ীর গ্রে হাউণ্ড অনেকক্ষণ ধরে হিংস্র চীৎকার করছিল। শিকল ছিঁড়ে তাড়া করেছে একটা খরগোশকে খড়ের জঙ্গলের দিকে ছুটেই আসছে জঙ্গলটাও আশ্চর্যভাবে ঐ নিরীহ জন্তুর চোখের সামনে থেকে দূরে চলে যাচ্ছে!

পারল না খড়ের জঙ্গলে হারাতে পারল না খরগোসটি। গ্রে হাউণ্ডের বিরাট মুখের গর্তে হারিয়ে গেল পলাশ পুরের খরগোস?

—উঃ! কি রক্ত!

বিভিন্ন কাজে মেয়েরা

তুহিনা মুখোপাধ্যায় (মহিলা ইঞ্জিনিয়ার)

এই পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন কাজের মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের কথা মেয়েমজলিসের পাতায় জানাব। এ বিষয়ে আমাদের পাঠিকারাও সহায়তা করবেন। আজকের সাক্ষাৎকার মহিলা ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমতী তুহিনা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। ইনিই প্রথম বাঙালী মহিলা স্থাপত্য শিল্পী। —সম্পাদিকা মেয়ে মজলিশ।

আমি লেখাপড়া করার পর architecture নিয়ে প্রথমে একটা consulting architect officeএ কাজ করতে আরম্ভ করি। কি করে architectরা কাজ করে, সেটা হাতে কলমে-practical wayতে দেখার জন্য, সেখানে আমি বেশ কিছুদিন কাজ করি। এরপর আমি আর একটা concern-এ যাই। সেখানে কিছুদিন কাজ করার পর আমার মনে হয় independenrly practice শুরু করতে পারব। Practice আরম্ভ করলাম কিছু কিছু Client যাঁরা বাড়ী ঘর multi-storyed Bldg. কলকাতার ওপর করতে চান তাঁরা আমার কাছে আসেন, এবং আমি তাঁদের সাথে কাজ করতে আরম্ভ করি

সে সময় আমি আর একটা কাজে জড়িয়ে পড়ি। সেটা হল একটা engg. concern—যেটা কিছু বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভদ্রলোক, ব্যবসা হিসাবে এটাকে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু ছোট ব্যবসাতে অতবড় শিক্ষিত লোকদের support করার অসুবিধা হওয়াতে তাঁরা বড় বড় concern-এ চাকুরী নিয়ে চলে যেতে আরম্ভ করলেন। ফলে আমার সাথে তাঁদের পরিচয় থাকায় এই co'র দেখাশুনার দায়িত্ব আমার ওপরে ওনারা দেন। এই concernটা একটা important developed engg. item of product—যেটাকে water seal বা water bar বলা হয়--ভারতবর্ষের বহু construction field-এ এটা কাজে লাগান হয়। এই productটা ভারতবর্ষে এর পূর্বে ব্যবহৃত হত না সেদিক থেকে দেখতে গেলে এটা একটা pioneer

এর পরের কথা ১৯৬৭—৬৮ সাল যখন চারদিক থেকে শুনতে পেলাম, দেখতে পেলাম, খবরের কাগজে পড়লাম ভারতবর্ষে আমাদের technical লোকেদের, architect ইঞ্জিনিয়ারদের দুরবস্থার কথা কোন কাজকর্ম নেই। সকলেই বেকার

সেই সময় চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে আমি দেখলাম, এটা বিশেষ করে পূর্ব ভারতের একটা সমস্যা। সারা ভারতে এই সমস্যার ততটা সম্মুখীন নয়

কলকাতার আশেপাশে পশ্চিম বাংলায় প্রচুর প্রাচীন শিল্প রয়েছে। সেগুলো ভারতের আর কোনদিকেই নেই—সেই সমস্ত শিল্প নষ্ট হতে বসেছে তাদের কাজ নেই। অথচ সেখানে কাজ করার বহু লোক রয়েছেন, যাঁরা দক্ষতর মত দক্ষ ও উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত আবার এমন দেখা যাচ্ছে ভারতের অন্য জায়গায় নতুন শিল্প বসান হচ্ছে সেখানে ঐ সমস্ত নিপুণ দক্ষ লোকদের শুধু প্রয়োজনই নয় বিরাট অভাব, কিন্তু এই যে এঁদের প্রয়োজন আছে এবং কোথায় এই খবরগুলো ঠিক সময়ের মধ্যে পৌঁছে দেবার আমাদের কোন ব্যবস্থা নেই।

তখন আমার মনে হল যে এই বিষয়ে যদি আমি সামান্য সাহায্যের হাত পাতি তবে একটা বড় জিনিষ হয়। আমি ঠিক করলাম একটা Engg. খবরের কাগজ বের করব। এবং সেই কাগজের মাধ্যমে যদি সারা ভারতবর্ষের requirement for technical people এবং engg items ইত্যাদির দরকার কোথায়? কখন? কবে? এই সমস্ত খবরগুলো যদি সকলের হাতে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি তবে একটা সুরাহা হয়।

যেমন কলকাতার হাওড়ার দাস নগরের একটি ছেলে high pressure welding এর ভাল কাজ জানে অথবা ভাল machine shop-এর জটিল যন্ত্রপাতি চালনা করতে অত্যন্ত এবং খুব সহজেই করতে পারে।

অথচ Gujrat-এর Baroda'র কাছে যেখানে নতুন শিল্প সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে উচ্চস্তরের যন্ত্রপাতি বসেছে কিন্তু চালানোর লোক নেই। কেননা অতীতে এই কাজে তারা অভ্যস্ত ছিল না।

এই যে এক জায়গায় অভাব, অপর জায়গায় বেকার সমস্যা, কাজ নেই—এই খবরটা যদি চলাচলের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তবে সব পক্ষেই সুবিধা হয়।

আবার দেখা যায় অনেকে নানান রকম engg. items কিনতে চান। কিন্তু কোথায় কেনা যায় কারা তৈরী করতে পারে তার জানা নেই। অথচ এইখানকার পশ্চিম-বাংলার সবচেয়ে পুরান, প্রাচীন শিল্প-সংস্থা আছে তারা অনায়াসে, অতি সহজে এগুলো তৈরী করে দিতে পারে।

কিন্তু এখানেও সেই খবরাখবর পৌঁছানর একই প্রশ্ন আসছে এবং তা যদি করা যায় তবেই trade-exchange সম্ভব হতে পারে।

আমার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে এই বেকার সমস্যা এবং উৎপাদনের প্রয়োজন নেই বলতে আমরা যা ভাবি সেটা ঠিক নয়। তার মূল কারণ হচ্ছে এই খবর-গুলোকে প্রচার করার কোন ব্যবস্থা নেই। এই ভেবে আমি Indian Engineering News Record নামে একটি Engg. খবরের কাগজ আরম্ভ করি।

Q. এই কাগজটি কতদিন চলছে?

A. এই technical খবরের কাগজটি আজ ৫ বছর চলছে। সারা ভারতবর্ষে এটার কদর হয়েছে। একটা মূলতঃ utility paper. সকলেই এর থেকে সাহায্য পাচ্ছেন। শুধু এখানকার লোকেরাই চাকরী পাচ্ছে না—এখানকার কারখানাও কাজ পাচ্ছে—এবং এই স্তরেতেই আমি এর প্রয়োজনীয়তা আরও বুঝতে পারছি। তবে এই কাগজটাকে employment of item exchange, production exchange করতে হ'লে quite comprehensive এবং informative করতে হয়। এর সাথে থাকবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গার শিল্প ও কারিগরী উন্নয়নের খবরাখবর—যেমন বহুলোক আছেন যারা নাকি একটা Boiler বিক্রী করতে চান, আবার ঐ size এরই boiler কিনতে চায় এমন কি খুজে হন্যি হয়ে ঘুরছেন এমন লোকও রয়েছেন। এখন এই ধরণের খবরগুলো জোগাড় করে যদি বের করা যায় তাঁদের একটা সাহায্য হয়। সেরকম আমার কাগজে who makes what-এর chapter রয়েছে যাতে প্রয়োজনের সময় কে কি তৈরী করে এই খবরটা হাতের কাছে ধারাবাহিক ও যথাযথ ভাবে যদি পাওয়া যায় তবে খুবই উপকারে আসে। বলতে গেলে এই ইঞ্জিনীয়ারিং কাগজটিতে অবান্তর কথা থাকে না।

Q. কর্মজীবনের কথা তো শুনলাম, এখন বলুন ব্যক্তিগত জীবনের কথা। মেয়েদের সংসার ধর্ম তো রয়েছে এবং তাও সময় সাপেক্ষ।

A. হ্যাঁ, কাজের দিকটাও ছাড়াও রয়েছে আমার ব্যক্তিগত দিক, আমার সংসার ও ছেলে মেয়েদের দেখাশোনা করা এসব এবং সেটাই আমি মনে করি সবচেয়ে বড় ও সময় সাপেক্ষ। আমার বাড়ীতে যেমন শ্বশুর, শাশুড়ী থাকেন, তেমন স্বামী ছেলেমেয়ে সবাই রয়েছেন। তাঁদের ও সংসারের দেখাশুনাতে আমার শতকরা ৬০/৭০ ভাগ সময়ই চলে যায়। ১৫/১৬ ঘণ্টা যদি আপনারা কাজের মধ্যে ধরেন, আমায় বলতে হবে প্রায় ৯/১০ ঘণ্টা আমায় দিতে হয়। এরপরে আমি অন্যান্য কাজ করি এবং তাতে কোন অসুবিধা হয় না। আসলে এই কথাই আমার বলার আছে যে মেয়েরা বিভিন্ন

কাজে থাকলেও তাদের একটা বড় কাজ হল তাদের ঈশ্বরকে নিয়ে। তারি মজার জিনিস সেটা আমার কাছে, আমি দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো করেও সময়ের অভাব হয় না। তবে এ কাজগুলো করবার কতগুলো পদ্ধতি আছে আর সেগুলো যদি follow করা যায়, সেগুলো আমি করছি, তবে আমি দেখতে পাই যে আরও করার ক্ষমতা আমার রয়েছে। সময় আমাকে কখনোও পীড়ন করে না এবং shortage হয় না।

চিঠির উত্তর

রাজাদি

সবিতা বসু হাজরা বেলগাছিয়া। —তুমি লিখেছ আচ্ছা, আধুনিক বেশবিন্যাস কি আজকের সামাজিক জীবনে খুব একটা অপরাধ? একটা কথা হচ্ছে, এক একটা সময় আসে যখন মানুষ সেই স্রোতের হাওয়ায় নিজেকে বিলিয়ে দেয় এবং তার প্রভাব সমাজের পক্ষে কুফল কি সুফল তা ভেবে দেখার সময়ও থাকে না। আসলে এটা হয় সম্পূর্ণ অপরিণত মেয়ে ছেলেদের মধ্যে। তবে কুরুচিপূর্ণ বেশ-ভূষা কখনই সমাজের বা কোনো মানুষের পক্ষেই সুস্থ মনোভাব নয় এ কথা সবাই স্বীকার করবেন। তাই মনে হয় সমাজ জীবনে যার প্রভাব অসুন্দর তা না করাই বাঞ্ছনীয়।

মাধবী—তোমার চিঠিতে কোন নাম ঠিকানা নেই—তবে তুমি যে একজন শিল্পী তা এ চিঠির সঙ্গে আঁকা ছবিটা দেখেই বুঝতে পারলাম—অনেক ধন্যবাদ।

রাণু মুখার্জি—আপনার চিঠিখানি পড়লাম কিন্তু ঠিক কি জানতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না।

মায়ারাণী দাস মুর্শিদাবাদ। না ভাই, পল্লীগ্রামের বোন বলে অবহেলা করব কেন? তুমি বরং কোনো চিকিৎসকের পরামর্শ নাও। নমিতা চট্টোপাধ্যায় বৈচি হুগলি। দিদা শ্রীরামপুর—না। চিঠি পাঠাবার জন্য খাম পোষ্টকার্ড পাঠিও না।

অপর্ণা সিকদার বর্দ্ধমান—আপনার বেদনাতপ্ত লেখা চিঠিখানি পড়ে খুব দুঃখ পেলাম। আপনি লিখেছেন 'আমার ১৭ বছরের কন্যাটী আমাদের অমতে একটি বেকার ছেলেকে বিয়ে করে বাড়ী থেকে চলে গেছে। হাঁা, খবরটি খুবই দুঃখের। কিন্তু এখানে জানিয়ে রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বোধ হয় যে অপরিণত বয়েসের ছেলেমেয়েদের প্রতি আজকের অভিভাবকদের উদাসীনতাই এর অন্যতম কারণ। —অনেককে বলতে শুনেছি, দেশ স্বাধীন হয়েছে এখন আর ছেলেমেয়েদের অত বন্ধনে রাখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু দেশ স্বাধীন অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নিশ্চয়ই নয়? কাজেই এখন দুঃখ হলেও তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি বলুন? সে যদি অন্যায় করে তার ফল নিজেই ভোগ করবে।

বৃশ্চিয়া বসু, শ্রীরামপুর—আমাদের মেয়ে মজলিসে নিয়মিতই চিঠি লিখতে পার উত্তর ও যথাসময়ে পাবে। রান্না শেলাই ও লিখে পাঠাতে পারো। খুব খুশী হোলাম সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

পোষাক ও রূপরুচির স্থানকাল

সাজসজ্জা নারীকে শ্রীময়ী করে। করে রমণীয় ও কমনীয়। আর নারী জীবনের ক্ষেত্রে যতই প্রগতি লাভ করুক না কেন—জীবন থেকে যেমন মাধুর্যকে বাদ দিতে পারবে না তেমনি সাজ পোষাকে পুরুষের অনুকরণ করলেও কোনদিন নারী পুরুষ হয়ে উঠবে না। অতি আধুনিকা তরুণীদের সেখানে ঠিক পুরুষ না 'হিপি' কি যে মনে হয় বুঝে উঠতে পারি না। এরা যে হারিয়েছে ঐতিহ্য ও শালিনতাবোধ।

বাঙালীমেয়ের শাড়ীর মধ্যে যে এক বিশেষ তত্ত্ব নিহিত আছে একথা বোধহয় কেউ জানেনও না বা জানতেও চাননা।—কারণ, শাড়ীকেই পশ্চাৎ-গামীদের পরিচায়ক বলে পরিত্যাগ করেছেন। নারীর শাড়ীতে কেন চওড়া পাড়, কেন থাকে আঁচল। আগেরদিনের বুড়ো মানুষরা পাড় ছাড়া আঁচল ছাড়া শাড়ী-পরলে বকতেন শুনতাম। তার একটা বিশেষ কারণ আছে। নারী হচ্ছে সংসারে কল্যাণী, শক্তিস্বরূপা। নদীর যেমন দুটি তীর নদীকে রক্ষা করে ভাঙনের মুখ থেকে—নারীর শাড়ীর চওড়া পাড়ও সবসময়ে রক্ষা করে সর্বপ্রকার অমঙ্গল থেকে। আর তার মর্মর অঞ্চল শত্রুসমাগম প্রান্তরের ইঙ্গিত বহনকারী। কিন্তু এই টাইট প্যান্ট আর চিলে কামিজ বা মুক্তি কুর্তা পরা কল্যাণীরা সংসারের কোন মঙ্গল করবেন তা ভেবে একটু চিন্তিত হবার কথা বৈ কি? কিন্তু না পরে তো উপায় নেই ক্যাম্বনের শাড়ি যদি ফাঁসির শাড়িও হয় তাতেও নির্বিচারে মাথা গলিয়ে দিতে পারেন এই উৎকট এবং উদ্ভট আধুনিকতার উপাসকেরা?

কি যে নিজেকে মানায় এ-বোধটুকু যেমন অধিকাংশ মেয়েরনেই —তেমনি উৎসবভেদে যে সাজপোষাক বিভিন্ন হওয়ার প্রয়োজন এ অনুভূতিটুকুও অধিকাংশ মেয়ের নেই। এই তো সেদিন গিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দ'র শতবার্ষিকী উৎসবে অরবিন্দ ভবনে।

একে সকালবেলা তায় ওইরকম একটা ভাব গম্ভীর উৎসব, কিন্তু অধিকাংশ ভদ্রমহিলাকে দেখলাম যেন এসেছেন যেন কোন গানের জলসা শুনতে কিংবা সিনেমা থিয়েটারে যাবার মত সেজেছেন। মনে আছে একবার এক শ্রাদ্ধবাড়ী গিয়ে খুব বোকা বনে গিয়েছিলাম।

দেখি যে প্রায় অধিকাংশ মহিলার অঙ্গেই বেনারসী শাড়ী—কানে বড় বড় দুল।

তার মাঝে কালোপাড় একটা নতুন টাঙ্গাইল শাড়ী আর কালো ব্লাউজ পরে আমার ঢুকতে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকাল!

তবে আমি লজ্জিত হইনি! ওঁরাই বোধ হয় লজ্জা পেয়েছিলেন।

চিন্তা, রুচি ও নিজের চেহারার সম্পর্কে একটা ধারণা না থাকলেই সাজপোষাকে সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে না! যার ফলে লোকের সমালোচনার বস্তু হতে হয়। এক্ষেত্রে আমি আর একটা কথা বলবো, বয়স বাড়ার সংগে সংগে সাজ-পোষাকের উগ্রতা বা চটকটা একটু কমিয়ে দিতে হয়। নইলে বড় বেমানান দেখায়। কিন্তু আধুনিকা অনেক ভদ্রমহিলাদের এ জ্ঞানটা বড় কম। বিশেষ করে উচ্চ সমাজে। যেখানে একমাথা পাকা চুল নিয়েও মেয়েরা দিব্যি ঠোঁটে লিপষ্টিক মেখে বেড়ান।

এবার উৎসব ভেদে পোষাকের কথা: অনেকের আমি দেখেছি নেমন্তন্ন বাড়ী মানেই ছুকে বাঁধা সাজ। এক গা গয়না, বেনারসী বা ঝলমলে একখানা শাড়ী, মুখে চড়া প্রসাধন।

কিন্তু মনে রাখতে হবে বিভিন্ন উৎসবের মর্ম আলাদা। আর সুরও আলাদা—আর সেই উৎসবের অতিথিরা যদি নিজেদের অন্তরে বাইরে সেই উৎসবের মর্মকে ফুটিয়ে তোলেন তবেই তো তা যথার্থ রূপ লাভ করে।

প্রথমেই যদি জন্মদিনের কথা। এই উৎসবে যিনি যোগদান করেন তার অন্তর কি যার জন্মদিন তার প্রতি শুভেচ্ছায় ও ভালবাসায় ভরে ওঠে না? প্রিয়জনকে যেদিন জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে যাবেন সেদিন দারুণ চমৎকার একটা নীল পাড় শাড়ী, চমৎকার নীল রং-এর শাড়ী আর নীল ব্লাউজ!

এই নীলের অর্থ হচ্ছে অসীম অনন্ত!

আপনার না বলা কথা যেন আপনার মূর্তিমতি উপস্থিতি নিয়ে আপনার প্রিয়জনকে বলে যাবে—দিগন্তহীন, অসীম হোক তোমার পরমায়ু, তোমার নাম, আর খ্যাতি!

যাবেন সিনেমায় বা মার্কেটিং-এ কিংবা সন্ধ্যাবেলা একটু গঙ্গার ধারে বেড়াতে—মনটাও নিশ্চয় তখন খুব হাল্কা থাকবে। তাই নিজের পোষাকটা এ সময়ে একটু হাল্কা হলেও ক্ষতি নেই। গাইলন, জর্জেট, সিফন, কিংবা সিল্কের সুন্দর একটা শাড়ী পরুন! সেই শাড়ীটা যেন আপ[illegible] বেশ মানায় কারণ এক্ষেত্রে অলঙ্কারের ভূমিকা নেই[illegible]নে সামান্য একটি দুল থাকলেই চলে যায়। আপনার শাড়ীটাই যেন আপনার মনে খুশীর হাসির জয়পতাকা!

আপনি ভেবে দেখুন যেন আপনি আপনার প্রিয়জনের পাশে বসে গাড়ীতে করে যাচ্ছেন গঙ্গার ধার দিয়ে আর শাড়ীর আঁচলটা গঙ্গার ঢেউয়ের মত দুলে দুলে উঠছে—তখন আপনার প্রিয়জনের চোখে কি আপনার শাড়ী ও আপনি কি এক হয়ে যাননি!

শৈতে বা অন্নপ্রাশনের উৎসবে যাবেন।

দামী একখানা টাকাই কিংবা গাদোয়াল শাড়ী কিংবা সিল্কও চলবে।

শাড়ীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একসেট পাথর খোচিত গয়না কিংবা সোনার গয়না।

পূজাবাড়ীর চারিদিকেই পবিত্রতা বিরাজ করছে।

পরুন লাল পাড় গরদের শাড়ী কিংবা আসামী সিল্কের শাড়ী—শাড়ীর সঙ্গে মিলিয়ে জামা। কাণে দুটি বড় বড় দুল পরুন, গলায় একটা সরু হার। কপালে একটা সিঁদুরের টিপ এঁকে দিন।

মাথার চুলটাকে আলগা করে বাঁধুন। দেখবেন নিজের মনটাই অন্যরকম লাগবে।

পার্টিতে গেলে সাজের সুরটা একটু চড়া হবে। শাড়ীর রংটা একটু গাঢ় হবে। আর শাড়ীটা যতটা সম্ভব দামী হবে। তার সঙ্গে মিলিয়ে জামা, কাণের গয়না হীরে হোক জড়োয়া হোক। ঘড়িটা হবে আধুনিক ডিজাইনের এবং দামী। ভ্যানিটি ব্যাগটাও হবে সুন্দর ও দামী। আর এসময় প্রসাধন তো একটু চড়া হবেই থাকে।

যাতে অর্থকৌলীন্য বা আভিজাত্যে আপনি আপনার কোন বান্ধবীর চেয়ে কম নন এটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে।

এবারে বিয়ে বাড়ীর কথা।

বিয়েটা জীবনের মিলনের গান—কিন্তু আত্মীয় প্রিয়-পরিজন সকলের উপস্থিতিই সেই উৎসব করে তোলে মধুর ও রমণীয়।

আলো ফুল মালায় সব মিলে যেন প্রাণের আনন্দের আবাহনের উৎসব

সে উৎসবের অতিথি আপনি! তাই নিজেকেও সাজান সাম্রাজ্ঞীর মত।

পরুন দামী বেনারসী বা ব্রোকেড বেনারসী তার সঙ্গে মিলিয়ে ব্লাউজ। তবে ব্লাউজটা যেন ব্রোকেডের না হয়। সিল্ক বা বেনারসী হলেই ভাল।

পরুন জড়োয়া বা মুক্তোর সেট। আর তা না থাকলে বেশ ভারী সোনার গয়না। বড় একটি কানবালা বা কানপাশা, লম্বা হার, হাতে একসেট চুড়ি। কিন্তু ৪০ ভরি গয়না গায়ে চাপাবার প্রয়োজন নেই। এখনও অনেক ভদ্রমহিলাকে দেখি বিয়ে বাড়ীতে গলায় ২।৩টা হার, হাতে ২ সেট চুড়ি তারপর চুল বাঁধা যতরকমের হস্তবন্ধনী আছে

সব চোকাতে। এটা সব সময় মনে রাখবেন সাজ-পোষাকের বাহুল্যে মানুষের আসল রূপ চাপা পড়ে যায়।

যেখানে আপনি নিমন্ত্রিত হচ্ছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনি কতটা ধনী তা যিনি আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি জানেন। তাই অর্থনৈতিক উজ্জ্বলতার দৃষ্টান্ত স্থাপনের দরকার নেই। তাই দামী অবশ্যই পরবেন তাই বলে বোকার তারে যেন উৎকীর্ণিত না হন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু তাই তো হয়। গরমের দিনে বিয়ে বাড়ী গিয়ে দেখেছি ধনী, নির্ধন, শিক্ষিতা, অশিক্ষিতা সেখানে রূপের দিক দিয়ে সকলেই প্রায় একছাঁচে ঢালা। এক গা গহনা আর বেনারসী শাড়ী পরে আর উৎকট প্রসাধনে দরদর করে ঘামছেন। কিন্তু বিয়ে বাড়ী যে! বিয়ে বাড়ীতে যাবার সময় দোকান থেকে চুল বাঁধানো যেতে পারে! কিন্তু হঠাৎ ওইরকম একটা খোঁপা অনেকেরই বড় উৎকট দেখায়!

Hair dressing এর সময় নিজের চেহারা সম্পর্কে একটু সচেতন থাকা দরকার।

মনে আছে একবার এক বিয়ে বাড়ীতে দেখেছিলাম সে বাড়ীর সব মেয়ে বউরা Hair dressing saloon থেকে চুল বেঁধেছে!

ফলে তারা খোঁপা নামলাবেন না অতিথিদের দেখবেন ঝুঁকে উঠতে পারছিলেন না!

বিয়ে বাড়ীর জুতো বা ব্যাগ সবই হবে তোলা। যেটা সর্বদা ব্যবহার করেন সেটা ব্যবহার করবেন না।

সবশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা।

এখানে মানী গুণী জনের সমাবেশ হয়।

পরুন একখানা সুন্দর মিহি তাঁতের শাড়ী। তার সঙ্গে মিলিয়ে জামা!

কানে ছুটো ছুটো মুক্তোর টাপ পরুন, হাতে একটা ঘড়ি। প্রসাধনও করুন হাল্কা অতো চোখ না পড়ে। কপালে একটি টিপ এঁকে দিন।

সাজগোজের রূপ বাড়ে—আবার সাজগোজেই বীভৎস দেখায়—একথাটা মনে রেখেই নিমেষে আপনি তৃপ্তি পাবেন। আনন্দ পাবেন।

কেরেলা প্রণালীতে মাংস রান্না

সব সময়েই তো বাঙালী প্রণালীতে মাংস রান্না করছি, এবার আসুন না একটু দক্ষিণ ভারতীয় প্রণালীতে রান্না করে দেখি কেমন লাগে। আজকাল তো আমরা যেমন আধুনিক হচ্ছি তেমন নানা দেশের রান্না রেঁধে অতিথি সৎকার করতে আমাদের বেশ ভালই লাগে। আচ্ছা, এবার বলি কেরালা পদ্ধতিতে মাংস রাঁধতে হলে কি কি দরকার।

মাংস আধ কিলো, আলু আড়াই শো গ্রাম, ভালো মোটা পুরু আধখানা নারকেল ২৫ গ্রাম ধনে, ৫টা শুঃ লঙ্কা, ৫০ গ্রাম টমেটো, কারিপাতা নুন ও হলুদ।

প্রথমে ঐ ধনে ও শুঃ লঙ্কা সামান্য তেলে ভেজে রেখে দিন। ঐ নারকেলও মাখনের মত বেটে রাখুন।

এদিকে মাংসগুলোকে ছোট টুকরো করে কেটে ধুয়ে নুন হলুদ দিয়ে সেদ্ধ বসিয়ে দিন। মাংস আধসেদ্ধ হলে তাতে আলু মিশিয়ে দিন। এবার মাংসতে যতটা আন্দাজ ঝোল চান সেই পরিমাণ জল রেখে বাকি জলটুকু শুকিয়ে ফেলুন। তারপর তাতে ঐ ভাজা ধনেলঙ্কা ও টমেটো কেটে টুকরো করে তাও দিয়ে দিন। ৪।৫ মিনিট ফোটার পর তাতে ঐ বাটা নারিকেল ও কিছু কারিপাতা দিয়ে নেবে নামিয়ে রাখুন। খাবার সময় গরম করে পরিবেশন করুন।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

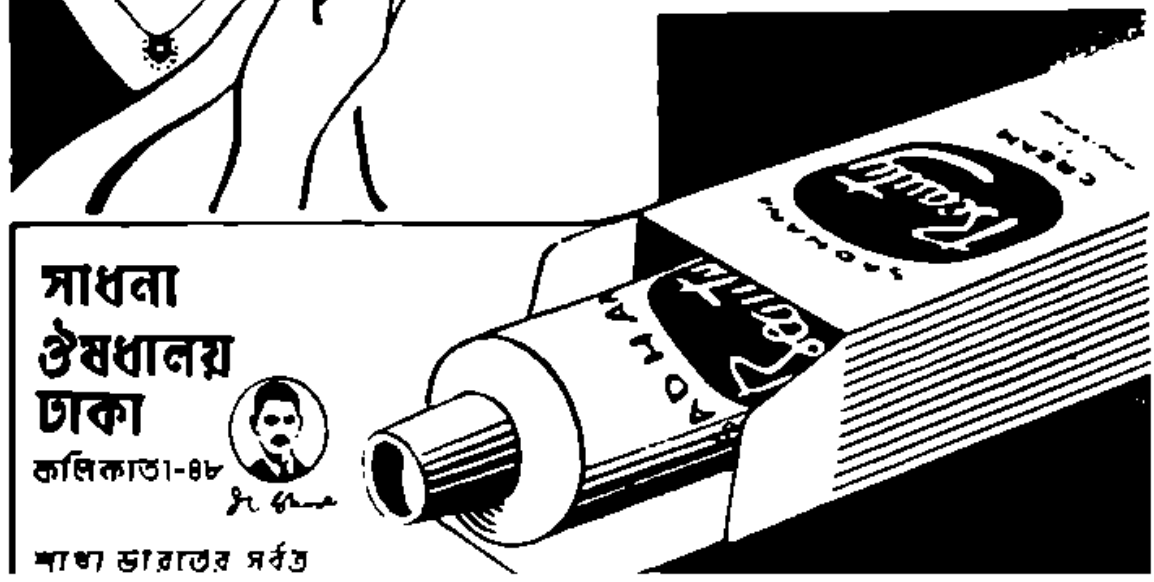

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৪৮

সারা ভারতের সর্বত্র

Regd. No. C 3643

মন খুশীতে ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
এ'বার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

শারদীয়া

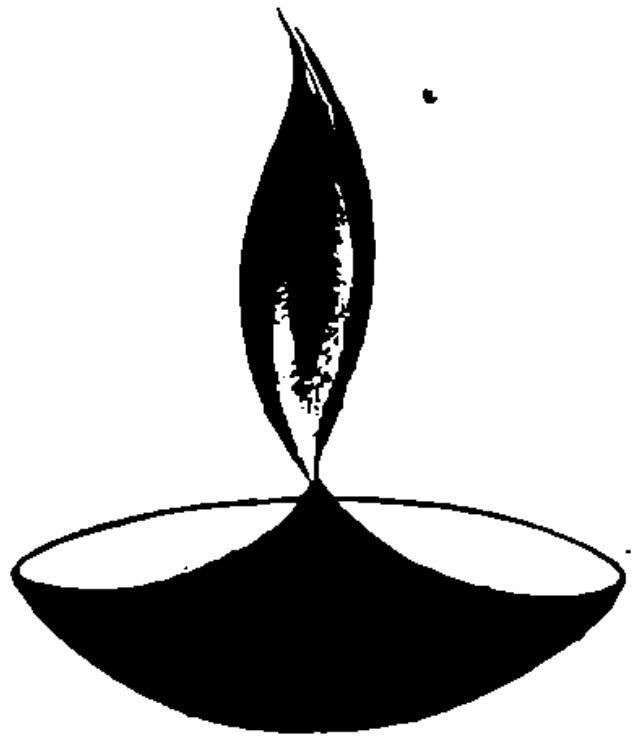

অষ্টবিংশতি বর্ষ

পৌষ ১৩৭৯

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ
মাসিক পত্রিকা

কে. সি. দাশের

রসগোল্লা

শুধু রসনার তৃপ্তি সাধনেই নয়
দেহের পুষ্টি সাধনেও অদ্বিতীয়।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিঃ

আবিষ্কারক : রসোমালাই

কলিকাতা—বাঙালোর

কী সুন্দর মধুর হাসি

...ডাক্তার ...পরামর্শে ডাক্তারই ...তৈরি হয়েছে এত সুন্দর দাঁত তাই তাঁর ...ও আজ এত মধুর সাধনা দশন ...ত উৎকৃষ্ট দাঁতের ...ন। এর অতুলনীয় ...বলীর জন্য এইদিন ...ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন **সাধনা টুথপেষ্ট**

10.6/70

সাধনা টুথ পেস্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেস্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৬৮

...ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এস. (লণ্ডন) এম.সি.এস. (আমেরিকা) ভূতপূর্ব প্রফেসর বঙ্গবাসী কলেজের ...

...কলিকাতা ৩৩ ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. এফ আয়ুর্বেদাচার্য

দাঁত ও মাড়ির স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
এই টুথপেস্ট– **নিম।**

নিম টুথপেস্ট শুধু আপনার দাঁত পরিষ্কারই করে না। নিমের হিতকর বিশেষ দ্রব্যগুণ দাঁত শক্ত করে, মাড়িকে রোগের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচায়, মুখের দুর্গন্ধ দূর করে শ্বাস-প্রশ্বাসে এনে দেয় মিষ্টি সুবাস।

ক্যালকাটা কেমিক্যাল-এর তৈরী।

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

পৌষ

১৩৭৪

JANUARY

মূল্য : এক টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)

বার্ষিক পূজা সংখ্যা সহ—কুড়ি টাকা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগোপবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে

১২৫বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও করুণা প্রেস প্রাঃ লিঃ

৩৩বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত

এঁরা বিজয়ী হয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে

আমাদের বিপ্লব সার্থক হ ক আর গড়ে উঠুক এক নতুন ভারত

dasp 77:584

খাটে খাই-
ষোল-আনা
তৃপ্তি চাই!
SCISSORS
সিজার্স সব সময় তৃপ্তি দেয়
—এর স্বাদই আলাদা

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ

বিক্রয়ে সর্বাধিক

এই মরশুমে বাটার ক্যানভাস জুতোর বিপুল সমারোহ

Bata

আপনার নয়নমণি

আপনার সন্তান আপনার কত না আদরের। সে চাইলে আপনি হয় তো আকাশের চাঁদও ধরে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হলে আপনি কি সকলের সব ইচ্ছা, সব প্রয়োজন পূর্ণ করতে পারবেন?

দ্বিতীয় সন্তান তিন বছর পরে। নিকটতম পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্রের পরামর্শ নিন।

*

সম্পাদকীয়		২০৫
গুহদের কালীবাড়ী		২০৬
বিপ্লব বহ্নি	—দীপঙ্কর	২০৭
আবার সেই ভেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	২১৪
নাটনঞ্চ	—রত্নাকর	২২৩

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা জে জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

শাখা

২৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ, ৫, ৬ হেয়ার স্ট্রীট,

ফোন : ২৩-১৩১১

এই সংখ্যায়

জীবন নাট্যের খণ্ডচিত্র

স্বামী ভোলানন্দের অলৌকিক শক্তি	—অনাথ উপাধ্যায়	২২৮
বঙ্কিম সাহিত্যে দস্যু	—গৌরীশংকর দে	২৩২
খেলাধূলা	—জ্যোতির্ময়	২৩৫
শাস্তি (গল্প)	—প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৩

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশির কুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

এই সংখ্যায়

*

সেদিনের বাঙ্গালী

আনন্দ মোহন বসু —মনি বাগচী ২৫০

হিসেব (গল্প) —কুমার মিত্র ২৫৩

এই প্রথম

এক টুকরো কাগজে একটু কালির দাগ (গল্প) —গোপীবল্লভ রায় ২৫৭

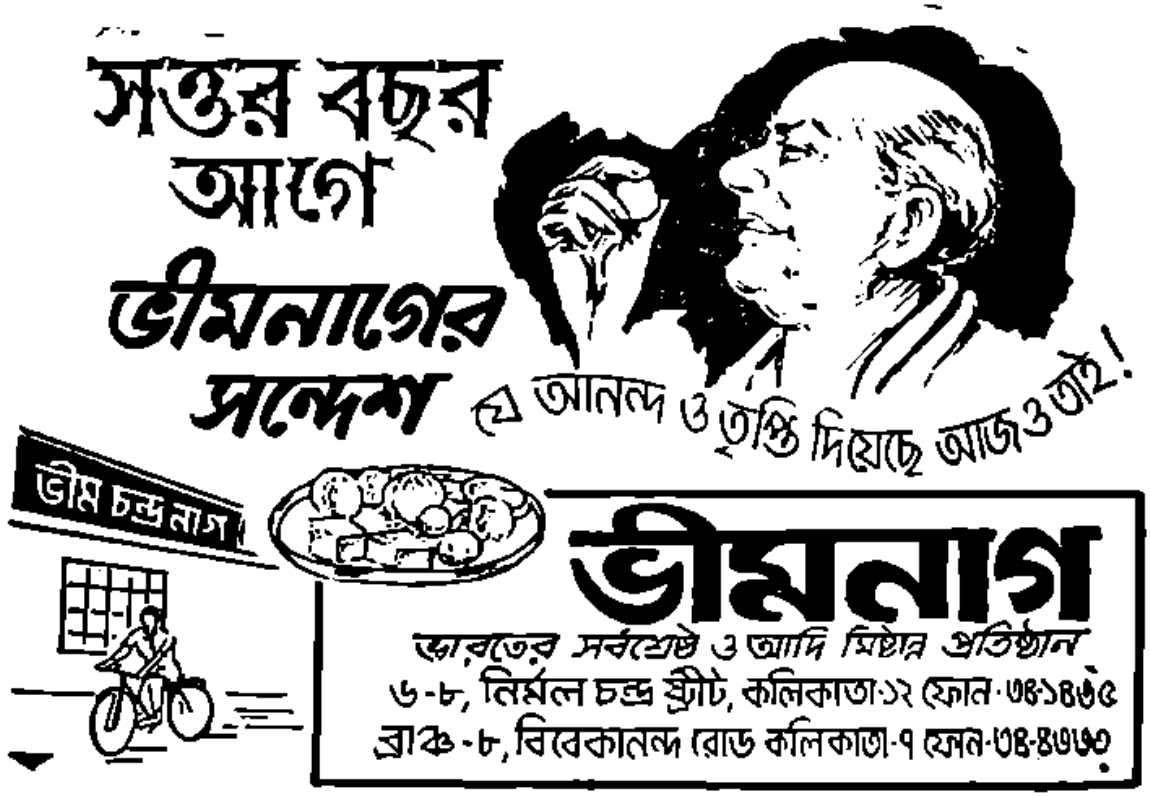

এই সংখ্যায়

*

মেয়ে মজলিস

পৌষ পার্বণ	—উষা ভট্টাচার্য	২৫৯
শীতের দিনে ছুটি খাবার	—মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়	২৬২
অশোক বর্ষীর কথা	—শ্রীহেমন্তবালা	২৬৩
অন্ধ প্রদেশের দুটি উৎসব	—মঞ্জুশ্রী রায়	২৬৫
আজকের প্রগতি ও মেয়েরা	—কুমারী শঙ্করী ব্যানার্জী	২৬৭

ধনে বন্যা ছিল কি বাঁধা ?

সত্যিই রমণীর কেশ হতে রমণীর শোভা

বেঙ্গল কেমিক্যালের ক্যামুরাইটিন

কেশ তৈল কেশরাশিকে এক অনুপম রূপলাবণ্যে ভূষিত করে।

ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ক্যামুরাইটিন কেশ তৈল নিয়মিত ব্যবহারে কেশরাশিকে করে রমণীর কাম্য হোক না আপনার সম্পদ গর্বের বস্তু।

কসমেটিকস্ ডিভিশন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা ○ বোম্বাই ○ কানপুর

দিল্লী ○ মাদ্রাজ ○ পাটনা ○ লাহোর

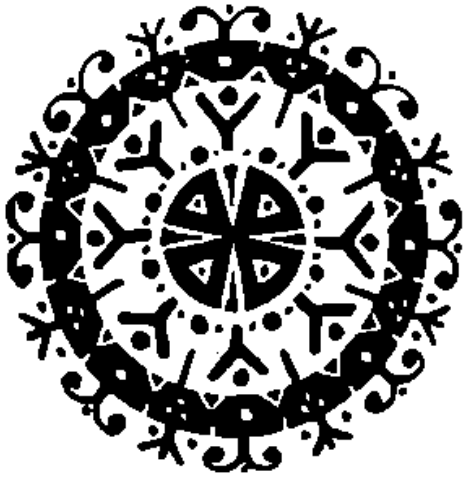

২৭৯এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-৩২৯৪

শাড়ী নয় সুতার কবিতা
শাড়ী শিল্পের চরম উৎকর্ষ অতি সুস্পষ্ট প্রতিটি শাড়ীতে
অতি আধুনিক * অভি নব * অভিজাত

সম্পাদকীয়

বাংলা সাহিত্য

এত দিন ধরে বাংলা ভারতের ভাব-জীবনে করে এসেছে অগ্রনায়কত্ব। ভারতের অন্যান্য দেশের লোকেরা বিস্ময় ও গর্বে বাঙ্গালীর দিকে চেয়ে থেকেছে অকুণ্ঠিত-ভাবে, বাঙ্গালীর কাছ থেকে নিয়েছে পথের নির্দেশ। আজ ভারত-সমাজে সেই শ্রেষ্ঠত্বের আসন বাঙ্গালী হারিয়ে ফেলেছে। দু'শতাব্দীর প্রাণান্ত সাধনার ফলে আজ ভারত যখন দেখলো মুক্তির আলো, সেই নবজীবনের বিকাশের মুহূর্তে যার প্রবর্ত্তিতে বাঙালী দিয়ে এসেছে সকলের চেয়ে বেশী উপকরণ, চরম বেদনায় আজ সেই বাঙালীই দেখছে তারই প্রবর্ত্তিত-পথে সে-ই পড়েছে সব চেয়ে পিছিয়ে। তার হাতের প্রদীপের আলোয় যখন সারা ভারত আলোকিত হয়ে উঠলো, তখন চরম দুর্ভাগা-তারই ঘরের প্রদীপ গেলো নিভে, আজ তার প্রদীপে তেল এসেছে ফুরিয়ে, শিখা মিনু মিনু ম্লান হয়ে আসছে প্রতিদিন। দেশ-প্রীতির আত্ম-প্রবোচনায় ও বাস্তবতাকে অস্বীকার কোরে অন্ধকারকে আরো গাঢ়তর করার কোন লাভ নেই।

এই সর্বব্যাপী হতাশার মধ্যে বাঙালীর এক মাত্র ঐতিহাসিক সম্বল হল, তার সাহিত্য। যুগের পর যুগ বাঙালীর সাহিত্য তার জাতীয় জীবনে জুগিয়ে এসেছে শক্তি, প্রেরণা, সান্ত্বনা ও শান্তি। বন্যা আর দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর মৃত্যু, লাঞ্ছনা আর নিগ্রহের মধ্যে, বাঙালীর বুকে অমৃতরস পরিবেশন করে এসেছে বাংলাভাষা। বাঙালী তার সাহিত্যের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা করেছে তার আনন্দমঠ। সেইখানেই সে খুঁজে পেয়েছে তার জীবন যাত্রী বিশ্ব-জননীকে। যে-পথে সে এগিয়ে গিয়েছে তার সাহিত্য আগেই এসেছে সেই পথের নির্দেশ। তাই আজ বাংলার এই ঘনায়মান অন্ধকারে চেয়ে ছিলাম বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের দিকে আকুল ভাবে, সেখানে খুঁজেছিলাম সামনে তাকিয়ে চলার কি পথ নির্দেশ সেখানে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু গত দুই যুগ ধরে সেখানে কোন আশার রেখা খুঁজে পাইনি। মাঝে মাঝে অন্ধকারে জ্বলে উঠেছে বটে আলো, কিন্তু সে আলোয় আলো, জোনাকির আলো, দুখড়ীর আলো, তেলহীন প্রদীপের বুক-জ্বলা আলো, একটু ঝড়ো বাতাসেই সে নিভে যায়। যতই দিন এগিয়ে চলেছে, যতই বাইরে থেকে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দুর্দৈব আর অপঘাত, ততই আমাদের সাহিত্যের দিকে চেয়ে হতে হয়েছে নিরাশাদ। যে আলোর ইতিহাস হবে আলোকিত কোথায় সে আলোর উৎস? এ আলোয় দাবী যে ইতিহাসের দাবী—

এই নিবিড় হতাশার মধ্যে আমরা আশা করেছিলাম বাঙালীর বর্ত্তমান জীবন ও সাহিত্য তার নব-জাগরণের মহালগ্নে বাংলার ইতিহাসের নতুন বাণী ও দ্যুতি বহন করে নিয়ে চলবে। মহাসাধনার প্রভাব স্পর্শে অমৃতময় হয়ে বাংলাসাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে এক নতুন প্রাণধারার সন্ধান দেবে, জগতের চিন্তাধারার বিবর্ত্তনের আলোক-উজ্জ্বল পরবর্ত্তী স্তরকে এগিয়ে আনবে, অনাগত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে এক নতুন সাহিত্য-সম্পদের সৃষ্টি করবে। যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত য়ুরোপের মন যে সাহিত্যের সন্ধানে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করে চলেছে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দ-সম্পৃক্ত-দৃপ্ত বাংলা সাহিত্য তার সন্ধান দেবে বিশ্বকে। কিন্তু গভীর দুঃখে মন ভেঙে পড়ে যখন দেখি আমাদের সম-সাময়িক বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ উল্টো পথে নিজের ইতিহাস গত সাধনার ধারা ভুলে গিয়ে যুদ্ধ ক্লান্ত ক্ষতবিক্ষত য়ুরোপের রিক্ত ও সন্ত্রস্ত মনের নানা উদ্‌ভ্রান্ত সাময়িক পরীক্ষাকেই অন্ধভাবে নকল করে চলেছে।

তাই আজ আহ্বান জানাই কে আছো কোথায় বীর সাহিত্যরথী বাংলার এই চরম দুর্দিনে বাঁচাও বাংলা সাহিত্যকে অপমৃত্যুর হাত থেকে, কর তাকে পঙ্কিল ও আবর্জনা মুক্ত, নতুন প্রাণরস সিঞ্চন করে করো তাকে সঞ্জীবিত, যার ফলে বাংলা সাহিত্যের অমৃতধারা শুধু বাংলা নয় সারা ভারতকে করবে নতুন ভাব-সমৃদ্ধ নতুন প্রাণ-বহ্নি উদ্দীপ্ত—জীবন্ত ও উজ্জ্বল। যা দেখে বিশ্বের সাহিত্যিকদের চোখ ধাঁধা হবে অপসারিত।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

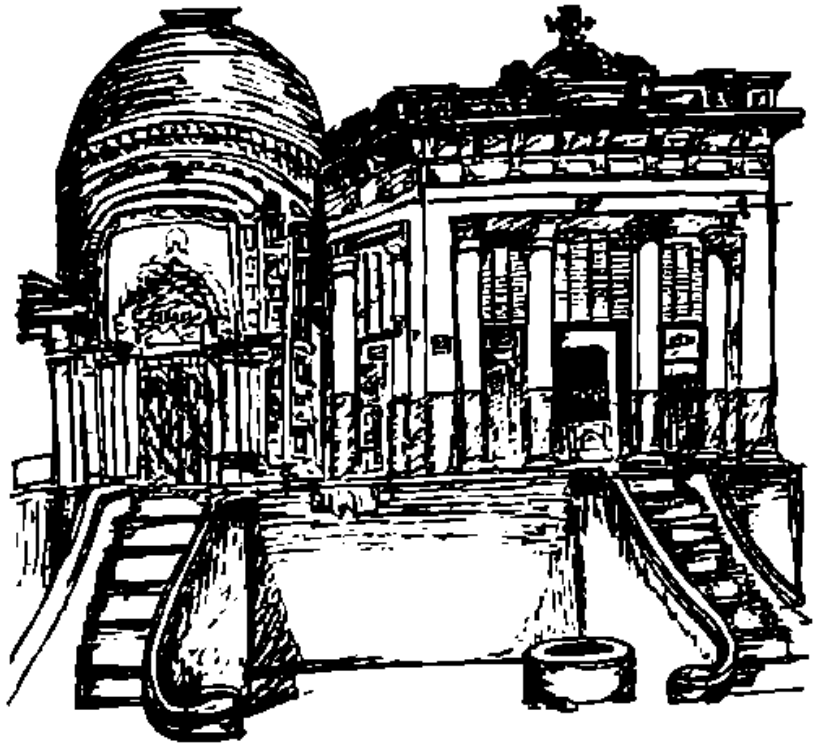

গুহদের কালীবাড়ী

উত্তর কোলকাতার বোসপাড়া মুড়িয়া বৃন্দাবন বসু ষ্ট্রীটের এই সেই কালীবাড়ি যার উল্লেখ রামকৃষ্ণ কথামৃতে বহুবার রয়েছে। এইখানেই আসতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণ। ভক্তদের বিশেষ করে রামকৃষ্ণ অনুগতদের মুখে মুখে এই প্রসিদ্ধ কালীমন্দিরের প্রচার আজ আর শুধু কোলকাতায় সীমাবদ্ধ নয়, ভারতের সর্বত্র।

১২৫৭ সালের ফাল্গুন সংক্রান্তিতে ৺শিবচন্দ্র গুহ কর্তৃক এই কালীবাড়ি স্থাপিত হয়। কথিত আছে রাণী রাসমণির স্বামী, বাগবাজারের গোকুল মিত্র, রাজেন্দ্র মল্লিক, ঈশ্বরচন্দ্র নান, চিৎপুরের সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ ডাকাত, দুর্গাচরণ মিত্র প্রমুখ বন্ধুগণ সহ শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে সঙ্গে নিয়ে শিবচরণ গুহ মহাশয় একদিন বেরিয়েছিলেন কালিঘাটের আদি গঙ্গায় স্নান করার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে হঠাৎ ১০।১১ বছরের একটি বালিকা তাঁদের অনুসরণ করে এবং কিছুদূর যাবার পর তাঁদের সামনে এসে শিবচন্দ্র গুহ মহাশয়কে দেখিয়ে বলে "আমি এর বাড়িতে যাবো"। এই ব্যাপারে সকলেই বেশ আশ্চর্য হন। অনুসরণকারিণী সাধারণ বালিকা নয়, বালিকার ছদ্মবেশে স্বয়ং কালীমাতা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সবই বুঝতে পেরেছিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গুহদের কালীমন্দির উল্লিখিত দিবসে স্থাপিত হয়। কালীমাতার নাম শ্রীশ্রীনিস্তারিণী দেবী। এর পাঁচ বছর পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই কালীমন্দিরে তখনকার দিনে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে পূজা ও ভোগ হতো। এমনও শোনা যায় যে কালী পূজার সময় একটি মোষ, একটি মেষ, ষোলটি ছাগ বলি দেওয়া হোত। ভাবলে বিস্মিত হোতে হয়, বলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার দিনের পালোয়ানের দল এসে উপস্থিত হত সেইখানে এবং কোন বাধা-বিঘ্ন না মেনে সেই সব বলি দেওয়া মোষ, মেষ ও ছাগগুলি নিয়ে চলে যেতো।

—মন্দিরের ছবি ও ইতিবৃত্ত-প্রণাত রায়

০০০ কালীমন্দিরের কথা কখনও পুরাতন হয় না, চিরদিনই নতুন। জনসাধারণের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে আবার এই কালীমন্দিরের কথা লিপিবদ্ধ করা হলো।

ওরা তিনজন—ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেব

'স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে শুধু গলা ফাটিয়ে চেঁচালেই হয় না। স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, তোমরা চাইলে আর আমরা দিয়ে দিলাম। ত্রিশ কোটি ভারতীয় প্রজার নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আমাদের ওপর ন্যস্ত, তোমাদের কল্যাণ কামনায় আমরা উদ্বুদ্ধ, তোমাদের দেশের শাসনভার তোমাদেরই হাতে তুলে দিয়ে চলে আসতে আমরা প্রতিশ্রুত। কিন্তু ঐ যে বলেছি, স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া নয়, তোমাদের হাতে দিয়ে দিলে তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে কি না, সেটা ত আগে আমাদের দেখতে হবে, ভাল করে যাচাই করতে হবে তোমাদের যোগ্যতা! তাই—'

তাই ১৯২৮ সালে স্যর সাইমনের নেতৃত্বে সেই সুদূর ইংলণ্ড থেকে বহুৎ মেহনৎ করে এলেন কয়েকজন বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ভাল করে যাচাই করতে ভারতীয়েরা স্বাধীনতা পাবার মত এবং স্বাধীন দেশের প্রশাসন চালাবার মত যোগ্যতা অর্জন করেছে কি না, ঘুরে থাকলেও তা কতখানি

'কিন্তু এ কি মনোবৃত্তি ভারতবাসীর? বোম্বাই-এ পদার্পণ করার দিন একেবারে 'ভারত বনধ' করে বসলো? বন্ধ করে দিল স্বাভাবিক জীবনযাত্রা? তারপর থেকেই যেখানেই যাচ্ছে কমিশন, সেখানেই হরতাল, কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল আর সমবেত কণ্ঠে শ্লোগান, গো ব্যাক সাইমন! এ কেমনতরো ব্যবহার তোমাদের!

কিন্তু গো ব্যাক বললেই ত আর চলে যাওয়া যায় না। আমরা কর্তব্যপরায়ন, ভারতের জন্য আমাদের দরদ ও সহানুভূতি সীমাহীন, তাই কলসীর কানা মারলেও প্রেম বিতরণ আমরা করবই।'

সাইমন কমিশন সারা ভারতবর্ষ সফর করতে লাগল কানে তুলো গুঁজে, চোখে ঠুলি লাগিয়ে আর পিঠে কুলো বেঁধে।

৩০শে অকটোবর শুভাগমন করল তারা লাহোরে।

লাহোর রেল স্টেশনে তাদের অভ্যর্থনা (?) জানাবার জন্য যাত্রা করল দীর্ঘ বিক্ষোভ মিছিল, সেই মিছিলের পুরোভাগে অন্যান্য নেতার সঙ্গে আর কেউ নন, স্বয়ং লালা লাজপৎ রায়। রেল স্টেশন ঘিরে কাঁটাতারের বেড়া খাড়া করা হয়েছে, সেই সীমানা পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র পুলিশের দল, তাদের পুরোভাগে সিনিয়র পুলিশ সুপার মিঃ স্কট।

লালাজী সদলবলে কাঁটা তারের ধারে এলেন

সদলবলে এগিয়ে এল স্কট।

তারপর সদলবলে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল অহিংস মিছিলের উপর চলল নির্বিচারে লাঠি, বুট, বন্দুকের

দীপঙ্কর

কুন্দো। আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল দলে দলে। স্কটের লাঠির ঘায়ে লালাজীর ছাতা ভেঙে গেল, পরক্ষণেই স্কটের লাঠি পড়ল তাঁর বুকের পাঁজরে।

লালাজি আহত হলেন।

১৭ই নভেম্বর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে গুপ্ত বিপ্লবী সংস্থা গড়ে উঠেছিল, হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান পার্টি। গত আগষ্ট মাসেই দিল্লীতে তার গুপ্ত সভা হয়ে গেছে, গঠিত হয়েছে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি, এক-একটি প্রদেশের সংগঠনের ভার এক-একজন কর্মির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পাঞ্জাবের ভার পেয়েছে ভগৎ সিং এবং শুকদেব।

১০ই ডিসেম্বর লালবাজার থানার এক গুপ্ত বৈঠক বসল মোজাং হাউসের একটি নির্জন কক্ষে।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, লালা লাজপৎ রায়ের হত্যার জন্য দায়ী সিভিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ স্কটকে খতম করতে হবে। তিনজন বিপ্লবীকে মনোনয়ন করা হল, ভগৎ সিং, রাজগুরু ও চন্দ্রশেখর আজাদ।

পর পর তিন দিন ওরা স্কটের গতিবিধি লক্ষ্য করল।

তারপর তারিখ নির্দিষ্ট করা হল ১৯২৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর।

ডি এ ভি কলেজ ও আদালত সমূহের মাঝখানে বড় রাস্তার উপর স্কটের অফিস। ওরা তিনজন অপরাহ্নের দিকে কাছাকাছি এসে পৌঁছল। কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হয়েছে তিনটি সাইকেল। স্থির হল রাজগুরু এগিয়ে গিয়ে গুলি করবে। কিন্তু তার গুলিতে স্কট খতম না হয়, তাহলে এগিয়ে যাবে ভগৎ সিং। ওরা ধরা দেবে না, কলেজ প্রাঙ্গণে ঢুকে সাইকেলে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। যদি কেউ ওদের অনুসরণ করে, তাহলে চন্দ্রশেখর তার সদুত্তর দেবে। যদি কেউ ধরাই পড়ে যায়, তাহলে আদালতে বিবৃতি দিয়ে সে দেশবাসীকে জানিয়ে দেবে যে, এটা সাধারণ হত্যা নয়, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। যে ইংরেজ সরকার সারা দেশের উপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড থেকে সুরু করে লালা লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী যে ভল্লাদ গভর্ণমেণ্ট, সেই গভর্ণমেণ্টের ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিদের একে একে খতম করে আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি যে, বিপ্লবীরা অত্যাচারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

কিন্তু পরম দৌভাগ্য স্কটের, অপরাহ্ণ ঠিক চারটে সাঁইত্রিশ মিনিটে স্কটের অফিস থেকে বেরিয়ে এসে যে মটর সাইকেলে চড়তে গেল, সে স্কট নয়, স্যাণ্ডার্স আর সাহেবদের লাল মুখ দেখতে প্রায় একই রকমের, তাই ওরা স্যাণ্ডার্সকেই মনে করল স্কট।

রাজগুরুর রিভলবার গর্জে উঠল।

মাথায় আঘাত পেয়ে লুটিয়ে পড়ল স্যাণ্ডার্স।

ভগৎসিং মনে করল, ব্যাটা মরে নি। তাই সেও এগিয়ে গেল, স্যাণ্ডার্সের লুটিয়ে পড়া দেহের ওপর পাঁচ ছয়বার গুলী করল।

তারপর দুই বিপ্লবী বন্ধু, যেন কিছুই হয়নি, যেন তারা রাস্তায় চলমান নাগরিকদের মতই নির্বীহ নির্লিপ্ত, এমনি ভাব দেখিয়ে প্যাণ্টের পকেটে দুই হাত ঢুকিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল কলেজের দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ স্কটের অফিস থেকে বেরিয়ে এল একজন ইউরোপীয় সার্জেণ্ট, স্যাণ্ডার্সের দেহরক্ষী চরন সিংকে সঙ্গে নিয়ে রিভলবার উঁচিয়ে ওদের পিছু ধাওয়া করল।

ভগৎ সিং পেছনে ফিরে গুলী চালাল। গুলী ওদের গায়ে লাগল না বটে, কিন্তু সার্জেণ্টটা লাফিয়ে উঠতেই এমনভাবে পা হড়কে পড়ে গেল যে, তার হাত ভেঙ্গে গেল।

চরন সিং তখনও একাই ধাওয়া করছে।

কলেজ গেটের কাছে অপেক্ষা করছিল চন্দ্রশেখর আজাদ, এবার সে গুলি চালাল। পেটে গুলি লেগে লুটিয়ে পড়ল চরন সিং।

ওরা দ্রুতপদে ঢুকে পড়ল কলেজ ভবনের ভিতরে একটি হল এর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে উঠল দোতালার বেডিং হাউসে, বিল্ডিং এর পেছন দিকে গিয়ে যেন ওয়াটার পাইপ বেয়ে নীচে নেমে পড়ল, তারপর তিনজন সাইকেলে চেপে কলেজের পিছনের গেট দিয়ে বেরিয়ে শহরের জনারণ্যে নিরাপদে মিলিয়ে গেল।

আততায়ীদের সন্ধানে পর মুহূর্তে থেকে সুরু হল সার্চ, সার্চ, সার্চ।

চতুর্দিকে যেখানে সেখানে সার্চ।

হানা দিল পুলিশ ডি এ ভি কলেজ হোস্টেলে, সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটির অফিসে, ডেইলি প্রতাপ পত্রিকার অফিসে, আরও অনেক জায়গায়। খবর পাওয়া গেল, ওরা নাকি নাভা হাউসের পেছনে এসে সাইকেল গুলো ফেলে রেখে অপেক্ষমান একখানা মোটরে গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে।

সাইকেল তিনখানা সেখানে পাওয়া গেল। কাদের

সাইকেল! কার এর মালিক? সে খবর পাওয়া গেল না। কোত্থেকে পাওয়া যাবে? মোটরের মত সাইকেল রেজিস্ট্রেশনের কোন আইন নেই, সাইকেল চালাতে লাইসেন্স লাগে না।

গ্রামের দিকে পালিয়ে গেছে শুনে রবী নদীর তীরে গোটা বিরাট জঙ্গলটাই ঘিরে ফেলল বিরাট পুলিশের সশস্ত্র সৈনিক নিয়ে, চালাল তন্ন তন্ন করে তল্লাসী

কিন্তু কোনো হদিশ পাওয়া গেল না বিপ্লবীদের।

ব্যর্থ হল বৈদ্যুতিক অভিযান।

পক্ষান্তরে, ২১ ডিসেম্বর লাহোর গেট ও শালিমার গেটের মেয়রের আঁটা হাতে লেখা পোষ্টার দেখা গেল, আমি ভারতে বিপ্লবী সংগঠনের কমাণ্ডার ইন চিফ, আমি ঘোষণা করছি, যদি কেউ আমায় গ্রেপ্তার করতে পারে তা'হলে গভর্ণমেণ্ট যাই দিক না কেন, আমি নিজেই তাকে দেব নগদ পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার।

ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে বিপ্লবীদের চ্যালেঞ্জ

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে তখন ইংরেজ হোম মেম্বার ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে একটি নতুন বিল উত্থাপন করতে চাইলেন, পাবলিক সেফটি বিল, যার একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমন করা। পরিষদের প্রেসিডেণ্ট বিঠলভাই প্যাটেল আপত্তি জানিয়েছিলেন, বলেছিলেন, আগে ট্রেডস ডিসপিউটস বিল নিয়ে আলোচনা হোক, হোম মেম্বার রাজী হননি, বলেছেন, জনগণের স্বার্থের খাতিরে এটা অত্যন্ত জরুরী, শিঘ্রে যে সব বিরোধ দেখা দেয়, তা নিয়ে আমাদের ভাবনা থাকলেও হিজ মেজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের ত্রিশ কোটি প্রজার শান্তি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা সবার আগে করা দরকার।

অথচ, যে জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হিজ মেজেষ্টিজ গভর্ণমেণ্টের ঘুম হচ্ছে না, সেই জনগণের প্রতিনিধিরা প্রচণ্ড আপত্তির ঝড় বার বার পরিষদ কক্ষ প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন, তাদের নেতারা কক্ষের বাইরে মাঠে ময়দানের সভায় বার বার বিক্ষোভ প্রকাশ করেছেন

সেই আপত্তি ও বিক্ষোভের ঢেউ আজ ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে দর্শকদের গ্যালারিতেও বুঝি এসে পৌঁছেছে। সেখানে প্রচণ্ড ভিড়। সকলেরই প্রচণ্ড ঔৎসুক্য, ঐ কুখ্যাত বিল আগে তোলবার জন্য হোম মেম্বার যে নোট দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে প্রেসিডেণ্ট প্যাটেল আজ রুলিং দেবেন, কি রুলিং দেন, শুনতে হবে।

সেই প্যাটেল উঠে দাঁড়িয়েছেন, চতুর্দিকে নীরবতা, সকলেই উৎকর্ণ, প্যাটেল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারী ভাঙ্গা উত্তাপহীন কণ্ঠে বলতে সুরু করেছেন, অমনি কোথা থেকে কক্ষের মেঝের ওপর এসে পড়ল পর পর দুটি বোমা, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল, পরক্ষণেই শোনা গেল পর পর দুবার রিভলভারের আওয়াজ। বোমার ঘায়ে মেঝেতে গর্ত হয়ে গেছে, টেবিল চেয়ার ভেঙ্গে ছিটকে পড়েছে

মুহূর্তে হৈ চৈ পড়ে গেল, সদস্যরা দর্শকরা প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগলেন, ভয়ার্ত চীৎকারে কক্ষ কেঁপে উঠল, হোম মেম্বার ও লালমুখ সদস্যরা তাড়া-খাওয়া ঘিরে তাড়া কুকুরের মত চৌ চৌ দৌড় মারলেন।

তারপর ছুটে এল মার্শালের দল, গোর্খা রিভলভার হাতে পুলিশের দল, টেলিফোন চলে গেল প্রধান থানাতে, আরও পুলিস পাঠাও, অস্ত্র পাঠাও, সৈন্য পাঠাও।

যে দুষ্কৃতকারীকে ধরবার জন্য এত তোড়জোড়, তারা দুজন কিন্তু দর্শকদের গ্যালারীতে অটল প্রশান্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওরা রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে মুঠো মুঠো হ্যাণ্ডবিল ছুঁড়ে ফেলল নীচে মেঝের ওপর, হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান পার্টির ইস্তাহার, তারপর পর পর চীৎকার করে উঠল, দেশের প্রতি আমরা আমাদের কর্তব্য করলাম, তারপর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র দুটি সিটের ওপর ফেলে দিল।

তারপর পুলিশের দল উঠে আসতেই বিনা প্রতিরোধে, বিনা দ্বিধায় হ্যাণ্ডকাফ পরাবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল।

কে তোমরা　　নাম কি? কোথা থেকে এসেছ

কেন বোমা ফেললে ? কেন ছুঁড়লে রিভলভার ? কাকে হত্যা করতে চেয়েছিল ?

পুলিশের হাজারো জেরার জবাবে অকম্পিত কণ্ঠে বলেছিল ওরা—

আমি ভগৎ সিং, বয়স একুশ বৎসর, পাঞ্জাবের অধিবাসী।

আমি বটুকেশ্বর দত্ত, বয়স বাইশ বৎসর, বাংলার লোক হলেও আমিও পাঞ্জাবের অধিবাসী।

আমরা সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান পার্টি নামীয় বিপ্লবী দলের সদস্য। তোমাদের পার্লামেণ্ট যে ভুয়ো, বিনা প্রতিবাদে যে এই ভুয়ো সভার কাজ চলতে দেওয়া উচিত নয়, মর্মে মর্মে আমরা তা উপলব্ধি করি বলেই, কারুকে হত্যার উদ্দেশ্যে নয়, তীব্র প্রতিবাদ জানাবার উদ্দেশ্যেই বোমা ফেলেছি, রিভলভার ছুঁড়েছি। জনগণের কাছে তোমাদের মুখোস খুলে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

এদিকে পরদিনই, অর্থাৎ ১৯২৯ সালের ৯ এপ্রিল, পুলিশ গোপন সূত্রে সংবাদ পেল যে, কাশ্মীর বিল্ডিং-এর ৬৯ নম্বর কক্ষে একটি লোহা ঢালাইয়ের ছোট কারখানা খোলা হয়েছে। কয়েকজন ভদ্রসন্তান লাহোর সহরের জনকতক লোহা ঢালাইকারী শ্রমিককে নিযুক্ত করেছে। কাজ হয় রাত্রিবেলা, দিনে নয়। তারা ঢালাই করে তৈরী করে চুড়ির মোটা ভিন্ধাকৃতি, অথচ আকারে ডিমের চাইতে বেশ বড় লোহার জিনিষ। কি হবে ওগুলো দিয়ে, জিজ্ঞেস করেছিল শ্রমিকরা। ভদ্রসন্তানরা বলেছেন, ওগুলো একটা মেসিনের অংশ।

কি সে মেসিন ? কি হয় তা দিয়ে ? আর ঢালাই কাজটা দিনের বেলা হচ্ছে না কেন ? নানা প্রশ্ন জাগল ওদের মনে। সন্দেহও হল বৈকি ! ওরা চেনাজানা একজন পুলিশের কাছে ঘটনাটা বলল।

পুলিশেরও সন্দেহ হল।

সে জানিয়ে দিল ওপরওয়ালাকে।

ওপরওয়ালা গুপ্তচর পাঠালেন কাশ্মীর বিল্ডিং-এর ওপর নজর রাখবার জন্য।

জানা গেল ৬৯ নম্বর কক্ষটি ভাড়া যে নিয়েছে, তার নাম ভগবতীচরণ। সে নিজে কিন্তু কক্ষটি যখন নিতে আসেনি প্রায় দু সপ্তাহ। তারপর জনকয়েক ছাত্র এসে থাকত ওখানে। তারা বেলা দশটায় ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে যেত আর ফিরে আসত সেই অপরাহ্নে। মাঝে মাঝে একনাগাড়ে কদিন আসতও না তারা। গভীর রাত্রে শ্রমিকরা আসে, কাজ করে, আবার ভোরের আলো ফুটে ওঠবার আগেই চলে যায়। কে একটি ছেলে রোজই চুপিসারে এসে হাজির হয় সেখানে, কাজকর্মের তদ্বির করে, তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে যায়।

১৫ এপ্রিল গভীর রাত্রে অকস্মাৎ পুলিশ হানা দিল কাশ্মীর বিল্ডিং-এর সেই ৬৯ নম্বর ঘরে, পাওয়া গেল শুকদেবকে, গ্রেপ্তার করা হল তাকে। পাওয়া গেল দুটি পিস্তল, চব্বিশটি বুলেট ও এগারোটি বোমা।

পরিষদ কক্ষে বোমা ফেলার অভিযোগে ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তের মামলা শুরু হল ১৯২৯ সালের ৭ মে দিল্লীতে।

১২ জুন দুজনের সাজা হয়ে গেল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সাজা হয়ে যাবার পর জেলের অভ্যন্তরে ওদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়ে গেল। আবেদন নিবেদনে যখন কাজ হল না, ওদের কড়া প্রতিবাদে যখন কর্ণপাতও করলেন না জেল কর্তৃপক্ষ, তখন সাজা হওয়ার মাত্র তিন দিন পর, ১৫ জুন থেকে ওরা শুরু করল অনশন। ওদের দাবী, ওদের রাজনৈতিক বন্দী বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, বিশেষ শ্রেণীর ইয়োরোপীয় বন্দীদের যেমন দেওয়া হয়ে থাকে, তেমনি উন্নত ধরণের খাদ্য দিতে হবে, কোনো হার্ড লেবার দেওয়া চলবে না, সাধারণ কয়েদীদের থেকে পৃথক কোন ইয়ার্ডে রাখতে হবে, বই ও অন্যান্য সাহিত্য পাঠের সুবিধা দিতে হবে।

যথারীতি কর্তৃপক্ষ এসব দাবীতে কর্ণপাতও করলেন না।

কলকাতায় গ্রেপ্তার করে যতীন দাসকে ১৬ জুন লাহোরে নিয়ে আসা হল।

১ জুলাই অনশনকারী ভগৎ সিংহকেও লাহোরে নিয়ে যাওয়া হল।

কিছুদিন অপেক্ষা করার পর জেল কর্তৃপক্ষ অনশনকারী রাজনৈতিক বন্দীদের বলপ্রয়োগে খাওয়ানো শুরু করলেন। প্রক্রিয়াটি অভিনব। প্রতিদিন সকালে ও বিকেলে ডাক্তার আসেন, সঙ্গে কয়েকজন ওয়ার্ডার ও জোয়ান-গোছের সাধারণ কয়েদী। বন্দীকে চিৎ করে শুইয়ে হাত, পা ও মাথা চেপে ধরা হয়, যাতে একটুও না নড়তে পারে সে। দুধ ও নানারকম আহার্য তরলিত করে একটি পাত্রে রাখা হয় আর সেই পাত্রের সঙ্গে লাগানো একটি সরু রবারের নল. তার গোড়ায় ইপকর্ক লাগানো। ডাক্তার সেই সরু নলটি বন্দীর নাকের ছিদ্র দিয়ে ঢুকিয়ে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত চালান করে দেয়। তারপর ইপকর্ক টিপে করে দিলে সেই তরলিত খাদ্য ধীরে ধীরে বন্দীর পাকস্থলীতে যায়। এইভাবে শরীর মজবুত রাখবার মত পর্যাপ্ত খাদ্য খাওয়ানো যায় না বটে, তবে অনশনঘটিত মৃত্যুকে খানিকটা বিলম্বিত করা যেতে পারে।

তবে বিপ্লবী বন্দীদের ক্ষেত্রে সে কথা সত্য নয়। প্রথমতঃ, চিৎ হয়ে শোওয়াবার সময় সে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে থাকে, তারপর শোয়ালেও সে বাধা নাড়ার চেষ্টা করে, যাতে নলটা নাকের মধ্যে ঢোকানো সম্ভব না হয়, পরিশেষে ওরা জবরদস্তি ঢুকিয়ে চলে যাবার পর বন্দী গলায় আঙুল দিয়ে বমি করবার চেষ্টা করে।

এর ফলে বিপ্লবী বন্দীর শরীর বরং তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে পড়ে।

ভগৎ সিং, রাজগুরু, সুকদেব ও অন্যান্য অনশনকারী বন্দীকে এমনিভাবে বলপ্রয়োগে খাওয়াতে লাগলেন লাহোর জেল কর্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের অনুমোদন নিয়ে।

যতীন দাস তখনো অনশন শুরু করেনি।

তবে জেলে এসেই সংবাদ পেয়ে গেছে সে।

সহকর্মীদের সঙ্গে গোপনে সংবাদ আদান প্রদানও চলছে।

কতকগুলি বাস্তব সুখ সুবিধা আদায়ের জন্য অনশনকে প্রথমটা সে ততটা সমর্থন করতে পারল না, বার্তাবহ মারফত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভগৎ সিংয়ের অনশনের তখন আঠাশ দিন অতিক্রান্ত, অনশন এখন প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে, একদিকে জেদী ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট, অন্যদিকে 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' ভারতের বিপ্লবী দল, যারা 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। এতদিন অটলভাবে অনশন চালিয়ে তাদের পক্ষে তা বিনা কারণে প্রত্যাহার করবার উপায় নেই।

সব শুনে যতীন দাস খবর পাঠাল, অল রাইট, আমি করছি হাঙ্গার ষ্ট্রাইক, আমাদের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমি ষ্ট্রাইক এ্যাবানডন করব না, করব না।

তার হাঙ্গার ষ্টাইক শুরু করবার তারিখটিও উল্লেখ-যোগ্য।

সে যুগে একটি 'স্বদেশী' ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করতে পারলেই পুলিশ খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠত।

কোনো 'স্বদেশীকে' ধরে ফেলতে পারলেই চলত তার ওপর দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার। ঘুট ঘুটে অন্ধকার কক্ষে বন্ধ করে রাখা, মারধোর করতে না দেয়া, বাবা মা চৌদ্দপুরুষ তুলে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ, মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়া, গায়ে মরলা-মেশানো জল ঢেলে দেয়া, বরফের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখা, নখের নীচে আলপীন ফুটিয়ে দেয়া, উলঙ্গ করে গোপনাঙ্গে আঘাত করা এবং চড় চাপড় কিল ঘুসি লাথি মারা ও হাণ্টার চালনা—এ ত চলতই, তাছাড়া চলত প্রচুর পরিমাণ টাকার লোভ দেখানো। যদি কোন বন্দী দুর্বলতা দেখিয়ে কিছু বলে ফেলত অমনি শুরু হত পুলিশের ষড়যন্ত্র মামলা সাজাবার কূট কলা কৌশল। যা সে জানে না, অতএব বলেনি, সে সব কথা প্রয়োজনমত তার মুখে গুঁজে দেয়া হত! কতক-গুলি বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক ঘটনার সঙ্গে আসামীদের যুক্ত করবার উদ্দেশ্যে ওর মুখ দিয়ে চমৎকার একটি আষাঢ়ে গল্প বলানো হত। তারপর সে গল্পটি যে গল্প নয়, তথ্যনির্ভর সত্য, তা আদালতে নিখুঁতভাবে প্রমাণ করবার জন্য অগণিত সাক্ষী সৃষ্টি করা হত। তারপর চাকঢোল পিটিয়ে শুরু করা হত বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা। একটি ষড়যন্ত্র মামলার সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারলেই যেমন

কর্তাদের দেখানো বেশ রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা. তেমনি প্রমোশন ও পুরস্কারের পথ সুগম হয়ে উঠত।

এমনিভাবেই শুরু হল লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা ১৯২৯ সালের ১০ জুলাই। প্রধান প্রধান আসামীদের নাম :

(১) ভগৎ সিং, বাবার নাম কিষেণ সিং, ১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পরিষদে বোমা নিক্ষেপ মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত।

(২) রঘুনাথ, ওরফে 'এম', ওরফে শিবরাম রাজগুরু, বাবার নাম হরি রাজগুরু. ১৯২৮ সালের ১৮ অক্টোবরের কয়েকদিন পূর্বে পুনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৩) শুকদেব, ওরফে দয়াল, ওরফে স্বামী, বাবারনাম রামলাল, ১৯২৯ সালের ১৫ এপ্রিল লাহোরে একটি বোমার কারখানায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৪) যতীন্দ্রনাথ দাস. বাবার নাম বঙ্কিম চন্দ্র দাস, ১৯২৯ সালের ১৫ জুন কলকাতায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(৫) চন্দ্রশেখর আজাদ. ওরফে পণ্ডিতজী. এখন ও পলাতক।

(৬) ভগবতীচরণ. ওরফে বি সি ভোহরী, এখন ও পলাতক।

এদের অপরাধ ? অপরাধ গুরুতর।

১৯২৮ সালের ১৩ জানুয়ারী বেনারসে তোমরা সি আই ডি ইন্সপেক্টরকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলে,

২৬ জুন গোপালপুর জেলার বরহালগঞ্জের একটি পোষ্ট অফিসের টাকা সরিয়ে ফেলেছ,

৪ ডিসেম্বর তোমরা সদলবলে অর্থ লুট করবার উদ্দেশ্যে লাহোরের পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে হানা দিয়েছিলে,

১৭ ডিসেম্বর লাহোরে তোমরা পুলিশ সুপার স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেছ,

১৯২৯ সালের ৮ এপ্রিল তোমরা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ কক্ষে বোমা ফেলেছ, বিতরণও ছুঁড়েছ,

৭জুন মাউলমিয়ার ডাকাতি করেছ. লাহোর, সাহারাণ পুর, আগ্রা ও কলকাতায় রাশি রাশি বোমা তৈরি করেছ,

তোমরা ঐকোড়ী ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের জেল ভেঙ্গে ছিনিয়ে নেবার ফন্দী এঁটেছিলে,

আইন ও শৃঙ্খলার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় প্রজাদের কল্যাণকর্মে প্রতিনিয়ত ও নিয়োজিত ব্রিজ মেজেষ্টির গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করেছ।

অর্থাৎ যেন তারস্বরে আদালতকে বলা হল, 'এই লাহোর থেকে সুরু করে সেই সুদূর কলিকাতা পর্য্যন্ত এই খুনী ও ডাকাতদের সংগঠন, এরা জনগণের ত্রাস, এরা সমাজের কলঙ্ক, এদের বাঁচাবার অধিকার নেই।'

সাক্ষী সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। সাধারণতঃ ঠেলাওয়ালা, পানবিড়িওয়ালা, ফলওয়ালা, টাঙ্গিওয়ালা, মুচি, মেথর, মুদফরাস. পুলিশের নাম শুনলেই যাদের বুকে কাঁপুনি সুরু হয়ে যায়, কিছু বখশিশ পেলেই তারা দিনকে রাত রাতকে দিন বলতে রাজী, পুলিশের প্রয়োজন মত তাদের মুখে কথা গুঁজে দেয়া হয়, মামলা সুরু হবার পূর্বে তারিখ মত আসামীদের আদালতে হাজির করা হলে আড়াল থেকে ওদেরকে ভাল করে চিনিয়ে দেওয়া হয়, সনাক্তকরণ প্যারেডে যাতে ওরা ভুল না করে বসে।

মামলা সুরু হবার ঠিক দুদিন পরেই যতীন দাস পুলিশের এই ঘটনাকে চরম আঘাত দিল। ১৩ জুলাই সুরু করল সে অনশন। ঘোষণা করল, আমার এই অনশন আমরণ। আমাদের দাবী পূরণ না হওয়া পর্য্যন্ত চলবে, চলবে।

চলল ও তাই।

প্রথমতঃ, উপেক্ষা, অবজ্ঞা, হুমকি, তারপর বলপ্রয়োগ হাজারো নির্য্যাতন, ভীতি প্রদর্শন। তাতে ও ভুলোল না অনশন চলতে লাগল

তারপর ওদের ব্রজকণ্ঠ খাদে নেমে এল, রক্তবর্ণ চক্ষু হয়ে এল ম্লানাবমান। সুরু হল উদাত্ত প্রতিশ্রুতি. অনশন প্রত্যাহার কর, অনেক কিছু করব কথা দিচ্ছি।

শুনল না যতীন দাস. শুনল না ভগৎ সিং, রাজগুরু. শুকদেব এবং সহবন্দীরা অনশন অব্যাহতভাবে চলতে লাগল।

ওদের সুর আরও নরম হয়ে এল, চলল অনুরোধ, উপরোধ, আবেদন। বন্দীরা তথাপি কর্ণপাত করল না। অনশন চলতে লাগল। আত্মবিলোপনে বিপ্লবী কি কখনও ভয় পায়?

অবশেষে বলদর্পি ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের দম্ভ ও কূট কৌশল চূর্ণ করে দিয়ে এল সেই চরম দিন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রক্তাক্ষরে লেখা একটি দিন, ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর. তেষট্টি দিন অনশনের পর যতীন দাস চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ল।

যতীন দাসের তিরোধানের পরই আবার ভ্রংষ্টা বার করল বৃটিশ সিংহ. আবার শোনা গেল তার গর্জন। তোড় জোড় করে সুরু হল আবার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যতীন দাস যখন চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল আর তার আত্মবলিদানের ফলে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারীকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল, তখন বেশ বোঝা গেল যে, তাদের অনশনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেসও সচকিত হয়ে ওঠে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, কংগ্রেস বিপ্লবী বন্দীদের দাবীদাওয়া নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে।

তাই, একশো বাহান্ন দিন চালাবার পর ভগৎ সিং ও সহবন্দীরা অনশন ত্যাগ করল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অনুরোধে।

দীর্ঘ একবছর পর ষড়যন্ত্র মামলা শেষ হল। ১৯৩০ সালের ৭ অকটোবর রায় দেয়া হল। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল তিনজন—ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেব।

রায় শুনে ভগৎ সিং বলে উঠল, দীর্ঘকাল জেলে পচার চাইতে ফাঁসীতে যাওয়া অনেক আনন্দের।

আলোড়িত হয়ে উঠল সমগ্র ভারত। চলতে লাগল সভা সমিতি, প্রতিবাদ বিক্ষোভ, আবেদন নিবেদন।

অবশেষে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী প্রাণরক্ষার আবেদন জানাতে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

বড়লাট সে আবেদনও প্রত্যাখান করতে দ্বিধা করলেন না।

ফাঁসীর দিন ধার্য হয়ে গেল, ১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ

ঐ দিন সন্ধ্যা চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল ওরা তিনজন, ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেব।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রির শুরু অন্ধকার নেমে এল বিশ্ব চরাচরে।

দেশমাতৃকা অবাধা অশ্রু মার্জনা করলেন।

• • • •

"ভারতে যে নতুন জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রীয় বিপ্লববাদের চেতনা গড়ে ওঠে তারও পথিকৃত হলেন বিবেকানন্দ এবং তার প্রবল প্রবক্তারূপে অভিব্যক্তি লাভ করলেন ভগ্নী নিবেদিতা। বিবেকানন্দ বোমা ছোড়েন নি, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভাষণ দেননি বা কোন রাজনৈতিক দল গঠন করেন নি সত্য, কিন্তু তবুও তিনিই ছিলেন ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক, প্রেরণার মূল উৎস। সে-যুগে বিপ্লবীদের ঘরে ঘরে তল্লাসীকরবার সময় এক ফিরিঙ্গী শাসক স্থির করে বলেছিলেন "কে এই বিবেকানন্দ, তাকে ধরে এনে ফাঁসী দাও"। বস্তুতঃ শুধু আত্মাহুতির প্রেরণার উৎসই নয়,—দেশপ্রেম, দেশসেবার ধর্মবাণীর সন্ধানও বিপ্লবীরা পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তৃতা থেকে।"

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(একত্রিশ)

ঘণ্টাখানি গ্রামের পূব প্রান্তে ভিত্তা নদীর ধারে এসে আমাদের স্টীম থামল এটাকে ঠিক ভিত্তা বলা যায় না, নদী পূর্বদিকে অনেক দূরে সরে গেছে। আমাদের সামনে বিরাট চর, না না, চর বলা ঠিক হবে না, রবীনবাবু যা বলেছিলেন, গ্রাম, দ্বীপ-গ্রাম বলা যেতে পারে। বহু গাছ গাছালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে খড়ের চালা, শস্যক্ষেত্র

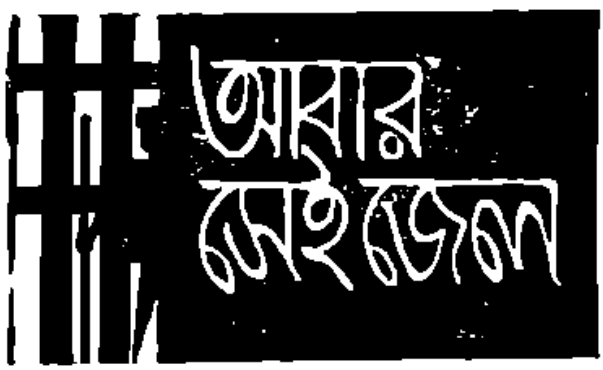

দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

ক্ষেতের পর ক্ষেত, আরও দূরে একখানা দোতালা কাঠের বাড়ী, সকালের রোদ তার টিনের চালে চিক চিক করছে, রবীন বাবু বললেন, ওটাই ঘোষ সাহেবের প্যালেস।

চরের এপারে সরু জলের ধারা, একশো গজ চওড়া হবে হয়তো। ভিত্তার সঙ্গে এর যোগাযোগ আছে বটে, তাই ভির ভির করে বয়ে চলেছে। রবীনবাবু বললেন, গভীরতা কোমরের বেশী হবে না, কিন্তু স্টীম যাবে না, এপারে নদীর ধারে লক করে রেখে আমাদের নৌকায় পার হতে হবে, তারপর ক্ষেতের আল ধরে ধরে হাঁটা, যতক্ষণ না প্যালেসের সিংহদ্বারে উপনীত হই।

পরেই দেখা গেল, তিনখানা নৌকা বাঁধা রয়েছে, মাঝিরাও বৈঠা নিয়ে প্রস্তুত। ঘোষ সাহেবের যাবতীয় ত্রুটি নেই। আমাদের দেশের মত কিন্তু কাঠ দিয়ে তৈরী নৌকা নয়, সেই যে দুই প্রান্তে মানানসই লম্বা ছুঁচলো হয়ে যাওয়া কাঠ, যাকে বলা হয় গলুই, মাঝখানটা ক্রমশঃ চওড়া হয়ে গিয়ে আবার ক্রমশঃ সরু হয়ে ঐ প্রান্তের গলুইতে গিয়ে ঠেকেছে, আর যা তার গাছের তক্তাগুলি আগুনে সেঁকে প্রয়োজন মতো বাঁকানো হয়েছে, তারপর ঘনঘন পাতলা লোহার পাত এঁটে একখানার সঙ্গে আরেক খানা এত নিখুঁত ভাবে জোড়া লাগানো হয়েছে যে, তার ফাঁক দিয়ে এক ফোঁটাও জল ঢুকতে পারে না—না এগুলো সে নৌকা নয়। দশ বারো হাত লম্বা একটা তাল গাছের টুকরোকে লম্বালম্বি আধখানা করে, চিরে, দুই প্রান্তের খানিকটে বাদ দিয়ে ভেতরের নরম অংশ কুরে ফেলে দেয়া হয়েছে। বসবার জন্য অবশ্য পাটাতনের ব্যবস্থা আছে।

রবীন বাবুর স্ত্রী বর্ষাকালে জলে ভোবা বিক্রমপুর দেখেছেন, কিন্তু আত্রেয়ী ও আমার ছেলে মেয়েরা, যদিও কেউ জিজ্ঞেস করলেই সগর্বে উত্তর দেয়, আমাদের দেশ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, জীবনে দেখিনি সে দেশ। তাই নৌকায় কিম্ভূত চেহারা দেখে ওরা ভীষণ হাসাহাসি করতে লাগল, তারপর অসাবধানে উঠতে গিয়েই দোলানীতে পড়তে পড়তে সামলে নিল।

রবীনবাবু আবার হাসতে হাসতে স্মরণ করলেন জল বেশী নয়।

ওপারে নেমে আধমাইল খানেক এগোতে দেখা গেল, সেই দোতালার বারান্দার রেলিং ধরে এদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছেন একটি ভদ্রলোক। রবীনবাবু বললেন, উনি এই বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি, শিবপ্রসাদ ঘোষ। যতই এগোতে লাগলাম, ততই সবার আগে চোখ টানতে লাগল, ঘোষের সারা মাথা জুড়ে টাক, ঠিক সারা মাথা নয়, একেবারে নীচের দিকে ইঞ্চি দুই চওড়া ছোট ছোট করে কাটা চুলের রেখা। সকালের রোদ চকচক করছে সেই টাকে। আরও কাছে যেতে দেখলাম, ঘোষ একখানা ধুতি দো-ফেরতা করে লুঙ্গীর মত

পুরেছেন, গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, গেঞ্জির নীচে মাঝারি সাইজের ভুঁড়ি মাথা উঁচু করে রয়েছে।

ঘোষ এবার নীচে নেমে এলেন, এগিয়ে আসতে আসতে হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসেন, আসেন মিঃ গাঙ্গুলী। আপনাগো লইগা আমি পালি ঘর আর বারান্দা বারান্দা আর ঘর করতে আছি সেই সকাল আটটা বিকা বয়টা যখন যাইয়া গেল, ভাবলাম, আউজগাও রবী বুঝি ফাঁকি দিল, আসল না। আসেন, আসেন, লন, উপুরে যাই।

দোতলার বাইরের ঘরে গিয়ে বসলাম সবাই। সাজানো ঘর। সোফা, টিপয়, ফুলদানি, রেডিয়ো, বুক কেস, পেতলের নটরাজ মূর্তি। একটু পরই ঘোষ গিন্নী প্রবেশ করলেন, নমস্কার প্রতি-নমস্কার হল, দেখলাম, শারীরিক বিবর্তনে স্বামীর সঙ্গে একেবারে নেক-টু-নেক না হলেও খুব কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করছেন, সদা হাস্যময়ী আর ঘোষেরই মত পুরো বাঙাল ভাষায় কথা বলেন। একটু পর ছেলেমেয়ে ও দুই গিন্নীকে নিয়ে তিনি ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। রইলাম আমরা তিনজন।

চাকুরেরা এক জায়গায় জড়ো হলেই, আমি দেখেছি মহা উৎসাহে চাকরি-বাকরীর গল্প সুরু করে দেয়, ইঞ্জিনীয়াররা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর গল্প, ডাক্তাররা ডাক্তারীর গল্প, আর সব চাকরিতেই ওপরওয়ালা আছেই আর আছে ডিপার্টমেণ্ট, সুতরাং ওপরওয়ালার কর্মপটুতা বা পঙ্গু পাণ্ডিত্য এবং ডিপার্টমেণ্টের ত্রুটিপূর্ণ প্ল্যান, প্ল্যান কার্যকরী করিতে গিয়ে গড়িমসি, গড়িমসির ফলে অর্থের অপব্যয় এমনি সব মুখরোচক বিষয়ে আলোচনা, মন্তব্য ও প্রতি-মন্তব্য এসে যাবেই এবং কণ্ঠস্বর অপ্রতিরোধ্য আবেগে উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠে যাবেই ভর ভর করে, দুনিয়া তখন রসাতলে গেলেও হুঁস হবেনা কারুর—কিন্তু না, শিব প্রসাদ ঘোষকে দেখলাম আনন্দকর ব্যতিক্রম। আমাদের তিনজনেরই দেশ ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায়, সেখানে ছিল আহার ও নিশ্চিন্ত জীবনের প্রাচুর্য। ঘোষ সেই সব কথাই বলতে লাগলেন। সেই ফেলে-আসা দেশের গল্প, ছায়ায় ঢাকা, পাখী ডাকা গ্রাম, অবারিত মাঠে সবুজ ফসলের ওপর দিয়ে দিয়ে হাওয়ার মাতামাতি খালের নীচে নীচে পায়ে-চলা সরু পথ, গাছে গাছে আম কাঁঠাল পেয়ারা, নারকেল, সুপুর, খড়ের চালে বাঁশের মাচায় লাউ কুমড়ো শশা ও ঝিঙের লতা, খালে ও বিলে পাল তোলা নৌকা জেলে ডিঙ্গির খোল ভর্তি টগবগ করে লাফানো মাছ আর গ্রামের পথে পথে স্বর্গীয় সরলতার প্রতিমূর্তি গ্রামের মানুষ, যারা শহর দেখিনি বলে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়, তারা শহর দেখতে চায় না, বাপ ঠাকুরদা যে চালের নীচে যে দাওয়ায় বসে শামলী গাইকে হাতে ধরে ঘাস খাইয়েছেন, যে পুকুর ঘাটে দাঁড়িয়ে ছাঁকা জাল দিয়ে মাছ ধরিয়েছেন যে পূজামণ্ডপে খানাদে কদমের আসনে বসে চণ্ডীপাঠ শুনেছেন, অবশেষে পরিণত বয়সে যে শ্মশানে ভস্ম হয়ে পঞ্চভূতে মিলিয়ে গেলেন, সেই গ্রামকেই তারা মনে করে স্বর্গ, স্বর্গ থেকেও গরীয়ান, মহীয়ান, কেদার বদরি হরিদ্বার বারাণসীর আকর্ষণ তারা অনুভব করে না।

বলতে বলতে যেন অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন ঘোষ, বলেন, আরে মশায়, আমার বনমালী কাকারে দেখছি, খাওয়া হইয়া গেছে, সকলে উঠতে যাইব, এমন সময় ওরুচরণ বাড়ৈয়া ঠাট্টা কইয়া কইল কি, কি বনমালী, ক্ষীর খাইলা না আজগা? কাকা কইল, খাইলাম ত। বাড়ৈয়া কইল, কৈ খাইলা? ওরে খাওন কয় নাকি? এক পাতিল খাইবা, তবে হান খাওন হইব। কাকা আবার বইসা পড়ল। বাড়ৈয়া ত জানে না কাকা কতখানি খাইতে পারে। কাকা কইল, প্যাটটা ভইরা গেছে, আউজগা বোধহয় বেশী পারুম না। তারপর, বোধহেন মিঃ গাঙ্গুলী, এক পাতিল ক্ষীর আনা হইল আর ভাখলাম, সেই দুই সেরি পাতিলটা পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই একেবারে ঠকঠকাইতে লাগল। তখন, বোধহেন মিঃ গাঙ্গুলী, যেমন আছিল মানুষের খাদ্য, তেমন পারত খাইতে। কেউ খাইতে পারে শোনলে আমাগো গাশে লোকে আনন্দ কইরা খাওয়াইত।—ইস, কি স্বাদই ছাড়তে হয়েছে!

ঘোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, তারপর বলতে

লাগলেন সেই সোনার দেশের বাপঠাকুরদার ভিটে ছেড়ে এক যন্ত্রে চলে আসার করুণ কাহিনী।

হঠাৎ একটি ফ্রক পরা মেয়ে, বারো তেরো বছর বয়স হবে, হয়ত ঘোষেরই মেয়ে, একখানা ট্রের উপর তিন কাপ চা আর তিনখানা প্লেট নিয়ে প্রবেশ করল। সবিস্ময়ে দেখলাম, প্লেটের ওপর আধ হাত খানেক লম্বা এক-একটি আস্ত কাতলা মাছ ভাজা! কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করবার আর সুযোগ পাওয়া গেল না, ঘোষ হেসে বললেন, নেও রবী, তুমি গল্প করছিলা গরম গরম চায়ের লগে কড়া কইরা ভাজা গরম গরম কাতলা ভাজা চমৎকার, জলপাই-গুড়ী আইসা আর খাইতে পাওনা, নেও, তাই করছে গিন্নী—ব্রেকফাষ্ট।

বলে উঠলাম, সে কি মিঃ ঘোষ, বেলা দশটায় ব্রেকফাষ্ট আর তাও আস্ত কাতলা দিয়ে!

থামতেই আত্তা, ঘোষ বললেন, প্যাট চিরা নাড়িভুড়ি বাহির কইরা ফালাইয়া এমন কড়া কইরা ভাজছে না যে, একেবারে ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের মতন লাগব, মুখে দিয়া মুড়মুড়াইয়া খান, একেবারে গুড়া হইয়া যাইব।

বলে হেসে উঠলেন, তারপর ট্রে থেকে চা ও প্লেট তুলে পাশে পাশে ছোট টিপয়ের ওপর রাখলেন, মেয়েটিকে বললেন, দীপা রে, এক গ্লাস কইরা জল দিয়া যা আর তর মায়েরে ক, একটা কইরা রাজভোগ পাঠাইয়া দিক—দুইটা লইয়া আয়।

রবীনবাবু ও আমি দুজনেই বাধা দিতে গেলাম, ঘোষ কর্ণপাত দিলেন না।

জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মিঃ ঘোষ, আপনি-কি ডি. সি-র সঙ্গেই এমনি চাকায় তাবার কথা বলেন নাকি, না এমুন-গেমুন বলেন?

কমান, তা কমু কমান, হেঁস করে উঠলেন ঘোষ, আরে স্বাধীন হওনের আগে ওনারা যখন বরিশাল বা ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, মিশতিলেন তখন সেইখানকার ভাষা? এবার ত পশ্চিম বঙ্গের এমুন খেদুমটে চালাইয়া আসছেন, আমি তাইলে ডাংগের ডাক ছাড়ুম ক্যান? আমি ক্যান পূর্ব বঙ্গের আইল্যা খাইলাম কমুনা!

সবাই হেসে উঠলাম।

বেলা সাড়ে দশটায় ব্রেকফাষ্ট খেয়ে, বিশেষ করে গোটা কাতলা মুড়ির মত কুড়মুড় করে খেয়ে, ভাবলাম, দুপুরবেলা বিশেষ কিছু আর চালানো যাবে না। কিন্তু দেখা গেল, ঘোষের বাড়ীতে, অন্ততঃ খাওয়াবার ব্যাপারে দুপুর ঠিক দুপুর নয়, অপরাহ্ণ তিনটেতে আমাদের আহারের ডাক পড়ল। স্নান করবার জন্য অবশ্য ঘোষ ও ঘোষ-গিন্নী পিড়াপিড়ি করেছিলেন, কিন্তু আমরা সবাই সে কাজটি সেরেই এসেছিলাম।

নীচে একটু দূরে রান্নাঘর, মাটির মেঝে, টিনের চাল, কাঠের ফ্রেমে আঁটা মুলি বাঁশের বেড়া। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, রান্নাঘরে কয়েকজন লোকের তৎপরতা। ওরাই নিশ্চয়ই যাত্রা করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মিঃ ঘোষ, আপনার রান্নাঘরে মুলি বাঁশের বেড়া দেখছি, জলপাইগুড়ীতে কি মুলী বাঁশ পাওয়া যায়? আর এখানকার লোক সেই বাঁশের পাতলা পিঠ দিয়ে প্যাটির মত বুনে বেড়া তৈরী করতে পারে কি?

হেসে উঠলেন ঘোষ, বললেন, বাঁশ পাওয়া যায় শহর থিকা ঘুরে গ্রামের মধ্যে। এ স্থানে কয় ভায়া বাঁশী কিন্তু ঐ বাঁশের ইউটিলিটি বিশেষ জানত না, লাউকুমড়ার মাচার উপুর লাগাইত। তারপর, বোঝছেন মিঃ গাঙ্গুলী, পিল পিল কইরা যেই ইষ্ট বাঙ্গলের মানুষ আইসা পড়ল না, ব্যাস, সুরু হইয়া গেল নয়া ইন্ডাষ্ট্রি, মুলি বাঁশের বেড়া তৈয়ারী। বাঙ্গাল পাড়ার দিকে গেছেন? ওদিকে গেলেই দেখবেন, খালি টালির চাল আর মুলি বাঁশের বেড়া। তবে আমার এই বেড়া কিন্তু সেইখানে থিকা আনি নাই, খালি বাঁশ কিনা আনছি, তারপর এই চরের মানুষদের নিজের হাতে ধইরা শিখাইয়া দিছি। আগে আছিল টিনের বেড়া, কন ত, রান্নাঘরে টিনের চালের নীচে যদি আবার টিনের বেড়া হয়; তাইলে গরমে সিদ্ধ হইতে হইবে না? আমি টিন দুইলা ফালাইয়া বেড়া

পাশাইছি।—নন যাই, চল রবী, খাইতে বসি। চরে বাকি, কি আর খাওয়াইতে পারব—

পাশের ঘরে আমাদের তিনজনের আসন পড়েছে আর কলরবে বুঝলাম, ও পাশের ঘরে বসেছে গিন্নীরা আর ছেলে মেয়েরা। ওদের সমস্বরে হৈ হল্লার মধ্যে আত্রেয়ীর একটি প্রশ্ন কানে এল, মিসেস ঘোষ, এগুলো আমাদের খেতে দিয়েছেন, না ছাঁদা বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য?

ঘোষ গিন্নীর জবাবটাও কানে এল, হঃ, এই চুপা ভাইল ভাত আবার বাইন্ধা লইয়া যাইবেন না. কোনরকমে প্যাট ভরতে পারলেই যথেষ্ট।

ওঘরে সমবেত কণ্ঠে হাসি শোনা গেল এবং এঘরে আমি আহার্য সম্ভারের প্রতি সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম না. দরকি একেবারে নেই, শাক, সেওনডাঙা, কোন চচ্চরি বা তরকারি, এমন কি, আলু ফুলকপির ডালনাও নেই। আছে শুধু একটি চুপা, একেবারে দ্বিতীয়ম, তার নাম, বুঝলে। খুব কড়া করে ভাজা ছোট ছোট পুঁটি মাছ আর চিংড়ি মাছ যেন পটেটো চিপস আর ভালমুট। ওকনো খেতে হবে না, পাশেই ক্ষীরের মত মুগ ডালের বাটিতে অর্ধমাজিত দেখতে পেলাম, আস্ত কই মাছের মাথা। দেখতে পেলাম, কালজিরে আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পাতলা-ঝোল রাঁধা মাছ, কই মাছের কালিয়া, সরষে বাটা দিয়ে ঝোরাল মাছ, সেই হলদিবাড়ী হাটের আধ হাত লম্বা ও তেমনি চওড়া কৈ মাছের পাতুরি, তারপর গলদা চিংড়ীর মালাই কারি, তারপর চাকা চাকা করে কাটা শোল মাছের ঘন্ট, তারপর দই-ইলিশ এবং তারও পরে মৌরলা মাছের চাটনি।

হেসে বললাম, মিঃ ঘোষ, সবই নিখুঁত করেছেন, তবে সত্যি, একটা খুঁত রয়ে গেছে। এই চুপা ভাইল ভাতের পর পাশেই রাখা উচিৎ ছিল এক কৌটো করে ভাদুর লবণ আর পাশের ঘরে স্টেথেসকোপ আর ওষুধের ব্যাগ নিয়ে প্রস্তুত একজন হাতযশওয়ালা ডাক্তার।

কি যে কন মিঃ গাঙ্গুলী ঘোষ হা হা করে হেসে উঠলেন।

রবীনবাবু বললেন, আপনি না হয় মন্যাট, বয়স্কালী কাকার যোগ্য ভাইপো, আমরা ত তা নই—

রাখ, রাখ, বাধা দিলেন ঘোষ, বয়সের কালে আমরাও কম আছিলাম না আর তোমাগো বয়সেও আমি তিন সেরি পাঁঠা একলার মতন খাইয়া কালাইছি। বেন, শুরু করেন মিঃ গাঙ্গুলী, রবীর কথায় কান দিয়েন না।

ঘোষ দেখলাম মিছে কথা বলেন নি। শুধু যে বাটিগুলোই একে একে রিক্ত হয়ে থোলার মত পড়ে থাকছে, তা নয়, ভাতের পাহাড়ও ক্রত ধসে পড়ছে এবং মুহূর্তে ঘোষের ভাতৃ গেঞ্জির আড়ালে সেই অতলস্পর্শী গহ্বরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে, রবীনবাবু যেন, ঘোষ হয় তাঁর চাইতেও কম বয়সে আটকে রয়েছেন ঘোষ আমার অবশ্য খাওয়াতে খুব বেশনায় ছিল না আর সেই পঞ্চাশ বছর বয়সেও যারা অটুট ছিল ফলসাইগুড়িতে আসবার পর থেকে মাছের মুখ যে কেন কম দেখতে পাচ্ছি তাই নয়, যাদের পাচ্ছি, আমরা, চাকুরেরা, তাদের হাত মাড়াতে পারছি না। সেই শুকনো মাড়াতে যদি এমনি অকস্মাৎ একদিন প্রোটিনের ঢল নামিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে ফলাফল তার ভাল হবে কি?

রবীনবাবু গোটাতিনেক বাটি একেবারে সাফ করলেন না কিছুতেই আর আমি মরিয়া হয়ে ভাতের পাহাড়ে সামান্য আনাগোনা করে শুধু মাছগুলোই খেলাম। কিন্তু মৌরলার চাটনি খেতে না খেতেই এসে গেল এক বাটি করে ঘন পায়েস আর একখানা চায়ের ডিসে দুটো কমলাভোগ, দুটো সন্দেশ।

রবীনবাবু চীৎকার করে উঠলেন, আরে মশাই, করেছেন কি? আপনার উদ্দেশ্য কি আমাদের হত্যা করা?

ঘোষ বললেন, শোনেন, শোনেন রবীর কথা মিঃ গাঙ্গুলী। এতগুলা ঝাল ঝোল আর টক খাইয়া তারে মিষ্টান্ন আর চুপা মিষ্টি না খাইলে মুখটা কখনো ভাল লাগে? বেশী ইয়ারকি মাইর না রবী, মাছের বাটির মতন সরাইয়া রাখলে ছাড়ুম না, বরং যদি একান্তই না পার, কমাইয়া দিতেছি—ভজন, এক কাম কর, মিষ্টান্নই

যায়েরে কও কমাইয়া দিতে আর একটা কমলাভোগ আর একটা সন্দেশ তুইলা লইয়া যা।

যতীনই পরিবেশন করছিল। ঘোষের কথামত সে রবীনবাবুর পাতের ও মিষ্টি কমিয়ে নিয়ে এল।

আমাদের আহারপর্ব যখন শেষ হল, তখন সাড়ে চারটে বেজে গেছে।

বসবার ঘরে এসে বসতেই ঘোষ চীৎকার করে যতীনকে ডাকলেন। যতীন ওপরে উঠে আসতেই বললেন, শোন, যা আছে, তোমরা সকলে ভাগ-যোগ কইরা খাইয়া ফ্যালাও। ঐবেলার লইগা কিছু রাখতে হইব না। যতীন চলে যাচ্ছিল, ডেকে বললেন, একটা মানুষও যেন বাদ না পড়ে আর না কম খায়; যারা মাছ আইনা দিছে, হরিপদ, কানাই, বরকৎ, আধাক্ষ ভাইলা আর তার লগের দুই জন, আরও যদি কেউ থাকে, সকলেরে খাওয়াইয়া দাও। মাথা নেড়ে যতীন চলে যাচ্ছিল, আবার ডাকলেন, আর শোন, তাতে যদি কম পড়ে, বসাইয়া দাও এক চড়া, ওরা সকলে খাটছে পিটছে, একটা মানুষও যান কম না খাইয়া যায়, বোঝছ?

যতীন মাথা নেড়ে নীচে চলে গেল।

এই ভীমসেনী রন্ধনালীর পিকনিক সেরে আমরা যখন বাড়ীতে ফিরে এলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রবীনবাবু বললেন, বাড়ীতে গিয়েই এক শিশি কারমিনেটিভ খেতে হবে, দেখি, তাতে যদি সামাল দিতে পারি।

ঠিক এর দুদিন পর সকালে অফিসে আসতেই জেলার কর্মী ঘোষাল এসে স্যালুট করলেন, তারপর হাসিমুখে বললেন, খৈনি গেজেট এবার খুব একটা ভাল খবর পরিবেশন করেছে স্যার। আপনি শীগগিরই দমদম বদলি হচ্ছেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে, কারণ ওখানকার সুপার ডাক্তার গোস্বামী পরশু অকটোবর রিটায়ার করছেন।

বললাম, ওসব গুজবে কাণ দেবেন না। আমাদের আই জি-র মতনই ডাক্তার গোস্বামী বার কয়েক এক্সটেনশন পেয়েছেন। আই জি-ই ওকে বলে-করে হাওড়ার চীফ মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি থেকে এনেছেন এই আশ্বাস দিয়ে যে তিনি যতদিন এক্সটেনসন পাবেন, গোস্বামীও যাতে ততদিন পান, তার ব্যবস্থা করবেন। আই জি ত আবার পেয়ে গেছেন, সুতরাং গোস্বামী পরশু অকটোবর যাচ্ছেন না, নিশ্চিন্ত থাকুন। আর যদি সত্যিই এবার যান, তাহলেও আমার চাইতে অনেক সিনিয়র কত ডিস্ট্রিক্ট জেল সুপার আছেন, তাঁদের কেউ প্রমোশন না পেয়ে—

না স্যার, যারা ছিলেন জেলার, চাকরিতে বছরের হিসেবে তাঁরা সিনিয়র হলে কি হবে, আপনি হচ্ছেন ডাইরেক্ট রিক্রুট, গভর্ণমেণ্ট আপনাকেই প্রথম সরাসরি ডিস্ট্রিক্ট সুপার নিয়োগ করেছেন, কাজে কাজেই আপনাকে ওঁরা সুপারসিড করতে পারবেন না। তাই নিয়ম—

তাই বলে পঁচিশ বছরের চাকুরেরা পড়ে থাকবেন আর আমার চাকরি মাত্র সাড়ে তিন বছরের, আমি বললাম না না, আপনার ধারণা ঠিক নয়।

জেলার আবার হাসলেন, বললেন, আমি জানি স্যার। ডিসট্রিক্ট সুপার হিসেবে আপনার চাইতে সিনিয়র দুজন আছেন। কাশীনাথ দাশগুপ্ত, তিনি এখন বহরমপুরের সুপার আর আছেন শান্তিপ্রিয় ঘোষ মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে। সুতরাং দমদমে আপনাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যেতে পারে না। এবার খৈনি গেজেট সত্যি খবরই সংগ্রহ করেছে স্যার।

জেলার যতই আশান্বিত হন না কেন, এই উড়ো খবরে আমি কান দিলাম না! যে ইনসপেকটর জেনারেল অব প্রিজন্স-এর সুপারিশে মন্ত্রী মহোদয় (তখনওবড় 'মহোদয়া, কারণ তখন কারামন্ত্রী ছিলেন পূরবী মুখোপাধ্যায়) এই জাতীয় প্রমোশন দিয়ে থাকেন, প্রমোশনের অর্ডারে অবশ্য প্রচলিত গৎটি দিয়েই শুরু হয়, The Governor is pleased to···· ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু সেই আই জি সাহেবের সঙ্গেই যে আমার খটাখটি লেগেই আছে এটা-ওটা-সেটা নিয়ে সেই ১৯৪৮ যেদিন তিনি আই জি-র গদিতে বসেছেন বলা যায়, প্রায় সেদিন থেকেই। অধস্তন কর্মচারী, তা তিনি যত, বড় পোষ্টেই থাকুন না কেন, তাঁকে যেকি চোখে দেখেন তিনি, তা আর আমার জানতে বাকি নেই! স্রেফ বিনা কারণে, শুধু তাঁর নিয়োজিত-

ডিপার্টমেন্টাল গুপ্তচরের মুখে শুনে অথবা একখানা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বেনামী চিঠির বক্তব্য সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত না করেই তিনি যে কত যোগ্য লোকের প্রমোশন আটকে রেখেছেন এবং যে-হুকুমকে ঠেলে উপরে তুলে দিয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। তথাপি, আমার মত সাড়ে তিন বছরের চাকরেকে, সেণ্ট্রাল জেলের ডেপুটি সুপারের অভিজ্ঞতা যার মাত্র দু'বৎসর আর ডিসট্রিক্ট জেলের সুপারের অভিজ্ঞতা মাত্র দেড় বৎসরের, তাকে এত তাড়াতাড়ি একেবারে সেণ্ট্রাল জেলের সুপারের পদে কেন, কোন, বিশেষ কারণে প্রমোশন দেবেন, বুঝতেই পারলাম না!

বড় মেয়ে বুলবুল জলপাইগুড়ী থেকে প্রি-ইউনিভারসিটি পাশ করে কলকাতা গিয়ে স্কটিস চার্চ কলেজে কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে বি-এস-সি-তে ভর্ত্তি হয়েছে, তার জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু আর দুতিন মাস পরেই মেজুলের ক্লাস সেভেন ক্লাস সিক্স-এর এন্যুয়েল পরীক্ষা। যদিই-বা অসম্ভব সম্ভব হয়ে পড়ে, এই মুহূর্ত্তে আমার জলপাইগুড়ি ছাড়তে হয়, তাহলে ওদের পড়া নিয়ে ভারী অসুবিধায় পড়তে হবে।

জলপাইগুড়ি জেলের ছাত্রদের মধ্যে ঝগড়া, কোন্দল ও রেষারেষি দূরীভূত করে এখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গভর্ণমেন্ট আমায় এখানে পাঠিয়েছিলেন, সে উদ্দেশ্য এরই মধ্যে সফল করতে পেরেছি কি না, সে বিচার করবেন গভর্ণমেন্ট, তবে প্রশাসনিক উন্নতি যে বেশ খানিকটা করতে পেরেছি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। খাতাপত্র পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে ১৯৫৯ সালে, অর্থাৎ আমি আসবার আগের বছরে জেলের বাগানে উৎপন্ন সবজিতে বন্দীদের চলেছিল মাত্র প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস, আর ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে আমি এসেই অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত কোনো সবজি কিনিনি। এখন ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর চলছে, বন্দীদের সংখ্যাও বেড়ে গেছে, আশা করা যায়, এ বছর হয়ত সবজি আর কিনতেই হবে না। তার ওপর এই জেলের ইতিহাসে এই প্রথম জেলের বাগানের সবজি জনসাধারণের কাছে বিক্রি করা হয়েছে এবং পাওয়া গেছে প্রায় পাঁচশো টাকা।

১৯৫৮ সালে শিল্প বিভাগে লাভের পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন হাজার টাকার কাছাকাছি, ১৯৬১ সাল শেষ হতে হতে মনে হচ্ছে লাভের অঙ্ক পাঁচ হাজার ছাড়িয়ে যাবে।

হঠাৎ জেল কোডের ২৮ ধারার কথা মনে পড়ে গেল, যাতে বলা হয়েছে যে জেল ডিপার্টমেন্টের যদি কোন কর্ম্মি অত্যন্ত প্রশংসনীয় কোন কাজ করেছে বলে মনে হয়, তাহলে আই. জি তাকে পাঁচশো টাকা পর্য্যন্ত রিওয়ার্ড দিতে পারেন।

আমার জলপাইগুড়ির কাজ কি প্রশংসনীয় হয়নি?

ভাবলাম, দিই না একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে আই জি-র কাছে: কপি দিতে হবে ডি সি-কে।

তৎক্ষণাৎ পরামর্শ করবার জন্য গেলাম ডেপুটি কমিশনার কে ডি বসুর কাছে

সব শুনে বোস খুব উৎসাহ দিলেন, বললেন, করুন না দরখাস্ত, আমিও খুব highly recommend করে পাঠাবো।

উঠতে যাব, এমন সময় বললেন, আপনি ত বোধহয় ট্র্যান্সফার হয়ে যাচ্ছেন, মিঃ গাঙ্গুলী।

চমকে উঠলাম, সে কি! কোথায়?

কোথায় ঠিক বলতে পারব না, বোস বললেন, তবে কোন সেনট্রাল জেলে নিশ্চয়ই। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি করে খবর পেলেন?

বোস হেসে বললেন, আপনার আই জি আপনার জেল ইনস্পেকশনের পর আমায় এখানে এসেছিলেন। আপনার কাজকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, গাঙ্গুলীকে সেনট্রাল জেলের সুপারের পোষ্টে প্রমোশন দেয়া সম্বন্ধে আপনার কি মত? আমি রেকমেণ্ড করেছি।

বাড়ীতে ফিরে এলাম। আত্রেয়ীকে তখনও কিছু বললাম না। বুঝতে পারলাম, খৈনি গেজেটের গাঁজা খবর বলে উড়িয়ে দেয়া যাবে না জলপাইগুড়ি আমায় ছাড়তে হবে

বদলির চাকরিতে বদলি থাকবেই, সে ত জানা কথা। নতুন নতুন জায়গায় নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হবে, বন্ধুতা হবে, কেউ কেউ হয়ত সারা জীবনের মত বন্ধুও হয়ে যাবেন, হঠাৎ ভাবলে মনে হবে এ এক মোহাচ্ছন্ন মিষ্টি অভিজ্ঞতা, এ এক আনন্দময় পরিক্রমা। কিন্তু হঠাৎ মনে হল, জলপাইগুড়িকে যেন আমি ভালবেসে ফেলেছি, জলপাইগুড়িকে ছাড়তে হবে মনে হলে অন্তরের কোথায় যেন একটা কাটা বেঁধে।

সেইদিনই সন্ধ্যার পর এলেন বাবুপাড়া পাঠাগারের সেক্রেটারী সুনীল পাল আর আরতি গুহ। যতদূর মনে পড়ে, তখন বোধহয় উনি পাঠাগারের ভাইস প্রেসিডেন্ট, সংস্কৃতিক বিভাগের অধিকর্ত্রী, নাট্য পরিচালিকা, পাঠাগারের কর্ণধারিণী এ্যাণ্ড হোয়াট নট। এসেই তাঁরা জানালেন যে, পূজোর পরেই আর্থ নাট্য সমাজ হল-এ বাবুপাড়া পাঠাগার যে নাটানুষ্ঠানের প্রোগ্রাম নিয়েছে, সেই নাটকের শুধু পরিচালনার ভার নিলেই চলবে না, এবার নাটকে অংশ গ্রহণও করতে হবে অভিনেতা রূপে। বললেন, আমরা আপনার পরিচালনা দেখেছি, এবার আপনার অভিনয় দেখব ও দেখাব।

সুনীলবাবু বললেন, পূজো ত এসে গেল, পূজোর পরই হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে হোব সুতরাং কি নাটক করা যেতে পারে, তা স্থির করবার জন্য দুচার দিনের মধ্যেই আমরা আলোচনায় বসব, কেমন মিঃ গাঙ্গুলী?

হেসে বললাম, সরকারী কর্মচারী হয়ে অভিনয়ে নামতে পারব কি না—

বাধা দিলেন আরতি গুহ, আমিও ত সরকারী কর্মচারী, আমি যদি এদের পাল্লায় পড়ে ষ্টেজে নামতে পারি, তাহলে আপনিও পারবেন। না হয় ডি সি-কে একটু বলে নেবেন। চমৎকার মানুষ ডি সি, আমরাই না হয় যাব ওঁর কাছে।

ভাবলাম, ডি সি আমার বদলি হয়ে যাবার সম্ভাবনার কথাটা যদি বলে দেন? নিশ্চিত না হয়ে ওটা প্রকাশিত হওয়া ঠিক নয়। এরা জানলেই মুহূর্তে শহরশুদ্ধ সবাই জেনে যাবে। তাই বললাম, আপনাদের যাবার দরকার কি? আমিই এক সময় বলব'খন।

আত্রেয়ী চা নিয়ে এল। গল্প আরও জমে উঠল এবং আরতি গুহ এলেই যা হয়ে থাকে, ওঁরা বিদায় নিলেন, তখন রাত এগারোটা।

কয়েকদিন পর ভবানীবাবুর আবির্ভাব। জেনে ফেলেছেন নাকি? দেখলাম, না, তিনি এখনও অন্ধকারেই আছেন।

এসেই গর্বের সঙ্গে বললেন যে, বাড়ীর ছাদ হয়ে গেছে, প্লাষ্টারিং চলছে, জানালা দরজার পাট তৈরী হয়ে গেছে, শুধু লাগানো বাকি. প্লাষ্টারিং শুরু হবে কাল থেকেই, তারপরই ইলেকট্রিসিটি এবং তারপরই, হাসতে হাসতে বললেন, ডাইনিং স্পেসে সবাই মিলে বসে পোলাউ আর মাংস। সুতরাং সেই আনন্দের কথা স্মরণ রেখেই একটা আনন্দদায়ক প্রস্তাব করলেন, চলুন, দার্জিলিং ঘুরে আসি সবাই মিলে।

দার্জিলিং!

কেন নয়? জোর দিয়ে বললেন, এত কাছে এসে গেছেন যখন, তখন আপত্তি কেন! যেদিন পৌঁছাব, তারপর দুদিন থাকব, বাড়ী ফিরে চলে আসব!

প্রস্তাবটা কিন্তু আমার ভালই লাগল। আত্রেয়ী ও ছেলেমেয়েরা কেউ দেখেনি। আমি একবার মাত্র গিয়েছিলাম সেই ১৯৪৩ সালে ডুয়ার্সের মেটেলিতে ব্যাংকে চাকরি করবার সময়। ডিসেম্বর মাসে এল এক বন্ধু এল কলকাতা থেকে মেটেলিতে, এসেই বলল, অফিসের কাজে দার্জিলিং যাব, তুমিও চল। ডিসেম্বরে দার্জিলিং? না ঠেকলে কেউ বেড়াতে যায়? কিন্তু বন্ধু নাছোড়বান্দা। সুতরাং সেই ডিসেম্বরেই যেতে হল। ফলে, দুদিন ছিলাম, জল-জমানো হাড়-কাঁপানো শীতে কোথাও বেরুতে পারিনি, সারাদিন জানালা দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকতাম আর রাত্রে পুলওভার, দুটো করে মোজা এবং আপাদমস্তক লেপ ঢাকা দিয়েও সারারাত হিটার জ্বালিয়ে রাখতে হত। এখন সেপ্টেম্বর মাস, সীজন এখনও

পুরোপুরি মুক্ত হয়নি, সুতরাং জেলে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে আসা যায়।

রাজী হয়ে গেলাম। ভাবলাম, হঠাৎ যদি ট্রান্সফার অর্ডার এসে যায়, তাহলে হয়ত আর যাওয়াই হবে না।

ডি সি-কে জানিয়ে দু দিনের ছুটি নিলাম। ছুটি দেবার মালিক অবশ্য আই জি, ক্যান্টুমেন্ট লিভের দরখাস্ত তাঁকেই পাঠাতে হয়, তবু ষ্টেশন ছেড়ে গেলে ডি সি-কে জানিয়ে যেতে হয়, ডিসট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার বা ডি সি অথবা তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ কোন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট জেলের চার্জে থাকবেন।

রবীনবাবুর পরিবারের সবাই আর আত্রেয়ী, মেঘুল, লুডু, রবীনবাবু ও আমি রওনা হলাম।

দু একটা হোটেলে স্থান পাওয়া গেল না, অবশেষে গিয়ে উঠলাম মো ভিউ হোটেলে।

উঠেই থমকে উঠল বুকটা।

অনেক দিন আগেকার অবিস্মরণীয় একটি ঘটনার কথা আবার নতুন করে মনে পড়ে গেল। এটা কোন সাল? ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর। সাতাশ বছর আগে ১৯৩৪ সালের ৪ মে এই মো ভিউ হোটেলেই এসে উঠেছিল একটি কিশোর ও একটি কিশোরী, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আর উজ্জ্বলা মজুমদার। ওদের সঙ্গে ছিল একটি হারমোনিয়াম, তার খোলের মধ্যে রিভলভার।

সেদিন এই শহরে এসেছিল আরও দুটি কিশোর, ভবানী ভট্টাচার্য্য আর রবী বন্দ্যোপাধ্যায়। তারা উঠেছিল দুইস ডুবিলী ডাবাটোরিয়ামে।

কিন্তু এই হোটেলের কোন ঘরে উঠেছিল মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা? আমাদেরই এই ঘরে? না পাশের ঘরে? না কি পেছন দিককার কোন ঘরে? এক তলায়, না দোতলায়? জিজ্ঞেস করব নাকি ম্যানেজারকে? সাতাশ বছর আগেকার ম্যানেজারই কি আছে এখনও?

কি জিজ্ঞেনবাবু, রবীনবাবু বলে উঠলেন, চান-টান করে নিন, একটু বিশ্রাম করে বিকেলেই বেরোব আমরা। আরে মশাই, জানালা দিয়ে কি আর ল্যাচারাল সিনারি দেখবেন? একেবারে জায়গামত নিয়ে যাব।

খানাপিনার পরে বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু ওদের মত আমার ঘুম এল না। মনের মধ্যে সেই সব পুরোনো কথা ঘুরপাক খেতে লাগল।

ওরা ছিল বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স নামীয় গুপ্ত বিপ্লবী দলের সদস্য, যে দলটি বি ভি নামেই খ্যাত। একদা আমিও সেই দলের কর্মী ছিলাম। এই বি ভি দলের কর্মীরা বিনয় বোস পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল সোম্যানকে হত্যা করেছিল ঢাকা শহরে, আবার এই বিনয়ই বাদল। ওরফে সুধীর গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দোতলায় পুলিশ দলের সঙ্গে চালিয়েছিল ঐতিহাসিক ব্যারাণ্ডা ব্যাটেল, খতম করেছিল পুলিশের ইনসপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে, যে দলের কর্মীরা পর পর তিন বছরে মেদিনীপুরের তিন-তিনটি সাহেব ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন, যে দলটির শহীদের তালিকা দীর্ঘ, বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে যে দলের কীর্তিকথা রক্তাক্ষরে লেখা আছে, সেই বি ভি দলই ১৯৩৪ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, 'ব্লাক এ্যাণ্ড ট্যান' নীতির প্রবর্তক অত্যাচারী গভর্ণর স্যার জন এ্যাণ্ডারসনকে শেষ করে দিতে হবে দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে। তাই এসেছিল ভবানী, রবী, মনোরঞ্জন আর উজ্জ্বলা।

বিকেলে সবাই উঠে রেডি হতেই বললাম, চলুন রবীনবাবু, লেবং ঘুরে আসি।

লেবং! রবীনবাবুর কণ্ঠে বিস্ময়, বলেন কি জিজ্ঞেস-বাবু? এত জায়গা থাকতে লেবং! কি দেখবেন সেখানে? একটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ, তাও এইটুকু, পৃথিবীর মধ্যে বোধহয় সব চাইতে ছোট রেস কোর্স, এখন রেস নেই, খালি পড়ে আছে। কিছু দেখবার নেই সেখানে। তার চাইতে আজ চলুন, ম্যালে যাই, তারপর তোর রাতে যাওয়া যাবে টাইগার হিলে, তারপর একে একে দেখা যাবে জুলজিক্যাল গার্ডেন, বোটানিক্যাল গার্ডেন, হিমালয়ান মাউণ্টেনিয়ারিং ই—

বাধা দিলাম, না না রবীনবাবু, সবার আগে চলুন লেবং-এ।

কি করে বোঝাব ওকে সবার আগে কেন লেবং যেতে চাই। বাইরে থেকে কেউ কলকাতা এলে সবার আগে কালিঘাট যাই কেন? কাশী গিয়ে প্রথমেই কেন যাই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে? ঠিক তেমনি লেবং আমার কাছে ভবানী মন্দির, সেখানকার ধুলোতে মিশে আছে আমার এককালের সহকর্মিদের তাজা রক্ত!

গিয়ে দেখতে পেলাম এখনও রয়েছে উঁচু খান-বাঁধানো সেই প্লাটফরম, গভর্নরের সিট, খান-বাঁধানো কয়েক ধাপ সিঁড়ি, চারিদিকে কোমর-সমান উঁচু পাঁচিল।

১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বরে যেন ফিরে এল ১৯৩৪ সালের ৭ মে। লোকারণ্য মাঠ। গভর্নর এ্যাণ্ডারসন বসে আছেন রাজা মহারাজা ও দর্শকদের মধ্যমণির মত।

গভর্নরের কাপ খেলা হবে, তাই ভিড় বেশী।

কেউ লক্ষ্য করল না, সাহেবি পোষাক পরা দুটি কমোর টিকিট কেটে ঢুকল এবং গভর্নরের দুদিকে নীচে দর্শকদের মধ্যে ভাল মানুষের মত আসন গ্রহণ করল।

গভর্নরের কাপ খেলা শেষ হল; গভর্নর উঠে দাঁড়ালেন।

পাঁচিলের ওপর হাত রেখে ভবানী গুলী করল, কিন্তু লাগল না এ্যাণ্ডারসনের গায়ে। পরের গুলীটা ছুটল না। ইতিমধ্যে এ্যাণ্ডারসনের গাড়িটা পর পর গুলী করেছে ভবানীকে লক্ষ্য করে। আহত ভবানী লুটিয়ে পড়ল। গল গল করে রক্ত বেরিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিল।

এবার রিভলভার বার করে এগিয়ে এল রবী, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল কয়েক ধাপ, মাত্র তিন হাত দূর থেকে গুলী করল।

কিন্তু এবারও বেঁচে গেল এ্যাণ্ডারসন। তার পি এ আহত হয়েছে।

ইত্যবসরে একজন সার্জেন্টের গুলী এসে লাগল রবীর শরীরে। সেও পড়ে গেল।

তারপর স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে শুরু হল ষড়যন্ত্র মামলা। মনোরঞ্জন, উজ্জ্বলা, মধুসূদন, সুকুমার, সুশীল, সবারই হল দীর্ঘ কারাদণ্ড, গভর্নর রবীর মৃত্যুদণ্ডও মকুব করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর করে দিল।

শুধু ভবানীর প্রতি রইল অটল দণ্ডাদেশ, to be hanged till death.

ভবানী বলেছিল, আমি দুঃখিত যে এ্যাণ্ডারসনকে মারতে পারিনি।

বি ভি দলের শহীদের তালিকায় আরও একটি নাম সংযুক্ত হল।

লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠ সেই থেকে পরিণত হয়েছে একটি পুণ্য তীর্থে।

দার্জিলিং-এ এসে সবার আগে সেই পুণ্যতীর্থের ধুলো কি স্পর্শ না করে পারি!

ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম

না, এখন আর এক ফোঁটা রক্তও নেই কোথাও। শুকিয়ে গেছে।

এক ভবানীর রক্ত থেকে হাজারো ভবানী জন্ম গ্রহণ করে।

শহীদের রক্ত কি কখনও শুকোয়?

(ক্রমশঃ)

"দেশ, দেশ, আমাদের এই দেশ! একেই আমাদের বড় করতে হবে। ধর্মে কর্মে জ্ঞানে সব রকমে একে গড়ে তুলতে হবে। দেশবাসী প্রথম দেশপ্রেমের ডাক শুনল—বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট, যোগেন বিদ্যাভূষণের নিকট এবং জীবন্ত, জাগ্রত, তেজোবীর্যসম্পন্ন বিবেকানন্দের কাছে।"

অতীত কালের অন্যান্য মঞ্চ

ইউনিক থিয়েটার—১৯০৩

১৯০৩ সালে গিরিন্দ্রমোহন মল্লিক ও সতীশ চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারের নতুন নাম (ইউনিক) দিয়ে অভিনয় শুরু করেন। ২১শে জুন প্রথম নাটক বঙ্গবালা। অভিনয়ে ছিলেন, তারাসুন্দরী, সুশীলা, ক্ষেত্র মিত্র, প্রমুখ। ১৪ই নভেম্বর তারাবাঈ নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন, দানী বাবু, চুণীলাল দেব, ক্ষেত্র মিত্র, তারক পালিত, বিনোদিনী, সুধীরা বালা। সুধীরা বালা সম্বন্ধে খবরে প্রকাশ, ইনি মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সংস্পর্শে এসে পরবর্তী কালে অভিনয় ছেড়ে দিয়ে সংসার ধর্মে লিপ্ত হয়ে কাশীবাস করেন সুধীরাবালার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবলা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত লেখকরূপে সুপরিচিত।

অতঃপর ইউনিক নাম বদলে ন্যাশনাল নাম দিয়ে কয়েকটা নাটকের অভিনয় করে। ১৯০৬ সালে ১৪ই জুলাই বঙ্গ বিক্রম, ৮ই আগষ্ট রিফিয়া, ১৫ই ডিসেম্বর দুর্গাদাস, ১৯০৭ সালের ১১ই মে সমাজ, তারপর ছত্রপতি, কালাপাহাড়, ভারত গৌরব, ওলডেরিনা, নবাব নন্দিনী প্রভৃতি নাটকের পর ১৯১৪ সালে এই মঞ্চের অবলুপ্তি ঘটে।

থেসপিয়ন টেম্পল—১৯১৫

১৯১৫ সালে বেঙ্গল মঞ্চ লীজ নিয়ে ক্ষেত্রমোহন মিত্র থেসপিয়ন টেম্পল নাম দিয়ে ৭ই আগষ্ট নূতনভাবে মঞ্চস্থ করেন। অল্পদিন পরেই এই মঞ্চের নতুন নাম হয়—প্রেসিডেন্সী থিয়েটার। ১৯১৭ সালে বাঙালী পলটন। তারপর বিশ্বার স্বপন, বাবর শা, হাসনাহানা, কর্মবীর, ধর্মপথ প্রমুখ কয়েকটি নাটকের অভিনয়ের পর ১৯১৮ সালে ওই মঞ্চ গুটান হয় এবং অনুমানে হয় ঐ স্থানেই গড়ে ওঠে বিডন ষ্ট্রীট পোষ্ট অফিস।

এমারেল্ড্ থিয়েটার—১৮৮৭

৬৮ নম্বর বিডন ষ্ট্রীট থেকে ৮ার থিয়েটার হাতিবাগানে নতুন নাট্যভবনে চলে যাবার পর বাড়ির মালিক গোপাল লাল শীল নাট্য গৃহের নাম রাখেন এমারেল্ড্ থিয়েটার। ১৮৮৭ সালের ৭ই অক্টোবর কেদার চৌধুরীর রচিত পাণ্ডব নির্বাসন নাটক দিয়ে মঞ্চের উদ্বোধন হয়। তারপর একে একে বহু নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। গিরিশচন্দ্র

রত্নাকর

মোটা বোনাস ও মাহিনায় এখানে যোগদান করেন। নীলদর্পণ, সীতার বনবাস, মুবারিনী, মেঘনাদ বধ, পূর্ণচন্দ্র, নন্দবিদায়, রাজা ও রাণী (১৮৮৯, ৩রা নভেম্বর) প্রভৃতি বহু নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়ের পর এমারেল্ড্ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় এবং ১৮৯৬ এর এপ্রিল মাসে বঙ্গ বিজেতা নাটকের অভিনয়ের পর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। এখানে অভিনয় শুরু করেন সিটি থিয়েটার।

এই সিটি থিয়েটারের উদ্ভবের একটি ইতিহাস আছে। ষ্টার থিয়েটারের (হাতি বাগান) কর্তৃপক্ষরা যখন অন্যায়ভাবে গিরিশচন্দ্রকে ছাড়িয়ে দেন তখন একদল গিরিশ-ভক্ত শিল্পী ষ্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে আসেন এবং নীলমাধব চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তাঁরা সিটি থিয়েটার গঠন করে ১৮৯১ সালেই গিরিশচন্দ্রের নাটক অভিনয় করতে থাকেন। তাঁরা কোন মঞ্চ না পেয়ে ধনীদের গৃহে অভিনয় করতে আরম্ভ করেন। ১৮৯১ সালের মে মাসে বাগবাজারে খ্যাতনামা নাগরিক নন্দলাল বসু ও পশুপতি বসুর বাড়ীতে তাঁরা অভিনয়ের আয়োজন করলে ষ্টার কর্তৃপক্ষ তাদের নামে হাইকোর্টে মামলা রুজু করেন। গিরিশচন্দ্রের বিরুদ্ধেও তাঁরা মামলা করেন। হাইকোর্ট আবেদনকারীদের গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আপোষ রফা করতে নির্দেশ দেন, কারণ তাঁরই চেষ্টায় বাংলাদেশ নাট্য-শিল্পে উন্নতি করতে পেরেছে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে ষ্টার কর্তৃপক্ষের মামলার নিষ্পত্তি হলেও সিটির বিরুদ্ধে মামলা চলতে থাকে। কিন্তু এই মামলায় ষ্টার হেরে যায়। হাইকোর্ট রায় দেন যে, নাটক প্রকাশিত হবার পর তার অভিনয় নিয়ে কোন বাধানিষেধ থাকবে না। সিটি থিয়েটার এদিকে মামলা চলার সময়েই 'বীণা' মঞ্চ ভাড়া নিয়ে ১৮৯১ সালের ১৬ই মে চৈতন্য লীলা, তারপর সরলা, পলাশীর যুদ্ধ, সীতার বনবাস, নল-দময়ন্তী, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, ভক্তবালা, বিবাহ বিভ্রাট, বেল্লিক বাজার, তাজ্জব ব্যাপার প্রভৃতি নাটকের অভিনয় করেন। ১৮৯৭ সালে দেবী চৌধুরাণী অভিনীত করার পর সিটি থিয়েটার উঠে যায়।

কোহিনুর থিয়েটার—১৯০৬

৬৮ বিডন ষ্ট্রীটের বাড়িটি ১৯০৬ সালে শরৎকুমার রায় নামে এক ব্যক্তি এক লক্ষ আট হাজার দিয়ে কিনে নিয়ে কোহিনুর থিয়েটার খোলেন। গিরিশচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা বোনাস ও পাঁচ শ টাকা মাহিনাতে নিয়ে আসা হয়। ধর্মদাস সুরকে বাড়ির সংস্কার সাধনে নিযুক্ত করা হয় এবং ধর্মিষ্ঠাচরণ সেনের কনসার্ট পার্টিকে বহাল করা হয়। নদীয়া জেলার কুরালগাছার জমিদার হাইকোর্টের উকিল প্রসন্ন কুমার রায়ের পুত্র শরৎকুমার রায় বি. এ. ছিলেন এই থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী।

১৯০৭ সালের ১১ই আগষ্ট এখানে চাঁদ বিবি প্রথম মঞ্চস্থ হয়। তারপর দুর্গেশ নন্দিনী, সিরাজদ্দৌলা, মীর কাশিম, শিবাজী, ব্যায়সা কা ত্যায়সা অভিনীত করার পর কোহিনুর বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে; কিন্তু হঠাৎ ১৯০৭ সালে শরৎরায় পরলোকগমন করলে থিয়েটারে বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়। শরৎকুমারের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই শিশির রায় থিয়েটার পরিচালনা করতে থাকেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ভাল ব্যবহার না করায় গিরিশ-চন্দ্র জুলাই মাসে মিনার্ভায় যোগ দেন। অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি কোহিনুরে আসেন এবং নবীন তপস্বিনীতে জলধর ও প্রফুল্ল নাটকে যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯০৮ সালে অর্ধেন্দু শেখর মারা যান। তারপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত কোহিনুরে বহু নাটক অভিনীত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য অশোক, বাসন্তী, বরুণা, মহিলা মজলিশ, দৌলতে দুনিয়া, ভূতের বেগার, পাণ্ডব গৌরব, বীরপূজা, ময়ূর সিংহাসন, প্রতিফল, সোনার সংসার, দুর্গাবতী, আকবরের স্বপ্ন, সুখের তলপান, মধুর মিলন, বিশ্বামিত্র, গ্রহের ফের; জোনাকিরাও সাক্ষাহান। অতঃপর কোহিনুর নীলামে বিক্রি হয়ে যায়।

মনমোহন থিয়েটার—১৯১২

১৯১২ সালের ২৯শে জুলাই নীলামে কোহিনুর থিয়েটার এক লক্ষ এগারো হাজার টাকায় খরিদ করেন মনমোহন পাঁড়ে। ২৭শে আগষ্ট ১৯১২ সালে এখানে গিরিশ স্মৃতি-রক্ষা কল্পে বলিদান ও পাণ্ডব গৌরবের বিশেষ অভিনয় হয়। মিনার্ভার অংশীদাররূপে মনমোহন বাবু এই থিয়েটারের নাম রাখেন মিনার্ভা কিন্তু মিনার্ভার অন্যতম অংশীদার উপেন্দ্র কুমার মিত্র তাতে আপত্তি করে মামলা রুজু করেন। শেষ পর্যন্ত মনমোহন বাবু তাঁর নবক্রীত রঙ্গালয়ের নাম রাখলেন—মনমোহন থিয়েটার।

এই সময় ধানীবাবুর বিপুল জনপ্রিয়তা। তাঁরই জন্যে

মনমোহন থিয়েটার দেখতে দেখতে জমে গেল। ১৯১৫ সালের ৭ই আগষ্ট এখানে গিরিশচন্দ্রের কালাপাহাড় প্রথম অভিনীত হল। বিভিন্ন ভূমিকায় ছিলেন, প্রিয়নাথ ঘোষ, দানীবাবু, তারা সুন্দরী, প্রকাশমণি, হীরালাল চট্টোপাধ্যায় শশীমুখী প্রভৃতি। তারপর ২৪শে সেপ্টেম্বর কঙ্কাবতী। এই গোয়েন্দা নাটকটি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করে। অতঃপর সাজাহান, বাদশাজাদী, বারোরাও, কবীর প্রভৃতি নাটক অভিনীত হবার পর ১৯১৬, ৮ই জুলাই মোগল পাঠান শুরু হয়। ১৯১৭ তে সতীলক্ষ্মী, পেয়ারে নজর, চন্দ্র শেখর, পানিপথ, চাঁদে চাঁদে, ১৯১৮ ১৬শে মার্চ, কিন্নরী। তারপর ১৭ই আগষ্ট দেবল দেবী। এই নাটকে শিশির বাঁ রূপে দানীবাবু অপূর্ব অভিনয় করেন। অতঃপর যেসব নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, পরমেশ্বী, ওলোট পালট, হিতবর, বিলুপ্ত, রাজা বসন্ত রায়, ধ্রুবনিধি ও প্রাণের টান। ১৯২২, ১১ই ফেব্রুয়ারী খোলা হয় বঙ্গে বর্গী—দানীবাবুর অসামান্য অভিনয় দীপ্ত আর এক নাটক। এই নাটকে নানা প্রকার অদৃষ্ট পূর্ব মঞ্চ কৌশল দেখানো হয়—কামানের গোলার মুখে মানুষের দেহ উড়ে যাওয়া, চোখের সামনে মানুষের মাথা কেটে ফেলা ইত্যাদি। এই নাটকে দানীবাবুর সঙ্গে ছিলেন ক্ষেত্র মিত্র, শশীমুখী, আশ্চর্যময়ী (মুখ্যাঙ্গিকা) হীরালাল চট্টোপাধ্যায়, রাধি সুন্দরী, পূর্ণ ঘোষ, ও অহীন্দ্র যে (কমিক অভিনেতা)। সেই সঙ্গে বহু পুরাতন নাটকেরও অভিনয় হয় যথা চন্দ্রগুপ্ত, সাজাহান, প্রহ্লাদ প্রভৃতি। ১৯২৩ সালের ১৮ই আগষ্ট খোলা হয় আলেকজান্ডার। নাটকটি ব্যর্থ হয়। তারপর ললিতাদিত্য নাটকটিও আড়ম্বর পূর্ণ দৃশ্যসজ্জা ও অতি নাটকীয় ঘনঘটা সত্ত্বেও দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে অসমর্থ হল। বিচক্ষণ থিয়েটার-ব্যবসায়ী মনোমোহন বাবু বুঝলেন, নতুন দিন আসছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তাঁর অভিনয় শিল্পীদের নেই। তিনি ১৯২৪ সালে শিশিরকুমারকে তাঁর থিয়েটার লীজ দিয়ে দিলেন।

১৯২৪ সালের ৬ই আগষ্ট শিশির কুমার যোগেশ চৌধুরীর সীতা নিয়ে নিজের দল সহ আত্মপ্রকাশ করলেন মনমোহন মঞ্চে। মনমোহন বাবুর সর্ত ছিল, রঙ্গালয়ের নামের সঙ্গে তাঁর নাম অবশ্যই যুক্ত থাকবে। সেই অনুসারে শিশির কুমার তাঁর নাট্য গৃহের নাম রাখলেন, মনমোহন নাট্য মন্দির। ভারতীয় ধারায় তিনি রঙ্গালয়ের সংস্কার সাধন করলেন। সামনে পরীদের ট্যাচু ছিল সেগুলি ভেঙে সেখানে বসানো ছিল চিত্রিত কলস। টিকিট ছাপা হল বাংলায়—প্রবেশ-পত্র, ক্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি। কনসার্ট-এর বদলে সানাই বাজতে লাগল।

সীতার পর শিশির কুমার মঞ্চস্থ করলেন জনা। তারা সুন্দরী বহুদিন অবসর জীবন যাপন করবার পর শিশির কুমারের অনুরোধে তাঁর নাট্য শালায় যোগ দিয়ে জনা নাটকে নাম ভূমিকায় নামলেন জনার পর পুণ্ডরীক, মধ্যে পাষাণী, আলমগীর। ১৯২৫ এর ১৩শে ডিসেম্বর নাট্য মন্দির লিমিটেড রেজেষ্টারি হল। পরিচালনায় ছিলেন তুলসী গোস্বামী, নির্মল চন্দ্র প্রমুখ কয়েকজন ধনী ব্যক্তি। ম্যানেজিং এজেন্ট ভাদুড়ী অ্যাণ্ড কোং। মনমোহন ছেড়ে শিশির কুমার কর্পোরেশন থিয়েটার লীজ নিয়ে ঐ নাট্য শালার নাম দিলেন নাট্য মন্দির।

মনমোহন থিয়েটার অধিকার করলেন আর্ট থিয়েটার। ইতার ও মনমোহন দুটি থিয়েটার চালাতে লাগলেন আর্ট থিয়েটার। ১৯২৭ ১লা জুলাই রথের দিন অপরেশচন্দ্রের শ্রীরামচন্দ্র নাটক নিয়ে মনমোহন থিয়েটারে আবার অভিনয় শুরু হল, অভিনয়ে ছিলেন রাবণ ও দশরথ—অহীন্দ্র চৌধুরী, রাম-দুর্গাদাস, সীতা-সুশীলাবালা, পরশুরাম-দুর্গাপ্রসন্ন বসু ইত্যাদি। তারপর ৫ই জুলাই দুর্গেশ-নন্দিনী, ১৪ই সেপ্টেম্বর চাঁদ সদাগর। ১৯২৮ সালে আরবী হয় নাটকের অভিনয়ের পর মনমোহন থিয়েটার লীজ নিলেন, অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সত্ত্বাধিকারী অনাদিনাথ বসু। সঙ্গে প্রবোধ চন্দ্র গুহ। এঁদের প্রযোজনায় মীরা বাঈ, পথের শেষে, কর্মবীর, প্রাণের দাবী, রক্তকমল, সমুদ্রগুপ্ত, জাহাঙ্গীর, মহুয়া মঞ্চস্থ হল। ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩০) কারাগার অভিনয়ের পর মনমোহন থিয়েটার চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩০ সালে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু ঐ রঙ্গালয়ের উপর দিয়ে

সম্প্রসারিত হয়। ফলে এতদিনের নাট্যশালাটি নিশ্চিহ্ন হয়। ৬৮ বিডন ষ্ট্রীটে ১৮৮৩ সালে বিনোদিনীর আত্মত্যাগে শুরুমুখ রক্ষের অর্থে আর গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় যে থিয়েটার গড়ে উঠেছিল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব যে থিয়েটারে পদার্পণ করেছিলেন, সেই ঐতিহ্য সম্পন্ন নাট্যশালা ১৮৮৩ থেকে ১৯৩০ এই দীর্ঘ সাতচল্লিশ বছর ধরে অগণিত নাট্যামোদীদের আনন্দ দেবার পর অবশেষে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের কবলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তাকে ধূলিসাৎ করে তার উপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনু অগ্রসর হয়ে গেল উত্তর দিকে।

শতবার্ষিকীর উৎসব ভণ্ডুল

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর সভাপতিত্বে গঠিত শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতি ৮ই আগষ্ট মহাসমারোহে বিরাট আকারে একমাস ব্যাপী যে নাট্য মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন তা শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত হয়েছে। এ যে কতবড় লজ্জাকর ব্যাপার তা বলে বোঝানো যাবে না। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির পূর্ণ লগ্নে তার এক শ বছরের সুমহান ঐতিহ্যকে মসীলিপ্ত করা হল, ভারতের অন্য রাজ্যের কাছে পশ্চিম বঙ্গ হাস্যাস্পদ হল, আমাদের মাথা হেঁট হল। কেন এমন হল? এবং এর জন্যে দায়ী কারা? এক আধ দিন নয়, প্রায় এক বছর আগে থেকে এর প্রস্তুতি চলছিল, সম্মিলিত অভিনয় করে বিলক্ষণ টাকাও তোলা হয়েছিল, মস্ত বড় কর্মসূচীও ঘোষিত হয়েছিল, অথচ শেষ মুহূর্তে জানা গেল, উৎসব হবে না। সমিতির তরফ থেকে জানানো হল, পনেরো দিন পরে উৎসব শুরু হবে। এখন শুনছি ১৫ই জানুয়ারী থেকে বিভিন্ন মঞ্চে উৎসব হবে। এদিকে ময়দানের উৎসব-মণ্ডপে অনেকে স্টল নিয়ে ভাড়া বাবদ অগ্রিম টাকা দিয়েছেন, অনেকে সীজন টিকিট কিনেছেন, তাঁদের কি গতি হল তা জানা যায় নি। এই ব্যর্থতার মূল রহস্য কোথায়? ফাঁকা কথা দিয়ে কৈফিয়ৎ দিলে চলবে না। আমরা জাতীয় স্বার্থে এই কেলেঙ্কারীর তদন্ত দাবী করি। বাঙালী জাতির মুখে যারা চুণ কালি মাখালেন, শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরীকে হাস্যকরতায় মোহিত করে শেষ পর্যন্ত যারা তাঁকে এ ভাবে অপদস্থ করলেন তাঁরা যদি এই ব্যর্থতার উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য কারণ না দর্শাতে পারেন তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিৎ। ছেলেখেলা নয়, হেলাফেলায় উড়িয়ে দেবার মতো ব্যাপার নয়, এ আমাদের জাতীয় মান অপমানের প্রশ্ন। অনেক সম্মানীয় নামী ব্যক্তিও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের বিবৃতিও আমরা শুনতে চাই। ১৫ই জানুয়ারী থেকে যে অনুষ্ঠান হওয়ার সর্বাঙ্গীন সাফল্য আমরা কামনা করব। কিন্তু যাঁদের কর্ম-অক্ষমতার ফলে নির্ধারিত দিনে উৎসব বাতিল হয়ে গেল তাঁরা যেন অতঃপর সচেতন হন!

ষ্টার থিয়েটারের অনুষ্ঠানও পণ্ড

শতবর্ষ পূর্তিদিবসে ষ্টার থিয়েটার যে মনোগ্রাহী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল, মঞ্চ-কর্মীদের বিক্ষোভের ফলে সে অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে সব লণ্ডভণ্ড হল, সেদিন অভিনয় হল না। প্রচুর সংখ্যক দর্শক যারা টিকিট কিনে সেদিনকার অভিনয় দেখতে এসেছিলেন তাঁদের হয়রানি আর অর্থদণ্ড সহ্য করে বাড়ি ফিরতে হল। কেন এমন হল? নাট্যশালার কর্তৃপক্ষ অবশ্য এক বিবৃতি প্রচার করেছেন। কিন্তু তার সবটাই আমাদের কাছে গ্রহণ যোগ্য বলে মনে হচ্ছে না। ষ্টারের মঞ্চ-কর্মী ও অন্যান্য কর্মীদের নানা দাবী-দাওয়া নিয়ে কিছুদিন ধরেই বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল—এখবর প্রায় সকলেরই জানা। সুতরাং কর্তৃপক্ষ আগে থাকতে সাবধান হননি কেন? মাত্র একশত টাকার দাবী। এই সামান্য দাবীকে নম্র মতো ম্যানেজ করতে পারলেন না। প্রথমে সে-দাবী প্রত্যাখান করে, অনুষ্ঠান পণ্ড হয় দেখে যে-দাবী মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, অনেক দেরী হয়ে গেছে, সময়মত দাবী পূরণ না হওয়ায় বিক্ষোভকারী কর্মীরা যেন যোগা-পড়ায় বাইরে চলে গেলেন। আমাদের তো মনে হয়, কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোবৃত্তিই এর জন্য দায়ী। সে যাইহোক, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তির দিনে এঘটনাও

যে অত্যন্ত লজ্জাজনক, অন্যায় দুঃখের তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শতবার্ষিকী সংবাদ প্রচার

সেদিন রাত্রে ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলাম বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে চন্দ্রগুপ্ত নাটকের অভিনয় হচ্ছে আর তার সূচনায় আলেকজাণ্ডার সেই বহুশ্রুত সংলাপ বলেছেন—সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ। তারপর হঠাৎ তিনি থামলেন এবং পুনরায় বলতে শুরু করলেন—এখানকার সংবাদ-পত্রে দেখা যায়, কোন অনুষ্ঠানের রিপোর্টে উপস্থিত অভিথিবৃন্দের মধ্যে এমন কয়েকজনের নাম দেওয়া হয়েছে যাঁদের মধ্যে দু'জন বহুদিন আগেই ভবলীলা সাঙ্গ করে চলে গেছেন, আবার এমন এক ব্যক্তির নাম আছে যিনি সেদিন কোন অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হন নি।

সেলুকাস বলে উঠলেন—তাও কি সম্ভব সম্রাট! কোন দায়িত্বশীল লেখক বা সংবাদ দাতা এমন আজগুবি সংবাদ প্রকাশ করবেন।

আলেকজাণ্ডার বললেন—বিশ্বাস না হয় গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবারের দৃগাস্তরের তৃতীয় পৃষ্ঠাটি দেখ। ঐ পৃষ্ঠায় বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে ৭ই ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল তার রিপোর্ট লেখা হয়েছে। "অহীন্দ্র চৌধুরী, নীহার বালা, বেণু বালা প্রমুখের ছিলেন বিশেষ অতিথি।"

সবিস্ময়ে সেলুকাস বললেন—তাই তো, এত বড় দুঃসংবাদ দারা, খুড়ি, সম্রাট। আমরা তো জানি, নীহার বালা বহুদিন আগেই পরলোকগমন করেছেন আর শ্রীচৌধুরী সেদিনকার কোন অনুষ্ঠানেই উপস্থিত হন নি। সুতরাং তাঁরা কী করে ঐদিন স্টার মঞ্চে বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করলেন তা তো বোধগম্য হচ্ছে না। ধন্য সাংবাদিক লেখক, ধন্য তাঁর কল্পনাশক্তি!

আলেকজাণ্ডার বললেন, শুধু ওই লেখকই নয়, আরও একজন লেখকের কল্পনাশক্তির জোড় দেখুন। সে সংবাদটি হল, নাট্যাচার্য মিনিরকুমার সম্পর্কে। তিনি নিজের দল নিয়ে কোন্ থিয়েটারে কোন্ সালের কোন্ তারিখে সীতা নাটকের অভিনয় শুরু করেছিলেন তা নিশ্চয় তোমার জানা আছে?

সেলুকাস বললেন, তা আছে বৈকি সম্রাট। সেই প্রথম রজনীর অভিনয় আসরে আপনার সঙ্গে আমিও তো উপস্থিত ছিলাম। ১৯১৪ সালে মিনিরকুমার মনমোহন থিয়েটার লীজ নিয়ে ৬ই আগষ্ট যোগেশ চৌধুরীর লেখা সীতা নাটক মঞ্চস্থ করেন। নাট্যশালার নাম বদলে তিনি নতুন নাম দেন—মনমোহন নাট্যমন্দির।

আলেকজাণ্ডার বললেন ভুল, ভুল, সেলুকাস। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হলেও তোমার তথ্য ভুল। এ বিষয়ে গত ১০ই নভেম্বর আনন্দ বাজার পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগে "বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ" নামক প্রবন্ধে এক লেখক লিখেছেন—"কর্নোয়ালিশ মঞ্চে তিনি অভিনয় শুরু করেন 'সীতা' নিয়ে ১৯১৬ এর ১৩ই জুন।"

সেলুকাস বললেন, একী ভাষি! রামমোহন নাট্যমন্দিরে দু'বছর অভিনয় করবার পর মিনিরকুমার কর্নোয়ালিশ থিয়েটার লীজ নিয়ে তার নামকরণ করলেন—নাট্যমন্দির। ১৯১৬ সালের ৬ই জুন রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক দিয়ে নাট্যমন্দিরের উদ্বোধন হয়। এতো সবাই জানে, অনেক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকেও তো এ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অথচ.....

আলেকজাণ্ডার বললেন, তা বললে কি হবে! অত বড় পত্রিকা, অমন লব্ধপ্রতিষ্ঠ তার বিভাগীয় সম্পাদক, লেখকের নাম আমাদের কাছে পরিচিত না হলেও তিনিও নিশ্চয় সুপণ্ডিত—অতএব তাঁরা যে খবর ছেপেছেন, তাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

সেলুকাস বললেন, সম্রাট সত্যই বলেছেন, কী বিচিত্র এই দেশ।

স্বামী ভোলানন্দের অলৌকিক শক্তি

অংকশাস্ত্রের বিখ্যাত পণ্ডিত সোমেশচন্দ্র বসু। ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধি, সংস্কারমুক্ত মন। কিন্তু তিনিও যেন বিহ্বল, কিসের ইচ্ছায় যেন দিশাহারা, তাঁর চিত্তে এক অসম্ভব কল্পনা। কিছুদিন ধরে এই কল্পনা তাঁকে অস্থির করে রেখেছে।

পত্নী-শোকে কাতর সোমেশচন্দ্র আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে চললেন হরিদ্বার অভিমুখে। কিছু দিন আগে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ মারা গিয়েছিলেন।

হরিদ্বারে থাকেন স্বামী ভোলানন্দ। সোমেশচন্দ্র শুনেছিলেন অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁর। দেখা যাক, তিনি সোমেশচন্দ্রের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারেন কি না।

১৩২৬ সালের ১৭ই বৈশাখ।

সোমেশবাবু হরিদ্বারে পৌঁছলেন।

অস্থির মন। কখন দেখা হবে স্বামীজীর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর ডাক এলো। বসলেন গিয়ে স্বামীজীর পায়ের কাছে।

তাঁর দিকে তাকিয়ে ভোলানন্দ বললেন—বলে ফেল! কী বলতে চাও। আমি জানি তুমি কী বলবে, তবুও তুমি বল শুনি।

সোমেশবাবু তাঁর ইচ্ছার কথা স্বামীজীকে জানালেন।

শুনে হাসলেন ভোলানন্দ।

—এমন ইচ্ছে কেন হল, বেটা?

সোমেশবাবু বললেন—তা জানি না, মহারাজ। কিন্তু আমি যেন আর অন্য কিছু ভাবতে পারছি না। মন আমার অস্থির, বিপর্যস্ত। কেন এমন হল তা জানি না।

—লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছো নাকি?

—হ্যাঁ, মহারাজ, সব ভুলে আছি। এখন আমার এই একমাত্র চিন্তা!

ভোলানন্দ বললেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হলে আবার লেখাপড়ায় মন বসবে তো? তোমাকে দিয়ে যে সংসারের অনেক কাজ হবে।

সোমেশবাবু বললেন—হ্যাঁ, মহারাজ। আমার এই ইচ্ছাটি আপনি পূরণ করুন। তারপর আমি আবার আগের মতো জীবনযাপন করব।

ভোলানন্দ বললেন—আচ্ছা, হো যায়েগা। যাবড়াও মাৎ।

ভোলানন্দ শিষ্যদের ডেকে নির্দেশ দিলেন।

দীক্ষাগৃহে তিনখানি আসন পাতা হল।

সন্ধ্যার পর সোমেশবাবুকে নিয়ে ভোলানন্দ সেই ঘরে ঢুকলেন।

অনাথ উপাধ্যায়

শুধু দু'জন। ঘরে আর কেউ নেই।

স্বামীজী দরজা বন্ধ করে দিয়ে সোমেশবাবুকে বললেন—বোসো এই সামনের আসনে!

সোমেশবাবু বসলেন, আবেগে উত্তেজনায় কাঁপছেন তিনি।

হঠাৎ স্বামীজী দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলে উঠলেন। ঘরের মধ্যে ম্লান আলো। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় চারিদিক অস্পষ্ট।

ভোলানন্দ কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। তারপর সোমেশবাবুর ডানধারের আসনে বসলেন।

সোমেশবাবুর বিপরীত দিকে আর একটি আসন। সেটি শূন্য!

—চোখ বোজ সোমেশচন্দ্র।

স্বামীজীর গম্ভীর কণ্ঠের আদেশে সোমেশবাবু চমকে উঠে চোখ বুজলেন।

ঘরের মধ্যে বিচ্ছিন্ন নীরবতা। যেন এক অপার্থিব পরিবেশ!

সোমেশবাবু শুনতে পেলেন, বহুদূর থেকে কে যেন বলছে, এসেছে, মা, এসেছে। চোখ খোল সোমেশচন্দ্র।

সোমেশবাবু চোখ খুললেন।

এ কী বিস্ময়! এ কী বিহ্বলতা! এ কী আনন্দ।

সোমেশবাবু দেখলেন, তাঁর বিপরীত দিকের আসনে বসে আছেন তাঁর পরলোকগতা পত্নী—তাঁর শোকে তিনি কাতর হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন।

বিস্ফারিত নেত্রে সোমেশবাবু শুধু চেয়ে রইলেন।

সেই মুখ, সেই চোখ, ঠোঁটের ফাঁকে সেই মৃদু-মধুর মিষ্টি হাসি!

আবার শোনা গেল, বহুদূর থেকে কে যেন বললে—ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে সোমেশচন্দ্র?

—হ্যাঁ, প্রভু। হয়েছে!

লুটিয়ে পড়লেন সোমেশবাবু।

কিছুক্ষণ পরে উঠে বসে দেখলেন, সামনের আসন শূন্য। তাঁর স্ত্রী অন্তর্হিতা!

* * *

যিনি এমনি অবিশ্বাস্য মহাশক্তির অধিকারী ছিলেন সেই ভোলানন্দ মহারাজের জীবননাট্যে কতই না চমকপ্রদ ঘটনা।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে তাঁর আবির্ভাব।

শৈশবেই গৃহত্যাগ করেন। সন্ন্যাসব্রত যেন তাঁর জন্ম থেকেই তাঁর রক্তে মিশে আছে।

ঘুরছেন তো ঘুরছেনই।

কোথায় তার শেষ? কোথায় তাঁর সাধনার সিদ্ধি?

ঘুরতে ঘুরতে কুরুক্ষেত্রের কাছে কর্ণাল জেলার পঞ্জানা নামক এক আশ্রমে এসে পৌঁছোলেন।

সেখানে তখন অনেক সাধু-সন্ত বাস করতেন। তাঁদের মধ্যে স্বামী গোপালগিরি মহারাজ ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ। দেশবিদেশের মানুষ তাঁর নাম জানতো। তিনিই সেই আশ্রমের গুরু।

বালক ভোলানন্দ তাঁর কাছে গিয়ে মনের ইচ্ছা জানালেন।

তাঁকে দেখে গোপালগিরি যেন মনে মনে চমকে উঠলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বালকের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর শুধু বললেন—হবে।

কিন্তু তোমায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে বৎস। মনে মনে বললেন গোপাল গিরি।

ভোলানন্দ আশ্রমে স্থান পেলেন

গোপালগিরি নানা কঠোর কাজ দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

দারুণ শীত। কিন্তু স্নান করতে হবে রাত তিনটায়। তারপর পূজাদি সেরে আশ্রমের সকলের জন্যে ডাল রুটি তৈরী করতে হবে। শুধু তাই নয়, রোজ প্রায় একমন ঘুঁটের ঘাটা তুলতে হবে।

ভোলানন্দ একাগ্রচিত্তে স্বামীজীর আদেশ পালন করে চলেছেন।

একদিন গুরুজী শুধোলেন, ভোলা কোথায় রে?

একজন শিষ্য বাইরে গিয়ে দেখলেন, দারুণ শীতে ভোলানন্দ হু হু করে কাঁপছেন। কিন্তু কাজ করে চলেছেন ঠিকমতই।

পৌষ মাস। কনকনে ঠাণ্ডা। ঘরে সবাই আগুন জেলে বসে আছেন। বাইরে বোধ হয় বরফ পড়ছে।

সন্ধ্যার সময় হঠাৎ গুরুজী ভোলানন্দকে বললেন, ভোলা, কেবল কৌপীন পরে এখনি আশ্রম থেকে দূর হোয়ে যা, তোর মত শিষ্য আমার দরকার নেই।

ভোলানন্দ একটি কথাও বললেন না। নিরুত্তরে চলে

গেলেন। শিষ্যরা বিস্মিত। এই হাড়কাঁপানো শীতে বাইরে বেরিয়ে ভোলাভাই বাঁচবে কী করে!

শিষ্যদের মনের কথা বুঝে হেসে বললেন গুরুজী—ঘাবড়াও মাৎ!

কিছুক্ষণ পরে একজন শিষ্যকে বললেন, যাও, ভোলাকে ডেকে নিয়ে এসো।

শিষ্যটি গায়ে ভবল কম্বল চাপিয়ে আশ্রমের বাইরে গিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, ঘুরে একটা গাছের তলায় ভোলানন্দ বসে আছেন। কাছে গিয়ে দেখলেন ভোলানন্দ যেন ধ্যানস্থ। তাঁর গায়ে ঠেলা দিয়ে তাঁকে তুলে গায়ে একটা কম্বল চাপিয়ে ধরে শিষ্য তাঁকে নিয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন।

গুরুজী বললেন—কিরে, খুব শীত করছিল?

ভোলানন্দ বললেন—না, মহারাজ, একটুও শীত করেনি তো! বাইরে তো শীত নেই।

শিষ্যরা অবাক। ভোলাভাই বলে কি! বাইরে শীত নেই!

মৃদু হাসলেন গুরুজী!

এইভাবে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে ভোলানন্দ গুরুর কৃপা লাভ করলেন।

গুরুর আদেশে তিনি দীর্ঘ বারো বছর পরে বাড়ী গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে এলেন।

তারপর গেলেন হিমালয়ে। পথে এক বৃদ্ধা তাঁর নিজের মেয়েকে ভোলানন্দের সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে তাঁকে খুব ধরাধরি করতে লাগলেন। ভোলানন্দ দেখলেন, এ তো বড় বিপদ! এদের সঙ্গে তো পথ চলা যাবে না। তিনি বিরক্ত হয়ে হিমালয়ের পথ ছেড়ে দ্বারকায় চলে গেলেন।

দ্বারকা থেকে হরিদ্বার!

সেখানে এক মোহান্ত তাঁর বাগানে ভোলানন্দকে আশ্রয় দিলেন। তারপর তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন। ভোলানন্দের নতুন নাম হল, স্বামী ভোলানন্দ গিরি!

দিনে দিনে তাঁর শিষ্য সংখ্যা বাড়তে লাগল।

একদিন এক পাদ্রী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর কোন জিনিসের দরকার আছে কি না। উত্তরে হেসে বললেন ভোলানন্দ, এমন কোন জিনিস নেই যা তাঁর পাওয়া হয়নি। "—নেহি, হামারা কুছ চিজকা জরুরৎ নেহি।"

পাদ্রী অবাক হলেন! এমন মানুষ তো তিনি দেখেন নি যাঁর কোন কামনা নেই। পাদ্রী তাঁর কাছে দীক্ষা নিলেন।

একবার ভোলানন্দ দেশলাই খোঁজবার জন্যে একটা গর্তে হাত দিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্ত থেকে বেরিয়ে এলো এক বিষধর সর্প! ফণা তুলে দাঁড়ালো সাপটা। তারপর ফণা নামিয়ে চলে যেতে লাগল। ভোলানন্দ বললেন, ও ভাই, যেও না, আমি তো তোমায় যেতে বলছি না! তোমায় বিরক্ত করলাম!

সাপ চলে গেল দেখে ভোলানন্দ বড় দুঃখিত হলেন।

কথিত আছে, তিনি শিবদুর্গার দেখা পেয়েছিলেন।

তারপর তিনি বহুদিন ধরে বহু তীর্থ ভ্রমণ সেরে আশ্রমে ফিরে এলেন।

একদিন আশ্রমে বসে আছেন এমন সময় একজন স্ত্রীলোক কাঁদতে কাঁদতে এসে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

জানা গেল, স্ত্রীলোকটির একটি মাত্র বাচ্চা ছেলে এইমাত্র ওলাউঠোয় মারা গেছে!

স্ত্রীলোকটির কান্না আর থামে না। আছাড়ি পিছাড়ি করতে লাগল।

দেখে বড় কষ্ট হল স্বামীজীর! বললেন, কাঁদিস না মা, ওঠ্। তোর ছেলে তো মরেনি, দেখগে যা, সে বেঁচে আছে।

স্বামীজীর কথা শুনে ছুটে চলে গেল মেয়েটি, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্যান্ত ছেলে নিয়ে স্বামীজীর কাছে এসে দাঁড়ালো। তার পিছনে তার স্বামী ও আরও কয়েকজন। সকলেই বিস্ময়ে হতবাক! কারুর মুখে কোন কথা নেই।

মরা মানুষ বেঁচে ওঠা তো তারা দেখেনি—এযে ভাবাই যায় না।

তাঁর এক শিষ্য নোয়াখালির পাবত্তীচরণ।

কুম্ভমেলা হচ্ছে। পাবত্তীচরণের বড় ইচ্ছা কুম্ভমেলায়

যান। কিন্তু যাবার দু'চারদিন আগে তিনি কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। ডাক্তার বললেন একমাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর চিকিৎসার দরকার। অসুখটা মারাত্মক।

কাঁদতে লাগলেন পার্বতীচরণ। গুরু, আমার এতদিনের সাধ পূর্ণ হল না। সারাদিন ধরে পার্বতীচরণ গুরুকে স্মরণ করলেন।

কী আশ্চর্য! পরদিন সকালে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ পার্বতীচরণ। অসুখের কোন চিহ্ন নেই। ডাক্তার পরীক্ষা করে বিস্ময়ে বিহ্বল। পার্বতীচরণ কুম্ভমেলায় গেলেন এবং সুস্থ শরীরে ফিরে এলেন।

একবার বরিশালের উকিল শশিকান্ত গুপ্ত তাঁর কাছে দীক্ষা নেবার জন্যে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

শশিকান্ত ইতি মধ্যেই মনে মনে তাঁকে গুরুপদে বরণ করে নিয়েছিলেন। ভাবছিলেন, গুরুর কী রূপ তিনি দেখবেন।

রাত্রিকাল। হোমঘরে ডাক পড়ল শশিকান্তর। ঘরে ঢুকে শশিকান্ত দেখলেন, ঘরে একটি প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে। অদূরে আবছা অন্ধকারে বসে আছেন ভোলানন্দ। আর তাঁর শরীর দিয়ে এক অপূর্ব দিব্যজ্যোতি বেরিয়ে ঘরটিকে আলোকিত করেছে।

তাঁর শিষ্যরাও এসব কখনো দেখেন নি। তাঁরাও অপার বিস্ময়ে বারবার গুরুকে প্রণাম করতে লাগলেন।

এমনি এক অকল্পনীয় অলৌকিক দিব্য-শক্তির অধিকারী ছিলেন স্বামী ভোলানন্দ গিরি। ১৯২৯ সালের ৮ই মে তিনি মরজগৎ থেকে তিরোহিত হন।

* * * *

"তখন গান্ধিজী বাস করিতেছেন দেশবন্ধুর গৃহে। বিপিন চন্দ্র পাল সোপনে গিয়েছেন উপরে গান্ধিজীকে দেখিবার জন্য। তিনি নীচে নামিয়া আসিয়া দেখেন দরজায় দাঁড়াইয়া একটি হিন্দুস্থানী, চক্ষে শতধারা। বিপিন চন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, তোমার রোদন করিবার কারণ কি? হিন্দুস্থানী উত্তর দিলেন। নাহি নাহি বাবু, আপ কুচ্ সমজতা নেহি। গান্ধিজী মহাত্মা, আউর চিত্তরঞ্জন উনকা ভকৎ হনুমানজী। কেহনা হুকে গান্ধিজীকো জেলমে আটক কিয়া। জিন্দির খোল দিয়া। জেল-দারোগা দেখা ভিতরমে গান্ধিজী নেহি হায়।"

বঙ্কিম সাহিত্যে দস্যু

গৌরীশংকর দে

"প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। ডারুইন বলেন, মানবজাতি বানরদিগের প্রপৌত্র। এ কথায় যদি কেহ রাগ না করিয়া থাকেন, তবে পূর্বপুরুষের এই অখ্যাতি শুনিয়া, বোধ হয় কোন জমিদার আমাদের উপর রাগ করিবেন না। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, অন্যত্র দেখিতে পাই অনেক দস্যুবংশ-জাতই গৌরবে প্রধান। তৈমুরলঙ্গ নামে বিখ্যাত দস্যুর পরপুরুষেরাই বংশ মর্যাদায় পৃথিবী মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে যাঁহারা বংশ মর্যাদার বিশেষ গর্ব করিতে চাহেন, তাহারা নর্মান বা স্কন্দনবীয় নাবিক দস্যুদিগের বংশোদ্ভব বলিয়া আত্মপরিচয় দেন। প্রাচীন ভারতে কুরুবংশের বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাহারা গোচোর, বিরাটের উত্তর গোগৃহে গোরু চুরি করিতে গিয়াছিলেন। দুই এক বাঙ্গালি জমিদারের এরূপ কিঞ্চিত বংশ মর্যাদা আছে।"

ইতিহাস, বিশেষ ক'রে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে কতখানি ওয়াকিবহাল ছিলেন 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস থেকে উপরে উদ্ধৃত অংশ তারই নজীর। প্রকৃতপক্ষে, দু একজন নয়, সেকালের বাংলার অনেক জমিদারের উত্থানের সঙ্গেই দস্যুবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। হুগলী জেলার অন্তর্গত ডুমুরদহের রায় বংশের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙ্গার জমিদার বংশের উৎপত্তিও একই ভাবে। এই বংশেরই একজনের মুখে শুনেছি এদের প্রতিষ্ঠাতা খেলারাম মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন ভালো লাঠিয়াল এবং ডাকাত। বাংলাদেশে এ রকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বৈদেশিক দৃষ্টান্ত অসংখ্য। ইতিহাসের বিশ্ববিশ্রুত নায়িকা সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথ ছিলেন জলদস্যুদের একজন বড়ো পৃষ্ঠপোষক। অথচ জলদস্যুদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন না। গোপনে উৎসাহিত করতেন, সাহায্য করতেন এবং ডাকাতদের লুঠের মালের খরচা নিতেন। ষোড়শ শতাব্দীকে ইয়োরোপের ইতিহাসে বলা হয় 'স্পেনের সুবর্ণ যুগ।' সুবর্ণযুগ স্পেনে এসেছিলো লুঠ তরাজের মাধ্যমে। ১৪৯২ সালে কলম্বাস নতুন মহাদেশ আবিষ্কার করলেন। কিন্তু 'হাসে পাড়ে ডিম আর হুহুরেরা খায়' দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে রোগে ভুগে মরলেন লিভিংষ্টোন, সমুদ্রপথে সারাদুনিয়া প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারালেন ম্যাগেলান। এককথায়, বহু কষ্টে দেশ আবিষ্কার করলেন পর্যটক এবং নাবিকেরা, কিন্তু সেই আবিষ্কারের ফল লুটলো ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের রাজা এবং বণিকেরা। এশিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ জাতির উপনিবেশ বিস্তারের জিনিসটা নির্লজ্জ লুটপাট ছাড়া আর কিছুই নয়। আধুনিক ইয়োরোপীয় জাতিগুলির উত্থান ও শ্রীবৃদ্ধির মূলেও আছে দস্যুতা। এখানেও বঙ্কিমের উক্তি সত্য। উত্তর আমেরিকার পেরু আর দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকোর স্বয়ম্ভরা ঐশ্বর্য লুট ক'রেই ষোড়শ শতকের স্পেন ষোড়শী। আবার সেই স্পেনের জাহাজ লুট করতে নিজস্ব ডাকাতদের উৎসাহ জোগাতেন ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথ। যাকে বলে চোরের উপর বাটপাড়ি। এ বিষয়ে রাণীর একজন প্রধান সাকরেদ ছিলেন স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে। উপাধি থেকেই পরিষ্কার, ডাকাতি করা সে যুগে লজ্জার নয়, বরং গৌরবের ব্যাপার ছিলো এবং সরকারের কাছ থেকে বড়ো বড়ো খেতাব পাওয়া

ছৈতো। দিল, দুনিয়া, দৌলত, সুন্দরী নারী, রাজপ্রাসাদ, সম্পত্তি সবই ছিলো এই সব সরকারী ডাকাতদের দখলে। এরাও ছিলেন এক একজন সামন্ত রাজ।

মধ্যযুগের য়ুরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট শার্লেমান বা চার্লস দি গ্রেটের মৃত্যুর পরে য়ুরোপে যে ভয়াবহ অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলার যুগ সূচিত হয় তারই ফলশ্রুতি সামন্ত প্রভুদের উত্থান এবং উত্তর য়ুরোপের তিনটি দেশ—নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক—অর্থাৎ যাদের বলা হয় স্কেণ্ডিনেভিয়ার দেশ সেখানকার ভাইকিং নায়ক জলদস্যুদের সারা য়ুরোপময় অত্যাচার। পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের আবির্ভাবের আগে বাংলাদেশেও এসেছিলো এমনি দুর্যোগ। এর নাম মাৎস্য ন্যায়। তার ইতিহাস আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। স্পষ্ট হ'লে হয়তো অনেক দস্যুর নাম জানা যেতো। ঘটনা তাই যে যুগে কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল, দেশ ছিন্নভিন্ন, সে যুগে অরাজকতা বেশি, চুরি ডাকাতিও সেই যুগে বেশি। আমাদের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসও তার সাক্ষ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের পটভূমিকায় 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'কপাল কুণ্ডলা' বা 'ইন্দিরা' লিখেছিলেন সে যুগই ছিলো অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার। শাহজাহানের আমলের আগে থেকেই বাংলাদেশে পর্তুগীজ জলদস্যুদের ভয়াবহ অত্যাচার। নদীনালা বহুল দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামকে গ্রাম জনহীন হয়ে পড়ে এদের নির্মম উৎপীড়নে। আর্মাডা বা জাহাজ ক'রে এসে এরা হত্যা, লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ, হরণ এবং অগ্নিসংযোগ করতো বলে এখনো আমরা দুর্বৃত্তকে বলি হার্মাদ। পর্তুগীজ জলদস্যুদের এই দস্যুবৃত্তির প্রতিধ্বনি রয়ে গেছে 'কপাল-কুণ্ডলা' উপন্যাসে :

"প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে একদিন মাঘ মাসের শেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগীজ ও অন্যান্য নাবিক দস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালে প্রথা ছিল

নাবিক দস্যু বলতে বঙ্কিম Pirate বা River Dacoitsদের কথা বলেছেন।

মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের কথোপকথন থেকে জানা যায় :

মতিবিবি জিজ্ঞেস করলেন—

"এখানে কেহ—জীবিত ব্যক্তি আছে?"

নবকুমার কহিলেন, "কে তুমি?"

উত্তর হইল, "তুমি কে?" নবকুমারের কর্ণে স্বর স্ত্রী কণ্ঠজাত বোধ হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কপালকুণ্ডলা নাকি?"

স্ত্রীলোক কহিল, 'কপালকুণ্ডলা কে তা জানিনা। আমি পথিক, আপাততঃ দস্যুহস্তে নিঃস্বলা হইয়াছি।'

বাক্য শুনিয়া নবকুমার ঈষৎ প্রসন্ন হইলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "কি হইয়াছে?"

উত্তরকারিণী কহিলেন, "দস্যুতে আমার পাল্কী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, আর সকলে পলাইয়া গিয়াছে দস্যুরা আমার অঙ্গের অলঙ্কার সকল লইয়া আমাকে পাল্কীতে বাঁধিয়া রাখিয়া গিয়াছে।"

"কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের কালগত পটভূমি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। এই সময় থেকেই ভারতে য়ুরোপীয় বণিকদের আনাগোনা। ইংরেজ দূত স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারেই এসেছিলেন। পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম হুগলী, চট্টগ্রাম, বাকলা ও শ্রীপুরে জাঁকিয়ে বসেছে। তাদের অত্যাচারে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর দীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা দেশে চলতে থাকে নিদারুণ অরাজকতা, শোষণ ও অত্যাচার এই যুগকে বলা হয় দ্বৈতশাসনের যুগ। "ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসঘাতক মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরাজ টাকা আদায় করে ও ডেমফাট লেখে বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।" এ

এরকম যুগে যে চুরি ডাকাতি বাড়বে এতে সন্দেহ কি ! এ রকম যুগে দস্যু এবং জলদস্যুরাই রাজা। তারাই ইতিহাসের নায়ক। এই যুগকেই অমর করে রেখেছেন বঙ্কিম। তাই তাঁর উপন্যাসে এদের ভিড়। সেই সময়ে বাঙ্গলার প্রতিটি অঞ্চলে ডাকাত ছিলো। আর্থিক কারণেই অনেকে ডাকাত হয়। জলপথ কিংবা স্থলপথ—কোন পথই নিরাপদ ছিলো না। লোহার মুগুর, বল্লম, লাঠি, শর্কী ইত্যাদি ছিলো ডাকাতদের প্রধান অস্ত্র। নরহত্যার উদ্দেশ্যে বৃহদাকার খড়্গও এরা ব্যবহার করতো।

'ইন্দিরা' উপন্যাসে ডাকাতদের কার্যকলাপের বর্ণনা সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী। মনে হয় সেকালের অলিখিত ইতিহাসের একটি পাতা উদ্ধার ক'রে বঙ্কিম উপন্যাসে সংযোজন করেছেন :

"ইন্দিরা উনিশ বৎসর বয়সে তরা যৌবনে স্বামী সন্দর্শনে যাইতেছে, পথে পড়িল কালদীঘি। দীঘির ঘাটে বটতলায় তাহার পাল্কী নামান হইল। বাহকেরা কেহ শুয়ে বিশ্রাম করিতেছে, কেহ জলে নামিয়াছে, কেহ নিকটে নাই।....এমত সময়ে পাল্কীর অপর পার্শ্বে কি একটা শব্দ হইল। আমি সেদিকের কপাট অল্প খুলিয়া দেখিলাম যে, একদল কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার মনুষ্য। ভয়ে দ্বার বন্ধ করিলাম ; কিন্তু তখনই বুঝিলাম যে এ সময়ে দ্বার খুলিয়া রাখাই ভাল। কিন্তু আমি পুনশ্চ দ্বার খুলিবার পূর্বেই আর একজন মানুষ গাছের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে আর একজন, আবার একজন। এইরূপ চারিজন প্রায় এককালেই গাছ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পাল্কী কাঁধে করিয়া উঠাইয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিল।' বঙ্কিমচন্দ্র এক ইন্দিরার কথা বলেছেন ; আরো কত ইন্দিরার সর্বনাশ হয়েছে। ইতিহাস তাদের কথা বলে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাস্তব জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কাজ ছিলো রাজস্ব আদায়। দেশের ভালো মন্দের দিকে কোন নজরই ছিলো না। তাই বিচার, শাসন, শৃঙ্খলা দেশ থেকে যেন উঠেই গিয়েছিলো। তার উপরে দেখা দিলো চরম খাদ্যাভাব। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। এই অরাজকতা ব্যবস্থার প্রতিকার করার জন্যই গঠিত হয়েছে 'আনন্দমঠ।' বঙ্কিম উপন্যাসে দস্যুরা কেবল অত্যাচারী নয়: প্রতিবাদের পতাকাও নিয়েও তারা হাজির। বাঙ্গালার নবাব আলীবর্দীখাঁর সময় থেকেই হিন্দু সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ দেখা দেয়। মজনু সা ও নাগা সন্ন্যাসীদের ভূমিকা সুপরিচিত। ১৭৬৩ সালে নবাব মীরকাসিম বাংলার মসনদ আবার দখল করার জন্য নাগা সন্ন্যাসীদের নিজের সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করেছিলেন। এই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনেই রচিত 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরাণী'। এই দুটি উপন্যাসে দস্যুরা আর পার্শ্বচরিত্র নয়, তারাই প্রধান নায়ক নায়িকা এবং তাদের চমকপ্রদ কার্য কলাপই কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। 'আনন্দমঠের' সন্তান সম্প্রদায় বঙ্গেশ্বরের মন্ত্রে দীক্ষিত। ভবানী পাঠকের সুযোগ্য শিষ্যা দেবীচৌধুরাণী আর্ত ও দরিদ্রের পরিত্রাতা এবং অত্যাচারীর শত্রু। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং নিজের শ্বশুর জমিদার ব্রজেশ্বরের বিরুদ্ধেও তিনি সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পিছ পা হন নি। দেশপ্রেমের আলোকে স্নাত হয়ে বঙ্কিম সাহিত্যে দস্যুগণ হয়ে উঠেছেন এখানে পূজনীয়, দেশবরেণ্য দস্যু। দেশমাতৃকার সেবকরূপে আজো তাঁরা প্রণম্য।

দিল্লীতে ভারত বনাম ইংলণ্ড ১ম টেষ্ট ক্রিকেট ম্যাচ

২০.১২.৭২

এ বছরে ভারত সফরের জন্যে ইংলণ্ডের ক্রিকেট বোর্ড যখন নির্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকা প্রকাশ করলেন তখন আমাদের ক্রিকেট মহলে কি হৈচৈ, কি বিক্ষোভ। এ কী আবার একটা দল! তাঁদের নামী টেষ্ট খেলোয়াড় নেই। এ তো 'বী' টিম ভারত ইংলণ্ডকে হারিয়ে দিয়ে এসেছে, তাই, কোথায় ইংলণ্ড সবচেয়ে শক্তিশালী দল পাঠাবে, তা নয়, একটা বাজে দল পাঠিয়েছে এ তো ভারতকে তাচ্ছিল্য করা! অতএব এ সফর বাতিল হোক! এমনি সব কড়া কড়া কথা বলতে লাগলেন আমাদের দেশের তথাকথিত ধুরন্ধর ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা! আশ্চর্য তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি! উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে ইংলণ্ড এবার দল গঠন করে সেই দল এদেশে পাঠালে! তার মানে কি সেই সব উঠতি খেলোয়াড়রা অপদার্থ? তাঁদের খেলার মান কি নির্বাচকরা লক্ষ্য করেন নি? একথা কেমন করে আমরা ভুলে গেলাম যে অনেক সময় পুরনো খেলোয়াড়দের চেয়ে উঠতি খেলোয়াড়রা ভাল খেলেন। তার কারণ হল উঠতি খেলোয়াড়রা তাঁদের ভবিষ্যতের জন্যে প্রাণপণ নিষ্ঠার সঙ্গে খেলেন। ফলে তাঁরা প্রায়শঃই ভাল ফল দেখান। তাছাড়া যে দল ভারতে এসেছে তার খেলোয়াড়দের ভিন্ন মনোভাব—তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, ভাল খেলতেই হবে, ভারতে আমাদের নিয়ে সমালোচনা হয়েছে, তার উপযুক্ত জবাব দিতে হবে, ইংলণ্ডের মান বাঁচাতে হবে। এই মনোভাব নিয়ে দলের অধিনায়ক টোনি লুইস সতীর্থদের অনুপ্রাণিত করেছেন, তাই, নিষ্ঠা একাগ্রতা ও প্রাণপন দৃঢ়তা -এদের সহযোগে জাত-ক্রিকেটারের দেশ ইংলণ্ডের ভারত সফর-কারী দল যে ভাল খেলবে—একথা আমরা সুস্পষ্টভাবে আগেই লিখেছিলাম। এবং দেখা গেল, প্রথম টেষ্টের প্রথম দিনে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের তথাকথিত বিজ্ঞদের মতামত কত ভ্রান্ত। আমরা ১ম টেষ্ট্‌টের প্রতিদিনের খেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দিলাম। প্রতিদিনের খেলার পর এই রিপোর্ট লেখা হয়েছে।

১ম টেষ্ট। ২০.১২.৭২ শুক্র। **প্রথম দিন।** ভারতের অধিনায়ক ওয়াদেকর টস জিতে 'ফিরোজ শা' কোটলা' মাঠে ফিল্ডের সবুজে বেষ্ট করতে পাঠালেন। কিন্তু সূচনাতেই নৈরাশ্য ভারতের অভাবিত ব্যাটিং ব্যর্থতা। প্রথম দিনে এই উইকেটেই পাড়ে গেল। রান

—জ্যোতির্ময়

হল সাড়ম্বরে মাত্র ১৪৬। ইংলণ্ডের তিন বোলার আরনলড, কোর্টটম, আর গ্রেগ-এর দুর্দান্ত বোলিংএর সামনে ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা দাঁড়াতেই পারলেন না! এ রকম বিপর্যয় ঘটবে তা ভাবা যায় নি। উইকেট খারাপ ছিল না। কোন অজুহাত নেই। এখনো কাট বোলিংএর সামনে এমনি ছেলেমানুষের মত সব আউট হওয়া। ইংলণ্ডের ফিল্ডিং মোটের উপর ভাল। তবে

দু একটা ক্যাচ তাঁরা ফেলে দিয়েছিলেন। নইলে তো ভারতের অবস্থা আরও শোচনীয় হত। গাভাসকার, ওয়াঙ্গেকর, সরদেশাই, সোলকার—এরা সব যে ভাবে আউট হলেন, কাঁচা খেলোয়াড়দের মতো ব্যাট চালালেন—তা ভাবাই যায় নি। শেষ পর্যন্ত আবিদ আলি আর ভেনকটরাঘবন নট আউট থেকে কতকটা মান রক্ষা করেছেন। অবশ্য ক্রিকেটের ফলাফল আগে থেকে কিছু বলা যায় না। মস্ত অঘটনের খেলা। কখন্ কি হয় ঠিক নেই। এখনো চারদিন বাকি! দেখা যাক্! তবে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের প্রথম দিনের খেলা যে অতিমাত্র হতাশব্যঞ্জক হয়েছে তাতে কারুর দ্বিমত নেই।

স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস।

গাভাসকার, ক গ্রেগ, বো আরনলড—১২। পারকার, ক পোকক, বো আরনলড—৪ ওয়াঙ্গেকার, বো আরনলড—৩। সারদেশাই, বো আরনলড—১২। বিশ্বনাথ, ক নট, বো, গ্রেগ—২৭ সোলকার, ক নট, বো গ্রেগ—২০। ইনজিনীয়ার, বে কোটটাম ১১। আবিদ আলি ব্যাটিং—৪৭। ভেনকটরাঘবন ব্যাটিং—১৪। অতিরিক্ত—১। মোট (৭ উইকেট)—১৫৬

বোলিং। আরনলড, ১৯ ওভার, ৬টা মেডেন, রাণ ৩৭, উইকেট ৪। কোটটাম, ১৯, ৪, ৫৭, ১। গ্রেগ, ২৩, ৮; ৩১, ২।

দ্বিতীয় দিন। এই তো ক্রিকেট! এই খুব অবরুদ্ধ ব্যাটিং, এই গেল গেল! ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয় সামলানো গেল না। দ্বিতীয় দিন ৩৫ মিনিটের ভারতের ইনিংস শেষ হয়ে গেল মাত্র ১৭১ রানে। ইংলণ্ড নামল ব্যাট করতে। প্রথম জুটি অ্যামিস ও উল্ড। তাঁরা ধীরে সুস্থে খেলতে লাগলেন। সোলকার ও আবিদ আলি বল শুরু করলেন। নতুন বলে আবিদ আলির এলো-মেলো বোলিং ব্যাটসম্যানদের ধাঁটি দৃঢ় করতে সাহায্য করল। ১২ রান তুললেন প্রথম জুটি! তার পরেই শুরু হল ইংলণ্ডের ব্যাটিংএ ধ্বস। ৬১ রাণ থেকে ৭১ রানের মধ্যে চার চারটে উইকেট পড়ে গেল। এবং এই ধ্বস সৃষ্টি করলেন ভারতের সেই স্পিন বোলার চন্দ্রশেখর। অদ্ভুত বোলিং করলেন তিনি। চারটে ক্যাচ ভারতীয় ফিলডার-রা যদি না ফসকাতেন তাহলে দ্বিতীয় দিনেই ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যেতো। ফিল্ডিং অবশ্য এদিনে ভাল হয়েছিল। সোলকার একটি চমৎকার ক্যাচ ধরে আলান নটকে আউট করলেন। ইনজিনীয়ারের উইকেট-রক্ষার কাজও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গ্রেগ ও আরনলড শেষ দিকে অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব নিয়ে ব্যাট করে ইংলণ্ডকে অনেকখানি রক্ষা করেছেন। বিশেষ করে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা গ্রেগ-এর ব্যাটিং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়। দ্বিতীয় দিনের ফলাফল দেখে মনে হয়, এই টেস্ট ড্র হবে না—হার-জিতের মীমাংসা হয়ে যাবে

ভারত। অবশিষ্ট ১ম ইনিংস

আবিদ আলি, ক গ্রেগ, বো কোটটাম ৫৮। ভেনকট রাঘবন ক গ্রেগ বো আরনলড—১৭। বেদী, অপরাজিত—৪। চন্দ্রশেখর বো আরনলড—০। অতিরিক্ত—১। মোট ১৭৩।

বোলিং। আরনলড—২৩, ৪, ৭, ৪৫, ৬। কোটটাম—২৩, ৫, ৬৬, ২। গ্রেগ—২৩, ৮, ৩২, ২।

ইংলণ্ড। ১ম ইনিংস।

উল্ড, ক রাঘবন বো চন্দ্রশেখর—১১। অ্যামিস, ব্রিস্টল ইনজিনীয়ার, বো বেদী—৪৬। ফ্রেচার, বো চন্দ্রশেখর—২। ডেনেস, ক ইনজিনীয়ার বো বেদী—১৬। লুইস, এল-বি বো চন্দ্রশেখর—০। গ্রেগ, ব্যাটিং—৪৩। আলান নট, ক সোলকার বো চন্দ্রশেখর—৪। আরনলড ব্যাটিং—১২। অতিরিক্ত—১। মোট ৬ উইকেটে —১৪১।

বোলিং। আবিদ আলি—৯ ১, ৩, ০। সোলকার

—৩০৮০। বেদী—৩৩, ১৫, ৪১, ২। চন্দ্রশেখর—১৫, ১১, ৫৬, ৪। রাঘবন—৭, ২, ১৬, ০।

তৃতীয় দিন। ইংলণ্ডের অবশিষ্ট প্রথম ইনিংস।

তৃতীয় দিনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হোল চন্দ্রশেখরের অলাভাস্ত বোলিং। যে চারটি ইংলণ্ডের উইকেট পড়তে বাকী ছিল তা তিনি একাই দখল করলেন লাঞ্চের আগেই। মোট পেলেন—৮ উইকেট ৮০ রাণের বিনিময়ে। তাঁর টেস্ট খেলার এটাই সর্বোৎকৃষ্ট বোলিং। তাঁর নিজের খেলায় কেন, যে-ভাবে অদ্ভুত চাতুর্যের সঙ্গে বল করে তিনি ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের ব্যাটিং-এর মনোবল ভেঙে দিয়ে তাঁদের ভীত সন্ত্রস্ত করে ফেলেছিলেন সে রকম দুর্ধর্ষ বোলিং টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসেও বেশী দেখা যায় না। তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন অপর ভারতীয় বোলার বিষেন সিং বেদী। তিনি পেয়েছেন ২ উইকেট ৫১ রাণের বিনিময়ে। ভারতীয় দলের ফিল্ডিং মন্থর হয় নি তবে ধারে পড়েছে। শেষ সময় ওয়াদেকার একটি ক্যাচ ফেলে দিলেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল ইংলণ্ড দলের টোনি গ্রেগ-এর ব্যাটিং। তাঁকে কেউ আউট করতে পারলেন না। বিপদের মুখে অসাধারণ খেলেছেন। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হল ২০০। ভারতের চেয়ে মাত্র ২৭ রাণ বেশী। এই অবস্থায় ভারতীয় দল দ্বিতীয়বার ব্যাট করতে নামলো, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংস-এও ভারতীয় ব্যাটিং-এর বিপর্যয়। মাত্র ১২৩ রাণে ৫ উইকেট পড়ে গেল। বড় বড় নামী খেলোয়াড় (যাঁরা ওয়েসট ইনডিজ, ইংলণ্ডে চমকপ্রদ ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন) তাঁরা সবাই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। আশ্চর্য! ইংলণ্ডের বোলিং এমন কিছু মারাত্মক হয়নি। পিচও খারাপ হয়ে যায় নি—তবুও এই ব্যাটিং বৈকল্য কেন হল তার কোন সংগত কারণ তো খুঁজে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডের পক্ষে আণ্ডারউড অবশ্য খুবই ভাল বল করেছিলেন। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে অবশিষ্ট উইকেটে ভারতীয় দল যদি অন্তত মোট ২৫০ রাণ না করতে পারে তাহলে তাঁদের হার মানতে হলে বিস্মিত হব না। অবশ্য চতুর্থ ইনিংস খেলতে হবে ইংলণ্ডকে—মাঠের অবস্থা তখন ভারতীয় বোলারদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে সন্দেহ নেই।

মোটের উপর তিনদিনের খেলায় দুই পক্ষেই সেশনগুলির বিশেষ প্রাধান্য দেখা গেল।

স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস—১৭০।

ইংলণ্ড (অবশিষ্ট ৯ উইকেট) **১ম ইনিংস**।

গ্রেগ, (অপরাজিত)—১৯। আরনলড, ক আবিদ আলি বো চন্দ্রশেখর—১২। পোকক, এ এল, বি, ওয়েলু, বো চন্দ্রশেখর ৪। আণ্ডারউড, ক সোলকার বো চন্দ্রশেখর—৩। কোটটাম, ক আবিদ আলি বো চন্দ্রশেখর—৩। অতিরিক্ত—২৩। মোট—২০০।

বোলিং :—

বেদী ৪৭, ২৩, ৫১, ২

চন্দ্রশেখর—৪১·২, ১৮, ৮০, ৮

ভারত—২য় ইনিংস।

গাভাসকার, ক গ্রেগ বো আণ্ডারউড—৮। পার্থসার এল, বি, ওয়েলু বো আরনলড—৩৮। ওয়াদেকর, ষ্টাম্পড নট, বো পোকক—২৪। সরদেশাই ক গ্রেগ, বো আণ্ডার-উড—১০। বিশ্বনাথ বো আণ্ডারউড—৩। সোলকার (ব্যাটিং)—৩০। ইনজিনীয়ার (ব্যাটিং)—৩। অতিরিক্ত—১০। মোট (৫ উইকেট) ১২৩।

বোলিং :—আরনলড, ১২, ৫, ১১, ১। আণ্ডারউড, ১৮, ৯, ৩৪, ৩। পোকক, ২১, ৫, ৪৩, ১।

চতুর্থ দিন।

একেই বলে ক্রিকেটের নাটক। অপ্রত্যাশিত চমক। এই হাসি, এই কান্না। চতুর্থ দিনের খেলা যখন শুরু হল ভারতের রাণ ৫ উইকেটে ১২৩। বড় বড় ব্যাটসম্যান আউট।

বিপদত্রাতা সোলকার আর সাহসী ইনজিনীয়ার উইকেটে। কিন্তু মন বড় নিরাশ। এঁরা কি পারবেন—

যেখানে প্রথম পাঁচজন আউট। তারপর খেলার মোড় ঘুরে গেল। সংযত ইনজিনীয়ার নিজের স্বভাবসিদ্ধ খেলা খেলতে লাগলেন। সোলকার, বিপদের মুখে তাঁর এই খেলার আর তুলনা নেই। ১২৩ থেকে দুজনে রান ওঠালেন লাঞ্চের সময় ২০৬। তারপরেই আবার বিপর্যয়। লাঞ্চের পরে প্রথম ওভারেই ইনজিনীয়ার আউট। তারপর আবিদ ও ভেনকট! সোলকার চমৎকার খেলে ৭৫ রান করে ক্যাচ আউট হলেন। ভারতের মোট রান হল—২৩৩।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল। কিন্তু কোথায় চন্দ্রশেখরের সেই বলের যাদু! তারপর ক্যাচ ফসকানো। ভারতীয় ফিলডারেরা ৪টি ক্যাচ ফেললো। এগুলি যদি না ফেলা হত তাহলে খেলার গতি অবশ্যই ঘুরে যেত। কিন্তু যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ৭ উইকেটে ১০১ রান করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব নয়। অবশ্য এটা ক্রিকেট —মহান অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। চন্দ্রশেখর! এখন চন্দ্রশেখরের উপরেই সব নির্ভর করছে। আর নির্ভর করছে ভারতের ফিলডারদের ক্যাচ না ফেলার উপর। কাল প্রথম ১ ঘণ্টার মধ্যেই জানা যাবে কে হারবে কে জিতবে।

ভারত। অবশিষ্ট ২য় ইনিংস

সোলকার ক রুপ বো আরনল্ড—৭৪। ইনজিনীয়ার, ক নট বো আনডারউড—৬২। আবিদ ক ফ্রেচার বো পোকক—০। ভেনকট, বো পোকক—০। বেদী, বো আরনল্ড—২। চন্দ্রশেখর (নট আউট) —১। অতিরিক্ত —১২। মোট—২৩৩।

বোলিং। আরনল্ড ২০, ৬, ৪৬, ৩। আনডারউড, ৩০, ১৩, ৫৬, ৪। পোকক ৩১, ৭, ৭২,৩।

ইংলণ্ড। ২য় ইনিংস।

উল্, (নট আউট) —৪৫। এমিস, ক চন্দ্রশেখর বো বেদী—১। ফ্রেচার, ক ওয়াদেকার বো বেদী—০। ভেনেস, ক বিশ্বনাথ বো চন্দ্রশেখর—৩৫। লুইস (নট আউট)—৪৭। মোট (৩ উইকেট)—১০৬।

বোলিং :—বেদী—১১, ১, ৩৫, ২। চন্দ্রশেখর, ১৬, ৬, ৪৪, ১।

পঞ্চম দিন।

অঘটন কিছু ঘটল না। চন্দ্রশেখর তাঁর প্রথম ইনিংস-এর কৃতিত্ব দ্বিতীয় ইনিংসে দেখাতে পারলেন না। ইংলণ্ডের অধিনায়ক টোনি লুইস দেখিয়ে দিলেন যে অধিনায়কত্বে তিনি কারুর চেয়ে কম নন। দ্বিতীয় দিনে সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তিনি অপূর্ব ব্যাট করলেন। টোনি গ্রেগ! তিনিও কি কম খেললেন! দু ইনিংসেই তিনি নট আউট! দু'বারই কোন ভারতীয় বোলার তাঁকে আউট করতে পারলেন না। পঞ্চম দিনের খেলায় প্রথম ওভারেই উল্ আউট হয়ে গেলেও ৩ উইকেটের পর আর কোন উইকেট পড়ল না। টোনি লুইস আর টোনি গ্রেগ নট আউট থেকে প্রয়োজনীয় রান তুলে দিলেন। দ্বিতীয় ইনিংস-এ বিশেষ সিং বেদী চমৎকার বল করেছেন। পঞ্চম দিনে অতিরিক্ত—১। টোনি লুইস (অপরাজিত)—৭০। টোনি গ্রেগ (অপরাজিত)—৪০। মোট রান—১১০।

চূড়ান্ত স্কোর

	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস	মোট রান
ভারত	১৭০	২৩৩	৪০৩
ইংলণ্ড	২০৮	২০৮ (৩ উইকেট)	৪০৮ (৪ উইকেটে)

ইংলণ্ড ৬ উইকেটে জয়লাভ করল।

প্রসঙ্গত

দিল্লীতে প্রথম টেস্ট নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। প্রথম টেস্ট-এ আমরা যে রিপোর্ট দিলাম তা প্রতিদিনের খেলার শেষে তার বিশেষ লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করে আমাদের অভিমতকে প্রতিফলিত করেছে।

আমাদের এই প্রতিদিনের খেলায় দিল্লী রেডিও থেকে ধারাবিবরণী থেকেও সাহায্য পেয়েছি। এই রিপোর্টের মুখবন্ধেই আমরা লিখেছি যে ইংলণ্ড দলের উঠতি খেলোয়াড়রা ভাল ফল দেখাচ্ছেন, এই দলকে ছোট করে দেখার কোন যুক্তিসহ কারণ নেই। আমাদের সেই কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। টোনি লুইস (অধিনায়ক) যিনি এই প্রথম টেস্ট খেললেন, তিনি দ্বিতীয় ইনিংস-এ যেভাবে অধিনায়কোচিত দৃঢ়তার সঙ্গে খেললেন, তার কাছে আমাদের অধিনায়ক ওয়াদেকর ম্লান ও নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন। দু'দফাতেই তিনি ব্যাটিংয়ে ব্যর্থ। ওভাল-এর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ক্রিসমাস দিবসে টোনি লুইস তাঁর দেশকে এক বিপুল এবং নতুন আনন্দে উদ্বেলিত করলেন।

এই খেলায় অনেকগুলি নতুন নজীর সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের অফস্পিন বোলার বিষেন সিং বেদী ২৮টি টেস্ট খেলে ১০০ উইকেট পাবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন এই টেস্টএ দুটি উইকেট পেয়ে। ২১ বছর বয়সি বেদী চতুর্থ ভারতীয় বোলার যিনি এই সাফল্য লাভ করলেন। এর আগে ভিন্থ মানকাদ পেয়েছেন ১৬২, সুভাষ গুপ্তে ১৪১, ইরাপল্লি প্রসন্ন ১২৪ উইকেট।

ইংলণ্ডের টোনি লুইস এই প্রথম টেস্ট খেললেন অধিনায়কের ভূমিকা নিয়ে এবং ১ম টেস্ট-এই জয়লাভ করলেন। ইতিপূর্বে এরকম নজীর আর নেই।

কিংবোন বা কোটলা মাঠে ইংলণ্ড এই প্রথম জয়লাভ করল।

অজিত ওয়াদেকর অধিনায়ক রূপে এই প্রথম পরাজয় বরণ করলেন। ফেরোজ শা কোটলা মাঠে তিনি এই প্রথম টেস্ট অধিনায়ক রূপে দল পরিচালনা করলেন।

দিলীপ সারদেশাই এই টেস্ট খেলে তাঁর টেস্ট খেলায় ২০০০ রাণ পূর্ণ করলেন।

চন্দ্রশেখর এই টেস্ট-এ তাঁর নিজের বোলিংএ সবচেয়ে বেশী উইকেট পেলেন। ইতিপূর্বে গতবারের ওভাল টেস্টএ তিনি পেয়েছিলেন ৬৮ রাণে ৬ উইকেট।

ভারত (ব্যাটিং)

১ম ইনিংস			২য় ইনিংস		
গাভাসকার	ক গ্রেগ বো আরনলড	— ১২	ক গ্রেগ বো আনডারউড	—	৮
পার্কার	ক পোকক বো আরনলড	— ৪	এল, বি, ডব্লু বো আরনলড	—	৫৩
ওয়াদেকর	বো আরনলড	— ৩	স্টাম্পড নট বো পোকক	—	২৪
সারদেশাই	বো আরনলড	— ১২	ক গ্রেগ বো আনডারউড	—	১০
বিশ্বনাথ	ক নট বো গ্রেগ	— ২৭	বো আনডারউড	—	৩
সোলকার	ক নট বো গ্রেগ	— ২০	ক ব্লুম বো আরনলড	—	৭৫
ইনজিনীয়ার	বো কোটটাম	— ১৫	ক নট বো আনডারউড	—	৬৪
আবিদ আলি	ক গ্রেগ বো আরনলড	— ৫৮	ক ফ্রেচার বো পোকক	—	
ভেনকট রাঘবন	ক গ্রেগ বো আরনলড	— ১৭	বো পোকক	—	
বেদী	(অপরাজিত)	— ৪	বো আরনলড	—	২
চন্দ্রশেখর	বো আরনলড	—	(অপরাজিত)	—	১
	অতিরিক্ত	— ১	অতিরিক্ত	—	১২
		মোট— ১৭৩		মোট—	২৩৩

ইংলণ্ড (ব্যাটিং)

	১ম ইনিংস		
উল্ড	ক রাঘবন বো চন্দ্রশেখর	—	১৯
অ্যামিস	ষ্টাম্পড ইনজিনীয়ার বো বেদী	—	৪৬
ক্রেয়ার	বো চন্দ্রশেখর	—	২
জেনেস	ক ইনজিনীয়ার বো বেদী	—	১৬
লুইস	এল, বি, ডবলু বো চন্দ্রশেখর	—	
গ্রেগ	(অপরাজিত)	—	৬৯
নট	ক সোলকার বো চন্দ্রশেখর	—	৪
আরনল্ড	ক আবিদ আলি বো চন্দ্রশেখর	—	১২
পোকক	এল, বি, ডবলু বো চন্দ্রশেখর	—	৪
আনডারউড	ক সোলকার বো চন্দ্রশেখর	—	৬
ফোর্টটাম	ক আবিদ আলি বো চন্দ্রশেখর	—	৩
	অতিরিক্ত	—	২৩
	মোট—		২০০

	২য় ইনিংস		
	বো চন্দ্রশেখর	—	৪৫
	ক চন্দ্রশেখর বো বেদী	—	৯
	ক ওয়াডেকর বো বেদী	—	
	ক বিশ্বনাথ বো চন্দ্রশেখর	—	৩৫
	(অপরাজিত)	—	৭০
	(অপরাজিত)	—	৪০
		—	১
	(চার উইকেটে)	মোট—	২০৮

ভারত (বোলিং)

১ম ইনিংস

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
বেদী	১৭	২৩	৪৯	২
চন্দ্রশেখর	৬১·১	১৮	৮০	৮

২য় ইনিংস

ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
১৯	৯	৩৪	২
১৬	৬	৪৪	২

ইংলণ্ড (বোলিং)

১ম ইনিংস

আরনল্ড	২৩·৬	৭	৬৪	৬
ফোর্টটাম	২৩	৮	৬১	২
গ্রেগ	২৩	৮	৩২	২
আনডারউড	—	—	—	—
পোকক	—	—	—	—

২য় ইনিংস

২০	৬	৪৩	
—	—	—	—
—	—	—	—
৩০	১৩	৪৩	৪
৩৭	৭	৭২	৩

পরবর্তী ২য় টেষ্ট শুরু হবে ৩০শে ডিসেম্বর কলকাতার ইডেন উদ্যানে। কলকাতায় ইংলণ্ড বনাম ভারতের অথা এটি হবে পঞ্চম টেষ্ট খেলা। ইতিপূর্বে ইডেন উদ্যানে ইংলণ্ড বনাম ভারতের যে চার বার টেষ্ট খেলা হয়েছে তার মধ্যে ভারত ১৯৬২ সালে টেড ডেকসটারের দলের বিরুদ্ধে ১৮৭ রাণে অয়লাভ করেছিল। বাকি তিনটি টেষ্টই সমান সমান হয়।

এই উদ্যানে সব মিলিয়ে ১৪টি টেষ্ট এতাবৎ খেলা হয়েছে। তার মধ্যে একবার মাত্রই ভারত জিতেছে ঐ ১৯৬২ সালে। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৪৬ সালে ভারত ৯৬ রাণে হেরে যায়। ১৯৫৯ ও ১৯৬৪ সালে ড্র হয়, তারপর ১৯৬৯ সালে পুনরায় দশ উইকেটে পরাজিত হয়।

ওয়েষ্ট ইনজিজ-এর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে ভারত ড্র করে, ১৯৫৯ সালে ১ ইনিংস ও ৩৩৬ রাণে এবং ১৯৬৬ সালে ১ ইনিংসও ৪৪ রাণে হেরে যায়।

পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দুবার কোনি মীমাংসা হয় নি।

২য় টেষ্ট : কলকাতা ইডেন উদ্যান। ৩০.১২.৭২

চমকের পর চমক, অভাবনীয় নাটকীয় পরিস্থিতি, আশা নিরাশার দোলা, অসহনীয় উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার মধ্যে ভারত পঞ্চম দিনের লাঞ্চের অব্যবহিত পরেই মাত্র ২৮ রানে জয়লাভ করল। স্মরণীয় হোয়ে রইল এই টেষ্ট ম্যাচ নানা কারণে। ইংলণ্ডের উঠতি খেলোয়াড়দের দুর্দান্ত বোলিং এবং দৃঢ় মনোবল, অদৃষ্টপূর্ব তাঁদের ফিল্ডিং নৈপুণ্য, অধিনায়কের দক্ষ পরিচালনা, ভারতের নামী ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতা, ভারতীয়দের অপদার্থ ফিল্ডিং এবং সবচেয়ে স্মরণীয় হোয়ে রইল দুই ভারতীয় বোলারের কর্মকৃতি। বলতে গেলে ভারত যে জিতল তা একমাত্র এই দুই বোলারের জন্য ভাগবৎ চন্দ্রশেখর আর বিশেন সিং বেদী। অদ্ভুত বোলিং করলেন তাঁরা দু'জনে।

কিন্তু এই নিয়ে ভারতের বেশী আত্মপ্রসাদ অনুভব করবার প্রয়োজন নেই, বরং আত্মসমীক্ষা ও আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন। দলের অভাবিত ব্যাটিং-ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে পরবর্তী টেষ্টের দল গঠন করা দরকার। মাত্র দু'জন বোলারের উপর নির্ভর করে কতবার পরাজয় এড়ানো যাবে?—ব্যাটিং যদি না ভাল হয়, ফিল্ডিং যদি উচ্চমানের হয়? ইংলণ্ড দলের ব্যাটিংও ভাল হয় নি—অর্থাৎ তারা বেশী রান করতে পারে নি। তার উত্তরে তারা বলতে পারে, পৃথিবীর সেরা তিনজন স্পিনারের বিরুদ্ধে লড়েছে, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ আর ইংলণ্ডকে হারিয়ে দেবার মূলে, যারা অসামান্য বোলিং-এর স্বাক্ষর রেখে ছিল, সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে বেশী রান না করতে পারা এমন কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। তবুও তারই মধ্যে ইংলণ্ড দলের দু'তিনজন ব্যাটসম্যান অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এই লজ্জাবনত ব্যাটিং-এর কী কৈফিয়ৎ আছে? ইংলণ্ডের বোলাররা এমন কিছু দুর্দান্ত বোলিং করে নি—বলা যেতে পারে সাধারণ মানের বোলিং! তাতেই সব বড় বড় ভারতীয় ব্যাটসম্যান কাৎ! সবচেয়ে বড় করে যার নাম মনে আসছে সে হল গাভাসকার! কী হল তার? সে কী সত্যিই ফুরিয়ে গেছে? যাই হোক, তৃতীয় টেষ্ট-এর দেরী নেই। তার জন্য দলগঠন দেখবার অপেক্ষায় রইলাম।

স্কোর

ভারত ১ম ইনিংস

সুনীল গাভাস্কার ক ক্রিস ওল্ড ব ডেরেক আণ্ডারউড	১৮
রামনাথ পার্কার ক এলান নট ব ক্রিস ওল্ড	২৬
অজিত ওয়াদেকার রান আউট	৪৪
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ক ব্যারিংটন ব কটাম	৩
সলিম দুরাণী ব টনি গ্রেগ	৪
একনাথ সোলকার ব ক্রিস ওল্ড	১১
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ব আণ্ডারউড	৭৫
আবিদ আলি ব কটাম	৩
ই এ এস প্রসন্ন এল বি ডব্লু কটাম	৬
বিশেন সিং বেদী রান-আউট	

(নো বল ৮ বাই ১ লেগবাই ২)

অতিরিক্ত

মোট ২১০

বোলিং :—ক্রিস ওল্ড ২১-৭-৭২-২, বব কটাম ২৩-৬-৪৫-৩, ডেরেক আণ্ডারউড ২০-৪-১১-৪৩-২, প্যাট পোকক ৯-১০-২৬-০, টনি গ্রেগ ৯-১-১৩-১।

২য় ইনিংস

সুনীল গাভাস্কার এল বি ডব্লিউ ব ক্রিস ওল্ড	২
রামনাথ পার্কার ক ফ্রেচার ব ক্রিস ওল্ড	১৫
সেলিম দুরাণী ক ফ্রেচার ব গ্রেগ	৫৩
গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ ক ফ্রেচার ব ক্রিস ওল্ড	৩৪
ফারুক ইঞ্জিনীয়ার ক এলান নট ব আণ্ডারউড	১৭
একনাথ সোলকার ক এলান নট ব টনি গ্রেগ	৬
অজিত ওয়াদেকার এল বি ডব্লিউ ব টনি গ্রেগ	
আবিদ আলি ক ডেনেস এ্যামিস ব ক্রিস ওল্ড	৩
এরাপল্লী প্রসন্ন ব টনি গ্রেগ	
বিশেন সিং বেদী অপরাজিত	৯
ভগবৎ চন্দ্রশেখর ব টনি গ্রেগ	১
অতিরিক্ত (বাই ৮, লেগবাই ৩, নো-বল ৪)	১৫

মোট— ১৪৫

বোলিং—ক্রিস ওল্ড ২১-৬-৪৩-৪ ; বব কটাম ৫-০-১৮-০ ; টনি গ্রেগ ১১-৪-৩-২-২৪-৩ ; ডেরেক আণ্ডারউড ১৫-৪-৩৬-১ ; প্যাট পোকক ৮-১-১২-০।

ইংলণ্ড ১ম ইনিংস

ব্যারি উড ব বেদী	১১
জেনেস এ্যাবিস ক সোলকার ব চন্দ্রশেখর	১১
কিথ ফ্লেচার ক সুনীল গাভাস্কার ব প্রসন্ন	১৭
টোনি লুইস এল বি ডবলিউ ব বি এস বেদী	৪
টোনি গ্রেগ ক অতিরিক্ত (ভেঙ্কট-রাঘবন) ব প্রসন্ন	২১
মাইক জেনিস ক সোলকার ব চন্দ্রশেখর	২১
এলান নট ষ্টাঃ ইঞ্জিনীয়ার ব চন্দ্রশেখর	৩৪
ক্রিস ওল্ড অপরাজিত	৩৩
প্যাট পোকক ব প্রসন্ন	৩
জেরেক আণ্ডারউড ক সোলকার ব চন্দ্রশেখর	
বব কটাম এল-বি-ডব্লু ব চন্দ্রশেখর	৩
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগবাই ৩, নোবল ৪)	৮
বব কটাম এল-বি-ডব্লু ব চন্দ্রশেখর	৩
অতিরিক্ত (বাই ১, লেগবাই ৩, নো বল ৪)	৮
মোট—	১৭৪

বোলিং—আবিদ আলি ৪-১-৪-০, একনাথ সোলকার ৩-১-৫-০, বি এস বেদী ২৮-৭-৫১-২, চন্দ্রশেখর ২৬-২-৫-৬৫-৫, প্রসন্ন ১৬ ৪ ৩৩ ৩।

২য় ইনিংস

ব্যারী উড ব আবিদ আলি	১
জেনিস এ্যাবিস ক ইঞ্জিনীয়ার ব বেদী	
কিথ ফ্লেচার এল বি ডবলিউ ব বেদী	৫
এম জেনেস এল বি ডবলিউ ব চন্দ্রশেখর	৩২
টোনি লুইস ক সোলকার ব বেদী	৩
টোনি গ্রেগ এল বি ডবলিউ ব চন্দ্রশেখর	১৭
এলান নট ক দুরাণী ব চন্দ্রশেখর	২
ক্রিস ওল্ড নট আউট	১৯
পি পোকক ক ও ব বেদী	৫
ডি আণ্ডারউড ক ওয়াদেকার ব বেদী ৪	৫
বি কোটাম এল বি ডবলিউ ব চন্দ্রশেখর	১৩
অতিরিক্ত	
মোট—১৬৩	

বোলিং—আবিদ আলি ৮ ২ ১২ ১, সোলকার ১ ১ ০ ০, চন্দ্রশেখর ২৯ ১৪ ৪২ ৪, বেদী ৪০ ১২ ৬৩ ৫ প্রসন্ন ১০ ১১ ০, দুরাণী ৪ ১ ১৪ ০।

	১ম ইনিংস	২য় ইনিংস	মোট
ভারত	২১০	১৫৫	৩৬৫
ইংলণ্ড	১৭৪	১৬৩	৩৩৭

ভারত ২য় টেষ্টে ২৮ রানে জয়লাভ করল।

॥ শান্তি ॥

প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরমোহন এগিয়ে এগিয়ে হাঁটছিলেন সামনের দিকে তাকিয়ে। এটা তাঁর অভ্যাস। চলার সময় কোন দিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে হাঁটতে থাকেন। তাঁর পাশ দিয়ে চেনা পরিচিত কে এল গেল খেয়াল থাকে না।

অবশ্য তাঁর তাড়াও ছিল সামান্য। মিনিট কুড়ি হয়ে গেল ট্রেন থেকে নেমেছেন। লোকে লোকারণ্য। যেন কলকাতার বেশির ভাগ লোকই ছুটি কাটাতে হাজির এখানে। তাই তাড়াহুড়ো করছিলেন। হোটেল এখানে নেই। পরিচিত একজনের বাড়ী পাবার কথা। তবু ছিল—তাও না মিলতে পারে। তাহলে বিপদের একশেষ। অবশ্য কাল সকালে ঘর খুঁজতে বেরোনো যাবে। যাকে মাঝে বাড়ীর কেয়ারটেকার-কাম মালী-রাই বাবুর অনুপস্থিতিতে ঘর ভাড়া দিয়ে দেয়। কিন্তু হরমোহন আজকের চিন্তাতেই ব্যস্ত। সঙ্গে মালপত্রও সামান্য রয়েছে। তার ওপর সন্ধ্যে হয়ে গেল। হরমোহনের চিন্তাটা সব মিলিয়েই

ষ্টেশন থেকে রাস্তায় নেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে হরমোহন রিক্সার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। টুকুর গলা পেয়ে তাঁকে থামতে হল।—বাবা দাঁড়াও।

বিরক্তি নিয়ে মুখ ঘোরাতেই দেখলেন তাঁর কিছুটা পেছনে টুকু আর শৈলার পাশে এক যুবক। টুকুর সঙ্গে যেন বেশ সহজেই কথা বলছে। হরমোহন দৃষ্টি আর চিন্তাকে তীক্ষ্ণ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভেবে পেলেন না যুবকটি কে।

হাঁটতে হাঁটতে হরমোহনের কাছাকাছি এল ওরা। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছিল ছেলেটিকে। ঠিক ধরতে পারছিলেন না। হরমোহন এখন পরিষ্কার দেখলেন তাঁর সামনে সুধাংশু। এন্টালীর সুধাংশু মিত্র। মাত্র একদিনই তিনি ওকে দেখেছিলেন, কিন্তু ভোলেন নি। হরমোহন নতুন করে বিরক্ত বোধ করলেন।

সুধাংশু এগিয়ে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করল। কাকাবাবু, আপনারা- কাকীমাকে দেখছি না যে। কথাগুলো একটু অসংলগ্ন ঠেকল সকলের কানে। আবহাওয়াটা আড়ষ্ট হয়ে রইল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরমোহন বললেন—তুমি? বেড়াতে এসেছো বুঝি? তিনি গাম্ভীর্য অটুট রাখলেন।

—না না। গত জুলাই থেকে তো আমার এখানেই পোষ্টিং। সুধাংশু অনেকটা সহজ এখন। মাসখানেক হল বাবাকেও এনে রেখেছি। নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকলে শরীর গতিক কিছুটা সারবে। তারপর অবশ্য প্রচণ্ড শীত।

—ও। হরমোহন এখানেই কথার শেষ টানতে চাইছিলেন। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়েই সন্ধ্যে উতরে গেল একে তাঁর তাড়া। এখনও জানেন না ঘরটা ঠিক পাওয়া যাবে কি না। একজনের চিঠি সঙ্গে এনেছেন, তাতেই ঘর পাবার কথা। শেষ পর্যন্ত মেয়েদের নিয়ে কোথায় উঠবেন কে জানে! তার ওপর ঠিক এখনই····। ঠিক আছে আমরা এগোই। আবার দেখা হবে। তিনি বিরক্তি চেপে নরমস্বরে কথা কইলেন।

মেয়েদের দিকে ফিরে আবার বললেন—চলো।

—আরে কোথায় যাবেন? ঐতো বাবা আসছেন, দাঁড়ান একটু। সুধাংশু যথেষ্ট জোর করল। মুখে বিনয়ের হাসি মাখিয়ে শৈলা আর টুকুর দিকে তাকাল। প্রথম থেকেই শৈলা মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে। টুকু আশপাশের ব্যস্ততা, মানুষজন, রিক্সা যাবতীয় ভিড়ে ভীড়ে চোখ বুলোচ্ছিল।

হরমোহন পেছন দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখলেন শিবনাথ পানের খিলি মুখে পুরতে পুরতে এগিয়ে আসছেন। পরিচিত লোককে দেখে ওঁর মুখ হাসিখুশী।

আসলে শিবনাথই হরমোহনকে প্রথম দেখেছেন।

সন্ধ্যার মুখে এসেছিলেন এপাশটা ঘুরে দেখতে। এদিকটা একটু ঘিঞ্জী, নোংরা মতন। তবু থাকছেন যখন বেশ কিছুদিন, স্টেশন এলাকাটাই বা দেখবেন না কেন। সুধাংশুর সঙ্গে বেরিয়েছিলেন তাই।

কিন্তু স্টেশনের কাছাকাছি চেনামানুষকে দেখে সবকিছু ভুলে গেলেন। পান কিনছিলেন দোকানে দাঁড়িয়ে। দেখলেন হরমোহন হনহন্ করে হাঁটছেন। তখন সুধাংশুকে পাঠিয়ে দাঁড় করিয়েছেন।

হরমোহনের সামনে এসে আনন্দে প্রায় উল্লাস করলেন শিবনাথ—আরে মশাই। কিরকম কপাল দেখুন দিকি আমাদের। দুজনেই কলকাতার, অথচ কতদিন পরে দেখা হল শেষে কি না বিচারের এই ছোট্ট স্টেশনে। শরীর ভাল?

মনে মনে হরমোহন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। ট্রেনের ধকল শরীরে নিয়ে বিশ্রাম না করে ছেলে গল্প করার মেজাজ তাঁর নেই। তাছাড়া শিবনাথ আর সুধাংশুকে দেখে পুরণো একটা ক্ষতে সামান্য খোঁচাও লেগেছিল। তবু শিবনাথের আন্তরিকতা উপেক্ষা করতে পারলেন না। বললেন—হ্যাঁ। টুকুর কলেজ বন্ধ—ভাবলুম অমনি শৈলাকে নিয়েও পুজোতে ঘুরে যাই। আপনি……।

শিবনাথ হরমোহনকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। বললেন—থাক্ থাক্। এখন সবে নামলেন ট্রেন থেকে, পরে সব শোনা যাবে। সুধা ক'টা রিক্সা দেখতো।

হরমোহন কিছু বুঝতে পারলেন না। মেয়েদের মুখের ছোঁয়া একবার লক্ষ করে শিবনাথের ওপর দৃষ্টি স্থির করলেন। ভাল জ্বালা! কোথায় তাড়াতাড়ি ঘর খুঁজে নিয়ে একটু বিশ্রাম নেবেন, তা নয়—মনে হচ্ছে শিবনাথের মতলব অন্যরকম। খেয়ালী মানুষ উনি—কি যে মাথায় আছে কে জানে।

কারুর আপত্তিই টিকলো না। হরমোহন সম্পূর্ণ বেঁকে বসেছিলেন প্রথমে। তা হয় না। বরং আজ একদিন যাওয়া যাবে। এখানে যখন এসেছেন দেখা হবেই আবার। শৈলাও আপত্তি তুলল ঘোরতর। অবচেতন মনে তার সামান্য আনন্দ হলেও কিরকম একটা অস্বস্তি বোধে আচ্ছন্ন হয়ে রইল সে। যেন সামান্য অপমানের ব্যাপার এই। সুধাংশুদের পরিবারের সঙ্গে তাদের পরিচয় ছিল ঠিক, কিন্তু এখন তা যখন আর টিকে নেই, এতটা বাড়াবাড়ির কোন মানে হয় না।

তাছাড়া শৈলার অন্য চিন্তাও ছিল। হরমোহন কিছু মনে করতে পারেন। হয়তো সুধাংশুর এখানে থাকার কথা মেয়ের জানা ছিল। অথচ শৈলা কাউকেই বুঝতে দেয়নি। বাবা আর মেয়ের মধ্যে এরকম কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে।

তবু যেতেই হল। শিবনাথ আর সুধাংশুর কাছ থেকে রেহাই পাওয়া গেল না।

সুধাংশু এখনও কোয়ার্টার্স পায় নি। ছোটখাটো একটা বাড়ীই ভাড়া নিয়েছে। দুটি প্রাণীর তিনটি ঘর লাগতে পারে না। শিবনাথ একখানা ঘর নিজেদের জন্যে রেখে দুটো ছেড়ে দিলেন হরমোহনকে। শৈলা টুকুর রয়েছে, ওদের আলাদা ঘর দরকার। হরমোহনের সঙ্গে যাই ঘটুক, শৈলা বা টুকুর কোনরকম কষ্ট—ওঁর সহ্য হবে না।

শৈলা ক্রমেই রান্নার ভারটা নিল। একটা ছোট ছেলে সুধাংশুর রান্না করত। একদিন শৈলা ওকে ছুটি দিয়ে দিল। বেড়াতে এসেছে বটে তবু একটা লজ্জায় যে ঘরের কুঁকড়ে রয়েছে। বাবার সামনে তার যেন এখানে কেমন বাধো বাধো ঠেকছে। তাই বুদ্ধি করে এ কাজটা নেওয়া।

শিবনাথ বলেছিলেন—না, না। ওকি কথা মা। দু-দিন বাইরে এসে তুমি কেন রাঁধবে? বৈদ্যু রয়েছে। ওর রান্না খারাপ নয়।

শৈলা কথা শুনল না। জোর করে কাজে ডুবে রইল।

সত্যি বলতে শিবনাথ আর সুধাংশুর জন্যে কিছু ভাল রান্না করেও তৃপ্তি পাচ্ছিল সে। একটা আনন্দ উপভোগ করছিল মজা করে। আবার নিজের জন্যে তার দুঃখ ও যে হচ্ছিল না তা নয়।

টুকু অন্যরকম। ভোর ভোর উঠে সুধাংশুকে ডাকাডাকি করত। তারপর চা খেয়ে দুজনে বাজারে।

অবশ্য মাঝে মাঝে ওরও দীর্ঘশ্বাস পড়ত দু-একটা। কি হলে কি হতে পারত অথচ হয়নি ভাবত। তবুও ওর মেয়ে খাকার মেয়ে নয়। কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েও। ওসব আবেগটাবেগ ওকে সহজে বিচলিত করতে পারে না।

অবশ্য সুধাংশুকে টুকুর বাজারে টেনে নিয়ে যাবার অন্য কারণও ছিল। প্রথম দিনেই হরমোহন টুকুর হাতে কিছু টাকা দিয়ে দিয়েছিলেন। শিবনাথ বা সুধাংশুকে খাওয়া খাকার জন্যে টাকা দেওয়া অভদ্রতা নয়। হরমোহন তাই ওরকম ব্যবস্থাটা করেছিলেন। ভোরে যখন সুধাংশুর সঙ্গে বাজার করতে যেত অবশ্যম্ভি করে মাছটা আর মাংসটার দাম টুকুই দিত। একদিন পুরো বাজারের খরচটাই ও করল। এ কাজ ওর দ্বারাই সম্ভব। টুকু যা মেয়ে—হরমোহন ভাল করেই জানেন—সুধাংশু ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

মিনিট দশেক হাঁটলে বাজার। বাজার আর কি! পনের কুড়িজন দেহাতী—মেয়ে-পুরুষ জিনিসপত্র নিয়ে এক জায়গায় জড়ো হয়ে বসেছে। কারুর কাছে ছটা আটটা মুরগী, কিছু মুরগীর ডিম। আবার বস্তার চাল ফেলে বিক্রী করতে বসেছে কেউ-কেউ। দু-তিন হাঁড়ি টক দই নিয়ে বসেছে একজন। খোঁপায় লাল ফুল গোঁজা একটি দেহাতী মেয়ে আঁটি বাঁধা কিছু আখ এনেছে বিক্রীর জন্যে। আবার বড় ধামায় মুড়িও বিক্রী করছে দু-একজন। কাঁচা বাজার নিয়ে বসেছে অনেকেই। দু-চারটে করে সবাই এক একজনের কাছে। পরিমাণে নিতান্তই কম। বোঝা যায় নিজের নিজের ক্ষেতের জিনিষ এসব। বাজার বলতে কিছুই নেই। তবু বাজার। বেড়াতে এসে এরকম বাজার ভাল লাগবেই।

শিবনাথ আর হরমোহনও বাজারের পাশ দিয়ে বেড়াতে যেতেন। ফিরতেন বেলা করে। শিবনাথ মাসখানেক আছেন এখানে। রাস্তা-ঘাট প্রায় চেনা। হরমোহনকে সবকিছু দেখাতে দেখাতে নিয়ে যেতেন। ঐতিহ্যের বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে পথ হাঁটতেন দুজনে। পুরনো কিছু কিছু কথা এসে পড়ত। সমবয়সী একজনকে পেয়ে শিবনাথও বেশি কথা বলতেন। তবু যেন ঠিক জমত না। একটা ফাঁক থেকে যায় দুজনের কথা-বার্তায় আলাপ-আলোচনায়।

এই ক'দিন হরমোহন নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন সব। সুধাংশুর মাইনে-পত্তর এমন কিছু বেশী নয়। সে রেলের সামান্য কেরাণী। তবু হরমোহন দেখলেন—তার সবকিছু বেশ ছিমছাম। বাড়ীতে মেয়েছেলে বলতে কেউ নেই। তবু একটা পরিপাটী ভাব চারিদিকে ছড়ানো। সুধাংশুর কথাবার্তা চালচলন সবই কেমন পরিশীলিত মার্জিত। একটা সুখী সুখী স্বচ্ছন্দ ভাব তাকে ঘিরে যেন সর্বদাই উৎফুল্ল রেখেছে।

অবশ্য এই চেহারাটাই সারা বছরের চেহারা নাও হতে পারে। তবু হরমোহন সুধাংশুকে নবারুণের পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে চাইছিলেন মনে মনে। নিজের ছেলে বলায় রাখতেই আজ শৈলার এই অবস্থা। হরমোহন বুঝছেন সামান্য মানুষ সুধাংশু ওকে শান্তি দিতে পারত। সুষ্ঠু একটা সংসার পেত শৈলা। সুধাংশুর সামর্থ্য কম হতে পারে তবু সাধ্য কম নয়। আর শিবনাথের সঙ্গে কোনরকম ভিন্নতারও সৃষ্টি হত না তাহলে। এখন শৈলার অবস্থার জন্যে সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর হরমোহনই নবারুণকে খুঁজে বার করেছিলেন। এখন দেখছেন তাঁর সমস্ত হিসেব ভুল।

বাবার সামনে শৈলা শিবনাথ বা সুধাংশুর সঙ্গে কথা কইছিল না বিশেষ। তবু ওবে ইচ্ছে করেই কাজের মধ্যে ব্যস্ত তা বুঝতে এতটুকু কষ্ট হয়নি হরমোহনের। যেন শৈলা নিজের পছন্দমত একটা সংসার পেয়ে গেছে। এতদিন গৃহস্থালীর কাজকর্ম করতে না পেরে হাঁফিয়ে উঠেছিল। এখন ও স্বাভাবিক।

হরমোহন শৈলার অলক্ষে লক্ষ করছিলেন মেয়েকে। একটা চাপা আনন্দে যেন নতুন প্রাণ পেয়েছিল সে। শ্বশুরবাড়ীতে শৈলা যেমন থাকে দেখে আসেন নি নিজে চোখে। কিন্তু শুনেছেন। যে ক-দিন টুকু যায় শুধু সে ক-দিনই হাসিখুশী থাকে শৈলা। না হলে সে বড় একা। বস্তুত নিতান্তই সঙ্গীহীন।

বাড়ীতে শৈলার করার মত কিছু নেই। নবারুণ

একটা পাবলিসিটি ফার্মের টপ্ এগ্‌জিকিউটিভ। ভার মোটা অঙ্কের বেতন। অফিস থেকে গাড়ীও দিয়েছে। লেক-গার্ডেন্স-এর মত জায়গায় নবারুণ ফ্ল্যাট কিনে নিয়েছে একটা। সুন্দর পরিবেশ। টিপ্‌টপ সাজানো ফ্ল্যাট। ড্রইংরুম, সোফাসেট, ফ্রীজ। কোন কিছুর অভাব নেই। দুজনের সংসারে ঠাকুর চাকর। তবু সব থেকেও শৈলার যেন কি নেই। সারাদিন বাড়ীতে হাঁফিয়ে ওঠে সে।

নবারুণ ব্যস্ত মানুষ। বিভিন্ন কাজের ভীড়ে শৈলার দিকে তাকানোর সময় নেই। অবশ্য ওর মতে শৈলার অভ একা বোধ করারও কারণ নেই কিছু। ওদের এরিয়ার ক্লাব-টাব রয়েছে অনেক। অনায়াসেই সে মেম্বার হয়ে যেতে পারে।

বা শৈলা আঁকতে শিখুক। নবারুণের লাইনটা কমার্শিয়াল। তবু তার কাছে বিভিন্ন লোকের আনাগোনা। সুবিধেই হবে। ক্যানভাস আর তুলি নিয়ে তার সময় কেটে যাবে বেশ।

কিন্তু এসব শৈলার কাছে বড়মানুষের চিন্তা! টাকা পয়সা গাড়ী চড়ার মধ্যে শান্তি খুঁজতে যাওয়া তার পক্ষে বৃথা।

নবারুণের মত ছেলের শৈলাকে বিয়ে করার কথা নয়। তবু এ সম্বন্ধটা এসেছিল হরমোহনের কাছে। তাঁর এক বন্ধু দেবতোষ খোঁজটা এনেছিলেন। ছেলে হিসেবে নবারুণ ভালই। চেহারা দেখায় চওড়া—কর্মা রঙ্। বিয়ের বছর দেড়েকের মধ্যেই ওর স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেপুলে কিছু রেখে যায়নি মেয়েটি। তবু নবারুণের বয়সও এমন কিছু নয়। তিরিশের ঘরেই। তাই ওর বিয়ে করা।

অবশ্য শৈলাকে নবারুণ আগে একবার দেখেছিল। হরমোহনের একমাত্র ছেলে স্বদেশ তখন একটা মার্চেন্ট কোম্পানীতে সবে ঢুকেছিল। এবং হরমোহনের বন্ধু দেবতোষই বছরখানেক আগে স্বদেশকে নবারুণের কাছে পাঠান। স্বদেশের চাকুরীটা অন্য কার্মে বটে, তবু নবারুণ না থাকলে ওটা হত না। ওপর মহলের অনেকের সঙ্গে ওর জানাশোনা। স্বদেশের চাকরীর ব্যাপারে নবারুণ যথাসাধ্য সাহায্য করেছিল।

ছেলের চাকরী হয়ে যাবার মাসখানেক পরে হরমোহন একদিন নবারুণকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আর কিছু নয়। এই বাজারে চাকরী বলে কথা। অন্য কোন ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার চেয়ে একদিন ভালমন্দ খাওয়ানোর ব্যবস্থাটাই ভাল। হাসি ঠাট্টা। গল্পগুজব

সেদিনই নবারুণ শৈলা টুকুকে প্রথম দেখল! ওদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলল অনেক। টুকু তখন সবে হাঁটার দেকেণ্ডারী দিচ্ছে। আর শৈলা সেই বছরই গ্র্যাজুয়েট হল।

হয়তো শৈলাকে দেখে ভাল লেগেছিল নবারুণের। স্ত্রী মারা যাবার পর তাই তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিল ও আগে শৈলার কথাই মনে এসেছিল।

ঠিক এমন একটা সময়ে শিবনাথও একটা খবর পাঠালেন হরমোহনের কাছে। উনি শৈলাকে দেখেছেন ওর মেয়ে ইতুর বন্ধু শৈলা। সেই সূত্রেই ওঁদের বাড়ীতে শৈলার যাতায়াত। মেয়েটি বেশ শান্ত শিষ্ট। অথচ যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। চেহারাটা ছিপ্‌ছিপে, কিন্তু একটা ধার আছে। সুধাংশু আর শৈলা পরস্পরকে চেনে। শিবনাথের ইচ্ছে শৈলাকে ওঁর ছেলের বৌ করে আনেন। ওঁর নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ওরা সুখী হবে। ওদের মানাবেও ভাল।

হরমোহন এসব ঘুণাক্ষরেও জানতেন না। তাহলে এটা তাঁর ভালবাসার ব্যাপার। ভেবেছিলেন তিনি। শৈলা সুধাংশুকে ভালবাসত। অথচ কিছুই বোঝা যায় নি।

হরমোহন মহাফাঁপরে পড়ে গেলেন। পুরনো মানুষ। ভেবে চিন্তে দেখলেন—পাঁচজনের কাছে যা শুনেছেন—অমন বিয়েতে বেশীর ভাগই সুখী হয় না। অশান্তি ছাড়া দুজনের লাভ হয় না কিছু। বেশ কিছুদিন স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেও মনে সায় পেলেন না। আসলে স্বামী-স্ত্রী দুজনের চিন্তাভাবনাই পুরনো। আধুনিক কোন কিছু অতি সহজে নিতে পারেন না; অনেক যুক্তি-তর্ক সামনে এসে পথ আগলে দাঁড়ায়।

নবারুণের কাছে তাঁদের কৃতজ্ঞতাও ছিল। হরমোহন অবসর নিয়েছেন। সামান্য পেন্সন সম্বল। স্বদেশের চাকরীর গুরুত্ব কম নয়। তার ওপর তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন শৈলাকে বিয়ে করতে নবারুণ বিশেষ দাবীদাওয়া চাইবে না। আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সে যে যথেষ্ট ওপরে এ সম্পর্কে নবারুণ যথেষ্ট সচেতন!

অবশ্য শিবনাথও পরে হরমোহনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন—শৈলাকে পুত্রবধূ হিসেবে পাবার জন্যে। যেনা পাওনার কথা তোলেনও নি। বলেছিলেন—আমার একমাত্র ছেলে, আমিই যা পারি সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে যাব। আপনি শুধু শৈলাকে দিন।

শিবনাথের সঙ্গে হরমোহনের তখনই আলাপ। শিবনাথ অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলেন শৈলার জন্যে। ওঁর বাড়ীতে শৈলার অনেকদিনের যাতায়াত। উনি তাকে যেমন চেনেন, অন্য কেউ তেমন নয়। বাস্তবিক উনি মেয়েটিকে ভালবাসতেন খুব। শৈলাও ওঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি করত।

ক-দিন নানা চিন্তা ভাবনার মধ্যে থেকে হরমোহন ঠিক করে ফেললেন নবারুণের সঙ্গেই শৈলার বিয়ে দেবেন। সুধাংশুর চেয়ে নবারুণের অবস্থা অনেক ভাল! ওর কাছে মেয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

শৈলাকে ডেকে একদিন বলে দিলেন, সুধাংশুর কথা ভুলতেই হবে তোমাকে, উপায় নেই। মনে থাকে যেন কিরকম সময়ে নবারুণ আমাদের সাহায্য করেছে। আর শ্বশুর শাশুড়ী দেওর ননদ বলতে কেউ নেই, ও একাই সব। তার মানে সব কিছুই তোমার।

সুধাংশু বা শৈলা অন্য কোন উপায় খুঁজতে পারত। কিন্তু শিবনাথ তা হতে দিলেন না। চেষ্টাচরিত্র করেও যখন হরমোহনের মত আদায় করা গেল না তখন হাল ছেড়েই দিলেন। শৈলাকে নরম নরম কথায় বোঝাতে চাইলেন। বললেন—সব দিক বিচার বিবেচনা করে তোমার বাবা ঠিকই বলেছেন, মা। তুমি বাবার কথা শোন। আমার আশীর্বাদ রইল, সুখী হবে!

হরমোহন এই ক-দিন ধরে শুধু দেখছিলেন আর ভাবছিলেন। যেন এতদিন তাঁর চোখ বন্ধ ছিল। কিন্তু এখানে বেড়াতে এসে সুধাংশু আর শিবনাথের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তাঁকে শুধু চিন্তায় পেয়ে বসেছে। তাঁর ইচ্ছে শৈলা মেনে নিয়েছে। কিন্তু সুখ শান্তি কিছু পায়নি। সত্যি বলতে মেয়েকে জোর করে নির্বাসনে দিয়েছেন তিনি।

নবারুণ নিজের মত থাকে। শৈলাকে নিয়ে কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না। বেশির ভাগ দিনই ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। কাজের খাতিরে মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় যেতেও হয়। আজ এ মেয়ার, কাল ও মেয়ার—বিভিন্ন পার্টিলিয়নে ঘুরে বেড়ানো। কাজকর্মের তদারকি। ছুটিছাটার দিনেও ওর কাজ থাকে। যখন সামান্য অবসর পায় তখন আর শৈলার বেড়ানোর ইচ্ছে থাকে না। বলে—তুমি যাও, শরীরটা আজ ভাল নেই।

শৈলা মুখ বুজে থাকে সব সময়। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়েই তার দিন কাটে।

অথচ সেই শৈলাকে এখানেও দেখছেন। অতি সহজেই শৈলা সুখী হতে পারত কিন্তু তিনিই হতে দেন নি। হরমোহন ভেবে দেখলেন আক্ষেপ আর নিজের ওপর বিতৃষ্ণায় তাঁর সারা মন বিষিয়ে রইল।

তিনি টুকুকেও লক্ষ করলেন। ও সুধাংশুদা সুধাংশুদা করে বাড়ী মাথায় করছিল যখন তখন। দিদিকে বুঝি লুকিয়ে লুকিয়ে সুধাংশুকে ফ্যাপানোর চেষ্টাও করছিল। যেন একটা মজায় রয়েছে ও।

এ সবই হরমোহন দেখলেন। আরও এও দেখলেন যেন শিবনাথের চোখমুখও উজ্জ্বল চকচকে। বাপ-বেটায় আছেন এখানে। কে আর হৈ-হুল্লোড় মাতছে। হরিণীর মত টুকুর চঞ্চলতা, শৈলার পাকা গৃহিণীর মত গোছগাছ, রান্না, পরিবেশন বা গৃহস্থালীর অন্যান্য কাজে ব্যস্ততায় বাড়ীতে যেন পূর্ণ সংসারের প্রাণ দেখছিলেন শিবনাথ। কথাবার্তা, হাবভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল ওঁর আনন্দটুকু।

একদিন ওরা হৈ হৈ করে লাটু পাহাড়ে ঘুরে এল। পাহাড়ী জায়গা। আশপাশে টিলা টিলা। তবু পাহাড় বলতে একটাই। অবশ্য ছুটো ক্ষীণ ঝর্ণাও আছে। একটু

ঘুরে। যাওয়ার অনেক অসুবিধে। আর অতটা গিয়েও তেমন কিছু নয়। কাছেরটাতে পরের দিন বেড়িয়ে এল সুধাংশু শীলা টুকু।

হরমোহন আর শিবনাথ দুজনেই বাড়ীতে রইলেন। হৈ হৈ করে ওদের যেতে দেখলেন। শীলা টুকুর মত ছটফটে নয়, তবু দেখলেন তার চোখেমুখেও হাসির ছটা। কোন কিছু দেখার আনন্দের চেয়েও যেন মানসিক কিছুর আকর্ষণ ছিল বেশি। বস্তুত এখানে এসে প্রথম দিকে তার বাধো বাধো ঠেকছিল। কিন্তু এখন দুটির বাঁধ ভাঙছিল শীলার মনের মধ্যে।

দুই প্রৌঢ়ই একটা অদ্ভুত চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। কেউ কারুর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছিলেন না তাই। না হলে দেখা যেত দুজনের বুকেই একটা ব্যথা আঁক কেটে রেখেছে। কষ্ট পাচ্ছেন দুজনেই। অথচ কারুরই বলার নেই কিছু।

এমন করে দিন পাঁচেক কাটতে হরমোহন জোর তত্ত্বে তৈরী হলেন। ভেবেছিলেন আরও কিছুদিন বেশি থাকবেন। শিবনাথ সুধাংশুর সঙ্গে দেখা না হলে তাই থাকতেন। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই হরমোহনের মনে একটা কষ্ট। যখনই শীলার ওপর চোখ পড়ছে একটা ব্যর্থতার গ্লানি তাঁকে অবশ করে রাখছে। সুধাংশুদের সঙ্গে দেখা না হলে পুরনো কথা এমন জ্বালা সুরু হত না। মোটামুটি ঠেলেই ছিলেন। মুখে যা-ই বলুন দুই মেয়েকে নিয়ে সিমুলতলায় বেড়াতে আসার আসল কারণও তা-ই। ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা-ও হবার যো নেই। আবার এসে যখন পড়েছেন হুট করে চলে যাওয়াও যায় না। সেটা শিবনাথের প্রতি অশোভন আচরণ হত।

যাবার দিন সুধাংশু স্টেশনে গেল ওদের গাড়ীতে তুলে দিতে। শিবনাথও যেতে চাইছিলেন। হরমোহন নিরস্ত করলেন। বয়স হয়েছে? উনি আবার এতটা পথ যাবেন। তাছাড়া বেরোবার মুখে হরমোহনের কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল। শিবনাথের ওপর টানও বোধ করছিলেন একটু একটু।

শিবনাথ বললেন—শীলা গিয়েই কিন্তু চিঠি দিও। গভীর খাদ থেকে গলার স্বর বেরোল। একবার ভাবলেন বলেন—নবারুণের সময় হলে পরে একদিন ওকে নিয়ে ওর কলকাতার বাড়ীতে যেতে। খুব আনন্দ পাবেন।

কিন্তু না বলে চুপ করে রইলেন। ছেলেকে বললেন —গাড়ীতে ঠিকমত বসিয়ে দিয়ে এসো সুধা, তাড়া তাড়া।

হরমোহন এতক্ষণ কথা বলেন নি। অনেক কষ্টে এবার চাপাস্বরে বললেন—বড় আনন্দ পেলুম। অবশ্য আপনাদের অনেক অসুবিধে করেছি।

—আরে না না। ওকি বলছেন মশাই। শীলা টুকু তো আমার বাড়ীর মেয়ে।

ট্রেন ছাড়ার মুখে সুধাংশু বলল—যাচ্ছি কাকাবাবু। টুকু শীলা সাবধানে যেও। এই প্রথম হরমোহনের সামনে শীলাকে নাম ধরে ডাকল সুধাংশু।

শীলা কিছু বলল না মুখ তুলে বিষণ্ণ হাসি হাসল একটু। টুকু হঠাৎ করে বলে ফেলল—ছুটিতে বাড়ী গেলে একদিন আসুন না আমাদের বাড়ী। শেষের দিকে সহসা কথাটায় জোর কমে গেল।

হাওয়াটা যেন ভারী হয়ে উঠল হঠাৎ। এ প্রসঙ্গ না উঠলেই শীলা স্বস্তি পেত। হরমোহনকেও অমন করে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে হত না।

কি বলবেন কি বলবেন করে হরমোহন বললেন— বিদেশ বিভুঁয়ে আছো। সাবধানে থেকো বাবা। এদিকটা আবার বড় নির্জন। হরমোহনও এই প্রথম সুধাংশুর সঙ্গে দরদ দিয়ে কথা বললেন। স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ।

ট্রেনের হুইসিল আর ক-টা নিশ্বাস প্রায় একসঙ্গেই পড়ল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে সুধাংশু হাত নাড়তে টুকুর সঙ্গে শীলাও হাত নাড়তে লাগল।

গাড়ী ছেড়ে দিতে হরমোহনের মনটা যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল।

শিবনাথ সুধাংশু শীলা কারুরই সাধ তিনি পূরণ করেন নি। এখন ইচ্ছে থাকলেও কোন কিছু করার উপায় নেই।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভাবছেন শিবনাথ আর সুধাংশুর ব্যবহারের কথা। হরমোহন যেন আত্মীয়ের মত আতিথেয়তা পেলেন। অনুষ্ঠানের ত্রুটি নেই কোনরকম। একটুও বোঝা গেল না যে এই শিবনাথের অনুরোধ একসময় হরমোহন রাখেন নি। এবং শিবনাথ খুব সহজেই গ্রহণ করেছেন তা। আর তারপরও এমন আদর যত্ন। যেন সবকিছুই স্বাভাবিক। এটা আসলে চোখে আঙুল দিয়ে কোন কিছু দেখানো। তাঁকে একপ্রকার শাস্তি দেওয়া। হরমোহন ভেবে দেখলেন।

বরং শিবনাথ বিরূপ ব্যবহার করতে পারতেন। তাতেই হরমোহন আনন্দ পেতেন বেশি। এমন করে বুকটা হু হু করে উঠত না। শীলার মুখ চেয়ে কৃতকর্মের জন্যে নিজের ওপর ধিক্কার জন্মতো না এত।

জানলা দিয়ে বাইরে দেখতে দেখতে হরমোহন ভাবতে লাগলেন এই সব। টনটনে একটা ব্যথায় চেউ বুকের মধ্যে দাপাদাপি করতে লাগল। রেলটা ছুটতে লাগল জোরে জোরে।

১৯৬১ সালের ২৬শে জানুয়ারী লাহোর কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষিত হবার পর থেকে প্রতি বছর ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত হয়। এবার সভা ও শোভাযাত্রা বে-আইনী ঘোষণা করলেন। ফলে দেশের লক্ষ লক্ষ সংগ্রামী দেশপ্রেমিক সরকারের আইন অগ্রাহ্য করে জেলে যেতে লাগলো। সুভাষচন্দ্র তখন কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র। তিনি অধিক রাত্রি পর্যন্ত করপোরেশনে থেকে কাজ করেন। গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে যান। পুলিশ গ্রেপ্তার করার জন্য প্রাতঃকালে সুভাষচন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করলো পেলনা। সরকারের আদেশ অগ্রাহ্য করে সুভাষচন্দ্র নির্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করে শোভাযাত্রা নিয়ে ময়দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় পুলিশ তাঁর গতিরোধ করে বেপরোয়া লাঠি চালনা শুরু করলো সুভাষচন্দ্রের কেশ বিরল মস্তিষ্ক বয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে। সৌম্য শান্ত গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল রক্তস্নান হচ্ছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সুভাষচন্দ্র মৃত্যু অগ্রাহ্য করে দুহাতে দুই জাতীয় পতাকা ধরে ঐ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে—সেদৃশ্য যাঁরা দেখেছেন জীবনে ভুলতেপা রবেন না—সে এক অতুলনীয় দৃশ্য।

সেদিনের বাঙালী

সেদিনের বাঙালী ছিলেন শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞান গরিমায় ধর্মে কর্মে ও সাধনায় সকলের শীর্ষে। তাঁরা ছিলেন আত্মসচেতন ও ভাব-সমৃদ্ধ মনীষী—ষোলআনা মানুষ ও ষোলআনা বাঙালী। দেশাত্মবোধ, স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি মায়া মমতা দয়া দাক্ষিণ্য উচ্চাভিলাষ প্রভৃতি সমস্ত গুণাবলীই তাঁদের জীবনকে করেছিল সমৃদ্ধ ও সুন্দর। তাঁরা দেশ ও দেশের মানুষকে সত্যিই ভালবাসতেন। দেশপ্রেম ও পরহিতব্রত ছিল তাঁদের জীবনধর্ম।

একদিন ছিল যখন সারা ভারতের মানুষ বাঙালীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো। এবং বাঙালীর মস্তিষ্ক, বাঙালীর হৃদয় ও বাঙালীর শক্তিই সেদিন ভারতের সকল সংকট ও সমস্যার সমাধান করেছে। সেদিনের বাঙালীর চরিত্র জীবন-আদর্শ জীবন-ধর্ম অনুকরণ ও অনুশীলন করলে আজ আমাদের এ চরম দুর্গতি হতো না।

আজকের মানুষকে সে-সব সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে গল্পভারতীর পাতায় কিছুদিন ধরে সেদিনের বাঙালীদের অমৃত-সমান জীবন কাহিনী প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সারিতে এবার এলেন দেশবরেণ্য আনন্দমোহন বসু। উনবিংশ শতকে বাংলা তথা ভারতের গগনে যে সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সুশোভিত হয়ে দেশের মহাকল্যাণ সাধন করেছিলেন আনন্দমোহন বসু ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

—সম্পাদক

সেদিনের বাঙালী

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬)

মণি বাগচী

'এই মিলন-মন্দিরের ভিত্তি কেবলমাত্র এক টুকরা মাটির উপরে নয়, ইহার ভিত্তি আমাদের সকলের অক্লান্ত ব্যথিত হৃদয়ের উপর।'

১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর।

বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় তারিখ। ঐদিন স্বৈরাচারী লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ বিধানের প্রতিবাদে উত্তর কলকাতায় একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান হয়েছিল। ঐদিন অপরাহ্নে সহস্র বিক্ষুব্ধ জনতার সম্মুখে মিলন-মন্দির বা 'ফেডারেশন হলের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। এই পবিত্র অনুষ্ঠানে যিনি পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনিই স্বনামধন্য দেশপ্রেমিক আনন্দমোহন বসু। ঐদিন আবার রাখীবন্ধন উৎসব হয়েছিল—বাংলার কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল মিলনের এক নতুন মাঙ্গলিক। ঐদিন বঙ্গভঙ্গ আইন প্রবর্তিত হয় ও এক বাংলা ভেঙে দুই বাংলায় পরিণত হয়েছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িত জননায়ক আনন্দমোহন বসু স্ট্রেচার-বাহিত অবস্থায় সভাস্থলে এসে শিলান্যাস করেন মিলন-মন্দিরের। যেখানে অনুষ্ঠানটি হয়, এর ঠিক অদূরেই আনন্দমোহন বসুর বাসভবন।

রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি এই উপলক্ষে যে অপূর্ব ভাষণটি রচনা করেছিলেন সেটি সভায় পাঠ করেন উদাত্তকণ্ঠে বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ আর সঙ্গে সঙ্গে তার

বাংলা অনুবাদটি করে তেমনি উদাত্ত অথচ মধুরকণ্ঠে পাঠ করেন রবীন্দ্রনাথ। উপস্থিত সকলেই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনল : 'Whereas the Government has thought of it to effectuate the Partition of Bengal inspite of the universal protest of the Bengalee nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our province and, to maintain the integrity of our race. So God help us'. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সেদিন ঐ সভাস্থলেই মিলন-মন্দির নির্মাণের জন্য মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সত্তর হাজার টাকা চাঁদা উঠেছিল। আরো উল্লেখ্য যে, এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তথাপি এমনই প্রগাঢ় ছিল তাঁর দেশপ্রেম যে তিনি শুধু উপস্থিত থাকেন নি। পরন্তু ঐ সভায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করে একটি চমৎকার বক্তৃতাও করেছিলেন। এইসব কথা রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মচরিতে ('A Nation in Making') অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তাই বলতে ইচ্ছা হয় যে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন আন্দোলন মাত্র ছিল না, তা ছিল একটা বিরাট অভ্যুদয়! তুলনারহিত একটা রাজনৈতিক জাগরণ।

বহু বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামের আড়ালে 'আনন্দমোহন বসু' এই নামটি আজ চাপা পড়ে গিয়েছে বললেই হয়। অথচ মনীষা, চরিত্র, পাণ্ডিত্য ও দেশপ্রেমে এঁর সমকক্ষ দ্বিতীয় ব্যক্তি সে সময় বাংলাদেশে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর 'বাংলার নবযুগের কথা' গ্রন্থে লিখেছেন : বাংলার নবযুগের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথ যে অনন্যলভ্য প্রতিষ্ঠা পাইয়াছেন, আনন্দমোহন বসু মহাশয় তা পান নাই, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু আনন্দমোহন বসুর সাহায্য না পাইলে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে যে কাজটা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহা করিতে পারিতেন না, ইহাও অস্বীকার্য।'

মৈমনসিংহের এই সুসন্তানটি ছাত্র হিসাবে সে যুগে খুবই দেদীপ্যমান ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষা থেকে এম. এ পর্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আনন্দমোহন বিলাত যান। সেখানেও তিনি ছাত্র হিসাবে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে আনন্দমোহনই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম র‍্যাংলার (Wrangler) ছিলেন। প্রতিভা ও চরিত্রগুণে তরুণ আনন্দমোহন কেমব্রিজ সমাজে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তা কেমব্রিজের ইতিহাসে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। কেমব্রিজের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করে এবং পরে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ১৮৭৫ সালে দেশে ফিরে আসেন। মেধাই তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁর খ্যাতির বিশেষ কারণ ছিল তাঁর চরিত্র। এই চরিত্রবলেই তিনি সকলের শ্রদ্ধের হয়ে উঠেছিলেন। বিপিনচন্দ্র যথার্থই বলেছেন : সেকালের কোন বিলাত ফেরৎ বাঙালী আনন্দমোহনের মতন দেশের লোকের এমন অকৃত্রিম শ্রদ্ধালাভ করেননি।' এমন একটি বিশুদ্ধ চরিত্রের মানুষকে বিস্মৃত হওয়া তাঁর স্বদেশবাসীর পক্ষে সত্যিই অগৌরবের বিষয়।

একজন পুরোদস্তুর আদর্শবাদী (Idealist) ছিলেন আনন্দমোহন। ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন যে, তিনি তাঁর সময়ে এমন উচ্চ আদর্শবাদী পুরুষ এদেশে আর বড় একটা দেখতে পাননি। তাঁর জীবন ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, একটা সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শকে ধরে নিজের এবং দেশের আধুনিক ধর্মকর্ম আনন্দমোহন গড়ে তুলেছিলেন। এই জন্যই বুঝি স্বামী বিবেকানন্দ এই সাধু প্রতিম মানুষটির প্রতি সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। সমকালীন বাংলার এমন সত্যবাদী ও সংযত চরিত্রের মানুষ দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন না। কথিত আছে, তাঁর কঠোর ধর্মনিষ্ঠা দেখে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একদা কৌতুকভরে আনন্দমোহনকে 'saint Anandamohan' বলে ডাকতেন। আইডিয়ালিজমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন আনন্দমোহন। তাঁর মধ্যে যে অতিপ্রিয় অনুভূতি

ছিল, তা তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে ছিল না। আনন্দমোহনের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শের যে প্রেরণা ছিল তার উৎস ছিল এই আশীর্বাদ।

আনন্দমোহনের প্রতিভা তাঁর চরিত্রের মতোই সাধারণের অনেক উপরে ছিল। যে কেউ যখনি তাঁর উপদেশ কিম্বা তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা চাইত, সে তা পেত এবং সম্পূর্ণভাবেই পেত। তিনি রেখে-ঢেকে (ইংরেজিতে যাকে বলে with reservation) দেবার মানুষ ছিলেন না। কত লোককে যে তিনি পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। দেশের সেবা যে তিনি কতভাবে করে গিয়েছেন তা বলে শেষ করা যায় না। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই আনন্দমোহনের বদান্যতা ও চরিত্রমাধুর্যে মুগ্ধ বা আকৃষ্ট না হয়ে পারেননি।

আনন্দমোহনের কর্মকীর্তি আমাদের গর্বের বস্তু। তাঁর বাগ্মীতার খ্যাতি বড় কম ছিল না। সুরেন্দ্রনাথের কথায় 'He was a vigorous and eloquent speaker.' একদা লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের এক সভায় তাঁর বক্তৃতা শুনে হাউস অব কমন্স-এর বহু নাম করা সদস্য বিস্মিত হয়েছিলেন। আইন ব্যবসায়ে যখন সবেমাত্র তাঁর পসার বৃদ্ধি পেতে থাকে ঠিক সেই সময়ে তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনিই ভারত সভার প্রথম সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ভারত সভার সংগঠনে তাঁরই অবদান ছিল বেশী। সভার পক্ষ থেকে সেদিন Vernacular Press Act-এর বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে আনন্দমোহনের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল। দেশসেবার পুরস্কারও তিনি লাভ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালে জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন মাদ্রাজে হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন আনন্দমোহন বসু। এই অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গে তাঁর সতীর্থ সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন: It was a masterly performance. One of the greatest orations ever heard from a congress platform.'

আনন্দমোহনের সমগ্র সত্তা দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত ছিল। দেশের কাজে এমনভাবে অন্তঃকরণ বিলিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। স্বদেশের জনসাধারণের মঙ্গলচিন্তা তাঁর সকলচিন্তাকে এমনই আচ্ছন্ন করেছিল যে তাঁর শেষ জীবনে এটাই হয়ে উঠেছিল যেন সর্বক্ষণের চিন্তা এবং এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি তিনি একজন কতবড় স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশ জয় করে স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন ধর্ম সমাজের সভাপতি আনন্দমোহন বসুই তাঁকে সর্বপ্রথম করমর্দনপূর্বক স্বাগত জানিয়েছিলেন। স্বামীজী এই উদারতা কোনদিন বিস্মৃত হতে পারেননি। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে আনন্দমোহনের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। স্বদেশী যেন তাঁর কাছে ধর্মের মতন ছিল। বাংলায় তিনি যে কত প্রাণের মানুষ ছিলেন, ১৯০৬ সালের ২১ জানুয়ারি তারিখে শ্মশানঘাটে আনন্দমোহনের শবদেহের যাঁরা অনুগমন করেছিলেন, তাঁরাই অন্তরের সঙ্গে তা উপলব্ধি করেছিলেন। কর্মে মহৎ, কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল, এই অকলঙ্ক জীবনের স্মৃতি আর সেই সঙ্গে আনন্দমোহনের স্বদেশপ্রীতি বাঙালীর জীবনে আজ নতুন প্রেরণার সঞ্চার করুক এই আমার প্রার্থনা।

হিসেব

কুমার মিত্র

খুশীর মৌতাতে বেহুলার সারা শরীর ঝিমঝিম করতে থাকে। শিরশির করতে থাকে মন। সুখের আবেশে চোখ বুজে আসে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, ছুটোছুটি করে পঁচিশ বছরের বাড়ী মেয়েটা একটা ছোট্ট খুকুর সঙ্গে নিজের কোন তফাৎ রাখে না। যেন জলের সঙ্গে বালির স্বচ্ছ বাতাসের সঙ্গে কৌতুকের খেলায় মেতে উঠেছে সে। কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে বলে পায়ের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যায়। ভিজে গোড়ালির ওপর বাড়ী দেপ্টে বসে। জোরে পা চালালে লটর পটর শব্দ ওঠে। তখন পেছন থেকে দেখায়—বালির ওপর একটা মোটন মোটন পায়রা। মাছের পেছনে মাছরাঙার মতো বেহুলা এখন সদাই জলের পেছনে।

এমনই হয়। এমনটাই স্বাভাবিক। ঘরে শুধু হাতা বেড়ী খুন্তী হাতে থাকে বলে এখানে আঁচা-হাত-পা হবে না, এর কোন মানে আছে? বাড়ীতে একেবারে গেরস্থ-বউ বলে বাইরে কুমারী হতে ইচ্ছে করে না! নাকি সেপ্টুসে অহরহ মাথায় ঘোমটা বলে এখানে ঘোমটা খসাতে নেই? কিম্বা গুণধর বৌয়ের এতখানি বাড়াবাড়ি পছন্দ করে না।

মনের অশান্তিতে তার চোখের দৃষ্টি ভেরছা হয়ে যায়। তার সঙ্গে কথাও।

'ফাঁকফোকর পেলেই তো দেখি জলের ধারে ছোটে। রান্নাবান্নার কাজও হাসপাতা গোছের। এমন কিসের টান রে বাপু! শুধু তো জল আর বালি। এত কি দেখার আছে?'

স্বামীর কথা বেহুলার কানেই যায় না। অসন্তোষ শুদ্ধ দুটো চোখের সামনেই ভিজে শাড়ী আপটাতে আপটাতে ঘরের দিকে হাঁটা দেয় সে। গুণধরের কথার কোন দামই যেন নেই এখানে। মেয়ে যেন থামতেই জানে না। দীর্ঘ মূর্তিটা রোদ-চকচকে বালির ওপর চমকাতে চমকাতে ক্রমশঃ ছোট হতে থাকে। গুণধর ভুরু কোঁচকায়, হতাশায় ভঙ্গীতে হাত ওল্টায়। কি যেন একটা হয়েছে বৌয়ের।

বেহুলা খুশীর পরিমাপ করতে পারে না। এত সুখও কপালে লেখা ছিল! এক গাঁ থেকে আরেক গাঁ নয়, এক শহর থেকে অন্য শহর নয়, শ্বশুরবাড়ী থেকে সইয়ের বাড়ী কি বাপের বাড়ী নয়, একেবারে এক দেশ থেকে আর এক দেশ! এতকাল শুনেই আসছে লোকে দেশ দেশান্তরে যায়, তীর্থধর্ম করতে যায়। সে কেবল শুনেই আসছে। কে আর ভেবেছিল নিজের কপালেও লেখা আছে সে সব?

অথচ নিজেরই আপত্তি ছিল প্রথমদিকে।

ভাল কোম্পানীতেই গুণধরের চাকরি। কয়িংকর্ম লোক। হঠাৎ চাকরিতে উন্নতি হল। মাইনে বাড়ল। উপরি কিছু টাকাও পেয়ে গেল হঠাৎ। বেশ কিছুদিনের ছুটি জমে ছিল। প্রস্তাবটা গুণধরই দিল:

'চলো, দিনকতক কোথাও ঘুরেটুরে আসি।'

'সে আবার কি?' বেহুলার চোখে প্রশ্ন।

'কোথাও বেড়িয়ে আসি চলো দিনকতকের জন্যে।'

বেহুলার বিধা কাটতে চায় না। বেশ তো কাটছে এখানে, আবার বাইরে কেন? আর ঠাঁইনাড়া হতেই কেমন ভয় করে তার। অজানা দেশ, অচেনা মানুষ। গাড়ীঘোড়ার ভীড়। কত কি বিপদ লুকিয়ে আছে। ভয় করে বড়।

'ভালই তো আছি এখানে। আবার বেড়াতে যাবার কেন?'

গুণধর রেগে ওঠে। বলে, 'সেই তো চারবছর আগে

খোপে ঢুকেছে। কি যদু আছে এখানে! এত ভাল লাগে একই ঠাঁয়ে!'

'কিরকম খরচপত্তর হবে?'

'দিন পনেরোকুড়ি থাকতে গেলে শ তিনচার তো লাগবেই।'

'তিন শো!' আঁতকে ওঠে বেহুলা। তার কথার চঙে মনে হয় টাকাগুলো অযথা জলে যাচ্ছে।

তারপর কথা কাটাকাটি, তর্কবিতর্ক। শেষ পর্যন্ত গুণধরের ইচ্ছেই বজায় থাকে। একদিন বেরিয়ে পড়ে ওরা।

এখন নিজের বোকামির কথা ভেবে আঙুল কামড়াতে ইচ্ছে করে বেহুলার। গুণধর যদি ভেদ বজায় না রাখত, যদি তার ইচ্ছেই টিকে থাকত শেষ পর্যন্ত! তাহলে? তাহলে কত কি যে অদেখা রয়ে যেত জীবনে! আহা এখানে কি সুখ, কি সুখ! বেহুলার বুকের ভেতর সুখের বুজকুড়ি নেচেকুঁদে বেড়ায়।

গুণধর ঠিকই বলেছে। বেহুলার এখন সদাই সাগরের দিকে মন। ভাল করে ভোর ফুটছে কি না ফুটছে, গুণধর তখনও ঘুমে বেহুঁশ, এলোমেলো চুলগুলো কোনরকমে গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শাড়ী বদলে বেরিয়ে পড়ে বেহুলা। একাই। একটুও ভয় করে না। যেন কত দিনের চেনা রাস্তা। হেঁটে মিনিট তিনেক লাগে। সে-টুকুও তর সয় না। লম্বা লম্বা পা ফেলে দু মিনিটেই পার করে দেয়। একটু দেরী হয়ে গেলেই যেন সব মজা মাটি হয়ে যাবে।

পাড়ে তখন আস্তে আস্তে লোক জমছে।

বেহুলা শাড়ী বাঁচাবার চেষ্টা করে না। জল এসে যদি পায়ের ওপর না লুটোপুটি খেল তবে আনন্দ কিসের? অবাক বিস্ময় তাকে পাথর করে দেয়। দূরের দিকে আশ্চর্য হওয়া স্থির চোখ ছড়ানো। মুখখানা অনড় পুতুলের মুখ। শাড়ী পাখীর মতো ডানা ঝাপটায়। চুলের বাঁধুনি শিথিল হয়ে আসে।

কি গাঢ় নীল জল! ঢেউয়ের চূড়াগুলো ফেনায় ফেনায় সাদা। আর কি গর্জন! কিন্তু ডরাস লাগে না। লাফ কাটতে কাটতে এগিয়ে এসে কেমন যেনী বেড়ালের মতো আদর মাখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে!

ক্রমশঃ সকালের আলো ভাল করে ফুটে উঠল। রঙ-বেরঙের পোষাকপরা ছেলেমেয়েগুলো যেন বাচ্চা খোকা-খুকু হয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বেড়াতে বেড়াতে এগিয়ে চলেছে। হয় স্বামী-স্ত্রী, নয় ভাইবোন, নয়তো বা অপর কিছু। সঙ্গে কেউ না থাকলে হেঁটে বেড়ানোর আরাম নেই। ঘুমকাতুরে গুণধরের ওপর রাগ হয় বেহুলার। এত বেলা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে যদি ঘুমোবে তবে বেড়াতে আসা কেন?

কিন্তু বেশিক্ষণ রাগ পুষে রাখতে পারে না। ঢেউগুলো প্রতিবার ঝিনুক রেখে যাচ্ছে। সাগর যেন আদর করে ঝিনুক ছুঁড়ে দিচ্ছে। বলছে—যতো পারো কুড়িয়ে নাও। সাগরতীরে এসেছ আর ঝিনুক-কুড়োনো খেলা খেলবে না? বেহুলাকে কুড়োনোর নেশা পেয়ে বসে। আঁচল ভরে যায় এক সময়। অনেকখানি চলে যায় বলে বাতাসের উজান ঠেলে বাসায় ফিরতে বেলা হয়ে যায়।

সাগরবাতাস আর নূনের আদ্রতায় ভেজা আলুথালু-মূর্তি বেহুলা ঘরে ঢোকে। ঘরের এককোণে হুড়মুড় করে একরাশ ঝিনুক ঢালে।

গুণধরের ঘুম ভেঙেছে। ঘনঘন হাই উঠছে বেচারার। এখনও এককাপ চা জোটেনি কপালে।

'দেখ, কত ঝিনুক কুড়িয়েছি! আরো এগোলে আরো মিলত।' শাড়ী থেকে বালি ঝাড়তে থাকে বেহুলা।

চায়ের অভাবে ভেতো হয় মেজাজ। গুণধরের গলা চড়ে, 'যতো সব ছেলেমানুষী। ঘরের কোণে তো পাহাড় জমা করে ফেললে। এত ঝিনুক কি হবে, শুনি!'

'হবে আবার কি! এখানে যে বেড়াতে এসেছিলুম তার একটা—'

'বাহাদুরি।'

গুণধরের বাঁকা মন্তব্যে বেহুলা কাণ পাতে না। হাসতে হাসতে বলে, 'তুমি তো একদিনও সকালবেলা বেরোলে না। তাহলে বুঝতে কেমন নেশা ধরে যায়। মনে হয় শুধু এপোই আর ঝিনুক কুড়োই।'

গুণধর সেই বিরোধীপক্ষ, 'হুঁ, আমি আর বাচ্চা ছেলে নই যে দিনরাত টঙটঙ করে ঘুরে বেড়াবো।'

বেহুলা মিথ্যে কথা বাড়ায় না। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপে।

একটা জিনিষ গুণধরের বেশী করে চোখে পড়ছে। বেরিয়ে অবধি বেহুলা কোন হিসেব-নিকেশের ধার ধারছে না। যেমনই হোক, গুণধর পুরুষমানুষ, বিবেচনা করে প্রতিটি পা ফেলতে হচ্ছে তাকে। পয়সাকড়ির হিসেব নিকেশ রাখতে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু তার এতখানি হিসেবী মন বৌয়ের ভীষণরকম অপছন্দ।

যদি পারা যায় কিছু খরচ বাঁচাবে না কেন? এই ভেবেই ধর্মশালায় ওঠা। বেহুলা তাতেও অখুশী। ওখানের নানা নিয়মকানুন বরদাস্ত করতে পারবে না সে। কদিনের জন্যে বেড়াতে এসে আবার এই খোপে ঢোকা কেন? আঁশ-মাছের গন্ধ না হলে মেয়ের আবার ভাত রোচে না।

গুণধর একটু উষ্ণ হয়ে উঠেছিল সেটা তার স্বভাবের বাইরে।

'মাত্তর তো তিনটে দিনের ব্যাপার। মাছমাংস না খেতে পেলে তিনদিনে মানুষ মারা যায় না নিশ্চয়। খোপের কথা বলছ! স্বচক্ষেই তো দেখলে ঢের ঢের ধনীমানী মানুষ ওঠে এখানে এসে, কি জন্যে? ওই একই কারণে—খরচ-বাঁচাতে।

বাসা ঠিক করা নিয়েও একপ্রস্থ খণ্ডযুদ্ধ। একটু ভেতরে ঢুকলে, মন্দিরের কাছাকাছি গেলে বাড়ীঘর বেশ সস্তা। হোটেলপাড়ার ঘর তার চারগাপ চড়া। এখানের দুটাকাটা ওখানে আট টাকা। কিন্তু বেহুলা অতো দূরে যেতে নারাজ। বাড়ী থেকে বেরোলেই সমুদ্দুর, বাড়ীর ছাদে উঠলেই সমুদ্দুর—এ না হলে চলবে না। সমুদ্দুর দেখতেই তো আসা। তার হাওয়া খেতে, ঝিনুক কুড়োতে। আর বাইরে এসে এত পুতুপুতু করেই বা খরচ করা কেন বাপু!

অন্তত পঞ্চাশটা টাকা বাঁচাতে পারত গুণধর। বৌয়ের জন্যে তা হল না। তা হোক গে। ওর সাধ-আহ্লাদ কোনদিনই পুরোতে পারেনি। আর এমন আলোবাতাসের ঘরে থাকতে তারও বড় ভাল লাগছে।

কিন্তু নিত্যনতুন টাকার শোক কাঁহাতক আর তোলা যায়? রোজ সন্ধ্যার দিকে মন্দিরে একবার যাওয়া চাই। মন্দিরের কাছে থাকতে চায়নি বলে মন্দিরকে সে ভুলেছে, তা নয়। মাইলখানেকের কাছাকাছি রাস্তা। গাছপালা ঢাকা রাস্তাটুকু হেঁটে যেতে মন্দ লাগে না গুণধরের। কিন্তু বেহুলা রিকশা ছাড়া এক পা এগোবে না। শুধু একদিন নয়, রোজ রোজ একই বায়নাক্কা। শুধু কি তাই? মন্দিরে পাণ্ডা ভনভন করছে। যত মাছি তত পাণ্ডা ওখানে। যতজন হাত বাড়াবে ততজনকেই কিছু না কিছু দেওয়া চাই। বুকের ভেতরটা করকর করে গুণধরের। এমনভাবে দুহাতে খরচ করলে টাকার পরমায়ু আর কদিন? ইতিমধ্যেই তহবিল রীতিমত শাসাচ্ছে তাকে।

সেই শাসানির চোটেই দিনদিনের বদলে পনেরো দিনের মধ্যেই পুরীর বাস ওঠাতে হল। বেহুলার দুঃখ যায় না। আর কদিন যদি থাকতে পেতুম। আহা! বড় ভাল লাগছিল গো।

গুণধর রাগতাপ দেখায় না। উদাসীন গলায় বলে, 'ইচ্ছেই তো ছিল আরো কদিন থাকার। তোমার জন্যেই তো হলো না।'

'সে তুমি যাই বল বাপু। বাইরে বেরিয়ে অমন কেল্লনের মতো খরচ করতে পারব না।

কিছুই প্রায় বাঁচানো যায় নি। সবটুকুই বলতে গেলে খরচ হয়ে গেছে। শুধু ওদিকে তেমন করে ঝোঁকে না গুণধর। বেহুলার দিকে চেয়ে চেয়ে তার বুক ভরে ওঠে। তাজা জলহাওয়ার ছোঁয়া লেগে কদিনেই রোগা মেয়েটা ফেঁপে উঠেছে। নোনা বাতাসে একটু ময়লা হয়েছে বটে কিন্তু শরীরের খানাখন্দগুলো ভরাট হয়েছে বেশ। মুখখানা ঝকমক করছে মাজা বাসনের মতো! থেকে থেকে লালচে ছোপ লাগে মুখে। এমনটি আগে ছিল না। অথচ ওর দুর্বল শরীরটাকে সতেজ করতে ডাক্তারকে কম পয়সা দেয়নি গুণধর।

ফিসফিস করে বলে, 'নিজেকে তুই আয়নায় ভাল করে দেখেছিস বউ ?'

'কেন, হয়েছে!' বুঝেও না বোঝার ভান করে বেহুলা !

'তুই বেশ পাল্টে গেছিস রে !'

'যাও।' শুধু এটুকু বলেই বেহুলা মুখ ফেরায়।

ঠেপে ঠেপে বেহুলা বলে, 'বেশ কদিন কাটল বাপু। আমার মন কেমন করছে।'

খিদিরপুরের নোংরা বস্তীপাড়ার একটা আলোবাতাস-শূন্য ঘর গুণধরের চোখে ভাসে। বৌয়ের ভরন্তপুরন্ত সুখী সুখী মুখখানার দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মুখের ওই লালচে ছোপ কদিন টিকবে সেখানে ?

হঠাৎ আবেগের গলায় বলে বেহুলা, 'পুজোর ছুটিতে এবার আর ঘরে নয়। অতো গোলমাল ভীড় ভাল লাগে না ; কোথাও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু।'

আবার বাইরে যাওয়া ? বলে কি বউ ? পুজোর আর কটা দিনই বা বাকি ! এই একরাশ টাকা খরচ হয়ে গেল, এখনও সন্তানশোকের ছোঁয়া লেগে আছে মনে, আবার গুচ্ছের টাকা খরচের কথা ভাবছে ও ? ভাবতে পারছে ?

গুণধরের মেজাজ মুহূর্তে বিস্বাদ হয়ে যায়, 'তুই আমাকে কি লাটবেলাট পেয়েছিস বৌ ? অতো টাকা পাবো কোথা ?'

'যায় করবে।' কশাইয়ের মতো যেন ছুরি শানাচ্ছে বেহুলা, 'এটুকু করতে পারবে না আমার জন্যে ?'

ঘর ছেড়ে যায় গুণধর।

ওই মেয়েই যে সহরে পা দিয়ে অমন পাল্টে যাবে কে ভেবেছিল ?

কে জানে কেন এমন সুখী মেয়েটা বাসায় ফিরেই অসুখী হয়ে উঠল ?

ঘরে পর্দা নেই, চেয়ার টেবিল নেই, মেঝের সান চটে গেছে, দেওয়াল থেকে বালি ঝরছে, ভেতরে ভাল করে আলোবাতাস ঢোকে না। তা এসব তো আর নতুন ব্যাপার নয়। পাঁচ পাঁচটা বছর ধরে এসব অভাবের ভেতরেই তো কাটিয়ে এসেছে বেহুলা। এসব নিয়ে কবে আর তাকে খুঁতখুঁত করতে দেখা গেছে ?

'কিছুই তো নেই। দুটো ভদ্দরলোক এলে বসতে দেওয়া চলবে না। ভাগ্যে কোন ভদ্দরলোক আসে না ! সেদিন ললিতার বাসায় গিয়েছিলুম। আমার সই ও। ঘর এমন কিছু আহামরি নয়, কিন্তু যা সাজিয়েছে ! চোখ জুড়িয়ে যায়। চেয়ার টেবিল পর্দা আলনা খাট—কিছুরই কমতি নেই।'

'ওদের অবস্থা ভাল।'

'ইস্ ! আমাদেরই মতন গরীব। তবে ওরা তো আর পয়সা জলে ঢালে না।'

'জলে ঢালা ?' গুণধর রীতিমতো অবাক। 'মানে ?'

'জলে ঢালা নয় তো কি ? দিনকতক হাওয়া খেয়ে এসে কি আর চতুর্গুণো লাভ হল ? তিনশোটা টাকা থাকলে সংসারে কতো কাজ হয়ে যেত !'

গুণধর হাসবে না কাঁদবে বুঝতে পারেনা। কোনরকমে বলে, 'কিন্তু অমন শরীরটা কি ডাক্তার দেখিয়ে হত ?'

'শরীর ! শরীর নিয়ে ধুয়ে খাব ! সংসারের বোঝা ঠেলতে কদিন টিকবে শরীর ?'

ইনিয়ে বিনিয়ে একরাশ শোক করতে থাকে বেহুলা। টাকার জন্যে শোক। তিনশো টাকায় কত কাজ হতে পারত তার হিসিবিষি আওড়াতে থাকে।

সেই মুহূর্তে বৌয়ের দিকে চোখ যায় গুণধরের। বেহুলাকে কেমন বিকৃত দেখাচ্ছিল। গলা ক্যাঁস ক্যাঁস করছিল ! মুখটা কুঁচকে কুঁচকে উঠছিল। লালের ছোপের বদলে চামড়াটা কালো হয়ে উঠছিল ভেতরের ক্ষোভে। গুণধর তার পাঁচ বছর ধরে ঘর করা বউকে স্পষ্ট করে চিনতে একটুও ভুল করল না।

অবাক হয়ে ভাবল : অতো বড়ো সমুদ্দুরটা একটুও পাল্টে দিতে পারলনা বেহুলাকে ? একটুও না।

◀এই প্রথম▶

['এই প্রথম' পর্যায়ে আমরা সম্ভাবনাপূর্ণ নবাগত লেখক-লেখিকাদের রচনা আজ বেশ কিছুদিন ধরে ছেপে আসছি। নূতন লেখক সৃষ্টি করা সাহিত্য পত্রিকার একটি বিশেষ কর্তব্য। এইভাবে ভাবান্বিত হয়েই আমরা এই অধ্যায়টির সূচনা করেছিলাম। ইহা অল্প দিনের মধ্যেই লেখক মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। যাঁদের সত্যিই প্রতিভা আছে, সুযোগ সুবিধা পেলে যাঁরা একদিন সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেন সেইসব লেখক-লেখিকাদের রচনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরে উৎসাহ দান করাই আমাদের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর সর্বত্রই এই ভাবে নতুন লেখক তৈরী হয়। একদিন এইসব লেখক-লেখিকা যে প্রথম সারিতে স্থান পাবেন না তা কে বলতে পারে।

নূতন লেখক-লেখিকাদের রচনা অন্য পত্র-পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয়ে থাকলেও আমাদের পত্রিকায় তাঁরা 'এই প্রথম'। লেখকদের কাছে আমাদের অনুরোধ রচনা যেন অপেক্ষাকৃত ছোট হয় তা না হলে স্থানাভাবে কোনদিনই প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। রচনা পাঠাবার সময় 'এই প্রথম' এই কথাটির উল্লেখ করবেন এবং লেখার সঙ্গে নিজেদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিশ্চয়ই দেবেন।]

—সম্পাদক

"এক টুকরো কাগজে একটু কালির দাগ"

শ্রীগোপীবল্লভ রায়

প্রিয় পাঠক,

আজও কোন সদুত্তর পাইনি। তাই আজও চাঁদনী রাতে আমি স্মৃতির সাগর তোলপাড় করে বেড়াই।

সোনাবৌদির স্বামী জয়ন্ত ব্যানার্জী ছিলেন সাংবাদিক। আর সেই সূত্রেই আমার সঙ্গে ওদের পরিচয়। জয়ন্তবাবুর বেশীর ভাগ সময় কাটত কোলকাতার বাইরে।

আমার পাশের বাড়ি "সন্ধ্যার নীড়"-এ থাকতেন ওরা, বেশ বড় বাড়ি। গেটের পরের লালপাথরের কুচি ছড়ানো পথ যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একফালি বারান্দা। এখানে-ওখানে কয়েকটি ফুলের টব। পথের দু-পাশে সারি সারি ঝাউগাছ সীমান্তে নিস্তব্ধতার মত।

কিন্তু বাড়িটা বড় নিঝুম। কেউ কোথাও নেই। শুধু সোনাবৌদি—ঠিক যেন রূপকথার রাজ্যের বন্দিনী রাজকন্যা বড় নিঃসঙ্গ বড় অসহায় মনে হয় সোনাবৌদিকে —মনে হয় যেন রাত্রিশেষে ভোরের আকাশের বিষণ্ণ শুকতারা।

সারাদিন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াই, মানুষের মনের অলিগলিতে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। আর সন্ধ্যার পরে এসে বসি সোনাবৌদির কাছে। নিঃসঙ্গতার জগৎ থেকে ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি আলো আর আশায় ভরা মাটীর পৃথিবীতে। হাসি, ঠাট্টা, গল্পগুজবে জমে উঠে আমাদের সান্ধ্য আসর। জয়ন্তবাবু কোলকাতায় থাকলে এসে যোগ দেন আমাদের আসরে।

রোজকার মত সেদিনও গিয়েছিলাম—"সন্ধ্যার নীড়ে" অকারণ কাজে একটু রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই গিয়ে দেখলাম বাইরে নেই সোনাবৌদি।

ছাদের ওপর থেকে ভেসে আসছে সোনাবৌদির গানের সুর—অনেক দূর থেকে কুলুকুলু করেপড়া পাহাড়ী ঝরণার কলোচ্ছ্বাসের মত।

পাশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম, পেঁজা তুলোর মত মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদ উঠেছে আকাশে। সমস্ত ছাদের ওপর আলোর বন্যা।

পায়ের শব্দে পেছন ফিরে—তাকালেন সোনাবৌদি।

চাঁদের আলোয় কেমন যেন বিহ্বল দিশাহারা হয়ে গেলাম কালো হরিণ চোখ, নিপুন শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রু, কালো মেঘের মত একরাশ চুল আর গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট, সব মিলিয়ে যেন নতুন করে দেখলাম এক বিরহীনীকে।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটে গেল, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন সোনাবৌদি আমাকে পারলাম না নিজেকে রোধ করতে। ভেঙে গেল সংযমের বাঁধ হারিয়ে গেলাম এক উদ্ভিন্নযৌবনার উদ্দাম প্রেমের দুর্নিবার স্রোতে যার সাক্ষী রইলো দূর আকাশের—সেদিনি পূর্ণিমার চাঁদ আর নির্জন গঙ্গার ঘাটে বাঁধা ছোট্ট ছেলে ডিঙি।

নদীর স্রোতের মত সময় বয়ে যায় এমন যে স্বার্থপর দৈত্য তার বাগানেও ফিরে আসে বসন্ত। দীর্ঘ গাছগুলি ফিরে পায় যৌবন। মধুর সুরে কোয়েল গেয়ে ওঠে।

শুধু চৈত্রবেলার শেষে ঝরাপাতার কান্নায় সুর করে নিয়ে আসে আমার কাছে ভরন্তবাবুর চিঠি!

পাগল হয়ে গিয়েছে সোনাবৌদি, তার অনেক বসন্তের আকাংখার মানিক মিঠুরা অল্প দুদিনেই তাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

ভরন্তবাবুর চিঠি পেয়ে ছুটে গেলাম কোলকাতায়, কিন্তু "পাঠক" পারলাম না সোনাবৌদিকে ধরে রাখতে।

সারাদিন কাজের মধ্যে ডুবে থাকি কিন্তু নিঃস্তব্ধ রজনীতে যখন ওই রাঙামাটির পাহাড়ের পাশ থেকে চুপি চুপি চাঁদ ওঠে আকাশে,—সমস্ত আকাশ জ্যোৎস্না-প্লাবিত হয়ে যায়—আর দূর থেকে ভেসে আসে ঐ অমার "কোয়েল" এর অবিশ্রান্ত গর্জন তখন আমি স্থির থাকতে পারিনা—আমি যেন শুনতে পাই "কোয়েলের" ডাকের সঙ্গে সোনাবৌদির কণ্ঠস্বর—

মিঠু, মিঠুরা ফিরে আয় মিঠু—উ—উ.....

ইতি

"রাঙামাটি"

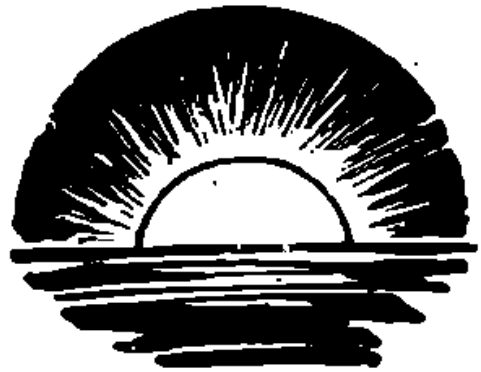

পৌষ পার্বণ

উষা ভট্টাচার্য

শিশুবেলা থেকে শুনে আসছি কথাটি, পৌষের পার্বণ অর্থাৎ উৎসব।

কথায় বলে বার মাসে তের পার্বণ। একথা শুধু বাঙ্গালীর পক্ষেই প্রযোজ্য নয়। সমগ্র মানব গোষ্ঠীর প্রতিটি আচার ব্যবহারে একথার তাৎপর্য প্রমাণিত হয়ে এসেছে সেই আদিম যুগ থেকে।

মানুষ সঙ্ঘপ্রিয় প্রাণী। একা থাকতে মানুষ ভালবাসেনি তাই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষ ঘর বেঁধেছে একত্রে, গ্রাম গড়েছে একত্রে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আতঙ্কিত হয়েছে একত্রে, আবার প্রকৃতির উপচার উপভোগ করেছে একত্রে।

বছরের প্রতিটি ঋতুর পরিবর্তন মানুষের মনকে নাড়া দিয়েছে। নিত্যকার দিনটি থেকে কয়েকটি দিনকে তারা তাই বেছে নিয়েছে আলাদা করে, কিছু নতুন উপচারে নতুন ব্যবহারে উপভোগ করেছে সেই বিশিষ্ট দিনটিকে, আলাদা করে নিয়েছে নিতান্ত প্রাত্যহিক সভ্যস্ত আচার বিচার থেকে। এই নতুনত্বের স্বাদই দিয়েছে মানুষের জীবনে আনন্দ। মানুষ নতুনের পিয়াসী তাই নিত্যকার দিন থেকে বেছে তুলেছে তার উৎসবের দিনগুলিকে।

উৎসব মানুষ একক হয়ে উপভোগ করতে পারে না। মানুষ নিজেকে যখন নবসজ্জায় নতুন ছন্দে সজ্জিত করে তুলেছে, মন চেয়েছে অপরের চোখে প্রশংসমান জ্যোতি, তেমনি যখন উৎসব সজ্জায় গৃহপ্রাঙ্গণ ধারণ করেছে নবরূপে মানবমন স্বভাবতই প্রাঙ্গণে প্রান্তে বন্ধুর আগমন আকাঙ্ক্ষায় রয়েছে প্রতীক্ষমান।

এমনি করে গড়ে উঠেছে বহু পার্বণ দিন, আনন্দের দিন, বন্ধুর সংগে সন্ধি বা গ্রন্থি বন্ধনের দিন।

মানুষের মন বৈচিত্র বিলাসী। সে চেয়েছে নিত্যকর্মে বিরাম। খুঁজছে কর্মে বৈচিত্র, দৃশ্যে বৈচিত্র, রুচিতে বৈচিত্র, নিয়মে বৈচিত্র। কল্পনাপ্রবণ মানবমানস অনুসন্ধান করেছে নবনবরূপে রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। নিরন্তর পরিবর্তনে প্রকৃতির ভাণ্ডারে সে খুঁজে পেয়েছে উৎসবের সন্ধান। উৎসবের দিনটি এমনি করেই নির্দেশিত হয়েছিল। ঐ নির্দিষ্ট দিনে প্রকৃতির পরিবর্তন সহায়তা করেছে পার্বণের দিনটিকে বিশিষ্ট রূপ দিতে। মানুষ পেয়েছে নতুনের আস্বাদ। নতুন এনে দিয়েছে সৌন্দর্য আর সুন্দর থেকেই ছুটে উঠেছে আনন্দ—আনন্দই দিয়েছে শান্তি। আমাদের পার্বণের দিনগুলিতে কিছু কিছু ধার্মিক অনুষ্ঠানের সংমিশ্রনে, সদাচার ও সুরুচি সংযুক্ত হয়।

ফলে ক্রমিমানস চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হয়। আমাদের পার্বণগুলি তাই প্রাচীনকালে প্রভূত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হোতো। মাসে মাসে এমন কত না "পালনী" বা পার্বণ পালন করা হোতো। সেকালে কি পুরুষ কি নারী সকলেই অপেক্ষাকৃত নির্মল চিত্ত ছিলেন সুতরাং প্রকৃতির সঙ্গে এমনি করে রূপ মাধুর্য উপভোগ করতে সরল প্রাণ গৃহস্থ এগিয়ে এসেছেন ইষ্ট কুটুম্বের কাছে। এগিয়ে এসেছেন গ্রাম প্রতিবেশীর অন্তরঙ্গ হয়ে। আত্মীয় ও আত্মার তৃপ্তি এমনি করেই আহরিত হোত।

প্রকৃতির পরিবর্তনে ভিন্ন ঋতুর সমাগমেই তাই

সাধারণত উৎসব পার্বণের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। জ্যোতিষিক যোগ, বিশেষ করে, শরীর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেই কোন বিশেষ পূজা, ব্রত, পার্বণ বা উৎসবের দিনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শারদোৎসবে নবরাত্র ব্রতই দুর্গোৎসব। ব্রত শেষে শরৎবর্ষের সূচনা হয়। সেইদিন বিজয়াদশমীর উৎসব, প্রাচীনমতে সেইদিনই হিমের বর্ষারম্ভ। কার্তিকী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। শ্রাবণী পূর্ণিমায় ঝুলন বা শ্রীকৃষ্ণের দোলন উৎসব। এমনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত আমাদের উৎসবের দিনগুলি। ভাদ্র ও শ্রাবণ সংক্রান্তিতে অরন্ধন বিধি। অতিবর্ষায় সিক্ত পরিবেশে একদিন বা দুদিন বিরতি। খাদ্যদ্রব্যের রুচির পরিবর্তন ও কিছু চিত্ত সংযমের অবকাশ অবশ্যই উপেক্ষনীয় নয়।

প্রখর রৌদ্রতাপে সন্তাপিত শুষ্ক ধরাতলে সামান্য কারণেই যখন দাবানলের আশঙ্কা তখন অগ্নি বা ব্রহ্ম পূজার বিধি প্রশস্ত। দেশে দেশে সেকালে ইষ্টকালয়ের প্রচলন ছিল না সুতরাং এ বিধি সাবধানী পন্থাসম্মত সন্দেহ নেই।

শীতে মাঘের হিম ভেঙে কুমারী কন্যার সূর্যদেবের আবির্ভাবের উপাসনায় ব্রতী হওয়া একাধারে যেমন সুশিক্ষার সহায়ক তেমনি চারুকলায় ব্রতিনীর আগ্রহের পরিপোষক। কুয়াশা কেটে আধো আঁধারে ফুল কুড়িয়ে কচি হাতে ফুলের সাথে দুর্বাদলের গোছ বেঁধে ঘাটে ঘাটে পুকুরের ঘোলাটে জলে ভাসিয়ে মিষ্টি সুরের ছড়াকাটা যেন সেই রূপকথার ছবি গড়ে তোলে। শীতের সাঁঝে সাদা উঠোনের গায়ে আলপনা এঁকে আকাশের তারার ব্রত রচনা আর একটি মধুর বৈচিত্র। অগ্রহায়ণের রবিবারে সূর্যোপাসনা ইতু ব্রতিনীকে চিত্তচঞ্চলে উন্মুখ করে। মাসান্তে সংক্রান্তি দিনে ঘট বিসর্জনের সঙ্গে ব্রত সমাপ্তি। এমনি গুতুতে গুতুতে কত না পার্বণ।

ব্রত করে সেই ভোর ভেড়ে তেত্রিশ পেরিয়ে যায়, ধর্ম প্রবণ চিত্ত তার সন্ধান পেয়ে উৎসুক হয়ে ওঠে, বরণ করে নেয় উৎসবমুখর নতুন পরিবেশ।

তারপর পৌষে শীতের মরশুম, শস্যের মরশুম। ঘরে ঘরে নতুন ফসল উঠবে। সারা বছরের সেরা শস্য আমন শস্য। বাঁচবার প্রধান খাদ্য আমন ধান এবার ঘরে উঠবে।

প্রথমে বীজ বপন হলো, তারপর সে ধানের সাধ ভক্ষণ উৎসবটিও পালন হলো। চাষীরা প্রত্যুষে কাঁচা হলুদ বাটা সরষের তেলের সঙ্গে মিশিয়ে হাতে নিয়ে মাঠের প্রান্তে নেমে বলে—

"ধান রে সাধ খা পাক্যা কুল্যা
ঘরে যা।"

ধানের ক্ষেতে তেল হলুদ ছড়িয়ে দিয়ে একমাত্র মঙ্গল কামনা "আমার গোলা যেন ভরে ওঠে।" ঘরে ঘরে গাঁয়ের বধূর কামনা কি বৃথা যায়! ধানের সেই সাধ ভক্ষণ দিনে চাষী মাঠে গিয়েছিল আর চাষী বৌয়েরা— গৃহস্থের গৃহিণীরা ধরদুয়ার নিকিয়ে চকচকে করেছে। ছড়া কেটে ঘষামাজি থোকা মাকড় তাড়িয়েছে, "হালের অর্জন ফসল আর ডালের তোলা মাছ" সেদিন তারা খায়নি।

শুষ্ক চিত্তে গোলার মঙ্গল চিন্তায় দিন কেটে যায়। তারপর সত্যি সে দিন আসে। মাঠের নতুন ধানের শীষকে বরণ করা হয় এক পরব দিনে। তারপর ধান পাকে, আসে নতুন ধানের উৎসব নবান্ন।

"নবান্নের পূর্বে নতুন অন্ন কেউ মুখে দিও না।"— সাবধানী চোখ গৃহিণীর, গৃহকর্তার। প্রথমে ঐ অন্ন উৎসর্গ হবে পিতৃপুরুষের তৃপ্তিকল্পে, দেবতার আরাধনায়, তবে আত্মীয় স্বজনকে। গাভী কাকাদি পশুপক্ষীও কি বাদ যাবে? তারাও অংশীদার।

এই নতুন শস্যকে অভিনন্দন করতে লক্ষ্মীর পুজো হওয়া আনুষ্ঠানিক। ধান খাও, ধান লক্ষ্মী!

বিভিন্ন শস্য উৎপাদনকালে শস্য উৎসব আরো হয়। আষের দিনে আম দিয়ে প্রথমে সরষের 'কাসন্দি' দিয়ে, চৈত্রে ছাতু সংক্রান্তিতে। আত্মীয় পরিবারবর্গকে আম কাসন্দি আর ছাতু খাইয়ে তৃপ্তিলাভ এইসব পার্বণের মুখ্য উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই।

এই নবান্ন উৎসবের শেষের অংশটি সত্যই লোভনীয়, মুখরোচক নতুন ধান ত উঠলো। পৌষমাস, নতুন শীতে

নতুন গুড়ের মরশুম। ঘরে ঘরে নতুন শস্য, নতুন পণ্য লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখতে হবে। চাই লক্ষ্মীর পূজা। গৃহিণী তাই ধানের গোলা নিকিয়ে পরিষ্কার করেন।

ধানের মরাই, ঘরের পেটরা খড় দিয়ে বাঁধেন।

ছেলেরা বলতে থাকে—

'আওনি, যাওনি, চাওনি, তিন দিন পিঠা খাওনি।' নতুন চালের প্রসাদ হাতে ছোট বুড়ো সবাই অনুমতি নেয় গৃহিণীর কাছে।

"মা নতুন খাব?" "খাও।" ছেলেকে অনুমতি যেন মা তবেই প্রসাদ ভক্ষণ, এমন কি গৃহকর্তাও পত্নীর অনুমতির অপেক্ষায় ব্রতিনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। "কি নতুন খাব?" উত্তর হয় "খাও", এখানে আজকের দিনে গৃহলক্ষ্মী গৃহিনীরই প্রাধান্য।

লক্ষ্মীর আগমন ও বন্ধন ও হলো তিনি ঘরে বাঁধা থাকুন চিরকাল এই একমাত্র প্রার্থনা। পৌষের সংক্রান্তিতে পৌষকালী পার্বণ বা পিঠে-পরব। পিঠে—যে সে পিঠে নয়। পুলি পিঠে। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, পেট পুরে তার গুড় নারকেলের পুর। কোথাও বা ক্ষীর। নতুন চাল সুস্বাদু, সুস্বাদু নতুন গুড়। আখের আর কোথাও বা খেজুরের রসের গুড় বা ঝোলাগুড়। ঘরে ঘরে পিঠা। পিঠা আর পিঠা। কত রকমের পিঠা! কাউকেও বলতে হয় না এ পিঠা-পার্বণ পালন করতে এলো। এ আবাল-বৃদ্ধবনিতার পার্বণ। এ পার্বণ হয় প্রথমত গৃহের কল্যাণার্থে। দ্বিতীয়ত রসনার তৃপ্তি বিধানার্থে। এবং সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণীর তুষ্টি সাধনার্থে।

পূজার প্রসাদে পূজারী ও ইষ্ট কুটুম্বের আনন্দ বিধান আর একটি উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। বৈদিক যুগে "পুরোডাস" পিঠে দিয়ে আহুতি প্রদান করা হতো দেবতার উদ্দেশ্যে। বছরের অন্যান্য সময়ে বিভিন্ন প্রকার পিষ্টকেও দেবতার পূজা সেকালের রীতি ছিল। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় পিষ্টক পার্বণ প্রচলিত ছিল তবে শীত ঋতুর পরই প্রাধান্য পায়। ছোট ছেলেরা গ্রামের ঘরে পার্বণী নিয়ে চাল, ডাল, কলা, মূলা সংগ্রহ করে সৌখালা বনভোজন করে আনন্দ করতো।

এই সব পার্বণের প্রায় সব কটিই প্রাচীনকালের মহিলাদেরও একাধিকার ছিল। প্রায় প্রত্যেক পার্বণেই পার্বণের প্রসাদ ভক্ষণেই পুরুষের বা স্বামীর কল্যাণ হত। বিশেষ করে পিঠাপার্বণ বা পৌষ-পার্বণে পুরুষের করণীয়ের প্রধান অংশ হলো নতুন দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহ করা ও পূজা অন্তে পিষ্টক গ্রহণ করে নিজ রসনা ও রমনীর মানসিক আনন্দ বিধান করা। আর রমণীর আনন্দ, সৃষ্টির—পিষ্টক রন্ধনের। পিষ্টক রচনার কারিগরী রমণীর একক ও স্বাভাবিক নৈপুণ্য। তখনকার দিনে শুধু ধনী গৃহের পরই এ নয়। ছোট পল্লীর একটি সাধারণ চাষী বউও এ-গুণের অধিকারিণী। সে যে পৌষ মাসে পিঠা তৈরী করতে বসে ছড়া কাটছে উনুনের পাশে—

"কার হাতে গো তেল আমলা
সবার হাতে হাতে দিও।
ঘি দিয়ে আমরা পক্কান্ন
দক ধানে ডোলভরে
কালো পুতে কোলভরে।
রসুন কাঠে রেঁধে খায় আড়ি মাপে কড়ি পায়।"

প্রগতির পথে অগ্রণী নারী মহল প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে এই কারিগরী বিদ্যাকে যত দিন না ভুলে যাবেন ততদিনই ভবিষ্যতের বংশধরেরা এই পিষ্টক পর্বকে হারিয়ে ফেলবে না। কিন্তু গ্রামের আকাশরেখার প্রতিদিন যে রূপান্তর ঘটছে, কারখানার ধোঁয়ার জাল ভেদে আর সভ্যতা বাঁশীর সুর ঠেলে কতদিন আর গ্রামের মেয়ে স্বর্গ-সুখ করতে পারবে কে জানে।

শীতের দিনের দুটি খাবার

মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন জাতের মানুষ বাস করে বিচিত্র অভিরুচি নিয়ে। তাদের খাদ্য-রুচিও বিচিত্র।

আমরা যে সব খাদ্য প্রত্যহ খাই তার মধ্যে কিছুটা বৈচিত্র, কিছুটা নতুনত্ব থাকা দরকার। খাওয়ার ব্যাপারে বাঁধাধরা নিয়ম অপ্রীতিকর। একরকম জিনিস একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মনের মত রান্না করলে তা খেতেও ভাল লাগে, যারা খায় তারাও তারিফ করে। শীতের মরশুমে এই রকম উপযোগী দুটি খাবারের কথা বলছি।

ফুলকপির কাটলেট :—

উপকরণ : বড় ফুলকপি একটি। ভিনিগার এক ছটাক, আদা এক তোলা, রশুন ছয় কোয়া। কাঁচা লংকা দুটি, নুন পরিমাণ মত। এরারুট বড় চামচের দু চামচ, বিস্কুটের গুড়ো এক পোয়া, ঘি আধ পোয়া। রশুনের গন্ধ যদি ভালো না লাগে তার বদলে পেঁয়াজ দেওয়া চলে।

প্রণালী : কপির ডাঁটা লম্বা রেখে এক একটি ফুল কেটে নিন, পরে ডাঁটা একটু চিরে নিন। আদা, কাঁচা লংকা, রশুন বেশ মিহি করে বেটে নিন। প্রথমে কপির টুকরো নুন জলে সিদ্ধ করতে হবে অল্প করে। তারপর জল থেকে তুলে নিয়ে ছুরির উল্টো দিক দিয়ে চেপে চেপে কাটলেটের মত করে তৈরী করতে হবে। আদা, রশুন ও লংকা বাটার সঙ্গে নুন ও ভিনিগার মিশিয়ে কাটলেট-গুলোতে বেশ করে মাখিয়ে রাখুন। এরারুট জল দিয়ে গুলে রাখুন। এখন কাটলেটে এরারুট গোলা লাগিয়ে বিস্কুটের গুঁড়ো বেশ করে নিন মাখিয়ে। ফ্রাই প্যানে ঘি দিয়ে চড়ান, ঘি গরম হলে কাটলেটগুলো লাল করে ভেজে তুলে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

কড়াইশুটির ঘোঁকাকারি—

উপকরণ : কড়াইশুটি তিন পোয়া, আলু চারটে। দই এক ছটাক, আদা দু' তোলা, পেঁয়াজ দু'টি। ধনে বড় চামচের এক চামচ, জিরে চায়ের চামচের এক চামচ, হলুদ দু'জিরে, শুকনো লংকা দুটি। ছোট এলাচ দু'টি, লবঙ্গ চারটি, দারচিনি এক টুকরো, চিনি মাঝারি চামচের এক চামচ, নুন আন্দাজ মত, তেজপাতা চারটি, ঘি তিন ছটাক।

প্রণালী : কড়াইশুটি ছাড়িয়ে বেটে নিন। ধনে, জিরে, হলুদ, লংকা, আদা, পেঁয়াজ সব আলাদা করে বেটে রাখুন। এখন বাটা কড়াইশুটিতে অর্দ্ধেক পেঁয়াজ বাটা, একটু আদা বাটা, চায়ের চামচের এক চামচ ধনে বাটা, অর্দ্ধেক জিরে বাটা, একটু লংকা বাটা আর একটু নুন ও চিনি দিয়ে বেশ করে মেখে নিন। কড়াতে এক ছটাক ঘি চাপান, ঘি গরম হলে এই মশলা মাখা কড়াইশুটি বাটা ছেড়ে কসে নিন। তারপর একটি থালায় ঢেলে, হাত দিয়ে চেপে চেপে বেশ করে জমিয়ে নিয়ে, ছুরি দিয়ে চৌকো করে কেটে নিন। ফ্রাইপ্যানে এক ছটাক ঘি দিয়ে এইগুলো লাল করে ভেজে তুলে নিন। আলু চারকাদি করে কেটে এই ঘিয়ে কসে রাখুন।

একটি হাঁড়িতে আর এক ছটাক ঘি চাপান, গরম হলে তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে, পেঁয়াজ, আদা, ধনে, জিরে, হলুদ, লংকা বাটা, সব দিয়ে কষুন। তারপর দই দিন। বেশ লাল করে কষা হলে আলু ছেড়ে দিয়ে সেদ্ধ পোয়া আন্দাজ জল দিন। ফুটলে গরম মশলা চিনি ও নুন দেবেন। আলু সিদ্ধ হয়ে গেলে হাঁড়ি নামাবার আগে কড়াইশুটির ঘোঁকাগুলো দিয়ে হাঁড়ি নামিয়ে রাখুন।

অশোক ষষ্ঠীর কথা

শ্রীহেমন্তবালা

এক বনে মুনি তপস্যা করেন। মুনির আশ্রমের কাছেই দূর্বাঘাস, মুনি সেখানে শৌচে যান। সেই ঘাস খায় এক হরিণী। হরিণীর একটি মেয়ে হোলো। অশোক বনে কন্যাটি প্রসব করে হরিণী মারা গেল। মুনি কন্যাটিকে তুলে নিয়ে এসে মানুষ করলেন। নাম দিলেন অশোকা। অশোকাকে নিয়ে মুনি আছেন। দিন দিন অশোকা বড় হয়ে উঠলো। একদিন রাজা এসেছেন মৃগয়া করতে, সঙ্গে তার মন্ত্রী, পাত্রমিত্র অমাত্য, সেপাই শান্ত্রী সব। রাজার বনে বনে ঘুরে ঠিক দুপুরে বড় পিপাসা পেলো। রাজা লোকজনদের বলে দিলেন একটু জলের চেষ্টা করতে। কোথাও জল পাওয়া যায় না। ঘুরতে ঘুরতে লোকজন মুনির আশ্রমে এসে উপস্থিত। কুটিরের সম্মুখে এসে বলছে, "বাড়িতে কে আছেন মা সকল, আমাদের রাজা-মশায় পিপাসার্ত, একটু জল দেন।" অশোকা বেরিয়ে এলো। সে সব শুনে পিতলের রেকাবিতে খান দুই বাতাসা আর ছোট গেলাসে এক গেলাস জল দিল। লোকটি বলল, "মা আমরা সকলেই পিপাসার্ত, আর একটু জল দেন।" অশোকা বলল, "ঐ যা দিয়েছি, তাতেই হবে, তুমি যাও গে।" সেই জল, বাতাসা নিয়ে লোকটি ফিরে যেতেই রাজা তো প্রথমে ঐটুকু জল বাতাসা দেখে রেগেই আগুন, পরে আর কী করবেন, ঐটুকুই গলায় ঢেলে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঐ জল বাতাসা আবার যেমন ছিল, তেমনি হোলো। রাজা, রাজার মন্ত্রী, পাত্রমিত্র, অমাত্য, সেপাই শান্ত্রী, লোকজন সবাই খেয়েও যেমন জল বাতাসা, তেমনি রইল। তারা প্রাণভরে খেয়ে আবার জল বাতাসা সমেত পাত্রটি ফিরিয়ে দিতে চলল। রাজা বলে দিলেন জেনে আসতে যে কন্যাটি কার কন্যা, সে কি দত্তা, না অদত্তা? মন্ত্রী গেলেন, কন্যার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই অশোকা বলল, সে মুনির মেয়ে, তার পিতা তপস্যা করতে গেছেন, তিনি আসবেন এখনি। সে অদত্তা। তখন মন্ত্রী রাজাকে এসে খবর দিলেন। রাজা তাঁকে আবার পাঠালেন, ঐ কন্যাকে তিনি বিবাহ করতে চান। মুনি এলে প্রথমে মন্ত্রী, পরে রাজা নিজে মুনিকে যথারীতি সম্মান করে অশোকার বিয়ের সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করলেন। মুনিকন্যারা রাজার ঘরে বিবাহিতা হয়েই থাকে। ক্ষত্রিয় রাজারা প্রায়ই ব্রাহ্মণকন্যা ঋষি-কন্যা বিবাহ করতেন। তাই মুনি রাজার সঙ্গে অশোকার বিবাহ সেই আশ্রমেই দিয়ে দিলেন। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় অশোকা কাঁদল, মুনি বললেন, এই অশোকের বিচি দিচ্ছি, সঙ্গে নিয়ে যাও। যেতে যেতে রাস্তার দু'ধারে ছড়াতে ছড়াতে যাবে। রাস্তায় দুই দিকে অশোকের গাছ হবে। যদি কখনো দুঃখ কষ্ট পাও, বিপদে পড়, তবে এই অশোকের ছায়ায় ছায়ায় পথ চিনে চলে আসবে আমার কাছে। আর, অশোক ষষ্ঠীর দিন, খবরদার ঐ দিন 'লক্ষ্মী' খেয়ো না, তাহলে অমঙ্গল ঘটবে। মা ষষ্ঠীর পূজা কোরো, অশোকের কলি খেয়ো।" এই বলে আরো নানা উপদেশ দিয়ে কন্যাকে তো শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। শ্বশুরবাড়ি গিয়ে অশোকা দেখে, তার আরো সব সতীন আছেন, আত্মীয়স্বজনে বাড়ি পরিপূর্ণ। অশোকাকে প্রজারা আর অন্য আত্মীয়েরা খুব খুশি হয়ে ধন্য ধন্য করতে লাগলো, কিন্তু সতীনদের মনে ঈর্ষা হোলো। আর সব বউ রাঁধতে যায়, কত বেরি হয়, রান্নাও যেমন তেমন হয়, আর অশোকার রান্নার সময় সে দরজা বন্ধ করে যায়, তার সৃষ্টি মাত্রই সব রান্না আপনি আপনি হয়ে যায়। রান্নাও অমৃতের তুল্য, সকলে খেয়ে ধন্য ধন্য করে। এতে অন্য রাণীদের ঈর্ষা হয়, তারা অশোকার নামে নানা মিথ্যা নিন্দা রটনা করে রাজার কান ভারি করতে চেষ্টা করে। ক্রমে অশোকার ছেলে মেয়ে

হোলো। অশোকষষ্ঠীর দিন অশোকা কখনো ভাত খেত না। কিন্তু এতদিন, এ ষষ্ঠীর দিনে ক্ষীর করতে গিয়ে চিনির সঙ্গে চাল পড়েছিল দুধের কড়াইয়ে, না জেনে তাই খেয়ে অশোকার সর্বনাশ হয়ে গেল। অশোকার ছেলে-মেয়ে মারা গেল, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, গোয়ালে গরু, রাজ্যে প্রজারা মরতে লাগলো। রাজারও কুষ্ঠ হতে পড়লো অশোকা। তখন সে কাঁদতে কাঁদতে অশোক গাছের ছায়ায় ছায়ায় তার পিতার আশ্রমে এসে উঠলো। মুনি বললেন, 'তুমি অশোকা, তবে তোমার এত শোক কেন?' তখন মুনি ধ্যানে জানলেন, অশোকষষ্ঠীর দিন চাল খেয়ে এই দশা। তখন মুনি ওকে দিয়ে অশোক ষষ্ঠীর পূজা করালেন। ঘটের ডালের আর কাকনের চালের নৈবিদ্যি দিয়ে যে ষষ্ঠীর পূজা করে অশোকতলায় ঐ ষষ্ঠীর প্রসাদী জলজল দিয়ে মরা ছেলেমেয়ে বাঁচালেন মুনি। হাতীশালে হাতী বেঁচে উঠলো, ঘোড়াশালে ঘোড়া বেঁচে উঠলো, গোয়ালে গরু বেঁচে উঠলো, রাজ্যে রাজ্যে প্রজারা অকালমৃত্যু থেকে বেঁচে উঠলো, অশোকা রাজার "সুয়ো" হলেন, সৌভাগ্য ফিরে পেলেন, দেশে দেশে অশোকষষ্ঠীর ব্রত প্রচারিত হোলো। চৈত্রমাসে অশোকষষ্ঠীর দিন অশোকতলায় যা ষষ্ঠীর পূজো দিয়ে, 'কথা' শুনে সকলের ভালো হোলো, তারা যা অশোকাকে আদর করতে লাগলো। এইভাবে অশোকষষ্ঠীর ব্রতকথা প্রচার হোলো। যে বলে, যে শোনে এই কথা, সকলের ভালো হয়, হারানো পায়, ম'লে জীয়ায়, নির্ধনের ধন হয়, অপুত্রের পুত্র হয়, যে যা বর মাগে, সেই বর পায়।

• • • —

"একবার চোখ খুলে দেখ্, স্বর্গপ্রসূ ভারত-ভূমিতে অন্নের জন্যে কী হাহাকারটা উঠছে! ঐ অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার জন্যেই আমি লোক-গুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—আর তোরা কি কচ্ছিস? দেশের লোককে আগে অন্ন সংস্থান করবার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শোনাস্। কর্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

অন্ধ্র প্রদেশের দুটি উৎসব

মঞ্জুশ্রী রায়

সব দেশের মানুষের মনের প্রবণতা মূলতঃ এক। দেখাশোনা বা যাতায়াতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকলেও সবদেশের মানুষের রূপকথা, লোকশ্রুতি, উৎসব-অনুষ্ঠান একই সুরে বাঁধা। বিভিন্ন আবহাওয়া, বিভিন্ন ঐতিহ্য ও দেশজ তাৎপর্যে আঞ্চলিক লোকাচারগুলো মাটির গুণে অনন্য হয়ে ওঠে।

অন্ধ্র-প্রদেশ প্রধানতঃ তেলেগু ভাষাভাষী দেশ। প্রাচীনকালে পূর্বগোদাবরী জেলার দ্রাক্ষারামম্ তীর্থের ভীমেশ্বর শিব, কুরনুল জেলার শ্রীশৈলম্ তীর্থের মাল্লিকার্জুন শিব ও চিত্তুর জেলার শ্রীকলাহস্তীর অধীশ্বর কালেশ্বরম্ শিব, এই তিন শিবলিংগের মধ্যবর্তী ভূখণ্ড ত্রিলিংগ দেশ বা তেলেগু দেশ বলে অভিহিত হতো। এখনকার তেলেগু দেশ বা বর্তমানকালের অন্ধ্র-প্রদেশের বিস্তার আরো অনেক ব্যাপক। সেইজন্যে এখানে নানাভাবে বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে আমি বেছে নিয়েছি দুটো প্রধান উৎসব, যা মানুষ বিশ্বের প্রায় সবদেশেই নিজেদের মত ক'রে পালন করে থাকে মোটামুটি একই রীতিতে এবং পদ্ধতিতে।

প্রথমে বলি সংক্রান্তির কথা। আমাদের পৌষ-পার্বণ, উত্তর ভারতের মকর-সংক্রান্তি এবং তামিলনাড়ুর পোংগল উৎসবের সংগে এই উৎসবের শুধুমাত্র তিথির মিলই নয়, অন্তরেরও মিল আছে। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে এই উৎসব পালিত হয় প্রতিবছর জানুয়ারীর মাঝামাঝি। উৎসবের আগের দিন যে সূচনা হয় তার স্থানীয় নাম "ভোগি"। সংক্রান্তির পরের দিন পালন করা হয় যে আচার তার নাম "কানুমু।"

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে-সংক্রান্তির দিন সূর্য মকররাশিতে প্রবেশ করে। সেদিন উত্তরায়ণের প্রথমদিন। সেদিনই পূর্বপুরুষদের পুজো করবার বিধান আছে। ওইদিন থেকে যতদিন উত্তরায়ণ চলবে ততদিন স্বর্গের দরজা পরিপূর্ণভাবে খোলা থাকবে মৃত ব্যক্তিদের জন্যে। স্বর্গীয় আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হবেন তাঁরা।

নতুন শস্য উঠবার ঠিক পরেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যখন চাষীরা পাকা-ফসলের গন্ধে সব দুঃখ ভুলে থাকে। সারাবছরের পরিশ্রমের ফসল বুকে তুলে পরম আদরে ঘরে তোলে। আনন্দে-হাসিতে-গানে সে সময়টা তারা মেতে থাকে। তাইতো কৃষিপ্রধান এ অঞ্চলে সংক্রান্তি খুবই জনপ্রিয় উৎসব। নতুন ফসলে নবান্ন প্রস্তুত করা অতি আবশ্যিক প্রথা। নতুন গুড়, নতুন চাল, নারকেল ও দুধ দিয়ে "পোংগল" নামে একটি সুখাদ্য প্রস্তুত করা হয়। প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর গোটা উৎসবটার নামই "পোংগল," আর সে উৎসব ওদেরও সব সেরা, সর্ব-প্রধান উৎসব।

উৎসবের দিন পনেরো আগে থাকতে ভোর ভোরে কুমারী মেয়েরা গৃহদ্বারে সুন্দর, সুশোভিত আলপনা আঁকে। চালের ছিটে দিয়ে আঁট দেওয়া জায়গাতে মুগ্‌ও নামে একজাতির সাদা গুঁড়ো দিয়ে দুচ রেখায় সূক্ষ্ম জটিল জ্যামিতিক নক্সা আঁকে। পেলব অথচ সমান মাপের নক্সার ঠিক মধ্যস্থলে একতাল গোবর রাখা হয়, তাতে কুমড়ো, লাউ কিম্বা শশার একটি ফুল গুঁজে দেওয়া হয়। এই গোবরের তাল সযত্নে রেখে দেওয়া হয়। সংক্রান্তির আগের দিন "ভোগি" জ্বালানো হয় এই শুকনো গোবর ও কিছু ডালপালাতে আগুন ধরিয়ে। সেই আগুনের আঁচে পরের দিন "পোংগল" রান্না হয়।

কোন কোন অঞ্চলে নব-বিবাহিত মেয়ে-জামাইকে বিশেষভাবে ওইদিন নিমন্ত্রণ কোরে আনা হয় গৃহে।

তৃতীয় দিনে "কানুমু"—এ প্রথা গাই বলদ ও ষোষের জন্যে। নবান্ন-উৎসবে এরা অপরিহার্য কেননা শস্য-

উৎপাদন ও দুধের জোগান—এরা ছাড়া সম্ভব না। তাই ফসল বাদের পরিশ্রমে ঘরে তুলি তাদের এই বিশেষ দিনে বন্দনা না করলে চলবে কেন?

সুন্দর কোরে পুঁতির মালা, শংখমালা ছোট ছোট পেতলের ঘন্টা, দড়ার নেকলেশ, রেশমীরঙিন টাসেল দিয়ে এদের শিং ও গলা সাজানো হয়। পেন্টের লাল, সবুজ রঙে মৃদু-শৃংগী ওংগলের বিরাট সুন্দর গরুদের শিং-গুলো রঙ্ কোরে দেওয়া হয়। সামিয়ানার মত কারুকরা-ঝংকার গদির আসন পিঠে বেঁধে আরো শোভা করা হয়। যার কোরে প্রথমে পোংগল ও তারপরে অন্য ভাল খাবার এদের খাইয়ে, তাদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে যাত্রা পরিক্রমা করা হয়। কৃষি-নির্ভর দেশে গো-ধনের এমন পুজো ও তাকে উৎসবের অংগ কোরে নেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

এ উৎসবের আর একটি অংগ "পুতুলসজ্জা"। বাড়ীতে যত সুন্দর সুন্দর পুতুল আছে তাদের পরিচ্ছন্ন কোরে থাকে-থাকে সাজিয়ে প্রদর্শনী করা হয়। সবাই দেখতে আসেন। বাড়ীতে বাড়ীতে এই সজ্জার অভিনবত্ব নিয়ে ও সংগ্রহ নিয়ে প্রতিযোগিতা চলে।

এবারে আসি 'উগাড়ি' উৎসবের কথায়। এটিও বিশেষভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে পালিত হয়। অন্ধ্র-প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে একে "ওড্ডি-পরোব্বা" বলে। তেলেগু ভাষাভাষীদের বছরের প্রথমদিন; ("চৈত্র শুদ্ধ পড়ামি")। প্রত্যেকে আনন্দের সংগে এদিনটিকে পালন করে। সংস্কার আছে বছরের প্রথমদিনটিতে খুশী থাকলে সারাবছর হেসে খেলে কেটে যাবে। এ-দিনে লোকে বিগত বছরের কথা স্মরণ করে ও ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধে। অনাগত দিনে যে শ্রম, যে বাধাবিপত্তি আছে তাকেও নতুন দিনের সংগে বরণ করে নিতে হয় কারণ জীবন অবিমিশ্র সুখের নয়। ভাল-মন্দ, তিক্ত-মধুর রসে ভরা এ জীবন। আজকের দিনে তাকেই আমরা বরণ করে নেব। এ-কথা স্মরণ রেখে তৈরী হয়—"পাচাড়ি।" চিনি বা গুড়, নিমফুল, আমের টুকরো, নতুন তেঁতুল বা লেবুর রস মিশিয়ে তৈরী করা হয়। তিক্ত নিমের আস্বাদকে লেবুর বা তেঁতুলের অম্ল রস ও চিনির মিষ্টরসের সংযোগে যেমন সহনীয় কোরে তোলা হয় তেমনি জীবনের দুঃখের তিক্ততাকে সুখের ও আনন্দের অম্লমধুর রসে সহনীয় কোরে তোলাই কাম্য।

জ্যোতিষি ডেকে ভাগ্যগণনা করাও এ উৎসবের আর একটি অংগ। সব অঞ্চলের লোকের মধ্যেই এই প্রথা আছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলা সবাই একজায়গায় জমায়েত হয়ে ভাগ্যফল শুনবে। এমনকি রেডিও স্টেশন থেকেও জনসাধারণের সুবিধের জন্যে ভবিষ্যত গণনা হাষ্টফল, রাশিফল প্রভৃতি প্রচার করা হয়। আশার বাণী এভাবে শুনতে পেলে সকলের হৃদয়ই আনন্দে সুখে ভরে ওঠে।

এ অঞ্চলের সব হিন্দুই ওই দিন তৈলমর্দন কোরে চানটি (oil bath) করবে, নববস্ত্র পরিধান করবে, উত্তম আহার্য বিশেষ বিশেষ প্রিয় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করবে এবং নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার অর্চনা করবে।

আজকের প্রগতি ও মেয়েরা

কুমারী শঙ্করী ব্যানার্জী

প্রগতির নামে একটা অদ্ভুত আলোড়ন জেগে উঠেছে মেয়ে মহলে। পৃথিবীর সর্বত্রই নাকি এটা ঘটেছে। কিন্তু আমরা বাঙালী তথা কলকাতাবাসিনী যারা পুরুষের সঙ্গে সর্বরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হয়ে পথে ঘাটে বাধ্য হয়েই বেরিয়ে পড়েছি—এ ধাক্কা সামলাবার শক্তি আমাদের কতটুকু?

কর্মব্যস্ততার ভেতরে দিনরাতই তো মেয়েদের থাকতে হয়। সংসারের সাশ্রয়ের জন্য মোটামুটি মেয়েদেরকে ঘুম ভাঙার পর থেকে শুরু করে রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সন্তান পালন, তাদের শিক্ষাদান, স্কুলে পৌঁছনো, রান্নাবান্না কাজের সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় কাজকর্ম, লোক-লৌকিকতায় ব্যস্ত থাকা, ঘরকন্নার সব কিছুর ওপরে প্রখর দৃষ্টি রাখা—এসব তো আছেই, এছাড়া কেউ পরিজন থাকলে তার সেবাযত্ন, ডাক্তার বৈদ্যের ব্যবস্থা করা, স্বামীপুত্রের সঙ্গে মন মিলিয়ে চলা এগুলোও একটা কর্তব্য বৈকি! এর ওপরে যারা চাকরী-জীবিনী তাদের তো ফুরসৎ নেই। তারা যে এত কর্মব্যস্ততার ভেতরেও বেঁচে আছেন এইটেই আশ্চর্য। একটা প্রকাণ্ড অলৌকিক কাজও বলা চলে একে।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এইসব ঝঞ্ঝাট পোয়ানো মেয়েরা যদি প্রগতির আলোড়নে জড়িয়ে পড়েন তাহলে তাদের দশাটা কি রকম হয়ে দাঁড়ায় সেটাই আমার বক্তব্য। প্রগতির অর্থে কী বুঝি সেটারও একটু ব্যাখ্যা দরকার। প্রকৃত গতি অর্থে যে প্রগতি সেটা এ যুগে অন্য অর্থে রূপান্তরিত। সৎ, শুভ, কল্যাণ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে আত্মমর্যাদার সংমিশ্রণে যে প্রগতি তাকে তো খুঁজেই পাওয়া যায় না।

সাহিত্যে, শিল্পে, ব্যায়ামচর্চায় বা অন্যান্য চারুকলার ভেতরে মেয়েদের প্রগতির একটা সুস্থ এবং সুশ্রী সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই। তারপরে যুদ্ধোত্তর কালে তো বটেই পাকিস্তান হবার পর অস্থির মনবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পরিবেশকে খাপ খাওয়াতে না খাওয়াতে অবাধ হিন্দী সিনেমার বন্যায় যেন ঐ এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে থমকে দাঁড়ালো।

আধুনিক কালের মেয়েদের জীবনে এটাই একটা স্বর্ণ-সুখ বলে অনুভূত হতে লাগার ফলেই এই প্রগতির স্তরে তাদের বেশভূষা, আচার আচরণ, সংলাপ সঞ্চালন, প্রগলভতা-প্রয়োজনীয়তা সবই যেন একটা উদ্ভট আকৃতি ধারণ করল। বাঙালী মেয়ের অনায়াসেই তাদের নিজস্ব বা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন, মৌলিকতা সৌন্দর্য এবং শ্রীকে ভুলে ঐ প্রগতির স্তরে লোলা খেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল

কিন্তু এই প্রগতির স্তরে ওঠানামা করতে করতে কোন মেয়ে কতটুকু লাভবতী হয়েছেন সেটাই বিচার্য। রেজিষ্ট্রেশন ম্যারেজও এই প্রগতির একটি বিশেষ অঙ্গ। গন্ধর্বমতে বিবাহ পূর্বেও ছিলো। কিন্তু তারজন্য পূর্বেও তাদের কম বেগ পেতে হয়নি। চিত্রাঙ্গদা, সুভদ্রা, শকুন্তলার মতো মেয়েদেরও 'লাভ্ ম্যারেজ' করে কতো ঝক্কিই না সইতে হয়েছিল। কিন্তু সেটাই প্রধান কথা বা বক্তব্য নয়।

নিয়ম অনুসারে সব কিছুরই ভারতম্য ঘটে। আগুনে আঙুল দিলে ক্ষতি করবেই কিন্তু রাঁধবার সামগ্রী দিলে তা লাভজনক ভোগ্যই হবে। সুতরাং প্রগতির অর্থ নানা ভাবেই ব্যক্ত করা চলে।

আমার বক্তব্য, এইসব বাইরের জগতের সঙ্গে কর্মময় জীবনকে যে সব মেয়েরা জড়িয়ে রেখেছেন—তাদের গায়ে যদি প্রগতির নামে ঐ উদ্ভট বেশভূষা, চালচলন, আচার

ব্যবহার প্রকট হয়ে ফুটে ওঠে তাহলে তা সমাজের বা সংসারের পক্ষে কতখানি কল্যাণময় হয়ে উঠবে? দু একজনকে নিয়ে বিচার করাটা ঠিক হবে না। সমষ্টির কতটুকু উন্নতি বা কল্যাণ হোল সেটাই মনে রেখে আজ অনেক কিছুই ভাবতে হবে।

হঠাৎ আলোকের ঝলকানিতে মুগ্ধ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। তবে তার জন্য যদি চোখের বা মনের কোনো ক্ষতি হয়—সেটা কিন্তু মোটেই যুক্তির কথা হবে না।

বর্তমানে মেয়েদের অর্থাৎ আমাদেরও অসহ্য যন্ত্রনার ভেতর দিয়ে কালাতিপাত করতে হচ্ছে বলেই একটু আরাম, একটু শান্তি, একটু মুক্তির জন্য আমরা হাত বাড়িয়ে পেতে চাই। কিন্তু পাই কি? কোন এক অভিশাপে, না, তাইই বা বলব কেন, আমাদেরই নিজ কৃতকর্মের জন্যই আমরা কেমন অস্বস্তির কিকিবিকি আগুনে জ্বলে যাচ্ছি!

এ থেকে রেহাই পাবার পথও সপ্রশস্ত রয়েছে। কিন্তু আমাদের "ভ্যানিটি" তাকে বাধা দিচ্ছে।

সংসারে শান্তিটাই আসল। তাকে পেতে গেলে তো আর আজকালকার ফ্ল্যাটে থাকা কপোত কপোতীর কাহিনী বিন্যাস করলে চলবে না। বুড়োবুড়ি, অশক্ত, অতিথি অভ্যাগত, রোগী, অনাহুত সকলকেই সাদরে গ্রহণ করতে হবে। এজন্য চাই তেমনই প্রশস্ত মন। নিজেদের কর্তৃত্বের তো সময় একদিন নিয়মানুসারে আসবেই। কিন্তু আজ যাঁরা জীবিত-জীবিতা থাক না তাদের তৃপ্তির জন্য তাঁদেরই হাতে এ কর্তৃত্বটুকু। হ্যাঁ একটু মানিয়ে নিতেই হবে। এরপরেই প্রশ্ন উঠবে স্বামী ও সন্তানদের। দিন যখন পড়েই রয়েছে তখন বয়স্ক বয়স্কাদের খুশিটুকু না হয়ে এবং তাদের বিনা অনুমতিতে কোথাও না গিয়ে—বাইরে হলায় কিছুটা স্বচ্ছন্দ্য বিহারিণী। এতে তাঁদের অনুমতি স্বেচ্ছায়ই আসবে বলে আমার বিশ্বাস। বাইরের সমাজেও যদি আমরা নিজেকে শান্ত স্থির এবং নির্দোষী রেখে দশজনের সঙ্গে কথা বলি, বেড়াই, হাসি গল্প করি তাতে দোষ কী? তবে হ্যাঁ, আগেই বলছি যে, আত্মমর্যাদাটা নিজের কাছে। কখনো সেটা বংশগত, কখনো বা পরিবেশগত। এজন্য মনেরও কল্যানময় শুচিতা এবং শিক্ষা দরকার।

এরপরেই আসবে উগ্র সাজসজ্জার কথা। সবাইকে তো আর সব কিছু মানায় না! কিন্তু বর্তমানের অনুকরণীয় যুগে যে অগ্রগতির হাওয়া বইছে তাতে যাকে যা মানায় না তাকেও এক অদ্ভুত সাজে কিম্ভূতকিমাকার রূপে আমরা দেখতে অভ্যস্ত হই। একটু বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দিয়ে তাকালে এ সব অনুভব করা সম্ভব হয়। এই সাজসজ্জা উৎকটতার জন্য আমরা মেয়েরা বহু স্থানে বহু ভাবেই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করি। আমাদের বোধশক্তির যথার্থই অভাব কি ঘটেনি?

এই রকম বহু সমস্যা কণ্টকিত নারী জীবনের দুর্দশা এবং দুঃখময় পরিণতির কথা বলতে গেলে একটি মহাভারতও রচিত হতে পারে। স্বল্প কথায় নারী জীবনের কয়েকটি সমস্যা তুলে ধরা হোল। মীমাংসার দায়িত্ব সংবেদনশীলা মেয়েদের ওপরই রইল।

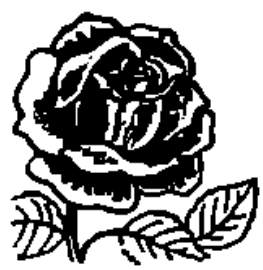

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য
যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলতিই
টনার প্রধান
উপকরণ

- কেশ পতন, অকালপক্কতা ও
- কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং
- প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ
- কেশোদ্গমে সহায়তা করে।
- মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা-৭

মেয়েরা সেরা লক্ষ্মী ঘি

এখন ২৫০ গ্রাম টিনেও বাজারে পাবেন

17 APR 1973

অষ্টবিংশতি বর্ষ ॥

ফাল্গুন ১৩৭৯

কে. সি. দাশের

রসগোল্লা

শুধু রসনার তৃপ্তি সাধনেই নয়
দেহের পুষ্টি সাধনেও অদ্বিতীয়।

কে. সি. দাশ প্রাইভেট লিঃ

আবিষ্কারক : রসোন্মালাই
কলিকাতা—ম্যাডাম্সের

কী সুন্দর মধুর হাসি

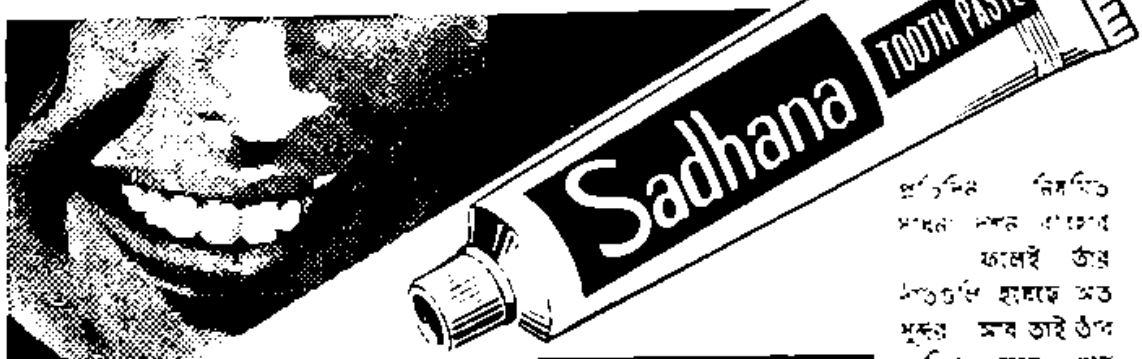

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহারে ফলেই তাঁর দন্তপংক্তি হয়েছে অত সুন্দর অমন তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য প্রতিদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

10.6/70

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের অনুরোধেই প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৬৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ. আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এম.সি.এম. (লণ্ডন) এম.সি.এম. (আমেরিকা) ভাগলপুর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও চিকিৎসক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (কলি) আয়ুর্বেদাচার্য

ক

গরমে চলুন
হালকা পায়ে
মেয়েদের জন্য তৈরি বাটার চপ্পলগুলির নকশা এমন, যাতে স্বচ্ছন্দে হাওয়া খেলতে পারে, যাতে সারাদিন পায়ে লেগে থাকে এক মোলায়েম ও নিশ্চিন্ত আরাম। দৃষ্টি ছিপছিপে গড়ন —সেদিকেই রাখবেন পায়ের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মনে রেখেই তৈরি...আসুন না, বাটার দোকানে। এছাড়া পায়ে দেখুন।
৮.১৫
১২.৯৩
১২.৯৫
১৬.৯৫
Bata
Bata
Bata
Bata

গল্প-ভারতী

GALPA-BHARATI

ফাল্গুন
১৩৭৯
অষ্টবিংশতি-বর্ষ

MARCH 1973

মূল্য : এক টাকা (ডাকমাশুল স্বতন্ত্র)
বার্ষিক পূজা সংখ্যা সহ—কুড়ি টাকা

সম্পাদক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শ্রীবোলবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাঃ লিঃ,
১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

আপনি

কিছু আয় করতে চান?

আমরা শিক্ষিত কর্মহীনদের সুযোগ দিতে চাই।

ভারত সরকারের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট বিক্রী ও মেয়াদী জমায় সরকারী সাহায্য করতে পারবেন এমন উদ্যমী ও উৎসাহী বিক্রয়-প্রতিনিধিদের স্থায়ী/অস্থায়ী কর্মী চাই। এই সরকারী সিকিউরিটীর ওপর বছরে সুদের হার ৭½% পর্যন্ত। এছাড়ার প্রচারের দায়িত্ব বুদ্ধি ও নিপুণতার সঙ্গে পালন করতে হবে। এর জন্য ১.৭৫% কমিশন দেওয়া হবে। এই কাজে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে আদান প্রদানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও সুযোগ আছে।

চাকরি বাকরি বা ব্যবসার কাজে নিযুক্ত আছেন এমন কোনও ব্যক্তি যদি উপরি কিছু আয় করতে চান তো এই কাজের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এই কাজে আগ্রহ থাকলে আজই জাতীয় সঞ্চয় কমিশনারকে পোস্ট বক্স ১৬, নাগপুর এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

davp 72/507

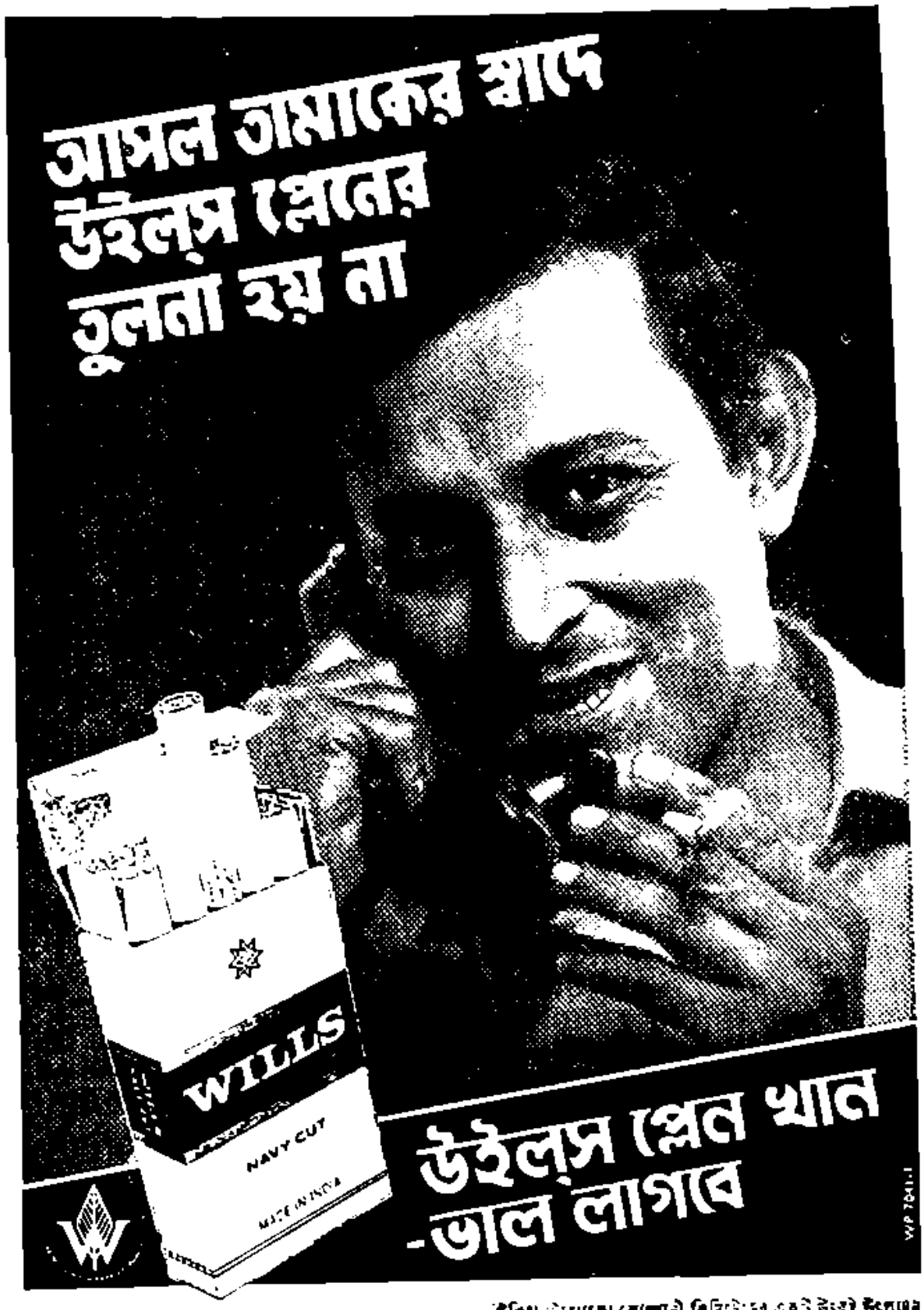

ইণ্ডিয়া টোব্যাকো কোম্পানী লিমিটেডের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

অনাবিল আনন্দের জন্য দার্জিলিঙ চলুন

মাত্র এক রাত্রির রেলভ্রমণ—পরদিন সকালেই পৌঁছে যাবেন মনোরম দার্জিলিঙ শহরে। বিকাল ৪–১৫ মিনিটে কলকাতার দার্জিলিঙ মেলে চড়ুন —পরদিন হিমালয়ের কোলে ঐ পার্বত্য শহরেই প্রাতঃরাশ করুন।

শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাতে দার্জিলিঙ অতুলনীয়। ঝকঝকে সূর্যের আলো এবং চমৎকার হিমেল আবহাওয়া। কেবল দার্জিলিঙই নয়—আরও অনেক সুন্দর দর্শনীয় স্থান রয়েছে—যেমন কালিম্পঙ, কার্শিয়াঙ, গ্যাংটক, ফালুট, সন্দাকফু ও পার্বত্য উপত্যকার মনোরম স্থানসমূহ।

সকলের সাধ্যমত থাকবার জন্য রয়েছে দার্জিলিঙ ও কালিম্পঙে ট্যুরিস্ট লজ, শৈলাবাস, টাইগার হিল ট্যুরিস্ট লজ ও পাংরিগা ট্যুরিস্ট লজ।

বিশদ বিবরণ ও বুকিং-এর জন্যে ম্যানেজারদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন :

দার্জিলিঙ ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৪১৩), শৈলাবাস (ফোন ৪৮৩), টাইগার হিল ট্যুরিস্ট লজ, কালিম্পঙ ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ৪৩) এবং পাংরিগা ট্যুরিস্ট লজ (ফোন ২৯৩) কিংবা নিম্নের ঠিকানাতেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/১, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ডালহৌসি স্কোয়ার) ঈষ্ট, কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-৮২৭১, গ্রাম : TRAVELTOUR

অজিত ম্যানসনস ; বেন্টিঙ্ক রোড, দার্জিলিঙ

ফোন-৪৪ গ্রাম : DARTOUR

ওয়াই (পর্যটন) বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

TCP/TB 1964

উৎকর্ষে শ্রেষ্ঠ
বিক্রয়ে সর্বাধিক

মাথা ঠাণ্ডা রাখার কাজে
"মহাভৃঙ্গরাজ" অদ্বিতীয়।

ভৃঙ্গল মহাভৃঙ্গরাজ মাথার তেল
বিশুদ্ধ আয়ুর্বেদমতে ক্যালকাটা
কেমিক্যালের আধুনিক কারখানায় তৈরি।

ভৃঙ্গল মাথার তেলে আছে
ভৃঙ্গরাজ পাতার রস, তিল তেল
এবং আরো ১২টি গাছগাছড়ার নির্যাস।
এ-সমস্তই মাথা ঠাণ্ডা
রাখে। চুল আরো
সজীব করে।

বিশুদ্ধ
আয়ুর্বেদমতে তৈরি
ভৃঙ্গল
সুগন্ধি
মহাভৃঙ্গরাজ
মাথার তেল

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—		৩৫৩
নিউদিল্লীর কালীবাড়ী		৩৫৪
বিপ্লব বহ্নি	—দীপঙ্কর	৩৫৭
আবার সেই ঢেল	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৩৬৫
খোঁজ (গল্প)	—সুবোধ বসু	৩৭১
কাপালিকের খপ্পরে (গল্প)	—অমিতা কুমারী বসু	৩৭৯

বেণীর বাঁধনে বন্যা ছিল কি বাঁধা ?

[illegible] কেশ হবে রমণীয় যে [illegible]
কেশ কেমিক্যালের ক্যাছার! ইডিন
[illegible] কেশরাশিকে [illegible] রমণীয়তা ভরিয়ে দিতে পারে।
ঔষধোপযোগিত এই ক্যাছারাইডিন কেশ তৈল নিয়মিত মাথা ঘুলিয়ে কেশরাশিকে পরম রমণীয় করে তোলে যা আপনার সম্পদ বলে মনের মতন।

কস্মেটিকস্ ডিভিশন
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা ০ বোম্বাই ০ কানপুর
দিল্লী ০ মাদ্রাজ ০ পাটনা ০ আমৃতসর

এই সংখ্যায়

বিগত যুগের বহুমাত্রিক মহিলা সাহিত্যিক	—রমেন চৌধুরী	৩৮৫
এই তো মানুষ	—নির্মলেন্দু মাল্লা	৩৮৯
বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৩৯৩
লড়াই চেতা মা [illegible]	—ভরদ্বাজ	৩৯৬
নাটমঞ্চ	—রাকিব	৩৯৯
জীবন নাট্যের রঙ্গচিত্র	—অনাথ উপাধ্যায়	৪০৩

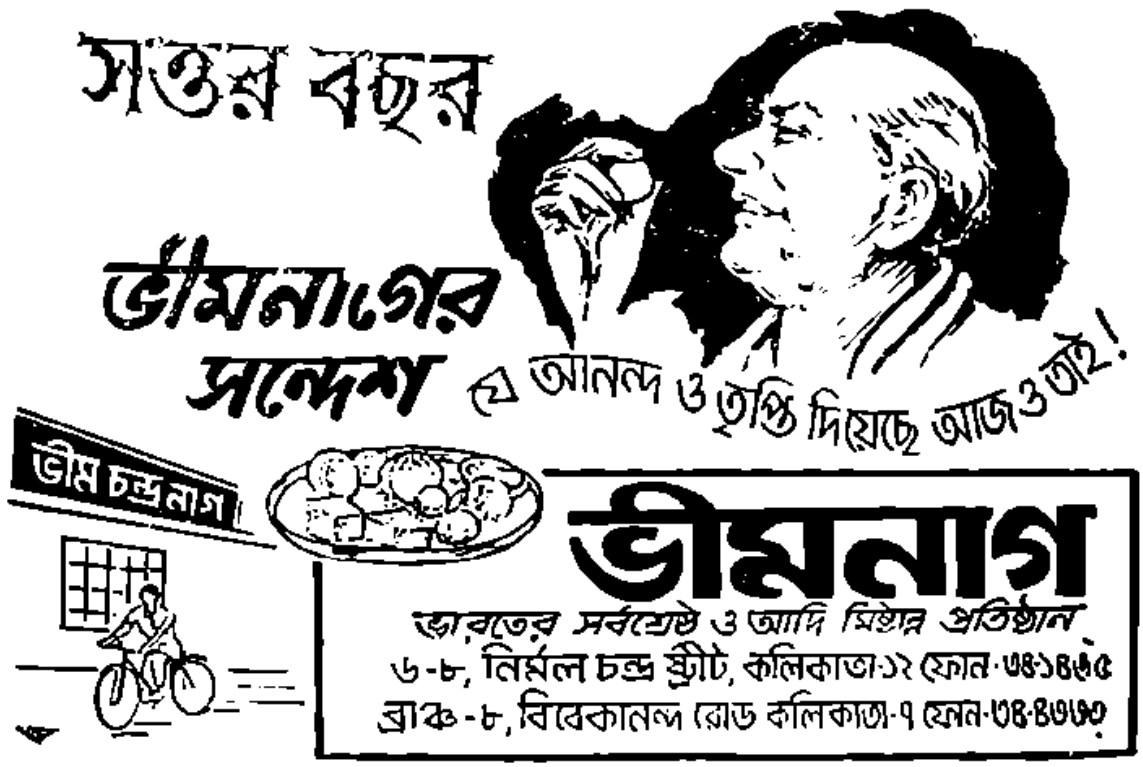

এই সংখ্যায়

বসন্ত উৎসব

উৎসবের ঋতু বসন্ত	—উৎপল চক্রবর্তী	৪০৫
বসন্তোৎসব ও নীতি বাগীশতা	—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	৪০৭
বসন্তরাজ	—বাসন্তী বাগচী	৪০৯
শান্তিনিকেতনের বসন্তোৎসব	—কৃষ্ণা সেন	৪১১
বসন্ত জাগ্রত দ্বারে	—মলয়া ধর	৪১২

এই সংখ্যায়

ফাল্গুনের উৎসব — মেয়ে মজলিস	—বেলা দে	১১৪
গৃহসজ্জা	—সুবর্ণলতা সেন	১১৫
ঘর না ফুলের বাগান—	— প্রতিকণা চক্রবর্তী	১১৬

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

জল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা তো জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রামদুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ফোন: ৩৩ ১৪৫০

৫, ৬, হেয়ার ষ্ট্রীট.

ফোন: ২৩-১৮১১

শাখা

২৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ.

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘি ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশির কুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম. জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

২৭৯এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-৩২৯৪

শাড়ী নয় সুতার কবিতা
শাড়ী শিল্পের চরম উৎকর্ষ অতি সুস্পষ্ট প্রতিটি শাড়ীতে
অ তুলনীয় * অভি নবধূনি * অভিজাত

সম্পাদকীয়

আজ গভীর ভাবে, আরো ব্যাপকভাবে ভারতের ঘরে ঘরে চেয়ে দেখুন, দেখবেন সেখানে এক মহাবিপর্যয়ের অভিনয় চলেছে। আজ প্রত্যেক পিতা শঙ্কিত হয়ে তার পুত্রের দিকে চেয়ে আছেন, আজ প্রত্যেক বিদ্যালয় শঙ্কিত হয়ে তার ছাত্রদের দিকে চেয়ে আছে। আজ প্রত্যেক তরুণীর মনের পেছনে উঁকি মারছে অবগুণ্ঠনে-ঢাকা অপরিচিত এক ছায়ামূর্তি—পুরাতন যা কিছু তা ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে অথচ তার জায়গায় নতুন কিছু গড়ে উঠছে না—প্রকৃতি শূন্যতা সইতে পারে না, তার রাজ্যে কিছুই শূন্য পড়ে থাকে না। তাই যা ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলে যাচ্ছে তার জায়গায় এলোমেলো যেখান থেকে যা খুশি তাই এসে বসেছে তার মধ্যে কোন রূপ নেই, কোন সুর নেই, কোন ছন্দ নেই। যা কিছু পুরাতন নয় তাই-ই নতুন নয় নতুনকে নতুন হয়ে বেঁচে থাকতে হলে, তারও প্রয়োজন রক্ত, মাংস, অস্থির সুদৃঢ়সংহতির। আজ পুরাতনকে ছেড়ে যে আসছে নবাগত, তার নেই কোন চেহারা তার নেই রক্ত, নেই মাংস, নেই অস্থির সুকঠোরতা চাষির চিত্তে আজ এই যে চলেছে ভয়াবহ ভাঙনের ধ্বংস লীলা, একে প্রতিরোধ করতে পারে একমাত্র জাতির শিক্ষা, জাতির শিক্ষার আমূল সংস্কার এবং অতি দ্রুত সংস্কার। আজ অন্তরের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ত্যাগ করে স্পষ্টভাবে স্বীকার করতে হবে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে চাই—আমাদের দেশের প্রত্যেক শিশুকে তার জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে এই ভারতবর্ষের সত্যতার সঙ্গে, তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, তার বিশেষ চিন্তাধারার সঙ্গে, তার স্বতন্ত্র মূল্যবোধের সঙ্গে। মুখে আমরা ভারতবর্ষের ঐতিহ্য, তার সভ্যতার অপরূপ অবদান, তার অবিনাশী আত্মার কথা যত জোরে জাহির করি, কার্যত অর্থাৎ শিক্ষাক্ষেত্রে তাকে অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখি। আজ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়, আমাদের প্রত্যেক কলেজ ও প্রত্যেক স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা দেখলেই তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। আজ দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য নতুন করে লিখতে হবে বই। শিশুকাল থেকে আরম্ভ করে যৌবনকাল পর্যন্ত বিদ্যার বিভিন্নস্তরে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন উপাদান তুলে ধরতে হবে ছাত্রদের সামনে—শিশুকাল থেকে তারা জানুক, চিনুক নিজেদের দেশকে। স্কুলে স্কুলে পড়ান হোক অন্তত পক্ষে রামমোহন-বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য।

কি পরম দুঃখের ইতিহাসের কথা, বাঙালীছাত্র, ভারতীয় ছাত্র, সে-তার স্কুল কলেজ শেষ করেও জানেনা বিবেকানন্দ কি লিখে রেখে গেছেন। শুধু ধর্ম বলে নয়, সাহিত্য হিসাবে বিবেকানন্দ যে বিপুল সাহিত্য সম্ভার রেখে গিয়েছেন তা আজ শুধু কোন কোন লাইব্রেরী, তাও সব লাইব্রেরীতে নয়, একরকম ধুলোয় পড়ে আছে। এই একটি লোকের লেখনী কি সুনিবিড় মেধে, কি সমুজ্জ্বল আত্মশিখায় ভারত-সাধনার কথা পর্যায়ের পর পর্যায়ে লিখে রেখে গিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি স্কুলেও ছেলেদের তা পড়ানো হলো কি? ছেলেরা ভারতবর্ষকে চিনবে কি করে? জানবে কোথা থেকে? কোথা থেকে তারা শক্তি পাবে যে-শক্তির বলে তারা বাহিরের আবর্জনাকে বর্জন করতে পারবে?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

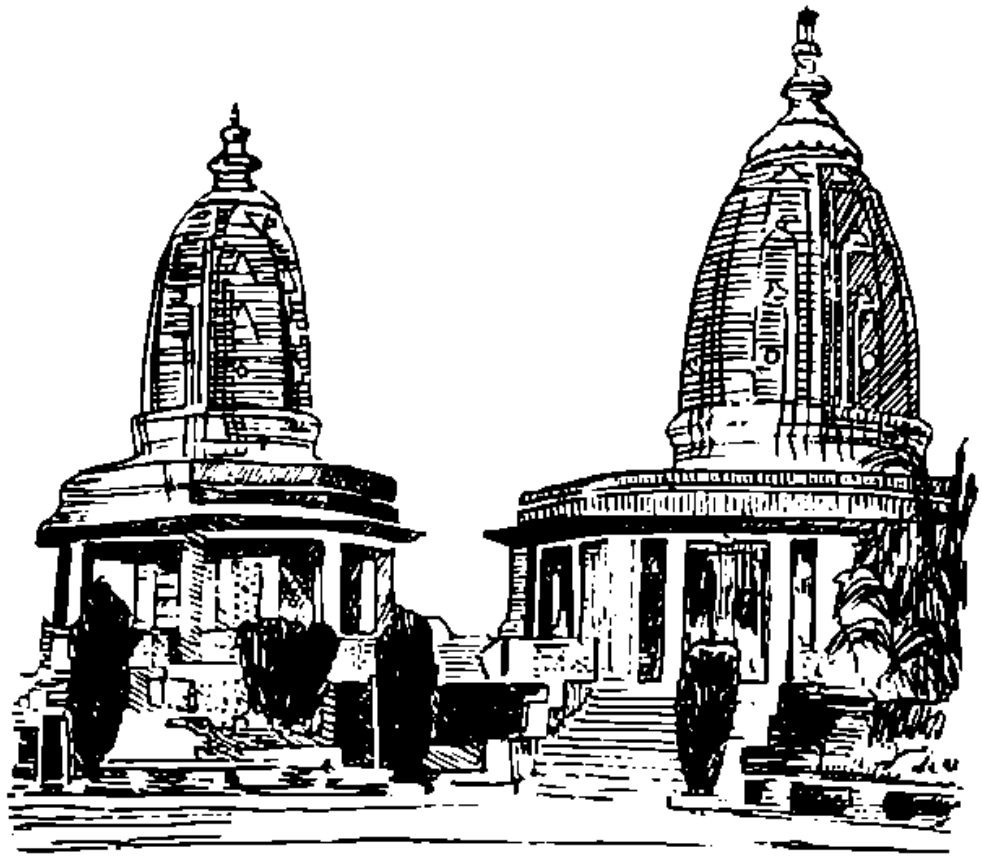

রাজধানীর কালীবাড়ি

(নিউ দিল্লী কালীবাড়ি সম্বন্ধে বহু অনুরোধ করায় ঐ সম্পর্কে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হল)

কালী মাকিকী জয় !

আজো এ ধ্বনি সারা ভারতবর্ষকে উত্তাল করে তোলে—! এই "মৃত্যুত্রস্তা মাত" বাঙালীকে যতখানি উদ্দীপিত করেছে, তার বীরত্ব, ধৈর্য আর মরণপণ সংগ্রামী জীবনকে উদ্বোধিত করেছে, তার আর তুলনা নেই। এই দেবীই তো বাঙালীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন।

তাই বাঙালী যেখানে গেছে, সঙ্গে নিয়ে গেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক চেতনা আর মা কালীর নাম। সে-নামের এমনি ভুবার শক্তি যে ভারতের বহু স্থানেই তা প্রকল্পের মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। গড়ে উঠেছে—কালীবাড়ি !

নিউ দিল্লী কালীবাড়ির উদ্দীপনাময় ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। তার আগে উত্তর ভারতের অনেক স্থানেই বাঙালীরা কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু নিউ দিল্লীর কালীবাড়িই বোধ করি আজ সবচেয়ে বেশী সংখ্যক বাঙালী ও অ-বাঙালীর চিত্তে দুর্নিবার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে। দেবী কালিকার মাহাত্ম্য প্রচার করতে, বাঙালীর ধর্মপ্রাণতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, বাঙালীর ঐতিহ্যকে প্রচার করতে নিউ দিল্লী কালীবাড়ির আজ অগ্রণী ভূমিকা।

বেশী দিনের কথা নয়। ১৯১৫, ভারতবর্ষের রাজধানীতে একটি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সেখানকার বাঙালীদের মনে জাগ্রত হয়। ১৯২১ সালে কলকাতা থেকে রাজধানী যখন দিল্লীতে স্থানান্তরিত হল তখন অনেক সরকারী আপিসও দিল্লীতে চলে গেল এবং সেই সঙ্গে গেলেন প্রচুর সংখ্যক বাঙালী সরকারী কর্মচারী।

দেখতে দেখতে বাঙালী সমাজ গড়ে উঠল সেখানে। জাগল ভ্রাতৃত্ববোধ। চলল ভাবের আদান প্রদান।

সংস্কৃতির চর্চার সঙ্গে ধর্ম চর্চাও চাই। চাই একটি কালীবাড়ি!

দিল্লীর বাঙালীরা উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত। খোঁজা শুরু হল। বেয়ার্ড রোড ও সংলগ্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা রাস্তার ধারে একটি পুরাতন জীর্ণ মন্দির খুঁজে পেলেন।

"পুণ্য লোভীর নাই হল ভীড়
শূন্য তোমার অংগনে,
জীর্ণ হে তুমি জীর্ণ দেবতারা…"

সেই জীর্ণ মন্দিরকে সংস্কার করে হরিশদ গুপ্তের সহায়তায় স্থাপিত হল, কালীমূর্তি। দিল্লীর আকাশে বাতাসে ধ্বনি উঠল—কালী মাইকী জয়!

দেখতে দেখতে সেই মন্দিরের জনপ্রিয়তা অভাবনীয় বৃদ্ধি পেল। উৎসবের সময় জনতাকে যেন সামলানো যায় না!

এই ছোট্ট মন্দিরে মায়ের বাস করা অসম্ভব। তাঁর জন্য চাই আরও প্রশস্ত স্থান। অগণিত ভক্তের তাই হল আকুল প্রার্থনা।

ইতিমধ্যে ১৯২৭ সালে নিউ দিল্লী হরিসভা স্থাপিত হয়েছিল। সেই সভার বিশিষ্ট সদস্য শিবদাস গুপ্তের নেতৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু বাঙালীর সই করা এক আবেদন-পত্র সরকার বরাবরে পেশ করা হল—একটি উপযুক্ত কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাই। তদানিন্তন বড়-লাটের কার্যকরী পরিষদের সভ্য স্যার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্রের কাছেও একটি ডেপুটেশন গেল। সেই সঙ্গে ডাঃ জে. কে. সেনকে চেয়ারম্যান ও শ্রী এস. সি. চট্টোপাধ্যায়কে সেক্রেটারী নির্বাচিত করে একটি অস্থায়ী কমিটি গঠন করা হল। তারপর দীর্ঘ দিন সরকারের সঙ্গে কথা চালাচালি ও দেখাসাক্ষাতের পর ভারত সরকার এই উদ্দেশে এক খণ্ড জমি দিতে স্বীকৃত হলেন—লোয়ার রিজ রোড (বর্তমানে মন্দির মার্গ)—এই রাস্তার ওপর এক একর জমিতে কালীবাড়ি স্থাপনের পরিকল্পনা গতি-বেগে শঙ্কিত হল।

১৯৩১ সালে একটি স্থায়ী কমিটি ও অষ্টি পরিষদ গঠিত হল এবং এই অষ্টি পরিষদ মাত্র ১০০০ টাকা প্রিমিয়ম দিয়ে ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে জমির দখল নিলেন। তারপর দিল্লীর প্রধান কমিশনার ও অষ্টি পরিষদের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী লীজের দলিল সম্পাদিত হল।

১৯৩৪ সালের ৮ই এপ্রিল স্যার বৃপেন্দ্র নাথ সরকার নতুন মন্দিরের শিলান্যাস করলেন। বর্তমান কালীবাড়ি যেখানে অবস্থিত, সেই জায়গাটি সে সময়ে ছিল অত্যন্ত পাথুরে অসমতল। ১০০০'০০ টাকা ব্যয় করে জমিকে সমতল করা হল। ৩৭০০০'০০ টাকা ব্যয়ে ১৯৩৮ সালে মন্দির, পুরোহিতদের থাকার জায়গা ও সীমানা-দেওয়ালের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হল। টাকার অভাবে ধর্মশালা, নাট মন্দির প্রভৃতির কাজ স্থগিত রইল।

১৯৩৮ সালের ২৩শে অক্টোবর দিল্লীর আকাশ আবার মুখরিত হল—কালী মাইকী জয়। সেই দিন স্যার মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন।

তারপর শুরু হল একটি ধর্মশালা নির্মাণের কাজ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কালীবাড়ি সমিতির সভাপতি। প্রধানত তাঁর ও সেই সঙ্গে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি নগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের ক্লান্তি শ্রান্তিহীন উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় (সেই সঙ্গে ছিলেন একদল নিঃস্বার্থ কর্মী) ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে ১,৫৬,৮৫০ টাকা ব্যয়ে ধর্মশালা নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হল। ১৯৫৮ সালের ১১ই মে এই ভবনের শিলান্যাস করেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এবং ১৯৫১ সালের ২৫শে আগষ্ট তিনিই নবনির্মিত ধর্মশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। তারপর ধর্মশালাটি আরও বড় হয়েছে, সাতটি কক্ষ সংযোজিত হয়েছে। এর জন্য ব্যয় হয়েছে ৫৫,৭২৫ টাকা।

সারা বছর ধরেই ধর্মশালায় মানুষের আনাগোনা। স্থান সংকুলান হয় না। রান্নাবাড়িটিও যাত্রীদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়। তাই একটি প্রশস্ততর রান্নাবাড়ির নির্মাণের কাজ শুরু হল ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে। শেষ হল ঐ বছরের আগস্ট মাসে। খরচ হল ১৪,৫০৬'০০।

এর আগে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে পালা করে প্রতি

বছর দুর্গা পূজা হত। কিন্তু কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হবার পর আর কেন নানা স্থানে মায়ের পূজা? এই তো হয়েছে উপযুক্ত মাতৃ বন্দনার অংগন। ১৯৫৫ সাল থেকে নিউ দিল্লীর দুর্গাপূজা কালীবাড়িতেই প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নিউ দিল্লীর কালীবাড়িতে দুর্গাপূজা এক দর্শনীয় স্মরণীয় সাংবৎসরিক ঘটনা। লক্ষ লক্ষ ভক্ত আসেন। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে···ভেদাভেদ নেই। ভারতের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মায়ের প্রতিমার সামনে এসে দাঁড়ান দরিদ্রতম নাগরিক ও শ্রমিক! রাজন্যবর্গের পাশে নগণ্য মানুষ।

কালীমন্দির থাকবে, অথচ শিব মন্দির থাকবে না—তা কি হয়? কালীবাড়ির বিস্তীর্ণ চত্বরের এক পাশে রামকৃষ্ণ মিশনের নিউ দিল্লী শাখার সেক্রেটারী স্বামী স্বাহানন্দ সেই মন্দিরের শিলান্যাস করলেন। এই মন্দির নির্মাণের সকল ব্যয়ভার বহন করেছিলেন শ্রীভোলানাথ মল্লিক ও তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী রেণুকা চক্রবর্তী। ১৯৬৯ সালের আগষ্ট মাসে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং ১৮ই সেপ্টেম্বর তার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হয়। মন্দিরটির জন্য ব্যয় হয় আনুমানিক ২১০০০,০০ টাকা। মন্দিরটি শ্রীভোলানাথ মল্লিকের পরলোকগতা পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা মল্লিকের নামে উৎসর্গীকৃত।

ভারতের রাজধানীতে কালীবাড়ি আজ একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। সর্বশক্তিময়ী মায়ের আরাধনা ছাড়াও এই প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক চর্চারও আজ এক অগ্রণী পীঠস্থান। এখানেই নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, বঙ্গসভা, মহিলা সমিতি ও তৎসংলগ্ন প্রাইমারী স্কুল এবং নিউ দিল্লী বাঙালী ক্লাব তাঁদের দপ্তর চালনা করেন। এখানে একটি সাধারণ পাঠাগারও আছে—নগেন্দ্র রক্ষিত রীডিং রুম। ধর্মশালাতে সভাসমিতি ও ধর্মচর্চার জন্য আছে একটি প্রশস্ত হল।

বর্তমানে ম্যানেজিং কমিটি একটি ত্রিতল গৃহের নির্মাণ কার্য শুরু করেছেন। আনুমানিক ব্যয় হবে ৩ লক্ষ টাকা। গৃহের নাম হবে 'বিবেকানন্দ ভবন।' ১৯৬৪ সালের ২১শে মে ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারক ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীযুক্ত সুধীরঞ্জন দাস এই ভবনের শিলান্যাস করেন। ক্রমবর্ধমান যাত্রী ও অতিথি-অভ্যাগতের স্থান সংকুলানের জন্য এই নূতন ভবন নির্মাণ করা অত্যাবশ্যকীয় বিবেচিত হয়।

এই নূতন ভবনে বড় একটি হল থাকবে আর থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সর্ব সরঞ্জামবিশিষ্ট একটি নাট্যমঞ্চ। এই কার্য শুচুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন কালীবাড়ি সমিতির সভাপতি তাই সর্বসাধারণের কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছেন

নিউ দিল্লী কালীবাড়ি বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চায় যে মহান ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে, যে কর্মতৎপরতায় স্বাক্ষর রেখে চলেছে তা অভিনন্দনীয় তো বটেই সেই সঙ্গে সর্বতোভাবে সকলের সাহায্য পাবারও একান্ত যোগ্য।

নিউ দিল্লী কালীবাড়ির এই নব উদ্যম মায়ের কৃপায় যে সব সার্থকতা লাভ করবে সে বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

"সকলই তোমারই ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি
তোমার কর্ম তুমি কর মা
লোকে বলে করি আমি!"

মায়ের কৃপা পেলে মানুষ কী না করতে পারে। কালী মাহিকী জয়।

জেলভোগ হাটের পথে

কংগ্রেসের আবেদন নিবেদন অনুরোধ-উপরোধের এবং ভয় দিয়ে ভয় জয়ের নীতিতে আস্থাহীন যে একদল তরুণ বিপ্লবের পথে দেশ স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, সেই ভ্রান্তিহীন ভ্রান্তিহীন মহা পরিক্রমণের অধিরাম শোভাযাত্রায় কিছু দূরে আমি হেঁটেছিলাম। শুধু হেঁটে-ছিলাম নয়, সেই শোভাযাত্রার অনেক, অনেক পেছন থেকে সন্দেহিতের মতন পায়ে পায়ে তাদের অনুসরণ করে-ছিলাম। তারপর চলার পথে হারিয়ে গেল কত না নায়ক, ঝরে পড়ল কত না সহযাত্রী ও বন্ধু, শীতের দিনের হাওয়ায় গাছের পাতা ঝরার মতন ঝরে পড়ল কত না তরুণ, তাদের কিছু কিছু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, কারুর কারুর আত্মবিলোপনের আগের কা হনী সংগ্রহ করে বর্ণনা করেছি। কিন্তু শ্রীরামপুরের সেতুবন্ধের বিশাল কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীর সামান্য থেকেও সামান্য সহযোগিতার মতন সেই বিপুল প্রথমটো বিপ্লবী শোভাযাত্রার পথাক্ত অনুসরণ করে আমিও যে অনুদ্দেশ্য চাঞ্চল্য দেখিয়েছিলাম, সেই চাঞ্চল্যের কাহিনী অমুক্ত থেকে গেছে। বিপ্লবের বহ্নিশিখা তা আলো নয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণের পাশে যেন একটি মাটির প্রদীপ!

এবার সেই প্রদীপেরই কথা কিছু বলছি।—

১৯৩৪ সাল।

আমি তখন বগুড়ে অন্তরীন রাজবন্দী। বগুড়া, মানে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত শ্রীনগর থানার অধীন একটি গণ্ড গ্রামে আমার পিতৃ পুরুষের ভিটা। ১৯৩১ সালে এই গৃহ থেকেই আমায় গ্রেপ্তার করে রাজ-বন্দীরূপে প্রথম আটক রাখা হয়েছিল ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে, তারপর স্থানান্তরিত করা হয় বহরমপুর রাজবন্দী শিবিরে, তারপর আনা হয়েছে আবার বগুড়ে। গ্রামের গণ্ডীর বাইরে যাবার হুকুম নেই এবং সন্ধ্যা ছটা থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত গৃহের সীমানার বাইরে যাওয়াও নিষিদ্ধ। শুধু সপ্তাহে একদিন অপরাহ্নে চার মাইল দূরে শ্রীনগর থানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হয়।

বগুড়ে অন্তরীন থাকলেও তাদের ওপর আই. বি. পুলিশের গুপ্তচরেরা নজর রাখবার চেষ্টা করেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞাগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলছি কিনা দেখে। দেখে, আমার বাড়ীতে কারা যাতায়াত করে, কাদের সঙ্গে আমার আছে কি বন্ধুত্ব, তাদের কেউ 'স্বদেশী' কি না, নতুন কাউকে বহিরাগতের দলে ঢুকছি কিনা। যে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকি বলে সন্দেহ-

দীপঙ্কর

ভাজন আমায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে, আমার সেই স্বভাবও আঁটছি কি না, গুপ্তচরেরা সেদিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তবে এই গুপ্তচরেরা সাদা পোষাকের পুলিশ নয়। গ্রামের লোককে, পাড়া প্রতিবেশীকে, এমন কি, আমার আপনজনকেও গভর্ণমেণ্ট মোটা টাকা দিয়ে গুপ্তচরের কাজে লাগায়। গ্রামের চৌকিদার দফাদার-তো নজর রাখেই।

তবে যেহেতু এরা সত্যিকার গোয়েন্দাগিরিতে ট্রেনিং-প্রাপ্ত পুলিশ নয় আর আমার গ্রামের প্রায় প্রতিটি লোকই আমার চেনা, তাদের মধ্যে কখনও কেউ আমার সম্বন্ধে অতি ঔৎসুক্য বা উৎসাহ দেখালে আমি তার মতলব

ঘরে ফেলল এবং ধরা পড়লে গুপ্তচরগিরির কি শাস্তি হতে পারে, কানাইলাল দত্ত, সত্যেন বসু থেকে সুরু করে বহু বিপ্লবী মন্ত্রির সৃষ্টি করে গেছেন, যে মন্ত্রির নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে আমরা বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখাব না, তাই গ্রামা মেয়েরারা আমাদের কাজে বিশেষ কিছু বাধা সৃষ্টি করতে পারত না।

চৌকিদার তমিজদ্দী প্রথম ১ একটু বেগ দিচ্ছিল। যখন তখন আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হত আর লম্বা 'সালাম' জানিয়ে এবং মক্কেলদের মতলবে থেকে এবড়ো-খেবড়ো গোটাকয়েক মলিন দাঁত বের করে এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করত, কেমন আছেন কর্ত্তা? অন্য ছেলেদের বাড়ীতে গিয়েও এমনি খুশির প্রশ্ন করত।

মাসে ওর পেছনেই আমাদের ছেলেদের লাগালাম। জানা গেল, আমাদের খবর এমনিভাবে সংগ্রহ করে প্রতি সপ্তাহে সে শ্রীমপুর গিয়ে থানার দারোগাকে জানিয়ে আসে।

আড়ালে ডেকে বুঝিয়ে দিলাম, আমরা তোমার বন্দোবস্ত করে ফেলেছি।

কাজ হল না।

তখন মুখোমুখি ওয়ার্নিং দেয়া হল, কিন্তু তাতেও কাজ হল না।

ছেলেরা তখন হুমকি দিতে লাগল। আমাদের বিপ্লব-গুরু (ওরফে ছোটকোন) একদিন ওকে বাড়ী থেকে ডেকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ভয় দেখাল, ফের যদি আমাদের কারুর বাড়ীতে কোনদিন তোমায় দেখি, তাহলে হাস্টারের এক ঘায়ে মাথা কাটিয়ে দোব।

তমিজদ্দী তাতেও দমল না, বরং পালটা ছোটকোনকে যাবা তুলে গাল দিল।

ছোটকোন আমায় এসে জানাতেই হুকুম দিলাম, ওর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দাও।

ব্যস, আসরে নেমে পড়ল আমাদের দুজন, ছোটকোন আর আমার ছোট ভাই রঘুলাল।

তখন বর্ষাকাল। সারা বিক্রমপুর পরগণা জলে ভরা-কার। বৈশাখ, জৈষ্ঠে পদ্মা নদীর জল ফুলে ফেঁপে বিক্রম-পুর ডুবিয়ে দেয়। না, বন্যা বলে বলে না, বর্ষার নদীতে ঢল নেমে তার পাড় উপচে পড়ে, সেই উপচে-পড়া জল প্রবেশ করে গ্রামাঞ্চলে, আবার কার্ত্তিক অঘ্রাণ মাসে নদীর জল নদীতে ফিরে যায়। বর্ষাকালে বিক্রমপুরে নৌকো ছাড়া কোথাও যাওয়া যায় না।

মনে পড়ে সেদিন আকাশে ছিল এক ফালি চাঁদ। স্তিমিত জ্যোৎস্না। জলের ওপর শিল্প-তোলা ধানে গাছগুলি মৃদু মৃদু হাওয়ায় দোল খাচ্ছে। মধ্য রাত্রে আমাদের দক্ষিণের কোঠায় বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে আমি কি একখানা বই পড়ছি আর সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। ঘণ্টাখানেক পর ওদের ছুট ডিঙি নৌকো নিঃশব্দে এসে আমাদের ঘাটে ভিড়ল, নিঃশব্দে নেমে এল ছোটকোন ও রঘুলাল। মা বাবা বৌদি, আমার বোন কেউ টের পেল না।

ছোটকোন বলল, কেরোসিন তেলে ভেজানো ন্যাকড়া বেড়ার অনেক জায়গায় গুঁজে দিয়ে, বেড়াতেও তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি, আমরা দূর থেকে দেখে এলাম আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

রঘুলাল (ওরফে রঘু) বলল, তুমি যা বলে দিয়েছিলে, পুব রান্নার ঘরটা জ্বালিয়ে দিয়েছি আর শোবার ঘরের পেছন দিককার বেড়ায় এক কোণে আগুন দিয়েছি, যাতে আগুন দেখে চৌকিদার সবাইকে নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়তে পারে।

বললাম, ঠিক করেছিস, চৌকিদার বা তার পরিবারের কাউকে তো আমাদের পুড়িয়ে মারা উদ্দেশ্য নয়।

কারা ঘরে আগুন লাগিয়েছে, দুনিয়ার কেউ টের না পেলেও তমিজদ্দী ঠিক ঠাওর করে ফেলল এবং পরদিনই সকালবেলা আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হল।

এসেই একেবারে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল, আমারে মাপ করেন কর্ত্তা।

মাপ? মাপ কিসের ওস্তা তমিজদ্দী? বুঝতে পারছি না তো! একেবারে যেন আকাশ থেকে পড়লাম।

বুড়ো লোকটা ভেউ ভেউ-করে কেঁদে ফেলল, এই নাক কামলা হাই কর্ত্তা, আর লাগুম না আপনাগো পিছনে।

যাব, তারপর ধীরে ধীরে তদ্বিরকারকে ডিস্মিস্ করে দেওয়া যাবে। অর্থাৎ এতদিন যে ছিল শ্রীবলব থানার দারোগার গোয়েন্দা, এবার হবে সে স্বদেশী দলের গোয়েন্দা। উটকলি প্যারের ছাপাও সে ঘন ঘন খাবার খেতে লাগল এবং আমরা সবাই যে গুপ্ত বিপ্লবের মতন বাড়ীতেই চুপটি করে বসে থাকি, কোনো 'বা-রাম' করি না, সেই খবরটা দিয়েই সে দারোগার সঙ্গে আমাদের, বিশেষ করে আমার সম্বন্ধে নানা আলোচনা ফেঁদে বসল এবং পুলিশ আমাদের সম্বন্ধে কি ভাবছে তাও সে আই-বি কি লিখছে, আমাদের বাড়ী তল্লাসি হবে কি না, সমস্ত খবর সংগ্রহ করে এনে দিতে লাগল।

আমাদের সংগঠনের কাজ পুরোদমে চলতে লাগল। একাকে প্রধান সহায়ক আমার ছোট ভাই রবু, তারপর ছোটকোন, অনাথ চক্রবর্ত্তী, খগেন ব্যানার্জী আর কালাচাঁদ দাস। বি ভি বিপ্লবী দলের সংগঠন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগল। চালাড়, জোলঘর, বীরতারা, ছয়গাঁও, মাতগাঁও, কোলা, তন্দর, ইটাপুরা, বেলতলি, তালপুর, সেরাজদীঘা এবং আরও নানা গ্রামের ছেলেদের দলে টানতে লাগলাম। শেখরনগর, নয়ানগরেও আমাদের প্রচেষ্টায় বি ভি-র শাখা প্রতিষ্ঠিত হল।

এই সংগঠনের কাজ করতে গিয়ে কত যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে, কত যে ঝুঁকি নিতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। একটা ঘটনা বলি।—

বর্ষাকালে চলাফেরার জন্য বিক্রমপুরের প্রায় প্রতি পরিবারেই একটি বা একাধিক নৌকো থাকে, নৌকো চালাবার লোক থাকে। তাছাড়া চতুর্দিক জলে জলাকার, চাষীদের ক্ষেতখামারের কাজ কিছু থাকে না, তাই তাদের মধ্যে অনেকেই নৌকোয় ছই বেঁধে ভাড়া খাটায়, নিজেরাই মাঝির কাজ করে। এমনই বিশ্বাসী মুসলমান চাষীর নৌকোখানাই আমি ভাড়া করে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়তাম গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। কোথায় যাই, কার কাছে যাই, কেন যাই, কেন যাই নিশীথ অন্ধকার রাত্রে, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ করত না সে, আমায় ভালবাসত ও শ্রদ্ধা করত সারা অন্তর দিয়ে, শুধু জেনেছিল, আমরা স্বদেশী, ব্রাণ দিকা সাইবগো খেপাইয়া ব্রাণের মানুষের ভাল করণের কাজেই আমরা লাইগা আছি।

কখনো কখনো ওর নৌকো ভাড়া না করে আমাদের বাড়ীর খোলা ছোট নৌকোখানা নিয়েই বেরিয়ে পড়তাম। তখন আমি হতাম দণ্ডধর আর বাকি সবে যেত খগেন, অনাথ, ছোটকোন, রবু প্রভৃতি আমার সহকর্মিরা। আমার ছদ্মবেশ থাকত নানা রকমের। কখনো আমি যেন বর্ষি পাড়ার 'নতুন দা'—চওড়া কালো পেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধুতি, সিল্কে করা আদির পাঞ্জাবী, গলায় জড়ানো কোঁচানো পাতলা চাদর, সরু ঘাটাবেড়াই গোঁফ আর দুই ঠোঁটের ফাঁকে জলন্ত সিগারেট। কখনো আমি পূজারী ব্রাহ্মণ বা, তুলগুরু—খাদ ধুতির কোঁচা পেটের নীচে গোঁজা, নয়না উপবীত, খালি পায়ে এবং কপালে ও নাকে চন্দনতিলক, গায়ে জড়ানো নামাবলী, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি কখনো আমি একেবারে পুলিশ অফিসার। আমার সোনাদা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙ্গালী পল্টনে যোগদান করেছিলেন, ফিরে আসবার সময় নানারঙ্গের খাঁকি ট্রাউজার্স, সার্ট, কোট, টুপি ও বুট-পট্টি এনেছিলেন; আমি সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতাম। আর আমার সহকর্মিরা ছেঁড়া ফতুয়া গায়ে দিয়ে ধুতিখানা লুঙ্গির মতন পরে মাঝি সাজত। সত্যিকারের পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে তারা আমাদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলতে পারত কি না জানি না, তবে গভীর রাত্রে এই সব বিচিত্র পোষাকে ঘোরবার সময় একটিবারও পুলিশের সাক্ষাৎ মেলেনি।

সেদিন রাত্রে যেতে হবে পাঁচ মাইল দূরে তালপুর গ্রামে মনীন্দ্র সরকারদের বাড়ীতে। মনীন্দ্র তার বোন লীলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে। শ্রাবণ মাস। পুরো বর্ষাকাল। পথঘাট, মাঠ সব জলে জলাকার। আমাদের যেতে হবে নৌকোয়।

আমি মিলিটারি পোষাক পরলাম—ব্রিচেস, পলাবন্ধ কোট, কাঁধে আঁটা গোটাকয়েক পিতলের বোতাম, বারান্দা ওয়ালা টুপি, ব্রাউন বুট ও পট্টি আর স্পিরিট গায় দিয়ে আঁটা সরু গোঁফ।

গভীর রাত্রে আমাদের নৌকো তালপুর অভিমুখে যাত্রা

করল। আমার নৌকোর মাঝি ছোটকান, খগেন, অবাক। তাড়াতাড়ি পৌঁছাবার জন্য আমরা দোজাসুজি ধান ক্ষেতের মধ্য দিয়ে নৌকো চালিয়ে দিলাম।

ভাবছিলাম, খুব তাড়াতাড়িই তালপুর পৌঁছে যাব। কিন্তু তালপুরের পশ্চিম দিকের গ্রামে প্রবেশ করে আমাদের পথ ভুল হয়ে গেল। খাল মনে করে এগিয়ে যাচ্ছিলাম নিশ্চিন্তে, অকস্মাৎ দেখা গেল, সেটা খাল নয়, পুকুর. এক দিকের পা. ডুবে গেছে। এদিক ওদিক চেষ্টা করেও পথ পাওয়া গেল না। রাত তখন এগারোটা। পুকুরের পাড়ে পাড়ে বাড়ীতে তখনও আলো জ্বলছে। খগেন হতাশস্বরে বলে উঠল, আজ বোধহয় আর পার পাওয়া যাবে না দাদা, ধরা পড়তেই হবে।

হঠাৎ দেখা গেল, একখানা বাড়ী থেকে দুজন মহিলা অনেকগুলো বাসন নিয়ে এসে জলের ঘাটে বসলেন। সঙ্গে কেরোসিনের ডিবা।

মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। বলে উঠলাম, মাঝি, চল্ তো ঐ ঘাটের দিকে, মহিলারা যেখানে বাসন ধুচ্ছেন।

প্রমাদ গুনল মাঝিরা। বস্তুতঃ অন্তরীন রাখবন্দী. রাত্রিকালে বাড়ীর বাইরে যাওয়া যার নিষিদ্ধ, চলে এসেছে সে গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে পুলিশ অফিসারের দৃষ্টিসীমার বাইরে, কোথায় সে ধরে পড়বার চেষ্টা করছে, তা নয়, সে উলটে যেতে চাইছে ঘাটে মহিলাদের কাছে! কিন্তু শিক্ষিত হলেও বিপ্লবী দলে দলনেতার আদেশের বিরুদ্ধে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ নেই।

নৌকো চলল ঘাটের দিকে। আমার পোষাক দেখে ওঁরা অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের গ্রামের চৌকিদার কে বলতে পারেন?

একজন জবাব দিলেন, নাম বরকত আলি।

কোথায় থাকে?

এই তো, এটাই চৌকিদার বাড়ী।

কোথায় সে?

দক্ষর জবাব এল, সে তো দারোগাবাবু বাইতে বসতে, অখনই পাহাড়ায় বাইর হইব।

ডাকুন তাকে।

একজন মহিলা ছুটে বাড়ীতে গেল এবং একটু পরেই এক হাতে লম্বা লাঠি ও অপর হাতে কালি-পরা হারিকেন লণ্ঠন নিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে এল বরকত আলি। তখান থেকেই বারকয়েক সালাম জানিয়ে ছুটে এসে ওর ডিঙিতে উঠল এবং নৌকো নিয়ে চলে এল আমাদের নৌকোর কাছে। এসেই আবার সালাম করল।

বুঝলাম আমায় থানার দারোগা মনে করেছে। কিন্তু সেরাজদীঘা থানার দারোগা পরিচয় দেয়া ঠিক হবে না. চৌকিদার নিজের থানার দারোগাকে চেনে নিশ্চয়ই—তাই প্রথমেই পরিচয় দিলাম, আমি আসছি ঢাকার পুলিশ সাহেবের দফতর থেকে। তোর খোঁজেই এসেছি। তোর নামই তো বরকত আলি?

আবার সেলাম জানাল বরকত আলি, আইগা, হ ছ্যার।

তোর নামে পুলিশ সাহেবের কাছে অভিযোগ গেছে—তুই ঠিকমত পাহারা দিস না—

না ছ্যার, সেই তো। বলে উঠতেই আমি একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম, চোপরও মিথ্যুক কোথাকার! গ্রামের সবাই তোর দুশমন, তাই না? তুই ব্যাটা রাতে তেল দিয়ে ঘুমোস আর ওদিকে লোকের বাড়ীতে চুরি হয়ে যায়। তারা থানায় জানিয়েছে, কোনো কাজ হয়নি, তাই আরজি পাঠিয়েছে ঢাকায় পুলিশ সাহেবকে। যেমন চৌকিদার, তেমন থানার দারোগা। তুই বিয়ে করেছিস? বৌ আছে? ক'টা বৌ?

বরকত আলি মৃদুস্বরে জবাব দিল, আইগা ছ্যার, দুগা বৌ—

দুটো বৌ! আবার ধমক দিলাম, হারামজাদা, লোকে একটা বৌকে খেতে দিতে পারে না আর তুই শালা দু-দুটো বিয়ে করেছিস? তুই তাদের নিয়ে বাড়ীতে থাকলে পাহারা দেবে তোর কোন্ চাচা আর দুফারা, তাই শুনি। গাঁয়ের একটি লোকও তোকে দেখতে পায় না। আমি সাহেবের কাছে রিপোর্ট দোব, তোর চাকরি যাবে হারামজাদা।

বরকত আলি হাত কচলে বলল, এই নাক কানমলা

যাই ছ্যার, আর কাযে গাফিলি করব না, ঠিকমত রোজ হাজে পাহারা দিমু। এইবারটা আমারে দেন ছ্যার।

নরম গলায় বললাম, যা, এইবারটা ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আবার যদি গ্রামের লোক খারাপি পাঠায়, তাহলে জানবি আর তখনও আসব না, তোকে বরখাস্ত করে দোব।

বরকত আলি বার বার সেলাম জানাল।

একটু পর বললাম, এবার যাব সেরাজদীঘা থানায়, দারোগাটাকে সাবেস্তা করতে হবে। এই ব্যাটা, তোদের গ্রামের যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দে তো। তাজপুরের রাস্তাটা দেখালেই হবে —

আমিই লইয়া যাইতে আছি ছ্যার। বরকত আলি উৎসাহিত হয়ে উঠল।

আবার ধমক দিলাম, যাব্ হারামজাদা। তুই সঙ্গে যাবি, তাহলে তোর পাহারার কাজটা কে করবে রে গাধা? আমায় শুধু তাজপুরের রাস্তাটা দেখিয়ে দে, চল।

আর কথা না বলে চৌকিদার তার ডিঙি বেয়ে চলল আর আমরা অনুসরণ করতে লাগলাম। বাইরে মাঠে এসে আমার মাঝিদের তাজপুরের রাস্তা ও সেই পথে সেরাজদীঘা থানায় যাবার হদিসটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে আবার বার বার তাগিদ জানিয়ে ঠিকমত পাহারা দেবার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে যখন ডিঙি বেয়ে ঘুরে চলে গেল, খগেন তখন বরকত আলির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বলে উঠল, ছ্যার, আমাগো চাকরিটা থাকব তো?

সবাই প্রাণ খুলে হাসতে লাগলাম।

ঠিক সময়মত তাজপুরে ধনীন্দ্রদের বাড়ীতে গিয়ে আমাদের নৌকো ভিড়ল।

আগেই বলেছি বিক্রমপুর প্রায় ছ মাস জলের নীচে থাকে, বৈশাখ থেকে আশ্বিন অথবা জ্যৈষ্ঠ থেকে কার্ত্তিক, এ সময় নৌকো ছাড়া যাতায়াত করা যায় না। নৌকো ভাড়া করতে হয়, ভাড়া করতে টাকা চাই। আমাদের সে টাকা কোথায়? বিপ্লবীদল কোনো প্রকাশ্য সংগঠন নয় যে, জনসাধারণের কাছে আদর্শ ও উদ্দেশ্য তারস্বরে ঘোষণা করা যাবে, তারপর চাঁদা আদায়কারীরা সম্পাদক সাক্ষরিত রসিদ বই নিয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করবে, সংবাদপত্রে আয় ও ব্যয়ের বার্ষিক শীট ছাপানো পুস্তিকা প্রকাশ করা হবে। গুপ্ত প্রতিষ্ঠান, যার একমাত্র লক্ষ্য দশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন করা, যে প্রতিষ্ঠানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ধূলোয় মিলিয়ে দেবার জন্য ভারতরক্ষা আইনের মতন সুতীব্র দেওয়ানী রিজ ম্যাগেটিন সরকারমেন্টের অগণিত চালাকচতুরা, সেই গুপ্ত বিপ্লবী দলের খরচা চালানো দুরূহ ব্যাপার। আমরা কেউ চাকরি করি না, সাংসারিক ব্যয় বরাদ্দ চাঁটাই করে কোনো বাবা মা-ই টাকা দেবেন না।

সুতরাং অন্য পথের কথা ভাবতে হল।

আমাদের গ্রামটা আড়িয়ল বিলের দিকে। সেরাজদীঘা গ্রাম অনেক পুবে, তাই উঁচু, আর তার ফলেই ওদিকের গ্রামগুলিতে নদীর জল প্রবেশ করে যেমন মাসখানেক পরে, তেমনি তার গভীরতাও খুব বেশী হয় না। খবর সংগ্রহ করলাম, সেরাজদীঘা পোষ্ট অফিস থেকে প্রতিদিন বিকেলে ডাকহরকরা যে পোষ্টাল ব্যাগটি কাঁধে নিয়ে লাঠির মাথায় বাঁধা ঘুঙুর বাজিয়ে মাইল দুয়েক দূরে ইছাপুরা পোষ্ট অফিসে যায়, সেই ব্যাগটির মধ্যে চিঠি পত্রের সঙ্গে থাকে বেশ কিছু সংখ্যক ইনসিওরের এনভেলপ, যার মধ্যে থাকে অনেক টাকার নোট। সেরাজদীঘা বাজারে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে, যারা মহাজনদের কাছে ইনসিওরে টাকা পাঠায়। ইছাপুরা যাবার কোনো বাঁধানো সড়ক নেই, ডাক-হরকরাকে যেতে হয় ক্ষেতের আল ধরে। বৈশাখে ক্ষেতে থাকে মানুষ সমান উঁচু পাট গাছ। স্থির করলাম, দুটি ছেলে পথের ধারে পাট ক্ষেতের মধ্যে লুকিয়ে শুয়ে থাকবে, ডাকহরকরার ঘুঙুর শুনলেই রেডি হবে, সে কাছে এলেই দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং লাঠির এক আঘাতে তাকে শেষ করে দিয়ে পোষ্টাল ব্যাগটি নিয়ে পাট ক্ষেতের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। যাবার আগে ডাক-হরকরার লাসটা টেনে পাট ক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে আসবে।

প্ল্যান নিখুঁত। ব্রিটিশদের ব্যবহার করলে আওয়াজ হবে আর পুলিশ অনায়াসেই বুঝে ফেলবে যে, এটা স্বদেশী-

সেরাই কাজ। আর রামদা ব্যবহারে যেমন কোনো আওয়াজ হবে না, তেমনি পুলিশও সাধারণ ডাকাতি ও মার্ডার মনে করে বিভ্রান্ত হতে পারে। স্থির হল, ছজন ছেলে যাবে।

শেখরনগর গ্রামের সুবোধ গুহের কাছে এসব কাজে যেই একটি ছেলে চেয়ে পাঠানো নরহত্যা ও ডাকে লুঠন, সুতরাং সাহসী ও কৌশলী হওয়া দরকার।

নির্দিষ্ট দিন সুবোধ পাঠাল গণেশ ঘোষকে আমাদের বাড়ীতে সকালে

কিন্তু আমার নিয়োজিত বর্ষাতির সংবাদ নিয়ে এসেছে গত রাত্রে যে এবার বর্ষার জল দেরাদুনীবার আগেই এসে গেছে এবং আমাদের নির্দিষ্ট স্থানটিতে বুক-সমান জল দাঁড়িয়ে গেছে।

ফলে, যেন তেনপ্রকারেণ কাজ সম্ভব হবে না। গণেশকে ফিরিয়ে দিতে হল।

দুঃখ হল না আমাদের অর্থসংকট

শ্রীনগর থানার কাছেই একটি গ্রাম, নাম কেলডোগ। আমার থানায় যাবার পথেই কেলডোগ। ওখানে প্রতি মাসে একবার করে গরুর হাট বসে। বিরাট হাট। অন্যান্য গরুর আমদানী হয়। অসংখ্য ক্রেতা। চারদিকে হাজার হাজার টাকার লেন-দেন হয়। সন্ধ্যা উতরে যাবার পরও কিছুক্ষণ হাট চলে লণ্ঠন বা কেরোসিনের ডিবা জ্বালিয়ে।

মনে পড়ে, ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে একদিন বিকেলে থানায় হাজিরা দিয়ে ফেরার পথে হাটের মাঝে দাঁড়িয়ে গেলাম। গরু বেচাকেনার ওপর নজর রাখলাম। পাছে কেউ সন্দেহ করে, তাই নিরর্থক এখানে-ওখানে গরুর দর-দস্তুর করে ঘুরতে লাগলাম। দেখলাম, বিক্রেতা গরু বেচার টাকা একটা মোটা সুতো দিয়ে তৈরী লম্বা জালের থলিতে ভরে কোমরে বেড় দিয়ে এঁটে রাখছে।

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল।

মনে মনে প্ল্যান এঁটে ফেললাম।

পরের মাসেই সব আয়োজন করা হল। রঘু ও ছোট-কোন-দুপুরবেলাতেই গরুর হাটে পৌঁছে গেল। নির্ভেজাল ক্রেতা হিসেবে ওরা দুজন ঘুরে ঘুরে নানারকম গরুর দর দস্তুর করতে লাগল এবং কোনো বিক্রেতার সঙ্গেই ধরে বসল না। ওদের ওপর যা নির্দেশ ছিল, তাই করতে লাগল —কোন্ বিক্রেতা বেশ মোটা মোটা টাকার গরু বেচছে এবং সে টাকা কোথায় রাখছে সেদিকে নজর রাখতে লাগল। জনাথ আর হরেন তখন অপেক্ষা করছে হাটের বাইরে মাঠে আর কালাচাঁদকে নিয়ে আমি অপেক্ষা করছি আরও দূরে মাঠের মাঝখানে একটা বড় পুষ্করিণীর ধারে। আমাদের প্ল্যান হচ্ছে, মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে যে বেপারীকে অনুসরণ করে ওরা চারজন আসছে দেখব, ঐ পুষ্করিণীর পাড়েই তার কাছ থেকে থলিটা ছিনিয়ে নেব। আমাদের সবারই জামার নীচে কোমরে গোঁজা আছে একখানা করে ছোরা আর আমার কাছে আছে ছোরা ছাড়াও একটি রিভলভার, চরম অবস্থায় ব্যবহারের জন্য।

মনে আছে, পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন তিথি ছিল সেদিন। আকাশে সোনার মতন চাঁদ জ্বলছিল, সন্ধ্যে হতেই সেই চাঁদ নীলচে হয়ে গেল এবং দিগ্‌দিগন্ত জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল।

জনেন এসে সংবাদ দিয়ে আবার ফিরে চলে গেল, রঘু ও ছোটকোন আসছে।

একটু পরেই ওদের দুজনকে দেখা গেল। ওদের সামনে এগিয়ে আসছে চারজন বেপারী। আমাদের অতিক্রম করে যেতেই কালাচাঁদ ও আমিও ওদের অনুসরণ করলাম।

কিন্তু এত লোকের মধ্যে আমাদের শিকার কে?

এক সময় ছোটকোন পেছনে এসে কিস কিস করে আমায় বলে গেল, যে লোকটার মাথায় বাবরি চুল, চুল বেড়িয়ে লাল ফিতে বাঁধা, হাতে গরু চড়াবার পাচন, লাঠিয়ালের মতন জোয়ান চেহারা, ঐ লোকটার কোমরে অনেক টাকা আছে, দাদা।

বললাম, ঠিক আছে।

ক্রেতার আল ধরে আরও অনেক দূর হাঁটতে হাঁটতে আমাদের সহযাত্রীদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমতে লাগল এবং তিন জনে এসে দাঁড়াল। আমরাও এগোতে লাগলাম, কিন্তু তিন জন আর কমছে না। লাঠিয়ালের পেছনে যে

লোকটি চলেছে, সে বেশ বৃদ্ধ, দীর্ঘ শুষ্ক, ময়লা ধুতি— ঝুল নুড়ি আর কাঁধে তদোধিক ময়লা গামছা। সঙ্গে একটি অপ্রিচর্যনার বাহুর। তৃতীয় লোকটার হাতে একটা গরু বাঁধার দড়ি। বয়স বুঝি একুশের বেশী হবে না।

আমরা আরও কিছুক্ষণ ওদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম।

কিন্তু না, ওরা তিনজনেই আজ পেছু একই খাল ধরে চলেছে। একই গ্রামের লোক নয় এবং পরস্পর পরিচিত নয়, তা বোঝা যাচ্ছে, কারণ তাহলে আলাপ-সালাপ চলত। কিন্তু আমরাই বা আর কতক্ষণ অনুসরণ করব? একটিকে ধরবার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম ছয় জন, এখন দেখছি তিন জনের মোকড়া নিতে হবে। তাতে অবশ্য বিচলিত নই, কারণ আমাদের সঙ্গে আছে ছয় খানা তীক্ষ্ণধার ছোরা আর পুলিসের একটি রিভলভার কিন্তু রক্তহীন রাতারাতি কাজটা সারাতে উদ্যোগ, খুব খারাপি নয়। জ্যোৎস্নায় চতুর্দিকে প্রান্তর, চতুর্দিকে ক্ষেত, ক্ষেতে লাঙল চালানো হয়েছে মই হয়, ফসল বোনা হয়নি, মাটির ঢেলাগুলিকে ছোট ছোট ঢেউয়ের মতন মনে হচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বারতারা গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি।

না, আর দেরী নয়।

খানিকটা পেছনে পড়ে আমরা প্ল্যান ঠিক করে ফেললাম। আগে আগে চলেছে লাঠিয়াল, সেই বাবরী চুলওয়ালা আমাদের শিকার, কালাচাঁদ আর আমি তার পেছনে চললাম, বুদ্ধের পশ্চাতে এসে গেল রবু আর অনাথ আর ছোট ছেলেটার পেছনে চলতে লাগল খগেন ও ছোটকোন।

এমনিভাবে কিছুক্ষণ চলার পর অকস্মাৎ—

অকস্মাৎ আমি লাঠিয়ালের সামনে গিয়ে মাকের ওপর ছোরা তুলে বলে উঠলাম, এই শালা, কি আছে টাকাকড়ি, বাইর কর্।

পশ্চাতের ওরাও ওদের শিকারের ওপর লাফিয়ে পড়ল, টাকা বাইর কর্ শালা –

প্রথমটা চমকচকিয়ে গেল লাঠিয়াল, বাবরীতে ঝাঁকুনি মেরে রুখে দাঁড়াচ্ছিল, আমি বাঁ হাতের ঘুঠোয় ওর বাবরী চেপে ধরলাম, শালা বাইর কর কোমর থিকা, নইলে ব্যাখছম? বলেই ছোরাশুদ্ধ অগ্রভাগ ওর থুঁতনির নীচে আস্তে চেপে ধরলাম।

'আমার কাছে তো কোন টাকা নাই' বলেই লোকটা আমার হাত ছাড়িয়ে পেছনে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল, কালাচাঁদ লাফিয়ে পড়ে ওর কোমর কাপড়ে ধরল আর আমি এগিয়ে এসে বাঁহাতি ছুরিকাঘাতের অভিনয় করে ছোরার অগ্রভাগ এবার পিঠের ওপর চেপে ধরলাম, বলে উঠলাম, বহুৎ, ছুরি মাইরা শালার প্যাটের নুলিটা বাইর কইরা ফালা।

লাঠিয়াল থর থর কাঁপতে লাগল।

এরমধ্যে মানে কালাচাঁদ এখন আর ওরা বলেনা, রবু, ছোটকোন নয়, সবাই মানের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ভদ্রের ছোকরা, টাকা খেলার নিষ্ফল প্রচেষ্টায় চাষীদের ভাষায় কথা বলে।

লাঠিয়ালের পিঠে ছোরাটা একটু চেপে ধরলাম, বাইর কর্, নইলে ফিনিশ্ করুম।

লোকটা তবু দেরী করতে লাগল দেখে আরও একটু চেপে ধরে ঘাঁকে ঘাঁকে খোঁয়াতে লাগলাম পাখীর পালক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি দেবার মতন করে।

এবার ফল হল লাঠিয়ালের। 'দিতে আছি, দিতে আছি' বলে কোমর থেকে সরু পলিটা বার করতেই কালাচাঁদ ছিনিয়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল। লোকটা চো চো দৌড় মারল ভাড়া-খাওয়া পাখির পেয়ালের মতন।

এবার ছুটে গেলাম বুড়ো বেপারীর কাছে।

দেখলাম সেও তালবাহানা সুরু করে দিয়েছে। রবু ওর মাকের ওপর ছোরা ঘোরাচ্ছে, অনাথ বার বার ধমক দিচ্ছে, তবু বুড়ো বারবার হাত জোড় করে প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে দেরী করছে। দেরী করবার সময় কোথায় আমাদের? লাঠিয়ালকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, ছোট ছেলেটাও যা ছিল সব খগেন ও ছোটকোনের হাতে তুলে দিয়ে ছুটে পালিয়েছে, কাছে কোনো পাড়া আছে কি না, কে জানে, সেখানে উঠে সব বললেই লোকজন ছুটে আসতে পারে লাঠিসোটা ও লণ্ঠন নিয়ে। মনে হচ্ছে, বুক বেপ চালাক ও কৌশলী, ইচ্ছে

করেই কাঁদুনি গাইছে আর আমাদের দেরী করাচ্ছে। সুতরাং—

সুতরাং এবার এগিয়ে গেলাম আমি। ছোরা ওর কাঁধের ওপর চেপে ধরলাম, হুকুম করলাম রঘুকে, চমিবন্দি আর চক্ষু দুইটা ছোরা দিয়া তুইলা ফালা তো!

অনাথ তৎক্ষণাৎ ওকে জাপটে ধরল আর রঘু কাঁচুনি দিয়ে ছোরাটা ওর গালে চেপে ধরল।

এবার কেঁদে ফেলল ও হাউমাউ করে, দিতেছি ভাই, দিতেছি। বলে সে সব থলিটা রঘুর হাতে তুলে দিয়ে 'ইয়া আল্লা' বলে মাটিতে বসে পড়ল।

ব্যস, আমাদের কাজ শেষ।

কোথা থেকে কে এসে পড়বে, কে জানে!

আর মুহূর্ত কাল দেরী করা ঠিক নয়।

আমরা ডান মার্চ করে সোজা উত্তর দিকে চলতে চলাম। আর ক্ষেতের আল ধরে ধরে নয়, সোজা চষা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে।

দিকভ্রম হয়নি, তাই লাকড় ঠিক দিয়ে আমাদের গ্রামে প্রবেশ করলাম।

ছোটকোনের বাড়ীর দক্ষিণে পুকুরের বাঁধানো ঘাটলায় এসে বসলাম। কাপড়ের থলিগুলো নিয়ে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল ছোটকোনের সঙ্গে।

রঘু বলল, দাদা, আমার তো আশঙ্কাই হচ্ছিল যে, বিনা রক্তপাতে আমরা একসঙ্গে তিন-তিন জনকে কাবু করতে পারব কি না।

বললাম, একেবারে রক্তহীন বলতে পারা যায় না। লাঠিয়ালের পিঠে আমার ছোরাটা সম্ভবতঃ আধ ইঞ্চি ঢোকাতে হয়েছে, তারপর একটুখানি ঘুরিয়েও দিয়েছি, জিনিসটা ধারাল হয়েছে।

একটু পর কালাচাঁদ এসে বলল, মোট এক হাজার তিনশো কুড়ি টাকা পাওয়া গেছে।

বললাম আমাদের টাকার অভাব এখনকার মতন মিটল।

সে যুগে সংখ্যাতীত দুর্ধর্ষ রাজনৈতিক ডাকাতি ও রাহাজানির তুলনায় আমাদের এই অভিযান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র, উল্লেখের যোগ্য নয়, প্রখর ডাঙরের পাশে নগণ্য মাটির প্রদীপের মতন। শুধু উল্লেখ করলাম এজন্য যে, কাজটি অতি সহজে, প্রায় নীরবে, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সমাধান হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ঝুঁকি কম ছিল না। যদি ওর দলপ্রয়োগ করে বাধা দিত, অবশ্যই তাহলে ছোরা চলত এবং কে জানে, তাতেও না হলে হয়ত আমি রিভলভারটাই বার করতাম, হয়ত তিন-তিনটে লোক খুন হয়ে যেত। কে জানে, আমাদের ধস্তাধস্তি আরও লোকের চোখে পড়ে যেতে পারত, তারা ছুটে আসত, আমাদের বাধা দিত, ধরে ফেলবার চেষ্টা করত, যুদ্ধ হয়ে যেত আমাদের সঙ্গে একটি রক্তক্ষয়ী লড়াই, সেই লড়াই-এর ফলাফল কি দাঁড়াত, কে বলতে পারে!

এসব কিছুই হল না বটে, কিন্তু এসবের ঝুঁকি নিয়েই আমরা সেদিন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছিলাম।

এবং আমার বয়স তখন চব্বিশ বছর হলেও আমার ছোট ভাইয়ের বয়স ছিল সতেরো, অন্য সহকর্মীদের বয়স হয়তো আরও দু-তিন বছর কম এবং বিপ্লবজগতে ছিল সবার ছোট, মাত্র চোদ্দ বছরের কচি কিশোর!

সে যুগে বিপ্লবী দলে এমনি কচি কিশোরের সংখ্যা ছিল অগুনতি।

(তেত্রিশ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১ অক্টোবর সকাল সেনট্রাল জেলে যোগদান করতে হবে, মানে ঐদিন ফোরনুন-এ অর্থাৎ বেলা বারোটার মধ্যে আমার চার্জ নিতে হবে। তখন জলপাইগুড়ি থেকে ট্রেনে সকালে আসতে হত লবণিগলি মহিষারী ঘাট হয়ে ঈমারে নদী পার হয়ে। ঐদিন ঐ সময় চার্জ নিতে হলে আমাকে আগের দিন সকাল পৌছান দরকার, মানে ৩০ সেপ্টেম্বর। তাহলে আমার জলপাইগুড়ির জেলের চার্জ ২৯ সেপ্টেম্বর দিয়ে ঐ দিনই আমার রওনা হতে হবে। যাদের উনত্রিশ দিন এক জেলে কাজ করে মাত্র একটি দিন অন্য জেলে অন্যের সেই মাইনেতে কাজ করলে হিসাবপত্রের যে জটিলতা দেখা দেবে, সরকারী কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী সে জট খুলতে সময় লেগে যাবে অন্তত তিনটি মাস।

সুতরাং পুরো সেপ্টেম্বর মাসটা জলপাইগুড়িতে অফিস করে যেতে পারলেই ভাল হয়। ১ অক্টোবর বদলি হয়ে ২ অক্টোবর সন্ধ্যার পর সকাল পৌছব এবং ৩ তারিখ চার্জ নেব। ডি সি বোসকে গিয়ে সব বললাম। উনি ভাল বুদ্ধি দিলেন। বললেন, আপনার ট্রেন বিকেলে আপনি ৩ সেপ্টেম্বর বারোটা পাঁচ মিনিটে চার্জ দিয়ে বিকেলে চলে যান, তাহলেই এখানে পুরো মাস চাকরি হয়ে গেল, মাইনের হিসেবে আর গোলমাল হবে না। আপনি ১ অক্টোবর সকাল পৌছে পরদিন ফোরনুন-এই চার্জ নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনার আই জি যা বলেছেন, তা থেকে একদিন দেরী হচ্ছে। নতুন অফিসে প্রথম মাসের মাইনে পেতে সাধারণতঃ দেরী হয়, নতুন জায়গায় আপনার ইনিশিয়েল খরচ-খরচাও কিছু হবে। সুতরাং আপনি এখানকার সুপারিনটেনডেন্ট থাকাকালেই, মানে ৩০ সেপ্টেম্বর এক মাসের মাইনে এ্যাডভান্স নিয়ে যান, ওটা এ্যাডজাষ্ট হবে পর পর তিন মাসের মাইনে থেকে।

খুব ভাল পরামর্শ। তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম। ডি সি তখনই অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর চীফ মেডিক্যাল অফিসারকে লিখলেন,...You will please request Dr. D. K. Sen, District Medical Officer, Jalpaiguri, to take charge from Sri D. L. Ganguly in the afternoon of the 30th September, 1961.....

আই জি-কে আমি ভলান্টারী জানিয়ে দিলাম, ২ অক্টোবর ফোরনুন এ আমি সকল জেলের চার্জ নেব, তাহার আগে সম্ভব হইতেছে না। ডাঃ রমাপতি সোরেনী একদিন, ১ অক্টোবরের জন্য যেন অপর কাউকে চার্জ দিয়ে যান।

জেলের চার্জ নেবার নিয়মটা অদ্ভুত। সুপারের নীচেই জেলার, জেলার সেকেণ্ডেড অফিসার। জেল কোড আইনের প্রায় প্রতিটি ধারাতেই জেলারের প্রশাসনিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, জেলারই জেলের চীফ

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

একজিকিউটিভ অফিসার আর সুপারকে বলা যেতে পারে প্রেসিডেন্ট। কিন্তু কখনও কোন কারণেই সুপার জেলের চার্জ জেলারকে দিতে পারেন না, চার্জ নেবার জন্য তাকতে হয় চীফ মেডিক্যাল অফিসারকে কিংবা তাঁর প্রতিনিধি ডাক্তারকে অথবা তাকতে হয় ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে কিংবা তাঁর প্রতিনিধি কোনো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে, জেল প্রশাসনের অ আ ক খ-ও জানেন না যাঁরা। আলিপুর, সদর ও প্রেসিডেন্সী জেলে ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট আছেন, তাঁরা চার্জ নিতে পারেন, কিন্তু যে জেলে নেই ?

অথচ জেলার কখনও না থাকলে অনায়াসে চার্জ দিয়ে

যেতে পারেন তাঁর অংশুমন কোনো ডেপুটি জেলারকে, হোন না তিনি নন-গেজেটেড!

৩০শে সেপ্টেম্বর বেলা সেভেনটায় ডাক্তার ডি কে সেন এসে গেলেন।

চার্জ বুঝিয়ে দিলাম।

গেটের বাইরে আসতেই দেখি, ব্যারাকের জমাদার সিপাইরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। জলপাইগুড়ি জেল বহরমপুর সেন্ট্রাল জেলের এলাকাভুক্ত, বদলি হয়ে এরা সেখানে যেতে পারে, সকলে পারে না। তাই আমার সঙ্গে আর দেখা হবার সম্ভাবনা নাই ভেবে আমায় বিদায় অভিনন্দন জানাতে সমবেত হয়েছে।

ওদের প্রায় সবার সঙ্গেই দু-চারটে কথা বললাম। সাধারণ ভাবে সবাইকে বললাম, যে চাকরিই কর না কেন, চাকরির সততা বলে একটা কথা আছে, সেটা পালন করে চলতে হয়। পালন করায় যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি যারা ভগবানে বিশ্বাস কর, তারা জানবে, ভগবান তাদের সহায় হন। তোমাদের মধ্যে অপরাধের জন্য যাদের আমি শাস্তি দিয়েছি, জানবে, মানুষ হিসাবে তাদের ওপর আমার কোন রাগ নেই। বাবা ছেলের অন্যায় দেখে শাস্তি দেন, তাই বলে ছেলেকে কি জন্মের মতন ত্যাগ করেন? শাস্তির উদ্দেশ্য সংশোধন, শাস্তির জন্যই শাস্তি দিইনি। তাই আশা করি তোমরা আমার ভুল বুঝবে না।

ওরা তালুট করল।

বাড়ীতে ফিরে দেখি, যাকে বলে জনস্রোত।

একদল পুরুষ ও মহিলা আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন, তাঁরা নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেবার পরক্ষণেই এলেন আর এক দল। তারপর আবার আর এক দল। যে সব বিভিন্ন ধরনের সভায় বক্তৃতা করেছিলাম, যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলাম, সেই সব সভা ও অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এলেন। 'ডানপিটেদের আসর'-এর অনেকগুলো ডানপিটে এসে পুষ্পে বৃষ্টি তুলে শ্লোগান তুলিয়ে গেল, 'ডানপিটেদের বন্ধুপথ সুগম হোক।' 'বন্ধুদের আসর'-এর অনেক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু এসে আমায় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলেন। ঘিওঘড়িকাল সোসাইটির অনেক সদস্য এবং হরিসভার কর্মকর্তারা এসে যুগপৎ অভিনন্দন ও বেদনা জানিয়ে গেলেন। অনেকগুলি নাট্যসংস্থা, যাদের কর্মীদের সঙ্গে আমার সামান্য মুখ চেনা ছিল কিংবা আদৌ যাদের দেখেছি বলে মনেও করতে পারছি না, তাঁরাও এলেন। এলেন প্রতিবেশী মাষ্টার মশায় বিজয়কান্ত চক্রবর্তী, পবিত্র বসু, রামচন্দ্র পাল, সুধীর দাস, অমিয় চন্দ এবং আরও অনেকে। আমার বাড়িওয়ালা শেষের সাম্যালও সপরিবারে এলেন।

সবার মুখে প্রায় একই কথা। আপনার চাকরিতে এত শীঘ্র পদোন্নতিতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, বুঝতেই পেরেছিলাম আপনার উন্নতি অবধারিত, কিন্তু এখন মনে করে আমাদের দুঃখ হচ্ছে যে সরকারী এসেন্সিয়েল বিভাগে কর্মরত থেকেও আপনি আমাদের শহরের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নানা ভূমিকায় যেভাবে সক্রিয় সাহায্য করেছেন, আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা সেই সাহায্য আর পাবনা, ফলে আমাদের আনন্দ ব্যাহত হবে।

বলতে চেষ্টা করলাম, না, না, সে কি কথা! আমার জায়গায় যিনি আসবেন—যদিও কে আসবেন, তা এখনও ঠিক হয়নি, তবু এমনও হতে পারে যে, তিনি আমারই মতন অথবা আমার চাইতে বেশী অন্তরঙ্গভাবে আপনাদের সঙ্গে মিশবেন।

কিন্তু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশায় তাঁরা কেউ উৎফুল্ল হতে পারলেন না, যা হাতে আছে, যা নিশ্চিতভাবে মুঠোর বাইরে চলে যাচ্ছে, তারই জন্য গভীর বেদনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

বিদায় নেবার সময় বার বার জানালেন একটি অনুরোধ, আমাদের মনে রাখবেন।

বদলির চাকরিতে এই এক ধরনের ট্র্যাজেডি, বিশেষ করে, চাকরির কাইলেই যারা নিজেদের শৃঙ্খলিত সীমাবদ্ধ করে রাখে না, তাদের পক্ষে। আমার দশ বৎসর মেয়াদী জেল সুপারের চাকরি জীবনে মাত্র তিন বার বদলি হয়েছি। দমদম থেকে জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি থেকে আবার দমদম, তারপর বদমদম থেকে বহরমপুর সেন্ট্রাল জেল, সেখান থেকেই

১৯৬৮ সালের পরলা জানুয়ারী রিটায়ার করেছি। সরকার জেলে থাকতে খুব অসুবিধা হয়নি, কারণ ওখানকার সুপারের কোয়ার্টার অশোকর রোড থেকে অনেকখানি ভেতরে, বিরাট এক সবজি বাগানের মধ্যে অবস্থিত, প্রতিবেশী বলতে কেউ নেই, তাই ওখানে খুব কম লোকের সঙ্গেই মেলবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু জলপাইগুড়ি ও বহরমপুরে থাকাকালে ওখানকার নানা পাবলিক ফাংশনে যোগদান করেছি, ওখানকার সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে অনেকখানি একাত্ম হয়ে গেছি। শুধু সাংস্কৃতিক জীবন কেন, অনেকেরই সঙ্গে রীতিমত ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, তাদের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখেরও অংশীদার হয়ে উঠেছি। তারপর অকস্মাৎ একদিন বালামী ধং-এর দল এসে ঘাড় ধরলির হুকুম আর ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে বাক্স বিছানা গুছিয়ে যাত্রা করতে হয় নতুন কোন স্থানের উদ্দেশ্যে। বেদনায় বুক ভরে ওঠে। মনে হয়, কি যেন পেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম বুক ভরে, মন ভরে, ফাইলে পরিবেষ্টিত চাকরি জীবনের বাইরে বেরিয়ে এসে পেয়েছিলাম অনেক জনের প্রীতি ও সখ্য, কত অচেনা লোকের সঙ্গে হল পরিচয়, গড়ে উঠল অন্তরঙ্গতা—কিন্তু হায়, সবই জীর্ণ বস্ত্রের মতন পরিত্যাগ করে চলে যেতে হয় গভর্ণর বাহাদুরের কলমের একটিমাত্র আঁচড়ে!

সকালবেলা আমরা গিয়েছিলাম বড়দির ওখানে। দেখি, কেউও সেখানে।

কেষ্ট বলল, সেই ১৯৪৭ সালে ছেটেলি ছাড়বার পর আর এ শহরে আসেননি। ভাগ্যিস, সরকারী চাকরিতে ঢুকেছিলেন, তাই দাদাবাবু, আবার দেখা হল।

আয়েষী, দেবুল আর লুডু ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, আমি বারান্দাতেই বসেছিলাম। বড়দি ঘরের মধ্য থেকে ডাকলেন, সুদর্শন! তারপর বেরিয়ে এলেন, বললেন, তাহলে সত্যিই চললে? পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই বললেন, কল্যাণ হোক। জীবনে আরও আরও উন্নতি কর।

দাদাবাবুর নামও ছিলেন গাঙ্গুলী। একই বাড়ীতে বড় জামাই ও ছোট জামাইয়ের একই নাম। আবার ছোট জামাই বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায় ও আমার জন্ম একই সালে একই দিনে, শুধু বিমলেন্দুর জন্ম আমার ঘণ্টা আগে। তারপর আমার শ্যালকেরা যেমন সাত ভাই, আমরাও তাই। আমার শ্বশুর মশায় যেমন শাশুড়ীর আগে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, আমার বাবাও তাই। এমনি সব অদ্ভুত মিল নিয়ে জোর হাসাহাসি চলত। বড়দি পড়েছেন ভারী মুস্কিলে, আমায় নাম ধরে ডাকতে পারেন না, আমার নতুন নাম রেখেছেন, সুদর্শন।

দাদাবাবু বেরিয়ে এলেন, উন্নতি করবেই তো। এ তো আর চাটার্জী নয়, গাঙ্গুলী, গাঙ্গুলীর উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারে না।

অন্য সময় হলে চাটার্জী বড়দি আর গাঙ্গুলী দাদাবাবুতে বিতর্ক সুরু হয়ে যেত, চাটার্জী বড় না গাঙ্গুলী বড় কিন্তু আজ সবারই মন ভার। বড়দি চুপ করে শুনলেন।

খুদুমণি আর দহরমে এসে প্রণাম করল। আমরা বড়দি দাদাবাবুকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে এলাম।

বেলা বারোটায় সপরিবারে এসেছিলেন রবীন গুহ।

হেসে বললাম, বাড়ী তৈরীর কন্ট্রাক্টরী আর শেষ হল না, রবীনবাবু।

আয়েষী বলল, গভর্ণমেণ্টের সৌলতে আপনারা দুজনেই হেরে গেলেন।

লুডু বলল, ইস, ট্রান্সফারটা যদি পুজোর পর হত, তাহলে হয় আমাদের এখানে, নয়তো নতুন কোয়ার্টারে বেশ মজা করে ভোজ খাওয়া যেত, তাই না মামা?

আর বাড়ী, রবীনবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন, আর যাবই না ওদিকে। একটু পর বললেন, সাড়ে পাঁচটায় আপনার ট্রেন, আমি ঠিক সময় জীপ নিয়ে আসব।

বাধা দিয়ে বললাম, আপনি আপনার জীপ আনবেন কেন? আমরা তো রিকসাতেই যেতে পারব। তারপর আজ বিকেলে আপনার টুর নেই?

মিসেস গুহ বললেন, আপনার বদলির খবর আসবার পর থেকে ওঁর টুর বন্ধ।

টুর-পাগলা এস ডি ও রবীন গুহ টুরের কথা বুঝি ভুলেই গেছেন।

রবীনবাবু বললেন, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।

বলবার আগেই তিনি সন্ধানে এসেছিলেন আরতি গুহ আর সুনীল পাল।

আরতি গুহ কলরব করে উঠলেন, আপনি তো মশাই, সাংঘাতিক লোক দেখছি। পুজোর পর বাবুপাড়া পাঠাগারের সাত দিনের নাট্যোৎসবের অন্ততঃ তিন ছয়েক নটরূপে টেনে ছিলেন গাঙ্গুলীকে নামিয়ে জলপাইগুড়ির লোকদের তাক লাগিয়ে দেবার আয়োজন করছি আমরা, আর অমনি গোপনে লেখালেখি করে তার আগেই সরে পড়বার ব্যবস্থা করে ফেললেন?

হেসে বললাম, কি করা যাবে বলুন, গভর্ণর সাহেব স্বিজন হয়ে যে হুকুমনামায় সই করেছেন—

সারা জলপাইগুড়ি শহরকে তিনটিছি করে? সুনীলবাবু বলে উঠলেন।

বললাম, তাক গে, সে হুকুমনামার আর হাত নেই বলে না। বদলির হুকুম আটকে রাখা যাবে না। দফতরের সুপার পলকা অফিসটির রিটায়ার করেছেন, তাই সেখানে নিশ্চয়ই কাউকে পাঠাতে হবে, চেয়ার খালি থাকতে পারে না—দেখছেন না, আমার জায়গায় কাকে এখানে দেয়া হবে, তাড়াতাড়িতে সেটাও গভর্ণমেণ্ট স্থির করতে পারেননি বলে আমি ডি এম ও-কেই চার্জ দিয়ে যাব। সে থাকবে। অনুরোধ জানাই, কলকাতায় কখনো গেলে দফতরের গরীবখানায় যেতে যেন ভুলবেন না।

আরতি দেবী জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার কি হবে?

ওরা এখন আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে, আস্তেই জবাব দিল, কিছুদিন পর আবার ফিরে আসবে এবং পি ডবলিউ ডি-র এস ডি ও রবীন গুহের বাড়ীতে থেকে এখানকার পরীক্ষা শেষ করে চলে যাবে।

লতু আরতি গুহের স্কুলেরই ছাত্রী। তিনি ওকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করলেন, বললেন, চোরাটি যেমন ছুটুছুটে, রেজাল্টও তেমনি ফার্স্ট ক্লাস করা চাই কিন্তু, বুঝলে। মানে, হায়ার সেকেণ্ডারী ফার্স্ট ডিভিসনে যাওয়া চাই, পারবে না?

লতু তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, পারব।

লক্ষ্মী মেয়ে। আরতি গুহ আবার ওকে কোলে টেনে ধরলেন।

সুনীলবাবু বললেন, আমাদের পাঠাগারের বার্ষিক সম্মেলন হয় সাধারণতঃ এপ্রিলে। আগামী এপ্রিলে পারব কি না জানি না, কিন্তু সিকসটি-থ্রি'র বার্ষিক সম্মেলনে আমরা আনবই আপনাকে প্রধান অতিথি করে। আসবেন তো?

হেসে বললাম, সিকসটি থ্রি, অনেক দূরে সুনীলবাবু, ততদিনে গঙ্গা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে। যদি মনে রাখেন, মনে করেন, ডাকেন, অবশ্যই আসব। তবে মনে থাকবে কিনা—

আপনাকে ভুলব না আমরা, আরতি গুহ বাধা দিলেন।

আমাদেরও মনে রাখবেন, বললেন সুনীলবাবু।

জোর দিয়ে বললাম, নিশ্চয়ই মনে রাখব। যদি আমার প্রাক্তনী জীবন নিয়ে লেখা 'তখন আমি জেলে' বইয়ের মতন আমার চাকরি জীবনের কাহিনী লিখি, কথা দিয়ে যাচ্ছি, সেই কাহিনীতে অবশ্যই থাকবে বাবুপাড়া পাঠাগার, থাকবেন সুনীল পাল, থাকবেন আরতি গুহ এবং হয়তো এখানকার আরও অনেকে।

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১ সাল।

রবীনবাবুর জীপে আমরা এসে জলপাইগুড়ি টেশনে নামলাম বিকেল পাঁচটায়।

টেশনে ঢুকেই দেখি চতুর্দিকে পরিচিত মুখ। সাধারণতঃ এই ট্রেনটায় ভিড় হয় বটে, কারণ কলকাতার দিকে যাবার পক্ষে এই ট্রেনটাই প্রশস্ত, কিন্তু দেখলাম, আজকের ভিড় ঠিক সে ভিড় নয়, আজ প্রধানতঃ আমাকে সী-অফ করবার জন্যই জন সমাবেশ।

জেলের স্টাফ সবাই এসেছেন। কর্মী ঘোষাল, অনন্ত গাঙ্গুলী, নীরেন লাহিড়ী, অজিত ভট্টাচার্যরা। ডাক্তার নৃপতি চক্রবর্তী এসেছেন। জমাদার আর সিপাই মিলিয়ে অন্ততঃ জন পঁচিশেক। সবার ওপরে ছয় ফুটেরও অধিক দীর্ঘ জেলার কর্মী ঘোষালের মাথা উঁচু হয়ে আছে। খাকি ইউনিফরম, হাইল্যাণ্ডার ক্যাপ, যে পোষাকে আমায় একদিন এই টেশনেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন মাত্র সতেরো মাস

আগে। সিগার ঠোঁটের. চৈতের মতন, কিন্তু ওভারকোটটার নিচের দুপে আজ খদখদে গাম্ভীর্য।

ডাক্তার সুদেব ব্যানার্জীও পুলিশ হাসপাতাল থেকে এসে গেছেন, জলপাইগুড়ি জেলে হাকে হাকে যন কমাকমি ও বগড়াঝাটি বাধাবার প্রধান ব্যক্তি, যাকে অনেক ধমক দিয়েছি পুলিশ হাসপাতালে। আগে দেখতে পাইনি। কোথা থেকে ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে একেবারে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন, বিনীত কণ্ঠে বললেন, আপনি আমার কাকার বয়সী, শ্রদ্ধাভাজন, আপনার উপদেশ আমি মনে রেখেছি, মনে রাখব।

আমি ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

সবাই ঘিরে ধরল। আমি যেন সেই জনারণ্যে হারিয়ে গেলাম।

টুকরো টুকরো নানা প্রশ্ন, নানা কথা। কিন্তু সব কথার সেরা কথা, আপনাকে ভুলে এ আমরা আদৌ করি আপনিও আমাদের মনে রাখবেন। তুলার হিসেবে নীচের পেটেই আর এখানে আমাদের সন্ধ্যেবেলা নাই বা থাকল, বেড়াতে আসবেন।

মনে পড়ল, আমাদের স্বনির্বাচিত অভিভাবক ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিসন্স সাহেব একদা আমার উপদেশ বাণী লিখে লিখেছিলেন, মফঃস্বল জেলে কাজ করতে হলে শুধু অফিসে আটকে না থেকে সেখানকার জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে হয়, সেই জনপ্রিয়তার ওপরই পাবলিক সার্ভিসের সাফল্য নির্ভর করে। আজ এই মুহূর্তে এই প্ল্যাটফরমে উপস্থিত থাকলে সাহেব বাহাদুর আমার জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করতে পারতেন। আমি জিগেছিলাম ওদের মনে, কিন্তু ওরা যে আমায় এতখানি ভালবেসে ফেলেছেন, এতখানি আপন জনের মতন প্রিয় মনে করেন, আজ বিদায়ক্ষণে তার গভীরতা উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

হঠাৎ দূরে দেখি একটি মেয়ে আত্রেয়ীদের সঙ্গে কথা বলছে।

না, চিনতে ভুল হল না, সোনালী, সোনালী ঘোষ।

কবে শেষ বার দেখেছিলাম ওকে? গত বছর বাবুপাড়া পাঠাগারের 'সাহিত্যিক' নাট্যাভিনয়ের সময় আধা নাটা-সমাজ হল-এ, বুবুল পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল তার বন্ধু বলে। তারপর বুবুল চলে গেছে কলকাতায় ক্রীশ্চান চার্চ কলেজে বি এস সি পড়তে। —না না, তারপর আর একবার দেখেছিলাম ওকে। নন্দিনী রেস্টুরেন্ট এক ছোকরা বয়-ফ্রেণ্ডের সঙ্গে। চুরি করে দেখেছিলাম, দুজনের খুনসুটিও শুনেছিলাম কান খাড়া করে। ভাল লাগেনি শুধু নয়, বিরক্তিতে মন বিষিয়ে উঠেছিল। বুবুলকে বারণ করে দিয়েছিলাম ওর সঙ্গে মিশতে। বড়লোকের পোলার যাওয়া আদুরে মেয়ে বলেই ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল।

কিন্তু আজ এ কি পোষাক সোনালীর? কোথায় সেই অনেক বড় ও অনেক নীচু-গলা গেঞ্জি, বুক ও পিঠের সঙ্গে ইঞ্চিখানেক চওড়া ফিতে দিয়ে সংযুক্ত, পেটের অনেক ওপরেই যার প্রান্তসীমা? কোথায় সেই এমব্রয়েল করা ঘুস, সেই হিলহিলে সাপের মতন বব চুলের উল্লম্ফন, সেই শরীর দুলিয়ে খিলখিলে হাসি, আর পাশের মানুষের গায়ে ঢলে ঢলে পড়া? উদ্ধত যৌবনের অশ্লীল সেই প্রদর্শনী আজ আর দেখছি না তো? আজ ন্যাপ্পু করা সমস্ত চুল টান টান করে টেনে সাদা রিবন দিয়ে এঁটে বেঁধে হর্স টেলের মতন ছেড়ে দিয়েছে টকটকে লাল পাড় সাদা শাড়ী, গলা-আঁটা কনুই-ঢাকা লাল ব্লাউজ। হাতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। লুডু ও আত্রেয়ীর সঙ্গে কি কথা বলছে আর মাঝে মাঝে চোখ তুলে আমার দিকে চাইছে।

দেখলাম, ফুলের গোছা আত্রেয়ীর হাতে দিয়ে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তারপর হাতের সাদা রঙের ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট বাক্স বার করে লুডুর হাতে ধরিয়ে দিল। বোধ হয় পেন ও ডট পেনের বাক্স। বিদায় উপহার।

লুডু ওর হাত ধরে ভিড়ের মধ্য দিয়ে আমার কাছে নিয়ে এল। বলল, বাবা চিনির বন্ধু সোনালীদি। আগেও দেখেছ তুমি। আমায় পেন ডট-পেন দিয়েছেন।

সোনালী হেঁট হয়ে প্রণাম করল। বললাম, খুব চুপ মেয়ে। সেই কবে তোমায় দেখেছিলাম, তারপর আর তোমায় দেখিনি। বুবুল কলকাতা চলে গেল, তুমিও আত্রেয়ীর মতন মিলিয়ে গেলে—

এখানে ছিলাম না, জেঠামশাই, সোনালী বলল, কাকার সঙ্গে কাশ্মীর, দিল্লী, বোম্বে বেড়াতে গিয়েছিলাম—

বা, তুমি তো অনেক ভাল ভাল জায়গায় ঘুরে এলে, আমি বললাম, শোন, এবার কলকাতা গেলেই নিশ্চয়ই সময়ে আমাদের বাড়ীতে আসবে, বুঝলে ? তোমার বন্ধু বুবুল এখন ইটিশের প্রফেসর আমার ভাইপো জ্যোতির্ময় চাটার্জীর বাড়ীতে আছে, আমরা গেলেই আমাদের কাছে চলে আসবে, দেখা হবে।

সোনালী বলল, আচ্ছা যাব

আরতি গুহ সুনীলবাবুরা সদলবলে এসে পড়লেন। এক গাদা ফুলের তোড়া হাতে দিয়ে বললেন, যাই বলি না, আপনাকে ছেড়ে দিতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে—

প্রত্যুত্তরে আবৃত্তি করে ফেললাম,

জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই

ভুবনের ঘাটে ঘাটে—

এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে—

অন্য সময় হলে ওঁরা হেসে উঠতেন, হয়তো পুরো 'শাজাহান' কবিতাটাই শুনতে চাইতেন। কিন্তু আজ আর কিছু বললেন না। শুধু বললেন, ঠিকই বলেছেন মিঃ গাঙ্গুলী।

ট্রেন আসার ঘণ্টা পড়ে গেল।

জেলার ও সহকর্মিরা টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে দিলেন। বড় ও ভারী জিনিস সব আগেই বিমানযোগে রওনা পাঠানো হয়ে গেছে।

সবাই আবার নমস্কার জানালেন।

ট্রেন এসে গেল। আমরা উঠে পড়লাম।

জেলার ও জেলের সবাই স্যালুট করলেন।

সমবেত জনতার অনুরোধ, মনে রাখবেন।

করজোড়ে বললাম, মনে রাখব। মনে রাখব।

ট্রেন চলতে সুরু করল।

ভিড়ের মধ্যে দেখলাম, রবীন গুহ নিষ্পলক চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

ভাষা বুঝি তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেছে।

হয়ে গেছে আমারও।

[ক্রমশঃ]

খোঁজ

—সুবোধ বসু

হরিদ্বারেই আস্তানা গেড়েছিলেন হরিহর। সঙ্গে গৃহিণী হরিমতী, ভৃত্য, পাচক, দারোয়ান। অর্থবল এবং লোকবল কোনটারই অভাব নেই। চষে বেড়াচ্ছেন তীর্থস্থান। নিত্যি হর-কী-প্যারীতে গিয়ে স্নানাহ্নিক করেন, সন্ধ্যায় 'ব্রাটকর্মে' বসে গঙ্গার লহরীতে মন ভাসিয়ে দেন। দিনমানে ভীম গোড়া, সপ্তসরোবর, অবস্থিত শ্রীরামমন্দির, কনখল এসব তো আছেই। সর্বত্রই আনন্দ পাচ্ছেন। চিত্তে প্রশান্তি বোধ করছেন। কিন্তু যার সন্ধানে আসা, এখনও তার সাক্ষাৎ মেলে নাই।

হরিহর একজন গুরু চান কিন্তু যে কোন গুরুতে তাঁর চলবে না। কলকাতা শহরে বসেই ভজন ভজন ডাকসাইটে গুরু সংগ্রহ করা চলত। তাঁদের কতজন সম্বন্ধেই তো কত অলৌকিক কাহিনী শুনেছেন। কিন্তু এরা বড় সংসার-ভিত্তিক; শহরেই আশ্রম, শহরের লোকদের নিয়ে কারবার। হরিহরের বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকেই এঁদের কারও না কারও কাছে মন্ত্র নিয়েছেন, এঁদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানা চমকপ্রদ কাহিনী হরিহরের কর্ণগোচর করেছেন, কিন্তু হরিহর আত্মসমর্পণ করেন নাই।

বন্ধুরা বলেন, 'তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞান চাও। কিন্তু জ্ঞানলাভের জন্যই শিক্ষক প্রয়োজন। গুরু সেই শিক্ষক…'।

হরিহর গুরু বিরোধী নন। তবে সব কিছুই যেমন চেয়ে এসেছেন, তাঁর গুরুও তেমন বিশেষ হওয়া চাই। যাঁর তপস্বী, আধ্যাত্মিক মহিমা যাঁর বদনমণ্ডলে পরিস্ফুট, বৈরাগ্য যাঁর প্রতি আচরণে প্রকাশমান, সেই রকম মহাপুরুষ যদি কারও দেখা মেলে, একমাত্র তবেই তিনি তাঁকে গুরুপদে বরণ করতে পারেন। এদিকে বয়স বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর মেয়াদ আর বেশি দিন নেই। হিসেব করা চলে না। এবারের তীর্থযাত্রা অনেকটা গুরু অনুসন্ধান যাত্রা ছিল হরিহরের।

হরিদ্বার থেকে আজ সকালে ঘোড়াগাড়ী ট্যাক্সি ভাড়া করে' রক্ষী দারোয়ানসহ কলকাতার ক্রোড়পতি হরিহর মুখুজ্জে সন্ত্রীক হৃষীকেশে এসে পৌঁছালেন। গাড়ীতেই শহরের এদিক ওদিক সামান্য ঘুরে সম্প্রতি লছমনঝুলার কাছে এসে নেমে দাঁড়িয়েছেন। কি অপূর্ব দৃশ্য! পায়ের তলায় স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীর খরস্রোত, নদী-জলমালাবৃত অরণ্যালাঞ্ছন যুক্ত প্রান্তর, সুদূরে শৈল তরঙ্গমালা। সপ্রশ্ন মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন হরিহর। তপস্যার জন্য কি মনোরম পরিবেশই বেছে নিয়েছিলেন আর্য-ঋষিরা! গণ্ডীর বন্ধন চাড়িয়ে মন এখানে সহজেই অনন্তে প্রসারিত হ'তে পারে।

কে উনি? চমকে উঠলেন হরিহর।

নদীসৈকত থেকে উপরে উঠে আসছেন এক দিব্যদর্শন পুরুষ। গৌরাঙ্গ, দীর্ঘকায়, কটিবস্ত্রসম্বল; তাম্রবর্ণ কেশ-জাল জটার মত জড়িয়ে আছে; উন্নতললাটে রৌদ্র প্রতিফলিত হয়ে যেন একটা জ্যোতিশ্চক্র সৃষ্টি করেছে মুখমণ্ডল ঘিরে।

হরিহর দ্রুত ছুটে গেলেন। প্রথম সুযোগেই সেই মূর্তির পায়ে মাথা লুটিয়ে দিলেন। মনকে ধাঁড়িয়ে পড়লেন মহাপুরুষ, যেন ধরা পড়েছেন, পালিয়ে যেতে পারেন কিনা একবার যেন তাই ভাবলেন অসহায় দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে। ইতিমধ্যে হরিহর উঠে দাঁড়িয়েছেন কৃতাঞ্জলি-পুটে। এইবার ঈষৎ স্মিত হাস্য করলেন মহাপুরুষ।

'বাবা', ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন হরিহর, 'অধমের প্রতি এ তোমার পরম অনুগ্রহ। তোমারই সন্ধানে আমি এত দূরে ছুটে এসেছি, কিন্তু সাধ্য ছিল কি তোমার দর্শন পাই, যদি স্বেচ্ছায় তুমি অনুগ্রহ না করতে।

হরিদ্বারে আমি একটি বাসা ভাড়া করেছি। যদি অনুগ্রহ করেন, বাবা, তবে দয়া করে সেখানে দু'দিনের জন্য পদধূলা দিয়ে যাও।'

হিন্দীতেই বলেছিলেন কথাগুলি হরিহর কিন্তু সে হিন্দী বোধগম্য হবে কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন না। কিন্তু মহাপুরুষ এবারও স্মিতহাস্য করলেন। তখন উৎসাহিত হয়ে গৃহিনীকে ইসারা করে কাছে ডাকলেন। দারোয়ান এলো, গাড়ী এলো। হরিমতী করপুটে বিনতি জানান, দারোয়ান গাড়ীর দরজা খুলে ধরল। স্মিতহাস্য করে দিব্যপুরুষ ভিতরে প্রবেশ করলেন।

কলকত্তা থেকে এক রইস এসে গঙ্গার ধারের এই প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে আছেন, হরিদ্বারের প্রতিবেশীরা এতটাই জানত। এইবার তাদের কৌতূহল অসম্ভব বেড়ে গেল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার তীর্থকামী এখানে আসেন পুণ্যস্নান দর্শন, পুণ্য অবগাহন ও সাধুসঙ্গলাভ এখানকার প্রধান আকর্ষণ। যৌনী মহারাজের আগমনে হরিহরের গৃহেও এই জনস্রোত আরম্ভ হলো। পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও গুজরাতি, মহারাষ্ট্রীয়, রাজস্থানী, যুক্তপ্রদেশবাসী, বাঙালী, অসমিয়া কত যে স্ত্রীপুরুষ যৌনী মহারাজের দর্শনলাভের জন্য এলো তার হিসেব নেই। যৌনী যোগী নীরব প্রসন্ন হাস্যে ভক্তদের অনুগৃহীত করেন, কখনও বা ডান হাত তুলে নীরব আশীর্বাদ জানান।

এই অভাবিত অনুগ্রহে হরিহর অভিভূত হয়ে পড়েছেন। কি করে, মহাপুরুষের যথেষ্ট আপ্যায়ন করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হরিমতী নিজ হাতে রান্না করছেন; হরিহর নিজে ভৃত্যের মত সেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। দারোয়ান, চাকর, পাচক এরা তো আছেই, ইতিমধ্যে স্বেচ্ছাসেবীরও একটা বড় দল জুটে গেছে। তাদের অধিকাংশই এখানে খাওয়া-দাওয়া, অষ্টপ্রহর থাকা শুরু করেছেন।

মাত্র সামান্য এ ক'দিনেই হরিমতী বাবার নানা ভাবব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের অনেকটারই অর্থোদ্ধার করতে শিখে ফেলেছেন। তার অনুরোধেই বাবা আরও ক'দিন থেকে যেতে রাজি হয়েছিলেন। এতে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন হরিহর। একদিন চুপিচুপি স্ত্রী হরিমতীকে বললেন, 'বাবাকে বলে কয়ে দু'হপ্তার জন্য কলকাতায় নিয়ে চলো; তোমার কথা ঠেলতে পারবেন না। এখন মহাপুরুষের সন্ধান পেলে সারা কলকাতাই তোমার বাড়ীতে ভেঙে পড়বে, আর আমরাও এঁর সেবা করার সুযোগ পেয়ে, জনসাধারণকে এর পুণ্যসান্নিধ্যের সুযোগ দিয়ে ধন্য হয়ে যাব····'।

'একগাদা বকর বকর না করলে কি ওখানকার লোক খুশি হবে? বাবার মৌন ভাঙাবে কি করে?'

'মৌনী ঋষি কখনও মৌন ভাঙে?' হরিহর বিস্মিত হয়ে বললেন। 'তা বলে মাহাত্ম্য বুঝতে কারুরই দেরি লাগে না সূর্যের আলোর মত তা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এর মধ্যেই তো তুমি তাঁর অনেক ইঙ্গিত ইসারার অর্থ বুঝে নিতে শিখেছ। বাবা বাণী চান, বাবার বাণী তুমিই তাদের ব্যাখ্যা করে শোনাতে পারবে। কিন্তু বাবা রাজি হলেই হয়। গত কাল থেকেই যেন কেমন পালাই-পালাই করছেন····'?

'দেখি, কত দূর কি হয়' সেবিকা হরিমতী হেঁয়ালি করে দেখতে রাজি হলেন।

কলকাতার মত শহর নেই, আর বাঙালির মতো জাত নেই। হৈ চৈ, উৎসব আর আন্দোলনে কলকাতা যেমন অন্য যে কোনও জায়গাকে টেক্কা দিতে পারে, কলকাতার বাসিন্দারাও তেমনি অন্যদের নাক কাটতে পারে উন্মাদনা ও আবেগে—তা সে ফুটবল ক্রিকেট ম্যাচের জন্যই হোক, আর হরিভক্তির জন্যই হোক। পরবর্তী উক্তিটি যাঁদের অত্যুক্তি মনে হবে, তাঁরা একবার আসুন মনোহরপুকুর রোডে হরিহর মুখুজ্জের প্রাসাদোপম বাড়ীর গেটের সামনে। একবার জনস্রোতটা দেখে যান। কাতারে কাতারে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেছে দুটো ফুটপাথ ঘেঁষে; অন্তত এক ফার্লং লম্বা লাইন। গেটের সামনে পান বিড়ি চায়ের স্টল বসে গেছে। স্কুলের একাধিক দোকান বসেছে গেট পেরিয়েই। অগণিত ভক্ত প্রবেশ করছে গেট দিয়ে, আর গাড়ী-বারান্দার দিকে এগিয়ে যাবার

প্রায়ই ফুলওয়ালাদের কাছ থেকে নানা ওজনের ও আয়তনের মালা বা তোড়া কিনে নিয়ে যাচ্ছে। আরও ফুল আসছে, আরও লোক কিনছে, মানুষের মিছিল আর উত্তেজনার অবধি নেই। কোনও নতুন চলচ্চিত্রের উদ্বোধন রজনীতেও এমন ভিড় হয় না।

হাওয়ায় রটে গিয়েছে কথাটা। সুবিখ্যাত হরিহর মুখুজ্জে তীর্থ করতে হৃষীকেশ গিয়েছিলেন। সে অঞ্চলে বেড়াতে বেড়াতে হিমালয়ের এক গিরিগহ্বরে এক যৌনী যোগীর সাক্ষাৎ পান। অনেক স্তবস্তুতি করে ক'দিনের কড়ারে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন। একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেন না মুখ দিয়ে। কিন্তু প্রসন্ন হাস্যে ভক্তের চিত্তে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেন আকার-ইঙ্গিতে তাদের ঐহিক ও পারমার্থিক সকল সমস্যার সুরাহা করে দেন।

ভক্তিমানদের স্ট্যাটিসটিক্স রাখার কাজ কোনও সরকারী সংস্থার উপর ন্যস্ত আছে কিনা জানিনা কিন্তু কলকাতার ভক্তিপরায়ণদের হিসাব নেবার এর চেয়ে বড় সুযোগ পাওয়া দুর্লভ। কে বলে কলকাতা ধন-ভয়ন-রাজোনির জায়গা, চোরাকারবারী আর ঘোড়দৌড়ের পীঠস্থান, পাপ আর পাপের ব্যবসার লীলাক্ষেত্র? এত ভক্তও যে বহরে আছে, তা ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ঐই ভক্তেরা গঙ্গার জোয়ারের মত শুধু আসছে, আর আসছে, আর আসছে।

'ভক্তির কত বড় আকর্ষণ, মৈত্রীর কত বড় বন্ধন!' হরিহর তাঁর বন্ধু রায় বাহাদুর অহিভূষণের দিকে সানন্দ দৃষ্টিপাত করে গদগদ স্বরে বলেন। 'নইলে এত অচেনা বন্ধু, বাঙালি, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী, মাড়োয়ারী, ভারতবর্ষের সারা অঞ্চলের অধিবাসী, স্ত্রীপুরুষ, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা, সমাজের সবচেয়ে ছোট আর সবচেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ, যারা অবশ্যের বাড়ীতে পদধূলো দেবার কথা কখনও ভাবতে পারত না, পরিচয়ের অভাব যারা ঘরে দাঁড়াত, দেখ, বাবার আগমনে তারা কত সহজে, অসঙ্কোচে, প্রীতি ও ভক্তির মনোভাব নিয়ে এসে যাচ্ছে হাজারে হাজারে। বাবার মাহাত্ম্য ছাড়া এ কি কখনও সম্ভব হতো? খাঁটি সোনা চিনে নিতে দেরি হয়না। যে আসছে, যে দর্শন লাভ করছে সেই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাবার পায়ে আত্মনিবেদন করবার জন্য অধীর হয়ে উঠছে.....'

অহিভূষণ একে রাসভারি লোক, তার উপর বন্ধুর আমন্ত্রণে তাঁর গুরুদর্শনে আমন্ত্রিত হয়ে আজই প্রথম এসেছেন, তিনি গলা দিয়ে সামান্য একটু গরগর্ আওয়াজ বের করলেন মাত্র। কিন্তু হরিহরের উক্তির সমর্থকের ভিড় সেখানে। গুরু-দর্শন ও গুরুভক্তি প্রদর্শনের পর উপরের হল থেকে হরিহর মুখুজ্জে মহাশয়ের বিশেষ পরিচিতেরা নিচের প্রকাণ্ড বৈঠকখানায় এসে বসেন ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা মৌনীবাবার মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা ও পরস্পরের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন আজও সেই আলোচনার [illegible] শহরের ধনী, বনেদী ও বিদগ্ধ সমাজের দু' পুরুষের নিজ বক্তব্য বিনা দ্বিধাতেই জানাতে পারেন এই ঘরোয়া পরিবেশে।

'এই কলকাতায় বসেই তো কত মহাপুরুষ দেখেছি', নবীনগরের রাজা বাহাদুর বলেন, 'কিন্তু এমন এক জোড়া চোখ আর কারও দেখি নি। যেন ত্রৈকালিকের কিছুই লক্ষ্য করছেন না সেই নাল [illegible] দুটি যেন অনন্ত নীলিমায় নিবদ্ধ.....'

'আশ্চর্য চোখ! এমন চোখ সত্যি দেখিনি!' সমর্থন এলো রাজা বাহাদুরের কথায় 'যেন প্রশান্ত সমুদ্র, তেমনি গভীর, তেমনি নীল!'

'মুহূর্তে দৃষ্টি আপনার দিকে চেয়ে আশীর্বাদ করছে, মুহূর্তে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে!' বস্তুত বাবার অসাধারণ চক্ষুযুগল সম্পর্কে প্রত্যহই বহু লোক বিমুগ্ধ মন্তব্য করেন। বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করবার উপায়ও নেই।

ক্রমে ক্রমে বহু অভিজ্ঞতার কথা অন্যান্য দিনের মত আজও প্রকাশ পেতে লাগল।

সকালের ট্রেনে সোমেশ বাবুর আগরতলা যাবার কথা ছিল। শেষ রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আবতাড়া ঘুমে চমকে নিজের শোবার ঘরের দক্ষিণের প্রকাণ্ড খোলা জানালাটার দিকে তাকালেন। দেখলেন—

প্রায় বিশ্বাস করা মুস্কিল—'বাবা'র সৌম্যমূর্তি। যেন ফ্রেমে-আঁটা ছবির মত স্থির। সহসা বাবা ডান হাত উঠিয়ে তিন চার বার নাড়ালেন, যেন নিষেধ করছেন। ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন সোরেশবাবু! ছুটে গেলেন জানালার কাছে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। অথচ সজ্ঞানে বাবাকে দেখেছেন তিনি। হাত নেড়ে নিষেধ করছেন—যা করতে যাচ্ছিস, করিস নে। সকালের প্লেনে যেতে নিষেধ করছেন না তো বাবা? সোরেশ যাত্রা স্থগিত রাখলেন। সকালেই বাবার শ্রীচরণে হাজির হলেন। বাবা নীরবে চোখ তুলে তাকিয়ে একটু হাসলেন ও তাঁর প্রধানত হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। ....তার পরের খবর সবাই জানে। রেডিয়োর দুপুরের খবরেই প্লেনটার দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

মিসেস চন্দর অভিজ্ঞতাও কম আশ্চর্য নয়। তাঁর প্রতিবেশিনী মিসেস চোপরা বাবার নিষ্ঠাবতী ভক্ত। তিনি রোজ সন্ধ্যায় বাবার কাছে যে কীর্তন হয়, তা শুনতে আসেন। পর পর ক'দিন নাকি তিনি এটা লক্ষ্য করেছেন—কীর্তন যখন খুব জমে ওঠে, বাবা নিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ার ভর করে. ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন, মুখের যোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, ঠিক সেই অবস্থায় এটা ঘটেছে। বাবা কই? বাবা নেই তো! তাঁর আসন শূন্য! উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন মিসেস চোপরা। কিন্তু ব্যস্! না, সবই তো ঠিক আছে। বাবা যেমন বসে থাকেন, তেমনি বসে আছেন। তবে কি চোখের ভুল হয়েছিল? মিসেস চোপরা, পরের সন্ধ্যায় এলেন। তারও পরের সন্ধ্যায়। কিন্তু ঠিক সেই অভিজ্ঞতা। অতি সঙ্গোপনে তিনি তখন এই কথাটা বন্ধু মিসেস চন্দকে জানালেন। ছুটে এলেন মিসেস চন্দ। কীর্তনের সময় বাবা কি মাঝে মাঝে বাইরে যান? না। কোনও দিনই যান নি। আর কিছু ভাঙলেন না মিসেস চন্দ। বন্ধুর সঙ্গে সান্ধ্য কীর্তনে আসা আরম্ভ করলেন। পর পর দু'দিন কিছুই না দেখে যখন ঘটনাটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে করা শুরু করেছেন, তখন কীর্তনের মধ্যপথে বাবা হাতে একটা চিমটি পেয়ে চমকে উঠলেন মিসেস চন্দ। পাশে তাকাতেই মিসেস অরোরার দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি ও উত্তেজিত ভঙ্গি নজরে পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি বাবার আসনের দিকে তাকালেন। কই, বাবা তো নেই! কোথায় গেলেন? কিন্তু অল্পকাল মাত্র। আরতির ধূপের যোঁয়া হঠাৎ যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল। দেখলেন, বাবা নিমীলিত চোখে সমাহিত শান্তভাবে নিজ আসনেই উপবিষ্ট আছেন!

বাবা যে হাওয়া থেকে জিনিষ বানাতে পারেন, তা তো অনেকেই দেখেছে প্রায় প্রথম দিন থেকেই যাঁরা সংগ তাঁর কাছে থাকেন, যেন তাদের মনোরঞ্জনের জন্য একাধিকবার তিনি এই বিভূতি প্রদর্শন করেছেন সহাস্য মুখে। আঙুলগুলির উপর কয়েকবার ঘুরো আঙুল ঘুরিয়ে হাওয়া থেকেই তৈরি করে নিলেন কোনও না কোনও রকমের ফুল, বা একটা বাতি বা একগুচ্ছ আঙুর! হরিমতী বাবার প্রিয় সেবিকা; একদিন বাবা হাওয়াতে হাত ঘুরিয়ে তাঁর জন্য একটি দামি সোনার আংটি তৈরি করে দেন এসব কথা শহরের কারুরই আর শুনতে বাকি নেই। কিন্তু মিসেস দেশাই আজকের সভায় যে কথা শোনালেন, তা আরও চমকপ্রদ। বিখ্যাত ওষুধপাতি ব্যবসায়ী হরিবাবু দেশাইয়ের সহধর্মিনী রুক্মিণী দেবী বিশেষ ভক্তিমতী মহিলা। দেব দ্বিজে ভক্তি ও দরিদ্রসেবার জন্য তিনি কলকাতার সমাজে সুবিদিত। তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বাবাকে তাঁর বাড়ীতে পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। তাঁর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করা যায়না, হরিমতী বাবাকে নিয়ে তাঁর বাড়ীতে যান এক সন্ধ্যায়। সেখানে ইতিমধ্যে সারা শহর ভেঙে পড়েছে। মহাসমারোহে বাবাকে বাড়ীর উপর তলায় নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমেই রুক্মিণীদেবী পায়ে প্রণতা হয়ে বাবার সামনে একজোড়া কারুকার্যখচিত রূপোর খড়ম রাখলেন। চকিতে বুঝে নিলেন মহাপুরুষ। নিজের মৃগচর্মের চটি ত্যাগ করে খুশি মুখে খড়ম পরে নিলেন পায়ে। জয়ধ্বনিতে চারদিক মুখর হলো। ....সেই দিনই রুক্মিণীদেবী এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ

করেছেন। সমর্পনা, ভজন-কীর্তন, ভোগ সবই শেষ হয়ে গেলো কিন্তু লোকের ভিড় কমে না। বাবাকে দর্শন করে ধন্য হবার জন্য যেন সারা বড়বাজার অঞ্চলের লোক ছুটে আসছে। তখন সেই ভিড় ঠেলে বাবাকে বাইরে নিয়ে আসাই প্রায় অসম্ভব। রুক্মিণীদেবী তখন বাবা ও তার সঙ্গের লোকদের পেছনের এক সিঁড়ি দিয়ে গাড়ীতে পৌঁছে দিলেন। ঘটনাটা সেই সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়কার।—হঠাৎ একবার চমকে রুক্মিণী লক্ষ্য করলেন, সিঁড়িতে তো বাবার পা নেই! সেই রক্তে খড়ম পরা দু' পা'ই শূন্যে; সিঁড়ি স্পর্শমাত্র না করে শূন্য দিয়েই তিনি যেন ধাপে ধাপে নিচে নেমে আসছেন। গাড়ীতে চড়া পর্যন্ত দিয়েট থেকে এই এক-হেড় ইঞ্চি উপরে হেঁটে এল রুক্মিণী নিষ্পলক ভাবে লক্ষ্য করেছেন।....হরিমতী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু অপরিচিত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামার দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তিনি এ ঘটনা লক্ষ্য করেন নি। পরদিন মিলেস দেশাইয়ের কাছ থেকে বিবরণ শুনে বাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন। বাবা প্রথমে স্মিত হাস্য করেন। এবং পরে মেঝের দিকে আঙুল দেখিয়ে মাত্র ইঙ্গিত করেন। অর্থাৎ, হাঁ করেছিলাম, কারণ সিঁড়ি নোংরা ছিল। অব্যবহৃত সিঁড়ি সত্যই কিছুটা অপরিচ্ছন্ন ছিল, অপরাধীর মত রুক্মিণী দেবী স্বীকার করলেন।

'তোবে হামিও একটা কোথা জানাচ্ছি', ক্রোড়পতি মাড়োয়ারী শঙ্কর আগরবাল জানালেন তাঁর অভিজ্ঞতা। বড় একটা ডীলের কথা চলছিল, কিন্তু একটু ঝুঁকি ছিল তাতে। হয় দশ-এগারো লাখ টাকা বেশি মুনাফা, নয়তো বড় রকম গোলমাল। ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্ত মনে মনে স্থির করেই সে সন্ধ্যায় বাবার দর্শনে এসেছিলেন। ঘরে ঢোকা মাত্র বাবা কিক কিক করে হাসা শুরু করলেন তার দিকে চেয়ে, তারপর হাসি থামিয়ে চোখ দিয়ে যেন ধমক দিলেন আগরবালকে। খুব ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। ভয় পেয়ে গেলেন আগরবাল। তার মনে হলো, ডীলটিতে বাবার আপত্তি আছে।—সেটা থেকে সরে এলেন আগরবাল। পরে জানা গেল। ঐ ফটকা সম্পর্কে পুলিশ পাঁচ পাঁচ জন ধনী ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে....'

উপর থেকে খোলের আওয়াজ ভেসে এলো। এবার কীর্তন ভজনের পালা শুরু হবে, রাত দশটা অবধি চলবে। ব্যস্ত হয়ে ভক্তরা উঠে দাঁড়ালেন। রায় বাহাদুর অহিভূষণও উঠে দাঁড়ালেন, তবে বাড়ী ফেরার জন্য। হরিহর নিজে চললেন তার সঙ্গে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে।

'পরশুই দীক্ষাদান হচ্ছে', যেতে যেতেই বহুদিনের পুরানো বন্ধুকে বললেন হরিহর। 'অনেক সাধ্যসাধনা করে গিন্নী রাজী করেছেন বাবাকে। বাবা ওর কথা ঠেলতে পারেন না—এ তাঁর পরম অনুগ্রহ; আর বাবার ইঙ্গিতগুলি ও ছাড়া কেউ এমন বুঝে নিতেও পারে না।.... আমি বলি, তুমিও সেদিন সস্ত্রীক দীক্ষা নিয়ে নাও। ভগবানই তো শেষ-আশ্রয়। টাকা কড়ি মান সব উড়ে যাবে। তাই অনেক অনুসন্ধান করে উপযুক্ত গুরু সংগ্রহ করেছি....'

'বিনা-গুরুতে ভগবানকে ডাকতে অসুবিধে কি?' অহিভূষণ গম্ভীরভাবেই বললেন

'শোন কথা!' স্তম্ভিত হয়ে জবাব দিলেন হরিহর: 'শিক্ষালাভ করতে হলে, জ্ঞান লাভ করতে হলে শিক্ষকের দরকার হয় না? ভগবৎতত্ত্ব কি সোজা জিনিস। সে তত্ত্বও শিক্ষকের কাছে শিখতে হয়। গুরু সেই শিক্ষক।—'

'স্কুল কলেজের শিক্ষকদের তো ডিপ্লোমা-ডিগ্রী আদি থাকে।' অহিভূষণ মামুলি ভঙ্গীতে বললেন। 'তা দিয়েই তাদের যোগ্যতার প্রাথমিক বিচার হতে পারে, কোন্ গুরুর পরমার্থ শিক্ষা দেবার কতটা অধিকার আছে, তা জানাই তো মুস্কিল। সব গুরুরই কি সেই অধিকার আছে?—আর যাঁদের আছে, তাঁদের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে কি দেখে?....'

'আমাদের বাবার মধ্যে যে বিভূতি দেখছ, তাই দেখে,। সগর্বে বললেন হরিহর। 'গৌরকান্তি অনিন্দ্যমূর্তি, সমুদ্রের মত নীল দীর্ঘ আয়ত চোখ, মহাদেবের মত শিক্ষল কেশদাম উন্নতশিরে—যেন ভগবান স্বয়ং দেহ ধারণ করেছেন। আর বাবার অলৌকিক কাহিনী তো তুমি

কিছুই বকেয়া রাখি তাদের যেতে। সময় এগিয়ে এসেছে, আর ক'দিনই বা এই পৃথিবী, এবার তাড়াতাড়ি করতে হবে—'

অহিভূষণ তাড়াতাড়ি করুন আর নাই করুন, হাজার হাজার লোক উৎসুক হয়ে উঠেছেন দীক্ষা পাবার জন্য। ইতিপূর্বে হরিহরকে ধরা নিজ নিজ গুরুর চ্যালা বানাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যেও বহু লোক নিজেদের পুরানো গুরুদের পরিত্যাগ করে মৌনীবাবার কাছ থেকে দীক্ষা নেবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। এখন দীক্ষাভিলাষীদের সংখ্যাই একটা সমস্যার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে; একদিনে কত লোককে দীক্ষা দেওয়া যায়? অথচ নতুন নতুন লোক আবেদন নিয়ে হাজির হচ্ছে। মুহুর্মুহু টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠছে।

'আপনার কে "হ্যালো" "হ্যালো"। বেয়ারার টেলিফোনের রিসিভার কানে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন হরিহর। 'আই সি ইয়েস। ইয়েস। হোয়াই নট। কাম্ অ্যাল্‌সং টু-ডে সেভেন ইন দা ইভ্‌নিং—ও-কে। এবী টাইম ইউ লাইক—

প্রথমে একটু বিস্মিত হয়েছিলেন। তারপর পুলকিত বোধ করলেন। কলকাতায় ইতিমধ্যেই তার নিজের সুরে আনা গুরুর কি রকম প্রসিদ্ধি হয়েছে, তাও তারই আরেকটা প্রমাণ। ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশন থেকে সেক্রেটারি বললেন, হৃষীকেশ থেকে মুখুজ্জে মশায়ের বাড়ীতে এক সাধুপুরুষ এসে অবস্থান করছেন, এখবর তারা পেয়েছেন। ক'জন ইংরেজ ভদ্রলোক এঁকে দর্শন করতে যেতে চান, যদি না মুখুজ্জে মশায়ের আপত্তি থাকে। হরিহর তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। স্থির হয়েছে এরা সন্ধ্যা সাতটায় সাধু দর্শনে আসবেন।

'এদেরও ধরে কাল দীক্ষা দিয়ে দিলে হয় না!' খবর শুনে রসিকতা করে বললেন হরিবল্লভী।

সান্ধ্য ভজন-কীর্তন জমে উঠেছে। বাবার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কত না পদ ও সুরের সৃষ্টি হয়েছে; গায়ক ও গায়িকার কত বিভিন্ন দল পালা করে ভক্তি সঙ্গীত পরিবেশনের ভার নিয়েছে। প্রতি সন্ধ্যায় বাবার আরতি ও সঙ্গীত পরিবেশনা শত শত ভক্তকে আকর্ষণ করে।

এম্‌বেসির মার্কা-ঝাঁটা প্রকাণ্ড গাড়ীটাও যেন আজই হয়েই এগিয়ে এলো। ফটকের মধ্যে গাড়ীর প্রবেশ নিষেধ করা হয়েছে। চারজন দীর্ঘকায় ইংরেজ ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়লেন। দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে বাড়ী সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ীর মালিকের জন্য কার্ড বের করে আনলেন।

'চলা জাইয়ে।' কার্ড হাতে গ্রহণ না করেই সেলাম করে বললে দারোয়ানজী। 'বাবুজী নীচে হী হ্যায়।'

এর দু' মিনিট পরেই হরিহর তার ছেলে ছেলেদের সঙ্গে চারজনকেই বাবার দর্শনলাভের জন্য দোতলার বড় হলঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আবার দু' তিন মিনিটের মধ্যেই দর্শন শেষ ক'রে এরা চারজন নীচে নেমে এলেন হরিহরের কাছে। সবিনয়ে এঁদের একজন হরিহরকে বললেন কিছু। অনুরোধে সাড়া দিয়ে হরিহর এদের নিয়ে অফিস-কামরায় নিয়ে এলেন।

বাবার সমক্ষে ভজন ও কীর্তনের মাতামাতি চলেছে যেন সুর ও ভক্তির আনন্দে সবাই প্লাবিত। ধূপের ধোঁয়ায় ঘর ভরে আছে। বাবা এই ধোঁয়ায় চাদর জড়িয়েই যেন নিমীলিতনেত্রে বসে আছেন। দুধ আলতার গোলা রং, বলিষ্ঠদেহ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিরদাঁড়া খাড়া রেখে ভাবে বিভোর হয়ে কীর্তনানন্দ উপভোগ করেন। তাঁর সামান্য উঁচু আসনের দু'পাশের দুই ঘরের দরজা দিয়ে খুব নিকট-ভক্তেরা কখনও কখনও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনা-নেওয়া করছেন পা টিপে টিপে এসে, আবার তখনই বের হয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া সভার জন্য সবাই, গায়ক ও শ্রোতা, যেন তদগত সমাহিত হয়ে আছে।

'হারী!' সহসা বাবার খুব কাছ থেকে নিচুগলায় কিন্তু বেশ তীব্র আওয়াজ এলো।

বাবা যেন চমকে উঠলেন। চমকে উঠে পাশে তাকালেন। কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু মুহূর্তকালের জন্য মাত্র। পরক্ষণে তিনি উঠে দাঁড়ালেন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত। একবার ডান দিকের ও তার পর বাঁ দিকের দরজার দিকে দ্রুত দৃষ্টিপাত করলেন; পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাবা। সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাণ্ড হলঘরটার প্রত্যেকটা আলো ও আলোর ঝাড় নিবে গেল; গভীর অন্ধকার ঢেকে দিল চারদিক। ইতিপূর্বেই মিসেস্ অরোরা সখী মিসেস চন্দকে আবার চিমটি কেটেছেন—অর্থাৎ, চেয়ে দেখো ভাই, বাবা এই ছিলেন, আবার এই নেই। কিন্তু তখন খাবে নি বার বার পদগুলি ভক্তি রসাপ্লুত করে গাওয়া হচ্ছে:

জয় জয় জয় মৌনী মহারাজ
জয় জয় কর্ণধার ভবসিন্ধুমাঝ।
তুমি শিব মহেশ্বর, তুমি নারায়ণ
জয় জয় সদ্গুরু জগৎকারণ—

'আহা, থামোই না, একটু', হরিহর হতাশ ধরে বললেন, 'একমাত্র ছেলে মারা গেলেও তো লোকে এমন কাঁদে না।

বস্তুত যৌবনকালে হরিহর কখনও খুব বেশি রাত করে গায়ে আতরের গন্ধ ও মুখে মদের গোসবু নিয়ে বাড়ী ফিরলে অভিমানিনী হরিমতী যেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, আন্তরিক ক্লেশের সঙ্গে কাঁদত, তার চেয়ে কম বুকফাটা নয় এই ক্রন্দন। আর সন্ধ্যার পর থেকেই এই কান্না চলছে; হরিহর যতই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, উল্টো ফল হয়েছে। এখন গভীর রাত; বিছানায় শুয়ে এখনও ফুলে ফুলে উঠছেন হরিমতী।

'তুমিই তো সব নষ্ট করলে', ফোঁস করে উঠলেন হরিমতী। 'ইংরেজ আর দেশের রাজা নয়, তাদের ভয়টা কি? তুমি খুব বাহাদুরী দেখালে! পরম ধন তাদের হাতে সঁপে দিয়ে এখন সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে, একমাত্র ছেলে মরলেও কেউ এমন কাঁদেনা—এর দরকারটা ছিল কি শুনি?···'

'ইংরেজ রাজা নয় বলেই কি অন্যের ছেলেকে আটকে রাখা যাবে?' হরিহর গম্ভীর গলায় বললেন। 'স্বয়ং বাপ নিতে এসেছে। আমাকে সবটা দেখালে। পাসপোর্ট দেখালে, যার ব্যাপ্টিস্মাল সার্টিফিকেট। ডেপুটী হাইকমিশনারের সেক্রেটারি সঙ্গে এসেছেন। এর পর আর সন্দেহ থাকতে পারে? হরিদ্বারের কাছে ভারি মেশিন তৈরির যে সরকারী কারখানা খোলা হয়েছে, বিশেষজ্ঞ এঞ্জিনীয়ার হিসাবেই সেখানে ইংলণ্ড থেকে মিঃ টমাসকে আনান হয়। তার ছেলে স্থায়ী মানসিক রোগগ্রস্ত; বছরের আধেক প্রায় স্বাভাবিক; বাকি আধেক পুরো পাগল। একটাও কথা বলবে না, আপন মনে ঘরময় ঘুরে বেড়াবে। বাবা দিতে গেলে পালিয়ে নির্ঘোঁজ হবে!···ঘটনাচক্রে কোন্ এক সেঁয়ো বুড়ীর কাছে নাকি ম্যাজিক শিখতে গেছে; সন্দেহ করা হয়, সেই যাদুকরীই ওর মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। সারাক্ষণ জামার আস্তিন থেকে ডিম বের করে আনছে, আঙুলের ফুঁয়ে ফুল ফুটিয়ে বেড়াচ্ছে—অস্বাভাবিক অবস্থার এগুলিও লক্ষণ, যেমন লক্ষণ ঘুরোপুরি মেন হয়ে যাওয়া ···কি আর করা যাবে বল, যাকি হতেই হবে···।

'তা বলে আমাদের দোষার ঘরে! যৌবার শোবার ঘরে দু'দুটো আলাদা দাহেবকে ডেকেকে কাপড়া কাপড়ি করার জন্য?···।

হরিহর ছেলে বলেন, 'আর উপায় কি! নইলে যে বেশি জানাজানি হয়ে যেত: ডি ডি পড়তো।···ইংরেজের বাচ্চা, দেখ তো কেমন অন্যের সম্মান বাঁচিয়ে, সবচেয়ে কম হৈ চৈ করে কাজ উদ্ধার করে নিলে।···উঠে পালাতে হলে ডাইনের বা বাঁয়ের দরজা দিয়ে পালাতে চাইবে ভেবে নিয়ে দু'পাশের ঘরে দু'জন লুকিয়ে রইল। তৃতীয়জন কাছে গিয়ে হঠাৎ "হাণ্ডস্ আপ" বলে ডেকে চমকে দিল। ব্যস্, আর যাবে কোথায়! পাশের দরজাই পালাবার একমাত্র পথ। ঢোপ গেলামাত্র চতুর্থ ভদ্রলোক উপরের মেইন সুইচ টিপে সারা জায়গা অন্ধকার করে' দিলেন। ঘুপের ঘোঁয়া তো ছিলই, তার উপর সহসা অন্ধকার; অধিকাংশ লোকই কিছু টের পেলেনা। ভেতরের ধস্তাধস্তি তো কীর্তনেই চাপা পড়ে গেছে।···কিন্তু ক্যাসাদ এখনও মেটেনি। প্রথমটা, কালকের

দীক্ষা। বাবা দীক্ষা দিতে চাননা, বলেন ওটা অনাবশ্যক সংস্কার; তাই বিশ্বাসের না জানিয়েই হিমালয়ে নিজ আশ্রমে ফিরে গেছেন, এটা অনায়াসেই সবাই বিশ্বাস করতে পারবে। কিন্তু পরেরটা সেটাই কি করে? বাবার আশ্রম করার জন্য ইতিমধ্যে আড়াই লাখ টাকা চাঁদা উঠেছে। এখন এই টাকার কি ব্যবস্থা করি, কি বলে ফিরিয়ে দিই ···।

'ফিরিয়ে দিতে যাবে কেন? মন্দির বানাবে।' চন্দন ত্যাগ করে হরিমতী তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন। 'ভক্তিই তো ভক্তের একমাত্র সম্বল। ভক্তির জন্যই তো গুরু ··ভক্তিতেই ভগবান ।

'এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমতীর মত কথা বলেছ; এত ভক্তি বলেই তো এত গুরু!' আশ্বস্ত হয়ে বললেন হরিহর। 'কিন্তু ভেবোনা, শীঘ্রগিরই এমন মন্দির বানিয়ে দেব, যে কলকাতা শহরেরও তাক লেগে যাবে। হাজার হাজার ভক্তিকামী ছুটে আসবে যে মন্দিরে। মৌনী মন্দির ভক্তদের পীঠস্থান হয়ে উঠবে। বা স্বামী থেকে হরি মন্দিরও বলতে পার ····'

• • •

"আমাদের দেশ তো একদিন ধর্মকে যুদ্ধ করিতে জানিত একদিন দারিদ্র্যকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিখিয়াছিল আজ আমরা কি টাকার কাছে মাথাতে ধূলাবলুণ্ঠিত হইয়া আমাদের সনাতন পুরুষকে অপমানিত করিব আজ আবার আমরা সেই শুচিশুভ্র, সেই মিতসংযত, সেই স্বল্পীকরণ জীবনযাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্বিনী জননীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর, সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না। আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্য নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না। একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতান্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কখনই নহে। নিরতিশয় দুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাণ্ড প্রভাব বীরত্বভাবে নিগূঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে। আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের দুই চারিদিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিদ্যা সেই চিরন্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের সুগম্ভীর আহ্বান প্রতি মুহূর্তে আমাদের বক্ষঃ কুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃ শনৈঃ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গল দীপোজ্জ্বল গৃহের দিকে চলিয়া গিয়াছে সেইখানে আমাদের গৃহযাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!" একবার স্বীকার করো যে দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পরাহত অকাল-কুষ্মাণ্ডের ন্যায় অধঃপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।"

কাপালিকের খপ্পরে

শ্রীঅমিতা কুমারী বসু

বহুদিন সুজিতের দেখা পাইনি। ভাবলাম খোঁজ নেব। এরি মধ্যে একদিন সুজিত এসে হাজির হল। তাকে দেখে খুসী হয়ে উঠলাম। বল্লাম, এসো, এসো, এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক্।

নানারকম গল্প হচ্ছে। এক সময় সুজিত যখন তার সিগারেট খেয়ে ছাইদানীতে ছাই ঝাড়ছিল। তখন তার ডান হাতের দিকে নজর গেল। লম্বা লম্বা পাঁচ আঙুলে না হলেও দু আঙুলে তিনটে আংটি, ডান হাতের মণিবন্ধে একটা মোটা কালো সুতো বাঁধা।

আমি একটু অবাক হয়ে বল্লাম, সুজিত, তুমি আমার ছেলের বয়সী। তাই জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করো না। সেদিন পার্টিতে দেখলাম পাকা সাহেব সেজে এসেছ। আজ দেখছি হাতে একরাশ আংটি, সুতো এসবের অর্থ কি, তুমি কি বহুরূপী?

সুজিত প্রাণখোলা হাসি হেসে বল্লে, ঠিকই বলেছেন, আমি বহুরূপীই। আমার এক তান্ত্রিক কাকা ছিলেন। তাঁরই দেওয়া এসব মন্ত্রপূত সুতো ও আংটি।

—তুমি এসব তান্ত্রিক-সাধু সন্ন্যাসীর তুকতাককে বিশ্বাস কর?

—করি বৈকি, আমিও যে অনেক সাধুর পিছনে ঘুরেছি। তারপর কাকার কাছে অনেক অলৌকিক কাহিনী শুনেছি এবং কিছু কিছু দেখেছিও। যাদের কাছে শুনেছি, কাকা যখন চৌদ্দ পনের বছরের বালক, তখন খবর পেলেন যে তাদের গ্রামে এক অতি সিদ্ধপুরুষ এসেছেন। তিনি তান্ত্রিক সন্ন্যাসী। এখবর শুনেই কাকা সেখানে ছুটে গেলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে ও তাঁর কার্যকলাপ দেখে কাকার মনে খুব শ্রদ্ধা জাগল। তিনি রোজই গিয়ে সাধুর কাছে বসে থাকেন। সন্ন্যাসীকে এটা সেটা এগিয়ে দেন, ধুনী জ্বালিয়ে সাধু চোখ বুজে বিড়বিড় করে কি সব মন্ত্র আওড়ান, তিনি নিবিষ্ট মনে তা দেখেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সাধুর কাছে গ্রামের লোকের কি ভীড়। কেউ বা সাধুর পা ধরে হাউ হাউ করে কাঁদে, মুক্তি চায়, কেউ সন্তান কামনা করে, কেউ বা ধন চায়, এদিতর বর প্রার্থনা চলে সন্ন্যাসীর কাছে।

একদিন কাকার মা শৈবলিনী খবর পেয়ে সন্ন্যাসী দর্শনে এলেন। তাঁকে দেখে সন্ন্যাসী একবার থেকে তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী বলতে লাগলেন। শৈবলিনী খুবই আশ্চর্য হলেন সন্ন্যাসীর ক্ষমতা দেখে। তাঁর ভক্তি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তিনি ভাল করে সন্ন্যাসীর দিকে চাইলেন। মনে হল সন্ন্যাসীর বয়স ষাটের উপর হবে মাথায় প্রকাণ্ড এক জটা চূড়ো করে বাঁধা। মুখে একরাশ লম্বা দাড়ি, খাড়া নাক আর চোখ দুটা জবাফুলের মত টকটকে লাল, ভীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

সন্ন্যাসী শৈবলিনীকে ভবিষ্যতের বহু আশ্চর্য বিষয়ের কথা বল্লেন, আর আশ্বাস দিলেন—তোর এই বেটা অতি সুলক্ষণযুক্ত। তার ভবিষ্যত অতি উজ্জ্বল। তার কোন কাজে বাধা দিবি না। এই বলে সন্ন্যাসী মার হাতে একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে বল্লেন, কোন ভয় নেই তোর, বিপদ কেটে যাবে।

শৈবলিনী সন্ন্যাসীকে ভক্তিভরে প্রণাম করে বাড়ী ফিরে এলেন। মনে হল তাঁর মাথাটা যেন কি রকম ঘুরছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। হয়ত গরমে এরকম হচ্ছে ভেবে তিনি বারান্দায় পাটী বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন বেহুঁশ হয়ে। সে রাতে তাঁর আর খাওয়া হল না।

কাকা কিন্তু অন্যদিনের মত সে রাতে বাড়ী ফিরলেন না সকালবেলাও যখন কাকা বাড়ী ফিরলেন না, তখন

বাড়ীর লোক ছুটল সাধুর ওখানে। কিন্তু গিয়ে দেখে সেখানে সাধুটাধু নেই। শুধু ধুনীর কতকগুলো ছাই পড়ে আছে। তা থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে।

গ্রামের লোকও কিছু বলতে পারল না। বলে, রাত বারোটা পর্যন্ত সন্ন্যাসীর আস্তানায় আগুন জ্বলছিল তারা দেখতে পেয়েছে। এর বেশী আর কিছু বলতে পারল না। বেলা দশটার পর শৈবলিনীর ঘুম ভাঙল, বারান্দায় পুবের রোদ এসে পড়েছে। এতখানি বেলা হয়ে গেছে দেখে শৈবলিনী ধড়মড়িয়ে উঠলেন। ডাকলেন, মৃন্ময়! মৃন্ময়! কেউ সাড়া দিল না। আবার ডাকলেন। উত্তর না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে বল্লেন, আমার মৃন্ময়কে ডেকে দাও তো।

তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বাড়ীর লোকরা বল্লে, মৃন্ময়কে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ন্যাসীও নেই, মৃন্ময়ও নেই। শৈবলিনী পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন, পুলিশে খবর দাও। ঐ সাংঘাতিক সন্ন্যাসী আমার মৃন্ময়কে বলীকৃত করে নিয়ে চলে গেছে। ঐ সন্ন্যাসী মোটেই ভাল লোক নয়। যুজরুকী করে আমার অতীতের দু'চারটে কথা বলে আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। তারপর নানা বিপদের কথা বলে আমার হাতে এক তাবিজ বেঁধে দিল। যার ফলে বাড়ীতে এসে আমি বেহুঁস হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর সেই সুযোগে সে আমার ছেলেকে নিয়ে পালাল। শৈবলিনী হাতের তাবিজ ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলেন। তারপর মনোদুঃখে শয্যা নিলেন।

মৃন্ময়কে কোথাও পাওয়া গেল না।

সেই কাকা বাইশ বছর পর বাড়ী ফিরলেন। তাঁর মায়ের কাছে খবর গেল, জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী এসে বাইরের ঘরে বসে আছেন। কাকার মা পাগলের মত ছুটে গিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, বল্লেন, বাবা, তোমরা তো সর্বজ্ঞানী, আমার ছেলে কোথায় আছে বলে দাও।

সন্ন্যাসী বলে উঠলেন, ছিঃ মা কর কি, ওঠো, আমিই তো তোমার মৃন্ময়।

শৈবলিনী বিদ্যুৎ বেগে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাইলেন। কাকার কপালে একটা কাটা দাগ ছিল। তা দেখে চিনতে পারলেন। তাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বল্লেন, বাবা এতদিন পর যদি দেখা দিলি তবে আমাকে ছেড়ে আবার চলে যাসনে, তোর এই বেশ বদলে ফেল।

সন্ন্যাসী মায়ের ঐ আকুল কান্না শুনে আর তাঁর শীর্ণ জীর্ণ দেহ দেখে বিচলিত হলেন। শৈবলিনী একটানা কাঁদতে কাঁদতে বলেই চলেছেন, বাবা আমাকে ছেড়ে যাসনে, বলতে বলতে বেহুঁস হয়ে পড়ে গেলেন। সন্ন্যাসী আর স্থির থাকতে পারলেন না। মা, মা, করে চেঁচিয়ে উঠলেন। জলের ছিটা চোখে মুখে দিয়ে মায়ের মূর্চ্ছা ভাঙ্গালেন।

সেই থেকে কাকা সন্ন্যাস ছেড়ে দিয়ে বাড়ীতেই রইলেন, তবে গৃহী হলেন না। কাকা সুপুরুষ ছিলেন, গৌরবর্ণ রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছিল। মুখে স্নিগ্ধভাবের বদলে একটা রুক্ষভাব। চোখ দুটো কারণ-পানে প্রায় সব সময় লাল টুকটুকে থাকত।

আমি তখন বালক। কাকাকে প্রথম প্রথম দেখলেই আমার ভয় করত। মাথায় একরাশ কবজ, তাবিজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটা। বসে বসে গাঁজা টানছেন। পরিধানে গেরুয়া বসন, আমি দরজার পাশ থেকে উঁকি দিয়ে দেখতাম। তবে কাকা আমাকে আড়াই করে ফেল্লেন। তাঁকে দিনে অন্ততঃ একবার আমার দেখা চাই-ই।

কাকা আমার এই লুকোচুরি ধরে ফেল্লেন, একদিন ডেকে বল্লেন, পালাচ্ছিস কেন? এদিকে আয়।

তাঁর সেই বজ্রনাদীর গলার সুরে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকলাম। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, ঘরের কোণে একটা ত্রিশূল, কতকগুলো বোতল, একটা কালো রং-এর পাত্র। বোধহয় মড়ার মাথার খুলিই হবে। এখানে ওখানে গাঁজার কল্কে ছাই ইত্যাদি বহুবস্তু। তা দেখতে দেখতে আমার গাটা ছমছম করে উঠল।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার ভয় ভেঙে গেল। আমি রোজই গিয়ে কাকার পা টিপতাম এই আশায়, যদি কাকা আমাকে কিছু মন্ত্র তন্ত্র শিখিয়ে দেন। একদিন কাকার

পা টিপতে টিপতে বল্লাম, কাকা, আপনি এই সাধুর সঙ্গে কি ভাবে চলে গিয়েছিলেন সেই গল্পটা বলুন না।

কাকা বল্লেন, বলব, তার আগে তুই আমার গাঁজার ছিলিমটা এনে দে, একটু গাঁজার দম দিয়ে নি। তারপর বলব, তুই পারিবি তো ?

কাকা বলতে লাগলেন, শোন্ তবে। সন্ন্যাসী তো মাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিল, আমাকে বলে, বোস এখানে, এখন বাড়ী যাস্‌নে। আজ তোর অনেক কাজ। আমি সন্ন্যাসীর কথা শুনে খুসী হয়ে উঠলাম। সন্ন্যাসী নিজে বলছেন তাঁর কাজ করতে—কি ভাগ্য আমার।

সন্ন্যাসী বল্লেন, নে এক ছিলিম তামাক তর, তারপর আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। আমি সে দৃষ্টি সহ্য করতে পারলাম না, এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার সমস্ত শরীরে যেন একটা তীব্র শিহরণ খেলে গেল। তারপর সন্ন্যাসী একটা বোতল থেকে একটু তরল পদার্থ হাতে নিয়ে আমার উপর ছিটিয়ে দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন। তারপর একটা মাটির ভাঁড়ে খানিকটা ঢেলে দিয়ে বল্লেন, নে খা। আমি ধীরে ধীরে সেটা হাতে নিয়ে মন্ত্রচালিতের মত এক নিঃশ্বাসে টেনে খেয়ে ফেল্লাম। মনে হল যেন গলা বুক জ্বলে যাচ্ছে। সমস্ত শরীর ঝিম্‌ঝিম্ করছে। কিছু পরেই শরীরটা হঠাৎ ঝরঝরে মনে হল, দ্বিগুণ বল পেলাম।

এবার সন্ন্যাসী 'চল্ আমার সঙ্গে' বলে সব তান্ত্রিকরা গুটির বোঝা আমার মাথায় তুলে দিলেন। সন্ন্যাসীর হাতের চিমটা রুম্‌রুম্ করে বেজে উঠল। ত্রিশূল হাতে নিয়ে সন্ন্যাসী ঘুরে দাঁড়ালেন। ধুনীর মৃদু আলোতে জটাজুটধারী দীর্ঘকায় মূর্তি আমার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হল। সন্ন্যাসী বজ্রগম্ভীর স্বরে বল্লেন, চল্ আমার পেছু পেছু, কিন্তু খবরদার একটা কথা বলবি নে বা শব্দ করবি নে। চলতে পারবি তো ?

আমি নীরবে মাথা হেলিয়ে বোঝা নিয়ে সন্ন্যাসীর পিছু চল্লাম। সন্ন্যাসী আমাকে নিয়ে গঙ্গাতীরে এলেন। সেখানে এক খেয়া মাঝি নৌকায় ঘুমাচ্ছিল, তাকে ত্রিশূলের এক খোঁচা দিয়ে বল্লেন, নৌকা ভাসা।

মাঝি ধড়ফড়িয়ে উঠে ভীষণ দর্শন সন্ন্যাসীকে দেখে ভয়ে ভয়ে বৈঠা হাতে তুলে নিল। আমরা নৌকায় উঠে পড়লাম। নদীর ওপারে পৌঁছে আমরা দ্রুতপদে চলতে লাগলাম। রাত্তারাতি আমরা বহুদূর চলে গেলাম। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে আমরা এক গ্রামের সীমানায় পৌঁছে এক বটগাছতলায় আড্ডা গাড়লাম। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে এখন সন্ন্যাসী দেখতে পেয়ে লোক খুসী হয়ে উঠল। একে দুয়ে এসে সন্ন্যাসীকে দর্শন করে যেতে লাগল। কেউ দিল পয়সা, কেউ দিল ফলমূল, কেউ বা আনল দুধ, এভাবে আমাদের ভাল ফলার জুটে গেল।

দিনে আমরা বেশ ঘুমিয়ে নিলাম। নিশীথ রাত্তে সন্ন্যাসী বল্লেন, চল্ এবার গ্রাম ছেড়ে। আবার আমাদের যাত্রা সুরু হল। এভাবে কখন পায়ে হেঁটে, কখন ভেলে চড়ে আমরা দিনে রাত্তিরে আসামের কামাখ্যা মন্দিরে পৌঁছলাম। সেখানে অনেক সন্ন্যাসী আর সুন্দরী সুন্দরী তরুণী ভৈরবীদের দেখতে পেলাম। সেখানে অনেক কিছু দেখলাম। এভাবে তিনমাস নানা স্থানে ঘুরে ফিরে আমরা হরিদ্বারে এলাম। সন্ন্যাসী বল্লেন, এবার আমরা হিমাচল প্রদেশে যাব। এই তিনমাসে আমি গাঁজা আর কারণে বেশ রপ্ত হয়ে উঠলাম। তাছাড়া সন্ন্যাসী মাঝে মাঝে আমাকে কি খেতে দিতেন যাতে শরীরে শক্তি পেতাম।

হিমাচল প্রদেশে পৌঁছে আমরা এক গৃহস্থ বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে তারা বেশ ভাল করে সাধু সেবা করল, সে রাত্তটা আমরা সেখানেই কাটালাম। পরদিন ভোরে সন্ন্যাসী বল্লে, দেখ্, ঐ যে পাহাড়ের চূড়ার একটু নীচে জঙ্গলের মধ্যেএকটা সাদা মন্দির দেখা যাচ্ছে, সেখানে আমাদের যেতে হবে, পারবি তো যেতে ?

সেই খাড়া পাহাড়টার দিকে চেয়ে প্রথমে ভয় লাগল, মনে মনে বল্লাম পারতেই হবে, যে ভীষণ সন্ন্যাসীর হাতে পড়েছি, না পেরে উপায় নেই। মুখে সাহস দেখিয়ে বল্লাম, খুব পারব। যাত্রা সুরু হল। নীচ থেকে উপরের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কি অপূর্ব সুন্দর এই হিমালয় পর্বতশ্রেণী। আকাশচুম্বী দূরের শৈলমালা অসীমে মিশে

গেছে। তার শিখর তুষারাচ্ছন্ন, রৌদ্রকিরণে স্নাত সেই তুষার গাত্রে অপূর্ব রং-এর খেলা, দেখে আশ মেটে না, চোখ ফেরান যায় না, মনে হল বইতে কত পড়েছি। হিমালয় সাধু সন্ন্যাসীদের আবাসভূমি, তার শিখর কাঞ্চনজঙ্ঘা, গৌরীশঙ্কর, পর্বত অভিযানকারীদের দুরাশার স্বপ্ন; শিব-দুর্গার কৈলাস তো ওখানেই।

অগ্রসর হলাম। মধ্যবর্তী পথে দুএকঘর সমাচ্ছন্ন ছোট ছোট গ্রাম। আমি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহ টেনে কোন রকমে চল্লাম সন্ন্যাসীর পেছন পেছন। অবশেষে এক সময় গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছলাম। পাহাড়ের কোলে একটু সমতল-ভূমি, সেখানে ছোট একটি মন্দির। আমি ধপ্ করে বসে পড়লাম মন্দির দুয়ারে।

সন্ন্যাসী অদ্ভুত ধরনের এক হাসি হেসে বল্লেন, কি রে খুব হেদিয়ে পড়েছিস, যা একটুনি স্নান কর। কিছুদূরে ওই যে সরোবর দেখছিস তাতে ভালভাবে স্নান করে শুদ্ধ-সাদ্ধ হয়ে আয় দেবী প্রণাম করতে।

আমি ধীরে ধীরে চলে সরোবরে গিয়ে নামলাম, সত্যি শীতল জলে স্নান করে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল, সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেল। ফিরে গিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম, দেখলাম ভিতরে ছোট এক নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্তি, হাতে রক্তমাখা খাঁড়া। অন্ধকারে মন্দিরের ভিতর মা কালীর মূর্তি যেন আমার মনে একটা বিভীষিকা জাগিয়ে তুল। আমাদের বাড়ীতেও কালীমূর্তি আছে কিন্তু সেখানে মায়ের মুখখানা স্নিগ্ধ যেন বরাভয়দায়িনী, আর সন্ন্যাসীর এই কালীমূর্তি যেন লক্লকে জিভ বের করে রক্তপানে উদ্যতা।

আমি মা কালীকে হাঁটু ভেঙ্গে প্রণাম করতে যেতেই তান্ত্রিক সন্ন্যাসী হাঁ, হাঁ করে উঠল, এত তাড়াহুড়া কেন? এভাবে মাকে প্রণাম করতে নেই, আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে হবে। জানিস তুই কত ভাগ্যবান, আজ মা কালী তোর রক্তপান করবেন, তোর জন্ম সার্থক হবে।

সন্ন্যাসীর কথা শুনে তো আমার পাতকপাটি লাগবার কথা, পা দুটা ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। একবার কালীমূর্তির দিকে চাইলাম, আবার কাপালিকের দিকে চাইলাম। একপাশে ঘৃতের দীপ প্রদীপ জ্বলছে, হাওয়ার দুলে দুলে প্রদীপের মৃদু আলো পাশে রাখা এক তীক্ষ্ণধার খাঁড়ার উপর পড়ছে, আর সে আলোতে খাঁড়াটা বিদ্যুত চমকের মত ঝলসে উঠছে। দেবীর সামনে বসে কাপালিক সন্ন্যাসী একটা মড়ার খুলিতে পাশে রাখা বোতল থেকে কারণবারি ঢালছে আর পান করছে।

হা, হা করে হঠাৎ কাপালিক এক অট্টহাসি দিল, সেই ভীষণ হাসি ছোট মন্দিরটিতে প্রতিধ্বনি তুল, হা, হা, হা। কাপালিক বল্লে, বেটা প্রস্তুত হ, আজ তোর অতি শুভদিন, স্বয়ং মা কালী তোকে গ্রহণ করবেন। তোকে আজ উৎসর্গ করলেই আমার ১০৮ বলি পূর্ণ হবে, আমি সিদ্ধিলাভ করব। জগৎ আমার মুঠোয় এসে যাবে। বলে আবার কাপালিক মন্দির কাঁপিয়ে হেসে উঠল হা, হা, হা।

আমার সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল, পাথরের মূর্তির মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করব কিছুই ভেবে পাচ্ছি না, মনে হল কাপালিকের হাত থেকে আর নিস্তার নেই। কাপালিক বোতল থেকে কারণ ঢালছে আর পান করছে, বোতল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তার চোখ দুটা জবাফুলের মত লাল হয়ে আরো ভীষণ দেখাচ্ছে। কাপালিকের কথা ভড়িয়ে আসছে, বলছে, জানিস তোর বলির পূর্ণাহুতি হয় একটি সুলক্ষণ যুক্ত ব্রাহ্মণ কুমারকে উৎসর্গ করতে পারলে। কত খোঁজ করতে করতে তবে তোকে সংগ্রহ করেছি, তোর দেহে সমস্ত শুভলক্ষণ আছে, তুই মা কালীর কাছে উৎসর্গ হবার জন্যই জন্ম নিয়েছিস্।

কাপালিকের কথা শুনতে শুনতে আমি মনে প্রাণে ভাবতে লাগলাম এই আসন্ন মৃত্যুমুখ থেকে কি করে নিজেকে রক্ষা করতে পারি। হয়ত অদৃষ্টে ছিল এ যাত্রা ঘর দুয়ারে যাব না, তাই মাথায় একটা বুদ্ধি গজাল। গলা বুক শুকিয়ে গেছে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে, অতি কষ্টে সাহস সঞ্চয় করে হাতযোড় করলাম, বল্লাম, প্রভো, আমি মা কালীর কাছে বলি হব, এর চেয়ে শুভ খবর আর কি হতে পারে। আমার জীবন ধন্য, তবে একটা কথা আছে, শুনেছি মরবার আগে নিজের বাসনা পূর্ণ করে যেতে হয়।

কাপালিক ভারী গলায় বলে, কি তোর সাধ বল্।

আজ্ঞে আমি একবার পেট ভরে কিছু খেতে চাই।

—আচ্ছা দেখি তোর ভাগ্যে কি জোটে, সে এইটুকু কারণ আগে পান কর্, তোর ভয় কেটে যাবে।

সত্যি, কারণটুকু চক্ চক্ করে গিলতেই আমি সজীব হয়ে উঠলাম, আমার সমস্ত ভয় যেন দূর হয়ে গেল। সন্ন্যাসী উঠে ঘরের এক কোণায় বসে যখন কল মিষ্টি বা পান খুঁজে বের করছিলেন, তখন আমি এক নিমেষে সেই দাঁড়া তুলে নিয়ে প্রাণপণে এক কোপ দিলাম তার ঘাড়ে। তারপর কি করে যে এক লাফে সেই মন্দির থেকে বের হলাম, আমি আজো বুঝতে পারিনে।

আমি ছুটছি তো ছুটছিই, তখন গড়িয়ে পড়ছি, আবার উঠছি, কোথাও বা কাঁটা গাছে হাত পা কেটে রক্ত বেরুচ্ছে, কোনদিকে খেয়াল নেই মনে শুধু এক ভয়—ঐ বুঝি কাপালিক আসছে ধরতে, ওই বুঝি এল। পাগলের মত ছুটতে ছুটতে পাহাড়ের নীচে ছোট একটি গ্রামে পৌঁছলাম। প্রথমেই যে বাড়ীটা নজরে পড়ল সেটার ভিতর ঢুকে দড়াম্ করে পড়ে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। প্রায় সাতদিন নাকি অজ্ঞান ছিলাম, যখন জ্ঞান হল তখন অপরিচিত ভিন্ন দেশীয় নারী পুরুষ দেখে আবার আতঙ্কে আমার মন ভরে গেল। ভাবলাম সেই কাপালিক সন্ন্যাসীই বুঝি আমাকে ধরে নিতে এদের পাঠিয়েছে। পালাতে হবে ভেবে যেই উঠতে গেছি, অমি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

এভাবে বাইশ দিন আমি অসুস্থ ছিলাম। এদের সেবাযত্নে যখন আমার মন থেকে আতঙ্ক দূর হল, মস্তিষ্ক পরিষ্কার হল, তখন চোখ মেলে দেখলাম একটি মধ্যবয়সী পাহাড়ী রমণী আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি চোখ খুলেছি দেখতে পেয়ে ছুটে অন্য ঘরে চলে গেল। তাড়াতাড়ি এক গ্লাস ভর্তি গরম দুধ এনে আমাকে দিল, বলে, খাও। আমি সে ভাষা বুঝতে পারলাম না। তবে ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম, গ্লাসটা হাতে নিয়ে দুধটুকু খেয়ে ফেললাম। আবার অবসাদে দু'চোখ বুজে এল।

পরদিন যখন সে ঘুম ভাঙল, তখন দেখতে পেলাম একটি পাহাড়ী লোক এসে আমার কাছে দাঁড়াল, তার কোলে একটি দুইসুই শিশু, আর তার হাত ধরে একটি তিন চার বছরের ছেলে। সেই মহিলাটিও ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল। এদের বেশভূষা আর ভাষায় বুঝলাম এরা হিমাচল প্রদেশবাসী। শিশুদের দেখে আর স্বামী স্ত্রী দুজনের দিকে চেয়ে মন তৃপ্তিতে ভরে উঠল, নিজের পিতৃস্নেহের কথা মনে পড়ল।

পাহাড়ী মহিলা আবার এক গ্লাস দুধ এনে মুখের সামনে ধরল। পুরুষ লোকটি গড়গড় করে কি বলে কিছু বুঝতে পারলাম না, তবে তার ভাবে বুঝলাম যে দুধ খেতে অনুরোধ করছে। আমি দুধটুকু খেয়ে আকারে ইঙ্গিতে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম, বুঝল কিনা কে জানে। মহিলা শিশু দুটিকে নিয়ে ভিতরে চলে গেল, আর লোকটিও কোথায় হন্ হন্ করে চলে।

আধঘণ্টা পরে সে ফিরল সঙ্গে একজন সৈনিকবেশী লোককে নিয়ে। তিনি এসে বলেন, তুমি কি বাঙ্গালী? তা তুমি হিমাচল প্রদেশে কি করে এলে?

তাঁর কথাগুলো আমার কাছে অমৃত সমান লাগল, কতদিন বাংলা কথা শুনিনি! উত্তর দিলাম, হ্যাঁ আমি বাঙ্গালী।

বলেন, দেখে তো মনে হচ্ছে বয়স খুব বেশী নয়, বাড়ী থেকে পালিয়েছ না আর কিছু? তুমি নাকি এদের বাড়ীতে ঢুকেই পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে? আজ বাইশ দিন পর তুমি প্রকৃতিস্থ হয়েছ। এই কয়দিন এই পাহাড়ী দম্পতি তোমাকে নানা ওষুধ আর পথ্য দিয়ে যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলেছে। তুমি নাকি মাঝে মাঝে ভীষণ আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে উঠতে, তারপরই মূর্চ্ছা যেতে, সঙ্গে সঙ্গে এই কয়দিন প্রবল জ্বরও ছিল, কি ব্যাপার বলোতো?

তখন আমি বললাম, এক সন্ন্যাসীর খপ্পরে পড়ে আমি বাড়ী থেকে তার সঙ্গে পালিয়ে আসি। ঐ যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা ছোট সাদা রং-এর মন্দির আছে, সেখানেই ঐ সন্ন্যাসী আমাকে মা কালীর কাছে বলি দিতে চেয়েছিল। আমি সুযোগ বুঝে সন্ন্যাসীর কাঁধে

খাড়া দিয়ে এক কোপ মেরে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে এসে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম, আর কিছু মনে নেই।

গৈরিকধারী শিউরে উঠে বলেন, তুমি তো দাংঘাতিক কাপালিকের খপ্পরে পড়েছিলে। ও তো অঘোরানন্দ কাপালিক। তাকে না চেনে আর ভয় না পায় এমন লোক তো এতদ্বাটে নেই। তা কাপালিক কি জীবিত ? না মৃত ?

—তা তো জানিনে, জীবিত থাকলে নিশ্চয়ই আবার এসে আমাকে ধরে নিয়ে যেত।

—তা এখন তুমি কি করতে চাও ? বাড়ীর ছেলে বাড়ী ফিরে যাও।

বললাম, তা হয় না। আমি কাপালিকের সঙ্গে থেকে অনেক কিছু দেখেছি। তার যে অলৌকিক শক্তি ছিল তাও জানি। আমার তান্ত্রিক হয়ে নানা শক্তি অর্জনের সখ, আমি তান্ত্রিক হতে চাই।

গৈরিকধারী একটু ভেবে বলেন, আমি যদিও গৈরিকধারী, তবে আমি সন্ন্যাসী বা তান্ত্রিক নই। আমি তন্ত্রবিচার বই বহু পড়েছি, অনেক গুরু বিষয়ে জানি। তুমি যদি আমার আশ্রমে থাকতে চাও, তবে আমি তোমাকে রেখে অনেক কিছু শেখাতে পারি। কিন্তু এক সর্তে যে তুমি বারো বছর আমার অধীনে থাকবে।

আমি তাতেই রাজী হলাম, কারণ আমার একটা আশ্রয় চাই। সেদিনই আমি গৈরিকধারীর আশ্রমে যাব স্থির করলাম। মহিলা আমাদের জন্য গরম গরম আটার রুটি আর পাহাড়ী সবজী তৈরী করে খেতে দিল। ঘাটি মি মাখা গরম আটার রুটি আর পাহাড়ী সবজী অপূর্ব লাগল। মমতাময়ী বড় যত্নে আমাদের পরিবেশন করে খাওয়াল। আমার মায়ের কথা মনে হয়ে চোখে জল এল।

ভাবলাম দুনিয়াটা কি আশ্চর্য স্থান। এই একই অঞ্চলে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিতা পাহাড়ী মহিলা আমাকে স্নেহে মায়ের মত সেবা যত্ন করে খাইয়েছে আর অপরদিকে এক পুরুষ আমাকে মা কালীর কাছে উৎসর্গ করে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চেয়েছে। সংসারে দানবও আছে দেবীও আছে।

যাবার সময় হয়ে এল, আমি সম্পূর্ণ বিদেশী, স্বামী স্ত্রীর কাছে হাতজোড় করে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালাম। বললাম, তাদের দয়ায় আমার প্রাণরক্ষা হয়েছে—জীবনে একথা ভুলব না।

গৈরিকধারী পাহাড়ী ভাষায় সেটা ওদের বুঝিয়ে দিলে ওরা অপ্রস্তুত হয়ে বলতে লাগল, না, না, আমরা আর এমন কি করেছি। আপনি যে সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাতেই আমাদের আনন্দ, আবার আসবেন।

নীচে নামতে লাগলাম, আবার পেছন ফিরে তাকালাম, দেখলাম পাহাড়ী পরিবারটি ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের দেখছে। আমি আবার হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে হন্ হন্ করে চললাম। না, সন্ন্যাসীর মায়ার বাঁধনে জড়িত হতে নেই।

কথা শেষ হতে না হতেই দেখলাম কাকার নাক ডাকছে ভস্ ভস্ করে। ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ আর বাকী গল্পটুকু শুনবার আশা নেই ভেবে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

এই কাহিনীটুকু বলে সুস্মিত উঠে দাঁড়াল। বলে, চলি মাসীমা। আমি বলে উঠলাম, সুস্মিত, তোমার কাকার বাকী গল্পটুকু শুনবার জন্য বড় কৌতূহল জাগছে। তোমার যদি অবসর থাকে কালই একবার এসে যাও, রাত্রে এখানে খেয়ে যাবে।

'আচ্ছা' বলে সুস্মিত চলে গেল।

আমি মনে পাইচারি করতে করতে সুস্মিতের কাকা আর কাপালিকের কাহিনীটা ভাবছিলাম। কার কাকার মত কত ছেলেই তো এভাবে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় সন্ন্যাসী হতে। তারা কি সত্যিই কোন অমৃতের সন্ধান পায় যাতে তাদের কাছে সংসারের সুখ বিলাস তুচ্ছ মনে হয় ?

কিন্তু কাপালিক, ওদের জীবন তো ভীষণ, ওরা তন্ত্রমন্ত্রের ভিতর দিয়ে পরমসুন্দরের আরাধনা করে। কাপালিক তান্ত্রিক এদের কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়, ওরা নাকি অষ্টসিদ্ধি লাভ করে খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। মরা মানুষকেও নাকি কখনও কখনও বাঁচিয়ে তোলেন, লোকের অতীত নির্ণয় করতে পারেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ত্যাগী পুরুষ, তিনি তো অষ্টসিদ্ধি লাভ করতে চাননি। এরকম নানা কথা মনটাকে নাড়া দিতে লাগল।

দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ল। সেই অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গাছের পাতাগুলো সে আভায় রঙীন হয়ে উঠল। বিশ্বশিল্পীর তুলির পোঁচে নীল আকাশে অপূর্ব রং-এর খেলা চলেছে। সুস্মিত আর্টিষ্ট কি তার এককণাও ফুটিয়ে তুলতে পারবে ক্যানভাসের গায়ে ?

অগ্রহায়ণ সংখ্যা পল্লভারতী প'ড়ে বুঝলাম আমাদের দেশে আজও এমন পত্রিকা আছে যার পরিচালকবর্গ আমাদের দেশের মহান ঐতিহ্যকে, বিগত যুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়কে আমাদের সামনে তুলে ধ'রে আমাদের সচেতন-করতে চান, স্মরণ করিয়ে দিতে চান। বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিকদের দানও যে কত বড়ো ছিলো, তাঁদের সাধনা ও নিষ্ঠা যে কত গভীর ছিলো তা পল্ল-ভারতী জানিয়ে দিয়েছেন এই সংখ্যায় কয়েকজন বিগত যুগের বিস্মৃতপ্রায় লেখিকার সাহিত্য-কর্মের পরিচয় দিয়ে। এই সংযোজনটি প'ড়ে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত বোধ করেছি। বহুদিন আগে আমি এই সম্বন্ধে ব্যাপক অনুসন্ধান ক'রে আরো প্রাচীন কয়েকজন লেখিকার জীবন ও সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহ করেছিলাম। তার মধ্যে থেকে বিশেষ শ্রদ্ধেয় শতবর্ষাধিক পূর্বেকার এক লেখিকার সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধে রচনাটি পল্লভারতীর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিতে আনন্দবোধ করছি।

রমেন চৌধুরী

বিগত যুগের বরণীয়া

মহিলা সাহিত্যিক

॥ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ॥

১৮৫১-১৯৪২

সুদীর্ঘ একশ' একুশ বছর। আঠার শ' বাহান্ন থেকে উনিশ শ' তিরাত্তর খৃষ্টাব্দ—মাঝে দুঃখ সুখের বিরাট পারাবার। সেদিন আর আজ কতই না প্রভেদ। তখনকার আকাশে ছিল সম্ভাবনার বিরামবিহীন বিদ্যুৎ-বিকাশ, কিন্তু আজ? রুঢ় বাস্তবের গূঢ় ইঙ্গিতে আজ মানুষের কোন স্বপ্নই চোখে নেই। আশার প্রবাহ মরুপথে হারিয়ে-গেছে কোন্ কালে।

বাঙলা দেশের ইতিহাসে উনিশ শতকের তুলনা নেই। সারা ভারতের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করবার জন্যে যে সকল বরণীয় ও বরণীয় সন্তান বাঙলার আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, তাঁদের আবির্ভাবের পুণ্যলগ্ন হ'চ্ছে আঠার আর উনিশ শতাব্দী। এই উনিশ শতকেই অর্থাৎ ১৮৫১ সালে প্রায় সত্তর শ'বছর আগে জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর জন্ম হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র, প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্মিণী, বাঙলা সাহিত্যের লেখিকা জ্ঞানদা দেবীর পিতৃদেব অভয়া চরণ মুখোপাধ্যায় যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে তখন বসবাস করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা হ'লেন জ্ঞানদানন্দিনী। জন্মের সন তারিখ নিয়ে প্রায়শঃ নানা-রকম অসুবিধা হ'য়ে থাকে, সন্দেহ থেকে যায়—হয়ত হিসাব ঠিক হ'ল না। জ্ঞানদা দেবী সম্বন্ধে সে সন্দেহের নিরসন-করে তাঁর একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ১৩৪৮ সনের ফাল্গুন সংখ্যা প্রবাসীতে লিখেছেন: 'যশোর জেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানদা দেবীর

জন্ম। এই সালটি সমাস্ত করবার দুটি আনুষঙ্গিক উপায় আমাদের ছিল। একটি এই যে তাঁর একমাত্র পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক বৎসর আর তাঁর নিজের একুশ বৎসর বয়স একসঙ্গে আরম্ভ হয়। কারণ দু'জনের জন্মদিন একই দিনে পড়ে। আর আমার দাদার জন্মের সাল জানতুম ১২৭১, সুতরাং মায়ের হবে ১৮৪২। আর একটি এই যে, সুরেন্দ্রনাথ যখন একুশ পূর্ণ হ'লেন, তখন যে সব সরকারী কাগজ পত্র এল, তাতে লেখা ছিল, মা-বাবার বিয়ের সাল ১৮৫৯। ওদিকে শুনেছি আমার দাদামশায় মায়ের আট বৎসরে বিয়ে দিয়েছিলেন। সে হিসাবেও ১৮৫২ সালে জন্মালে ১৮৫৯-এ সাত পূর্ণ হ'য়ে আটে পড়ে। যথাসাধ্য সঠিক কথা বলতে চাই ব'লেই এই ভূমিকার অবতারণা।'.....

অসাধারণ তেজস্বী মহিলা ছিলেন জ্ঞানদা দেবী—সেটা ইন্দিরা দেবীর রচনার স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে: 'তেজস্বিতাটা দেখছি বংশগত ছিল। আমার মা সেটি উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণমাত্রায় পেয়েছিলেন।'

লেখাপড়া অবশ্য পাঠশালার অবশ্য কিছু করলেও প্রকৃত শিক্ষালাভ করেছিলেন স্বামীর আগ্রহে এবং দেবর প্রভৃতির প্রচেষ্টায়। তৃতীয় দেবর হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুরের কাছে তিনি সবিশেষ ঋণী ছিলেন, তার উল্লেখ করেছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী জ্ঞানদা নন্দিনীর কথায়: 'বিয়ের পরে আমার সেজ দেবর হেমেন্দ্রনাথ ইচ্ছে করে আমাদের পড়াতেন। আমরা মাথায় কাপড় দিয়ে তাঁর কাছে বসতুম, আর এক একবার ধমকে দিলে চমকে উঠতুম। ... আমার যা কিছু বাঙলা বিদ্যা তা সেজ ঠাকুরপোর কাছে প'ড়ে। মাইকেল প্রভৃতি সব বাঙলা বই পড়াতেন, আমার খুব ভালো লাগতো; এখনও লাগে।'

কলকাতায় এবং স্বামীর কর্মকেন্দ্র বোম্বাইয়ে নিয়মিত ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন তিনি। তখন ভারতী পত্রিকা সাফল্যের সঙ্গে প্রকাশিত হচ্ছে; জ্ঞানদা নন্দিনীর সুচিন্তিত প্রবন্ধ আত্মপ্রকাশ করল ১২৮৮ সনের শ্রাবণ সংখ্যায়। 'ইংরাজ-নিন্দা ও দেশানুরাগ' শীর্ষক রচনাটিতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমি সেদিন কি ভাবিতেছিলাম জান যে, এখন সময় নাই, অসময় নাই কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক, চারিদিকে কেবলই ইংরাজ-নিন্দা শুনা যায়। সংবাদপত্রে, সভাতে, বন্ধুদের মিলনে, পারিবারিক গল্পে ইংরাজ-নিন্দা একটি প্রধান স্থান গ্রহণ করে। ইহা আমাদের একটি চিরনূতন উপকরণ, দেশহিতৈষিতা প্রকাশের একটি অনায়াসলভ্য, সদাপ্রস্তুত সামগ্রী, তাহার একমাত্র সম্বল বলিলেও খাঁটি সত্যে বড় বেশি তাঁহে পড়ে না। এটা কি ভাল? অন্যের আলোচনায়, অন্যের দোষ সংশোধনার্থে এত অধিক সময় ব্যয় করা, আপনার প্রতি এতদূর দৃক্‌পাতশূন্যতা, এত নিঃস্বার্থপরতা কি ধর্মসঙ্গত? যাঁদের জ্ঞান, যাঁদের সদ্‌গুণ বৃদ্ধির জন্যে আমরা এত ত্যাগস্বীকার করি, তাহারা কি তজ্জন্য আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়? আমার তো তা বোধ হয় না। আর তা ছাড়া ইংরাজ জাতির সামাজিক, শারীরিক, মানসিক সর্বপ্রকার উন্নতির উপায় উদ্ভাবনে শত শত ইংরাজ-মস্তক অহর্নিশি নিযুক্ত রহিয়াছে, সহস্র সহস্র ইংরাজ তাহা কার্যে পরিণত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আমরা আমাদের মনকে ইংরাজদের উপর হইতে কখন কখন একটু সরাইয়া যদি আপনাদের উপর নিবেশ করি, তাহাতে আমরা যে বড় পাপের ভাগী হইব, কিম্বা, ইংরাজদের যে বিশেষ হানি হইবার সম্ভব আছে এমন তো বোধ হয় না।'

সুতরাং এই দুর্গন্ধ পরিহার অত্যাবশ্যক। এমন সুন্দরভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দোষ দেখান প্রশংসার সবিশেষ দাবী রাখে। জ্ঞানদা দেবী তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমালোচনাই শুধু করেননি, উক্ত প্রবন্ধে আরও বলেছেন, 'দেশের স্থানে স্থানে উপযুক্ত দেশীয় লোকের পঞ্চায়েৎ সভা স্থাপন করিয়া বিচারকার্য্য অনেক পরিমাণে হস্তগত করা যাইতে পারে। ইংরাজ কর্মচারীদের স্বজাতি-পক্ষপাত বা দেশীয় রীতিনীতি বিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ কোন দেশীয় লোক অন্যায়রূপে দণ্ডিত হইলে, তাহাকে ও তাহার পরিবারকে আবশ্যক মতে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া এবং মমতা প্রকাশ দ্বারা আমরা তাহার দণ্ডের তীব্রতা কিছু কমাইতে পারি।'

এ যেন উক্তিতে লেখিকা সম্বন্ধে এ ধারণা অনায়াসে করা চলে যে, তিনি রাজনীতিতেও কিঞ্চিৎ অধিকার রাখতেন। জ্ঞানদানন্দিনী সিভিলিয়ান স্বামীর সুযোগ্য সহধর্মী হ'য়ে উঠতে পেরেছিলেন আন্তরিক প্রচেষ্টায়। পঞ্চায়েৎ সভা প্রভৃতির প্রয়োজন অনুভব করা তৎকালীন পুরনারীর পক্ষে বিস্ময়ের বিষয় বটে।

আশ্বিন, ১২৮৮-র ভারতীতে তাঁর 'স্ত্রী-শিক্ষা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। শিশুদেরও কি ভাবে মহিলারা শিক্ষাদান করবেন তার সুচিন্তিত নির্দেশ আছে রচনাটিতে। বৎসামান্য তা থেকে উদ্ধৃত করে দিলাম :—'মাতা সর্বদাই সন্তানদের বলেন, 'ওরকম করিসনে, ওখানে যাসনে,' আর তাঁর কথা না শুনলে, মারেন, ধমকান, বলেন : 'এমন দুষ্টু ছেলেও দেখিনি—মা বাপের কথা শোনে না'। ইহাতে শিশুর মনে অনেক প্রকার বিদ্বেষের বীজ রোপিত হয়।'

আমাদের দেশে শিশুকে শিক্ষা দেয়া, মানুষ করা কতদূর কষ্টসাধ্য তা ব'লে শেষ করা যায় না। অধিকাংশ ছেলেমেয়ে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে কি রকম ভিন্নমূর্তি ধারণ করছে, তা যাঁরা একটু সজাগ দৃষ্টি মেলে রাখেন তাঁরাই লক্ষ্য করবেন। তখনকার দিনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা করা হ'ত, এখন ও-সবের বালাই নেই বললেও চলে। আমি ত' আশে পাশে অনেককে ঘুরতে দেখি, তাদের মধ্যে কম ছেলেমেয়েই দেখি প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে। এ বিষয়ে জ্ঞানদানন্দিনী অন্য প্রবন্ধ 'কিণ্ডারগার্টেন'-এ তুলনামূলক আলোচনাও করেছিলেন উক্ত ওই বছরেই 'ভারতী' পত্রিকার অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং এই পদ্ধতিতেই মানুষ করেছিলেন তাঁর পুত্র স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বর্গতা ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণীকে। প্রকৃষ্ট প্রমাণ ত' এখানেই।

জ্ঞানদানন্দিনীর অপর রচনা 'ভাউ সাহেবের বখর'—মারাঠি থেকে অনূদিত। ১৭৬১ সালে পানিপথে মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে আফগানদের যে যুদ্ধ হয়, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত তার পাঁচ ছয়টি 'বখর' অর্থাৎ ইতিহাস বিদ্যমান। লেখিকা বলেছেন—'এই ইতিহাসখানি ভারতবর্ষে মহারাষ্ট্র প্রভাবের চরম উৎকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার অবনতির পথে যাত্রার ইতিহাস। ১৭৫৯ হইতে ১৭৬১ সাল পর্যন্ত ইহার সময়।'

কৃষ্ণাজী আনায়াও ১৭৮১ সালে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন—পত্রাকারে এটি লেখা হয়। জ্ঞানদাদেবী অপূর্ব দক্ষতায় এর তর্জমা করেন, ১২৯০-৯১ সনের 'ভারতী'তে ধারাবাহিক ভাবে মুদ্রিত হয়েছিল।

এর পরের বছর 'বালক' নামে সচিত্র মাসিক পত্রিকা জ্ঞানদাদেবীর সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবন-স্মৃতি'-তে লিখেছেন :—

"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজ বউ ঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র, বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ীর বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাদের লেখায় চলিতে পারে না বলিয়া তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।'

'বালক'-এর আয়ু ছিল মাত্র একটি বছর। 'বস্তু এই এক বছরের পথ-চলা তার উল্লেখযোগ্য হ'য়েছিল। পরে 'ভারতী'-র পক্ষে 'বালক' সম্মিলিত হয়ে যায়।

জ্ঞানদানন্দিনীর হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল—শুধু মানুষের দুঃখেই তা বিগলিত হ'ত না, জীবজন্তুর কষ্টও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। দুর্গাপূজায় পাঁঠা বলির সময় ঘুরে সরে গিয়ে চোখ বুজে কানে আঙুল দিয়ে বলতেন, 'হে মা দুর্গা, আমায় উপর রাগ ক'র না।' একবার তিনি কশাইয়ের হাত থেকে গরু কিনে নিয়ে অক্লেশে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেহের চেহারা ও মনের গঠন দুইই ছিল পৈতৃক সম্পত্তি।

পরবর্তী জীবনে জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর পরম প্রিয় বাঙলার শিশুদের জন্যে দু'খানি বই লিখেছিলেন 'টাক ডুমাডুম্ ডুম্' এবং 'সাত ভাই চম্পা'। দু'খানিই নাটিকা। সুলিখিত যে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। উনিশ শ' দশ ও এগার সালে বই দুটি প্রকাশিত হয়।

'সাত ভাই চম্পা'-র শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমরা তখন সাবালক হ'য়েছি, মেজবা জ্ঞানদানন্দিনী

দেবীর উৎসাহে 'বালক' কাগজ বার হলো। তাঁর ওখানে 'লিখো ছবি ছাপার কল নিয়ে সত্যদা, হরিশ দব বসে গেলেন। সেই 'বালক'-এর আমলে একদল আমরা বড় হ'য়ে আর এক দফা বাল্য-গ্রন্থাবলী লিখতে সুরু করে দিলুম। রবিকা লিখলেন 'নদী', আমি 'ক্ষীরের পুতুল'। 'শকুন্তলা', 'রাজকাহিনী', এই সব লেখা চললো। মেজ দা-ও লিখলেন সেই সময় ছেলেদের জন্য 'সাত ভাই চম্পা' 'টাক্ ডুমাডুম্ ডুম্'।'

প্রথম জীবনে অত্যন্ত লজ্জাশীলা, মুখচোরা মেয়েটি উত্তরকালে সবিশেষ বাকপটুতা অর্জন করেছিলেন। ইন্দিরা দেবী মায়ের অতিরিক্ত লাজুকতার বিষয়ে বলেছেন, "—যার জন্যে বাবা বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে কথা বললে ঘড়ি দেখেন; আর রবিকাকা পরে বলেছিলেন যে, এখন বোধ হয় মেজদাদা তোমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে ঘড়ি দিতে রাজী আছেন।" প্রবাসী, ফাল্গুন, ৩৮৮ দ্রষ্টব্য)।

পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে জ্ঞানদানন্দিনী বিলাতে একা বাস করেছিলেন বহুদিন।

তৎকালে সাজ-সজ্জায় নতুনত্বের সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী—জ্ঞানদাদেবীর চরিত্রের এ হ'ল আর একটা দিক। সৌন্দর্যের সার্থক পূজারিণী ছিলেন আজীবন। প্রকৃতির সৌন্দর্য, মানুষের সৌন্দর্য, বেশভূষার সৌন্দর্য—সকল প্রকার সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। কথার সৌন্দর্যেরও কম ভক্ত ছিলেন না। যে গান বা কথা ভাল লাগত, লিখে রেখে দিতেন।

জ্ঞানদানন্দিনীর রচনা খুব বেশী নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন বাঙলা ভাষার পাঠকেরা। তাঁর আন্তরিক উৎসাহে ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা সাহিত্যের আরাধনায় ব্রতী হ'য়েছিলেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে কথা স্বীকার ক'রে গেছেন। কাজেই এদিক থেকেও তাঁর কাছে আমরা ঋণী।

১৩৪৮ সনের ১৫ই আশ্বিন ৯০ বছর বয়সে তিনি দিব্যধামে গমন করেছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সৌন্দর্যের উপলব্ধি তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল

এই তো মানুষ !

—নির্মলেন্দু মাল্লা

শীত শেষ হয়ে বসন্ত আসন্ন। বরফ গলছে। এইবার চাষবাস শুরু হবে। প্রচুর জমির মালিক জর্জ ওয়াশিংটন। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছেন শত শত একর জমি।

—তাহলে নোটবুকে সব লিখে নাও, জর্জ তাড়া লাগালেন ভাইকে, আমি তো আর থাকছি না, আমার অবর্তমানে তোমাকেই সব দেখতে হবে।

গালে হাত দিয়ে ভেবে বসল জন ওয়াশিংটন। একবার অবাক চোখে তাকাল জর্জের দিকে। চার হাজার একর [তিন বিঘায় এক একর] জমির মালিক ওই জর্জ আর সে কিনা চলেছে যুদ্ধে ! এমন অগাধ আয়ের ক্ষেত্র ফেলে কামানের মুখে বুক পেতে কি আনন্দ পাবে জর্জ !

বিকেল হয়ে আসছে। কাজের আর শেষ নেই। নানা পরামর্শ আর হিসেবের খাতাপত্তরের মধ্যে দু ভাই ডুবে। হঠাৎ একটা গাড়ী এসে অফিসের দোরগোড়ায় দাঁড়াল। জানলা দিয়ে দেখলেন জর্জ আর চীৎকার করে উঠলেন, মা-মা, তুমি এখানে কেন ?

মায়ের মুখখানি অম্লান, কান্নায় পরিপূর্ণ, সখেদে বললেন, অতদূর থেকে তোমায় দেখতে এলুম আর এই কিনা প্রশ্ন—কেন এলুম।

ছেলের হাত ধরে নীচের বড় হলঘরে এলেন মা, আসার উদ্বেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন, অগাস্টিন বললে তুমি নাকি সৈন্য দলে নাম লিখিয়েছ ? ওপথে যেয়ো না বাছা, যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর, কেন তুমি তোমার জীবনকে বিপন্ন করবে ! প্রতিজ্ঞা কর, তুমি যুদ্ধে যোগদান করবে না।

—আমি কথা দিয়েছি, আমায় যেতেই হবে মা, জর্জ উত্তর দিলেন।

—কামানের মুখে ধরে দেবার জন্যে কি আমি তোকে চেয়েছিলুম ? আবেগে মায়ের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল।

—এসো মা, কিছু খেয়ে নাও, অনেক দূর থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, খুব সহজ ভাবেই বললেন জর্জ, বাইরে সহজ, ভেতরে প্রতিজ্ঞা কঠিন, একটু থেমে বললেন, মৃত্যু তো একদিন হবেই, সে কথা ভাবি না, এদেশ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করা আমার কর্তব্য—আমার কামনা, আমি আমার কর্তব্য করে যাব।

মত অনুনয়েও বিচলিত হলেন না। জীবন পণ করে জাতির বাধা বিপদ দূর করতে এগিয়ে এলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

• • •

ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ চলেছে, উপনিবেশ আমেরিকাকে দখলে রাখার প্রাণান্তকর সংগ্রাম। তখনো বিপ্লব আসেনি ইংরেজের বিরুদ্ধে। তখনো জর্জ ওয়াশিংটন লড়ছেন ফরাসীদের বিরুদ্ধে।

সুউচ্চ পাহাড়, দুর্ভেদ্য অরণ্য আর উত্তাল নদী—দুর্গম দুরূহ পথ, শত্রু অদৃশ্য। কোথা দিয়ে যে জর্জ আক্রমণ করবেন বা আক্রমিত হবেন কিছুই অনুমানে আসছে না। সৈন্যদল স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে অনির্দিষ্ট কাল ধরে।

হঠাৎ শত্রু দেখা দিল সৈন্যদের মধ্যে। উন্মুক্ত প্রান্তরে সম্মুখ যুদ্ধেই তারা অভ্যস্ত। এই পাহাড়ের আড়ালে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আগমনী কামনা করে প্রতীক্ষা করতে পারল না তারা, এক মহাবিভীষিকার কামান বন্দুক ফেলে সব পালাতে লাগল। সেনাধ্যক্ষ ব্র্যাডডক কিছুতেই পারলেন না এই পশ্চাদপসরণ রোধ করতে। এক মার্কিনীর গুলিতেই অবশেষে আহত হলেন তিনি।

ব্র্যাডডকের পেছনেই ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। এইবার তিনি এগিয়ে এলেন। পরপর তিনটে ঘোড়া তাঁর সামনে নিহত হোল। আমার বিঁধল বুলেট। তিনি প্রাণপণে রোধ করতে লাগলেন সৈন্যদলের পশ্চাদগতি।

তখনো ব্র্যাডডকের প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হয়নি। তাঁরই কথায় সাতজন সঙ্গী নিয়ে চল্লিশ মাইল ঘুরে ডানবারের ক্যাম্পে ছুটলেন ওয়াশিংটন। পথ পিচ-কালো। ঘোড়া থেকে নেমে অরণ্যের মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে পথ বের করতে হোল। ভোরের মধ্যেই সৈন্যদলের রসদ নিয়ে ফিরলেন তাঁরা।

ফরাসীরা ভীত হয়ে উঠেছিল, দুর্গ ড্যুকোয়েসন অবরুদ্ধ হয় বুঝি। কিন্তু তার বদলে ইংরেজদেরই কান্বারল্যাণ্ডে ফিরতে গিয়ে সমস্ত শৃঙ্খলা ভেঙে গেল, কামান, বারুদ, আর রসদ—সব নষ্ট হোল।

কিন্তু একটি বিষয় জেগে উঠলো, আমেরিকা দেখল এক অপার্থিব বীরত্ব, সমস্ত বিশৃঙ্খলার মাঝে এক অনবনীয় শৌর্য, দেশবাসীর চিত্তে একটি মানুষের চিত্র মুদ্রিত হয়ে গেল।

ওয়াশিংটন কিছুই জানলেন না।

দেশময় রটে গেল তিনি নিহত হয়েছেন।

সেই সংবাদটি তাঁর কানে গেল, ভাইকে চিঠি লিখলেন ওয়াশিংটন : আমি আমার মৃত্যু এবং মৃত্যুকালীন অন্তিম বক্তৃতার কথা শুনলুম। আমি এই পত্র মারফত প্রথমটির বিরোধিতা করছি এবং তোমাকে নিশ্চিত জানাচ্ছি যে দ্বিতীয় বিষয়টির রচনায় আমি এখনো বসিনি।

• • •

১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ···মার্চের একটি দিন···অনেক ঘুরের খামার থেকে কৃষিকার্য পরিদর্শন করে ফিরলেন ওয়াশিংটন, দেখলেন তাঁর বারো বছরের পুত্র খেলায় মত্ত হয়েছে।

—জ্যাকি, তুমি পড়ছ না যে? ওয়াশিংটন গম্ভীর।

—মা বললেন আজ না পড়লেও চলবে, জ্যাকি উত্তর করল।

ওয়াশিংটনকে চিন্তিত মনে হোল, দ্রুত পদক্ষেপে গৃহে প্রবেশ করলেন তিনি, এক দাসভৃত্য একখানি খাম এগিয়ে দিল, সেখানি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, একবার তার দিকে তাকিয়েই শুধু বললেন, শ্রীমতি ওয়াশিংটনকে একবার আমার ঘরে আসতে বল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই দেখা গেল স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখোমুখী হয়েছেন। ওয়াশিংটন তখন শান্ত, মৃদুস্বরে স্ত্রীকে বললেন, প্যাট্‌সি, কেন তুমি ছেলেকে অত প্রশ্রয় দিচ্ছ? ওকে তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, ও এখন থেকে কাজ করতে শিখুক।

—তবে আজকের দিনটা বাইরে গেলে—কথাটা অসমাপ্ত রয়ে গেল শ্রীমতির কণ্ঠে।

—প্যাট্‌সি, ছোটবেলায় আমি ভাল লেখাপড়া করতে পারিনি বলে সারাজীবন অনুতাপ করছি আর তুমি কিনা ওর অমূল্য সময়কে বাজে খেলায় নষ্ট হতে দিচ্ছ!

শ্রীমতি ওয়াশিংটনের মাথা ভক্তিভরে নত হয়ে পড়েছে, চোখ দুটি জলে পরিপূর্ণ।

আরো কোমল হলেন ওয়াশিংটন, বললেন, কাঁদবে কেন? ছেলে বড় হচ্ছে, তাকে মানুষ করতে হবে, আরও দেখ ছেলে মানুষ করতে হলে যত না আমাদের কথা চিন্তা করব তত চিন্তা করব ওর ভবিষ্যতের কথা।

ওয়াশিংটন নিজে চললেন ছেলের জন্যে স্কুল দেখতে, শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে সন্ধান নিলেন, শিক্ষকদের আদর্শ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন, অবশেষে জ্যাকি ভর্তি হোল রিচমণ্ডে ডেভারেণ্ড জোনাথন বুচারের বিদ্যালয়ে।

• • •

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ঘুমায়িত হয়ে উঠছে আমেরিকার অন্তরে, নিত্য নূতন অত্যাচার, ট্যাক্সের দুর্বহ বোঝা, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অচল প্রায়। ওদিকে কানাডায় মার্কিন সেনাপতি ফরাসীদের হাত থেকে দুর্গ নিয়েছেন অধিকার করে। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত সাহস মার্কিণ কংগ্রেস মহলে আসছে।

কিন্তু যুদ্ধ করবে কে? কোথায় সৈন্য? কোথায় সেনাধ্যক্ষ।

বোষ্টন অবরোধ করেছিলেন জেনারেল আর্টেমাস ওয়ার্ড। কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের সৈন্যরা তো তাঁকে মানবে না।

তাহলে আর কে রইলেন? জাতির এতবড় দুর্দিনে কে হবেন সর্বাধিনায়ক! জন হ্যানকক কিংবা চার্লস লি?

কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হোল। উঠে দাঁড়ালেন জন অ্যাডামস্, বললেন, ভার্জিনিয়ার একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি আছেন, তাঁকেই সংযুক্ত মার্কিন সৈন্যদলের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত করা হোক।

কথাটা উঠতেই এক মুনিঋষি পরিহিত লোক উঠে দাঁড়ালেন, দ্রুতপদে লাইব্রেরীতে চলে গেলেন।

তিনি আর কেউ নন—জর্জ ওয়াশিংটন। তিনি জানতেন এখনি বিরোধিতার ঝড় উঠবে। সেটা যাতে ভালোভাবে উঠতে পারে তারই সুযোগ দিলেন।

ভার্জিনিয়ার অধিবাসীরাই আগে থেকে বলল, কি করেছেন উনি ? এপর্যন্ত একটা গুলিও ছুঁড়তে পারেন নি।

তাছাড়া পরিষ্কার বোঝা গেল নিউ ইংল্যাণ্ডের সৈন্যরাও তাঁর সঙ্গে যোগ দেবে না। কোথায় কে এক কৃষিজীবী, সে কিনা হবে জাতির কর্ণধার ! অসম্ভব ! অবিশ্বাস্য !

এডা জন অ্যাডামস্ তুলে ধরলেন ওয়াশিংটনের বীরত্ব গাথা, তাঁর মহত্বের কাহিনী।

অবশেষে মার্কিণ সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ক পদে বৃত হলেন জর্জ ওয়াশিংটন।

অজস্র আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তিনি ফিরে এলেন তাঁর আপন গৃহে, নিমগ্ন হলেন গাঢ় চিন্তায়, এ কী বিপুল দায়িত্ব এল তাঁর স্কন্ধে ! এতদিন তিনি ছিলেন ইংরেজদের সৈন্য, আর আজ কিনা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে যে জাতি তারই পক্ষ নেবেন ! তাহলে কি রাজশক্তির প্রতিভূ ভাবি কোয়ারক্যাঙ্কের সঙ্গে আত্মিক বিচ্ছেদ আসন্ন হয়ে এলো ?

কাগজ টেনে নিলেন তিনি, খসখস করে লিখলেন কোয়ারক্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে :

এক ভাই-এর তরবারী আজ আর এক ভাই-এর বুকের ওপর নেচে উঠেছে, ভাবতেও কষ্ট হয়, কিন্তু আজ তো দুটি পথের একটিকে বেছে নিতেই হবে, হয় সংঘর্ষ—রক্তপাত—বিপ্লব, নয় পরাধীনতা। যে কোন নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন লোক এর প্রথমটিকে বেছে নিতে ইতস্ততঃ করবে কি !

•

জর্জের ঘরে প্রবেশ করলেন তাঁর ব্যক্তিগত সচিব।

এমন অসময়ে—হঠাৎ—কি ব্যাপার ! অনেক কিছুই ভাবছিলেন তিনি, গত দু বছরে অনেক পরিবর্তন এসেছে জাতির জীবনে। একদিকে এক একটি রাষ্ট্র সরকার এবং বিচারালয় গঠন করে চলেছে। অন্যদিকে অন্তর্দ্বন্দ্ব গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে জাতির জীবনে।

—ফিলাডেলফিয়া থেকে সংবাদ এসেছে জেনারেল, সচিব পত্রখানি রাখলেন টেবিলের ওপর। পোছনের দরজা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। যেন তিনি পত্রখানি বের করেছেন অমনি লক্ষকণ্ঠের কলধ্বনি উঠছে বাইরে থেকে। কথা কয়েকটি পড়েই জর্জ ছুটলেন হলের মধ্য দিয়ে, সামনেই পড়ল জোসেফ রীড। সমস্ত রীতিনীতি বিস্মৃত হয়ে রীড ধরল তাঁর হাতখানি, চীৎকার করে উঠল, স্বাধীন ! আমরা এখন স্যার স্বাধীন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী।

স্থির, নিষ্কম্প জর্জ ওয়াশিংটন। একথায় কি নিহিতার্থ ! একটি নতুন জাতির জন্ম হচ্ছে—চারিদিকে তার মৃত্যুর বিবর্ণ রূপ—অসহায়তা—তারই মাঝখানে নবজীবনের আশ্বাস।

জর্জের হৃদয় ভরে উঠল নব উদ্দীপনায়, চোখ দুটি বেয়ে নেমে এলো আনন্দাশ্রু।

বাইরে কে যেন গর্জন করে উঠল, নিপাত যাক রাজা জর্জ !

সংগ্রাম প্রবলতর হোল।

• •

অস্ত্র নেই, আহার্য নেই, নেই বস্ত্র-বাসস্থানের বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা, লড়বে কারা, কিসের জোড়ে লড়বে ! সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা বিপর্যস্ত—সৈন্যবাহিনী সুগঠিত সুসংবদ্ধ নয়—আবার তারই মধ্যে প্রবেশ করেছে মারাত্মক বিভেদ।

বিদেশের সাহায্য কি মিলবে ? বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা কি নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সহযোগিতায় নতুন করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না ?

জর্জ চিন্তা করলেন,জাতিকে সচেতন করতে হবে তাঁর সৈন্যদলের সম্মুখে আসন্ন বিপদের বার্তা জ্ঞাপন করে।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ···মার্চমাস···ভর্জ খবর পেলেন তাঁর নিজেরই ক্যাম্প উড়ে যেতে বসেছে ডিনামাইটের বিস্ফোরণে, সৈন্যদলে বিক্ষোভ এত বিপুল। কংগ্রেসে প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছে তারা, বেতন বাকী পড়েছে, বোনাস নেই, এর প্রতিকার চাই।

কংগ্রেস অসহায়, কংগ্রেস নীরব। কোথায় মিলবে এত অর্থ।

গোপন অধিবেশন বসছে সৈন্যদের মধ্যে।

হলের মধ্যে প্রবেশ করলেন তেতাল্লিশ বৎসরের এক সবল দীর্ঘকায় পুরুষ। কিন্তু একী! কপালে বলিরেখা, মুখে অপ্রসন্ন বিষণ্ণতা, কী ধীর গম্ভীর রূপ তাঁর!

ভর্জ ওয়াশিংটন অনুনয় জানালেন সৈন্যদের কাছে, জানি অভাব আছে, অভিযোগ আছে, কিন্তু এই দীর্ঘ, জটিল এবং দুঃসহ পরিবেশের মধ্যেই আর একবার অতুলনীয় দেশভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে।

এক বিধবা সৈনিকের পত্র পাঠ করতে গেলেন ভর্জ, পারলেন না, কোটের পকেট থেকে চশমা বের করলেন, মৃদু হেসে বললেন, ভদ্র-মহোদয়গণ, আপনাদের সেবার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, আমার চুল ধূসর হয়ে এসেছে আর দৃষ্টিশক্তি—ক্ষীণ।

বিদ্রোহ প্রশমিত হোল।

• • •

জাহাজে করে ইংরেজরা নিউইয়র্ক বন্দর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, প্যারিসে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, অ্যানাপোলিসে কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে, সর্বত্র জাতির অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে ভর্জ ওয়াশিংটন চলেছেন কংগ্রেসের হাতে তাঁর দায়ভার সমর্পন করতে।

হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করলেন ভর্জ। এক আবেগমুখর ভাষণ দান করলেন, এক বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে তাঁদের অভ্যুত্থানের কথা বলতে গিয়ে সমস্ত শ্রোতার হৃদয়ে নবরোমাঞ্চ এনে দিলেন। পরিশেষে বিদায় প্রার্থনা করলেন কংগ্রেসের কাছ থেকে।

তাঁর অসামান্য শৌর্যের কথা স্মরণ করে সকলের চোখ সজল হয়ে উঠল।

• • •

শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সভা আহূত হোল। সভাপতিরূপে মনোনীত হলেন ভর্জ ওয়াশিংটন। কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রের অধিকার নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দিল। জনবহুল রাষ্ট্রগুলি দাবী করল জনসংখ্যার অনুপাতে কেন্দ্রে সদস্যপ্রেরণের অনুমতি ছোট রাষ্ট্রগুলি বিদ্রোহ করল তার বিরুদ্ধে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র অন্তর্বিপ্লবের সম্মুখীন হোল।

সমস্ত বিতর্কের মাঝখানে সকলেই ফিরে চাইলেন এক নিরপেক্ষ অচঞ্চল ব্যক্তির দিকে, যিনি সুদীর্ঘ আট বৎসর ধরে সংগ্রাম করছেন এক অনাহার ক্লান্ত অর্ধশিক্ষিত সৈন্যদল নিয়ে, যিনি জাতিকে এনে দিয়েছেন তাদের প্রার্থিত মুক্তি।

অবশেষে খসড়া শাসনতন্ত্র গৃহীত হোল।

এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় আলেকজাণ্ডার স্পটসউডকে পাঠালেন ভর্জ নিতান্তই ব্যক্তিগত পত্র: আমার মনে হয় একজন কৃষকের জীবনই সবচেয়ে আনন্দের। যে গাছ পুঁতেছিলাম তাকে বড় হতে দেখা, তাকে ফলবান হতে দেখা, এতে যে ভাবের উদয় হয় তা অনুভব সাপেক্ষ —ব্যক্ত করা দুষ্কর।

• • •

এপ্রিলের একটি সকাল। মাউন্ট ভার্ণনের এক সুন্দর মহলে সকলে সমবেত হয়েছেন মিঃ টমসনকে অভ্যর্থনার জন্যে।

হলের মধ্যে মিঃ টমসনের কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠল, জাতি তার প্রথম প্রেসিডেন্টরূপে মনোনীত করেছে ভর্জ ওয়াশিংটনকে।

ভূ'পা এগিয়ে এলেন ভর্জ। সকলে স্তব্ধ। তিনি অভিবাদন করলেন সকলকে, বললেন, আমার উপরে জাতির এই নির্ভরতায় এবং আস্থাপ্রকাশে আমি যে কতখানি কৃতজ্ঞ তা একমাত্র নীরবতাই প্রকাশ করতে পারে। আমি এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করতে পারি সৎ প্রচেষ্টার দ্বারা যা করা সম্ভব আমার দ্বারা তাই কেবল মাত্র সম্পাদিত হবে।

মাউন্ট ভার্ণন থেকে বিদায়ের কাল আসন্ন হয়ে উঠল। রইল পড়ে কৃষিক্ষেত্র, রইল নতুন ফসলের প্রাচুর্য পর্যবেক্ষণ, ওয়াশিংটন যাবেন প্রথম প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করতে।

মায়ের কাছে বিদায় নিতে এলেন ভর্জ। আবার কবে দেখা হবে কে জানে! আদৌ হবে কিনা কে বলতে পারে! শত স্মৃতিতে ঘেরা এই মায়ের কক্ষ, এই মাউন্ট ভার্ণন। ছেলের দিকে একবার গর্বভরে তাকালেন মেরি বল ওয়াশিংটন। বিচ্ছেদের কাল সমাগত! তবু কান্না নেই কোন চোখে। প্রসন্ন হাসিতে বিদায় দিলেন মা। ওয়াশিংটন যাত্রা করলেন নতুন পথে —যাত্রা করলেন জাতিকে চালনা করতে নতুন পথে।

বিস্মৃত বৈজ্ঞানিক

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আবিষ্কারের সঙ্গে আবিষ্কারকের নাম জড়িয়ে সারা পৃথিবীতে সেই নাম পরিব্যাপ্ত হয়েছে—এমন নজীর পৃথিবীতে বেশী নেই!

আবিষ্কারের নামটি জানি—কিন্তু সেই নামের পিছনে যে মানুষটি ছিলেন তাঁর জীবনের নাটকীয় ঘটনা, মর্মন্তুদ-কাহিনী, কজনই বা জানেন বা জানবার চেষ্টা করেছেন।

আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছেন পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সাধক ও আবিষ্কারক।

তাঁর জীবনের যে অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ও চাঞ্চল্যকর পরিণতি ঘটেছিল সে সম্বন্ধে মাত্র কয়েকদিন কাগজে কাগজে কিছু লেখা বেরিয়েছিল, তারপর আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাননি। রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

১৯১৩ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর দেশত্যাগী ডঃ রুডলফ ডিজেল জাহাজে চেপে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করছিলেন।

লণ্ডনে বড় বড় ব্যবসায়ীদের এক সভায় যোগদান এবং সেই সঙ্গে সেই বিভাগের কর্তাদের সঙ্গে কয়েকটা জরুরী বিষয়ের আলোচনার জন্যে তিনি প্যারিস থেকে লণ্ডন যাচ্ছিলেন।

রাত দশটায় বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি তাঁর কেবিনে গেলেন।

পরদিন সকালে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। অনেক খোঁজাখুজি, বিস্তর তদন্ত—সবই ব্যর্থ হল। তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধানে কয়েকদিনের জন্যে সারা বিশ্বে এক আন্তর্জাতিক সোরগোল পড়ে গেল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধলো তখন গুজব রটল, জার্মান গুপ্তচররা গোপনে তার জাহাজে উঠে তাঁকে খুন করে গুম করেছে—যাতে তিনি তাঁর বিখ্যাত ইঞ্জিন ও সেই সংক্রান্ত আরও সব মহামূল্যবান তথ্য ও গবেষণা ইংরাজদের জানাতে না পারেন।

তাঁর মৃত্যুর সেই অসমাপ্তি রহস্য ক্রমে লোক ভুলে গেল। ডঃ ডিজেল বা তাঁর জীবন সম্বন্ধে বর্তমানকালের পাশ্চাত্যদেশের মানুষের কোন খোঁজই রাখে না। অথচ নিঃসংশয়ে তিনি ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কারকদের মধ্যে অন্যতম।

তাঁর নাম আজ বিংশ শতকের শেষ অংশে একটি সাধারণ কমন নাউন-এ পরিণত: 'ডিজেল' বলতেই একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কলকব্জার যন্ত্রকে আমাদের মনে পড়ে। "ডিজেল এঞ্জিন"। এই এঞ্জিন আজ পৃথিবীর যন্ত্রশালাকে নানাভাবে মুখরিত করে চলেছে, ডিজেল লাইনার সপ্তসমুদ্র মন্থন করে বেড়াচ্ছে, ডিজেল লরি ও বাস পৃথিবীর পথঘাট প্রকম্পিত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ডিজেল বিমান দেশ-বিদেশের আকাশে উড়ছে, ডিজেল ট্রাকটার মাটি চষছে বিভিন্ন দেশে।

এই যন্ত্রচালনাশক্তির আবিষ্কারক রুডলফ ডিজেল জন্মেছিলেন ১৮৫৮ সালে এক জার্মান কারিগরের ঘরে।

জন্ম থেকেই অদ্ভুত মেধার অধিকারী—যেন দৈবশক্তি সম্পন্ন!

বিশ বছর বয়সে মিউনিক কারিগরি মহাবিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় তিনি রেকর্ড নম্বর সংগ্রহ করলেন। চমৎকৃত হলেন সেই বিদ্যায়তনের শিক্ষকবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষ। অভিনন্দনের পর অভিনন্দন পেলেন তিনি!

তারপর শুরু হল তাঁর সাধনা।

দিন যায়, রাত্রি আসে। কিন্তু সে খেয়াল সাধকের নেই। টেবিলের উপর স্তূপাকার কাগজপত্র আর নানা

রকমের ছোটখাটো যন্ত্রপাতি নিয়ে মাসের পর মাস ডিজেল তাঁর সাধনায় মগ্ন রইলেন।

১৮৯৩ সালে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন। তার মধ্যে তাঁর নবাবিষ্কৃত ইনজিন সম্বন্ধে সার তথ্যসমূহ উদ্ঘাটিত হল। কিন্তু সেই দুরূহ সাধনার ফলশ্রুতির অর্থ বোঝবার মত যোগ্য লোক কোথায়? অনেকে তো তাঁকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলে। তাঁর নাম দিলে—কাণ্ডজে আবিষ্কারক; তাঁর ইনজিনের নাম দিলে—কাগুজে ইন্‌জিন।

হতাশ হলেন ডিজেল। ভেঙে পড়লেন। কিন্তু হতাশ হলে তো চলবে না! তাঁকে সিদ্ধিলাভ করতেই হবে। কিন্তু তাতে যে অনেক টাকার প্রয়োজন। নিজের যা কিছু ছিল সব ঢেলে দিয়েছেন তাঁর আবিষ্কারের পিছনে। এখন আরো টাকা চাই। অনেক টাকা। তা না হলে তাঁর এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হবে। এখনি অন্তত তিন চার রকমের মডেল তৈরী করা চাই। প্রয়োজন মোটা টাকার।

বিখ্যাত যন্ত্রব্যবসায়ী ক্রুপ তাঁর কাগজপত্র পরীক্ষা করে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর কাজে টাকা লাগাতে রাজী হলেন।

১৮৯৩ সালের শেষে প্রথম ডিজেল এনজিন ধোঁয়া ছেড়ে রাস্তায় বেরুলো। সেদিন চারিদিকে কি কলরব আর উত্তেজনা। আবেগে আর অস্থিরতায় ডিজেল প্রায় মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

পরীক্ষা সফল হল। সার্থক হল বৈজ্ঞানিকের সাধনা। বারো বছরের মধ্যে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেল তাঁর অনন্যসাধারণ কর্মকৌশল-প্রসূত ডিজেল মোটর। তারপর পনেরো বছর ধরে তিনি নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে নানা আকারের যন্ত্র তৈরী করলেন।

যশ পেলেন প্রচুর। অর্থ প্রচুরতর। ছোট বাসা থেকে উঠে এলেন নিজের নবনির্মিত প্রাসাদোপম সুরম্য ভবনে। মিউনিকের শ্রেষ্ঠ নাগরিক রূপে সম্বর্ধিত হলেন। বিভিন্ন দেশে তাঁর ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থাপিত হল। টাকা আসবার বিরাম রইল না। বিরাট বিরাট কারখানা। বহু লোকজন। কল্পনাতীত খরচের মাত্রা।

১৯১২ সালে ডিজেল মার্কিণ মুলুক সফর করলেন। অভিনন্দন আর সম্বর্ধনা। জগৎ জোড়া খ্যাতি। জগৎ-ব্যাপী একটি নাম—ডিজেল।

কিন্তু তখন কে অনুমান করতে পেরেছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর জীবনে নেমে আসবে চিরকালের কালো যবনিকা।

দুই বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সেদিন ইংলিশ চ্যানেলের উপর দিয়ে লণ্ডন চলেছেন। নিজস্ব ইয়াচা করা জাহাজে।

এক বন্ধুর নাম স্যর চার্লস্ ক্যারেলস্। মেণ্ট শহরে অবস্থিত ডিজেল ফ্যাক্টরির কর্তা ক্যারেলস ছিলেন ডিজেলের অন্তরঙ্গতম বন্ধু। তিন বন্ধুতে নৈশভোজ সমাধা করে কিছুক্ষণ ডেকের উপর বেড়ালেন। তারপর যে যার কেবিনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন।

কয়েক মিনিট পরে ক্যারেলস-এর কেবিনের দরজায় টোকা দিয়ে ডিজেল তাঁকে ডাকলেন। বন্ধু দরজা খুলে দাঁড়াতেই ডিজেল আবেগের সঙ্গে তাঁর করমর্দন করলেন। স্নেহের সুরে শুভরাত্রি জানালেন। তাঁর সেই আকস্মিক আবেগপূর্ণ আচরণে ক্যারেলস কিছু বিস্মিত হলেন।

'কাল সকালে দেখা হবে। কাল সকালে।' এই বলে ডিজেল দ্রুত প্রস্থান করলেন।

ব্যস! সেই তাঁর শেষ কথা।

পরদিন সকালে তাঁর দেখা পাওয়া গেল না।

কেবিনের মধ্যে দেখা গেল, তাঁর রাতের পোষাকটি পাট করে রাখা আছে বালিসের উপর। হাত ঘড়িটি ঝুলছে মাথার শিয়রে দেওয়ালের গায়ে।.....

সপ্তাহ খানেক পরে এক ডাচ জাহাজ একটি ভাসমান মৃতদেহ টেনে তুললে। চেনবার উপায় নেই। বিকৃত বিকৃত দেহ। পাতলুনের পকেট থেকে পাওয়া গেল মনিব্যাগ, চশমার খাপ আর নাম খোদাই করা ছোট ছুরি। ডিজেলের দেহ।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বেগে নানা গুজব ছুটলো। জার্মান গুপ্ত বিভাগের লোকেরা নাকি সুবিধা পেয়ে তাঁকে ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছে! কোন এক জার্মান কাগজে লেখা

হল : দেশদ্রোহী ফডলফ ডিজেল তার উচিৎ প্রাপ্য পেয়েছে।

নানা ধরণের কাল্পনিক কাহিনীর সৃষ্টি হল তাঁর অপঘাত মৃত্যুকে ঘিরে।

আসল তথ্য প্রকাশ পেল বহু বছর পরে তাঁর ছেলে ইউজীন ডিজেলের লেখা "পিতার জীবন-চরিত"-এর পাতায়!

শেষের দিকে বাহ্যিক আড়ম্বর আর প্রাচুর্যের আড়ালে ডিজেল অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জীবন যাপন করছিলেন। ঋণের দায়ে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাঁধা পড়েছিল। আসন্ন অপমানের আত্মগ্লানিতে দিশাহারা হয়েছিলেন তিনি।

আরও টাকার নেশায়, ব্যবসাকে আরও বড় করার উচ্চাশায় তিনি জুয়া খেলে ভিতরে ভিতরে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর জানা যায় প্রায় এক লক্ষ পাউণ্ড তাঁর ঋণ। অনেক সম্পত্তি ইতিমধ্যে ক্রোক হয়েছিল। বাকি যা ছিল তার মূল্য তিরিশ চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের বেশী নয়।

কিন্তু সেটা বড় কথা ছিল না। বড় ছিল তাঁর কাছে তাঁর মান সম্ভ্রম। মানসম্ভ্রম নষ্ট হবার আশংকায় ভিতরে ভিতরে তিনি যেন পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।

মর্মাহত হয়ে তাঁর এক ধনী ব্যবসায়ী বন্ধু বলেছিলেন, এ তো সামান্য ব্যাপার! ডিজেল যদি ঘুণাক্ষরেও একবার তাঁর অবস্থার কথা আমায় জানাতেন!

কিন্তু গর্ব আর আত্মাভিমান ডিজেলকে যেন শেষ দিন পর্যন্ত গ্রাস করে রেখেছিল।

কয়েক সপ্তাহে আগে পিতা পুত্রের মধ্যে একদিন নানা প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্যে ডিজেল পুত্রকে প্রশ্ন করলেন, কী কী উপায়ে মানুষ সাধারণত আত্মহত্যা করে এবং কোন্ পথটা সহজ বলে মনে করে। উত্তরে পুত্র সরল মনে বলেছিলেন, সমুদ্রবক্ষে চলমান জাহাজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরাই সব চেয়ে সহজ পথ।

তখন পুত্র কি জানতেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর পিতার মনে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ প্রবাহিত হচ্ছে!

লড়াই জেতা যায় বুদ্ধি দিয়ে

ভরদ্বাজ

অস্ত্রশস্ত্র, কামান, বন্দুক, বোমা, বিমান—এসব তো আছেই। কিন্তু তাঁর সঙ্গে অপ্রত্যক্ষভাবে যে-বস্তু যুদ্ধজয়ের জন্যে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে, তা হল—বুদ্ধি!

এক এই বুদ্ধির জোরে অনেক হারা-লড়াই জেতা হয়েছে, অধিকতর পরাক্রমশালী শত্রুকে ঘায়েল করা হয়েছে!

লর্ড ওয়েলিংটন খুব ভাল ক্রিকেট খেলতেন। বুদ্ধির সঙ্গে ব্যাট করতেন, বুদ্ধি খাটিয়ে বল করতেন। তেমনি বুদ্ধি খাটিয়ে বুচারকে হাত করে তিনি নেপোলিয়নকে হারিয়ে ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় করেছিলেন। ইংরেজীতে একটা কথা চালু হয়েছিল—The battle of Waterloo was won on the Cricket field of Eton.

অর্থাৎ বিলাতের সম্ভ্রান্ততম বিদ্যায়তন ইটন-এর ক্রিকেট মাঠে ওয়েলিংটন যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন তারই জোরে তিনি বুদ্ধিবলে নেপোলিয়নকে হারিয়েছিলেন।

শুধু যুদ্ধে নয়—প্রমোদে সম্ভোগে রাজদরবারে—অনেক মন্ত্রী বা পারিষদের অসাধারণ বুদ্ধির অনেক কাহিনীই তো আমরা শুনেছি।

আকবরের সভারত্ন বীরবলের কাহিনীগুলির মধ্যে যে অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ আছে, সারা পৃথিবীতে বুদ্ধির গল্প হিসাবে তার তুলনা নেই—একথা আজ প্রাচ্যে পাশ্চাত্যে সর্বত্র স্বীকৃত।

আমাদের রাজ্যের এক জগৎ-বিখ্যাত কবি—তাঁর সম্বন্ধেও নানা গল্প আছে। বিপরীতধর্মী ব্যাখ্যান।

তাঁকে গৃহস্থালীর কাজে বলা হয়েছে বন থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এসো। তিনি বনে গিয়ে একটা উঁচু গাছের ডালে বসে সেই ডালটাই কাটতে লাগলেন!

আবার তাঁর আশ্চর্য বুদ্ধির কাহিনীও অনেক আছে। যেমন তিনি তাঁর প্রতিপালক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্মান বৃদ্ধি করলেন এমন এক উপায়ে যা যেমন কৌতুককর তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত—এমনি একটি কাহিনী তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত!

বিক্রমাদিত্য একটা ব্যাপারে বড়ই ঈর্ষাপরায়ণ। প্রতিবেশী রাজ্যের ভোজরাজ একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। এ চ্যালেঞ্জ লড়াইএর নয়, বাহুবলের নয়, বিদ্যার চ্যালেঞ্জ! শ্লোক রচনা করার চ্যালেঞ্জ! ভোজরাজ নাকি এমনি স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যে তাঁর কাছে কেউ কোন শ্লোক বললেই তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি পুনরাবৃত্তি করে বলেন, এ তো আমার জানা—এ ঘটনাও জানা। এ শ্লোক নতুন নয়। যে আমাকে নতুন শ্লোক শোনাতে পারবে তাকে আমি হাজার স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব।

হাজার স্বর্ণমুদ্রার আশায় বহু পণ্ডিত ভোজরাজের সভায় গিয়ে শ্লোক বললেন। কিন্তু প্রত্যেকটি শ্লোক, তা সে যত দীর্ঘই হোক, রাজা আবৃত্তি করে বলেন, এ আমার জানা আর শ্লোকে যে ঘটনা বা যে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তাও আমার জানা। শুধু আমি কেন, আমার প্রধান মন্ত্রীও জানেন।

সুতরাং সকলেই পরাস্ত হয়ে ফিরে এলেন।

ভোজরাজের এই কাণ্ডকারখানা শুনে একদিন সভায় বসে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সখেদে বললেন, ভারত কি সত্যিই পণ্ডিতশূন্য হল? ভোজরাজকে ভোজবাজী দেখিয়ে কেউ কি এই স্বর্ণমুদ্রা জিতে আনতে পারে না?

এই বলে তিনি চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, মহাকবি কালিদাসকে দেখছিনা কেন ? তিনি কোথায় ?

একজন অমাত্য বললেন, তিনি বাড়িতেই আছেন মহারাজ। কাব্য রচনা করছেন।

ঢের কাব্য রচনা হয়েছে, আর কাজ নেই। ডেকে আনো তাঁকে !

একজন অমাত্য গিয়ে কালিদাসকে ডেকে নিয়ে এলো। সভায় প্রবেশ করে কালিদাস একটি শ্লোক বললেন, যার তাৎপর্য, কপোত কপোতীর সহবাসকালে যদি কেউ তাদের লাঠি উঁচিয়ে তাড়িয়ে দেয় তাহলে প্রকৃতির কাছে সে মানুষ হয় ঘোরতর অপরাধী। তেমনি কোন কবির শৃংগার-রসাশ্রিত কাব্য রচনার সময় যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় তাহলে তাও হয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ।

মহারাজ হেসে বললেন। শৃংগার রসে তো ডুবে আছেন ! এদিকে আমার মান যে যায় !

কালিদাস আবার শ্লোক বললেন, সূর্যের মান যেমন কেউ নষ্ট করতে পারে না তেমনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের মানও কোন নশ্বর মানব খর্ব করতে পারবে না।

মহারাজ তখন ভোজরাজের প্রেরিত চ্যালেঞ্জের কথা কালিদাসকে বললেন।

কালিদাস বললেন, এই কথা ! মহারাজ যদি অনুমতি দেন তো আমি এখনি ভোজরাজ্যে রওনা দিই এবং ঐ এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পেটিকায় ভরে নিয়ে ফিরে আসি। যেমন করেই হোক অর্থটা হস্তগত করবই আমি !

মহারাজ বললেন, কিন্তু কবিবর, আপনি যদি বিফল হোয়ে ফিরে আসেন তাহলে যে আমার লজ্জা আর দুঃখের শেষ থাকবে না ! ভারতবর্ষের নানা রাজ্যের বড় বড় পণ্ডিত সব এসেছিলেন কিন্তু কেউই স্বর্ণমুদ্রা জিতে নিতে পারেন নি।

কালিদাস বললেন, উজ্জয়িনীর কবির সাক্ষাৎ তো ভোজরাজ পান নি এখনো !

মহারাজ বললেন, তাহলে আপনি যাবেনই ?

কালিদাস উত্তর দিলেন, মহারাজ হাসিমুখে যদি আজ্ঞা করেন তবেই যাব। মহারাজের চিত্ত জানেন, সেই তো পরম বরাভয় !

কালিদাসের কথা শুনে হেসে ফেললেন মহারাজ বিক্রমাদিত্য !

* * *

কালিদাস ভোজরাজার রাজ্যে পৌঁছোলেন।

যথাসময়ে তাঁকে রাজসভায় আহ্বান করা হল। সভায় প্রবেশ করে কালিদাস দেখলেন, সিংহাসনে ভোজরাজ রাজকীয় উন্নত মহিমায় সমাসীন। তাঁর আশে পাশে মন্ত্রী ও পারিষদবর্গ।

কালবিলম্ব না করে কালিদাস শ্লোক আবৃত্তি করলেন :

"ভোজরাজ ! আপনার মঙ্গল হোক। আপনার বিদ্যাবত্তা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়নিষ্ঠা ভুবনবিখ্যাত। আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে মহারাজ যে, আপনার মহামহিম পিতৃদেব আমার কাছ থেকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ঋণস্বরূপ নিয়ে আজও তা আমাকে পরিশোধ করেন নি। এখন মহারাজ অনুগ্রহ করে তা আমায় দিলে, আমি বড়ই উপকৃত হব।

পদ্যে রচিত পরম উৎকৃষ্ট সংস্কৃত শ্লোক ! ভাষার কারুকার্যে ছন্দে মিলে—অপূর্ব ! ঋণ লেনদেনের গদ্যময় ব্যাপার—কিন্তু কালিদাসের বর্ণনায় তা শুষ্ক কাষ্ঠং নয়—নীরস তরুবর !

কালিদাসের শ্লোক শুনে মহারাজের মাথা ঘুরে গেল ! এ শ্লোক তো আগে শোনেন নি। এখন যদি বলেন, শুনেছেন, তাহলে কালিদাসের কাছে তাঁর পিতার ঋণ স্বীকার করতে হয় এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা তখনি দিতে হয়। যদি বলেন শোনেন নি তাহলে তাঁর প্রতিভার খ্যাতি নষ্ট হয় এবং সে ক্ষেত্রেও হাজার স্বর্ণমুদ্রার বাজি তাঁকে হারতে হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি বলে ফেললেন, পণ্ডিতজী, আমি তো জানি না যে আমার পিতা কোন সময় আপনার কাছ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন। আপনার কথা শুনে আমি খুবই বিস্মিত বোধ করছি।

কালিদাস হাসলেন। বিজয়ীর হাসি। বললেন, মহারাজ ! বিস্মিত হবারই তো কথা ! এ আমার নতুন

এক শ্লোক—আপনি জানবেন কেমন করে। সুতরাং যখন নতুন শ্লোক আপনাকে শোনাতে পেরেছি তখন আপনার প্রতিশ্রুতি মতো এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমায় প্রদান করুন।

ভোজরাজ বুঝলেন, তিনি মোক্ষম প্যাঁচে পড়েছেন। উভয় সংকট! শ্লোকটি জানা বললে, পিতার ঋণ স্বীকার করে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। জানা নয় বললেও এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

অবাক হলেন ভোজরাজ। কী বুদ্ধি আর রচনাকৌশলেরই না পরিচয় দিলেন কালিদাস! সত্যিই মহাকবি কালিদাস! শুধু কি কবি! কবি চূড়ামণি!

গুণগ্রাহী ছিলেন ভোজরাজ। যথোচিত সম্মান দেখালেন উজ্জয়িনীর কবিকে! শুধু এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রাই নয় আরও উপঢৌকন দিলেন তাঁকে!

উজ্জয়িনীতে ফিরে কালিদাস যখন মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সামনে সহস্র স্বর্ণমুদ্রার থলিটি আর উপঢৌকনগুলি রাখলেন তখন তাঁর জয়ধ্বনিতে সভাতল মুখরিত হল।

স্বয়ং মহারাজও সেই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন!

• • •

কালিদাসের কালে আমাদের দেশে সৌন্দর্যচর্চা ও শিল্পসংস্কৃতির প্রসার চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সেকাল' নামে কবিতাটির মধ্যে কবিকল্পনার সাহায্যে সেকালের আচার ব্যবহার বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনার সমাবেশ করে একটি চমৎকার পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। কাল ও দেশের ব্যবধান সেদেশের ও সেকালের কোনো সৌন্দর্যকে একালের কবিচিত্ত থেকে দূরে রাখতে পারেন নি। কালিদাসের বর্ণিত তাঁর সময়ের চিত্র পরম্পরা রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণতার সঙ্গে নিজের কবিতার মধ্যে গ্রথিত করেছেন।

দ্রষ্টব্য :—ক্ষণিকা কাব্যের 'সেকাল' (১৩০৬) কবিতা। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবিরশ্মি দ্বিতীয় খণ্ড।

ঠাকুর-পরিবারের নাট্যাভিনয়

আদিপর্ব : জোড়াসাঁকো

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জীবনচর্চায় ও চিন্তায় যে নবযুগের সূচনা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিবারের পূর্বসূরিরা ছিলেন তার অগ্রদূত।

নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে এই পরিবারের অনেকেই, বলতে গেলে গোটা পরিবারই নাট্যাভিনয়ের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁদের মনে হয়েছিল, নাট্যচর্চায় তাঁদের নিজস্ব একটি রঙ্গালয়ের প্রয়োজন আছে।

১৮৩১ সালের ২৮ শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অধিনায়কত্বে ইংরাজীনবীশ নব্য বাঙালী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন হয় বলে জানা গেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই ভাই, গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথের নাট্যস্পৃহা ছিল প্রবল। তাঁরা এই ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। কেবল অভিনয়ই নয় গিরীন্দ্রনাথ নাটকও লিখেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্মৃতিতে লিখেছেন—"মেজকাকা "বাবু বিলাস" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। একবার তার অভিনয় হয়েছিল। তাঁর মোসাহেবদের মধ্যে দীননাথ ঘোষাল নামে একটি চালাক চতুর লোক ছিল, সে-ই বাবু সেজেছিল। অভিনয় কি রকম ভালো তা শেষ পর্যন্ত বলতে পারি না। আমরা তো আর সে মজলিসে আসন পাইনি। উঁকিঝুঁকি দিয়ে যা কিছু দেখা।"

মহর্ষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথও একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৮৭২ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের "ঢি ন্যাশনাল পেপার" পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এই সম্পর্কে লেখেন—"The first project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosonno

রত্নাকর

Coomar Tagore. The neet attempt of the kind was made by Baboo Nobin chandra Bose of Shambazar. The theatre got up by him was of a high order. The play Bidya Shoonder was inacted in it. The third attempt of the kind was made by the late Baboo Nagendra Nath Tagore. He was very successful in his attempt.

গিরীন্দ্রনাথের দুইপুত্র, নগেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ছেলেবেলা থেকেই বাপের মত নাট্যাভিনয়ে আগ্রহশীল ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মহর্ষির দুই পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছিলেন সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ, কিন্তু তাঁর উৎসাহই ছিল সবচেয়ে বেশী।

তাঁদের সমবেত চেষ্টায় ঠাকুর বাড়ীতে একটি ছোট-খাটো নাট্য সম্প্রদায় গড়ে উঠল।

যাঁরা আত্মীয় না হলেও এই পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে দু'চারজনকে নেওয়া হল। অভিনয়ের আয়োজন, নাটক নির্বাচন, প্রভৃতি কাজের জন্যে পাঁচজনকে নিয়ে একটি 'কমিটি অফ ম্যানেজ' গঠিত হল। এই পাঁচজন সভ্যের নাম, কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, অক্ষয় চৌধুরী এবং যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। কৃষ্ণ বিহারী সেন ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের ভাই। আর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন দেবেন্দ্র নাথের জামাই। কৃষ্ণ বিহারীর উপর অভিনয় শেখাবার ভার দেওয়া হল। এই ভাবে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গড়ে উঠল।

ঠাকুর বাড়ীতে যখন এই নাট্যশালার ভিত্তি স্থাপিত হয়, তখনই ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করলেন। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় মাইকেলের 'রুক্মকুমারী'। তারপর তাঁরই প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুই অভিনয়েই অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় এই দুটি নাটক অভিনীত হবার পর উদ্যোক্তারা অভিনয় উপযোগী নতুন নাটকের অভাব অনুভব করতে লাগলেন। শুধু তো নাটক করা নয়, তার ভিতর দিয়ে লোকশিক্ষা প্রচারও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেরকম নাটক কোথায়? তাঁরা তখন নতুন নাটকের জন্য ঠাকুরবাড়ীর গৃহশিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীকে ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক। তিনি একটি বিষয় নির্বাচন করে দিলেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী ১৮৬৫ সালে উদ্যোক্তারা বহু বিবাহ বিষয়ক একটি নাটকের জন্য দুশো টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে এক বিজ্ঞাপন প্রচার করলেন।

তারপর বিজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁরা রামনারায়ণ তর্করত্নের উপর এই বিষয়ে একটি নাটক লেখবার ভার দিলেন। ইতিপূর্বে ১৮৬৪ সালে রামনারায়ণের প্রসিদ্ধ সামাজিক নাটক 'কুলীন কুলসর্বস্ব' প্রকাশিত হয়েছিল এবং অচিরেই তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার রূপে কলকাতার সুধীসমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেজন্যেই জোড়াসাঁকোর নাট্যসম্প্রদায় তাঁকেই এই কাজের ভার দিলেন।

পণ্ডিত রামনারায়ণ অল্পদিনের মধ্যে নাটকটি লিখে ফেললেন। নাম—'নবনাটক'। এই নাটকটি ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই নাটক রচনার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে এক বিশেষ সভার অনুষ্ঠান হয় এবং রামনারায়ণকে দু'শো টাকা পারিতোষিক দেওয়া হয়। পণ্ডিত শিব সেই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

মহাসমারোহে জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় 'নবনাটক' অভিনয়ের তোড়জোড় শুরু হল। ঠাকুর পরিবারের মধ্যে যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ বা 'বড়র দল' তাঁরাই অভিনয়ের আয়োজনে ব্যাপৃত হলেন। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন—"বড়র দলই অভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। দোতলার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা সীন আঁকিতে আরম্ভ করিল। ড্রপ সীনে রাজস্থানের ভীম সিংহের সরোবর তটস্থ জগ মন্দির অঙ্কিত হইল। নাট্যোল্লিখিত পাত্রগুলির পাঠ আমাদের সবাইকে বিলি করিয়া দেওয়া হইল। আমি হইলাম 'নষ্ট', আমার জ্যেঠতুতো ভগ্নীপতি নীলকমল মুখোপাধ্যায় সাজিলেন 'নষ্ট', আমার নিজের আর এক ভগ্নীপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় 'চিত্তভোষ', আর এক ভগ্নীপতি নারদা প্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় হইলেন 'গনেশবাবুর' ধড় স্ত্রী। সুপ্রসিদ্ধ কমিক অভিনেতা অক্ষয় মজুমদার লইলেন 'গনেশবাবুর' পার্ট। বাকী আমাদের অন্যান্য আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের জন্য নির্দিষ্ট হইল।"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, দু'মাস ধরে এই অভিনয়ের জন্যে দিনে রিহার্সাল ও রাত্রে বিবিধ যন্ত্রসহকারে কনসার্টের মহলা চলেছিল। ১৮৬৭ সালের ৭ই জানুয়ারী প্রথম রজনীর অভিনয় হয়। কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়ে এই অভিনয় আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের

মধ্যে সস্ত্রীক লর্ড ল্যান্সডাউনও ছিলেন। নাট্যকার স্বয়ং অভিনয়ের সময়ে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের নাটকের অভিনয় সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন।

অভিনয়কে সর্বদিক দিয়ে সুন্দর করবার জন্য উদ্যোক্তারা যত্নের কোন ত্রুটি করেন নি। এ সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখছেন—"তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অংকিত হইয়াছিল। বেশ যতদূর সাধ্য সমৃদ্ধ ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিবার জন্য যতদূর সম্ভব চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। বনদৃশ্যের পীনপাদিকে নানাবিধ লতাগুল্ম এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাকী পোকা আটা দিয়া জুড়িয়া অতি সুন্দর ও সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যি-কারের বনের মতই মনে হইত।"

নাটকের অভিনয়ও খুব ভাল হয়েছিল। নানা পত্র পত্রিকায় বিশেষ প্রশংসাজ্ঞাপক মন্তব্য বেরিয়েছিল। জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় পরপর দু'বার এই 'নব-নাটক' অভিনীত হয়। প্রথমবারের অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল মাত্র ছ'বছর। এই অভিনয়ের কথা তাঁর স্মরণ ছিল।

১৮৮৭ সালেই জোড়াসাঁকো নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায় এবং সেই সঙ্গেই ঠাকুর বাড়ীর নাট্যাভিনয়ের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্বে শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় রবীন্দ্র-নাথের নাট্যাভিনয়—বারান্তরে।

নাট্য সম্মেলন

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় সুশীল সিংহের অভিজ্ঞতা ও কর্মতৎপরতা সংস্কৃতি-অনুরাগী ও শিল্পী মহলে বিশেষ বিদিত। তিনি বহু সংস্কৃতি ও রবীন্দ্র মেলার সঙ্গে অনেক বছর যুক্ত ছিলেন। তারপর কয়েক বছর আগে শ্যামবোয়ারে যে নাট্য সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তাও অনেকেরই স্মরণ আছে। জেনে আনন্দ হল, এবছরে পুনরায় ১৪—২৮ এপ্রিল সুভাষ বাস-এ (শ্যাম বোয়ারে) পক্ষকাল ব্যাপী নাট্যসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে বহুরূপী নান্দীকার প্রমুখ তেরটি গ্রুপ থিয়েটার তাঁদের হাল আমলের নাটকগুলি মঞ্চস্থ করবেন, তার সঙ্গে আছে মহিলা শিল্পী মহল ও শিল্পী সংসদ।

এই সম্মেলনে ২৪ দিন ব্যাপী একটি নাট্য প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নাট্য-প্রবাহ

অন্বেষা। নাটক—পদ্মাপদ বসুর অসমাপ্ত। শিল্পী: আরতী মৈত্র, নির্মল সেন, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমাই দে, সরাজ বসু, সুরেশ বসু, প্রশান্ত সেন, অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও ইতি তালুকদার। নাটকের বক্তব্য বলিষ্ঠ। কাহিনী বাস্তব। চরিত্র সৃষ্টিতে ক্ষমতার স্বাক্ষর। তবু প্রযোজনা। দলগত অভিনয় অনবদ্য। তার মধ্যে শ্রীমতি মৈত্র অসাধারণ।

সেন্টাল এক্সসাইজ। তারাশঙ্করের নাটক কালিন্দী। নির্দেশনা: বিজু মুখোপাধ্যায়। শিল্পী: সবিতা মুখোপাধ্যায়, সত্য চক্রবর্তী, নিখিল চৌধুরী, কমল প্রধান, রমেন ভট্টাচার্য্য, রথীন ঘোষাল, কিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম হালদার, হরিপদ দাস ও নবীগোপাল বসুরা। ষ্টেটের উপর দু-অভিনীত। প্রযোজনায় আরও অনেক উন্নত মানের আবশ্যক ছিল।

আগ্রাহী। নাটক—কি কি পোকার কান্না। নির্দেশনা—তপন রায়। শিল্পী: স্বপন মুখু, বাবুল লাহিড়ী, সুমিত ভঞ্জ, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, শুভ দত্ত প্রমুখ। দলগত অভিনয় অগোছালো সুন্দর। দর্শকরা খুশী হয়েছেন।

পঞ্চমুখ। নাটক—কমল লাহিড়ীর স্বর্গগ্রাস। নির্দেশনা—অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্পীদের নাম জানা যায়নি কিন্তু নাটকটির সুপরিচালনায় এবং সামগ্রিক সুঅভিনয়ে দর্শকবৃন্দ প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন।

। ভি ভি এম এল। নাটক—কেদার রায়। নির্দেশনা—শীল চট্টোপাধ্যায়। শিল্পী: দেবব্রত চক্রবর্তী, কানু

হার চৌধুরী, গোপাল মুখোপাধ্যায়, অনুরাধা রায়চৌধুরী, পাপিয়া ও বুলবুল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। অভিনয় সাধারণ মানের। কয়েকজন শিল্পীর চরিত্র রূপায়ণ বিশেষ দক্ষতার পরিচায়ক। নির্দেশনায় চিন্তাশীলতার ছাপ নেই।

স্টেট ব্যাঙ্ক ইণ্ডিয়া এমপ্লয়িজ শাখা—নাটক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানাগলি। নির্দেশনা— তপন বসু। শিল্পী: নিরুপম মুখো, দিলীপ ও প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, সমু শীল, শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ কুণ্ডু, অরুণ ঘোষাল ও তারাপ্রসাদ বসু। অভিনয় মোটামুটি ভাল। নির্দেশনাও ভাল।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, শ্যামবাজার শাখা। নাটক— অমরেন্দ্র রায়ের কাহিনী অবলম্বনে মণিদত্তের নাট্যরচনা কৃতদাসী। শিল্পী: অশোক মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ মুখো, সন্তোষ মজুমদার, শিবানী ভট্টাচার্য, কাশী মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাসন্তী চট্টোপাধ্যায় হিমানী গঙ্গো প্রমুখ। পেশাদার ও অপেশাদার শিল্পী নিয়ে গঠিত সন্তোষ কুমার মজুমদারের পরিচালনা উল্লেখযোগ্য।

কোটস ক্লাব। নাটক গঙ্গাপদ বসুর সত্য বাঙ্গা নেচে। শিল্পী :—শক্তি সোম, মণি হে, দিলীপ সেন, মণি ঘোষ প্রমুখ। শিবকালী মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। অভিনয় অনবদ্য।

বেলিয়া পুকুর শিল্পী সংসদ ও আমরা খেয়ালী। নাটক সাজাহান। শিল্পী প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় (সাজাহান), দ্বিজেন রায় (ঔরঙ্গজেব), রথীন সেন (দিলদার) সবিতা মুখোপাধ্যায় (জাহানারা) প্রমুখ। বলিষ্ঠ অভিনয়। প্রযোজনা সুন্দর

মহাপুরুষের দিব্যলীলা

ফাল্গুন বাঙালীর জীবনে মহাপুণ্য মাস। এই মাসের ২৭শে তারিখে মর্ত্যলোকে আবির্ভাব ঘটেছিল নরদেহধারী ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের। তাই ফাল্গুন-সংখ্যা পল্লী-ভারতীতে তাঁর পুণ্যজীবনের দুটি অলৌকিক লীলা সংগ্রহ করে পাঠকবর্গের উপহার দিয়ে আমাদের প্রণাম তাঁকে নিবেদন করলাম।

মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা

বর্ষাকালে একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঘাটের শিবমন্দিরের ফুলবাগানে এক মালীর ছেলে আগাছা পরিষ্কার করছিল। কাজ করতে করতে এক সময় হঠাৎ সে চীৎকার করে উঠল—

"সাপ, সাপ! বাবা গেলাম। বাবা গো—"

দু'চারজন ছুটে গেল, ব্যাপার কি!

জানা গেল, একটা বিষাক্ত গোখুরো সাপ ছেলেটার ডান হাতের আঙুলে ছোবল মেরেছে।

দেখতে দেখতে ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে সাদা সাদা ফেনা নির্গত হতে লাগল।

সকলে হায় হায় করতে লাগল ছেলেটা বুঝি এতক্ষণে মরেই গেল।

ছেলের অবস্থা দেখে মালী প্রথমটা কিছুক্ষণ হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলতে লাগল, "বাবা! আমার ছেলেটাকে বাঁচাও। ওই আমার একটা মাত্র ছেলে! ওকে বাঁচাও বাবা, ওকে বাঁচিয়ে দাও। নইলে আমিও মরে যাব।"

যেসব ভক্ত সেখানে ছিলেন, তাঁরাও ঘটনাস্থলে গেলেন, দেখলেন, ছেলেটার দেহ অসাড় শুদ্ধ! শ্বাস-প্রশ্বাসও পড়ছে না। না। কোন আশা নেই।

ভক্তরা মৌনমুখে ফিরে এলেন।

ঠাকুর উঠলেন। কোন কথা নেই তাঁর মুখে। ধীরে ধীরে গিয়ে ছেলেটাকে দেখলেন। তারপর ফিরে এসে নীরবে নিজের জায়গায় বসলেন।

মালীটা কেঁদেই চলেছে। ঠাকুর কিন্তু কিছুই বলছেন না। তিনি যেন অন্যমনস্ক, ধ্যানস্থ।

ভক্তরা বিস্মিত!

ঠাকুর ছেলেটাকে গিয়ে দেখলেন। অথচ কিছুই করলেন না। মালীটাকে একটা সান্ত্বনার কথাও বললেন না। এর কারণ কি?

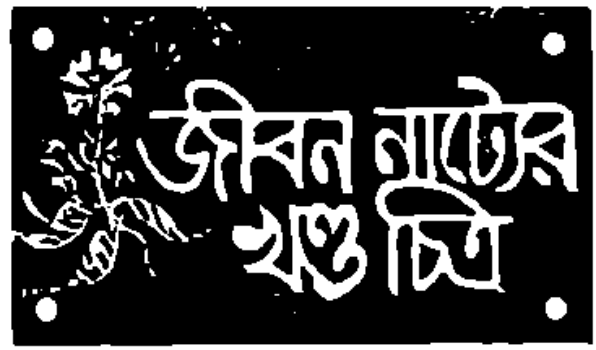

অনাথ উপাধ্যায়

মিনিট চার পাঁচ পরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, পরম ভাগবৎ শ্রী শ্রীচরণ দাস বাবাজী।

ঠাকুর তাঁকে দেখে বললেন, "এই যে বাবাজী এসেছেন, ভালই হয়েছে। আসুন তো। আমাদের মালীর ছেলেকে সাপে কেটেছে। তার কাছে একবার চলুন।"

চরণদাস হেসে বললেন, "কেন, আপনি তো দেখে এসেছেন। ওতেই তো যা হবার হবে। চিন্তা কি।"

রামকৃষ্ণদেব বললেন, "না, না, আপনি চলুন, দেখা যাক।"

দু'জনে অচৈতন্য মৃতবৎ ছেলেটার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

রামকৃষ্ণদেব সেখানে গিয়েই মাটিতে বসে ছেলেটার মাথা নিজের কোলে তুলে নিয়ে মায়ের নাম করতে

লাগলেন। আর চরণদাস বাবাজী ছেলেটাকে প্রদক্ষিণ করে হরিনাম আরম্ভ করলেন।

ঠাকুরের মাতৃনাম আর চরণদাসের হরিনাম, দুইএ মিলে যেন এক অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি হল।

একসময় ঠাকুর মালীকে ডেকে বললেন, সে একসের আন্দাজ দুধ গরম করে রাখুক, ছেলেটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে যখন উঠে বসবে তখন তাকে সেই গরম দুধ খাইয়ে দিতে হবে। তারপর তাকে আর শুতে না দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটা চলা করাতে হবে।

কিন্তু ছেলেটা কি আর উঠবে? তার শরীর তো কাঠ, বুকের স্পন্দন নেই।

স্তব্ধ বিস্ময়ে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

নাম গান চলছে। কখনো নীচু স্বরে, কখনো বা উচ্চকণ্ঠে!

মাঝে মাঝে ঠাকুর ছেলেটার কানের কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছেন। মুখে মায়ের নাম। কোরে কোরে বলছেন।

চরণদাস বাবাজীও ভাবের আবেগে নাচতে নাচতে ছেলেটাকে প্রদক্ষিণ করছেন।

ও কি ও! ছেলেটা যে নড়ে উঠল। তাহলে মারা যায়নি! তারপর সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো, দু'হাত উর্দ্ধে তুললো! ঠাকুর তার সেই হাত দুটি ধরলেন, ছেলেটা ধীরে ধীরে উঠে বসল।

তাই দেখে চরণদাস বাবাজীর সে কী নৃত্য!

সকলে অবাক, আনন্দে আত্মহারা।

ভক্তরা এ কী লীলা আজ প্রত্যক্ষ করলেন! একটি মৃতপ্রাণকে ঠাকুর মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে ফিরিয়ে আনলেন।

অন্তর্যামী

ঠাকুরের নিত্য সহচর ও সেবক রামলাল অনেকদিন ধরেই একটা চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন।

ভাবছেন, আমার খুড়ো মশায় তো লেখা-পড়া কিছু জানেন না। অথচ দেখছি, কত বিদ্বান পণ্ডিত মস্ত মস্ত লোক তাঁর কাছে আসছেন, তাঁর সঙ্গে তর্ক করে হেরে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করে তাঁর পায়ের ধুলো নিচ্ছেন। এর তাৎপর্য কি!

রামলাল দেখছেন আর ভাবছেন।

আচ্ছা, তাহলে এঁকে কি আমার নিরক্ষর খুড়ো ভাববো, না, নরদেহে নারায়ণ এসেছেন, তাই ভাববো? কার সেবা করছি? মানুষের না স্বয়ং ভগবানের? এর কোন্‌টা ঠিক। কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? কে-ই বা বলবে? যাক গে! শেষ পর্যন্ত ঠাকুরকেই বলব, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করে সন্দেহ ভঞ্জন করে নেব।

এই রকম চিন্তায় মগ্ন হয়ে রামলাল নির্জন সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় পশ্চিম দিকের গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে মুখ করে ঠাকুর হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করছেন এমন সময় রামলাল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

ঠাকুর তাঁর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, "কি রে রাম! কি যেন বলবি বলবি ভাবছিস। তা, বল না। কি ভাবছিস?"

এই বলে আবার নিজেই বললেন, "আচ্ছা, থাক। তোকে আর বলতে হবে না। আমিই বলছি।"

রামলাল স্তব্ধ হয়ে ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ঠাকুর বললেন, "শোন্! তুই যে দুটো ভেবেছিস, তার প্রথমটা ছেড়ে দে। দ্বিতীয় যেটা ভেবেছিস, সেইটে ধর।"

এই বলে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই খোলটার ভিতরে যদি তিনি এসে থাকেন, তাহলে তুই তাঁরই সেবা করছিস। ভক্তদের সেবা করছিস। মায়ের ভোগের প্রসাদ পাচ্ছিস। এর চেয়ে বেশী আর কি আশা করতে পারিস! তোর সমস্ত কর্ম তাঁরই চরণে পড়ছে। এ সবের মধ্যে দিয়ে তুই তাঁরই সেবা করছিস। তাই তো মনে কোন সংশয় রাখিস না।"

রামলাল বিস্মিত বিহ্বল।

ঠিক যে কথাগুলি তিনি ভাবছিলেন, ঠাকুর ঠিক ঠিক সেই কথাগুলিরই জবাব দিলেন! তিনি কি অন্তর্যামী? না, রামলালের মনে আর কোন প্রশ্ন রইল না। কোন সংশয় রইল না। ঠাকুরের পায়ের কাছে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলেন রামলাল।

উৎসবের ঋতু—বসন্ত

উৎপল চক্রবর্তী

সব ঋতুরই এক একটি আলাদা চরিত্র আছে। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বহিরঙ্গ সজ্জা তার দৃশ্যত আভাস মাত্র, কিন্তু অন্তরঙ্গ প্রকৃতির সুরটি ঠিক ঐভাবে প্রকট নয়—ওটা বাজে মানুষের মনের নিভৃতে। ব্যক্তিমানুষ নয়—সর্ব-কালের সব মানুষেরই। তাকে মুক্তি দিয়েছে যাদুশিল্পীরা তৈরবী আর টোরীতে, পূরবী আর বরবারী কামোদে—চিত্রকরের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটায় রঙে তুলিতে—লেখকের ভাবনায়—কবির কল্পনায়।

বৈশাখের খরতাপ বা আষাঢ়ের স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া যে বিপুল বৈরাগ্য বা ঘনতর আবেশ রচনা করেছে মানুষের মনে, আশ্বিনের নির্মেঘ নীলিমা বা পৌষের হিম-হাওয়া যে আনন্দ বা রিক্ততার অনুভূতি এনেছে তাকে মর্মে রূপে কত ভাবেই না বিধৃত করতে চেয়েছে আনন্দিত বা বিষণ্ণ চিত্ত—তার অজস্র প্রমাণ মেলে সঙ্গীতে চিত্রে কবিতায়।

আর শুধু মননদীপ্ত মানসিকতাতেই নয়, মানুষ তার লৌকিক জীবনেও প্রকৃতির এই ছন্দকে মূর্ত করতে চেয়েছে নানা ভাবে। তারই বিচিত্র প্রকাশ পালা-পার্বণে ব্রতে উৎসবে মানে আধারে—যা বিশেষ করে এই তেরো পার্বণের বাংলায় প্রভূত বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। যাঁরা সহিষ্ণু রসজ্ঞ উপভোক্তা, তাঁরা জানেন, প্রকৃতির এই বিচিত্রতার পালাবদল নিঃশব্দে ঘটলেও যখন পূর্ণরূপে সে স্বরূপে প্রকাশিত তখন তার বহিরঙ্গের মনোহর মূর্তির অন্তর্লীন আনন্দ বা ব্যথা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ফুটে ওঠে। এবং সংগীতের ভেতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করে তোলেন সুরসাধকেরা যেমন বর্ষার মল্লার বা বসন্তের বাহার।

কিন্তু শুধু গানের ভেতর দিয়ে নয়—নৃত্যের তালে তালেও তাকে ছন্দোময় করার আয়োজন করেছে মানুষ যুগে যুগে। কোন প্রাচীন যুগে শুরু হয়েছিল যখন উৎসব বসন্তকালে—কামদেবের সেই অঙ্গনা কালক্রমে পরিণত হয়েছে বসন্তোৎসবে যার সঙ্গে হোলী খেলার যোগ হয়েছে অঙ্গাঙ্গীভাবে।

ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় যখন ফাল্গুন আসে তখন প্রকৃতির আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নানা সুরে। আজ সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে—এই অনুভূতি উদ্বেলিত করে প্রতিটি মানুষকে, আবীরে কুঙ্কুমে চন্দনে তাই পরস্পরকে রাঙিয়ে দেবার উল্লাস ধ্বনিত হয় বাতাসে।

প্রবাদিত মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মদিনকে ঘিরে বসন্তোৎসব সাড়া তোলে মানুষের মনে। যে মহাপ্রেমের বাণী, হৃদয়ে হৃদয় যোগ করার সংকীর্তন শ্রীচৈতন্যদেবের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—সেই মহামিলনের গান আজো উদ্বোধিত করে মানুষের চৈতন্যকে, আর তাই এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরেই শুরু হয় বসন্তোৎসব।

তেরো পার্বণের বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটি একই ভাবে পালন করা হয় এই উৎসবটি।

বসন্তোৎসব বা হোলী উৎসবের আগের দিন যে অনুষ্ঠানটি হয় তাকে সাধারণভাবে চাঁচর বলে।

উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ-পশ্চিম-বাংলার প্রায় সর্বত্রই এই চাঁচর উৎসবটি দেখেছি। বিশেষত যেখানে গাছপালা বেশী—অরণ্য প্রকৃতি যেখানেই এর প্রচলন আছে। সম্ভবত সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে বন পোড়ানর প্রথা আছে তারই আভাস বহন করে চাঁচর উৎসবটি। খড় বাখারি দিয়ে একটি ঘর তৈরী করা হয় প্রথমে। এটাকে বলে বুড়ীর ঘর। সে ঘরে নারায়ণ পূজা করা হয়। তারপর নারায়ণ বের করে এনে ঘরে আগুন দেওয়া হয়। গ্রামের উল্লাস আর গানের মাতনে গ্রামের মানুষ উত্তাল হয়ে ওঠে। এই 'বুড়ী' কে, এ নিয়ে অনুমান, সম্ভবত শীতের শেষে ফাল্গুনের এই রমণীয় ঋতুতে ঐ 'শীতবুড়ি'কেই পোড়ানো হয়—আর

তখনও আগুন পোহাবার উত্তপ্ত আবেশ উপভোগ করেন সকলে।

সে যাই হোক, ঐ বুড়ীর ঘর পোড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় ঢাক-ঢোল সহযোগে হোরী সংকীর্তনও। কোথাও অষ্টপ্রহর, কোথাও বা চব্বিশ প্রহর। 'হরি হরয়ে নম, কৃষ্ণ যাদবায় নম, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম'—ওস্তিয়লের প্রাঙ্গণে তালে মানুষের মন।

ইতিমধ্যে তৈরী হয়েছে দোল মঞ্চ। কোথাও বা তিন থাকের, কোথাও পাঁচ থাকের। সেখানে নারায়ণ পূজার পর শুরু হয় আবীর খেলা। ফাগের স্পর্শে বাতাসও রঙীন হয়ে ওঠে। মানুষের মনের রঙ প্রাণের রঙ মিশে যায় আবীরের রঙে।

যেখানে এই মহোৎসব হয়, সেখানে সারাদিনের জন্য পাতা পড়ে মানুষের। যে যখনই আসে তখনই প্রসাদ পায়। এমন সময় ছিল সোনার বাংলায় যখন খিচুড়ী তৈরী করে তা রাখা হ'তো বড় বড় সিমেন্টের চৌবাচ্চায়, কখনো বা নৌকোয়। সেখান থেকে বিতরণ হতো। গ্রামের মানুষ সবাই সেদিন সেখানেই আনন্দোজ্জ্বল দিন কাটাতেন।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে হরিনাম কীর্তন। আর আবীর খেলা। আর যেখানে আনন্দ আরো তরলীকৃত সেখানে পিচ্‌কারী দিয়ে রঙ খেলা।

বসন্তোৎসবের এই আবীর-মাখানো রূপটি কখনো কখনো আবিল হয়ে ওঠে অতিরিক্ত মত্ততায়। কিন্তু মানুষের প্রাণে প্রাণে মিলনের এই আনন্দময় সুরটি অমলিন হয়ে যায়। এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর শান্তিনিকেতনে এই উৎসবটির মার্জিত রূপটি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন গানে গানে আর নৃত্যের ছন্দে। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক গান লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, অনেক নৃত্যের পরিকল্পনা করেছিলেন—অনেক নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন। আম্রকুঞ্জের স্নিগ্ধ ছায়ায় ছন্দায়িত ছেলেমেয়েরা সুস্বরে সেই গান করেন সমবেত কণ্ঠে, নৃত্যের তালে তালে আবীর ছড়িয়ে যায় বাতাসে। বসন্তোৎসবের এই নবরূপটি বাংলায় এক নতুন ঐতিহ্যের পত্তন করেছে। এর খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপ্ত। শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব দেখার জন্য তাই আজ দেশবিদেশ থেকে নরনারী আসেন।

চব্বিশ পরগণার বাণীপুরেও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেখানেও ঐ দিন সকালে বিশেষ প্রার্থনা সভার পর সব প্রতিষ্ঠানের ছেলে মেয়েরা আম্রকুঞ্জে সমবেত হয়ে পরস্পরের প্রীতি বিনিময় করেন। সন্ধ্যায় কোন একটি প্রতিষ্ঠান-প্রাঙ্গণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সবাই সমবেত হয়ে বসন্তের গান পরিবেশন করেন।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনাতেও এবার এক নিয় বুনিয়াদী শিক্ষায়তনে এই বসন্তোৎসব বেশ সাড়ম্বরে পালন করা হয়েছে লক্ষ্য করেছি। সেখানেও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক প্রাতঃকালীন প্রার্থনা সভার পর খোল করতাল নিয়ে ছাত্র ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলে সংকীর্তনে বের হন। সন্ধ্যায় আবীরের ছোঁটা আর নিত্যমুখের অনুষ্ঠান—সাঁওতালী গান—রবীন্দ্রনাথের গান—লোকগীতির মূর্ছনায় মুখর হয়ে ওঠে বসন্ত।

উৎসবের ঋতু বসন্ত। আসে বৈশাখ, আসে বর্ষা। কিন্তু প্রকৃতি আর মানুষ এই একটি মাসের রঙীন স্বপ্নে পাগল বছর ভোর থাকেন—যখন এই ঋতুর পরশমণি ছোঁয়া যায় তখন আবার গান জেগে ওঠে—আর সবার মনে রঙ লেগেছে দেখে।

বসন্তোৎসব ও নীতিবাগীশতা

—রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষে তথাকথিত নীতি-বাগীশতা—so called morality-র যে কোন স্থান ছিল না, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমাদের বসন্তোৎসব। এই বসন্তোৎসব কবে যে তথাকথিত নীতিবাগীশতার Holy পোষাক পরে হোলি হয়ে গেল সে কথা আজও অজানা। তবে একটা কথা বেশ জোর করেই বলা যায়, সভ্যতা-চার্যের আগেকার সমাজে এই পৃথিবীটা যে রূপে রসে গন্ধে ভরা, একথা বহুলোকে বিশ্বাস করত। এই নশ্বর মর-জগতেও (বুদ্ধের বাণী প্রচার হওয়া সত্ত্বেও) যে ভোগের ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার একটা বড় মূল্য আছে, সেটা বড় বড় দার্শনিকরাও অস্বীকার করতেন না। ভারতীয় সনাতন দর্শন কোন কালে বস্তুকে বাদ দেয়নি। শাস্ত্রকে রিপু বললেও—তাকে অস্বীকার করেনি ; বরঞ্চ মধুরিপু বলে আনন্দের সঙ্গে আলিঙ্গন করে নিয়েছে। ভারতীয় ঋষিরা দেখেছিলেন এই রিপুটিকে শত্রুর মতো খুন করে তার লাভ করা প্রায় অসম্ভব। করলেও তার বিপরীত ফল আরও ভয়ানক। তাই তাকে শৃঙ্খলা-বদ্ধ না করে সখার মতো আলিঙ্গনে বেঁধে প্রয়োজন অনুসারে মহত্তর সৃষ্টির কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

সমাজকে বাঁধতে গেলে নীতি শৃংখলার প্রয়োজন আছে নিঃসন্দেহে। ইন্‌হিবিশন্ বা অবদমন হল এই শৃংখলবদ্ধ অবস্থারই ফল। দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন উড়তে ভুলে যায়, মানুষও তেমনি পশু হয়ে পড়ে ক্রমাগত আবদ্ধ হবার ফলে। প্রাচীন সমাজে তাই বৎসরের বিশেষ একটা দিনে এই ইন্‌হিবিশনের শৃংখলটাকে খুলে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। পুরাতন সভ্যতাগুলির প্রায় সবকটির মধ্যেই এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল, ভারতবর্ষ কিন্তু এর ব্যতিক্রম নয়।

প্রাচীন গ্রীসে ডায়োনিসিয়ার (Dionysia) উৎসব পরবর্তী কালে রোমে ব্যাকাস্ (Bacchus) উৎসবে রূপ নিয়েছিল। দুয়েরই উদ্দেশ্য ছিল বৎসরের একটা দিনে সমস্ত সামাজিক বাধা ভুলে গিয়ে মদন মহোৎসবে মেতে ওঠা। বৃটেনে এখনও 'মে ডে' May Day উৎসব বহু জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

মানুষ যতই সভ্য হোক, যতই সে প্রকৃতির কাছ থেকে দূরে চলে যাক, বাতাবরণের প্রভাব তার ওপর তার অজ্ঞাতেই কাজ করে যাবে ভূমিকম্পের স্পন্দনের মতো। তাই কঠিন হিমের জড়তা শেষ হয়ে যেই আগুন বাতাসের মৃদুমন্দ হিল্লোল সুরু হয়, তখনই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতিতেও সৃষ্টির তীব্র তরঙ্গ জেগে ওঠে। বনে বনশ্রিকা ও পুষ্প-কোরকের অজস্র বর্ণাস্রোত বইতে থাকে। তার ফলে রূপে-রসে সমস্ত প্রকৃতি ভরপুর হয়ে ওঠে। আম, কাঁঠাল, শিরীষ, মহুয়া, মুচকুন্দ, চাঁপার গন্ধে বাতাসে মাতলামী লেগে যায়। মৌমাছি-প্রজাপতিদের নৃত্য ও গুঞ্জনে চারদিকে নৃত্য-সঙ্গীতের আসর বসে যায়।

আসলে রূপ-রস-গন্ধ এগুলি হল অন্তরের অদৃশ্য রসের বাহ্যিক প্রকাশ। প্রকৃতিতে এ সব কিছুই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যেই নিয়োজিত হয়, সে হল সৃষ্টি। প্রাণের সব চেয়ে বড় লক্ষণ হল সৃষ্টিকারকতা। তাই বীজের অন্তর্নিহিত বড় অবস্থার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রাণচাঞ্চল্যের সুরু হয় বসন্তের আগমনে, সেই সঙ্গে চলে প্রকৃতির বড় কাজটি—জীবসৃষ্টি। তাই বসন্ত হল সৃষ্টির প্রতীক। তার সখা হল মদন বা কামদেব। আমাদের ভারতীয় পুরাণে মদনের আর একটা নাম 'মন্মথ'। মন্মথ শব্দের উৎপত্তি—মথ্ ধাতু থেকে। এই মথ্ ধাতু থেকেই আমরা মিথুন ও মৈথুন, এই শব্দ দুটি পাই, যাদের অর্থ হল স্ত্রী-পুরুষ যুগল ও তাদের মধ্যে সন্তান সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রিয়

সংযোগ। 'মথ্' ধাতুর আদল অর্থ হল কোন কিছুর সাহায্যে কোন একটি পাত্রের অভ্যন্তরে ঘর্ষণ-দ্বারা আলোড়ন সৃষ্টি করা। সেই ঘর্ষণে বা আলোড়নে অগ্নি পর্যন্ত উদ্ভূত হয়। গ্রীক 'প্রমিথিউস' সেই অগ্নিকে স্বর্গ থেকে আহরণ করে নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখে ছিলেন নিজের মধ্যে। এখানেও সেই 'মথ্' ধাতুরই খেলা। ভারতে প্রমিথিউসই প্রমথ।

ভেল বা বীর্য হল অগ্নির রূপান্তর। এই প্রজা-অগ্নিকে উৎপাদন করতে হয় 'মথ্' ধাতুর সাহায্যে। তাই বৈদিক যজ্ঞের বিধিতে আরণ্য অগ্নি জ্বালাবার যে প্রক্রিয়াটি আছে, তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য। সেখানে একটা চেপ্টা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে একটি গর্ত করা থাকে, তার নাম দেওয়া হয় উর্বশী। তার উপর রাখা হয় আর একটী গড়ানিটি কাঠ শলাকা, তার নাম পুরূরবা। সেই চেপ্টা গর্ত বিশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ডের পাশে রাখা থাকে ঘৃতে ডোবান কতকগুলি শুকনো তুল-শলাকা। যজ্ঞের হোতা মন্ত্র উচ্চারণ করেন, আর সেই কাষ্ঠদণ্ডটি ঘর্ষণ করতে থাকেন ঐ চেপ্টা কাষ্ঠখণ্ডের গর্তের ভিতর। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছিটকে এসে পড়ে ঘৃতমণ্ডিত তুল শলাকার ওপর। আগুন জ্বলে ওঠে দাউদাউ করে। সুরু হয় বৈদিক যজ্ঞ।

দেখা যাচ্ছে সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষ বহুযুগ ধরে অতি উচ্চে স্থান দিয়ে এসেছে। সেই সঙ্গে বসন্তোৎসব মদনমহোৎসব মায় নিয়ে ভারতীয় জনসাধারণের কাছে সব উৎসবের সেরা হয়ে উঠেছে। কাব্য পুরাণাদিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভূরি ভূরি।

ভবিষ্যোক্ত পুরাণম-এ শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে এই মদন মহোৎসবের এক বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন—মহা যৌবনবান, তরুণ মহাদেব তপস্যামগ্ন। পার্বতী গৌরী এলেন তাঁর ধ্যান ভাঙাতে, তাঁকে সাহায্যের জন্য সঙ্গে এল মদন। হাতে তার ফুলধনু, সঙ্গে সখা বসন্ত তার সমস্ত সম্ভার নিয়ে এগিয়ে এসেছে গৌরীকে সাহায্য করতে। এরই রূপায়ণ হয়েছে প্রকৃষ্টভাবে কালিদাসকৃত 'কুমারসম্ভবম্'-এ। হরের তপস্যা ভঙ্গ হল। তাঁদের তৃতীয় নেত্র থেকে বিরক্তির আগুন ধক ধক্ করে জ্বলে উঠল মদন ভস্ম হলেন সেই আগুনে। কিন্তু ভস্ম হয়েও 'পক্ষ করে রুদ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী, বিশ্বনাথে দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।'—মহাদেবও এই কামবিনীড়নের হাত এড়াতে পারলেন না। সমুখে প্রণতা গৌরীর পানি গ্রহণ করলেন, এবং—'আনন্দে ধরিয়ে হাতে পরিপূর্ণ পাত্রটি বিশের সুধার"। দগ্ধ মদনের স্ত্রী রতির বিলাপে তখন আকাশ বাতাস মুখরিত। গৌরীর অনুরোধে লজ্জা আশুতোষ বর দিলেন মদন অনঙ্গ হবেও বৎসরে একটি দিন সশরীরে আবির্ভূত হবে এই পৃথিবীতে। সেই দিনটি হল বসন্ত ঋতুর শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী। সেই থেকে পৃথিবীতে শুরু হল মদনের পূজা।

শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা অনুযায়ী, সেই বাসন্তী শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশীর দিন প্রভাতে বরাঙ্গণাগণ—মনোরম মন্মথায়নে (মদনের মন্দির, Baccus altar-এর মতোই) গিয়ে ফুল-ললিত সঙ্গীতে ও বহুবিধ বিলাস সামগ্রীর দ্বারা ভূষিত হয়ে কেলিতে রত হয়। মধ্যাহ্নে মদনের পূজা। ব্রাহ্মণ পূজা করে ও দান পায় প্রচুর। এ পূজার প্রধান মন্ত্র হল —"নমো মায়ায় কামায় দেবদেবায় মূর্ত্তয়ে। ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবেন্দ্রানাং মনঃক্ষোভ করায় বৈ।" নিশায় আরম্ভ উৎসব। তখন নারী পুরুষ উভয়েই এই উৎসবে যোগ দেয়। নিদ্রাবিহীন দারুণ রাত উৎসবের মত্ততা চলে। চলে সুরাপান ও মদনের সেবা।

ঠিক এই একই উৎসবের কথা সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষ লিখেছেন তাঁর রত্নাবলী নাটিকাতে। সেখানে রাজা ও বিদূষকের কথোপকথনে—এক বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় এই মদন মহোৎসবের। তারও দিনটি হল বাসন্তী শুক্লা ত্রয়োদশী।

কালিদাসের রঘুবংশেও এই উৎসবের বর্ণনা আছে। তখন রাজা দশরথ উৎসবে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে ঝুলনে দুলতেন। বর্ণনাটি চমৎকার। অনুভবামৃত বেলমৃত্যুৎসবং/ পটুরশিপ্রির কণ্ঠমি যুক্তয়া। / অনয় যাপনয়ন্ত পরিগ্রহে/

ফুলতাং ফলতাবব লাভনাঃ। / দশরথ বহু কামিনীর ফুলতাতে কণ্ঠাশ্লিষ্ট, কণ্টকিত হয়ে ফুলনে ফুলতেন। এই ফুলন বা দোলা থেকেই বোধহয় দোল্ উৎসব কথাটি এসে থাকবে। কারণ মালবিকাগ্নিমিত্রতেও বসন্তোৎসবে দোলনায় দুলবার কথা বলছেন রাণী ইরাবতী।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পর্যন্ত এই বসন্তোৎসব বা মদন উৎসবের আদিকের কথা উল্লেখিত আছে।—"চন্দনাগুরু কস্তুরী কক্কমন্ত্রব সংযুতম। / আবীরচূর্ণং রুচিরং গৃহ্যতাং পরমেশ্বর। / তখন মদনমহোৎসবে কাপড় রাঙাবার জন্য কৌসুম্ভ (কেশর) ব্যবহার করা হত। লাল আবীর ও কুঙ্কুমের প্রাধান্য ছিল। তখন এসব রং আসত কাশ্মীর, বাহ্লীক (বাল্খ—বালাখশান) ও পারস্য দেশ থেকে। কুঙ্কুমের নানান রকম—যথা উত্তম-মধ্যম-অধম—ভেদের কথার উল্লেখ তখনকার গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

পুরুষোত্তমদেব রচিত 'হারাবলী' শব্দকোষে 'হোলকা' নামে একটি উৎসবের সন্ধান পাওয়া যায়। খুব সম্ভবত এই হোলকা থেকেই হোলি নামের উদ্ভব। সুতরাং ধরা যায়—মুসলমানদের আমল থেকেই বসন্তোৎসব 'হোলি' নাম পেয়েছে। অলবেরুনীর বর্ণনাতেও 'হোলির' কথা বেশ ভাল ভাবেই লেখা আছে। (১)

বসন্তোৎসব যে একসময়ে প্রাচীন ভারতের সবচেয়ে বড় উৎসব ছিল তার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। এই কারণটি আজ ভারতীয় জনসাধারণ বিস্মৃত হয়েছে। শীতের শেষে বসন্তের প্রাদুর্ভাবে প্রকৃতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়। নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনায় প্রকৃতি মত্ত হয়ে ওঠে। চার দিকে তাকালে মনে হয় পৃথিবী যেন নতুন সাজে, নতুন রূপে ধরা দিল। বৈদিক যুগে প্রকৃতির এই নব রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে ঋষিরা পালন করতেন নববর্ষ উৎসব। এখন, খৃষ্ট জন্মাবার চার হাজার বছর আগে সূর্যের অয়ন পথে উত্তরায়ণের সুরু হত ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন থেকে। এবং এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত ঋতুরও সুরু। সুতরাং বসন্তোৎসব অর্থেই ছিল—নববর্ষের উৎসব। (২) তখন থেকেই এই দিনটিতে বসন্তোৎসব—পরে যা সব ভারতীয় হোলি বা হোরি নাম পেয়েছে এবং বাংলায় যাকে দোলোৎসব বলা হয়—তার সুরু।

(১) নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বিশ্বকোষ' দ্রষ্টব্য।

বসন্ত রাজ

বাসন্তী বাগচী

ঋতুচক্রের আবর্তনে শরণাতীত যুগ থেকে প্রতি বছরের শেষে ধরাতলে অবতীর্ণ হয় বসন্তকাল। ভোরের আকাশের রঙে রঙ মিলিয়ে বনভূমি সজ্জিত হয় রাঙা অশোক পলাশ শিমুল আর নবীন কিশলয়ে। মানুষের অন্তরেও তাই জেগে ওঠে আবিরের রঙে পরস্পরকে রাঙিয়ে দেবার উগ্র আকাঙ্ক্ষা। উৎসব সুরু হয় শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত পঞ্চমীর বাসন্তী রং দিয়ে, শেষ হয় দোল পূর্ণিমায় হোলির লাল রঙে।

সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই উৎসব পালন করে থাকেন। এই বসন্ত উৎসব নিয়ে বিভিন্ন-ভাষে বিভিন্ন কবি রচনা করে গেছেন অগণ্য কবিতা ও গান। এঁরা কখনো করেছেন প্রকৃতির রূপ বর্ণনা। কখনো তারই মধ্যে অনুভব করেছেন বিশ্ব-স্রষ্টাকে, কখনো সব কিছু ভুলে হোরি খেলার আনন্দেই মেতে উঠেছেন। মানব চিত্তের বিবিধ ভাব বৈচিত্র্য ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, বিরহ, মিলন আর উৎসবানন্দ, সবই বসন্তকালে, দোল পূর্ণিমায় এঁরা নূতন রূপে অনুভব করেছেন। ছন্দ আর সুরলহরে যে বাণী তাঁরা

আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার মাধ্যমেই তাঁদের অস্তিত্বও আমরা অনুভব করতে এবং তাঁদের সৃষ্টি অনুসরণ করে বসন্ত কালের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে পারি, তবু জানতে ইচ্ছা করে, বর্ত্তমান যুগের সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের পীঠস্থান কবি তীর্থ শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর উপস্থিতিতে এই উৎসব কী ভাবে অনুষ্ঠিত হোতো। সৌন্তলিকতা কিংবা অবতারবাদের সমর্থক না হয়েও হোলির উৎসবে কবি সানন্দেই যোগ দিতেন বলে জানা যায়। এই উপলক্ষ্যে রচিত একটি কবিতা ("অবাবদিহি") প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর "নবজাতক" গ্রন্থে।

"কবি হয়ে দোল উৎসবে
তোম লাগে কালো লাগে আবির
এ নিয়ে রসিকা তোরা সবে
করেছিলি খুব হাসাহাসি।
চৈত্রের দোল প্রাঙ্গণে
আমায় অবাবদিহি চাই
এ ছাবি তোদের ছিল মনে
কাজ ফেলে আসিয়াছি তাই।
দোলের দিনে সে কি মনের ভুলে
পরেছিলেম বসন কালো কাপড়,
দখিন হাওয়া দুয়ারখানা খুলে
হঠাৎ পিঠে দিল হাসির চাপড়।
সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি
কোথা যে মোর গেল রঙের ডালা।
কালো এসে আজ লাগাল বুঝি
সেই প্রহরে রং হরষের পালা।"...

দোল-পূর্ণিমার উৎসব উপলক্ষে রচিত হয়েছে এমনি আরো কত কবিতা, কত গান। সকালে ছেলেমেয়েরা নৃত্যগীত মুখর শোভাযাত্রা সহকারে উপস্থিত হয়েছে আম্রকুঞ্জের উৎসব-বেদীতে উপবিষ্ট কবির সন্নিধানে। দোল-পূর্ণিমার রাত্রে কবির উপস্থিতিতে অভিনীত হয়েছে কত নব রচিত নৃত্যনাট্য। পীত বা পলাশবর্ণের অঙ্গাবরণ শোভিত কবিকে দেখে তখন সমাগত দর্শকবৃন্দ নিশ্চয় এই কথাই মনে মনে ভেবেছেন—

এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ,
বাইরে তাহার উজল সাজ,
ওরে অন্তরে তার বৈরাগী গায়
তাইরে, বাইরে না, না-না-না।"

(আর আজ? এমন উদ্দাম বীভৎসতা শান্তিনিকেতনে তখন অকল্পনীয় ছিল,—তখন এমন স্পর্ধা, এমন দুঃসাহস ছিল কার?)

শান্তিনিকেতন সঙ্গীত ভবনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয় বলেন, "আম্রকুঞ্জের বেদীর উপর ভূশাকারে আবির সাজিয়ে পলাশ ফুল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হোতো। "যা ছিল কালো ধলো, তোমার রঙে রঙে রাঙা হোলো" এই গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হবার পরে ছোট ছোট ছেলেরা হুমড়ি খেয়ে পড়তো আবিরের স্তূপের উপর। সুরু হোতো আবির খেলা। ওখানে এ খেলা কোনোদিন হয় নি। গুরুদেব রাত্রের আসরে দর্শক হিসাবেই উপস্থিত থাকতেন, অংশগ্রহণ করতেন সকালের অনুষ্ঠানে। পাঠ ও আবৃত্তি করতেন, গানও গাইতেন। একবার কবিতা হিসাবেই লিখে আনা "আমের বনে বনে ধরলো মুকুল" এই রচনাটি হঠাৎ সুর দিয়ে গেয়ে উঠলেন এবং পরে আমাদের শিখিয়ে দিলেন।"

অসুস্থতাবশতঃ কবি উৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকতে না পারলে ছেলে-মেয়েরা ভোর বেলায় বৈতালিক গান গাইতে গাইতে প্রথমেই হাজির হোতো কবির গৃহদ্বারে দর্শন লাভ ও প্রণামের আশায়। কবি বঞ্চিত করতেন না কাউকে,—ওদের গানে কোথাও সুর ভুল হলে কবি নিজে গান গেয়ে সুধরে দিতেন ওদের ভুল, অসুস্থ শরীরেও।

কিন্তু এ তো হোলো "বিশ্বভারতীর" গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের কথা। আরো পুরোনো দিনের কোলকাতার বয়স্কগণের প্রিয় কবিবর কী করতেন দোলের দিনে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে, নাটোর-রাজপ্রাসাদে কিংবা আর কোথাও,—যে গল্প শোনাবার মতো এখনকেও বোধহয় আজ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব

কৃষ্ণা সেন

এবার দোলপূর্ণিমায় শান্তিনিকেতন যাবার সুযোগ এসেছিল। শান্তিনিকেতন আগেও গেছি এবং রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ, বিভিন্ন সময়ে তিনি যেখানে যেখানে বাস করেছেন সেই 'উত্তরায়ণ', 'শ্যামলী', 'পুনশ্চ', 'কোণার্ক', এবং যতগুলি শিক্ষাকেন্দ্র 'শ্রীনিকেতন' দেখবার সুযোগ লাভ করেছিলুম। অবশ্য এ প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা। সময় সংক্ষেপের জন্য সে দেখাটুকুও চকিতের দেখা বলা যেতে পারে। তাই মনে মনে শান্তিনিকেতনকে আবার দেখবার ইচ্ছা ছিল সর্বোপরি শান্তিনিকেতন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

এবার দোলপূর্ণিমায় শান্তিনিকেতন গেছি বিশেষ কারণে। ইচ্ছা ছিল শান্তিনিকেতন ভালো করে দেখব। আর সেই সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে 'বসন্তোৎসব' দেখব। শান্তিনিকেতনে হিন্দী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শিবনাথজীর বাড়ী আগের দিন রাতে আমরা দলবলে গিয়ে উঠলুম। নিদ্রা এবং তার চেয়েও বেশী অনিদ্রার মধ্যে দিয়ে রাতটুকু কাটিয়ে পরদিন ভোরে উঠে আমরা আম্রকুঞ্জে 'বসন্তোৎসব' দেখবার জন্য বেরিয়ে পড়লুম। বাইরে থেকে প্রচুর লোক ভীড় জমিয়েছে। আশেপাশে গাছের ডালগুলিও বাদ পড়ে নি। ভীড়ের মধ্যেই কোনক্রমে আমাদের জায়গা করে নিলুম। বসন্তোৎসবের সুরুতে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা এবং ছেলেরা "ওরে গৃহবাসী" "খোল দ্বার খোল" গানের সঙ্গে নৃত্য করে আম্রকুঞ্জে সমবেত হয়ে যে যার সঠিক স্থান গ্রহণ করল। এই সমবেত নৃত্য ভারি সুন্দর। এরপর চলল নৃত্য, সঙ্গীত, পাঠ এবং আবৃত্তির পালা—কখনও একক, কখনও সমবেত; ছোট থেকে সুরু করে বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের সকলেরই পরণে লালপাড় হলুদে শাড়ি এবং মাথায় হলুদে ফুল। শহরের বদ্ধ পরিবেশ থেকে এসে শান্তিনিকেতনে খোলা আকাশের তলায় বসে এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি দেখার আনন্দই আলাদা। 'যদি তারে নাই চিনি গো', 'এতদিন যে বসেছিলেম', 'আগুন হাওয়ায় হাওয়ায়', 'চলে যায় মরি হায়', 'বাড়িয়ে দিয়ে যাও' ইত্যাদি গান এবং তৎসহযোগে নৃত্যে আমরা শুধু বসন্তোৎসব চোখে দেখার আনন্দ লাভ করি নি পরন্তু 'ধরণীর ধ্যানের ধন', 'নন্দনের আনন্দ' সেই বসন্ত ঋতুর স্পর্শ লাভ করেছি আর যখন ফিরে এসেছি তখনও মনের মধ্যে বাজছে সেই সুরের রেশ কবির ভাষায় বলি —

"অধীর সমীর ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে
গন্ধ সনে হল মন সুদূরে বিলীন।"

অনুষ্ঠানের শেষে নৃত্য এবং গানের সঙ্গে পরস্পর চেনা-অচেনা নির্বিশেষে আবীর মাখানোর পর্বটিও মনোরম। 'আমাদের শান্তিনিকেতন' সমবেত কণ্ঠে গীত হবার পর অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি। সেইদিন রাত্রে বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং পরদিন 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল।

বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

অলকা বসু

গাছপালা আর লতাপাতা আমরা কে না ভালবাসি বলুন? কিন্তু প্রকৃতিরানীর মত নিখুঁতভাবে মিষ্টি করে সাজাতে আমরা ক'জন পারি, বলতে পারেন? বারোঋতুতে বারোরঙে বারোভাবে মনভোলানো সেজে প্রকৃতিরানী কেমন পর্যায়ক্রমে নিজেকে সাজিয়ে তোলে, সাজার এ ধরণটিকে, কই আমাদের সাজ আর সাজানো তেমন নিখুঁত হয় বলতো? প্রকৃতিরানী কিন্তু পারে, আর সবাইকে সহজভাবেই শিখিয়ে দেয় কোন রঙটা কোন ঋতুতে চোখের তৃপ্তি আনবে বেশী করে। হ্যাঁ, সেজন্য একটু চোখ মেলে তাকাতে হবে বৈকি—প্রকৃতির দিকে। আর মনটা যদি বাস্তবতার স্পর্শে একেবারে মরে না যায় তাহলে বারোঋতুর ছন্দে ছন্দে চলে যাওয়ার সাথে প্রকৃতির কেমন রঙ, বদলায় সে সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। এইতো মাত্র একটা মাস আগেও গাঢ়, ঘন আর চড়া রঙগুলো কেমন ব্যবহার করতে ভালো লাগছিল। শীতঋতুতে যেমন বারোরঙের মরশুমী ফুলের সমারোহ দেখা যায়, নারীরাও তেমনই মরশুমী ফুলের মত বারোরঙের শাড়ি, ব্লাউজপীস, রৌদ্রের আবরণে ঢেকে দিতো নিজেদের দেহ। মনটাও আনন্দ আর হৈ চৈ করার জন্য নেচে উঠ্‌তো।

ঋতুর প্রভাব যে মানুষের মনের উপর বিস্তারিত হয় তা কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। তাই বারোঋতুতে মনেরও হয় বেশ পরিবর্তন। মাত্র ছয়টা তো ঋতু, তার মধ্যে গ্রীষ্ম হানে দারুণ দহনজ্বালা—ক্লান্ত করে মানুষকে দহনে। তারপর বর্ষার আগমনে মনটা মযূরের মত নেচে উঠ্‌লেও শেষ পর্যন্ত একঘেয়েমিতে ভ'রে যায়। ছুটো ঋতু শরৎ আর হেমন্তকে আলাদা করে তেমন দেখা যায় না—একজন বর্ষার সাথে অজান্তে হাত মেলায়। আর শীত তার হলে থেকে নেয় হেমন্তকে। তাদের কোন পৃথক সত্তা নেই। শীতঋতুটা কিন্তু একেবারে ভিন্নপ্রকৃতির—ঠিক যেন বড় হোটেলের অ্যাসব্যাণ্ডের বাজনা—তারই পাশে বসন্ত যেন ভোরবেলায় দূর থেকে ভেসে আসা সানাইয়ের সুর। মিষ্টতায় ভরা। আবেশ ছড়াতে expert—ঠিক নয় কি?

শীতের সৌন্দর্য্যকে দেখা যায়, কিন্তু বসন্তের সৌন্দর্য্যকে অনুভব করা যায় শুধু। সন্তকোটা ফুলের মত তা মিষ্টি, যৌবনাগমনে আরক্তিম নারীর মত তা লজ্জা—নববধূর মতই তা নতুনত্বে ভরা। শীত যেন ultra modern মেয়ের মতই নিজেকে তুলে ধরে সবার মাঝে, কিন্তু বসন্ত প্রকটভাবে নিজেকে তুলে ধরে না বটে কিন্তু সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতেও ভুলে যায় না। সূর্য রাশি রাশি আলো বিকীরণ করে ধরার অনেক প্রয়োজনই মেটাচ্ছে কিন্তু সবটুকু প্রশংসা কেড়ে নেয় চাঁদিনীরাতের একমুঠো জ্যোৎস্না। বর্ষাঋতু ফসল ফলাতে সহায়তা করে, শীত মানুষকে সজীব করে কিন্তু এদের আদর ঐ বসন্তঋতুর তুলনায় কতটুকু? দক্ষিণের বাতাসটা মিষ্টি হাওয়া এসে যখন একমুঠো মিষ্টি হাওয়া এসে দেহটাকে জুড়িয়ে দেয় তখন সবটুকু ভালবাসা কি ঐ বসন্তঋতুই কুড়িয়ে নেয় না? তবে, মাত্র কয়েকদিনের অতিথি বলেই কি বসন্তের এত আদর? কোকিলের কুহুতান তখন মধুর লাগে। গাছে গাছে সবুজ কচিপাতা এসে মনটাকেও কেমন সবুজ করে তোলে—রাশি রাশি রুক্ষচূড়া ফুটে আগিয়ে দেয় বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—মানুষের মনে আসে কেমন যেন একটা ভালোলাগার ভাব। মানি তা অল্পকালের, মানি তা ক্ষণস্থায়ী, তবু ফাল্গুনের নবীন আনন্দে সাড়া না দিয়ে মানুষ থাকতে পারে কই?

সামনের বাগানের কাঠচাপা গাছটাও কয়েকদিন আগেও ফুল আর পাতাবিহীন হয়ে একেবারে কঙ্কালসার

হয়ে দাঁড়িয়েছিলো—ক'দিন হ'লো পাতা আর ফুলে কেমন সুখরী হয়ে উঠেছে—কচিপাতার ভাঁজে সবুজ রঙটা তাই ভালো লাগছে সবার, এই ক'দিন। ঘরের বেডকভার, পর্দা আর table cloth গুলো হাল্কা সবুজ আর হালকা হলুদরঙে ভরিয়ে দিতে মন চাইছে। এই রঙগুলো কেমন যেন সজীবতার কথা ঘোষণা করে। নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দেয়।

প্রকৃতিদেবী যখন যে রঙে সাজে তখন যদি অঙ্গসজ্জায় ও গৃহসজ্জায় সেই রঙটি ব্যবহার করা যায় তাহলে সহজেই চোখের তৃপ্তি আসবে। প্রশ্ন উঠবে, এতে তা কি সম্ভব? একসঙ্গে পর্দা আর ম্যাচকরা বেডকভার কিনতে গেলেই তো অনেক ছোটখাটো সখসাধই বাদ দিতে হ'বে তাহলে। আসবাবটা কোনরকমে রঙের পরিবর্তনের তালে তালে পরিবর্তন করা যেতে পারে। বেশ সেটুকুর জিদেই যদি সরঞ্জাম কেনা যায় তাহলেই বা মন্দ কি? অঙ্গসজ্জায় যদি রুচির প্রকাশ থাকে তা গৃহসজ্জার ব্যাপারে সংক্রমিত হ'তে বিলম্ব হবে না। প্রকৃতির সাথে মিলিয়ে পর্দা, বেডকভার পরিবর্তন না করলেও নিশ্চয়ই শীতের গাঢ়রঙের পর্দাটা সরিয়ে ফেলতেই হ'বে আমাদের, গ্রীষ্মের আগমনের সাথে সাথে। কিন্তু বসার ঘরের হলুদ-রঙের দেওয়ালে কিংবা সবুজ রঙের printed পর্দাটা দক্ষিণা সমীরণে দুলে উঠে যখন একমুঠো মিষ্টি চাওয়া ছড়িয়ে দেবে, আর ফুলদানীতে রাখা রজনীগন্ধা বিলিয়ে দিতে ভুলে যাবে না তার সুগন্ধ, তখন আপনার অতিথিরা যদি সেই ফাঁকে সুখী হ'য়ে আপনার রুচি ও শিল্পীমনের প্রশংসা করে ফেলেন, তাহলে কেমন লাগবে বলুন তো? পর্দার জন্য হঠাৎ খরচ হয়ে যাওয়া টাকাগুলোর কথা খুবই কি বাধিত করবে?—না প্রশংসায় আরো একটু বেহিসাবী হবার আগ্রহ বেড়ে যাবে, একবার ভাবুন তো?

বুদ্ধি খুলটা ব্যয়সঙ্কোচনের। কিন্তু দুদিনের তরে এই পৃথিবীতে এসে যদি সুন্দরের পূজারী হ'য়ে বেঁচে থাকা যায় তাহলে ক্ষতি কি? বড় বাস্তব সব সময়েই তো তার শক্ত মুঠিতে নিষ্পেষিত করতে চাইবে। তাই বলে হার মানতে হ'বে? সুন্দরের আদর চিরদিন,—তা মানুষই হোক, প্রকৃতিই হোক, পরিবেশই হোক আর জীবনই হোক। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকা একটা আর্ট। খরচের কথা সহজেই উঠবে। অনেকেরই ধারণা সুন্দরের পূজারী হতে হলে খরচের অঙ্কটা কিছু বাড়ে। কথাটা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু বদলে তা কিছুটা আনন্দও তো দেয়? বাঁচার জন্য সে আনন্দটা নিশ্চয়ই অবহেলার নয়। তবে, যাদের আছে শিল্পীমন, যাদের আছে রুচিজ্ঞান তারা নানা জিনিস দিয়েই ঘর সাজায়, সৃষ্টি করে কিছু রমণীয় জিনিস যা ঘরের সৌন্দর্য্য বাড়ায়। তারা নিজের সৌন্দর্যকেও ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট। যেমন ধরুন, বসন্তের আগমনে সন্ধ্যায় হালকা সাজে সেজে একগাদি বরাপাতা যদি খোঁপার একপ্রান্তে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে তা কি সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবে না?

বসন্ত যেমন প্রতিবছর একবার এসে প্রকৃতিকে সাজিয়ে দেয় নতুনরূপে, ভরিয়ে দেয় রঙে, রসে—জানায় পুরাতনের গ্লানি মুছে যাক্! চির সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে মানুষের মাঝে ধরা দেয় সে। মানুষ বসন্তের হাত ধরে নবীন হয়ে ওঠে—ভালবেসে ফেলে এই ঋতুটিকে। নবীন ও প্রবীণ সবারই আদরের সে। কারণ সে যে সৌন্দর্য্যের পূজারী। যার শুরুদিন থেকে বসন্ত বিদায় নিলে ব্যাকুল হৃদয় গেয়ে ওঠে "ঋতি চায় গো, আমার বসন্তের দিন চলে যায়"। বিদায়ী বসন্তের রূপ আর তেমন সজীব থাকেনা। গাছের পাতা যায় ঝরে, সেই সবুজপাতার ঝরা হয় তখন বাসন্তী। কবি গেয়ে ওঠেন—

"ঝরা পাতাগো, বাসন্তী রঙ দিয়ে
যেবের বেলে গেছে তুমি কি এ
খেলিলে হোলি ধূলায় ধূলায় ঘাসে ঘাসে
বসন্তের চির ইতিহাসে।"

বসন্তকালের সবচেয়ে বড় উৎসব এই হোলি উৎসব। আবীরে আর রঙে মানুষ আত্মীয়, বন্ধু ও প্রিয়জনকে রাঙিয়ে দেয়। এই উৎসবটী প্রতিবছর নতুনরূপে এলেও এই উৎসবটী বহুদিনের বহুকালের বলেই মনে হয়। কারণ শ্রীরাধাকেও বলতে শোনা যায়—

"ওগো বরনে আবীর দিয়ো না গো শ্যামরায়
আমি চাহিবো না তব পানে।"

এই সময় আরো একটি উৎসব নানাভাবে হয়—তা হলো বসন্ত উৎসব। ধরণীর রমণীয় শোভা দেখে কবি ঋতুকেন্দ্রিক বহু গান রচনা করে গেছেন। বসন্তকে আবাহন করার কালে কেহ গায়—"আজি দখিন দুয়ার খোলা, এসো আমার বসন্ত এসো হে।" কারো কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "ওহে সুন্দর মরি মরি, তোমায় কি দিয়ে বরণ করি।" আবার কোথাও বা উদাত্ত কণ্ঠে শোনা যায় "আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে—।" চিরসুন্দর চিরবন্ধুর বসন্তকে আলিঙ্গন করে আমাদেরও কি বলতে ইচ্ছে করে না "এই লভিনু সঙ্গ তোমার, সুন্দর হে সুন্দর"?

ফাল্গুনের উৎসব

বেলা দে

বাংলার প্রধান উৎসব পূজা ও পার্বণ। প্রাচীন যুগে সমাজ জীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল ধর্ম। দেবদেবীর পূজা বা ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ তার আশা আকাংখা প্রকাশ করতো। বিশ্বাস করতো, যে দেবদেবীর সাহায্যেই তার সকল আশা, কামনা পূর্ণ হবে।

বাংলা দেশে ব্রত পূজা ছাড়াও আরো কয়েক রকমের অনুষ্ঠান পালন করা হয় তার মধ্যে দোলযাত্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সময় প্রচুর জাঁকজমকের সঙ্গে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হোত। ফাল্গুন পূর্ণিমার আগের দিন রাত্রে বাঁশ বাখারি আর খড় দিয়ে একটি মানুষের প্রতিমূর্তি তৈরী করা হয়। তাকে স্থানীয় রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দোল মঞ্চ, বা বাড়ীর প্রাঙ্গণে স্থাপনা করে। তার কাছে একটি ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী করা হয়—সন্ধ্যায় পুরোহিত এসে পূজা করে, বিগ্রহকে সেই খড়ের মূর্তির কাছে নিয়ে এসে খড়ের মূর্তিতে আগুন দেন আর এই সময় দেব বিগ্রহটিকে সাতবার সেই প্রজ্বলিত মূর্তিটিকে প্রদক্ষিণ করান হয়, এর নাম ছাড়ান পোড়া। পরদিন সকালে দেববিগ্রহকে স্নান করিয়ে পুরোহিত আনুষ্ঠানিকভাবে সেটিকে কয়েকবার দোল দেন। যারা কাছাকাছি থাকেন তারা ফাগ এবং ফাগ গোলা, রঙীনজল, বিগ্রহের গায়ে ছিটিয়ে দেন। পুরোহিত সেই ফাগ-কণিকা তুলে নিয়ে সকলের কপালে ফোঁটা দেন। তারপর সুরু হয় হোলি উৎসব। সেকালের বৌ মেয়েরা এই দোল খেলায় আমোদ প্রমোদ করতেন। অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে এই দোল উৎসব সম্পন্ন হয় একটু আধটু বদল করে। ওড়িষ্যায় যে হোলি উৎসব হয় তা বাংলারই অনুরূপ। আবার উত্তর প্রদেশে রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে মাঝে মাঝে দোলযাত্রার অঙ্গীভূত করা হয়।

এছাড়া হোলি উৎসব উত্তম ফসলের আশায় একটি কৃষি উৎসব হিসেবেই পৃথিবীর অনেক অংশে প্রচলিত আছে। দেশভেদে, কালভেদে প্রথার প্রবর্তন হলেও মূল আকৃতিটি সর্বত্র একই রকম। বসন্ত যৌবনের উৎসব, জীবনের উৎসব, তাই হোলির গানেও জীবনের জয়গান ধ্বনিত হয়। আজো পল্লীবাংলার গ্রামে দোল পূর্ণিমার সন্ধ্যায় লীলাকীর্তন শোনা যায় পথের দুধারে সমবেত ভক্তবৃন্দ পরস্পরের গায়ে ফাগ দিয়ে আনন্দ অনুভব করেন। পূর্ণিমায় দোল রাজদোল। হোরির কয়েকটি গানে আছে অষ্টকালীয় নিত্যলীলার মধ্যেও হোরিলীলা অনুভব। সখী এসে শ্রীরাধাকে বলছেন—

'আজ কোই কুলবতী নাহি বাহিরায়
যমুনা সিনানে কোই নাহি যায়।
বিগতি পড়ল আজ যুবতী সমাজ।
সখাগণ সঙ্গে খেলই যুবরাজ।

এদিকে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ভাবনাদের উপর শ্রীরাধা অবিরল বৃষবৃষ বিগলিত রঙীন জলধারা বর্ষণ করছেন—প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধাকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ মৃগমদরঞ্জিত প্রভূত বারিরাশি নিক্ষেপ করছেন। সখী ললিতা বলছেন—দেখ, দেখ, আমার সখী প্রিয়তম বল্লভকে পরাজিত করেছেন। সত্যিই শ্রীকৃষ্ণ হেরে গেলেন।

"সিংহাসনে বৈসে রাই
কোলে করি তায়
এ মোহনদাস
হেরি পূর্ণ মনস্কাম।"

গৃহ-সজ্জা

সুরঞ্জনা সেন

Home, Home
Sweet Home
There is no place
Like Home

"বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এককোণে
রাঁধিব আপন মনে
ধন নয়, মান নয়,
এতটুকু বাসা।"

এই বাসনা শুধু কবির নয়, অনেকেরই। কিন্তু, বাসা এতটুকু হোক তাতে ক্ষতি নেই, তা যেন হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর। তার জন্য আবার গৃহ-সজ্জা সম্পর্কে কিছু জানা দরকার।

ঘর সাজাবার জন্য যে সব উপকরণ পাওয়া যায় তার মধ্যে সব চেয়ে সস্তা, সুলভ, আর তাড়াতাড়ি ব্যবহারের উপযোগী জিনিস হল দেয়াল-কাগজ। রাণী ভিক্টোরিয়ার যুগের বিখ্যাত কবি ও চিত্র-শিল্পী উইলিয়াম মরিস দেয়াল-সজ্জায় নানা মূল্যবান ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। ঘরের ভেতরে কী ক'রে সরল সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টি করা যায়, এ বিষয়ে জাপানীদের কাছেও অনেক কিছু শেখবার আছে।

ঘরের দেয়ালে লাগাবার জন্য আধুনিক নানা ডিজাইনের কাগজ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। কাগজের রঙ্গা বা লতাপাতা ফুল ইত্যাদির রং যেন খুব বেশী উগ্র না হয়। চোখের পক্ষে রং যেন প্রীতিকর হয়। ঘরের সবগুলি দেয়ালে, সিলিংএ একই ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা উচিত। অবশ্য, এই সব বিষয়ে ব্যক্তিগত রুচির দাম অনেকখানি ব'লে বাঁধা ধরা কোনো নির্দেশ দেওয়া সঙ্গত নয়। দেয়াল-কাগজ ব্যবহারের একটা সুবিধা, প্রত্যেক বছর নতুন ডিজাইনের কাগজ ব্যবহার করা যায়। বাইরের পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন গাছপালা নতুন রঙে সেজে ওঠে, ঘরের ভেতরের তেমনি যেন আবহাওয়ার পরিবর্তন আনা চলে। যাঁদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, এবং যাঁরা একটু সৌখিন তাঁরা ইচ্ছে করলে প্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ হেমন্ত, শীত, বসন্ত ইত্যাদি ঋতুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘরের ভেতরটা পালটে দিতে পারেন। যাদের চটি আঁকার হাত রয়েছে তাদের তো আরো সুবিধে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেয়াল-কাগজের ব্যাপক চাহিদা এবং ব্যবহার হয়েছে। ছাপা হচ্ছে নানা রকম সুন্দর সুন্দর আর আধুনিক ডিজাইনের কাগজ। আমাদের দেশে এর ব্যবহার যে একেবারে নেই তা নয়। নানা পূজা-পার্বণে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং উৎসবে দেয়াল কাগজ দিয়ে পূজা-মণ্ডপ, বাঁশের বা কাঠের খুঁটি, তোরণ ইত্যাদি সাজান হয়। কিন্তু শয়নকক্ষ বা বাসগৃহ সাজাবার কাজে দেওয়াল-কাগজের ব্যবহার এখনো নিতান্তই সীমাবদ্ধ। আমাদের দেশের মেয়েদের এদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। তাহলে তাদের ঘর যে কেবল স্নিগ্ধ, মনোরম হ'য়ে উঠবে তা নয়, দেয়াল-কাগজ তৈরির ছোট

ছোট অনেক কর্ম-ক্ষেত্র গড়ে উঠবে। অনেকের আর্থিক সংস্থান হবে।

দেহ ও মনের স্বাস্থ্য অনেকখানি নির্ভর করে ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যের ওপর। পয়সা থাকলেই ঘর সুন্দর রাখা যায় না। এর জন্য দরকার রুচির।

ঘরের দেয়াল কাগজে মুড়ে দিলে যেমন সৌন্দর্য বেড়ে যায়, তেমনি সুন্দর পর্দা দরজা, জানালায় লাগালে বাড়ির চেহারাই যেন পালটে যায়। বাড়ির রং, গঠন ইত্যাদির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পর্দার কাপড় কিনবেন। অনেক বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই বেশ সুন্দর পর্দা তৈরী করতে পারেন। এতে কেবল যে খরচ কম পড়ে তা নয়, মনের তৃপ্তিও পাওয়া যায়

• •

গৃহ-সজ্জায় আরেকটি উপকরণ ছবি। অনেকে বাজারের সুরুচিপূর্ণ ক্যালেণ্ডার বা ওই ধরণের ছবি ঘর ভরে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন মনে রাখবেন, আপনাদের অনেকের বাড়িতেই ছোট ছেলে-মেয়ে আছে। ওই সব ছবির প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন বিষয়ক হ'য়ে উঠতে পারে। ভালো ক্যালেণ্ডার দেয়ালে টাঙালে ভাল হয়। তবে, এক ঘরে একটি বা দুটির বেশি ক্যালেণ্ডার না থাকাই ভালো। দেয়ালে ভালো ছবি টাঙিয়ে রাখার মূল্য নিশ্চয়ই আছে। তবে ঘর বিশেষে ছবির রকম-ফের থাকা দরকার। যেমন ঠাকুর ঘরে রাখবেন দেব-দেবীর কিংবা সাধু-সন্তদের ছবি। শোবার ঘরে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য, বা বড় বড় শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রতিলিপি। শহরে প্রাকৃতিক পরিবেশের অভাব। তাই যেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্য থাকলে ইট-কাঠ পাথর দেখে দেখে ক্লান্ত চোখ একটু বিশ্রাম পায়। এ ছাড়া দেয়ালে রাখতে পারেন মনীষী-দের বাণী। শিশু, বয়স্ক নারী, পুরুষ সকলেরই চরিত্র গঠনে, হতাশ মুহূর্তে মনকে সজীব ক'রে তুলতে, আশার আলো দেখাতে এদের জুড়ি নেই। মাঝে মাঝে বাণীগুলি পাল্টে দিতে পারেন।

যদি সম্ভব হয় একগুচ্ছ ফুল রাখবেন। যাঁদের বাড়িতে স্থান-সমস্যা, তাঁরাও টবে ফুলের চর্চা করতে পারেন। ফুলের ঔজ্জ্বল্য সাহচর্য গৃহের সৌন্দর্যের অনেকখানি সহায়ক। প্রকৃতির সঙ্গে মনের সমাবেশের সুযোগ দেয়।

গৃহ-সজ্জার আরেকটি প্রয়োজনীয় দিক আসবাবপত্রের বিন্যাস। আলমারী, খাট, টেবিল, চেয়ার আলনা ইত্যাদি সাজিয়ে গুছিয়ে যার যার জায়গায় রাখবেন। ঘরে যেখানে সেখানে কিনিস-পত্র ফেলে না রেখে ঠিক, ঠিক জায়গায় রাখা উচিত। সাজানো ঘর ছন্দোবদ্ধ কবিতার মতো। প্রসাধনের টেবিল একটু আড়ালে থাকাই ভালো। ঘরে বই রাখার জন্য যেমন বুকসেল্ফ থাকবে তেমনি চায়ের সাজ-সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা ছোট শেল্ফের ব্যবস্থা থাকবে। অতিথিদের জন্য গোটা কয়েক সুন্দর কাপ ডিস রেখে দিলে ভালো হয়। আর ঘরের সামনে থাকবে একখানা পাপোষ।

মনে রাখবেন ঘর আপনার মনের রুচির প্রতিফলন, ঘর আপনার নিজস্ব পৃথিবী। তাই নিজে সুন্দর হতে গেলে, তাকেও সুন্দর ক'রে তুলতে হবে।

ঘর না ফুলের বাগান

প্রতিমা চক্রবর্তী

আপনি কি সারাটা বছর নিজের ঘরে বসন্তের কোন আবহাওয়া রাখতে চান? তাহলে পুরানো একটা কায়দাতেই তা করুন না। ফুল পাতা ঘাস ইত্যাদি অতি সাধারণ উপকরণের সাহায্যেই তা সম্ভব। এই সব ফুল এবং ঘাস আপনার নিজের বাগানে বা বাড়ির আশেপাশে থেকেই পেতে পারেন।

এইসব ঘাস পাতাকে শুকিয়ে রাখবার জন্য বিশেষ কিছুরও প্রয়োজন হয় না বা পয়সা খরচের ব্যাপারও নেই। যে ঘর বেশ শুকনো, তার সিলিং থেকে ঘাস

পাতা বা ফুল তোড়া করে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখুন। আর ফুলগুলি জাতীয় ফুল কাঠের বাক্সে বালির মধ্যে রেখে বালি দিয়ে ঢেকে রাখুন। অন্ততঃ চার পাঁচ দিন।

ফুলগুলি যখন বেশ শুকিয়ে যাবে, তখন আসবে আপনার পরবর্তী কাজ অর্থাৎ রং করা। লক্ষ্য করবেন যে সাদা ফুলগুলি শুকিয়ে তাতে রং করলেই রং বেশী খোলে এবং সাদার ওপর প্রত্যেক রং করার পক্ষে সুবিধা। আর যদি রং দিতে চান তাহলে শুকনো রঙিন ফুলেই তা ব্যবহার করবেন। অবশ্য কি রং দেবেন তা নির্ভর করবে আপনার রুচি শিল্প-সম্মত কিনা তার উপর। রং করবার আগে হাতে রবারের দস্তানা লাগিয়ে নিতে পারেন তাতে আপনার হাতে রং লাগবার ভয় থাকবে না।

শুধু ফুল কেন, ঢেঁকিশাক, খেজুরের পাতা, বেতপাক পাতা, নানাপ্রকার বড়ো বড়ো ঘাস যার আলগুলি খুব নরম, ইত্যাদি শুকিয়ে নিলেও দেখতে বেশ লাগবে। তিন-ভাগের দুভাগ জল আর তিন ভাগের একভাগ মিলাইন মিশিয়ে তাতে এইসব পাতা, এবং ঘাস সপ্তাহ-খানেক ভিজিয়ে রেখে তুলে নিন।

এরপর ইচ্ছে করলে আপনি নিজের খুশীমতো, রংও করতে পারেন, কিংবা প্রকৃতির রাজ্যে যে-রকমটি দেখা যায়।

শুধু ফুলের রং নয়, সৌরভকেও বেশ কিছুটা সময় ধরে রাখা সম্ভব। এই করতে গেলে গোলাপ, যুঁই, ইত্যাদি ফুলগুলির পাপড়িগুলি শুকিয়ে নিতে হবে। তার-পর বিভিন্ন আতরে সেই ফুলগুলিকে ডুবিয়ে নিন।

বাগানে ফুল নেই। ঘরে বাইরে সর্বত্র ফুলের অভাব? তাতে তার কিসের? আপনার ঘরে তো এখন ঘাস-পাতা ফুলের ছড়াছড়ি, শুধু চেহারায় নয়, বর্ণে গন্ধেও তারা আসলের কাছাকাছি। দোকান থেকে প্লাষ্টিক কিংবা কাগজের তৈরী ফুল না কিনে শুকনো ঘাস ফুল-পাতা দিয়ে মনের মতো করে ঘর সাজিয়ে দেখুন এতে কতখানি আনন্দ, আর তৃপ্তি।

বাগানে ফুল নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু কতটুকুই বা তার আয়ু! কিছু কিছু ফুল তো ভোরের শিশিরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। দেখতে দেখতেই শুকিয়ে যায়। কিন্তু ঘরে ব'সে অতি সহজে আপনি যে ঘাস-ফুল-পাতা মনোহারী ক'রে তুললেন তা আপনি রেখে দিতে পারেন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমনকি বেশ কয়েক বছর, তবু ম্লান হবে না তার পাপড়ির রং, বিগলিত হবে না তার সৌন্দর্য, কারণ তা আর শুধু প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, আপনারও রচনা। এই কারণেই এই শিল্পটি পৃথিবীর অনেক জায়গাতেই ইতিমধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

আপনার মনের মাধুরী মিশিয়ে যে ফুল-পাতা ঘাস আপনি রচনা করেছেন তা ব্যবহার করতে পারেন নানা-ভাবে। যদি আপনি পুষ্প-বিলাসী হন, কিংবা কোনো ফুলের স্মৃতি নয়, ফুলটিকেই বহুদিন রেখে দিতে চান, তাহলে সেই ফুলটিকে ওই ভাবে শুকিয়ে নিয়ে এবং রং ক'রে অ্যালবামে রেখে দিতে পারেন। যেমন ক'রে আপনি ফটো রাখেন। এই ধরণের অভিনব অ্যালবাম প্রিয়জনকে উপহার দিয়ে আপনি তাকে বিস্মিত শুধু নয়, আনন্দও দিতে পারেন। উজ্জ্বল বর্ণের ফুল ফ্রেমে ছবির মতো করে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখবেন আপনার ঘরের চেহারাই পাল্টে গেছে। মাঝে-মাঝে ছবি টাঙিয়ে রাখার চাইতে অনেক ভালো লাগবে। কাচের আবরণের আড়াল থেকে ছবিগুলি হাসি-খুশী মুখে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে ফুলের রঙের সাথে যাতে ফ্রেমের রং বেশ মানানসই হয় সে-দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সাদা ফ্রেমে অনেক ফুলের বেশ রং খোলে। শুকনো ফুল কিংবা পাতা চা বা কফির টেবিলে রেখে কাচের আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখুন, দেখবেন আপনি এবং আপনার অতিথি উভয়ই মুগ্ধ আর অপলক হয়ে তাকিয়ে থাকবেন। আপনার তৈরী ফুল সুন্দর ট্রে সাজিয়ে রাখুন, বহুদিন আপনার ঘরের আবহাওয়া সজীব, মনোহর থাকবে। ট্রে আবার ভুল ক'রে জল দেবেন না যেন। দেখুন তো কত সুবিধা। ট্রে তারা ওই ফুল আনাচার কিংবা বিছানার ধারে টিপয়ে রেখে দিতে পারেন। আর সুগন্ধের ব্যবস্থাও তো আগে থেকেই ক'রে রেখেছেন। বৃষ্টির জন্য বাইরে বেরুতে পারছেন না? তাতে কী হয়েছে, আপনার ঘরখানাকেই তো সুন্দর একটি ফুলের বাগান ক'রে রেখেছেন।

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা

গল্প ভারতী সমসাময়িক সাহিত্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তা অভূতপূর্ব।

গল্প ভারতী নবজাগ্রত জাতির মর্মরাঙা মর্মকাহিনী।

গল্প ভারতী সকল শ্রেণীর নবীন ও প্রবীন সাহিত্যিকদের মিলন তীর্থ।

গল্প ভারতী সরস সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জাতীর অন্তরের বাথা ও বেদনার কথা আপনার কাছে পৌছে দিচ্ছে।

গল্প ভারতী নূতন যুগের চিন্তার দ্বারকে উন্মোচন করে দিয়েছে।

গল্প ভারতী অনুবাদ সাহিত্যে নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের মান উন্নীত করেছে।

গল্প ভারতী প্রত্যেক পাতা স্থায়ী সাহিত্যের দাবী করে।

গল্প ভারতী জাতির ভাবজীবনে ও চিন্তাধারায় এক নতুন যুগের সৃষ্টি করেছে।

গল্প ভারতী পূজা সংখ্যার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা শুধু একটি উৎসব ঋতুর সামগ্রী নয়। প্রত্যেক সুধীজনই সানন্দে স্বীকার করেছেন যে এই পত্রিকা বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির চিরস্থায়ী নিদর্শন এবং সেই জন্যেই দেশব্যাপী প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর কাছে পূজা সংখ্যা গল্প ভারতী বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছে।

গল্প ভারতী তার গৌরবোজ্জ্বল ২৮ বৎসরে পদার্পণ করেছে

আজই গল্প ভারতীর গ্রাহক হোন

গল্প ভারতীর গ্রাহক হওয়া মানে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে সাহায্য করা

পূজাসংখ্যাসহ বাৎসরিক চাঁদার হার সডাক মাত্র ২০ টাকা।

যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়

ভারতের ও বাংলাদেশের সর্বত্র সম্ভ্রান্ত এজেন্ট আবশ্যক

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিঃ

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-৩২৪৪ ও ৫৫-১৩৫৫

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

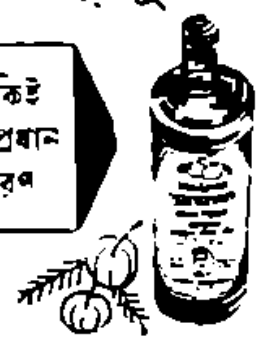

- কেশ পতন, অকালপক্বতা ও কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।
- মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

Regd. No. C 3643

মন খুশীতে ভরে যায়

ঘরে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু ঘি নয় রুচির পরিচায়ক